













# নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

## লেখকদের প্রতি

- ১। অমৃত প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল যথেষ্ট পাঠ্যবেন। অন্যান্য রচনার খবর ৬-মাসের মধ্যে জানান হয়। অন্যান্য রচনা কোনভাবেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। পক্ষের সঙ্গে কোন ডাকটাকি পাঠ্যবেন না।
- ২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যিক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য প্রকাশের লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।
- ৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃত' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টের নিয়মাবলী এবং সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থের তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে প্ত রাখা জায্য।

## গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক।
- ২। ভি-পিও পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদ নিম্নলিখিত হারে মাসিকভাবে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যিক।

## চাঁদার হার

	কলিকাতা	বক্সাল
বাৎসরিক	টাকা ২৫.০০ টাকা ৩০.০০	
সাপ্তাহিক	টাকা ১২.৫০ টাকা ১৫.৫০	
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫ টাকা ৮.০০	

বিঃ প্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার  
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)  
বাৎসরিক টাকা ১.০২  
সাপ্তাহিক টাকা ০.৫২  
ত্রৈমাসিক টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্স গ্যাটার্স লেন,  
কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ  
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৫ সংখ্যা  
মূল্য—৫০ পয়সা  
শিল্প—২ পয়সা  
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 5th January, 1973 শক্রবার, ২১ শৌব, ১৩৭১ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৭০৮	এক নজরে	—শ্রীপ্রতাপকদম্পী
৭০৯	সম্পাদকীয়	
৭১০	দেশেবিশেষে	—শ্রীপঙ্কজরীক
৭১০	চলো বিধাননগর	—শ্রীদিলীপ দালাকার
৭১৬	পুনশ্চ	—শ্রীকপণক
৭১৭	আজকের মুখ (গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
৭২১	কুলের উৎসবে উৎসবের ফল	—শ্রীমোহন ভৌমিক
৭২৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅশ্বকর
৭৩১	বাংলাদেশের প্রথমদলীয়	—শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য
৭৩৩	বাড়ি (উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মী
৭৩৭	অর্থনৈতিক সমীক্ষা : টাকার দায়	—শ্রীশান্তিলাল মল্লোপাধ্যায়
৭৪০	পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ	—শ্রীমুনোজ
৭৫১	ফুল ফোটার আগে (উপন্যাস)	—শ্রীশৈলেন রায়
৭৫১	চিঠিপত্র	
৭৫৫	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীঅরুণাকান্ত
৭৫৯	সম্মোহন বৈচিত্র্য	—শ্রীনন্দলাল পাল
৭৬০	দৃষ্টি পরিবেশ	—শ্রীঅলোক সেন
৭৬২	প্রতিশ্রুতী নিজের পোশাক (কবিতা)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৭৬২	চোখ (কবিতা)	—সামসুদ হক
৭৬২	বিকোভ (কবিতা)	—শ্রীআইভি রাহা
৭৬৩	গম্ভা (গল্প)	—শ্রীবেবী আনওয়ার
৭৬৬	অপনা	—শ্রীপ্রমীলা
৭৬৮	রমা গৃহঠাকুরতা : সংলাপ মর্মেতে	—শ্রীসম্মা সেন
৭৭৫	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনাঙ্গীকর
৭৮০	খেলাধুলা	—শ্রীদশক

## রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

স্বাক্ষরকারী ঠাকুরের জীবনী ৫.৫০ শ্রীমদ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যুবার আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা ৩.৭৫ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব ৮.০০ ভারত-মত রবীন্দ্রনাথ ৪.৭৫ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটগল্প অঙ্ক পুস্তিকা ১০.০০ অশ্বকর ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র নথ ও গল্প ১০.০০ সত্যেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্ত। বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬.৫০ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা ৩.০০ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ ৫.০০ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র স্মৃতি ১২.০০ রবীন্দ্র রচনার উপস্থিতিসম্ভাব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রী ৬.০০ শ্রীশৈলেন দেবনাথ। ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ড্যান্স ২৫.০০ বালকৃষ্ণ মেনন। সংগীত রসায়ন ১৮.০০ শার্ঙ্গদেব (সুবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-অনূদিত)। শিল্পতত্ত্ব ১৫.০০ বেনিডেট ব্রোচে (সোমনকুমার ভট্টাচার্য-অনূদিত)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬।৭ স্বাক্ষরকারী ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭  
পরিবেশক : জিআস, ১এ কলেজ রো ও ১০৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা













# নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

## লেখকদের প্রতি

- ১। অমৃত প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল যথেষ্ট পাঠ্যবেন। অন্যান্য রচনার খবর ৬-মাসের মধ্যে জানান হয়। অন্যান্য রচনা কোনভাবেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। পক্ষের সঙ্গে কোন ডাকটাকি পাঠ্যবেন না।
- ২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যিক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য প্রকাশের লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।
- ৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃত' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টের নিয়মাবলী এবং সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থের তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে প্ত রাখা জায্য।

## গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক।
- ২। ভি-পিও পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদ নিম্নলিখিত হারে মাসিকভাবে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যিক।

## চাঁদার হার

	কলিকাতা	বক্সবল
বাৎসরিক	টাকা ২৫.০০ টাকা ৩০.০০	
সাপ্তাহিক	টাকা ১২.৫০ টাকা ১৫.৫০	
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫ টাকা ৮.০০	

বিঃ প্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার  
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)  
বাৎসরিক টাকা ১.০২  
সাপ্তাহিক টাকা ০.৫২  
ত্রৈমাসিক টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ গ্যাটার লেন,  
কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ  
৩য় বর্ষ

অমৃত

৩৫ সংখ্যা  
মূল্য—৫০ পয়সা  
শিল্প—২ পয়সা  
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 5th January, 1973 শক্রবার, ২১ শৌব, ১৩৭১ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৭০৮	এক নজরে	—শ্রীপ্রতাপকদম্পী
৭০৯	সম্পাদকীয়	
৭১০	দেশেবিশেষে	—শ্রীপঙ্কজরীক
৭১০	চলো বিধাননগর	—শ্রীদিলীপ দালাকার
৭১৬	পুনশ্চ	—শ্রীকপণক
৭১৭	আজকের মুখ (গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
৭২১	কুলের উৎসবে উৎসবের ফল	—শ্রীমোহন ভৌমিক
৭২৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅশ্বকর
৭৩১	বাংলাদেশের প্রশ্নমেলায়	—শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য
৭৩৩	বাড়ি (উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মী
৭৩৭	অর্থনৈতিক সমীক্ষা : টাকার দায়	—শ্রীশান্তিলাল মল্লোপাধ্যায়
৭৪০	পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ	—শ্রীমুনোজ
৭৫১	ফুল ফোটার আগে (উপন্যাস)	—শ্রীশৈলেন রায়
৭৫১	চিঠিপত্র	
৭৫৫	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীঅরুণাকান্ত
৭৫৯	সম্মোহন বৈচিত্র্য	—শ্রীনন্দলাল পাল
৭৬০	দুর্ভিত পরিবেশ	—শ্রীঅলোক সেন
৭৬২	প্রতিশ্রুতী নিজের পোশাক (কবিতা)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৭৬২	চোখ (কবিতা)	—সামসুদ হক
৭৬২	বিকোভ (কবিতা)	—শ্রীআইভি রাহা
৭৬৩	গম্ভা (গল্প)	—শ্রীবেবী আনওয়ার
৭৬৬	অপনা	—শ্রীপ্রমীলা
৭৬৮	রমা গৃহঠাকুরতা : সংলাপ মর্মেতে	—শ্রীসম্মা সেন
৭৭৫	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনাঙ্গীকর
৭৮০	খেলাধুলা	—শ্রীদশক

## রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

স্বাক্ষরকারী ঠাকুরের জীবনী ৫.৫০ শ্রীমদ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীস্বাক্ষর আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা ৩.৭৫ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব ৮.০০ ভারত-মত রবীন্দ্রনাথ ৪.৭৫ শ্রীমদ্রনাথ ঠাকুর। ছোটগল্প অঙ্ক পুস্তিকা ১০.০০ আশুতোষ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র নথ্য ও গল্প ১০.০০ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬.৫০ শ্রীশশীকর ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা ৩.০০ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পদ্যাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ ৫.০০ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র স্মৃতি ১২.০০ রবীন্দ্র রচনার উপস্থাপন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ৬.০০ শ্রীশৈলেন দেবনাথ। ইন্ডিয়ান কালিকাল ডায়েস ২৫.০০ বালকৃষ্ণ মেনন। সংগীত রসায়ন ১৮.০০ শ্রীশৈলেন দেবনাথ। বঙ্গদেশের বঙ্গদেশ—অনুদিত। শিল্পতত্ত্ব ১৫.০০ বেনিডেট ব্রোডে (স্বাক্ষরকারী ভট্টাচার্য অনুদিত)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬।৭ স্বাক্ষরকারী ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭  
পরিবেশক : জিআস, ১এ কলেজ রো ও ১০৩এ রাসবিহারী এডিনউ কলিকাতা

# এক নজর

**অমূল্য মাদিরা :** লন্ডন শহরে গত নভেম্বর মাসের একশ তারিখে ৪,৬৬১ পাউন্ড মূল্যে এক বোতল পুরনো মদ বিক্রী হল, ভারতীয় মাদার হিসাবে যার দাম হবে ৮৮ হাজার টাকার কিছু বেশী। ইতিপূর্বে এত দামে এক বোতল মদ কখনও লন্ডন, প্যারিস বা লস এঞ্জেলসের নীলামে বিক্রী হয় নি। ১৮৭০ সালে রথস-চাইল্ডসের তৈরী এই মদ ও মদের বোতল দুই নাকি হাতে তৈরী করা। এই ধরনের মদের বোতল আর একটিই আছে পৃথিবীতে। প্রায় ৬০০ কেতল বিভিন্ন সময়ের ও ভিন্নতর মানের মদ এই দিন লন্ডনের বন্ড স্ট্রীটস্থ সোথবির বিখ্যাত নীলাম কেন্দ্র থেকে বিক্রী হয়। কিন্তু নীলামে ডাক চলে একসঙ্গে লন্ডন, প্যারিস ও লস এঞ্জেলস শহরে। ত্রেভাদের মধ্যে টেলিফোনের সাহায্য সংযোগ রক্ষা করা হয় এবং তিন কেন্দ্রে যিনি সর্বোচ্চ ডাক দেন তিনি তার ইম্পট বস্তুটি লাভ করেন। উল্লেখিত নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী দামট দেন মারিও রুসপোলি নামে এক মাদিরা রসিক। এই দিন নীলামে মোট ৩৮,০৭১ পাউন্ড মূল্যের পুরনো মদ বিক্রয় হয়।

**ওরা চলে গেল :** গ্রীক, পারশিক, শক-হুন-পাঠান-মোগলের মতো ওরাও একদিন অনাহৃত হয়েই এদেশে এসেছিল এবং এদেশের মাটিতে আশ্রয় পেতে তাদেরও কোন অসুবিধা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্মসভায় ভারতের শাস্বত আতিথেয়তা ও ওদারের কথা বলতে গিয়ে ওদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে ইহুদিরা যখন স্বদেশেই নিরাশ্রয় হয়, রোমানদের পীড়নে নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর চারিদিকে তখন ভাবতই ওদের আশ্রয় দিয়েছিল অস্কাচে, সাগ্রহে। সে আতিথ্য তারা গ্রহণ করেছিল সন্তোষচিত্তে। ভাবতব দক্ষিণ-পাশ্চিম উপকূলে ওদের বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শক-হুন-পাঠান-মোগলদের ভারত আগমনের সঙ্গে ওদের ভারত আগমনের ব্যাপারে একটা পার্থক্য বরাবরই ছিল, এবং সে পার্থক্য সম্বন্ধে ওরাই ছিল সবচেয়ে বেশি সচেতন। এই ভারতের মহামানবের সাগরে একদেহে লীন হতে ওরা আসেনি। উনিশ শ বছর ধরে ওরা একথা কখনও ভোলেনি যে, ওরা এদেশের অতিথি, এটা ওদের স্থায়ী বাসভূমি নয়। ওদের প্রতিশ্রুত ভূমি ইজরেইল ওরা আবার একদিন ফিরে পাবেই এবং সেদিন একবারের জন্যও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ওরা স্বগৃহে ফিরে যাবে। তারপর বিগত দুই সহস্রাব্দে কত ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছে ওদের জীবনে, দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ইহুদির প্রাণবলি হয়েছে, কিন্তু ওরা ওদের বিশ্বাস থেকে এতটুকুও টলেনি, একবারের জন্যও ভাবেনি যে ওদের দেশ ওরা আর ফিরে পাবে না। আর শেষ পর্যন্ত যখন ওদের বিশ্বাসেরই জয় হল, প্রতিষ্ঠিত হল ইহুদি রাষ্ট্র ইজরেইল তখনই শীতের পার্থিদের মতো ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে ফেরা শুরু হল।

কোচিন থেকে কদিন আগে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ,

৭০ খ্রিস্টাব্দে কেসব ইহুদি কোচিনে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তিন দশক আগে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ পেরিয়ে গিয়েছিল। কিছু এখন সেখানে মাত্র পনেরটি ইহুদি পরিবার পড়ে আছে

এবং তাদের মোট সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হবে না। এই সম্প্রদায়ের নেতা শ্রী এস এস কোডার বলেছেন, ইজরেইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ওদের দলে দলে দেশত্যাগ শুরু হয়। ছেলেরাই প্রথমে যায়, তারপর মেয়েদেরও না গিয়ে উপায় থাকে না। আজ যারা পড়ে আছে তাদেরও না চলে গিয়ে উপায় নেই, কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হওয়াই এখন সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত মালা গ্রামে আজ একজন ইহুদিও বাস করে না তাই সেখানকার সিনাগগ, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতির দায়িত্ব স্থানীয় পণ্ডায়েকে নিতে হয়েছে। কোচিন ও তার নিকটবর্তী চেনামঙ্গলমের সিনাগগের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কাষণ উপাসনা ভবনগুলির দায়িত্ব নেওয়ার মত কোন রাজক আদ সেখানে নেই।

ইউরোপ আমেরিকাব ধনাঢ্য মহল আজ পাগল হয়ে উঠেছে এক চতুর্দশবর্ষীয় বালকগুরু—গুরু মহারাজজির ভক্তিতে। মেটামুর্ট হিসাবে গুরু মহারাজজির লন্ডনে ভক্তের সংখ্যা ৬০০০, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ৫০০০ আর আমেরিকায় ৩০,০০০। তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ঘরের ছেলে এবং সকলেই সম্মানজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত আর প্রায় সকলেই যুবক ও যুবতী। গুরু মহারাজজির জন্য তারা পাগল; এই মহাবিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু গুরুজির নিয়ন্ত্রণে—এ বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই; গুরুজির দর্শন ঝুলে বা তাঁর চরণারবিন্দ স্পর্শের সুযোগ পেলে তারা নবজীবন লাভের আনন্দ ও শিহরণ অনুভব করে। গুরুজি যে ভগবান কৃষ্ণ ও যীশুর বিভূতির উত্তরাধিকারী! ইউরোপ আমেরিকা থেকে যে অনন্য তিন হাজার শ্রেষ্ঠাঙ্গ শিষ্যশিষ্যা জাম্মো জেট বিমান ভাড়া করে আসছে ভারতে, তাদের একমাত্র আনন্দ যে একটানা তিনদিন তারা এই বালকগুরুর চরণতলে কসে তার দর্শনে নয়ন ও বাণীতে শ্রবণ সার্থক করতে পারছে।

ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত, গোলগাল ও মাথনের মত নরম, চতুর্দশবর্ষীয় বালক গুরু মহারাজজি আর এক গুরু সংগুরুদের শ্রীহংস মহারাজজির পুত্র এবং তাঁর কাছেই দীক্ষিত। মাত্র দু' বছর বয়সে এই বালকের বিভূতির প্রকাশ পায় এবং ছ' বছর বয়সে বালক গুরুর পরিচ্ছদ ইংরেজিতে এক তত্ত্ব-সমৃদ্ধ ভাষণ দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে। আজ চতুর্দশ বর্ষ বয়সে এই বালক শতসহস্র ভক্তকে একটানা কয়েকঘণ্টা ধরে ভাষণ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। বালক গুরুর প্রায় সবটুকু সমস্ত এখন বিশ্বব্যপ্ত ভক্তদের মাঝে ঘুরে ঘুরেই কেটে যায়। তার সংগঠনের নাম 'ডিভাইন লাইট মিশন', শিষ্যদের দেওয়া একটি রোলস রইস গাড়িতে চড়ে গবে, আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ান। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির দাস্তাভিক মূলপত্র 'দি ডিভাইন টাইমস' পত্রিকায় নিয়মিত গুরুজির বাণী ও ঐশ্বরিক লীলার কথা প্রচারিত হয়। বালক গুরু এখন বিশ্বগুরুর মর্যাদার উন্নীত।

# সম্পাদকীয়

## নববর্ষের শুভ সূচনা

একটি বৎসর অতিক্রান্ত। আমরা প্রতিশ্রুতিময় সত্তরের দশকের আরেকটি বৎসরে পদার্পণ করলাম। বাহ্যিকের সালে দেশের রাজনৈতিক অবস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বিগত কংগ্রেস বৎসরের শ্রদ্ধা সংশয় এবং অস্থিরতা কাটিয়ে ভারতবর্ষ তার পাল্লারমুখের গণতন্ত্রের বিন্যাসকে আরও মজবুত করেছে। পশ্চিম বাংলায় দুঃখনিশার অবসান ঘটিয়ে এ রাজ্যে স্থায়ী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে বৃহৎ ভারতবর্ষের সাথে সমান ডালে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য। প্রতিবেশী বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার প্রথম দাবিকী উদযাপন করেছে ডিসেম্বরে। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর উজ্জ্বল ও অক্ষয় ভিত্তি আজ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত।

বৎসরের শেষ সপ্তাহে আমাদের বাংলায়, কলকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের ৭৪তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বাংলার গত কবছন যে বাস্তবিক অস্থিরতা ছিল এবং কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তাতে কেউ আশা করতে পারে নি এত অল্প সময়ের মধ্যে এই রাজ্য কংগ্রেস আশ্রয় তার হৃদযাত্রা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী এই গোবর্ধন অধিকারী কংগ্রেসের বাংলাদেশ যুবসমাজকে এবং বাংলার সাধারণ মানুষের সুস্থ রাজনৈতিক বুদ্ধিকে। তাদের জন্যই বাংলায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদের কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে গোটা জাতি হয়েছে ঐক্যবদ্ধ। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভাষণও বিশেষ তাৎপর্যময়। কংগ্রেসের মধ্যে যে সংকল্প ও প্রত্যয় ফিরে এসেছে নতুন উদ্দীপনায় সভাপতির ভাষণে তা সম্পূর্ণ। একথা ঠিক যে, পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বৃহৎ জনসমাজের অনেক সমস্যা এখনো সমাধান করা যায় নি। কিন্তু ধাপে ধাপে এবং প্রগতিশীল কর্মসূচী অনুযায়ী সেই সমস্যার মোকাবিলা করার যে চেষ্টা হচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পুন্নিবাসী চিন্তাধারার জট থেকে মুক্ত করে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে একটি গতিশীল এবং সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠনে পরিণত করা হয়েছে। বৃহৎ দল বলই তার মধ্যে নানা ধরনের লোক সহজে অনুপ্রবেশ করার সুযোগও পায়। গতিশীল কর্মসূচির গ্রহণ ও ব্যাপায়ণে পথে তারা সাধামত বাধা সৃষ্টি করে। কংগ্রেস সভাপতি এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জোরালো ভাষণ হুঁসিয়ারী দিয়েছেন এবং তাদের প্রতিকূলতা ঘোষণা জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসকর্মীদের।

অন্যত্র যেহেতু বৃহৎ জনসমষ্টির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার ও শিল্পসমৃদ্ধির অর্ধপূর্ণ কার্যসূচী রূপায়ণ সম্ভবিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। অনেক পুন্নিবাসী দেশেও পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা কার্যে রূপায়ণের মনোভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের মধ্যে দরিদ্র দেশে সামাজিক অসংগতি দূর করার জন্য ন্যায়নীতি ও সামোর ভিত্তিতে কার্যসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেদিকেই আজ কংগ্রেসের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সামাজিক কুসংস্কার এবং অশিক্ষা দূর করতে না পারলে এই বৃহৎ ও পবিত্র কর্মক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্রভাবে শক্তি, কায়মী উপস্বলভোগী শ্রেণী এবং পুন্নিবাসী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন আমলাতন্ত্রের দ্বারা দেশে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়ণ যে কত কঠিন তা নেতারা এখন ভালভাবেই উপলব্ধি করছেন। সে কারণেই কংগ্রেস সভাপতি তার সংগঠনকর্মীদের এবং সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনগণকে এই দুমুহ কার্যসূচী রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অংশীদার হবার আহ্বান জানিয়েছেন। যত দিন যাচ্ছে জনগণের সংকল্পও হচ্ছে ততই দৃঢ়। কিন্তু সরকারী শৈথিল্য এবং নানা স্তরের কর্তব্য অপরোক্ষ ও অনাচারের দ্বারা জনসাধারণের প্রাণ বন্ধু নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। পুন্নিবাসী, মুনামফোরদের চক্রান্ত এখনও ভাঙা সম্ভব হয় নি। তাই দ্বিমূল্য বেড়েই চলেছে। এর জন্য সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও দুর্দশার অন্ত নেই। বস্তুত, এটাই হল সর্বমস্ত হতাশার মূল।

সত্তরের দশকে আমরা পুরোপুরি খাদ্য স্বচ্ছন্দ হব এবং সকল মানুষকে মোটা ভাত-কাপড় দিতে পারব এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে পঞ্চম সোজনার কাজ শুরু হবে। নতুন বৎসরে সেই প্রত্যাপাই আমরা নতুন করে তুলে ধরতে চাই জনসাধারণের কাছে গরিবী হুঁটোও ধরান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গরিবীই হল সবচেয়ে বড় পাপ। এই পাপ দূর করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের বিধাননগর অধিবেশন নতুন করে যে সংকল্প ঘোষণা করেছেন তা সার্থক হোক। নববর্ষের এই শুভেচ্ছাই জানাই। আরও নিষ্ঠা, আরও শ্রম এবং আরও সততার ঘোষিত কার্যসূচী রূপায়িত হোক এবং দেশের বড়ো-বড়ো কোটি কোটি মানুষের জীবনে তা নিয়ে আসবো প্রসন্নতার সঞ্চার।

# ডল বিডল

১৯৭২ সাল শেষ হয়ে যখন ১৯৭৩ সাল শুরুর হতে চলল ঠিক সেই সংক্রান্ত বর্ষেই ইন্দোচীনে শান্তির আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এই একটি মাত্র ঘটনার স্বাক্ষর বিদ্যায় বহুটি 'হত্যার বৎসর' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সম্ভবত এই শতাব্দীতে মানুষের শেষ চম্পাগাতা স্মৃতির সঞ্চার সমাপ্ত করে যেদিন আমেরিকান নভেম্বররা পৃথিবীর বৃক ফিরে এলেন ঠিক সেদিনই মার্কিন বোমারু বিমানগুলি প্রচণ্ড পরাক্রমে ইতিহাসের ভীষণতম বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল ক্রম উত্তর ভিয়েতনামের উপর, এই একটি তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগের মধ্যে ১৯৭২ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে একই সংশ্লিষ্ট মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার রংসর হিসাবে।

অথচ বিদ্যায় এই বৎসরের সূচনা হয়েছিল গভীর আশা নিয়ে। ঘটনার স্রোত এই বছর এমনভাবে বয়েছে যাতে মন হাল্কা, দীর্ঘকাল যাদে মানুষ বন্ধি পরান বিরোধ ও বিবাদ ভুলে বিশ্বশান্তির একটি নিরুপযোগ্য ভিত্তি খুঁজে পেতে চলেছে। ১৯৭২ সালে বিশ্বশান্তির এই আশার বহুতম

প্রতীক হয়ে উঠেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের চীন সফর। এই সফরের ফলে আর কিছু না হোক, অন্তত এটুকু আশা করা গিয়েছিল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে গনবহুল আর সবচেয়ে জনবহুল নিজেদের ভিতরকার চিরচিরিত বৈরিতার পথ পরিহার করে সহজতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পাবে। চীন সফরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন রাশিয়া সফরে গেলেন তখন বিশ্বশান্তির আশা উজ্জ্বলতর হল। এই সফরের পর দুই দেশের মধ্যে যেসব চুক্তির কথা ঘোষণা করা হল সেগুলির ভিতর দিয়ে এটা প্রমাণিত হল যে, রাজনীতি ও মতাদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও পৃথিবীর এই দুই শক্তিশালী দেশ কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী ইন্তেকনা হ্রাসের এই প্রবণতা ১৯৭২ সালে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। চীন ও জাপান তাদের দীর্ঘকালের শত্রুতার স্মৃতি মুছে একে অন্যের দিকে হাত বাড়াল। জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী তানাকা চীন ঘুরে আসার চীন-জাপান সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। ১৯৭১ সালের শেষে রাষ্ট্রসংঘে জাল-চীনের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে যে শত্রু প্রবণতার সূচনা হয়েছিল সেটা এইভাবে ১৯৭২ সালে সার্থক পরিণতির দিকে যাচ্ছিল।

এই ১৯৭২ সালেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত দেশগুলিতে দেশ-বিভাগের বন্দনাময় স্মৃতি মুছে দেওয়ার জন্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করতে আরম্ভ করা হয়েছে। পাকিস্থানের খাইরে বোরের গিরে বাংলাদেশ এই বছর তার মক্তির প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। বাংলাদেশের মক্তি অনেক সশস্ত্র সংস্কারের মূলে আঘাত করে ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছে। ১৯৭২ সালে সম্পাদিত সমালোচনামূলক চুক্তি ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের এই পথটিকে আলোকিত করেছে। যদিও এই চুক্তির রূপাংশ খুব সহজসাধ্য হচ্ছে না, তাহলেও বছরের শেষে অন্তত এই চুক্তির প্রথম খাপটি পার হওয়া গেছে যার ফলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে দুই দেশের অধিকৃত এলাকাগুলি ভারত ও পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে চলে এসেছে। ওদিকে আর একটি বিভক্ত দেশ জার্মানিও

দেশ-বিভাগের কতটুকু মুছে দেওয়ার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৭২ সাল বিদ্যায় নেওয়ার আগে পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিভক্ত কোরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অংশও এই বছর নিজেদের মধ্যে পুনর্মিলন সংক্রান্ত আলোচনা আরম্ভ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিচার্ড নিকসন, পশ্চিম জার্মানিতে ভিলি ব্রান্ট ও জাপানে কাফুই তামাকার পুনর্মিলনীচন ১৯৭২ সালেই এই তিনজনের শান্তিনীতির প্রতি দেশের মানুষের সমর্থন সূচিত করেছে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিশেষ পরামর্শদাতা ডঃ হেনরি কিসিজার ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লেঃ ডুক থোর মধ্যে দীর্ঘ ও গোপন আলোচনার মধ্যে এক সময়ে এই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ করার একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। ডঃ কিসিজার নিজে ঘোষণা করেন 'শান্তি এখন করারত'। বর্ডারদের 'আগেই ইন্দোচীনে যুদ্ধবিবর্তের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলেও আশা করা হয়েছিল। এই আশা যদি সার্থক হত তাহলে, ১৯৭২ সাংসদ পথ-পরিবর্তনের বৎসর হিসাবে চিহ্নিত করে রাখতে কোন অসম্ভাব্য ছিল না। কিন্তু প্রধানত সারগণের বশব্দ সনাক্তের প্রধান থিউ বাগড়া দেওয়ার ফলেই এই আশা বাস্তবে পরিণত হল। বছরের শেষে এই ব্যর্থতা ১৯৭২ সালে ভিলে ভিলে গড়ে তোলা আশা ও বিশ্বাসের প্রাতিমাখানকে নাটকীয়ভাবে ভেঙে চুরমার করে দিল। ১৯৭২ সালে আশা করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিকসন। হমনয়, হৃদয় ও উত্তর ভিয়েতনামের অন্যান্য অঞ্চলে অসাম্প্রদায়িক জনসাধারণ, সিনেমা হাউস, বিদেশী দূতাবাস, হাসপাতাল, এমনকি বন্দীশালারও উপর নির্বচনে বোমাবর্ষণ করার জন্য ঝাঁক ঝাঁকে বি-৫২ বিমান পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন সমস্ত ঘোষণা করলেন, উত্তর ভিয়েতনাম (আমেরিকার নিজের শত্রু) চুক্তি করতে যতক্ষণ সম্মত না হচ্ছে ততক্ষণ আমেরিকা বোমা ফেলতেই থাকবে। খাস আমেরিকার মানুষ যখন বর্ডারদের উৎসব নিয়ে ও নতুন বছরকে আরাধন করতে বাস্তব তখন উত্তর ভিয়েতনামের বালিশালান আমেরিকান বৃদ্ধবন্দীর নিজেদের দেশের বিমানের হানাদারি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিবর খনন করতে লেগেছিলেন—বিদ্যায় ১৯৭২ সালের ঘটনাপ্রবাহের বিচিত্র পরিহাসের প্রতীক হয়ে থাকবে এই ঘটনা।

দেশের দিকে তাকালেও আমরা সম্ভবত ১৯৭২ সালটিকে আশাভঙ্গের বৎসরকেই চিহ্নিত করব। ১৯৭১ সাল ভারতবর্ষে শেষ হয়েছিল একটা গভীর আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। পাল্লারমেন্টের মধ্যবর্তী নিষ্পত্তি

**বেনাবসী**  
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের  
শ্রেণি  
**ব্যানার্জি ব্যানার্স**  
বড়বাজার • কলিকাতা-৭  
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

• স্ট্রিট •  
**জাহাঙ্গীর হোসেন**  
গ্যারান্টিং প্রাইমেরাড  
**রায় কাজিন কোং**  
৪ জাহাঙ্গীর মেমোরিয়াল ইন্ড  
কলিকাতা-১

অন্যান্য গ্রন্থ—(ক) অব্যর্থ ঐষ ০.০০ (খ) হুসল জর্জার গ্রাম ১.৫০ (গ) দক্ষকরোগ চিকিৎসা ১.৫০ (ঘ) বোল রায়, পুঁজাবোর চিকিৎসা ১.৫০  
প্রতিষ্ঠান—এম জি রায় গ্রন্থ কোষ, ১৫ নং নিজামী সড়ক, মেডে, কলিকাতা-১।  
কোংক্রল্ড কোং-১০/৬। ১১ ব্রহ্মাণী গাথী, রাও কলিকাতা। হ্যান্ডিয়ান পাবলিশিং  
কোং-১৬/৫ বৈ বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

হাজার যুদ্ধবন্দীর পুনর্বাসন কার্যে সাহায্য করেন।

১৯৫৭ খঃ তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক্য করেন। অতঃপর তিনি ওয়েলিংটনে ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজে কমান্ড্যান্টের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ খঃ তিনি লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত হন। চীনা আক্রমণের পরেই নেকার কোর কমান্ডার নিযুক্ত হন।

১৯৬০ খঃ তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয়

কমান্ডের জি ও সি-ইন-সি নিযুক্ত হন এবং পরে পূর্বে কমান্ডের প্রধানরূপে কলকাতায় বদলী হন। ১৯৬৮ খঃ তাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ খঃ ৮ জুন তিনি সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

প্রকাশ লেঃ জেনারেল বেডের ১৪ জানুয়ারী সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সাধারণত ১৫ জানুয়ারী তারিখ

সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যবাহিনীর অভিযান গ্রহণ করে থাকেন। জেনারেল বেডের বখাসময়ে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুসারে কোন বিশিষ্ট জেনারেলকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হলে সামরিক বাহিনীর তালিকায় তার নাম রাখা হয় এবং অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকার সেই নীতিই অনুসরণ করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

## জাতীয় সঞ্চয়ের সঙ্গে নববর্ষের শুভ কামনা

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা



ভারত সরকার

সাত বছরের জাতীয় সঞ্চয়  
সার্টিফিকেট—দ্বিতীয়, তৃতীয়  
ও চতুর্থ ইস্যু

ডাকঘর মেয়াদী জমা  
১, ৩ ও ৫ বছরের

7½%  
পর্যন্ত

7¼%  
পর্যন্ত

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইস্যুর  
ওপর রূর-এ রোয়াং। বাকীগুলিতে ৩,০০০টাকা  
পর্যন্ত হুল করমুক্ত।

পোস্ট বক্স ৭৬, নাগপুর





# চলো বিধাননগর

## দিলীপ মালাকার

চলো চলো দিল্লী চলো স্লোগান ছিল ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন চলছিল আই, এন, এ মুভমেন্ট। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্লোগান ছিল চলো নাকা চলো। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার স্লোগান চলো চলো বিধাননগর।

দিল্লী চলো, ঢাকা চলো, বিধান-নগর চলো তফাত নেই। কংগ্রেস অধিবেশনে কলকাতার কয়েক বাস, মিনিবাস চলছিল একটামাত্র লক্ষ্য—বিধাননগরে। বিধাননগরে গিয়ে দেখি গাড়ির গার গাড়ি। তার বৃকে সাঁটা 'অন এসেন-শিয়াল সাঁভিস', 'অন স্পেশাল ডিউটি' 'এ', 'বি' পার্ক, প্রেস: ইত্যাদির লেবেল মাঁটা। বিশেষ ট্রেন এসে থেমেছে উল্টাডাঙা স্টেশনে। যদি ট্রাম লাইনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকত তাহলে বোধহয় ট্রামও থামত বিধাননগরে।

লবণ হ্রদ নামে যে জলাভূমি পড়েছিল গুরুত্বপূর্ণ তাকে উদ্ধার করে বালি দিয়ে তৈরি করে নগর বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর উদ্যমে লবণ হ্রদের কাজ শুরু হয় দশ বছর আগে। সে কাজ এখনও চলছে। বাড়ি ঘর হয়েছে প্রচুর। কিন্তু মনে হবে যেন রাজস্থান বা নয়াদিল্লীর কোনো উপনগরী। সবজির চিহ্ন নেই। ধূসর করছে বালি। অনেকে তাঁটা করে খেলেছিলেন, যদি বালি খেতে চাও তো বিধাননগরে যাও।

ধূলোয় ঢেকে শাস্ত্রাঙ্ক ছিল সন্ধ্যার পর মশার কাকড়ি। তারচেয়েও উল্লেখযোগ্য হল ডাকলাইটে-বিশালকার পোকা-মাকড়। স্বরং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত এইসব পোকা-মাকড়ের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এত বড় পোকা আমি জীবনে দেখিনি।

বিধাননগরে ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয় ২৬শে ডিসেম্বর। কিন্তু অগণিত দশকের ভাড়ি শুরু হয় ২৪শে ডিসেম্বর থেকে। তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল পাঁচমবঙ্গ সরকারের নবান্বিত অতিথিশালা। যেখানে প্রধানমন্ত্রী বাস করেছিলেন। বাড়িটা সম্পূর্ণ শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত। সদ্য



বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনের বিবরণ নির্বাচনী কমিটির বৈঠকের আগে রূপে মাত্রমুখ গানের সময় মণ্ডপে দেহবৃত্তপ পরিভ্রমণ করেন। ছবিতে কংগ্রেস সভাপতি ডঃ লক্ষ্মণদয়াল শর্মার ডানদিকে এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ খানস, বাঁদিকে মহামন্ত্রী শ্রীনিবাসদেবরায় ও সর্বদিক্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখা যায়।



প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত শ্রীতরুণকান্ত ঘোষ



বিধানসভায় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধান প্যাণ্ডেলের পিছনে উৎসব কংগ্রেস পতাকা।

বানান বাগানে বড় বড় খেজুর গাছ তুলে লাগান হয়েছিল। বানান হয়েছিল ফুল বাগান।

জনগণের ভীড় দেখা গেছে প্রদর্শনী মণ্ডপে। সেখানে লাখ লাখ লোকের ভীড়।

কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে লক্ষ লোকের লাইন। অধিবেশন শুরুর হওয়ার পর জনতার ভীড় রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল সময় সময়। প্রথম দিন দেখলাম জনতা একবার এ, আই, সি, সি. সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত আসন ও সাংবাদিকদের জন্যে সংরক্ষিত জায়গায় ঢুকে বসে পড়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন কয়েকজন মন্ত্রী।

প্রথম যুগে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলেই তার সঙ্গে কলকাতা স্বদেশী মেলা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী মেলার চলন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার। সেই থেকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে মেলার চলন চলে আসছে। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনেও তাই হয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশনকে বাৎসরিক মেলা বলে কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংবাদপত্রে। তাই নিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস অধিবেশন মেলা নয়। একে অত খেলা মনে করার কারণ নেই। কংগ্রেস অধিবেশনের শেষের দিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও সেই এককথা বলেছেন, যেসব দু'টি লোক কংগ্রেস অধিবেশনকে মেলা বলে প্রচয় করছে তারা জেনে রাখুন এটি জনগণের মেলা।

কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাগতদান করতে এসে বিহার-উত্তরপ্রদেশের লিঙ্গ লোক 'রথ দেখা ও কল্যাণ বেতা' দুই কাজই

করেছেন। কয়েকজনকে দেখলাম কংগ্রেসের প্যাডেলের সামনে চাদর বিকি করছে।

একদিন দেখলাম প্যাডেলের কাছে সাপ ও বেজার খেলা দেখান হচ্ছে। বেশ ভীড় জমে গেছে। একজন কংগ্রেস সদস্য বললেন—উত্তরে লাগ-নেউলের খেলা হয়নি তাই বাইরে হচ্ছে। আমাদের অধিবেশন শান্তভাবেই হয়েছে।

এ বিষয়ে সবাই একমত। এবারকার বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। এখানে বেশকিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তার হুকুটেরী করা হয়েছিল দিল্লীতে। বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনে ঈশ্বরী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসেন নি ততক্ষণ উত্তরনা ও দক্ষিণের কৌতুহল অত বেশী ছিল না। যখনই শ্রীমতী গান্ধী প্যাডেলে আসতেন তখনই দেখতাম গুজুন ও জনতার কৌতুহলী দৃষ্টি। কংগ্রেস বলতে যেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী বলতেই যেন কংগ্রেস।

হিন্দুওয়ালারা একটু বেশী মতায় হিন্দুপ্রমিক বলে মনে হল। অধিবেশন শুরুর হওয়ার আগের দিন প্রদেশ কংগ্রেসের ক্যাম্পের সামনে এক হিন্দুওয়ালার বক্তৃতা শুরুর করে দেয়, ইংরেজীতে কেন পথ-নির্দেশিকা ও প্রচারপত্র ছাপা হয়েছে। ইংরেজ ভাষা বিদায় নিয়েছে। আর ইংরেজী কেন।

অধিবেশনের প্রথম দিন কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা ভাষণ দিচ্ছিলেন ইংরেজীতে। অমনি প্রতিবাদ উঠল, হিন্দীতে বলুন, ইংরেজীতে নয়। পরে অবশ্য সভাপতি হিন্দীতে বলেছিলেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে ডায়ালসের সামনে এসে উপস্থিত এক নাগা সম্মানী। তার পরনে কোপান। খালি গা। হাতে একটি ছোট কাঠের বাজ। স্বেচ্ছাসেবকরা যখন তাকে নিয়ে এলো বাইরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথেকে এসেছেন। নাগা সম্মানী জানালেন যে তিনি হিরস্বার থেকে এসেছেন। দেখানাই কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেখানেই তিনি গিয়ে হাজির হন। টেনে চাপলেই হল। কোনো ঝামেলা নেই। দেশে এত পাগ বাড়ছে তাই তিনি ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন।

ব্যাখ্যারীদের সংখ্যা কম ছিল না। কেউ কেউ নিজেই হাতে ব্যাজ তৈরী করেও এসেছিলেন। কিন্তু যারা কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের কারুর কারুর ব্যাজও ছিল না, ছিল না তাদের গাড়িতে বিশেষ কাগজ সঁটা। তাই নিয়ে বেশ রসিকতা চল প্যাডেলে। উপমন্ত্রী শ্রীসুভ্রত মখার্জীর জামায় ব্যাজ নেই। তাকে চুকতে দিতে চাইছিল না পুলিশের লোক যদিও তিনি পুলিশ মন্ত্রী। শেষে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ রিজিত গুপ্ত এসে উদ্ধার করে নিয়ে যান মণ্ডপে।

এমনি আরেক অঘটন ঘটে কেন্দ্রীয়

কোনো ছাড়পত্রের কাগজ ছিল না। তাই শুরুরে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন মন্ত্রী জ্ঞান সিং সোহনপাল মাঝার হাত দিয়ে বসে-ছিলেন। কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিল গাড়ির ব্যবস্থা করা।

এ তো কিছুই নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি চীফ শ্রীহাডাকে নিয়ে টানা-টানি কয়েক স্বেচ্ছাসেবকরা। তার বুকে কোনো ব্যাজ ছিল না। পুলিশের লোক এসেও সেই এক কথা বলে। শ্রীহাডাকে কেউ চেনে না। তাই এত গণ্ডগোল।

দক্ষিণের কৌতুহলের শেষ ছিল না। রামাধর দেখার। কারণ চম্পা হাজার লোকের আছাড়ের ব্যবস্থা চাটখানি কথা নয়। চম্পা হাজার লোকের দুবেলা খাবার অর্থাৎ আশী হাজার পাতের রান্না করেছে কয়েক হাজার পাচক। সেকালে রাজ-রাজড়াদের আমলে রাজস্বের মজ্ব হত বলে শুনছি। সেখানে নাকি বহু লোক খেত। কিন্তু চম্পা হাজার লোকের রান্নার ব্যবস্থা ছিল বলে আমরা জানি না।

চা-জলখাবারের সমস্যাও সমস্যা বড় কম ছিল না। কেউ চা খান কেউ কফি। মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীকে কফি দিতে তিনি চাইলেন চা। চা আনতে ছুটলেন এক কর্মকর্তা। চা যখন এলো তখন প্রধানমন্ত্রী উধাও।

একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো বস্তা একবার মাইক হাতে পেলে সহজে ছাড়তে চাইতেন না। তাই নিজে বেশ রসিকতা চলে ভি, আই, পি লাউজে।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন বিধাননগরের নবনির্মিত বাড়িগুলোতে। বাড়তি সদস্যরা ছিলেন টিনের চালের ক্যাম্পে। সবচেয়ে বেশী সদস্য আসে উড়িষ্যা থেকে—প্রায় সাড়ে তিন হাজার। তারপর হল উত্তরপ্রদেশের। সবচেয়ে কম আসে মিজোরাম থেকে। মাত্র তিনজন।

বিধাননগরে অধিবেশনও ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এক এক প্রদেশের প্রতিনিধি এক এক রকমের মতব্য করেছে। কংগ্রেস অধিবেশনের এলাহি কাউন্সিলরানা দেখে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন প্রতিনিধি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস অফিসের সেক্রেটারী শ্রীসুন্দর রাজন, সালেম জেলার প্রদেশ কংগ্রেস কর্মিতির সদস্য শ্রীমতী ময়রাগাথাম ত্যাগরাজন ও মান্নাজ নগর কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীএল মাথাই বলেছেন—১৯৫৫ সালের আবাদী কংগ্রেসের পর বিধাননগরের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের বসে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের তুলনায় বিধাননগর প্রকাশ্য অধিবেশন বিরাট ও এলাহি ব্যাপার। থাকা-খওয়ার ব্যবস্থার তর্য সমস্যা। প্রদর্শনীও আকর্ষণীয়। জায়া সমস্যার তাঁরা খানিক কিস্তি বোধ করছেন। এই ধরনের ব্যবস্থার সামান্য চুটি ছিল।

অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের

শ্রীরাজন মতি বললেন—বসে অধিবেশনে যে আয়োজন ছিল তার তুলনায় বিধাননগরের আয়োজন অনেকদূর বড়। প্রদর্শনীও বিরাট। সন্ধ্যা ব্যক্সা থাকলে আরও ভাল হত। যাবার আগে কলকাতা শহর দেখতে বেরুবেন।

মাণপুরের এক প্রতিনিধি শ্রীইবেতোম্ব সিং এর কাছে বিধাননগরীর সব ব্যবস্থাই ভাল লেগেছে। তাঁর দলের কোনো অসুবিধে হয়নি।

হিমাচল প্রদেশের শ্রীভার্গব, এম, পি, এবং শ্রীরমেশ বর্মী, এম, এল, এ বললেন—বিধাননগরে সবই ভাল কিন্তু তথা ও জনসংখ্যার বড়ই অভাব। নইলে সব সন্তোষ হত।

বিহারের কৃষিমন্ত্রী শ্রী পি, সি, কিস্কু ও শ্রীমতী কিশোরী দেবী, এম, এল, সি বললেন—আমাদের কাছে বসে অধিবেশনের ব্যবস্থা ভাল লেগেছিল। বিধাননগরে বাস-স্থানের ব্যবস্থা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। তাছাড়া রংগে যানবাহনের সমস্যা।

পাঞ্জাব প্রতিনিধি দলের শ্রী ও, পি, গুপ্ত (লুধিয়ানা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি) ও শ্রী এ, সি, মোহেতা জানালেন—তাঁদের খাওয়া থাকার কোনো অসুবিধে হয়নি। তবে তথা ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ভাল নয়। সমস্যা মতন অনেক খবরও পান না। অধিবেশনের পরে কলকাতায় শিফাপল দেখা তাঁদের একমাত্র মনের সাধ।

সংবাদিকদের জন্যে ব্যবস্থা ছিল অনেক। এক সার বাড়ি তাঁদের জন্যে। মণ্ডপের কাইরে ডাক-তার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল বিরাট প্রেস লাউজ। সেখানে টেলিপ্রিন্টার ও টাইপরাইটার মেশিনের ছড়ছড়। অধিকাংশ সংবাদপত্রের অফিসে ছিল টেলিপ্রিন্টার ও সরাসরি টেলিফোন লাইন। মণ্ডপেও ছিল মেশুর ধার বেঁধে প্রেস করণ। ভারতের প্রায় সবকটা বড় সংবাদপত্রই অফিস খোলা হয় বিধাননগরে। তাছাড়া ছিল চোদ্দজন বিদেশী সাংবাদিক।

কংগ্রেস অধিবেশনের জন্যে নাকী চম্পা লাখ টাকা তোলা হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থ ঢেলেছে প্রচুর বিধাননগরে। জেনো। তার সঠিক অংক জানা জায়নি। তবে একটি রাজনৈতিক দলের অধিবেশনের জন্যে সরকার এতখানি আগ্রহ দেখাচ্ছে সেটা অনেকে ভাবতে পারেননি। অনেক বলেছেন যে, ইংল্যান্ড যখন লেবার পার্টি বা কমজারভেটিভ পার্টির বাৎসরিক অধিবেশন বসে বসেই না ব্রাকপুলে তখন কি সরকার এগিয়ে বাহ? তা কখনই নয়। কারণ রাজনৈতিক দল যা করে তা তাঁরা নিজের টাকার জোয়েই করে। সরকার এগিয়ে গেলে দেশের মতাই হেঁচকি বেধে যায়। এই নিয়ে অনেকে তানক রকমের সমালোচনা করছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এটা সমস্যাও নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এটা সমস্যাও নেই। উপরন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এটা সমস্যাও নেই।

ঋতু হিসাবে পৌষ-মাঘ শীতকাল  
 হলেও, অনেক বছর কার্তিকের শেষ বা  
 অগ্রহায়ণের সোড়ায় থেকেই শীতের জোরাল  
 আমেজ দেখা দেয়, গরমের আনা-কানপড় বার  
 করে ফেলতে হয়, কাঁথা-কম্বল-মোগল গায়ে  
 দিতে হয়, তারপর পৌষ-মাঘ এঙ্গে ভেঁা  
 আয় কখাই থাকে না। এবার শীতের প্রকাশ  
 স্পষ্ট এখনও তেমন বাব্বীকরে দেখা দেয়নি।  
 শীতকে অনেক সময় ভয়ের চেয়ে দেখলেও,  
 শীত কিন্তু গ্রীষ্ম-বর্ষার মত বর্ণশাদ্যাক  
 নয় বলেই মনে হয়। গ্রীষ্ম-বর্ষার বা পেটে  
 সর না, হজম হয় না, শীতে তা অনারসে  
 হয়ে থাকে। শীতে কুখার উষ্মক যেমন  
 অন্যান্য ঋতুর চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশী  
 হয়, তেমনই হজমও হচ্ছে বাস্তবক্ষেত্রে।  
 প্রাকৃতিক দশাও মনোরম। এই সময় নম্বা  
 রকমের আনাছ-কেনাছ ও ফল-ফুলারি  
 যেমন গুঠি, তেমনই ফুলেরও সমারোহ দেখা  
 যায় চারদিকে। সেজন্যই বসন্তকে যেমন  
 ঋতুরাজ বলা হয়ে থাকে, তেমন শীতকেও  
 আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে 'সুন্দরী' 'স্নানী'  
 প্রভৃতি বলে।

### ਅੀਓ-ਜਾਨਕੀ

আমি, এই সহরে, মাস-দু-তিন শফর-  
প্রবাস করব। পোষ-মাঘ-ফাগুন। ঠৈয়

...আমি আমার সৌন্দর্যের কথা  
বোঝাবো না। সন্দেহী আপনি সৌন্দর্যে  
আপনি দেখান না; লুকিয়েও রাখেন না;  
লোক তাহা দেখে। আমি আমার  
লাগরণাশ তো আর লুকিয়ে রাখিনি;  
লোকের চক্ষু থাকে-তো দেখুক। আমার  
অশে অশে দেখুক, ওপাশে-ওপাশে-নয়নে-  
বদনে-নিতম্বে দেখুক, আমার নীবীবক্ষে  
দেখুক, আমার কপালে-কণ্ঠে-কুন্তলে  
দেখুক, আমার কঁকালে, আমার বাহুতে  
ও বকে দেখুক; আমার সম্মুখে ও  
পশ্চাতে দেখুক! আমার এই সহরের  
শিয়ার শিয়ার ডোরা আমার সৌন্দর্য-  
শোভা দেখুক! আমার হাট, আমার হোটেল,  
আমার গাট, আমার মাট, আমার পথ  
আমার পার্ক, আমার ঘান, আমার বাহন  
আমার অসংখ্য বর্গের আর অসংখ্য

(অতীতে সাধারণতঃ কংগ্রেসের অধি-  
বেশন শীতকালেই বড়দিনের সময় হিঙ্গ-  
মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত  
হতে দেখা যেত। সে কারণ জম্মুভূমির  
সম্পাদক শীত-সন্দরীর আয়োজনা  
প্রসঙ্গে কংগ্রেসের (কমলাস) কথা উল্লেখ  
করেছেন।)



এক মনোহর আমার মনে হল, আমার ভিতর থেকে কেউ বন্ধি আমার নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে উঠল। ডাকটা অনেক দূরের। কণ্ঠ নারীর না পুরুষের—এ বাবার চেষ্টা করিনি। আমার পোষাকী নাম সীতেশ্বরী অফিসে জানে 'পালিতবাবু' এরকম কান সঙ্গে আমার ডাকেনি। ডেকেছে বাবাই বলে—নিশ্চয়ই আমার বাড়ির দণ্ডা অতি অন্তরঙ্গ ডাকনামে—আমার বাবা-মা ছোটবেলা থেকে যে নামে ব্যবহার ডকে আসতেন—সেই নামে।

ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাঁপা

অনামনস্ক। তারপরেই। চাঁপার কোন কথা আমার কানে যায় নি। দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। কম পণ্ডারের আলোর ঘর থেকে বারান্দার এলাম। আমি, দোতলার সব ঘরের দরজা এখনো বন্ধ হয় নি। কোন কোন ঘরে মাঠের সঙ্গে গান-বাজনা চলেছে। আমি যেন মাঝার মধ্যে একটা ভারী কোথা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

সবটাই দ্রুততার ঘটছে। একতলার বাইরে যাবার প্যাসেজটার আলো-অঁধার। দৃশ্যে সারি সারি নানা বরসী মেয়ে সেজে-গজে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কারোর

পা দিলাম। শুনতে চাইনি, শোনার মত কান আমার এই মনোহর নেই। তবে 'চাঁপার' 'প্রথম' 'এত ভাড়াভাড়ি'—এই রকম ছোট ছোট শব্দের সঙ্গে অশ্লীল মন্তব্য, বিড়ির খোঁয়া বের করা ফ্যাকফ্যাক হাসির শব্দ আমাকে যেন অজস্র ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারল। ইঁটের থাকায় মুখ খুবড়ে পড়তে পড়তে রাস্তায় পড়িয়েছি যেন।

আমি ভিতরে বেশরোশা, ভয়ংকর জেনী পশুর মত। যেন কিছই শুনিনি, কিন্তু ভিতরে ভর, অসহায়তা, ওপরে ভাবিষ্ক নিয়ে প্রায় দৌড়ানোর মত হঠাতে লাগলাম।

নেই। শব্দ আমি বুঝতে পারছি, আমি ভীষণ ব্যর্থ, অফিসের জামা-কাপড় সারা-দিনের ধামের ওপরে এখনকার ভেজা অবস্থা বিস্তীর্ণ গন্ধ ছড়িয়েছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। যেন আমি বচিতে চাই, আমার ডুবে যাওয়ার মূহুর্তের সেই ভয়ঙ্কর শ্বাসকষ্ট থেকে একটু শান্তি চাই—এই ভেবে খানিকটা শ্বলভাগ পেরে তাকে একমাত্র নির্ভর কেনে পাগলের মত পালাচ্ছি।

এমন হাঁপাতে হাঁপাতে আমি এ কেলথার এলাম। থমকে দাঁড়ালাম, ভারগাটা ঠাণ্ডা করতে পারছি না। আলোর থেকে অন্ধকার এখানে বেশী। রাস্তা নির্জন। মনে পড়ছে, কিছু সময় আগে একটা ট্রাম রাস্তা পেরিয়েছিল, পেরিয়েই একটা গাড়ির তলার বেতে বেতে কোনরকমে বেঁচে গেছি। গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক করে দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে গলাগাল দিয়েছিল 'শাল কুস্তার বাচ্চা, রাস্তা চলতে জানে না! শালার মরার সাধ। আমি জ্বাকাই নি। মূহুর্তের মৃত্যুর মূখ থেকে ফিরে সেই যে হেঁটোছি, এখন এখানে। কিন্তু এ রাস্তাটা কোথায় গেছে, কেন এদিকে এসেছি?

থমকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট চোখে গলি বরাবর সোজা সামনে তাকালাম। আমি বোধহয় গলপার ধারে এসে গেছি। ঝির ঝির করে বাতাস গারে লাগল। আমি বুকের নিঃশ্বাস সামলাতে এগিয়ে গেলাম।

গলপার ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। এমন অসহ্য গরমের দিনে চারপাশে লোকজন গিজ-গিজ করছে। গলপার গা বেয়ে ঢালার ওপর, পাড়ের রেখার, রেলিং-এ বসে আছে ভিড় করে। আমি ঈষৎ ঠান্ডা বাতাস গারে মাথতে মাথতে দুই নিকর হারামির পাছের মীচে বসার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

এখানেটা অন্ধকার। অথচ সামনেই গংগা চমৎকার দৃশ্যময়। বসেই মনে হল, কটা বাক? হাতমড়ি দেখলাম, সাড়ে আটটা। আমি ধানের ওপর বসে একটা সিগারেট ধরলাম। আমার হাত কাঁপছে এখনো। টেঁটি থেকে দু'বার সিগারেটটা পড়ে গেল। তৃতীয়-বার শক্ত করে সিগারেটটা দু'টোটির মাঝখানে চেপে দেশলাই কাঠি জ্বলিয়ে ধরলাম।

এখন মনে হল আমি ভীষণ ক্লান্ত। আগ বোধ হয় কোনদিন এই মাটি ছেঁড়ে উঠতে পারব না। অথচ একটু আগে কি ভয়ঙ্কর শক্তি ছিল গায়ে। চাঁপার ঘর থেকে বেরিয়ে কি ভীষণ জোর, সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে এডটা হেঁটোছি। আর এখন।

আমি একভাবে সিগারেট টানতে লাগলাম। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সেই দগদগ শব্দ নেই। কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছি আমি। অথচ আধঘন্টা আগে আমি চাঁপা দাক্তীর ঘবে ছিলাম ওর নাম চাঁপা জানতাম না। রাস্তা থেকে ওদের একতলার ঢোকার মূখে হঠাৎ বন্ধক বন্দিরাই ভয়ঙ্কর ঘরে আমার সামনে

'আমি ওপরে বাব।' আমি বিড় বিড় করেছিলাম। কারোর দিকে, তারকের ছিলাম কিনা জানি না। কিন্তু সেই মূহুর্তে আমার মধ্যে ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টান্ত আপকু করছিল।

'এই ওপরের ঘরে বাবে।' কে একজন চাপা গলার বলছিল।

'অ চাঁপা, তোর তো এবার।'

যে মেরেট আমার সামনে আমার দিকে তারকের ছিল, সে বলল, 'আসুন।'

আমি ওর পিছন পিছন এগোচ্ছি, কানে এল—চাঁপার ভাগ্যটা ভালো রে। সহজেই পেরে গেল।

আমার তখন শব্দ শরীর। আমি একভাবে ফর্সা মেরেটের পিছন পিছন উঠে ওর ঘরে ঢুকছি।

বসুন।' চাঁপা আমাকে বসার জন্যে নীল চাদর পাতা ভরপাথের বিছানা দেখিয়ে দিল।

আমি অভ্যুতের মত বসেই বসেছিলাম। 'আপনার নাম কি?'

'চন্দ্রাবাণী দাসী। সকলে চাঁপা বলে ডাকে' চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মুখে পান ছিল। চিবোতে চিবোতে এক-সময় উঠে গিয়ে ফেলে দিয়ে মূখ ধরে এসে বসল। 'আপনি বুঝি নতুন? এত কাঁপছেন কেন?' চাঁপা বেশী হাসল।

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'এ লাইনে এসেছেন কেন?' বিয়ে করে ঘর সংসার করতে তো পারেন।'

বিকট শব্দে হেসে উঠল চাঁপা। ঠিক বুঝছি, আপনি নতুন। যারা নতুন আসে, তারা এসব কথা বলেই সময় কাটায়।' আবার হাসতে লাগল চাঁপা।

আমি চাঁপাকে দেখছি। রং ফর্সা, বছর পঁয়তাল্লিশের একটি মেয়ে। মুখের প্রসা-ধনের আড়ালে এমন নির্মম ছায়া লুকনো থাকতে পারে কোন মেয়ের মুখে, আমার ধারণা ছিল না। গায়ে কিছু মাংস আছে, খোঁপা অনেক কাঁটা দিয়ে শক্ত করে লাগানো।

'কি দেখছেন এমন করে?' চাঁপা খিল খিল করে হেসে উঠল। মূহুর্তে কাপড় খসে গেছে বুক থেকে।

'আপনার সিঁধতে তো সঁদুর আছে। বিবাহিত—' আমি জানি আমি ভিতরে ভীষণ কাঁপছে, শব্দ নিজেই সামলাবার জন্যেই এমনভাবে বলে চলছি।

'এমনি সিঁদুর পরতে হয়। বিয়ে হবে কি করে? চাঁপা একটু এগিয়ে এল আমার দিকে।

'কেন? আমি সিঁধের সিঁদুর দেখছি।'

সংসার করলে ছেলেপুলে দরকার। আমা-দের ছেলেপুলে হবে না। এখানে আসা

দিয়োঁছি।' একটু থামল চাঁপা। আপনার ছেলে মেয়ে আছে বাঁক?

হ্যাঁ, আছে। মনে মনে বিড় বিড় করতে করতে চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আপনি এলেন কেন?' লাগ ছোপ ধর: দাঁতে হাসতে হাসতে আমিও এগিয়ে এল চাঁপা। আমার হাত ধরল। 'গান শুনবেন, না এখন চলে যাবেন?' চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের কাপড় কোলের ওপর লুটোচ্ছে।

আমি কেন এলাম। হঠাৎ কথটা শব্দ, তখন যেন মনে হয়েছিল। আর চাঁপা আমার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ি, আমার স্ত্রী অশোকা, স্বর্গীয় বাবা-মার মূখ, আমার ছেলে-মেয়ের কথা চকিতে মনে হতেই বাবাই—আমার এই ডাকনামে সেই মূহুর্তে কেউ যেন ডেকে উঠেছিল।.....

'কটা বাজল বলুন তো?' ঈষৎ দূরে এক-নয়ক ভদ্রলোক সময় জানতে চোর কথা বল-তেই আমার সান্নিধ্য মিলে এক। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে খড়ি দেখলাম। 'নটা বাজতে দশ।' বলে আমি একটু আগের ভয়ের দাঁতিতে হাঁপ-ধরা বুক থেকে পরিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেললাম। হাতের সিগারেট নিভে গেছে।

মুখের ভিতরটা ততো লাগছে। সারা-দিন অফিসে থাকার পর কিছু না খাওয়ায় পিঠি পড়ছে হৃদয়। নাকি সস্তা সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন মূখ তেতো। মেরদাড়ায় মীন পড়ে কনকন করতাই সোজা সহজ হয়ে বস-লাম। হঠাৎ যেন চারপাশ থেকে বাতাস চলে গেছে। গুমোট গরমে বুক চাপা অবস্থা যেন এখানেও। সিগারেট ধরতে ইচ্ছে করছে না।

চাঁপার ঘরে কেন গিয়েছিলাম—চাঁপাও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। অথচ সেই মূহুর্তের আগে পূর্বস্বত একবারও আমার নিজের মনে হয়নি কথটা। আমিও জাবিন, কিসের জন্যে অশোকার স্বামী, ন বছরের মেয়ে ও একটি পাঁচ বছরের ছেলের পিতা, আমি, সীতেশ পালিত, প্রায় আটত্রিশ বছরের একজন নবক বেশ্যার ঘরে ঢুকছি।

ঠিকই, সেই মূহুর্তে কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু তার আগে, কতবার যে আমি নিজেকে শেক করতে চেষ্টাছি। নিজের চিন্তা-তেই আঁতকে উঠলাম। চাঁপার ঘরে আসার আগেও তো একবার ভেবেছিলাম, আমাদের পুরনো ওই বাড়িতে ভর্তি বাড়ির ছাদ থেকে কাঁপ দিয়ে পড়ি। তা না করে একসময়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাড়ার অতি-পারচিত গুহ-ধের দোকান থেকে কিছু ঘুমের বড়ি কেনলাম। এখাও তো ভেবেছিলাম! চাঁপাদের পাড়ার ঢোকার আগে পাঁকের সামনে মোতলা বসে চাকাটার দিকে তাকিয়ে একবার গা গুলিয়ে উঠেছিল না? সেই মূহুর্তে গানের রং



কি ভেবে আমি একটু আগে বেশা-  
পালীতে ঢুকছিলাম? হঠাৎ এই মূহুর্তে  
আমার নিজের ভাবনার আমি উত্তেজিত হো-  
করাছি। আমার ভিতরটা আবার নামে ভিলে  
উঠেছে।

.....টাকের জোর এখন নেই, কিয়-  
করতে গিয়েছিলে কেন? সামনেই তো বেশা-  
পাড়া ছিল।" অশোকা চোঁচিয়ে উঠল।

একতলার একখানামাত্র সাতসেসতে ঘর।  
সামনে ছোট দালান, অশোকর, চাপা। ওপাশে  
জিনিসপত্রে ডাই-করা রাসাঘর। আমি  
রাহুয়েয়ে জড়িয়ে, জল খাচ্ছি।

অশোকা, সাবধানে কথা বলো। ছেলেটা  
তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।" আমি ঠান্ডা  
গলায় বললাম।

আমাকে সাবধান করতে এসে না।  
তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেয়া  
যে।"

আমি নীরব থেকে অশোকাবাবু দেখছি।  
পাতলা, রূপে বিষম চেহারা অশোকর। গাল

তোড়ানো, বড় বড় চোখ দুটি ভিতর  
ঢোকা। মাথার চুল উঠে গেছে অনেক। শরী-  
রের কোথাও এডটুকু মাসে নেই। অ্যানিমিশ  
থেকে কোন রকমে ধার-দেনা করে সামলে  
নিরোছি।

বললাম, "তুমি তো জান, যা ধার হগে  
আছে, আর কেউ দেবে না।" আমি ঘরে এসে  
বসলাম। আমাটা এবার ছাড়ব বলে বোতাম  
বুলাছি।

"আমি সব জানি। কিন্তু এখন চলবে কি  
করে?"

"আমি কি করে জানব?"

"হ্যাঁ" অশোকা যেন ভেঁচাল। মনে  
ভেঁচালে অশোকাকে কুৎসিত দেখায়।  
"তা হলে আমাকে বাইরে বেরতে বল।" একটা  
ঘরে তো ছেলে-মেয়ের জন্ম দিচ্ছি, আর  
একটা ঘরে বাই তাদের খাওয়া-পানার জেনো।  
তোমার বাবা-মা বাকি তাই শিখিয়েছে।

"চুপ কর।" ভীষণ জোরে ধমক দিলাম।  
কমশঃ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। সহ্যের  
একটা সীমা আছে।

তোমার দর অমরতা। অশোকা শরীরের  
পাড় কথানা মূড়ে-ভেঙে বরের কোশে মসে  
রইল।

আমি চুপ করলাম। একদিন মর, বিয়েল  
দদিন পর থেকেই অশোকর এই মূর্তি দেখে  
আসিত। আমি। তখন সবোমার বড় মেয়ে  
রূপা পেটে এসেছে। মেয়েকে গানব করতে  
হবে, টাকা চাই অনেক। অভাবের সংসার আর  
নয়। ভাল চাকরী দেখ, টাকা রোজগার কর।  
অশোকা বার বার বলত। আমিও মনে মনে  
চাইতাম। কিন্তু রূপা হওয়ার পরও বাবুল  
এল। এক অসুখের দাঁড়িয়ে আমি।

জোঁড় ভেলে বাবুল পাঁচ বছরের। রূপা  
বড় হয়েছে, বাইরে সমবয়সী মেয়েদের মতো  
গিয়ে খেলে, গল্প করে। বাবুল বাইরে যার  
না। ও এগিয়ে এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল।  
মা, দিদি কোথা?

হঠাৎ অশোকা ঠাস করে একটা চকু মারল  
বাবুলের গালে। ঘরে ছিটকে গিয়ে গড়িয়ে  
মুখ পেরে পড়ে রইল বাবুল। কয়েক  
মহুর্ত।

# ব্যক্তিগত ব্যঞ্জক কলম!

**ফায়ারাইট**  
স্কেচ পেন ও ফাইরাইট পেন



ফায়ারাইট প্রাঃ লিঃ  
আইসি বোটিরিয়াল ডিভিশন, স্কে. বি. বঙ্গল,  
বোম্বাই-৬৯ (ভারত)



- মনে রাখবেনঃ**
- স্কেচ পেনগুলি পাওয়া যায় ১২টি রঙে আর ফাইরাইট পেনগুলি পাওয়া যায় ৭টি রঙে।
  - আবার কালি ভরার ক্ষেত্রে পেড-নেব প্রাপ্যটি গুলুন।
  - ডগ একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার আগেই কালি ভরুন।
  - ফাইরাইটে রয়েছে নকশাত সিঙ্ক্রটিক টিপ—ভাঙ্গার ভয় নেই।
  - স্কেচ পেনগুলির টিপ সিঙ্ক্রটিক বেজিন মেশানো ফাইরাইট দিয়ে তৈরী—তাই স্কেচ করার সময় চাপ পড়েনা।
  - ফাইরাইট ও স্কেচ পেনের ক্ষেত্রে সব রঙে আবার ভরার কালি পাওয়া যায়।

আমি দুই উঠে দাঁড়িলাম। 'এ কি করলে!' অশোকর দিকে তাকিয়ে কথটা বলিই বাবুলকে তুলে ধরলাম।

'মরে বাক। ওদের মা আমি নই।' খন খন করে বেজে উঠল অশোকর গলা।

আমি বাবুলকে সামনে ধরে দেখি বাবুল চোখ বুজিয়ে হাঁপাচ্ছে। মার খেতে অভ্যস্ত ওমা, জানি, কিন্তু এমন! আমি সারাদিন অফিসে থাকি, এদের দেখিনা। অশোকা এই করে। আমার ভয় করল। দুই হাতে জল ছিটোলাম। কয়েকবার চুমু খেলায়। জোরে জোরে নাড়া দিয়ে ডাকলাম। একসময়ে বাবুল কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার চোখে জল। নিঃশ্বাস দুই। আমি বাবুলকে কোনরকমে খামিরে মেরে শাইয়ে দিলাম। বাবুল, কেন বেন, খামিরে পড়ল।

আমি এতক্ষণ অশোকর দিকে তাকাই নি। অশোকা দশ বছর ধরে এভাবে আমাকে শাসন করছে এসেছে। আমার অক্ষমতা, অসহায়তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার বোভাগসুলো খুলেছিলাম। আবার পল্লম। ডাকলাম অশোকর দিকে। আমার মাথাব মধ্যে ঠান্ডা বাওয়ার গুরুগুরু শব্দ। রগ দুটো দশ দশ করছে।

বাইরে বাবার জন্যে পা বাড়লাম।

'কোথায় বাছ?'

'এ দিকে ইচ্ছে।'

'রাস দেখাছ?' তাজিলোর হাসি হাসল অশোকা।

'ওটা কি তোমার একমাত্র অধিকারে?'

'না, তা নয়। কিন্তু কল ওপস?'

'নিজের ওপস।'

'নিজেকে নিয়ে যা পার কর, আমাদের ব্যবস্থা কর।'

'আমি কিছু জানি না।' বেগরোয়ার মত এসোপদাম।

অশোকা হঠাৎ এগিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করল। 'খাওয়ার আগে আমার কথার জবাব দাও।

তোমার কথার জবাব? যেমা করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে।'

'ও, জাই! কেন আমি দেখতে খারাপ হল। আমার কিছু নেই বলে।'

এ কথাগুলো শুনে শুনে অভ্যস্ত আমি; কিন্তু কেন বেন রেগে গেলাম। 'ঠিক তাই। কি তোমার আছে আমাকে ধরে রাখার। খুঁজিও এতটুকু হাস রেখেছ।' এই কথানা মাঝে একটা সূক্ষ্ম পদক্ষেপ কিছু পার না।

'কি, কি বললে!'

'ঠিকই বলেছি। বেশকিছু তোমার থেকেও পরিষ্কার থাকে। তোমার জন্যে, যা টাকা খরচ

পেডাম।' বলেই প্রায় ত্রিশে সরিয়ে বস থেকে বেরিয়ে এলাম।

অশোকাকে কোনদিন এরকম কথা বলিনি: দশ বছর ধরে বা বলেছে, তাই করেছি। যা পেয়েছি, তাই ওকে দিয়েছি। কিন্তু আজ চাঁপার ঘরে ঢোকান অশোকর কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর আমি নিজেকে নিঃসহায় ভেবেছিলাম, পর থেকে বেরিয়েই ভেবেছিলাম, পুরনো বাড়ির ছাদের কথা। রাস্তার বেরিয়ে পাগলের মত ছুটফট করে কখন বেন চাঁপার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

কিন্তু সেখান থেকে কৈ-দেন আমার ডেকে এখানে নিয়ে এল। কে? আমার মা-বাবা? শুধু তরাই তো আমাকে 'বাবাই' বলে ডাকত। কতদিন মায়ের কোলে মৃদু শব্দে 'বাবাই' নামের সঙ্গে মিল রেখে মায়ের নিজেরই বানানো ছড়া শুনোঁত: সৈসব, ছড়া কতদিন আমার মনে পড়ত। এখন সব ভুলে গেছি।

নাকি রূপা আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেছিল? বাড়ি থেকে বেরবার সময় রূপা ছিল না। রূপার সঙ্গে দেখা হয়নি। রূপাই বন্ধি আমাকে ডেকেছে! কেন বেন রূপার কথা মনে পড়ছে। রূপা বাড়িতে, আমার খুঁজছে! আর আমি এখন কোথায়, কতদূরে!

ভরংকর এক চাপা ভর আর উত্তেজনাখ ভিতরে আঁতকে উঠলাম। আমার চারপাশ ঘুরে ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। এই মৃদু-মৃদু সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক দৃষ্টান্তকে দেখলাম। সঙ্গে একটি মেরে: সম্ভবত ওদেরই এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

সত্যেন, তোর মেরেটা খুব সুন্দর হয়েছে রে। ঠিক তোর মত।

'না, ঠিক বলি না।' সত্যেন নামে খুবকটি হাসল। স্ট্রীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মেরে ঠিক ওর মায়ের মত, আগন্তুক পরেরটা আমার জন্যে ঠিক আছে।' হো হো করে হেসে উঠল ওমা।

.....'মেরেটা কার মত হবে বলতো?' এক বছর যেতে না যেতেই মেরের মূখের দিকে তাকিয়ে অশোকা বলেছিল।

'ঠিক তোমার মতো।'

'যা, তোমার মতন লম্বা হবে, স্বাস্থ্য পাবে। মূখের নীচের দিকটাতে তোমার মূখেরই একটা অংশ একেবারে ছিঁটে তোলা।'

'তার মানে তুমি-আমি মিলিয়ে আছি।'

হঠাৎ আমার কি হল, আমি ছিটকে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িলাম। সামনের ওরা হেসে ভেঙে পড়ছে। আমি ওদের হাসির মধ্যে কারোর কথা শুনতে পেলাম না। মনে হল, আমাকে কেউ খেন ডাকছে: 'বাবাই' বলে ডাকছে কেউ। আমার মা, নাকি, আমার মায়ের

দিদা নাকি ভোমাকে 'বাবাই' বলে ডাকত। আমি ভোমাকে 'বাবা' বলে ডাকব।

আমি তো তোমার ছোট মা।

ছোট করে ডাকব!—চিবুক পরে, রূপা আরও ছোট ছিল যখন, কতবার একসাথে বলত।

আমি ভরংকর এক উত্তেজনা বোধ করছি ভিতরে। কোনদিকে না তাকিয়ে আমি, কেন যেন, পড়ি-মরি করতে করতে বাস-ট্রাম ধরে বাড়ির দিকে এসেছিলাম।

বাড়ি ধীরে ধীরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, আমার উন্নতির সামনে অশোকা গালে হাত দিয়ে নিঃসাড় বসে আছে। আমার পদশব্দে ও পিছন ফিরল না।

আমি ঘরে ঢুকতেই রূপা চোঁচকে উঠল, 'এই তো বাবা, এসে গেছ। আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই কথা বলব না!'

'কেন মা! আমি মেরের ওর স্কুলের বই চাঁচিয়ে রাখা জায়গার সামনে বসে পড়লাম। একটা দূরে বাবুল একভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

'তুমি অফিস থেকে এসেই চলে গেলে কেন?' রূপাল গলা একটু যেন ভেজা।

'তুমি আমায় দেখেছ?' আমি মেরের মূখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

'দেখিনি। আমি দোতলার রুমের ঘরে গিয়েছিলাম। নীচে নেমেই দেখি, তুমি চলে যাচ্ছ। কি ডাড়াডাড়া বাঁচ্ছলে! কতবার তোমার ডাকলাম, তুমি সাড়াই দিলে না। পেছন ফিরে একবার দেখলেও না! আমি তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না।'

'এই তো এসেছি।' আমি রূপাকে কোলের ওপর টেনে নিলাম। হ্যা, দেখি তোমার মূখটা।'

'কেন!' রূপা অবাক হয়ে আমার চিবুক ধরে আমার দিকে তাকাল। 'কি দেখছ বাবা! আমি খুব সুন্দর দেখতে কিনা?' বলেই হাসতে লাগল রূপা। 'বাবা তুমি খুব ভাল।'

আমি রূপার মূখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলাম। অনেকদিন পরে রূপাকে এমন খুঁটিয়ে দেখলাম। রূপার মূখের নীচের দিকটা, বত বড় হচ্ছে, আমার মত। চোখ, কপাল একেবারে অশোকর কেটে বসানো। বিয়ের সময় অশোকর যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, রূপা সেরকম হয়ে উঠছে। রং, লম্বায় আমি। রূপা যেমন সুন্দরভাবে অশোকা-আমি মিলিয়েই হয়ে উঠছে।

আমি আমার শুনেনা মূখের আর শুনেনা বুক ভরে আমার মেরের মূখ ছবির মত স্থির রেখে দেখতে লাগলাম। আমার



রোববারের সকালে হাতিবাগানের রাস্তাগুলি জমজমাট থাকে। অফিসের ব্যস্ততা নেই। ছুটির দিনের হাঙ্গামা মেজাজ নিয়ে সবাই চলাফেরা করেন। ভেতরে মাছের বাজার। পাশেই তরিতরকারীর দোকান। তবু অনেকের হাতে বাজারের থলি থাকে না। পরনে পাঞ্জাম। গায়ে পাঞ্জাবী। কেউবা আসেন, পাখির খোঁজে।

এখানে পাখি পাওয়া যায়। কোকিল, টিলে, ময়না, বুলবুলি, পায়রা। এমন কি তিতরও। কোনো পাখি পোষ মানে। কোন পাখি মানে না। ষাঁদের বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে, তাঁরা লাল, নীল মাছের খোঁজ করেন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় ফুলের দোকানের আনাগোনা।

গ্রে স্ট্রীটের খানিকটা জায়গা জুড়ে কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীটের মত পবনত, দোকানীরা ফুলের টব, ফুলের চারার অস্থায়ী দোকান সাজিয়ে বসেন। ফুলের চারা বিক্রী হয় কুণ্ডিসমূহ। বর্ষাশেষে মৌসুমী ফুলের চারায় বাজার ছেড়ে যায়। দামেও সস্তা। তবু চাহিদা বেশী গোলাপ, রজনীগন্ধা, জুই, বেগ, ডালিয়া, চন্দ্র-মালিকা প্রভৃতির।

রোববারের এইরকম একেকটি সকালের স্বাদই আলাদা। অভিজ্ঞতাও বিচিত্ররকম।

## গৌরাজ্জ ভৌমিক

সেদিন দেখা হয়েছিল আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে। চন্দ্রমালিকার খোঁজে এসেছিলেন। পানি নি। তাই, দুটো গোলাপ আর ডালিয়ার চারা কিনেছিলেন। ওর জাদ ভর্তি এখন ফুলের টব। বললেন, আসুন না একদিন। চমৎকার দুটো গোলাপ ফুটেছে। দেখাবো। নতুন কয়েকটা ক্যাকটাসও সংগ্রহ করেছে। এমন জিনিস কিন্তু আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

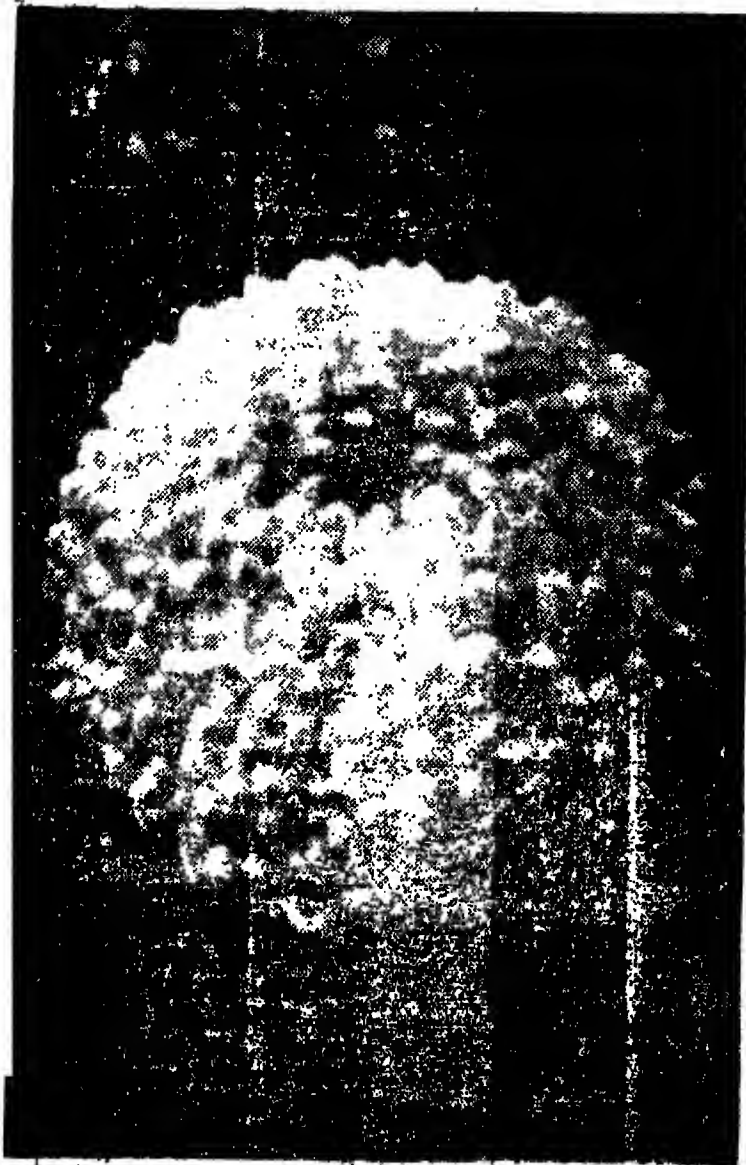
আমি তাকে জানি।

কয়েক পূর্বয যথেষ্ট কলকাতার বাসিন্দা। তবু নিজের বাড়ি নেই। ভাড়াটে বাড়ি-টাকেই নিজে বাড়ি করে নিয়েছেন। সারাদিনের কাজকর্মের পর, এই নিয়ে তাঁর সময় কাটে। এই তাঁর বিলাস। কোনো পাছে কুণ্ডি দেখা দিলেই বন্ধুবান্ধবদের কাছে খবরটা ছড়িয়ে দেন। ফুল ফুটলে তো আর কথাই নেই।

কলকাতার কয়েক লক্ষ নাগরিকের মধ্যে তিনি সংখ্যালঘুদের দলে। কিংবা তাঁর কোনো দল নেই। তিনি নিঃসঙ্গ। বাঁদের বাড়ি আছে, তাঁরা হয়তো ফুলের চারা কেনেন। টবে ফুলও ফোটে। কিন্তু বাসাবদলের নিয়মিত অভ্যাসে যারা অস্থির, তাঁদের জীবনে বাগানের শখ থাকে না। দোকানের ফুলে ফুলদানি সাজাতে হয়।

আমি গায়ে গিয়েছি। গায়ে থেকেছি। অফিস, কলেজ ভালোবাসার অবসর কাটান; এমন মানুষ বিশেষ দেখিনি। ফুল হাজির





ওখানেও ফোটে। কিন্তু সেই ফোটেও  
রঙ ফুলদানিতে সাজানো হয় না। কারো  
বাড়ির উঠানে সেখানেই ফুলদানি গছ।  
সকালবেলায় শাদা ফুলগাছ বিকসে অন্য  
রকম হয়ে যায়। তবু কেউ এদের হিঁড়ে  
এসে ফুলের গোড়া খাওয়া না। কখনো  
শিউলির-গাছের সারা বাড়ী সাজ করে। সেই  
ফুলও বেগুনি ভাগই উঠে। এতদে  
প্রকৃতপক্ষে গায়ের মানুষ ফুল  
সম্পদ উদাসীন। শহরতলি তার ব্যবহার  
বেশী।

চেনাশাণী কিংবা গাফিলতের বোঝে  
কোনো মহিলা যদি ফুল দিয়ে বসন্ত  
গন্ধার মালা খোঁজায় লড়িয়ে রসতা এঁটেন,  
আমরা এবাধু হইয়া। এতদে স এই কয়েক  
অনেকের সম্মুখি দেখা হয়ে যায়। তাদের  
কাউকে মিনিমুম কাউকে চিনি না। কিংবা  
চিনলেও তাগেলে জাঙ্কি কোনো ডল লকের  
যোন কিংবা স্ত্রী হইলে। দিদি কিংবা  
বৌদি হইলে। এককম প্রেম পরিচয়ের  
জল্পপটভার আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক  
গুঁড়ি হইতে শুরু।

কিন্তু গায়ের মানুষ এখনো এতটা  
অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। আই ডন'টিটি হারায়  
না। সমাজের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ প্রসঙ্গ করে  
চলে। শব্দের ভিত্তিতে সামলে ফুল গোলা  
হাট দিলে কল্পা যোগটি খোঁজাই যায় না।  
এক বংশের সূত্রের লক্ষ্য জেটা, প্রাস-  
প্যাসব সম্পর্কে।

নয়ানানী মানুষের আবেশে এই অতি-  
পরিচয়ের সন্কেট নেই। শাসন নেই। এবং  
নেই বয়েস। চোখেরাও অনেকটা স্বাধীন হবার  
সুযোগ পায়। সাক্ষরতাকে আর্ট বলে  
ভাবতে পারে।

এই ভাবনার মূলে শারীরিকতা, একটা  
মড় কথা।

অন্য কারণও থাকতে পারে। সেটা  
শিক্ষণত রুচির দিক। বদমাশের ফল খাওয়ার  
বলেছেন, ক্ষানবাকের ফল খাওয়ার প্রাতি-  
ক্রিয়া। সেই আদিমকাল মানব এখন  
প্রকৃতি-জাগ্রিত হিল, তখন সৌন্দর্য উপ-  
ভোগের জন্য রিশের আয়োজন করতে হত  
না। কিন্তু জনমানব বন থেকে ফুলের

দূর্য সংগ্রহ করে উল্যান বানিয়েছে। প্রকৃতি-  
বিশিষ্ট হয়েছে। তবু নিম্নেই স্থাপিত দিতে  
পারে নি।

এরই জন্য বা কিছ, উদ্যোগ, বা কিছ,  
আয়োজন।

বিভূতি বাড়ুজের উপল্যাসে মাঠ-  
ফালের কল্মা পেরেছি। সৌখীন ফুলের  
কল্মা পাই নি। 'আরণ্যকে' দখলি গাছের  
ফুলকে চিহ্নিছি, নকশার উপহার।

গায়ের মানুষ ভদের চেনে। মাড়িয়ে  
যায়। মাওভাতি মটর, সবে কিংবা খেসারীর  
ফুল দেখে। বড়জোর, অথবা ঠাকুরের  
রিসের চোখ দিয়ে, এই মাঠকে সতরগ  
খেলার ছক খসে উঠতে পারে। তার বেশী  
নয়। তবু কোথাও যদি সৌখীন ফুলের  
বাগান দেখা যায়, তাহলে দ্বন্দ্ব হতে হবে, এই  
গায়ে শহুরে রুচির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।  
কিংবা শিক্ষিত মানবের সংখ্যা বাড়ছে।

এই ভো সেদিনের কথা। কলকাতা  
থেকে চার্লস মাইল দূরে এক গায়ে গিয়ে-  
চলে। তাজল বনে গিয়েছি। মাগনো-  
লিলা ফুল দেখে। যে সে ফুল নয়,  
ও মাউজেরা। দৃশ্যকে বসন্তের, কেথায়  
পেরেছে। এতদে আমাদের দেখা ফুল নয়।

বসন্ত, আমাকে বোঝানো, ইচ্ছা থাকলেই  
দেখা যায়। এই ফুল তিনি সংগ্রহ করে  
ছেন অনেক কষ্ট করে, ওড়ার আয়োজনা  
ছোকে। অসমের দেশেও এখন পাওয়া যায়।  
উদ্ভিদবিদ পিয়ার মাগনোলার নাম। এতদে  
সঙ্গে এই ফুলের নামকরণ হয়েছে মাগনো-  
লিয়া।

বসন্ত, তিনি আমাকে পদপরিচক  
ঠাউয়েছেন। না হলে, তবু কথা বলতেন  
না। তার মতে, হওয়া ভাবার মাগনোলিয়া  
ভালা হয়। সূত্র বোধ করে। প্রাউজেরা  
অবশ্য রোগের তাপ মটর পারে অস্বস্তি।  
তবে গায়ের গোড়ায় জল জমলে বাঁচে না।  
ফুল ফোটার মাস দুয়েক আগে, গোবর  
কিংবা হাড়ের গুড়োর সার দিলে ফুল  
খড় হয়।

এসব তথ্য আমার ত অস্বাভাবিক।

তিনি বললেন, মাগনোলিয়া গ্রুপের  
আরো অনেক ফুল আছে। যেমন পুমিলা,  
টেরোকাপা, মিউটাবিলিস, ফসকাটো  
প্রকৃতি। সমস্ত বাংলায় এদের চাষ হয়।  
কিন্তু এখনো তেমন মর্যাদা পায় নি।  
প্রাউজেরা এদের রাণী। এবং শ্বেতাংশিনী।  
পুমিলা আর টেরোকাপার রং শাদা।  
মিউটাবিলিস গাঢ় ঘিয়ে রঙের।

এইসব আলোচনার পরেও, গায়ের  
মানবের সঙ্গে আমি তার কোনো মানসিক  
সংযোগ আবিষ্কার করতে পারিনি।  
এককালে তিনি কলকাতার লেখাপড়া ক্রেত-  
তেন। এখন পিতৃপুরুষের ভিটের চান  
গায়ের বাসিন্দা। চাষবাসের সঙ্গে সংযোগ  
নেই। কলা, মূল্যের চাষও করেন না।  
পাশের বাড়িতেই গোপাটি আর গাঁদা ফুল  
ফুটেছে বেগুন গায়ের ফাঁকে ফাঁকে। এই  
ফুল পূজার জন্য প্রয়োজন।



সিনেমা হলে। কেরানীর স্ত্রী থেকে আফসার গিন্নী পর্যন্ত প্রায় সকলেই সপরিবারে ভাঙে অংশ নেন। কেউ নিজের স্ত্রীকে অন্যের চোখে ছোট হতে দিতে চান না বলেই হয়তো সাজগোজের বাহারেও টেকা দিতে প্রস্তুত। সভাপতির টেবিলে রাখা ফুলের তোড়া থেকে নাটমণ্ডের শেষ আসনে বসা মহিলার চুলে দড়ানো ফুলের মালাটি পর্যন্ত সব নিলিয়ে কেমন যেন বোয়ামাটিক পরিবেশ তৈরী করে। কেউবা অনুষ্ঠান শেষে আফসার, বিব্বা ম্যানোজং ডিরেক্টর, কিংবা কোম্পানী মালিকের সঙ্গে নিজের বউকে পরিচয় করিয়ে দেন, এই আমার স্ত্রী রীনা। ভাগ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে।

আধুনিক সঙ্গীত এখনকার ক্যাসান নয়।

কলকাতা এই রকম এক আশ্চর্য শহর। এখানে গানের ইন্দ্রুল আছে নাচের ইন্দ্রুল আছে। এমনকি ফুল সজাচার টেনিও দেওয়া হয়। গানের পাথে নাচিয়ে মোহন সম্রত সিপদ। কারো খোঁপায় ফুল দেওয়া গলে হো কানাকানি শব্দ হয়ে যায়। মোহন মনে রাং ধরেছে।

নাটকম দেখেছি আমি সাঁওতাল পরগণায়।

আদিবাসী মোরো ফুল ভালোবাসে। কিন্তু ফুলের মালা পরে না। বালো সাঁওতাল দুরভীরা গায়ে দবদবে শাদা কাপড় আঁটা-সাঁটে করে পরে। চুল লম্বা টান টান করে। কখনো তাদের চুল দেখা যায়। কোনো একটি লাঙ্গল কিংবা সাদা ফুল। অনেক সদস্য জন্ম কিংবা মৃত্যুর ফুলও ওলা চলে গৌড়। দেখতেও খারাপ লাগে না।

শতের সাদা ফুলেরই ব্যবহার বেশী। লালের মধ্যে গোলাপ কিছুটা অভিজাত। বজলিগন্ধার মালায় লক্রেটের মতো কাজ করে। আসল কথা নাগরিক জীবনে ফুলের হাফার এখন সর্বত্র সঙ্গারিত।

অনেক কাজ আগের কথা বলছি।

ভিক্টর হুগোর 'হ্যানচ ব্যাক অফ নোভরদাম' দেখেছিলাম সিনেমার পর্দায়। ভাঙে কি যেন সব পাপ পুণ্যের কথা ছিল। সম্মিথের ইঙ্গিত ছিল। সব ঘটনা আজ মনে নেই। তবে, গীর্জা-সংস্কারের আগ্রায়ে বেড়ে-ওঠা একজন কৃষী মানবকে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

তাকে ভুলতে পারিনি।

কেননা, জনৈক তরুণীর সান্নিধ্য তার হৃদয়ের উন্মেষ ঘটেছিল। ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল। এবং সেই মহতের গীর্জার রাতলে-গজানো আগাছার ফলটি পর্যন্ত ঐ কৃষী মানবটির নজর এড়াননি। তার কাছে ভাংগা-পুঁজ মনে হয়েছিল।

ঐ ফুল ছিল তার ভালোবাসার প্রতীক। জাগরণের ইংলজবাহী।

ঠিক ওরকম প্রতীকী অর্থ না হলেও, নগর-জীবনে ফুলের ব্যবহার সর্বজনীন।

শব্দ একালে নয়, সেকালেও। ভিক্টর হুগো নিশ্চয়ই তা জানতেন। না হলে, ফুলের প্রতীকে ভালোবাসার ভাংগা-পুঁজ করতেন না। সেইকালে নিশ্চয়ই হুম্বোগের নগর-জীবনে বিজ্ঞানতার সূত্রপাত হয়েছিল। নাকি কালিদাসের কালে, কালিদাস ছিলেন আনন্দগিরিক?

আমার জা মনে হয় না।

তাই কাছে ফুলের ব্যবহার দেখেছি। ফুলের উপহার গ্রহণ হয়েছিল। তাই বলে, রাজসভায় বসে তিনি নর্তকীর নাচ দেখেন নি, কেবল নৃপুণের শব্দই শুনতেন—একথা ভাবতে পারি না। দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীরা ফুলের গণনা পড়তেন। ফুলের মালা গলার পরে মণিদের নাচ দেখাতেন। রাজ পুরো-হিন্দু দর্শিত তাদের ওপরে কিভাবে পড়ত, সে খবর কোনো ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই। তবে, তারা যে সমাজবিরুদ্ধ ছিল, সে ব্যাপারে সন্দেহই নিঃসন্দেহ।

তিনি না, তাদের জীবনে যন্ত্রণা ছিল কিনা।

ওবে অনুর্ব্ব যন্ত্রণায় আমরা উৎসব করি। কখনো দেবতার নামে, কখনো মনীষীর জন্মদিনে কিংবা স্মৃতিতর্পণে, কখনো-বা সংস্কৃতির নামে। সেই ফুল টবে জন্মার না, গানের চাষীরা জেগান দেয়। রেল কোম্পানীর কাছেও খবনাট অক্ষাত। না হলে, টাটম টেবিলে উৎসব থাকত। টাটা থেকে সন্দেহা যন্ত্রণাটি কলকাতায় আসে, তার নাম স্টীল এক সপ্তেস। কিন্তু, রাত শেষ হওয়ার আগেই সেরাটটি পাশকড়া হলে হাওড়ার দিকে ছুটে যে থাকে, তার কোনো নাম দেন নি।

গানের মানস তার নাম দিয়েছে, ফুলের স্পেশাল।

ঐ ট্রেনে আসে গোলাপ, রজনীগন্ধা, পদ্ম, ভলিয়া, স্যাম্বা, এমনি আরো অনেক ফুল। আসে অনেক সিন্ধু ফ্রাওয়ার। গাঁদা, দোপাতি, বেলপাতা, আমের শাখা, দূর্বা ঘাস প্রভৃতিও। কেননা, ভোব হওয়ার আগেই, ব্রীজের নিচে ফুলের বাজার বসে। ফুল বিক্ৰী হয়, ওজন দরে, ওজন হিসেবে, শতকরা গননিতহে।

শিয়ালদার ভাণ্ডারকারীর বাজারের সঙ্গে এই বাজারের কোনো গণগত পার্থক্য নেই। পাথকা আছে পণ্যের ভিত্তিতে। শিয়ালদার ক্যানিংয়ের চাষীরা কলা, মেলোর চাহিদা অনুযায়ী দরদস্তুর করে। হাওড়ার ফুলের দাম নিয়ে দর কষাকষি করে হাওড়া ও জোড়ানীপুণের ফুল চাষীরা। তবে উভয় বাজারের খবদর এক রকম নয়।

হাওড়া প্রান্তর নিচে ফুল কিনতে আসেন, কন্যাদায়গ্রস্ত গিতা কিংবা তার আত্মীয়স্বজনরা, পুজো কর্মসূচির সেক্রেটারী কিংবা উৎসবজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানগণ, সদা-প্রস্তুত কোনো কোন ভ্রমলোকের শোকাড জায়ায়-স্বজন। এবং আরো নানাপ্রকারের দূর্খী,

উল্লস, শোকাড, বিধব, উৎসবজ্ঞান ও উৎসবজীবন মানব।

তবে, তাদের ওপরে ব্যবসা নিভরশীল নয়।

কলকাতা এবং শহরতলীতে হারা ফুলের ব্যবসা করেন, তারাই মূলত হাওড়া হাটের খন্দর। সে রকম ছোট বড় ব্যবসায়ীরা সংখ্যা প্রায় এক হাজার। গিউ মার্কেটের সৌখীন ফুল ব্যবসায়ী থেকে লেক মার্কেট-কলেজ স্ট্রীট, হাতিবাগান, শোভাবাজারের ফুটপাথের দোকানদাররা পর্যন্ত ঐ জোগানেন ওপর নিভরশীল।

শোভাবাজারের দোকানীরা কুটো ফুল বেচে বেশী। পুজোর লাগে। জ্বার মালা, জুই, বেল, স্যাম্বা, অপরাধিতাও পাওঁয়া যায়। হারা অল্প ফুল কেনেন, তাদের চাহিদা। ঐই ফুটপাথের দোকানীরাই মটতে পারে। ফুলের জন্মদিন, মোরোর মূর্ত্যুত, কিংবা বিষাক্ততার লক্ষ্যপুতাকে তো আর বড় উৎসব বলা যায় না।

ওবে স্থানীয় ফুলের পুরস্কার বিতরণী সভা, রবীন্দ্রজয়ন্তী, মেয়ে ফুলের নৃত্যানুষ্ঠান কিংবা বিয়ে, বৌ-ভাতে ফুলের দরকার বেশ, আগে থেকে অর্ডার দেওয়াই ভালো। কাউয়ের পাতাসুখ গোলাপ, দেবদর, পাতাখ মজানো পদ্ম, স্যাম্বা, গোলাপের তোড়া, মোরোর, খোঁপায় পরার উপযুক্ত ফুলের অলংকার, ফুলদানির ফুল—সবই ঠিক সময়ে মিলে যাবে। লগনসার পাজার হলে দামের ওর তম হতে পাবে।

নৃত্যানাট্যের অনুষ্ঠানে ফুল লাগে খুব। একসঙ্গে বিশ-পঁচিশটি মোরোর সাজতে হয়। একবার আমি একটি অনুষ্ঠানে খোঁপ দিয়ে জেতাছিলাম, প্রায় তিনশ টাকা বরাদ্দ ছিল ফুলের শিতনে।

অর্থাৎ, উৎসব না থাকলে ফুলের চাহিদা বাড়ে না। এবং উৎসব শেষে যখন ফুলদানিতে ফুল থাকে না, চারদিকের আলোগলি মলান হতে থাকে, তখন মাড়িয়ে-বাওয়া দু'একটা ছেঁড়া ফুলের দিকে নজর পড়ে। বুকের শুনাতা ঢাকা যায় না। বিশেষ করে, সকালবেলায় যখন আঁস্তাকুড়ের মধ্যে ফুলের মালাগলিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তখন উৎসবের নিয়তি ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারি না।

তবে এখানে উপলক্ষও অনেক। উৎসবও অল্প।

কলকাতার বত নাট্যশালা ও সিনেমা হল আছে, তার প্রত্যেকটিতেই প্রতিদিন চলছে, কোনো না কোনো উৎসব। ক্রাফের টেম্বাধন, লাইভেরীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, কালচারাল ফাংশান, ফ্রাওয়ার্স কর্ণারের পুষ্প প্রদর্শনী, গণী সম্বর্ধনা, গৃহপ্রবেশ, সঙ্গীত সম্মেলন, ধর্মপদী গানের আসর, সোলো প্রোগ্রাম, শতভ্রম অভিনয়ের উৎসব

রক্ত জরন্তীর সাজসজ্জা—এরনি আরো অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই কলকাতার চাপল্যকে অনুভব করি।

নিউ মার্কেটে গেলে টের পাই, ফুলের চাহিদা কিভাবে বাড়ছে। বহু বড়লোকের বাড়িতে ওরা ফুল জোগান। সেই ফুল ফুলদানিতে সাজানো হয়। ফুলে মেজাজ প্রসন্ন রাখে।

এই খবর মেচেনার নিমাই মন্ডলেরও অজানা নয়।

তিনি জানেন, বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত যখন রজনীগন্ধার মরশুম থাকে, তখন ফুলের চাহিদা সবেও দাম বাড়ে না। কেবল ফাল্গুন মাসেই সুদে-আসলে কিছুটা উঠে আসে। রজনীগন্ধার খ বিক্রী হয় দশ-বারো টাকা।

ভরিতরকারীর চেয়ে এই ফুলের চাষে লাভ বেশী। তবে চন্দ্রমল্লিকার চাষে তেমন লাভ হয় না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, জল, ফুলের শত্রু। এ সম্পর্কে সতর্ক থেকেও পাশকুড়া, প্যারোট, মিটগারি, বৃন্দা-নন চক, কোলাঘাট অঞ্চলের চাষীরা রজনীগন্ধার চাষ করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জমির ওপর।

কলকাতার মানুষ তার খবর রাখেন না।

নৃত্যাশিল্পী অমলাশঙ্করের অভিজ্ঞতার কথাই বলাই। কলকাতার এক পার্বত্য এলাকায় তিনি গিয়েছিলেন নাচের দল নিয়ে। সেখানে লোকনৃত্যাশিল্পীদের একটা শিক্ষণ-কেন্দ্র আছে। তাঁর যারণা, ঐ রকম কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে, ফুলের সমারোহে, থাকলে শিল্পীরা যথার্থই জাতীয় ভাবা-পন্ন হয়।

এই ঘটনা বণনার সময় অমলাশঙ্কর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি। কেননা, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল আত-রিক। স্নিগ্ধ। ফুলের ভালোবাসায় তিনি যতটা মগ্ন ছিলেন, গ্রামীণ স্বভাবে ততটা একাশ ছিলেন।

আমি তাঁর সমাবেশ দেখিছি। কিন্তু যে ভূমিকায় তিনি নাচের অনুষ্ঠান করে-ছেন, সেই গ্রাথা, সেই পার্বত্য কি গ্রামের জীবনে আছে? না, নেই। কিংবা থাকলেও তারা ফুলের সাজে সাজে না। আমি কল-কাতার মধ্যে লৌকিক কাহিনীর নতুনরূপ দেখিছি। কিন্তু গায়ে সেই কাহিনীর কোনো চিরত্রেণ সাক্ষাৎ মেলেনি। আসল কথা, লোকসাহিত্যে গ্রামের লোক নেই। গ্রামীণ সভার পরিচয় আছে। বড়ী ঠাকুরা এক-কালে রূপসী ছিলেন হয়তো। কিন্তু তাঁদের সন্ত রূপকথার গল্পের যে বর্ণ-নয়তা, যে ঐশ্বর্য, তা লৌকিক জীবনের কোথাও নেই। সেই গল্প অতি-লৌকিকতার স্পর্শবাহী।

নির্বাসিত নগর-জীবনে আমরা তারই ছোঁয়া পাই।



কিন্তু পাশকুড়া, কোলাঘাট এলাকার পাকুর, খালেমিলে, রেলের ঝিলে যে-চাষীরা পশ্চিমফুলের চাষ করে, তাদের কাছে ফুল-কুমারীর গল্প নেই—ই রূপকথার কাহিনী। তারা জানে, দুই শ একর জমিতে পশ্চিমফুলের চাষ করলে, কত লাভ হয়। কলকাতার দোকানদারদের তারা এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। অনেকে সস্তা নামে পশ্চিম কিনে কোম্পান্টারেজে রাখে। তারপর চাহিদা বাড়লেই মওকা মারে। সেই ফুলে অনেক লাভ হয়।

এই লাভের জন্যই হাওড়া, মেদিনী-পুরের চাষীরা এখন গোলাপের চাষ করছে। বিধের পর গাথে, মাইলেব পর মাইল, যত-দূর চোখ যায়, গোলাপ, রজনীগন্ধা, আঙ্গুর, সূর্যমুখী, পশ্চিম, জলিগা, গাদা অপরাধিতা, চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত উজ্জল হয়ে থাকে।

সেই ফুল বিশ্বস্ততাব প্রতীক, বিষয়-তার প্রতীক, উৎসবের উপকরণ।

যে-ফুলের চপশালের খবর রেল-কোম্পানী রাখেন না, যার উল্লেখ টাইম-টোবলে নেই, সেই রংসমার গাড়ীটিই একদিন হয়তো নিজের প্রযোজনীয়তাকে সশব্দে জাহিষ কর'য়। কেননা, শহর যতটা বাড়ছে, বিচ্ছিন্নতাও ততটাই বাড়ছে। ফুলের চাহিদাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধিমান। অনেকে এরই মধ্যে সজ্জার চাষ ছেড়ে দিয়ে ফুলের চাষ শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে আরও জমির দরকার হবে। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের চাষও চাই।

ফুল আমাদের নিজস্বতার আশ্রয়। নিঃসঙ্গ জীবনের সংগী। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই বাবসার সঙ্গে জড়িত। কেবল হাওড়া রীজের বাজারেই ফুল বিক্রী হয়, বার্ষিক প্রায় চার কোটি টাকার।

## কুড়ি বছরের পয়গন্ধ



নতুন ইয়র্কের ম্যানহাটন শহরের এক পাড়ায় থাকতেন উৎসাহী তরুণী টেলিভিশন স্টেশন রাইটার হেলেন হানফ। শীঘ্র কুড়ি বছর ধরে তিনি লন্ডনের একটি পুরাতন বই-এর দোকানের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। অনেকদিন পর এই কুড়ি বছর ধরে বিনিময় করা হয়েছে আর তার মধ্যে গড়ে উঠেছে একালের এক আশ্চর্য প্রেম কাহিনী।

সম্প্রতি '৮৪, চেয়ারিং ক্রস রোড' নামক গ্রন্থটি এমনই একগুচ্ছ চিঠি দিয়ে গড়া। অত্যন্ত মানবিক স্পর্শ সংযুক্ত এই আনন্দ-বেদনাময় কাহিনী পাঠকচিহ্নকে সজল করে তোলে। সেই সঙ্গে মনে প্রাণে জাগে কেমন সহজে এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে একটি সাধারণ বিষয়বস্তু কিভাবে একটি মহৎ সাহিত্য গ্রন্থে পরিণত করা যেতে পারে।

'স্যাটার ডে রিকু' পরিচালক একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যে লন্ডনের ৮৪ নম্বর চেয়ারিং ক্রস রোডের মার্কস অ্যান্ড কোং পুরাতন দ্রুপাদ্য গ্রন্থাবলীর ব্যবসা করে থাকেন। কুমারী হেলেন হানফ নুইয়র্কের ১৪ নম্বর ইস্ট ১৫তম স্ট্রীট থেকে 'মার্কস অ্যান্ড কোং' কর্তৃক প্রদত্ত এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪৯-র ৫ই অক্টোবর তারিখে লিখলেন—

'আমি একজন দরিদ্র লেখিকা। পুরাতন গ্রন্থ পাঠের রুচি আছে। আমি যেসব বই চাই তা যেমন দ্রুপাদ্য আমার তেমনই দ্রুপাদ্য। এখানে হয় অতি মনোহর বহুমূল্য রাজসংস্করণ মেলে নয়ত পাওয়া যায় ছোট-খোঁড়া স্কুল-বালকের হাত ফেরতা বই। আমার অবিলম্বে যা চাই তার একটা তালিকা পাঠাচ্ছি—যদি আপনাদের কাছে সেকেন্ডহ্যান্ড কপি এসব বইয়ের থাকে তাহলে পাঁচ ডলার পাঠাচ্ছি—একেই অর্ডার বিবেচনা করে বই পাঠান।'

সেই বছরেরই ২৫ অক্টোবর মার্কস কোম্পানীর তরফে 'এফ পি ডি' নামাঙ্কিত একটি পত্র এল। এই পত্রে বলা হল—

আমরা আপনার সমস্যার ২।০ গুণ সমাধান করতে পেরেছি। বৃকপোষ্টে

হ্যাঁজিলিটের প্রত্যাশাবলী ও স্টিভেনসন পাঠাচ্ছি। লে-হাটের প্রত্যাশাবলী এত সহজে পাওয়া যায় না। ল্যাভিন হাইবেল আমাদের নেই, নিউ টেস্টামেন্ট আছে...'

৩ নভেম্বর তারিখে মিস হেলেন জবাব দিলেন—

'বইগুলি নিরাপদে এলো—স্টিভেনসন এত ভালো এত নরম একটা বই যে এত আমলের সম্পদ হতে পারে জানতাম না। আমি পাউন্ডের বিনিময় হিসাব জানি না আপনারা অল্প ঠিক করে জানিয়ে দেবেন।'

এরপর চিঠি এল ১ নভেম্বর। মার্কস কোম্পানীর তরফে 'এফ পি ডি' জানালেন—

টাকা এসেছে। নিউ টেস্টামেন্ট পাঠান হল। আশা করি আপনার ভালো লাগবে।'

১৮ নভেম্বর এই চিঠির জবাবে হেলেন হানফ লিখলেন—এ আবার কি ব্র্যাক প্রোটেক্টান্ট হাইবেল? এ কি করেছে ওরা? এমন গদ্য নষ্ট করেছে? দেখবেন এর জন্য ওরা জবাব দিবেন। আমি নিজে ইহুদী, আমার কাছে এ কিছন্ন নয়। তবে আমার বর্তমানে ক্যাথলিক। আর এক বইটি রেকর্ডিস্ট, এত কী প্রেসবিটেরিয়ান খড়্গভূতো ভাই-বোন (আমার বড় কাঁকা আরামা খৃষ্টধর্ম দীক্ষা নেন।) আমার এক খুঁড়ি 'ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স নিরাময়কারী', আমি জানি তারা কেউই এই হাইবেল স্পর্শ করবেন না, যদি এর অস্তিত্ব জানতে পারেন। আপনাদের কাছে এ ল্যান্ডরের 'ইমাজিনারি কনভারসেশন' গ্রন্থটি আছে?'

২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে মার্কস কোম্পানীর তরফে 'এফ পি ডি' লিখলেন—

আমরা আপনাকে একখণ্ড 'এমার্সন অ্যান্ড লাইফ অফ ওয়াশিংটন স্যাভেজ ল্যান্ডের, পাঠাচ্ছি। এই গ্রন্থটির ২য় খণ্ডই লুপ্ত আছে। এই গ্রন্থটির অবস্থা তেমন আকর্ষণীয় খণ্ড নয় বটে তবে ভালোভাবে বাঁধান। আপনাকে ল্যাভিন হাইবেল পাঠিয়েছি বলে দৃঢ়বিশ্বাস, একটি ডকুমেন্ট খুঁজ দেখব। লে-হানটের কথা আমরা জুলিন।'

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের আট তারিখে হেলেন হানফ লিখলেন—স্যাভেজ ল্যান্ডের নিরাপদে এল। আমি সেকেন্ডহ্যান্ড বই বড় ভালোবাসি বিশেষতঃ যে পৃষ্ঠাটি পূর্বতন মালিক বার বার পড়েছেন সেই পৃষ্ঠার চোখ পড়ে। যেদিন হ্যাঁজিলিট এল, আমি খুলে দেখি লেখা আছে 'আই হেট টু রিড নিউ বুকস' উল্লাসে বলে উঠলাম 'কমরেড'—আগে যিনি এই গ্রন্থের মালিক ছিলেন তার উদ্দেশে।

আমি শুনলাম যে আপনাদের এখানে যাংস, ডিম প্রভৃতি পাওয়া যায় না। এখানকার একটি ছোট ব্রিটিশ ফার্ম 'ডেনমার্ক' থেকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আমার পরিচিত গ্রামানের মাঝে লন্ডনে পাঠান। আমি মার্কস অ্যান্ড কোং-কে তাঁদের মারফৎ একটি ছোট বর্ডারের উপহার পাঠালাম। মনে হয় আমার প্রিয় টাকার কলিয়ে বাবে। আপনার অবধায়কছে বস্তুটি যাবে, আপনি অবশ্য যিনি হোন।—

এর জবাবে ২০ ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থক ডোরেল এই নাম ল্পাকর করে 'মিস হানফ' এই সর্বোচ্চ পত্র এল—

এই প্রথম বার পরস্পরের নাম উল্লিখিত হল পত্রের মধ্যে। তিনি লিখলেন—

'প্রিয় মিস হানফ: আপনার উপহার পারসেল আজ নিরাপদে এল। তাব ভিতরকার মালপত্র আমরা সবাই ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের মালিক মিঃ মার্কস ও মিঃ কোহেন বললেন—এইগুলি কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে নিতে মালিকদের বাদ দিতে। আপনাকে জানাচ্ছি যে পার্সেলের অন্তর্ভুক্ত সব প্রবাই আমরা চোখে দেখতে পাই না, এ শব্দে 'ব্র্যাক মার্কেটে' পাওয়া যায়। এভাবে আমাদের স্মরণ করা আপনার মহত্ব, আমরা সবাই সর্বশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯৫০-এর নভেম্বর জানাই।'

১৯৫০-এর মার্চ মাসের একটি পত্রে হেলেন লিখলেনঃ

'আপনারা কি করছেন? কব-কব নেই? কসে আছেন চুপচাপ? আমার পল-হানট কই? 'অকসফোর্ড ডার্ল?' 'জলগোয়ী'



বা কই? আপনারা আমাকে এখানে লাইব্রেরীর বইপুস্তকের মাঝখানে রাখতে বাধ্য করছেন। কোনদিন থরা পড়ব। ওরা আমার কান্ড কেড়ে নেবে।

আমি দাবী করা করেছি আপনি যাতে ইস্টারের 'এগ' (জিম) পাল-ও হস্ত ওখানে পৌঁছে লেখবে আপনি অসাড় হয়ে যত।

দেখুন বলন্ত আসছে—আমি কিছু প্রেমের কাহিনী চাই। কীটস বা শেলী সেই? আমাকে এখন কিছু কবির কাব্য পাঠান যারা যাকে না কেঁপে ভালোবাসতে পারেন। ছোট সাইজের বই, স্কাকের পকেটে থাকবে, সেন্ট্রাল পুর্কে নিয়ে যেতে পারব। চুপচাপ বসে থাকবে না, আমার জন্য খুঁজুন। আপনারা বই-এর সোকান যে কিভাবে চলেছে?

এর জবাবে ৭ এপ্রিল ফ্রাঙ্ক জারজেন ইস্টার পার্সেল পৌঁছেছে। সবাই খুশী—সবাই জানাচ্ছে ধন্যবাদ। বই পাচ্ছি না। চেষ্টা করছি। ইত্যাদি।

এ একই তারিখে লিখিত আরও একটি পত্র এল এ কোম্পানীর 'সিসিলি ফার' নামক জনৈক কর্মীর কাছ থেকে। সিসিলি লিখছেন—

'মিস হানফ, ফ্রাঙ্ককে জানাবেন না আমি এই চিঠি লিখছি। যখনই আপনার চিঠি পাই তখনই একটা চিঠি দেওয়ার বাসনা হয়। তাই ফ্রাঙ্ক কি মনে করবে। আপনার চিঠি আমাদের সকলের ভালো লাগে, জীব, না জানি আপনাকে কেমন দেখতে। মনে হয় আপনি তরুণী, অতি স্মার্ট, অতি ফাসিন-দুরন্ত। আমাদের মালিক বৃদ্ধ মার্টিন মনে করেন আপনার সরস বক্তাবিত্তি শুধুও আপনি হস্ত খুব বেশী পড়াশোনা করা টাইপ। একটা কটো পাঠান না কেন? আপনার যদি ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে কৌতূহল থাকে তাহলে বলি তার বয়স প্রায় পনের দিকে—চমৎকার একটি আইরিশ মেয়েকে বিয়ে করেছেন—মনে হয় এটি ওর স্বাভাবিক স্ত্রী। আমার বাক্য দুটো (মেয়ে পাঁচ-ছেলে চার) ভ' হাতে স্বাক্ষর পেরেছে। জিম আর কিসমিস দিয়ে আমি সত্যি কৈ বানিয়ে দিয়েছি। আমার চিঠির জন্য অপরাধ নেবেন না। ফ্রাঙ্ককে জানাবেন না। আপনার যদি লন্ডন থেকে কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকে আমাদের লিখবেন, বাড়ির ঠিকানা চিঠির পিছনে দিলাম।'

এই পত্রের উত্তরে হেলেন জানালেন—  
প্রিয় সিসিলি...বৃদ্ধ মার্টিনের অদৃশ্য রঙ্গ। আমি অতি পড়াশোনার অবহেলা করা মেয়ে। কখনও ফ্রাঙ্ককে হাইনি। বই পড়ার অন্তত আগ্রহ আছে।...আমি বেচারী ফ্রাঙ্ককে ফেল জালাই—জানি আমার আবার উনি সিরিাস ডলারিতে গ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ গ্যান্ডি' কটো করার প্রচেষ্টার আমি। ও'র যদি আলস্যের হয় তাহলে আমিই দায়ী। আমাকে লন্ডনের কথা লিখবেন। কবে সে ফ্রাঙ্ককে কাছ পৌঁছানোর প্রতীক্ষা আছি।'

অনেক দিন পরে সেপ্টেম্বরে একটি চিঠি এল ফ্রাঙ্ক ডোয়েসের কাছ থেকে—  
ফ্রাঙ্ক লিখলেন—

'আমরা আপনার চাইদা জুলামি। এখন একটা অকসফোর্ড বুক অব ভার্স পেরেছি—ইন্ডিয়া পেপারে ছাপা চমৎকার সেকেন্ডহ্যান্ড বই। দাম দু'ডলার। নিউম্যানের পদ আইডিয়া সব এ ইউনিভার্সিটি আপনি একবার চেষ্টা-হিলেন। চাই নাকি? প্রথম সংস্করণ এক খণ্ড আমরা কিনেছি—দাম ছয় ডলার।'

পত্র প্রাপ্তি মাত্র উত্তর দিলেন হেলেন—  
খালসেল, 'কাস্ট' এডিশন চাই, সেই সঙ্গে অকসফোর্ড বুক অব ভার্স—টাকা পাঠালাম।'

ইতিমধ্যে হেলেনের দেওয়া উপহার লামগ্রায় জন্য প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে আরও একজন চিঠি দিলেন। তাঁর নাম বিল হাম-ফ্রিক, তিনিও মাক'স অ্যান্ড কোং-এর কর্মী : তিনি লিখলেন—'আমার জ্যাঠাইমা আমার সঙ্গে থাকেন, বয়স ৭৫। আমি যখন আপনার পাঠান মাসে ইত্যাদির টিন নিয়ে এলাম তখন তাঁর চোখের আঁশের ছাপ খাঁদ দেখতে। সত্যি, এত দূরে থেকেও আমাদের কথা মনে রাখেন, আশ্চর্য! যদি কখনও লন্ডন থেকে কোনো কিছু প্রয়োজন হয় জানাবেন।'

এরপর চিঠি দিলেন ফ্রাঙ্ক ডোয়েস ১ এপ্রিল তারিখে। তিনি লিখলেন—আপনি

বোধহয় আমাদের নীরবতার উদ্ভিন। আমি লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনী-গৃহে পুরাতন নই সংগ্রহের চেষ্টার বর্জ্য। বাড়িতে ফ্রাঙ্ক-ফ্রাঙ্ক খেতে বেরিয়ে পড়ি। রাতে গিয়ে শব্দে গড়ি। স্ত্রী বলেন খাবার কুটম। কিন্তু আপনার পাঠান জিনিস পাওয়ার পর আমার বদনাম কেটেছে। তিনি সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেছেন। আপনার করুণার প্রতিবেদনে আমরা সামান্য একটা উপহার পাঠাচ্ছি। মনে হয় আপনার পছন্দ হবে।'

এই সঙ্গে একটি কার্ড—'এলিজাবেথান প্যারিসেস' নামক গ্রন্থের সঙ্গে সাটা—৮৯, চেরারিং ক্রসের সবাই সক্রিয় ধন্যবাদসহ হেলেন হানফকে দিলেন। বলা বাহুল্য চিঠি-পত্রের সমগ্র অংশ দেওয়া সম্ভব নয়, সংক্ষেপিত সারাংশ মাত্র পাঠকদের অবগতির জন্য বর্তমানে দেওয়া প্রয়োজন তা এই নিবন্ধে দেওয়া হল।

আগামী সংখ্যায় শেষাংশটুকু পরিবেশিত হবে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যে একটি কাহিনী গড়ে উঠতে পারে এবং তার মধ্যে এক আশ্চর্য প্রেমের সম্পর্ক পাওয়া যায়—হেলেন হানফ লিখিত '৮৪, চেরারিং ক্রস রোড, নামক গ্রন্থে তার পরিচয় হুজুরে আছে।

84 CHARING CROSS ROAD: By HELENE HANFF : Published by ANDRE DEUTSCH LONDON — Price 30 Shilling.

—অনুব্রজ

## সাহিত্যের খবর

### চাকর আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মেলায় উত্তর দলের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন :  
শতবর্ষের আলোর শশাঙ্কমোহন সেন

গত ২০ ডিসেম্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতিসভা উদযাপিত হয়। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী'র অনূপস্থিতিতে সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক হরিদবনাথ রায়।

প্রধান বক্তা জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, 'শশাঙ্কমোহন সেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে একটি প্রারম্ভিক নাম। তাঁর রচিত কবিতা, পুস্তক, সমালোচনা ও নিবন্ধ গ্রন্থসমূহ বর্তমানে দৃশ্যপ্রাপ্য...অন্য রবীন্দ্রবর্গেও শশাঙ্কমোহন ছিলেন স্বতন্ত্র বর্গের কবি।' অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ

দত্ত, জ্যোতিপ্রসন্ন সেন, সনৎকুমার গুপ্ত। অধ্যাপক মদনমোহন কুমার পরিচয়ের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

### ভিরেতনামে বাংলা বর্ষের প্রতিবাদে

প্যারিসে তৈরি হয়েছিল ভিরেতনামে শান্তি চুক্তির খসড়া। সেই-সব্দন হবো হবো করেও শেষ পর্যন্ত তা হল না। উল্টে ভিরেতনামের আকাশে নতুন উদ্যমে শব্দ হল বর্তমানকালের প্রচণ্ডতম বিমান আক্রমণ। নিকসন প্রশাসন বিজেক শান্তি-কামী মানবদের আশা ও বাস্তব মানবিক আচার ভগ্ন করে অতৃপ্তবর্ষ নৃশংসতার নজির তৈরি করল। ভারি প্রতিবাদে মৃদু হরে উঠেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। গত ২৫ ডিসেম্বর তাঁরা এক বিহার মিছিল নিয়ে হান মার্কিন দুর্ভাবাসের সামনে। মিছিলে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষকুমার বোষ, সুভাষ মথো-পাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মঈনুজ্জামান, সিরাজ, তরুণ সামন্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় অমিত্যন্ত রায়চন্দ্র, পবিত্র মথো-

পরিষদ, গণেশ বসু, দীপেন রায়, আশিস সান্যাল, দেবেন্দ্র চক্রবর্তী এবং আরো জনেকে।

এক-আ-জি-র খবর।।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানিতে সব গ্রন্থমেলাকেই টেকা দিয়ে গেল এয়ারকার ২৪তম মেলাটি। ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় মোট ৫৮টি দেশের ৩,৬৮০টি প্রকাশক সংস্থা নেন অংশ। সবশেষ দেখানো হয় ২৫০,০০০ বই আর তার মধ্যে ৭৮,০০০টি গ্রন্থই একেবারে নতুন প্রকাশিত। বলাই বাহুল্য, ফ্রাঙ্কফুর্টে গ্রন্থমেলা খুচরো বই কেনা-বেচার জায়গা নয়। তবে সব আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় মতই ফ্রাঙ্কফুর্টে হয়েছিল ভবিষ্যতের ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তিকেন্দ্র।

## নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী ৪৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লক্ষ্মী-এ। ২৫ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় মেয়র ডঃ দৌলি গুপ্ত। তিনি বলেন বাংলা সাহিত্য জাতির মধ্যে শব্দ, স্বাধীনতা সংগ্রামের চৈতন্যই নয়—ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাবোধও জন্মারিত করেছে। এবং এজন্য দেশ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের কৃতজ্ঞাচিত্তে গমরণ করবে। তিনি আরো বলেন, দেশ-বাসীর কর্তমান চিন্তাধারায় যে বিপ্লব ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের অবদান।

সম্মেলন সভাপতি দেবেন্দ্র দাশ বলেন, পদার্থ পশ্চিম বছর পরে আবার আমরা সবাই, সব বাঙালি, এপার বাংলা ওপার বাংলার বাঙালি সবই একসঙ্গে এক সুরে এক সংবেদনে উচ্চারণ করতে পারছি নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি। তিনি বলেন, সাহিত্য হচ্ছে প্রাণের আগুন, ভস্ম-রাশি নয়।...সাহিত্য ও জীবন সমস্যা নিয়ে। এখানে অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ দরকার। সাহিত্য সম্মেলনে এই দুই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অধিকারীরা কোন কোন বছর আমাদের পুরোধা হয়েছেন। তাদের করছ আমার নিবেদন যে জীবনকে বাদ দিলে সাহিত্য বাঁচবে না।

দ্বিতীয় দিনে অভুলপ্রসাদ জন্ম সত্ত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি বলেন: অভুলপ্রসাদ সত্যি সত্যি অজুতনীর। রবীন্দ্র শৌর্যমণ্ডলের



অভুলপ্রসাদ সেন



শ্রীতুসারকান্তি ঘোষ

একজন হয়েও, রবীন্দ্র সংস্কৃতি সমুদ্রে অবগাহন করেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্যায় অভুলপ্রসাদ মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। পুরোপুরি বাঙালি থেকেও অন্যতম সেরা ভারতীয় বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। জীবনের বহুস্তর তংশ বাংলার বাইরে কাটলেও বাঙালিদের সৌরভের কোনো সীমা ছিল না তার। তিনি আরো বলেন, 'স্বরং রবীন্দ্রনাথ একবার অভুলপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'অতুল, তোমার গান অভুলপ্রসাদ।'

মাত্র তের বছর বয়সে যিনি এমন ভাবসঙ্গীত রচনা করতে পারেন—

'তোমারই উদ্যানে  
তোমারই বতনে

উঠিল কুসুম ফুটিয়া।' —তাই প্রতিভাকে কেই বা না স্বীকার করে পারে? সেই প্রতিভাধর মানবটি সর্বদা যাতে আমাদের স্মরণ থাকে, বিশেষ করে লক্ষ্মীয়ে এবং কলকাতায়, ভেমনভাবে তাঁর স্মারী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই করণীয়।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পরবর্তী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মৌদীনীপুরের তমলুকে। এবং নতুন বছরের জন্যে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুসারকান্তি ঘোষ আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত চন শ্রীশঙ্কর মদ্যোপাধ্যায়।

অমৃত ও হৃদয়ান্তর পুরস্কার

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে এ বছর 'অমৃত' পুরস্কার পান মানসী মদ্যোপাধ্যায় আর 'হৃদয়ান্তর' পুরস্কার লাভ করেন বিশিষ্ট হিন্দী লেখক অমৃতলাল নাগর। প্রতিটি পুরস্কারের রসদ মূল্য এক হাজার টাকা।

বাঙালি প্রজন্ম লেখক সম্মেলন

হাওড়ার সাহিত্য প্রকাশীর উদ্যোগে আগের ২৫ থেকে ২৮ জানুয়ারি, হাওড়ায়

গার্লস কলেজ প্রাপ্ত হইলেন তিনিদিনব্যাপী 'হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে গেলেন। বতনুর জানা যায়, হাওড়া জেলার অধিকাংশ লেখকই এই সম্মেলনে অংশ নেন। বলাইবাহাদুর সাহিত্য অধিবেশন হাওড়া চিত্রপ্রদর্শনী, হাওড়া জেলা ও অবশিষ্ট গ্রাম বাংলার পত্র-পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইল।

#### মহাগোন্দাভিয়ার খবর

মাত্র কিছুদিন আগে মহাগোন্দাভিয়ার প্রতিষ্ঠিত লেখক গ্রন্থোৎসবের পেন্সন নতুন সম্মান। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নগণীয় অবদানের জন্যই তাকে দেওয়া হয় মহাগোন্দা পুরস্কার। এটি পান তিনি তাঁর 'ভোট গল্প' সংকলন। দ্য হালিস গার্ডেন-এর জন্য।

দ্বিতীয় মহাবন্দর শব্দে হবার গায় কয়েক বছর আগে থেকে লিখতে শুরু করে। কৃষিকাজ। মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। লেখক হিসেবেই তিনি জনপ্রিয় নন, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অস্বরণীয়। মহাগোন্দাভিয়ার মণ্টেনেগ্রো রিপাবলিক দিয়ে অনেক নগোজ পুরস্কারটি। বলাই বাহাদুর এই পুরস্কার দেওয়া হয় মণ্টেনেগ্রো মহাগোন্দাভিয়ার কবি পিটার পেট্রোভিচ নগোজ-এর নামে।

#### বাংলাদেশের ছন্দ হতে

তিনিদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন বাংলাদেশ লেখক শিবির। গত ১১ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন হয় বাংলা একাডেমিতে। প্রথম দিনে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ নাজিম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আবদুল করিম মিয়া। প্রথম দিনটি বাস্তব রাসেল সম্পর্কিত আলোচনার ছিল সীমাবদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে সরদার ফজলুর করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, জনাব আহমদ চফা প্রমুখ লেখক, অধ্যাপকরা অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে 'সংস্কৃতির সংকেত' সম্পর্কে প্রগাঢ় পাঠ করেন বদরুদ্দিন উমর ও জনাব সাঈদুর রহমান। আলোচনার অংশ নেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মাহাবুবউল্লাহ, আতমফ হুয়া। এদিনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আহমদ শরীফ।

## নতুন বই

আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশৃঙ্খলতা, উত্থান প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)। তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। আট টাকা।

কবি-শ্রীতরুণ সান্যালের আর একটি নতুন পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশৃঙ্খলতা, উত্থান প্রসঙ্গ' এর মধ্যে সার্থক প্রবন্ধকার হিসেবে। ইনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে সমালোচনামূলক ও চিন্তাশীলতার পরিচয় রেখেছিলেন, বর্তমান গ্রন্থটি সেই সমস্ত প্রবন্ধ-ভাবনা ও গ্রন্থ সম্বন্ধেই জাতীয় বঙ্গার উল্লেখযোগ্য সংকলন।

ওদেশ এককালে এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, স্যেংস, ডে লুই, এডগার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পরে' গ্রন্থে, বর্তমান সেনগুপ্ত তাঁর 'কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে কিছু কবিতা, কাব্য বিষয় আলোচনা করেছেন। তরুণবাবু এ সবার অনুসারী, কিন্তু একেবারে আধুনিক কালের ঢেউলি কবি মানসিকতার নবাবিধ সমস্যা ও দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস তরুণবাবুর রচনার ফকীর বক্তব্যে উজ্জ্বল।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট তেরোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ 'দাক', 'আধুনিক বাংলা কবিতা, কবুর পাখি', 'সর্বশেষ প্রবন্ধ 'মার্কি' দ্য সাদ ও তাঁর উত্তরপুরুষ'। মহাবতী প্রবন্ধগুলির মধ্যে বাস্তবপ্রসঙ্গ—যেমন রিলকে, গিওর্গি লুকাচ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, তেমন আরও কবিদের বিভিন্ন আন্দোলনের কথা, তার সমস্যা, প্রতীক, বিশৃঙ্খলতা, জীবনকল্প, চিত্রকল্প, ডিকশন ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

তরুণবাবুর আলোচনা বিশেষগণ্যমী ও 'কমপ্যোজিট'। সমস্ত প্রবন্ধের শেষে 'নজম্ব মত' ও ভাবনাকে অত্যন্ত মত' সংগে কঠিন ভিত্তি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভাবতে আরম্ভ লাগে, তরুণবাবু একজন কবি হয়েও কথোপকথন, ক্রোধ, কবিচারিতা বিষয়-ভাবনা বিচারে 'সাব-জেরটিভ' আলোচনায় বীধা পড়েন নি। আলোচনায় যুক্তি-অপেক্ষা সেরে যুক্তি মননিতর, বৈজ্ঞানিক নিয়মসমূহ নিষ্ঠাক্ষণিত। অর্থাৎ প্রবন্ধগুলির ক্ষেত্রে ঘটিছে সোধ ও কৌশল-অধিক উপলব্ধির শৃঙ্খলতা। বোঝা গেছে, যখন তিনি সমালোচনা করছেন, তখন তিনি কবি নন, কবি-আত্মা অস্তিত্ব উপবিত্ত অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন এক ভিজ্জাল সমালোচক।

প্রথম প্রবন্ধ প্রমাণ করে, কবি তরুণ সান্যাল সমালোচক হিসেবে কতিপয় কবি চেন। এই বিষয়ে তাঁর পরিচয় বক্তব্য কবি সমালোচক সত্যিকার অসক বোঝায়। সে-কিছই মিলকীর দায়িত্ব। রচনার পদ্ধতিটি হবে, হয় বিপ্লবী রোমান্টিকতা, নইলে বাস্তবতা। এবং সে বাস্তবতাও হবে এ যুগে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। তরুণবাবুর এই ভাবনা জনান প্রবন্ধে চারি-বারি মত সাজায়। বোঝা যায়, তরুণবাবু দাক-সরী দর্শনে বিশ্বাসী এবং একজন স্বনিষ্ঠ অনুসারীও। বিরোধীরা তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতার মতর হতে পারেন, কিন্তু তরুণবাবুর শাগিত ব্যক্তি ও বিপুল অধরনজাত সমীকরণের ফলস্বরূপ অভিজ্ঞতার কাছে নীরব হতে বাধ্য। কবিতা ও বিপ্লবের মধ্যকার সমস্যা সম্বন্ধেও

তরুণবাবু বিশেষভাবে চিন্তিত এবং এ চিন্তা স্বভাবী পাঠকরূপেই। বিজ্ঞানের ভাষা ও কবিতার ভাষা সংক্রান্ত মতব্যটি বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য। কবি হিসেবে তিনি আধুনিক মানুষ, জীবন, সমাজ ও সভ্যতার মূল কথাই বলেছেন—'বিজ্ঞান ও কবিতা, বিজ্ঞানশিক্ষা ও মানবতত্ত্ব—উভয় বিদ্যার একায় সামঞ্জস্যের মধ্যেই আছে আগামী কালের মানুষের সংস্কৃতি'। (কমোদ শব্দ)।

তরুণবাবুর কয়েকটি মন্তব্য তাঁর মতের সার্মগ্রিকতা স্পষ্ট করে। যেমন—'ভাষাই এক অর্থে কবিতা—কেননা তা চিত্র-রূপ, রূপক ও উৎপ্রেক্ষাময়'। 'কিন্তু বিচার আয়ি বিপক্ষে নই, কিন্তু আয়ি অ-বিশুদ্ধ কবিভার পক্ষে প্রবলভাবে। আসলে কোনো কবিতা আন্দোলনই তো নিরর্থক নহ'। তরুণবাবুর কোন কোন মন্তব্য 'নেগেশন' থেকে 'অ্যাকশনে' মধ্য দিয়ে তাঁর মূল চিন্তাপন্থি, অতীত কবিতা সম্পর্কে স্পষ্ট করায়। যেমন, 'এমন কি নিজেকে বোধগম্য ও বোধ্য করে তোলায় প্রয়োজনেও কবিকে কি বিপ্লবীর কৃমিকা গ্রহণ থেকে বিরত করা যায়? 'নৈবৃত্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, ও আধুনিকতা', 'দুরূহ শব্দের সোচ্চনার', 'কাব্যনাট্য প্রসঙ্গ', 'কবিব্যক্তি, কবিচারিতা ও কবি' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখকের চিন্তার মৌলিকতার দাবী রাখে। গিওর্গি লুকাচের প্রসঙ্গটি বোঝা করে তরুণবাবু আধুনিক পাঠকের বাস্তবতা সম্পর্কিত মূল ভাবনার সূত্র, সকল খাদ্য পরিবেশন করেছেন বলা যায়।

তরুণবাবুর সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের কবিতা রচনার গভীর-প্রোথিত অভিজ্ঞতা, বিশদ



সাহিত্যের বিপুল শিকার আশ্রয় আত্মী-  
কর্তব্যের প্রতি-প্রাণ জানিয়েই বলি, বেশ  
কিছু আলোচনার এদেশীয় কবি-মনসীবার  
চিন্তা-ভাবনা প্রসঙ্গত আনা উচিত ছিল।  
শুধু বিদেশী কবি-কাক প্রসঙ্গ কোথায়  
বেন অনুসন্ধান? পাঠকদের অন্তর্ভুক্ত রাখি।  
শ্রীমতী, আলোচনার বার বার একটি  
বাঁজা শব্দ অঁকার বা প্রয়োগ করে তার  
ইয়োজী প্রতিশব্দ ব্যবহার গদ্যকে ক্রান্তিকর  
করেছে কোথাও কোথাও।

সম্প্রদেয় ভর-গরুর গদ্য প্রসঙ্গে  
একটা কথা বলতে হয়, তিনি আলোচনার  
গদ্যে কোথাও অথবা তার নিম্নে আসেন নি।  
সহজ সরল গদ্যে দূর-হ কিব্বের মধ্যে  
নিবিষ্ট হতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হই।

**বিশ্বকর্ম্ম আরক গ্রন্থ** । সম্পাদনা কালীপদ  
বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলাভূষণ গুপ্ত।  
বারাসত-পশ্চিমা সম্মিলনী। দাম চার  
টাকা।

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমকে বলেছিলেন,  
দি গ্রেটেস্ট ম্যান অব দি নাইনটিন্থ  
সেণ্টুরী। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের  
উনিশ শতকের শ্রীমতীরাধে একটি বিশাল  
স্বতন্ত্র-বার-মুখ্য এতটুকু ভ্রমণ ধরে নি  
অন্তঃ। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমকে  
সুস্মরণ রেখে গুরুতর সম্মানীয় নেপো-  
লিয়ানের স্ফল্যবান উর্ভিচি স্মরণ করে বলা  
কর-‘দ্বিতীয় ইজ.এ কম্প্লিট ম্যান’। এই  
অনুধারণ প্রতিভার বিশ্লেষণ হয়েছে বাংলা  
সাহিত্যে নান্যভাবে, এখনো চলছে সময়ে।  
এই রকম আলোচনা ধারায় একটি মাল্যবান  
সংকলন হল ‘বিশ্বকর্ম্ম আরক গ্রন্থটি’।  
সাহিত্যের সাহিত্যের লেখক নন অথচ  
রচিত্রাঙ্গী, বিশেষ বুদ্ধিজীবী কয়েকজনের  
সাম্যক রচনার সমগ্র এই আরক গ্রন্থটি  
বঙ্কিম সম্পর্কে এক নতুন রসিক নিক্ষেপ  
করে। অমলাভূষণ গুপ্তের বিজ্ঞান সাহিত্যে  
বঙ্কিম এবং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
আমায়-বালাআমায় ও বঙ্কিম-হৃদয় সম্প্রদায়-  
দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ,  
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারালক্ষর বন্দ্যো-  
পাধ্যায়ের বঙ্কিম সম্পর্কিত রচনাংশ উদ্ধৃত  
হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। কবিতা লিখেছেন  
রবীন্দ্রনাথ রায় ও প্রবন্ধকুমার সত্যেন্দ্রনাথ।  
গ্রন্থটি গবেষক ছাত্র ও সহস্র পাঠকের  
কাছে অত্যন্ত উপযোগী।

**সংকলন বই ও বর্ণনামূলক গ্রন্থ**। স্বামী  
প্রমোদক সর্বস্বতী। গ্রন্থ বাংলা সারস্বত  
আশ্রম, পূর্বপল্লী, বধমান। দাম টাকা  
পঞ্চাশ পয়সা।

স্বামী প্রমোদকদের গুরু-শিষ্য সংবাদ  
নাম প্রবন্ধ জামা দপণ প্রকাশিত হয়েছিল  
ভৈরব পুটি ও চাঁদলিঙ্গ জালে। সেই  
প্রবন্ধই পরিত্যক্ত হিসেবে বর্তমান গ্রন্থটি  
বর্তিত হয়েছে। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের  
কিছু কিছু অংশ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হই

গ্রন্থের গোষ্ঠাক্ষর করেছে। কল্পিত বর্ণনায়  
ধরে অবশেষে মোকদ্দমত অর্থ সম্বন্ধের  
চৈতন্যবোধের কারণেই এই গ্রন্থটির রচনা-  
উদ্দেশ্য নিহিত। ‘প্রাচীন’ অংশ দিয়ে গুরু  
ও মোট পনেরোটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি শেষ  
হয়েছে। লেখকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী  
সহজ, সরল, যতবাদ বিশ্লেষণ সহনশীলতা  
সম্পন্ন ও সহজবোধ্য। ধর্ম-রস-  
পিঙ্গলদের কাছে এ গ্রন্থ অমূল্য।

**অমল মধ্যাহ্ন কিরি (কব্য সংকলন)**—বাল  
ভট্টাচার্য। কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, ১০১২,  
ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা-৩২।  
তিন টাকা।

বাল ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় সহজ  
কবিপ্রাণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আশা,  
নিরাশা, ভর-ভরহীনতা, ভালবাসা, বিবাদ-  
এ সমস্ত কবির অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে  
স্পর্শ করেই কবির উদ্ভঙ্গ বর্ণনায়। পরি-  
চায়ক হয়ে উঠেছে এ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে।  
কবি বলেছেন—‘কত আশা বৃক্ষের অভঙ্গে/  
অন্তহীন সাগরের মত’। বলেছেন—  
‘কিছুতেই পাবি না—/রক্তের ভেতর থেকে  
সমস্ত স্মৃতি রোধ কোড এক লহমার মুখে  
ফেলতে’। আলোচ্য কবি জীবনকে ভাল-  
বাসেন, তাই বলতে পেরেছেন অবলীলার—  
বন্ধু ওগো তোমার জন্য অগাধ আয়োজন।  
বাল ভট্টাচার্য যেমন ছন্দ মিলিয়ে কবিতা  
লিখেছেন, আবার গদ্যকবিতাও বাদ দেননি।  
এবং ছন্দের প্রত্যেক বিভাগেই কবির কান  
প্রথর ও সত্যক উদ্ভব। আধুনিক ইমেজ  
ব্যবহার কবিকে অনেকটা আত্মীয় মনে করায়  
স্বভাবী। কব্যপাঠকদের কাছে। নানা  
কবিতাটি কবিকর্ম্মতার পরিচায়ক। প্রচল  
সম্পন্ন।

**একদশী ভাগবত (ধর্মগ্রন্থ)**—শ্রীমৎ  
প্রাণকেশর গোস্বামী। শ্রীশ্রীগোরাধা  
মন্দির, ১১২১ ক্যানন স্ট্রীট,  
কলকাতা-৪৮। পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীযুত প্রাণকেশর  
গোস্বামী একদশে বাধ্যত ভগবতের তাৎপর্ষ্য  
বিশ্লেষণ করেছেন একান্তিক নিষ্ঠা-  
সহকারে। এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাক্ষ্যও  
উল্লেখযোগ্য। অনুবাদের ভাষা সহজ, সরল।  
ভূমিকাটিও মূল্যবান। ধর্মপ্রাণ পাঠকের  
ভালো লাগবে।

### সংকলন ও পত্রপত্রিকা

**সারক** : সম্পাদক রণধীর রায়। প্রকাশ  
স্থান উল্লেখ নেই। দাম এক টাকা।

সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক  
পত্রিকাটি মূল্য ব্যাপারে কিছুটা প্রথা-  
বিরোধী। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে  
বাঁটা সম্পর্কে। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে  
সাধারণ নাট্যশালায় শতবর্ষ উপলক্ষে।  
সম্পাদকের রচিত্রাঙ্গী বিশেষ মানসিকতার  
পরিচয় স্পষ্ট।

**অমল (জীবনানন্দ সংগ্রহ)**—কালীপদ  
বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য। ১১১৩  
লক্ষী দত্ত লেন, কলকাতা-৩।  
তিন টাকা।

প্রমোদক ‘অমল’টির বিশেষ সংকলন  
জীবনানন্দ সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।  
ইতিপূর্বে ‘এলিট’ ‘অবনীন্দ্র’ ও ‘মানিক’  
সংখ্যা প্রকাশ করে ‘অমল’টির স্বত একটি  
প্রতিষ্ঠিত রচিত্রাঙ্গী প্রমোদক ‘লিটল  
ম্যাগাজিনের’ সম্পাদক সহস্র পাঠকের  
দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। আলোচ্য  
সংখ্যাটি আমাদের মতে আরও উন্নতমানের  
এবং এর লেখক, কবি ও সম্পাদকের  
দুঃসাহসিক পরিগ্রহী সত্যতা ও অন্তরঙ্গতা  
তার পরিচয় বহন করেছে। সাধারণভাবে  
কবি জীবনানন্দের উপর সৃষ্টিমিত্ত প্রবন্ধ  
লিখেছেন সবশ্রী অলোক রায়, সুসুমার  
ঘোষ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুধীন মিত্র।  
জীবনানন্দের প্রতিটি কবিতাপ্রাণের উপর  
শ্রদ্ধা আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ  
ও তরুণ কয়েকজন কবি—সবশ্রী অরুণ  
ভট্টাচার্য, অমিত্য দাশগুপ্ত, বীত্যাখ্য  
ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কু পাণ্ডা, বীরেন্দ্রনাথ  
ভট্টাচার্য, মঞ্জুভা মিত্র ও দীননাথ সেন।  
ববি জীবনানন্দের ছোটগল্প এক বিস্ময়।  
সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত  
তরুণ গল্পকার শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত। জীবনা-  
নন্দকে নিবেদিত কয়েকটি কাব্য লিখেছেন  
সবশ্রী সত্যিকান্ত গদ্য, দীপেন বন্দ্যো-  
পাধ্যায় ইত্যাদি। জীবনানন্দ-জীবনী ও  
কবি-সম্পর্কিত রচনাপত্র লিখেছেন বখ-  
রমে শ্রীপ্রভাতকুমার দাশ ও শ্রীস্বপন দাস-  
শিকারী। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ সুরেন্দ্রসম্রাট  
এবং এই বিশেষ সংখ্যাটি সর্বস্বতের

গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রহের যোগ্য।  
ইতিহাস ও সংস্কৃতি : সম্পাদকমণ্ডলী  
সম্পাদিত। মেদিনীপুর ইতিহাস ও  
সংস্কৃতি পরিষদ। ডাকবাংলো রোড,  
মেদিনীপুর। দু টাকা।

বেসরকারী উদ্যোগে মেদিনীপুরের  
প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ,  
খাদ্যধারণ্য, লৌকিক সংস্কার, দেবদেবী,  
শিখ, সাহিত্য, লোকসংগীত প্রভৃতি বিষয়ে  
অনুসন্ধানের জন্য স্থাপিত হয়েছে  
মেদিনীপুরে জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি  
পরিষদ। এই সংকলনে প্রবন্ধগুলি সেই  
অনুসন্ধানের ফল। লিখেছেন ধীরাজ  
ভট্টাচার্য, বলাভূষণ সেনাপতি, প্রবীণ  
চৌধুরী, দীপাল চৌধুরী, সুহৃৎকুমার  
ভৌমিক (মেদিনীপুরের গ্রাম-নাম ও প্রাণ-  
তিহাসিক জনবসতি), সত্যেন বড়গুপ্তী,  
সুদর্শন সামন্ত (আঞ্চলিক ইতিহাস ও  
ভাষালিঙ্গ), নিশিকান্ত মাইতি, প্রমোদ  
মাইতি, বিনোদশঙ্কর দাস, গোপালানন্দ  
মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ বসু (মুসলমান আমলে  
মেদিনীপুর), প্রবাল রায়, তারালিঙ্গ ঘোষ  
পাধ্যায়, কাননবিহারী গোস্বামী, এবং  
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সংকলনটি  
কৌতুহলী পাঠকের কাছে মূল্যবান মনে  
হবে।

# বাংলাদেশের গ্রন্থ-মেলায়

## লোকনাথ ভট্টাচার্য

বাংলা একাডেমীর প্রাপণের এক দিকে সামিগ্রী, যেখানে সেমিনার চলছে—অন্য দিকে রাস্তারান্তি পাঁজরে-ওঠা ছোট-বড় শিশুদের মতন সারি-সারি বইয়ের দোকান, যেখানে গ্রন্থ-মেলা বসছে। আরো একটি প্রাপণ একাডেমীর সামনেই, মাঝখানে বিরাট বকের বেদী, সেখানে কবিগানের আসরের আয়োজন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সেমিনার থেকে সব বেরিয়েছি—সেদিন আলোচ্য ছিল পুস্তক-প্রকাশন ও বিতরণের নানা সমস্যা—ইহা ছিল, প্রাপণের গুদিকে গ্রন্থ-মেলায় যাব, আমাদের ভারতের স্টলে ভিড় তৈরীনের নতুন কোনো সমস্যা জাগল কি জাগল না দেখব। এমন সময় দুটি মেয়ে কোথেকে হঠাৎ ছাটখর, বলে ‘আপা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের— বাবেন জয়নাল আবেদীনের বাড়ী?’

যাব আবার না! জয়নাল আবেদীনের সপো দেখা করার চেষ্টা করছি ঢাকার পৌছানোর প্রথম দিন হতে—অতএব সন্ধ্যার সমস্ত প্রোগ্রাম নিম্নে বাতিল হয়ে গেল, এমনকি কী প্রোগ্রাম আছে-না-আছে আর মানই পড়ল না, মেয়ে দুটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তার আগে যেটুকু বলবার, তা হল মেয়ে দুটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় সেদিনই হয়েছে, সকালে, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, যেখানে গ্রন্থ-মেলা উপলক্ষে আগত ও বাংলাদেশ সরকারের বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক রায়কে সম্মতিক সম্বন্ধনা জানানো হয়। এবং সবাই যৈ-প্রাণের স্পর্শ, চোখের চাওয়া, তাঁতের হাসি, তার প্রভাবে যেমন আমরা আমাদের সপো এখানে ইতি-গর্ভেই তখনো, তেমনই এ সকালের অতটুকু আসাপই মেয়ে দুটিকে কেমন-মন আপন করে নিত পেরেছি। তার উপর জয়নাল আবেদীনের ম্যাকিক নামটি তাদের মধ্যে সেই সন্ধ্যায়, উচ্চবাচ্যের প্রশ্ন আর কোথায়!

‘গাড়ী কিন্তু নেই’, চোখ ঘুরিয়ে হেসে মেয়ে দুটির একজন জানালো।

ঢাকার বামবাহন একটা বিরাট সমস্যা, তাই গাড়ী সম্বন্ধে এ বিশেষ উত্তী। তাছাড়া ওদেরই গাড়ী করে সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হোটেল ফিরেছি—মেয়ে দুটির আপা হলেন মুহম্মদ মনসুরশিন, বাড়ল গানের সংকলনে সাগা জীবন কাটিয়েছেন, শব্দ পীতাই নন, বিলাস, রসিক ভাষা, নিজেই রাগণ করেন।

‘আমি রিকসা করে বেতে হবে’, একটু বেন-জানকির ভাবে অন্য মেয়েটি জানালো।

আমি তখন জানতে চাইলাম, কত দূর—অর্থাৎ পায়ে ছেটে সে-দূরটা পড়ি দেওয়া যায় কিনা। উত্তরে জানলাম দূর যদিও তেমন কিছুই নয় এবং ছেটে অস্বস্তিই হাজার হলে, তবু কেহেহু হাজার হলেও আমি অতিথি মানুষ এবং হাতে সন্ধ্যাও তত নেই—কারণ কে জানে আবেদী সাহেবের অন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা সম্ভায়—তাই শেষ পর্যন্ত দূর-দূর করে দুটি সাইকেল-রিকসাই নেওয়া হল, একটিতে আমি, অন্যটিতে ওরা দুজন। বলা হল আমার রিকসাটি আগে-অগে যাবে, ওদেরটি আসবে পিছন-পিছন। যখন জানতে চাইলাম কেন—কেহেহু আমি রাস্তা চিনি না, আমারই ওদের পিছন-পিছন আসাটা সমীচীন টেকেছিল—তখন মেয়ে দুটির আমার সেই প্রাণ-ছোঁওয়া হাসি, বলে ‘আপনাকে নজরে রাখার দরকার আছে’, এবং পরেই আমার রিকসা-চালকটিকে নির্দেশ দেয় সে যেন হুস-হুস করে পি না চালিয়ে একটু আস্তে-আস্তে যাব এবং জোনাকি সিনেমা সামনে এসে পূরন নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

অতএব আমার বেশ ভার দেওয়া হচ্ছে, দেখা-শোনা করা হচ্ছে, আমি জগৎজনেরই হাতে—এই জ্ঞান পরিচয় হওয়ারই অবকাশ। কিন্তু মিনিট দুয়েক আগে আরেকটা ছোট ঘটনাও ঘটেছে।

পারলে যদি কোনো বন্ধু-বান্ধবের গাড়ী পাওয়া যায়, বা যে-কোনো গাড়ী, যা আমাদের নিয়ে বেতে পার আবেদী সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত, অর্থাৎ রিকসা নেওয়ার অধাবাকডাটাকে যদি কোনো রকমে এড়ানো যায়—প্রথমে সেই চেষ্টাই চর্চাছিল। এবং গাড়ী আসছে-যাচ্ছে প্রচুরও, মেলা দেখতে কেউ এসেন, বা মেলায় কাউকে নামিয়ে কোনো গাড়ী অন্য উদ্দেশ্যে হল, এরকম আশঙ্কায়ই ঘটছে—দুটো-একটা ডানও এসে থামছে, হয় সেখানে থামতে কিছুক্ষণ, নয়তো একটু দাঁড়িয়ে অন্য পথ নিতে। এবং মেয়ে দুটির তখন কি ছোট্ট-ছোট্ট একটার পর একটা গাড়ীর চালককে জিজ্ঞাস করছে ওদিকে একবার কোঁ করে ঘুরে আসতে পারবে কিনা—আমাদের নামিয়ে বাংলা একাডেমীতে আবার ফিরে আসতে তাদের সবসম্ম পনের মিনিটও লাগবে না, এমন হুঁতরও অবতারণা করছে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, কোনো গাড়ীর পক্ষেই সম্ভব হল না আমাদের এই রাস্তাটা পেরিয়ে দিতে—অগত্যা সাইকেল-

রিক্সা নেওয়া হাঙ্গ উপায় রইল না। কিন্তু এ যখন হেলোহুটি করছে ওরা, এ-গাড়ী থেকে এ-গাড়ীর চালককে রাশী কমানোর চেষ্টা করছে, তখন প্রতিবারই ওদের হুঁতর একটি কন উড়া-হাওয়ার অস্বস্তি কমে ততলা আসছে—কথাটি হল ‘করেনার’ অর্থাৎ কিলশী। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যেটা ওরা গাড়ীর চালকদের মোকাফির চেষ্টা করছে তা হল আমি একজন ‘করেনার’ এক আমাকে নিয়ে ওরা একটা জায়গার বেতে চায়, হাতে সমস্ত ‘কম, অতএব এই সব নানান-কিছু বিবেচনা করে চালকদের কেউ কি সুর হতে আমাদের সেই জায়গাটার পেরিয়ে যেকেন? এবং আশ্চর্য যেটা, তা হল এই যে, ‘করেনার’ কথাটা উচ্চারণ করছে মেয়ে দুটি, তখন মধ্যে কিছু-আমার প্রতি কৈনো-অস্বস্তি বা বিবেকের ভাব একটুই নেই, কর-কথাটা স্বভাবিকই, যেভাবে আসছে তেমন কিছু না ভেবেই। বেন এমন একটা সত্য এটা, যেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হুঁত হতে হুঁতপ্তরে। হুঁতের মধ্যে আমার মনে পড়ে যায় আসার পূর্ব দক্ষম কপরে থামার দুপেই সমস্তটুকু, একটার পর একটা ফর্ম ভর্তি করা, এটা-ওটা নিরর্থক-কানুন পালনের পিছনে উদ্দেশ্যে ছোট্ট-বেন যৈ-সব দেশ বৈ-দূরের, বা সীতাই সব ‘অর্থ’ বিদেশ, সেখানেও পাড়ি দেওয়া এবং চেয়ে সোজা। অথবা উল্টোভাবেও জিনিষটাবো চলে—ভাবা চল, এ ‘করেনার’ কথাটা কতে এখানে শুনতে হয় এবং সেটা শুনতে বাতে চর্চাকত না হতে হয়, তার প্রস্তুতি-পর্ব শূন্য হয় সেই দক্ষম বিধান-কপরেই। অর্থাৎ, দক্ষমে ঢাকার ক্রিয়ানে, পি ফেলবার হাফ-পটটি যখন পাই অত নিম্ন কানুনের মধ্য দিয়ে গিয়েই, তখন ‘করেন’ ভিন্ন এ-চেষ্টার আম কি কিছু হওয়া সম্ভব?

তবু, কেন জানি না, কমুটা সেই সন্ধ্যায় মনে শব্দ চর্চাকতই হই ‘নি, এক ষমিদেশা আদাতও পাই বুকের কোণ-গহন কোণে—কথাটা স্বভাব উচ্চারণ হয়েছিল, ততবারই কে হাতুড়ি পিটিয়েই শব্দ কোমল এক জায়গায়। যদিও শব্দ কটে কলি নি কিছুই মনে-মনে দক্ষমকবার আওড়াই এক দৃষ্টান্তপ্রত কোমলকর ভাবে, ‘আমি যদি ভোর করেনার’ হই তো, ভোর আপনজন কে রে?’ ততক্ষণ অবশ্য রিক্সার উঠে কসোঁ, চলতে শুরুর করোঁই।

সংক্ষেপে বলা চলে, এই সাক্ষ্য ঘটনার বিবরণে বিবৃত হয়েছে একজন ‘করেনার’ আসার উপলক্ষ এবং সেই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ঢাকার কয়েকদিন কাটাওয়ার সাময়িক অভিজ্ঞতা।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উৎসব উপলক্ষ ঢাকার একটি গ্রন্থ-মেলায়, আয়োজন করা হয়েছে, ২০শ থেকে ২৭শ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই মেলায় কোণকানের জন্য আমি এসেছি নাশনাল বুক স্টোরের প্রতিনিধি হয়ে ও বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের আর্থান্ত অতিথি হিউতবে। সম্মতিক অধ্যাপক রায়ও এসেছেন একই দিনে

সাদা গিঁয়ে—বেথানে তিনি গেছেন, সোমিনারে বা বাংলা একাডেমীতে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বত্র যে-আশ্চর্য সম্বন্ধনা পেয়েছেন, তা প্রমাণ করে তার আজীবন সাহিত্য-কীর্তির অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ তো বটেই, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক অনস্বীকার্য ঐক্যও। সেই ঐক্যের সুরটি এপাশ ও ওপারের বাংলার বহু বিভিন্নতাগুলিকে মাঝে-মাঝে কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলে, খেই ভ্রমশই হারিয়ে যায়।

আরো এসেছেন প্রকাশকদের একটি অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল—কেউ বোসাই থেকে, কেউ-বা দিল্লী থেকেও। কলকাতা থেকে এসেছেন সুপ্রিয় সরকার—দু দিনের জন্য জয়ন্ত বসুও এসে ফিরে গেছেন। অশোক ভট্টাচার্যকেও কিছুক্ষণের জন্য দেখি। প্রকাশকের এই প্রতিনিধি-দল তাঁদের নিজস্বের ও ভারতে অনগ্র প্রকাশিত কিছু কিছু বই এনেছেন প্রদর্শনীর জন্য—ভারত ভিন্ন অন্য বিদেশী স্টল যা আছে, তাও কোনটি রাশিয়ার, কোনটি আমেরিকার, বা বাল্গেরিয়ার বা জাপানের বা বটেনের বা পূর্ব জার্মানীর। বাকী স্টলগুলি বাংলা-দেশের। মেলা বর্তমান চলছে, তার প্রতিদিনই সোমিনারও বসছে একাডেমী প্রাঙ্গণের অন্য পাশে—আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রিন লেখকের স্বাধীনতা, কোনদিন বা গ্রন্থ-প্রকাশন ও বিতরণ, কোনদিন বা পাঠ্যভ্যাস উন্নয়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধান বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন অমলাশঙ্কর রায়, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান, আবদুল গণি হাজারী, কে এম হাকীমিয়া, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহিম, সরদার জয়েনুন্নাহীন — নামের তালিকা অনায়াসে দীর্ঘতর করা চলে। এ-প্রসঙ্গে যেটি উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল এই সব আলোচনায় প্রোত্বেশের এত ঔৎসুক্য ভাষ্যতর কোন প্রদেশেই আয়োজিত অনুরূপ সভা-টভার সম্ভাষণ দেখি নি। সোমিনার বসন্ত বেলা তিনটে থেকে, চলত প্রতিদিন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছটা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত—এবং প্রতিদিনই অন্তত শ'বদেড়েক লোক তো সোমিনারে সব সময়েই রয়েছে। এব কারণ অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা যখন করছি, আমাদেরই দলের এর-ওর সঙ্গে এই নিয়ে

কথা বলছি, তখন কেউ-কেউ ভেবেছেন ঢাকা শহরে আমোদ-প্রমোদের অবকাশ নিত্যন্ত কম, বসন্তে সামান্য কিছুই যদি কোথাও ঘটে, হুজুতে সেখানে লোক বাবেই—অর্থাৎ এই গ্রন্থ-মেলাটা শহরের পক্ষে থাকে বলে একটা ঘটনা, এখানে এমন অনেক লোক আসছে যারা আমোদ-প্রমোদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের কোনো অবকাশ অন্য পক্ষে পেলে সেখানেও সমান তৎপরতার হুঁত। আরো সহজে বলতে গেলে, সোমিনারে রোজই যে-ভিড় দেখছি, তার মধ্যে অনেকই আছেন যারা হুজুগ দেখতে এসেছেন—অর্থাৎ, কারুর কারুর মতে, তেমন একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে।

আমার কিন্তু এটা মনে হয় নি, কারণ সোমিনারে শব্দ বহুতাই হচ্ছে না, আলোচনাও চলছে, এবং উপস্থিত প্রোত্বেশ সেই আলোচনা মন দিয়ে যে শুনছে—এবং তাতে অংশ গ্রহণও করছে—সেটা সহজেই পরিষ্কার ঠেকে।

এরই মধ্যে কখন হচ্ছে ছড়া-পাঠ, কখন বা কাজী সবাসচাঁদী কিছু আবৃত্তি করে গেলেন—কখন আবাস-সম্মার দিকে চলতির প্রদর্শনের আয়োজনও রয়েছে, সে-সব ছবি দেখাচ্ছেন রাশিয়া বা ভারত বা জাপান বা বটেন বা পূর্ব জার্মানী বা এণ্ট্রেলিয়া।

অবশ্য ভিড়ের কথা যদি বলি, আসল লোক-সমাগম দেখছি বইয়ের স্টলগুলিতে, বিশেষত ভারতীয় স্টলে যা ভিড় যোজাই সামলাতে হচ্ছে, তা আমাদের সকল প্রত্যাশার অতীত। প্রথম দিন যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র-প্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী মেলাটির উদ্‌ঘাটন করলেন, তখন থেকে আজ যখন মেলা শেষ হয়-হয়, ভিড়ের জোয়ার ঢলেছে সমানই। বিশেষত প্রথম কয়েক দিন আমরা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম, শেষে অঁচরই ভারতীয় স্টলে তিনটির জায়গায় ছটি বেঞ্চাসেবক মোতাস্থনের জন্য বাংলা-দেশের কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হল—যাতে অঘটন কিছু না ঘটে, তার জন্য দু-একটি অন্য ব্যবস্থাও নিতে হয়। 'অঘটন' কথাটা হচ্ছে কয়েকই কাবহার করলাম, কারণ নীতাই অন্তত প্রথম দিন আমাদের স্টলটি ভেঙে যাওয়ার ভয় ছিল। শত-শত ছাত্র হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঢেকার চেষ্টা করছে, কিছুতেই কোনো লাইন মানবে না, সকলেরই আকুল প্রশ্ন : 'এ-সব বই বিক্রী হচ্ছে তো? আমরা কিনতে পারব ততো?' অঁচ ভারত থেকে বই এসেছে শব্দ প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়—এবং তা শুনলে উদ্ভ্রা-প্রকাশ এক বিরাট ছাত্রগোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনেক করে বোঝাতে হয়, একই কথা বার বার বলতে বসতে মনের হাড়ে বাধ্য ধরে যায়, শেষে দ্বিতীয় দিন আগে-ভাগে মেলা-প্রাঙ্গণ এসেই আমাদের বক্তব্যটিকে লিখে পোস্টারের আকারে টাঙিয়ে দিই—যেমন, 'এ-সব বই প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রী এখানে হচ্ছে না—কাগজপত্র রয়েছে, তাতে আপনার ইচ্ছিত পুস্তকের তালিকা আপনার নাম-ধামসহ লিখুন, বই সরবরাহের ব্যবস্থা

চেষ্টা করা হবে দারিদ্রপ্রাপ্ত ব্যবসারীর মাধ্যমে।'

ভারত হতে আগত সকল রকম বই-এর চাহিদা এখানে ভীষণ বললে অত্যাতি হবে না—চাহিদা বিশেষত পাঠ্যপুস্তকের, এবং সে-চাহিদার আকার যে কী বিরাট, তার সামান্য আভাস পেয়েই আমরা কিংকর্তব্য-বিমুঢ় বনে গেছি। কারণ দুই দেশের মধ্যে বই-এর জলধেন সূত্বভাবে এখানে ঢালু হয় নি, পঞ্চ বাধা-বিঘ্ন নিত্যন্ত কম নয়—এবং সেই কথা-বিঘ্নগুলি দূর করার কষ্টতা আছে দুই দেশের সরকারেরই, আমাদের মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিবিশেষের নয়। আমাদের খুব ছোট্টা ছোট্টা চলছে তাই এখানে-ওখানে আজ পেশ করতে বা কখনো স্থানীয় পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক-মহলে ধর্গা দিতে—এক কথায়, নানান তাগিদে সারা দিন ধরে সারা শহরে চরিক-বাজী খেতে।

আর হ্যাঁ, একটা ছোট্ট জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, যেটা শুনলে ভারতে অনেকের—বিশেষত কবি-মহলে কারুর-কারুর তো বটেই—ভালো লাগা উচিত। সোমিনারে একদিন শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য-সভা হওয়ার কথা ছিল—সেটি হল না। কেন? উত্তর শামসুর বললেন, ছোট-বড় অপ্রকাশিত সব কবিতা তাতে কবিতা পড়তে চান, কেউ-কেউ নাকি ভয় পাবেন দেখান যে, তাঁদের পড়ার সুযোগ না দিলে সভা ভুল্লুর করে দেবেন।

যাই হোক, এই অল্প কদিন ঢাকায় বিরাট চরিকবাজী খাচ্ছি। তবু ডায়েতে ভালো লাগে, এরই মধ্যে সময় করে কখনো নির্বণ্ট হয়ে বসতে পেয়েছি শামসুর রহমান, আল মাহমুদ ও অন্যান্য কবিদের সান্নিধ্যে, কখনো থিয়েটার পরিচালক সম্পাদক রামেশ্বর, মজুমদার এসেছেন নাট্যোৎসাহীদের নিয়ে কখনো ভাষণ মুনীরের মাধ্যমে ইদানীংকার তরুণদের কিছু সাম্প্রতিক অভিনিবেশ ও নৈরাশ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি।

অবশ্য গিয়েছি একের-পর-এক সেই দরজাতও যেখানে কামা থমকে আছে। গিয়েছি মোফাজ্জল হায়দরের পরিবারে, বা মুনীর চৌধুরীর বাড়ীতে। এ এক আরেক তীর্থ, আরেক অভিনিবেশ, আরেক অভিজ্ঞতা। নাঃ, দুই বাংলা আর এক হবে না, কারণ এদের একটা সাংস্কৃতিক অতীত আছে, যেটা অন্তত মনে-মনে আজও সমানই বর্তমান তাদের পক্ষে—সে-অতীত আমাদের নেই। এবং এরা এখানে বা-ই হোক না বা হতে চান না, একমাত্র সেই অতীতই এদের সকল ভবিষ্যতের পথ-বোধে দেবে। আমাদের সংলাপ কেটে যায়, কেবলই কেটে যায়—দুই বাংলার মাঝখানে এমন এক পন্থা আজ, যা আর অতিক্রম করা বাবে না।

তাই মনে হয়, গ্রন্থমেলায় মেরেটি আমার 'ফরেনার' বলছিলাম, হুজুতে ঠিকই বলছিলাম।

**হাওড়া**  
**ফ্রেন্ডস**  
**সোসাইটি**  
বেতারসী-দিস্ক-ট্যু  
মিলবন্দু-খোম্বাক  
৫৫৫, জি.টি. রোড (সিউএ) হাওড়া  
ফোন : ৬৭-৪৪৩৭

# বাঁহা

শিল  
দেবর্মা

উপন্যাস

হুড়ি

তিন-চার মিনিট কিরণ চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলল না। কেয়ারা এসে দু-কাপ চা, টোস্ট আর ওমলেট টেবিলের উপর রেখে গেল। কিরণকে নীরব এবং চিন্তিত দেখে রীতাবরী চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল,—‘নাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে’।

কিন্তু কিরণের মুখভাব বদলাল না। সে গম্ভীর এবং অনমনস্কের মত চা-পান শুরু করল। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল,—‘আমি একবার তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব ভারি’।

—‘কি হবে দেখা করে?’ রীতাবরী তাকে বোকাবার চেষ্টা করল। ‘তোমাকে বলছি না? বাবার টনটনে বংশ-গৌরব। আমরা নিমন্তর বিখ্যাত গোম্বামী বংশের সন্তান, একথা তাঁর মূখে দিনের মধ্যে সাত-বার শুনি। তোমার কাছ থেকে মেয়ের অসবর্ণ কিরণের প্রস্তাব শুনলে বাবা তেলে-বেগনে জ্বলে উঠবেন। তারপর একটা বিদ্রোহী রাগারাগি হবে। হয়তো ভীষণ চটে গিয়ে তোমাকে অপমান করে ঘর থেকে বোঁদিয়ে যেতে বলবেন। দাদা-বৌদি, ‘ঝি-চাকর, বাইরের লোকদের সামনে আমাকে নিয়ে এমন একটা বিদ্রোহী কেলেঙ্কারী কিছতেই হতে দিতে পারব না’।

কিরণ বলল,—‘শুধুতে আপত্তি করলেও পরে হয়তো তোমার কথা ভেবে উনি রাজি হতে পারেন। আর এমনি তো ঘটে। প্রথম দিকে কল্লো মা-বামাই এই ধরনের বিয়েতে রাজি হতে চান না। পরে ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করে মত দিতে হয়’।

রীতাবরী অবসর রোপনের মত জাল হাসল।—‘তুমি আমার বাক্যকে চেন না। ভীষণ জেদী আর গম্ভীর। তাকে আমরা বরাবর স্কুলে মানুষ বলে জানি। বাবার খবাব ঠিক পাহাড়ের মত। অটল, অনড়। তাঁর কথার কিছতেই নড়চড় হবে না। একবার কোনো বিবরে না কললে তাকে আমরা মত বদলাতে দেখিনি’।

কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। ‘তাহলে উপায় কি হবে? আমাকে বিয়ে করলে বাবা বোধহয় কোনোদিন তোমার মুখপর্শন করবেন না’।

—‘তার জন্যে দুঃখ নেই’। রীতাবরী পরিষ্কার বলল। ‘আমি পরে চিঠি লিখে তাকে সমস্ত কিছু জানিয়ে আশীর্বাদ চাইব। যদি ক্ষমা করে উত্তর দেন, তাহলে তোমার সঙ্গে ফের ও বাড়িতে ঢুকতে পারি না হলে আর প্রয়োজন নেই। আমি জানব বাপের বাড়ির দরজা আমার জন্যে চিরদিন বন্ধ হয়ে গেছে’।

কিরণ কোনো কথা বলল না। সে চায়ের কাপে ঠোট ডুবিয়ে গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল।

রীতাবরী জিজ্ঞাসা করল,—‘আমাদের কথা বাড়িতে বলেছ নাকি?’

কিরণ মাথা নাড়ল। ‘আগে বলিনি রীতাবরী! কিন্তু জানিয়ে রাখলে বোধহয় ভালো হত। আসলে ঠিক এই মর্মেত’ মা আর বাবার কাছে তোমার কথা বলতে একটু অসুবিধে আছে আমার’।

—‘অসুবিধে?’ রীতাবরী সর্পিংস চোখে তাকাল। কিরণের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বালিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল,—‘অসুবিধে কিসের? এ বিষেতে কি তোমার মা বাবা আপত্তি করবেন?’

—‘না, না। আপত্তি করবেন কেন? ওসব কিছু নয়’। কিরণ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে তাকাল। ‘মাস্কল হয়েছ আমার সেই ভাইকে নিয়ে। বার কথা তোমাকে সেদিন বলেছিলাম’।

রীতাবরী ঈষৎ দৃষ্টিচলতার ভাব করে বলল,—‘কেন, কি হয়েছে তার? তুমি তো বলাছলে হিরু মনে তোমার ছোট ভাই খুব ভালো ছলে। হারার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে তার নাম দেখলে তুমি আশ্চর্য হবে না’।

—‘হ্যাঁ। পরীক্ষায় বসলে হয়তো সে রকম কিছু হতে পারত। কিন্তু এখন তার কোনো সম্ভাবনা নেই’। একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে কিরণ বলল, ‘হিরু বাড়ি থেকে চলে গেছে রীতাবরী’।

—‘চলে গেছে? কোথায়?’ বিস্ময়ে তার চোখ দুটি কোণ বড় দেখাল।

—‘ঠিক জানি না। তবে বাড়িতে একটা চিঠি লিখে গেছে। সে গ্রামে আছে... কোথায় কোন গ্রামে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি’।

রীতাবরী চুপ করে শুনছিল। টেবিলে আহাৎ সব পড়ে। ওমলেট কেউ মুখে দেয় নি। কিরণ শুধু একটা টোস্টে কামড় দিয়েছিল মাত্র। কেমন করে খাবে? আড়ালে বসে কে যেন একটা বিবর সুরের রাগ বাজিয়ে চলেছে। সেই সুর সমস্ত ঘরময়, এই গ্রীলের ভিতর, বাতাসের মত বার বার তাদের দুজনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

কিরণ মুখ নীচু করে বলল—‘মাস্কল হয়েছে তাই। হিরু চলে যাবার পর মা একেবারে ভেঙে পড়েছে। সবই করে...নাওয়া, খাওয়া ঘুমোন কিছুই বাদ নেই। তবে মায়ের মুখের দিকে যেন তাকান যায় না। আমি বুঝতে পারি দেহের ভিতরে রোগ যখন ছাঁড়িয়ে পড়ে, বাইরে থেকে তা ধরবার উপায় নেই। মায়ের অবস্থা ঠিক তাই। মনের ভিতরে ঘণ ধরেছে। তিনে তিনে মা নিঃশেষ হচ্ছে। অচ্চ কাউকে একটি কথাও বলবে না। শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কখনও নিজের ভাগ্যকে ধিকার দেয়’।

—‘আর তোমার বাবা?’ রীতাবরী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

—‘তাঁর অবস্থাও কিছু ভালো নয়। আগে বাবা বেশ শক্ত মানুষ ছিলেন। কথা-বাতা কম বলতেন। ছোটখটো ব্যাপারে আদৌ মাথা গলাতেন না। কিন্তু ইমানদী তিনি বেশ দুর্বল। শরীরটা ভালো থাকে না। বকের মধ্যে প্রায়ই একটা বাঁধা অনুভব করেন। আর মাঝে মাঝে পাগলের মত অর্থ-হীন ভাষিতে বলে ওঠেন,—‘ঘণ্টা বাজছে! ঘণ্টা বাজছে! কিরণ! শুধু হিরু নয়, আমাদের সকলকেই এবার যেতে হবে’।



একটা জনহীন অক্ষাংশে কিছু দূরত্বের  
 দখলী হঠাৎ মাঝি ধরল। দাঁড়ি কিছ  
 যত্নের সঙ্গে সে দীর্ঘতম দাঁড়ি দিয়ে  
 গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর আরেক আরেক

তার কান্টারের মত ভাঙিয়ে ছাড়ে আরো  
গায়ে তেনে আসল।

বিশিষ্ট অলঙ্কারে ভিৎকার করে বলল—  
এই হেঁড়ে দাঁড়া! লালগেহে আসল—

রতীশ কোনো কথা বলল না। সে  
একটা জোড় করে এবং কিছুটা কোশলে  
বিশিষ্ট কোলের উপর আধশোয়া অবস্থায়  
ফেলে তার মুখে, গালে, ঠোঁটের উপর  
জনকাত্ত চুসু খেতে শুরু করল।

খানিকটা ধনুতাবাদীতর পর বিশিষ্ট  
নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিরাড়ের সঙ্গে বলে  
উঠল—কি যে কর। এমন রাস হয়  
আমার—। তারপর রতীশের মুখের দিকে  
চাকিরে সে কিক করে হেসে ফেলল।  
বলল—কেমন জল! মুখে গালে রক্ত সেগে  
এবার বেশ সন্তোষ মত দেখাচ্ছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রতীশ বলল—  
তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার  
সেই মাসী কলকাতার আসছে।

—তাই নাকি? কোন মাসী বল তো।  
সেই যিনি খুব কেমন? এখন থেকে তেরশ  
মাইল দূরে থাকেন?

—হ্যাঁ। সামনের শনিবার মাসী  
আসছে। মোটে তিনদিন থাকবে। আমাকে  
পরিবার সকালে দেখা করতে বলেছে। ছুটি  
ঘাবে নিশ্চয়।

—কোথায় বেতে হবে?

—কেন, গ্যান্ড হোটলে। যেখানে  
মাসী এসে ওঠে।

বিশিষ্ট সান্দ্র সুদে প্রশ্ন করল—  
তোমার মাসী হোটলে ওঠেন কেন?  
নিজেকে বাড়ি নেই? তাহলে আশীর-  
স্বজন কিম্বা জানাশুনো কারো বাড়িতে  
উঠেই পড়েন।

—হুঁ। তাহলেই হয়েছে। রতীশ  
রহস্য করে বলল। মাসীকে কেলেবার  
গালতা করে দিতে পাঁচশত পদিশ ডাকতে  
হবে।

—পদিশ? বিশিষ্ট একটা ভয় পেল।  
তোমার মাসীকে বেয়েবার সময় পদিশ  
ডাকতে হয় নাকি?

—না, না, ডাকতে হবে কেন?  
প্রয়োজন বুললে পদিশ এখনিই থাকে।  
রতীশ হেসে জবাব দিল। সে ফের বলল—  
বেশ তো। রবিবার সকালে মাসীর সঙ্গে  
আলাপ কর। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।

অমির বারিক লেনের মুখে গাড়ি থেকে  
নেমে বিশিষ্ট ভাড়াভাড়ি গলিতে ঢুকল।  
এত সন্ধ্যা। একা একা হাটতে বেশ ভয়  
লাগে। তাদের বাড়ি থেকে কেউ  
খিরেটার লেখতে পারনি। বিশিষ্ট আশা  
করেছিল, তার মেজলা হয়তো বাবে। বেশ  
গেল না কে জানে? গলিটা একেবারে  
কাঁকা.....জনহীন। বিশিষ্ট কত বড় পা  
ফেলে বাড়ির দিকে ছোট্ট চলল।

সন্ধ্যা সাতটার অনেক আগেই ওরা  
এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছল। কলকাতার  
থেকে রথোজনা আবার ফারের জন্য কলকাতা।  
মিহির নাম করে সে সিগনেল কাটছিল।  
পুলের দিল হল যেহেতু কারিগর থেকে নিখোঁজ।

এখনও তার কোচনা হাটপ পাঞ্জা বায় নি।  
কিন্তু তাই নিয়ে কি কারো দুঃখিনী  
আছে?

কিম্বা একবার বলল—মিহিরিহি ছুঁর  
কেসে কি করবে? হিমু ভো ভোমাকে  
জানিয়ে গেছে না। সে বাড়ি থেকে চলে  
বাক্যে। গ্রামের কুড়োঘরে নিঃসন্দ্বল মানু-  
গড়িল্ল মধ্যে। একদিন সেখান থেকেই দলে  
দলে আবার শহরে এসে ঢুকবে।

সান্দ্রার কথা শুনলে মনেরমার  
করার আরো কড়ে। গলা-বন্ধ হয়ে আসে।  
চোখ দুটি জলজলে দেখার। বড় বড় জলের  
ফোটা টলমল করে। আর কিরণের এসব  
কথার কোনো মানে আছে? হেলোটা দু-দুই  
লিখে গেছে বলেই কি বাড়িল্ল লোক  
নাকে তেল দিয়ে ঘষাবে? কোথায় কোন  
গ্রামে সে পড়ে পড়ল? সেখানে কি খায়?  
এই ঠাণ্ডায় লেপ-কমল দূরে থাকুক, একটি  
শীতবস্ত্রও হিমু সঙ্গে নেয় নি। একপার  
মনোজ্ঞা কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকে?

শীতের বাড়িরে লেগে বড়ি নিয়ে আবার  
চোখ কথ করতে পারে?

হিমু চলে বাবার পর। রাতীশের বড়  
বেশী-অস্বস্তি। চোখেমুখে উরসা সেই.....  
নিজেকে-রমা আলোর মত নিশ্চেষ্ট দৃষ্টি।  
নাথেরাখে সেই এক বুল। পণ্টা হেঁকেছে।  
আর সময় নেই রে। হিমু চলে গেছে। এবার  
আমাদেরও সব দিকে দিকে বেতে হবে।  
তৈরি-হুতে শুরুর কর। টেনের কানী-কখন  
বাক্যে বুকভেই পারবে না।

সকালবেলায় বাগীচের খুব সেটি-  
সেটাল হয়ে পড়েছিলেন। মিলনকে কাছে  
ডেকে তার মাথার চুলে হাত বুলািয়ে দিয়ে  
বললেন—তোমার সঙ্গে যোগদান আমার দেখা  
হবে না রে খোকা। শরীরের অবস্থা জে  
বুঝতে পারছি। ভিতরে বুল-গোকা করে  
করে থাকে। কবে আছি, কবে নেই।  
আমেরিকার বসে হয়তো একদিন কখন পর্যন্ত  
বুড়ো কাপ নকশের দেশে রওনা হয়েছেন।

মিলন জানে তার বাবার মন জেতে  
গেছে। আর জোড়া লাগবে না। এই কলিমে



# আশোক

## স্টেইনলেস

### নং ১

## যাহার বিশেষত্ব

## অনেক

১. কলকাতার সবচেয়ে বড় ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি।  
২. কলকাতার সবচেয়ে বড় ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি।  
৩. কলকাতার সবচেয়ে বড় ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি।

আশোক স্টেইনলেস—আজকের নং ১ কোড।

যেন বেশ যোগা হয়ে গেছেন যাবার।  
কণ্ঠের হাড় দুটো বিস্তীর্ণ প্রকট। দৃষ্টি  
বিবর্ণ। আবার হাত ধরে সে বলল—  
‘তোমার মত অলসকে চিন্তা? আমি কি  
চিরকাল কিসে ধাক্কাতে বাঁধে? দু-বছর  
কিন্তু তিন বছর পরে আবার ফিরে আসব।  
আর এই কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে  
যাবে।’

অপূর্ণের প্রায় শেষ সময় এসে  
পৌঁছল। মিলনকে দেখে সোৎসাহে চেঁচিয়ে  
উঠল, —‘হ্যাঁ! নতুন স্টুটগার গ্রান্ড দেখাচ্ছে  
তোকে।’ তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে  
কিসকিল করে বলল, —‘দেখিস, এলসী  
বৌদি আবার না তোর প্রেমে পড়ে যায়।’

—‘হ্যাঁ! কি যে বলিল, তোর নিজের  
বৌদি। মৃত্যুর যদি এতটুকু আগল থাকে।’  
‘পরিচয় পেয়ে মনোরমা একগাল  
হাসল। —‘ওমা! তোর সেই কথা? কি  
সুন্দর চেহারা! ঠিক সুন্দরকার রাজ-  
পুত্রের মত।’

‘মিলন আশা করে নি। কিন্তু অপূর্ণের  
তার মা-বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।  
মনোরমা ওর চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ  
জানাল। মুখে বলল, —‘দে’চে থাক বাবা।  
তোমার কাছে আমরা বড় ভগ্নী। মিলন  
জনা তুমি অনেক কয়েক। চিরদিন তা মনে  
রাখবে।’

বাবার কোলক বিস্তৃত কান্ডে জানল।  
মিলন তাকে আদর করে বলল, —‘এই মুখ-  
পট্টা, কাদিছিস কেন? হেঁচকি জেনো কি  
আনব বল? চোখ-কোঁকড়া, কানোয় না  
টোঁকটোঁনের পাড়ি?’

তবু বিস্তৃত জোড়ের জল খালি না।

‘মিলন আবার বলল, —‘বোকা! জেনো?  
কাদিস নে। মা-বাবাকে দেখবি। তারপর  
ডালো করে নাচ-গিঁথে দুইও একদিন  
আমেরিকা যাবি।’

বিদায় সেরান মনোরমা দুটি বড় লজ্জার  
আর বিষম হয়। কান-কোঁকড়ার যে সজ্জা  
অনুভূতি এককাল ভেঁজা ছিল, সেগুলি  
হঠাৎ স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। বলা হয়ে  
অসতে চায়। মিলন জিজ্ঞাসা করে।

মনোরমা দুই জড়নের খুঁটে জোড়  
হয়ল। এতকাল ধাক্কা মূল্যবান জিনিস  
হেলেনেরদের অঙ্গুলে রেখেছিল। এখন  
তারা বড় হয়েছি। এবার উড়-কোঁকড়ার হিঙ্গ  
পালিয়েছে। মিলন আত্ম-চলল। জড়ক শব্দ  
কিরণ আর বিস্তৃত।

মিলনমাথিক মিলনমিলন, তেঁকে  
ইত্যাদির পর মিলন মিলন মিলন। তারপর  
মন্ত একটা হঠাৎ সঠিক মন্ত মিলন  
আকাশে উড়ল। মিলনমিলন পৃথিবীর উপ  
সুন্দরী নারীর মত। মিলন মিলন মিলন।  
আকাশের কান্ড মিলন মিলন মিলন মিলন  
আলো, নীল আলো মিলন মিলন মিলন  
কোথায় অদৃশ্য হয়।

হোটেলের কাছে এসে বিস্তৃত খুব  
অবাক হল। আর রতীশ যা বলেছিল সব  
ঠিক। এত সকালেও দরজার কাছে কি ভিড়।  
অন্তত আট-কণ জম পুঞ্জি জড়নের  
সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। নিশ্চয় হোটেল

থেকে কেউ বের হবে। তাকে এক পলক  
চোখে দেখার জন্য মানুষগুলো ভীতির  
কব্জের মত অপেক্ষা করছে।

লিপি দিয়ে উঠতে উঠতে রতীশ বলল,  
—‘তাড়াতাড়ি চল। আটটা বেজে গেছে।  
এইপর আসী আবার বেরিয়ে যাবে।’

—‘হোটেলের দরজার কাছে এত ভিড়  
কিসের?’ বিস্তৃত ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল।  
‘তোমার আসীকে দেখবার জন্য এরা এসেছে  
নাকি?’

রতীশের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই  
যেন রতীশ মুচকি হাসল। পরে বলল, —  
‘আগে আসীকে দেখবে চল। তখন তোমার  
সব প্রশ্নের জবাব পেরে যাবে।’

লিপি পাঠাতেই বেরোয়া এসে তাদের  
ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে বিস্তৃত প্রায়  
চতুর্ভুজ। তার সামনে দাঁড়িয়ে ইনি কে?  
প্রথমটা সব গোলমাল হয়ে বাচ্ছিল। কেমন  
যেন ওলটপলট ঠেকছে। তারপর মগজটা  
ধীরে ধীরে আবার পরিষ্কার হয়ে এল।

এবাক সে বাকতে পারল। রতীশ তাকে  
মিথ্যা বলে নি। তার আসীকে সে চেনে  
বৈকি। শব্দ সে নয়। এই কলকাতায় কত  
লোক চিনবে। তার কথা বলা, চলাফেরা,  
গান গাওয়া, সব বিস্তৃত পরিচিত। এতবার  
দেখাচ্ছে। কখনও ভুল হতে পারে?

—‘জিজ্ঞাসা করুন তোমাকে দেখে  
কিটি হাসল। বলল, —‘তোমার নাম বিস্তৃত,  
তাই না? রতীশ আমাকে চিঠিতে সব  
লিখেছে। তুমি খুব ভালো নাচতে পার।’  
ফের চোখের একটি স্পন্দন ভালো করে  
লক্ষ্য করল। —‘তারপর বড় ছুরি কি করবে?  
আমার মত মিলনমিলন নামের নাকি?’

বিস্তৃত কোনো জবাব দিল না। সে  
লজ্জার স্বর রাঙা হয়ে উঠল।

রতীশের মানসীয় সময় ছিল না। বাসও  
নাট্যকা। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা চলেবে।  
আজ আবার কাল। কাদিছিস মাল বোকাই  
নোকোর মত প্রেরণায় ভাসি। পরশ  
সকালে আবার বোকাই ফিরতে হবে।  
হু মন্ত বসে লিপি করবার সময় কোথায়?  
লিপি পাঠ পড়িই মনোমত্তা উঠল।

কাল—‘তোমার সখী। আজ আর সময় নেই  
রতীশ। হঠাৎ মাকে বললি এর পরের খার  
লক্ষী নিশ্চয় দেখা করবে।’

—‘হ্যাঁ! তুমি কাদিছিস দেখা করবে।’  
রতীশ প্রায় অশ্রুধারের জাঁপতে হাসল।

মনোমত্তা তাদের দুজনের কান টিপে  
আদর করল। তার মনোরম বোকা করে  
বলল, —‘বি কোথায়? মিলন মিলন মিলন  
আবার কেন একটা মিলনমিলন রতীশ মিলন  
করে কা না।’

তারপর মিলনমিলন মিলনমিলন মিলন  
কান্ডে অলসতার সৃষ্টি মিলনমিলন মিলন  
মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন

আরো কুড়ি পঁচিশ দিন পর। দাঁড়িত  
গোছপাছ শব্দ হয়েছিল। এতদিনের সংসার।  
মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন  
জিহ্বাশব্দ। কতকাল ধরে সব সংগ্রহ  
করেছে। সাক্ষীর ভাব নয়। যে একদিনই  
মনোরমা সব গুটিয়ে ফেলবে।

—‘মিলনমিলন মিলন মিলন মিলন মিলন  
যাবে। চাষীকে চিঠি লেখা হয়েছে।  
উঠানের আগাছা, বুঝে বোঝাফল কেটে  
সে যেন ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে।’

কাদিন ধরে কিরণ খুব চিঠিভিত্ত।  
রীতাকরী তাকে চিঠি লিখবে বলেছিল।  
কিন্তু হাস্যকর হতে চলল, তার কোনো  
খবর নেই। কিরণ একদিন ইউনিভার্সিটিতে  
গিয়েছিল। খোঁজখবরের আশায়। কিন্তু সে  
কাউকে চেনে না। কার কাছে রীতাবরী  
খবর জানতে চাইবে? তবু ব্যর্থ করে  
অফিসের কেরানীবাঘুর কাছে খোঁজ  
নিয়োগে। কিন্তু সে সংবাদও খুব উল্লাস-  
কাজক নয়। রীতাবরী নাকি বেশ কিছুদিন  
হল ক্রাসে আসছে না। প্রায় পনের-কুড়ি  
দিন? হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিন্না আরো  
দু-পাঁচদিন বেশী। ক্রাসের রোলকলের  
খাতার উপর একনজর বুলিয়ে কেরানীবাঘু  
তাকে পরিষ্কার উত্তর দিল।

অপ্রাণের সকাল। কাদিন হল শীত বেশ  
জাঁকিয়ে পাড়ছে। রোলকলের পিঠ রেখে  
কিরণ চিন্তা করছিল। তার এখন কি করা  
উচিত? দু-একদিনের মধ্যে সে রীতাবরীর  
বাড়ি যাবে নাকি? এ ছাড়া উপায় নেই।  
যা সেন্ট্রাল-মটাল মেয়ে। নিশ্চয় তার উপর  
রাগ করে ঘর বসে আছে।

অবশ্য রীতাবরী নিষেধ করেছে। তার  
কাবা ভীষণ রাগী। সব শব্দে হয়তো তেলে-  
বেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিরণকে দুটো  
অপমানের কথা হজম করতে হতে পারে।  
তবু সে তৈরি। ভীতির মত লেজ গুটিয়ে  
বসে থেকে লাভ নেই। যা হয় হবে। কিন্তু  
রীতাবরী এবং তার পরিচয় ও সম্পর্কের  
কথা জোর গলায় জানাতে সে বিবধা  
করবে না।

মনোরমা হঠাৎ তার কাছে এসে বলল,  
—‘ও কিরণ! শোন বাবা, তোর সঙ্গে  
আমার একটা কথা আছে।’

চোখ তুলে কিরণ অবাক হল। কথা  
বলতে গিয়ে মায়ের ঠোঁট দুটো জম  
ধরখর করে কাঁপছে কেন? মা কি আবার  
কিছু দেখল? হিরের বিধানের তলায়  
চকচকে হোরাটা দেখতে পেরে মা ঠিক  
অমনি কেপে উঠেছিল না?

মনোরমা ফিস ফিস করে বলল, —‘তুই  
তো ডাড্ডার। বিস্তৃতকে একটা দেখাব?  
মানে ওর শরীরটা—’

কিরণ ভুরু কোঁচকাল। মা যেন কি  
ইঙ্গিত করছে। অগত স্পষ্ট করে উচ্চারণ  
করতে পারছে না।

—‘কি হয়েছে বিস্তৃত?’ কিরণ প্রশ্ন  
করল। আজ সকালে সে বাথরুমে বসে বসি  
করছিল দেখলাম। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়েছে  
নাকি?’

—‘নারে বাবা। বোধহয় সর্বনাশ  
হয়েছে।’ মনোরমা দাঁত কিডামড় করে  
কামা চাপবার বাধ চেঁচা করল। কাদিতে  
কাদিতে বলল, —‘পোড়ামুখী! আমায়  
সকলের ঘুমে কলঙ্কর জাল লেপে  
দিচ্ছে।’

(আগামী সংখ্যায় সার্বভৌম)

# অর্থনৈতিক সমীক্ষা : টাকার দাম

শান্তিলাল মধুখোপাধ্যায়

কোন জিনিস কিনতে যে পরিমাণ টাকা লাগে তা হল সেই জিনিসের দাম। তেমনি টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় টাকার দাম। সুতরাং টাকার বিনিময়ে খেণী জিনিসপত্র পাওয়া গেলে টাকার দাম বাড়বে, আর জিনিসপত্র কম পাওয়া গেলে টাকার দাম কমে।

ইতিহাস থেকে

এই আভি সাধারণ তত্ত্ব মোটামুটি সকলেরই জানা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটাও জানে যে টাকার দাম কতটা বাড়ল বা কমে তার হিসাব করা হয় সাধারণ ভোগ্যপণ্যের গড় দাম কতটা কমল বা বাড়ল তত থেকে। কিন্তু এটা হরত অনেকেরই জানা নেই যে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে টাকার দাম বা ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। ইংল্যান্ডে চৌদ্দ শতকে মাত্র কয়েক পেন্সের বিনিময়ে একটি গরু বা ভেড়া পাওয়া যেত। আমাদের দেশে ঐ সময়ে শেখ নাসিরুদ্দিন চিরগের খইরুল মকসিস (১০৫২-৫৩ সালে লেখা) থেকে জানা যায়, কীমৎ (দাম) এত কম ছিল যে এক ভক্তের একটা বিরাট ভোজ দেওয়া যেত। তৎকালীন রূপোর টাকা এবং পণ্যপত্রটি তার মাত্রার সমান।

মুঘল আমলেও টাকার দাম প্রায় ঐ রকম ছিল। হুমায়ুননামার আছে যে আকবরের সময় এক টাকার চারটে ছাগল পাওয়া যেত। আর সারোস্তা খাঁর আমলের বাংলাদেশের ত' কথাই নেই, এখনও তা কিংবদন্তী হয়ে আছে। আওরঙ্গজেবের দক্ষিণাভ্যন্তর অভিযানের ব্যয়ভার বহন করতে সম্রাটের মাতুল সুবেদার সারোস্তা খাঁর শাসনাধীন বাংলাদেশ! সুবেদার সাহেব বাংলাদেশ থেকে সোনা রূপো সংগ্রহ করে, গালিরে দক্ষিণাভ্যন্তর প্রেরণ করতেন বলে টাকার পরিমাণ এত কমে গিয়েছিল যে জলের দামে বিনিময়পত্র পাওয়া যেত—চালের দাম ছিল টাকার আট মল।

এইভাবে এক এক সময় টাকার দাম বেড়ে গেলেও শতাব্দীর ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, এক শতক থেকে আর এক শতকে ঐ দাম কমেই চলেছে। পৃথিবীর জন-সংখ্যা বৃদ্ধির মত এও হল ইতিহাসের অন্যতম লিখন, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় তখনই যখন টাকার দাম অস্বাভাবিক পরিমাণে এবং দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলে বা কমে থাকে।

এই শতকেরই দ্বিতীয় দশকের শেষদিক থেকে অস্বাভাবিক মাত্রায় অনেক টাকার দাম অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে বাজিল—অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম অকল্পনীয়ভাবে হ্রাস পাইল। এর দরুন পৃথিবীর সমস্তভাগিক দেশেই কল্পনাতীতভাবে উৎপাদনের হ্রাস ঘটিল। যা উৎপাদ হত তারও ফোটা ছিল না। চাহিদার অজরবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু পরিমাণ দ্রব্য সমুদ্রের জলে ডালিরে দিয়ে এবং অসংখ্য পুত্রের নষ্ট করা হয়েছিল।

উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার বেকারে সব দেশই ছেড়ে গিয়েছিল এবং প্রচুরমাত্রা হ্রাসের ফলে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে বহু লোকের সারা-জীবনের সপ্তর নষ্ট হয়েছিল। এই সবের দরুন দাওয়া-হাওয়া রাজনৈতিক গোলাবোম্ব লেগেই ছিল। অনেকেরই মনে হয়েছিল যে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলেছে—ধনতন্ত্রের আয়তন করিয়ে এসেছে।

আজ অবশ্য এইভাবে টাকার দাম বৃদ্ধির কথা আর কল্পনা করা যায় না। এ যদি ঘটে তবে বটেই আভি দীর্ঘকালে—যে দীর্ঘকালে, কেইনসের ভাষায় : উই আর অল ডেড। সুতরাং আজকের সমস্যা নিম্নেই মাথা ঘামান যাক।

আজকের দিনের সমস্যা ঠিক বিপরীত প্রকৃতির—টাকার দাম দ্রুত হ্রাসের সমস্যা। এ সমস্যা মোটামুটি সমগ্র সভ্য জগৎকেই প্রণীড়িত করছে। সমস্যাটি যে, আশংক্য নয়, আভ্যন্তরীণ কারণ হতে উঠতে পারে, এ শিক্ষা সভ্যজগৎ লাভ করে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের জার্মানী থেকে। ক্রিয়াকর্ম শিক্স লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

১৯২০ সালের জার্মানী। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ আধ দশক আগে শেষ হয়ে গেছে। জার্মানীর ক্ষমতা হ্রাসের ব্যয়ভারের বিশাল বোকা, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যাহত এবং সরকারী আর-ব্যয় পঞ্চাতিতে বিশৃঙ্খলার চড়াপত্ত।

একজন মার্কিন পণ্ডিত এসেছেন জার্মানী বেড়াতে। ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকের এক বড় হোটেলে ঢুক তিনি দেখেন রিসেপশন কাউন্টারে বড় বড় হরফে নোটিশ ঝোলান : মার্ক পেপের নোট নেওয়া হয় না। মার্ক জার্মানীর নিজস্ব প্রশাসনিক মাত্রা। সুতরাং এইরকম নোটিশে অবাধ হবারই কথা। পণ্ডিত ভ্রমলোক কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য হননি, কারণ ব্যাপারটা তিনি কিছুটা জানতেন। সম্পূর্ণ হতবাক হলেন পরের দিন।

সকালে উঠে তিনি হোটেলের পানের ডাকঘরে গিয়েছিলেন বাসিন্দা এক বন্ধুর কাছে একটা ছোট পার্সেল পড়ায় জমো। ডাক-মাশুলে লুনে চক্ একবারে চড়কগাছ। কত কল্পনা করতে পারেন? ইংরেজীতে যাকে বলে একটা অ্যান্টার্মিক্যাল কিগার—১০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক। হতবাক হয়ে ভ্রমলোক দাঁড়িয়ে আছেন দেখে পার্সেল ঝাকটিই পথ বাতলে দিল : কোন বৈদেশিক কারেন্সী থাকলে বিনিময়ে করে আদান না কেন। না হয়, ঐ কারেন্সী আজকেই দিন, আমিই কবল্যা করছি।

পণ্ডিত ভ্রমলোক কি করেছিলেন তা লেখেন নি।

এর মাত্র কয়েকদিন আগে একজন ইংরেজ পণ্ডিত-ব্যবসারী লাইফজিগে এসে-ছিলেন জার্মানীতে প্রকাশিত বই ইংল্যান্ডে আমদানির ব্যাপারে ওখানকার এক প্রকাশকের সংগে চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে। চুক্তিপত্রের খসড়া পড়ে ইংরেজ পণ্ডিত-ব্যবসারী দেখেন যে মার্ক নর, ব্রিটিশ মাত্রা প্যাউন্ডেই টাকা মোটনির কথা লেখা হয়েছে। ভ্রমলোক জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে চাইতেই জার্মান প্রকাশক খোলা-খুলিই বললেন : আচ্ছা মার্ক কেউ আর চুক্তি সম্পাদন করে না—আভ্যন্তরীণ চুক্তিও নয়, বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তিও নর, মার্কের দাম যে হারে কমে তাকে মার্কিন পরে লোকে হরত মার্ক নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকারই করবে।

জার্মান প্রকাশকের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। অপরিবর্তনীয় কাগজী মাত্রা মার্কের বাজারে কোন দামই মইল না। বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবাই মার্ক নিতে অস্বীকার করতে লাগল। বড় বড় হোটেল দোকান ইত্যাদি 'নোটিশ' করিয়ে দিলে : মার্ক পেপের নোট নেওয়া হয় না। আর ডাকঘরের মত সরকারী সংস্থাগুলো মাশুলে ইত্যাদির জন্যে মার্ক অবতলক নিষেধ-কোর্টির সংখ্যা হাঁকতে লাগল।

এরই কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে বেরিয়েছিল। একদিনে নাকি বিংশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। যা তখনকার দিনে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ভারতীয় মাত্রায় যা পাওয়া গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

এইরকম অবস্থার কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কভিত্তিক মাত্রা ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে আর মার্ক বাড়ল হয়ে যাবে, তা সহজেই অনুমিত।

এর পরিবর্তী ঘটনা হল রাষ্ট্রবিপ্লব। বহু লোকের সারাজীবনের সঞ্চয় নষ্ট হওয়ার, বহু চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ার—এক কথায় সপ্তরের ভাঙার হিসাবে টাকার কোন কাজ না থাকার জামানরা সেই নতুন মাত্রা ব্যবস্থার প্রবর্তনের দাবী করতে থাকে যা টাকার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জ্ঞানার ফিরিয়ে আনবে। এও অনেক শাসন ব্যবস্থারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তাও তারা সম্পূর্ণ-ভাবে অনুভব করেছিল। এবং এর ফলেই নাৎসী দলন ও হিটলারের অত্যাচারের পথ সুগম হয়। তাই তৃতীয় দশকের মহামন্দার মত দ্বিতীয় দশকের জার্মানীর এই দুর্য্যাক ও সমগ্র সভ্যজগতের আভ্যন্তরীণ কারণ হয়ে আছে।

আজকের টাকার দাম :

আমাদের টাকার দামও আভি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তবে আশংকাজনকভাবে কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যে কিছুটা পরিলক্ষণ এবং কিছুটা তথ্যের সাচল্য নেওয়া অপরিহার্য, কারণ এটা হল পরি-



সংখ্যান ও তথ্যের বর্ণনা—টিক তত্ত্বের বর্ণনা।

আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন ১৯৪৯ সালের জুলাইর এই '৭২' সালে টাকার দাম হল মাত্র ৪২.৪ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত তেইশ বছরে আমাদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা ৫৮ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে। যদি এইভাবেও চলে—বর্ধিত আরও হ্রাস হ্রাস না পার, তবে আগামী কুড়ি বছরের পর অবস্থা কি দাঁড়াবে তা ভাবতেও পারা যায় না। জার্মানি যেকোন মত আমাদের টাকার কি বাড়িল হবে বাবে?

আগের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯৫০ সাল থেকে টাকার দাম কমেই আসছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনার সময় এই মাত্র হ্রাসের হার ছিল বছরে গড়ে এক শতাংশেরও কম। তারপর খুঁটে থাকে অকল্পিত হ্রাস। ১৯৫৬ এবং ১৯৬৬ সাল—এই দশ বছরের মধ্যে টাকার দাম ৪৮ শতাংশের মত কমে যায়। বার্কটকু ঘণ্টে পরবর্তী বছরগুলোতে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে এসে দেখা যায়, প্রবাসীরা পূর্ববর্তী বৎসরের জুলাইর ৬ শতাংশ বেশী এবং আগস্ট মাসের হিসেবে ঐ অংক ৮ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

তার পরের নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি, তবে টাকার দাম যে আরও কমেছে, এ সকলেরই অনন্ডিত সত্য। সুতরাং আভ্যন্তরীণ কারণ না থাকলেও গতি যে আশংকাজনক তাতে কোন সন্দেহই নেই। তাই সরকার, সংসদ থেকে শুরু করে দায়িত্ব-সম্পন্ন সকলেরই আজ এই গতিরোধের ব্যবস্থা নির্ণয় করতে বাস্তব বা ব্যতিবাস্তব।

#### মূল্যস্ফীতি:

এই প্রবাসীরা বৃষ্টি বা টাকার মূল্য হ্রাসকে 'প্রাইস ইনফ্লেশন বা মূল্যস্ফীতি' বলে অভিহিত করা হয়। শব্দ 'ইনফ্লেশন' বা মূল্যস্ফীতি শব্দটা কিছুটা বিজ্ঞানজনক, কারণ মাত্রার পরিমাণে বৃষ্টি না ঘটলেও দাম বৃষ্টি ঘটতে পারে। লর্ড কেলবিন তাঁর মূল্যস্ফীতির গ্রন্থ 'জেনারেল থিয়োরী অব এম্পায়রমেন্ট, ইন্টারপ্রেট অ্যান্ড ম্যানি-গেট (১৯০৬)' লিখেছেন: 'জুলনামূলকভাবে টাকা বন্ধন অপ্রচুর হয়ে পড়ে তখন টাকার কার্যকর যোগান বৃষ্টি করার জন্যে বিকল্প সম্পদকে খুঁজে নেওয়া হয় (৩০৭ পৃষ্ঠা)। বর্তমান দিনে এই বস্তু হল ব্যাংক-ঋণ। অতএব কারেন্সীর পরিমাণ বৃষ্টি করা না হলেও—এনতার নোট ছেপে বাজারে না ছাড়লেও অস্বাভাবিক মূল্য বৃষ্টি ঘটতে—অর্থাৎ টাকার দাম হ্রাস ঘটেও পারে। তাই একে বলা হয় মূল্যস্ফীতি।

#### মূল্যস্ফীতির বিশ্বজনীনতা:

আগেই বর্ণনা, মূল্যস্ফীতি আমাদের দেশের কিছু একক ঘটনা নয়—একরকম সার পৃথিবী আজ এই সমস্যায় প্রণীড়িত মার্কিন মন্ত্রিসভা এবং খাদ্যের গড় দাম ৯৮ বছরের জুলাইর খাদ্য অনুসারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ বেশী। এই মূল্যস্ফীতির কোনই পনের মাস আগে রাষ্ট্রপতি নিকসনকে

'কম্বল ক্রীম' বা সাময়িকভাবে মজুরিবৃষ্টি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে এবং তার কিছুদিন পরে ডলারের বন্দোবস্তা মূল্যের লাইটের 'জিডলারেশন' বা মূল্যমান হ্রাসের পথে পদ-সঞ্চার করতে হয়েছিল। কঠোর নিয়মানুবর্তী দেশ ইসরায়েলেও প্রবাসীরা বছরে ১০—১২ শতাংশ হারে বৃষ্টি পাচ্ছে। সাম্রাজ্যী দেশ যুগোস্লাভিয়া ও পোল্যান্ডও এই বিশ্বজনীন ব্যাধির বাইরে থাকতে পারেনি। নব শিল্পসম্রাট পশ্চিম জার্মানী ও জাপানও এর কবলমুক্ত নয়। আর গত মাসেই এর দরুন ইংল্যান্ড জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে ১০ দিনের জন্যে সমস্ত মজুরি দাম ভাড়া এবং লভ্যাংশের বে কোন বৃষ্টি বন্ধ করেছিল। আরও বলা যায়, গত মাসে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানী ও কানাডার নির্বাচনে অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ ছিল মূল্যস্ফীতি। বলা বাহুল্য কারণ এসব শক্তিশালী অর্থ-ব্যবস্থা যা সহ্য করতে পারে আমরাও যে তাই পারব—এরকম আশা করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। সুতরাং ঐ সব দেশের পক্ষে বা সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রে তা সংকটেরই নামান্তর। এই সংকটমুক্তির পথই খুঁজতে হবে এবার।

#### মূল্যস্ফীতির কারণ:

অতীতে, যেমন উল্লিখিত তৃতীয় দশকের গোড়ার জার্মানিতে যখন মূল্যস্ফীতি ঘটত তখন তাকে মূল্যস্ফীতি বলাই বর্ণনা করা যেত। এবারও যেমন উৎপাদক অপরিপূরিত চাহিদার সংগে ভাল রাখতে পারত না, অপরিপূরিত তেমনি টাকার যোগানও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেড়ে যেত। তবুও দিক দিয়ে এর ফলে ঘটত ভোগ, উৎপাদন ও টাকার যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের বর্ধমান অভাব। এবং ফলে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটত অর্থনীতিবিদ পিগু তাকে 'অত্যধিক টাকা কড়াকড় অত্যন্ত প্রবাসীর পশ্চাত্তান' বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে বৃষ্টির সময় বা বৃষ্টিবর্ধন যোগে তিক এই অবস্থা ঘটলেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরুর (১৯৫১ সালের মার্চ) থেকে মূল্যস্ফীতির কারণ ছিল একটু খবতল। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের পরি-কল্পনা—কর্তৃপক্ষ আধুনিক সম্প্রসারণধর্মী অর্থনীতির এই তত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, মূল্য বর্ধনশীল মূল্যস্ফীতির ভাড়া সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কারণ, কিছুটা বেশী দাম না দিলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহ আসবেই না, আর বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃষ্টিতে আগ্রহান্বিত হবে না। এই দামবৃষ্টিতে 'কাংকশানাল প্রাইস রাইজ' বা 'ক্রয়কালপ সম্পর্কিত (আংগিস নর) দাম বৃষ্টি বলে অভিহিত করা হয়।

এই ক্রয়কালপ সংক্রান্ত দাম বৃষ্টি জনাই উদ্ভব দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি নিয়মিত ঘটে থাকে। সুতরাং তাদের সমস্যা হল: কি করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ পূর্ণে নিয়োগ এবং মূল্যস্ফীতির মধ্যে সামজস্যবিধান করা যায়?

মোটামুটি আমাদেরও এই সমস্যা, তবে পরিমাণগত দিক দিয়ে হল অসংলগ্ন, পাতাল ভাং। যেমন আমাদের দেশে ১৯৬০—৬৭ সালের মধ্যে যে বছরে ১০ শতাংশ হারে মূল্যবৃষ্টি ঘটেছিল তাকে কোন মতেই সম্প্রসারণজনিত মূল্যবৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায় না। আর বিগত তেইশ বৎসরে টাকার দাম যে ৫৮ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে তাও নিশ্চয়ই সম্প্রসারণের মূল্য নয়।

#### আমাদের মূল্যস্ফীতির মৌলিক কারণ:

এই অভিহিতের বিবিধ কারণ আছে। এর মধ্যে দুটিকে মৌলিক বলে নির্দেশ করা যায়: ট্রাটিপূর্ণ ভূমি-পরিষ্করণ এবং জনবিস্ফোরণ। কৃষির পুনর্গঠনের জন্যে বিকল্প প্রচেষ্টা এবং বহু পরিমাণ বিনিয়োগ সত্ত্বেও আমরা খাদ্য সমস্যায় সম্মুখীন করতে সমর্থ হই নি—বর্তমান বৎসরের মত খারাপ কবলে পড়লে (কেটা এদেশে অতিশক্তাবিক ঘটনা) খাদ্যসম্পদের সম্প্রদায় হয়ে বিদেশের দিকেই তাকিয়ে থাকি। তেমনি জনসংখ্যা বৃষ্টির গতি বৃষ্টি করতে পারি নি। অপর দিকে পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় শুল্ক কার্যকর চাহিদার পরিমাণই বৃষ্টি করে চলেছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কসল হিসেবে ঘাটতি ব্যয়ের নীতি এবং কালো টাকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫৬—৬৬) ২,০০০ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি ব্যয় বা নোট ছাপিয়ে ব্যয় করা হয়েছিল, এবং গত ১৯৭১-৭২ সালেই বাংলাদেশ সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলায় জেনো ঘাটতি করার পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকার মত।

কালো টাকার ব্যাপারে ওয়াশিংটন ফর্মিট বলেছে, ৭০০০ কোটি টাকার মত কাজ-কারবার এই টাকায় চলে এবং এই সত্ত্বে ৪০০-৫০০ কোটি টাকার মত কর বছরে ফাঁক দেওয়া হয়। চাহিদার জুলাইর স্বল্প প্রবাসীর ওপর এই টাকার চাপ যে টাকার দামকে কমিয়ে দেবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এর ওপর আবার সাম্প্রতিক কারণ হিসেবে আছে প্রতিরক্ষাজনিত কল্প বৃষ্টি এবং অধিক রাস্তার প্রয়োজনীয়তা। বলা হয়, মাত্র বাংলাদেশে বৃষ্টি ও বাংলাদেশকে খাদ্য সরবরাহের ব্যয় আমাদের মূল্যস্ফীতকে বেশ খানিকটা উদ্ভব নিয়ে গেছে।

#### বৃষ্টিজনিত চাপ:

এইভাবে টাকার দাম কমলে মজুরী-বৃষ্টির দাবী জোরালো হতে কথা। আবার ঐ দাবী মেনে নিলে মূল্যস্ফীতির আরও বেড়ে যা টাকার দাম আরও কমে যায়। অতঃপর দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, কারণ দাবী শ্রম না করার জন্যে খরচ বা অন্যান্য কারণে উৎপাদন বাহ্যিক হলে মূল্যস্ফীতির গতি দৃষ্টিগত হতে বাধ্য, নিয়োগ বা শাস্তি-শাস্তি প্রদান না হলে কেউই দিলাম। মজুরিবৃষ্টির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃষ্টি গেলে উৎপাদকেরা মূল্যস্ফীতির হ্রাস

সহ্য করতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে উপর্য উপর দামও বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এর ফলেই দেখা যায় 'কমিউ-পন' বা উপপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি। অপরদিকে লোকের আর্থিক আর বৃদ্ধির দরুন অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রযাতির ওপর বর্ধিত ব্যয়জনিত চাপ পড়লে যে দামবৃদ্ধি ঘটে তাকে 'ডিম্মাড-পন' বা চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়। দামবৃদ্ধি উপপাদন-ব্যয় বা চাহিদা যে দিক থেকেই শূন্য হোক না কেন, একটা স্তরের পর উত্তর করণই কার্য করতে থাকে। আকস্মিক দৈনিক বর্তমানে তাই ঘটছে—বর্তমান উপপাদন ব্যয় এবং বর্তমান চাহিদা সমতালে মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত ওপরের দিকে নিম্নে বাড়ে। মজুত-দার, মুনাক্কা-শিকারী ইত্যাদি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতিতে আরও সঞ্চার করে চলেছে। মোট কথা : অর্থ-ব্যবস্থার একেবারে বেসামান্য অবস্থা।

হয়ত অবস্থা এখনও আরও বড়িয়ে যার নি। হয়ত মূল্যস্ফীতিকে এখনও মজুত-গতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু দেয়ালের লিখন সভাই আশংকাজনক। অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিলেও সম্পদ ও অল্প কয়েকটি পেরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে তাকে দুর্যোগেরই অঙ্গপূত বলে মনে করতে হবে। মূল্যস্ফীতি বা টাকার দাম হ্রাসের ফলে ধনী কৃষিকারী, ব্যবসায়ী, মজুতদার, চোরা-আমদানীর কারবারী ইত্যাদি মাত্র কয়েক শ্রেণী স্বীকৃত হয়ে উঠেছে, আর সমাজের বাকী অংশের দৈনন্দিন অভাব মিটানির সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এ অবস্থা অত্যন্ত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র বৈশী দিন চলতে পারে না। তাই দেয়ালের অস্পষ্ট লিখনের সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

#### প্রতিবিধান

প্রতিবিধান নিয়ে রথীন্দ্রহারখীরা মাথা ঘামাচ্ছে। অনেক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের অনুসরণে 'ওয়েল-ট্রীজ' বা মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করারও প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ প্রস্তাব যে মোটেই কল্যাণকর নয়, তা ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে। হয়ত ভারতে মাত্র সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে এবং সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধি রহিত করার একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু মোটখাট শিল্প, স্বয়ং-নির্মিত বাড়ি, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব? উপরন্তু মজুরী বৃদ্ধি রহিত করা হলে খাজনা, জাড়া, সূদ, মুনাক্কা ইত্যাদি সূত্রেও আর বৃদ্ধি রহিত করতে হবে। নচেৎ নিউডেমালিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হয়ে উঠবে এবং আর-বক্টন আরও বৈষম্যলোক হবে। সুতরাং এ পথ গ্রহণীয় নয়। তবে কোনো টাকার কাজ-কারবার দমন করতে পারলে অনেকটা যন্ত্রণা হতে পারে। এই ব্যাপারে কিন্তু শূন্য বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করলেই চলবে না, সমাজের

নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। 'অমর্ত্য'ই অন্য এক সংখ্যার আলোচনা করেছি যে এর জন্য খরসাঁট চেষ্টা নেয়া-বর্ণিত বাধ্যতাব্যবস্থা পূর্ণ হওয়ার পথ পরিহার করার জন্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে মূল্যস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান উপপাদন বৃদ্ধি। লর্ড কেইনস অবশ্য পূর্ণ নিরোপের অবস্থাকেই প্রকৃত মূল্যস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি বলেই বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ নিরোপের অবস্থার—অর্থ-উপপাদনের সকল উপকরণ যখন পূর্ণভাবে নিরোপিত থাকে তখন আর উপপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু আকস্মিক দৈনিক মূল্যস্ফীতির অবস্থার যখন সংঘাতীত বেকার পথে পথে ঘুরছে এবং বহু পরিমাণ উপকরণ অসল অবস্থায় পড়ে আছে তখন উপপাদনবৃদ্ধি নিশ্চয়ই সম্ভব। উপরন্তু, কল্যাণকর ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন উদ্ভাবনের ফলে উপপাদন-সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং প্রয়োজনমত মূল্যস্ফীতি গঠন করে সংগঠন-ব্যবস্থাকে সঠিক করতে পারলেই উপপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত, শূন্য দৃষ্টি-আকর্ষক নয়, পরিকল্পনাময়। এই পরিকল্পনার খেলাগানের চেষ্টাও গুরুত্ব দিতে হবে কার্যকারিতার ওপর, আর প্রথমেই কৃষির ভিত্তিকে সুসংগঠিত করতে হবে।

#### মূল্যস্ফীতির দমন :

যতদূর পর্বত অবস্থা আরও মধ্য না আসছে ততদূর নিরোপ ও বরাদ্দ ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে দমন করার সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত প্রধান প্রধান ভোগ্য-পণ্যের বণ্টন-ভার নিতে হবে। একেই অর্থ-নীতিতে মূল্যস্ফীতির 'সাপ্রেশান' বা দমন বলা হয়।

#### অন্যান্য ব্যবস্থা :

আর্থিক আর বৈশী হলোই প্রযাতির ওপর ক্রয়ক্ষমতার চাপ বেশী পড়বে। তাই আর্থিক আয়কেও কমান দরকার। এ ব্যাপারে হয়ত আয়করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সীমা আরও কমান যেতে পারে। এই ব্যবস্থা সরকারের জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস করলেও মূল্যস্ফীতিরোধের ব্যাপারে যে ফলপ্রসূ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

'রাজ কমিটি'র সুপারিশ সম্পূর্ণ কার্যকর করে কৃষি-আয়ের ওপর কর-স্বল্পতা সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। পুরণ রাখতে হবে, কৃষি থেকে আর প্রযাতির ওপর বিশেষ চাপ দেয়।

'একসাইস ডিউটিস' বা অস্ত্রশস্ত্রের হার দামবৃদ্ধির আর একটা বিশেষ কারণ। প্রতিবারেই কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে সাধারণ লোকে ভয়ে ভয়ে থাকে যে, আবার কোন-

কর বাড়ল এবং কলে দাম আরও চড়ল। কিলাস-প্রকৃ ছাড়া অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের হার কমানোর চেষ্টা করতে হবে। সূচনা সঙ্গে অবশ্য দাম বাতে কমে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, চিনির ক্ষেত্রে অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করে চিনির দাম কিছুটা কমানোর ব্যবস্থা এখনই করা যেতে পারে। আয়করের ক্ষেত্রে উল্লিখিত জনপ্রিয়তা হ্রাস এতে খানিকটা পূরিত হবে।

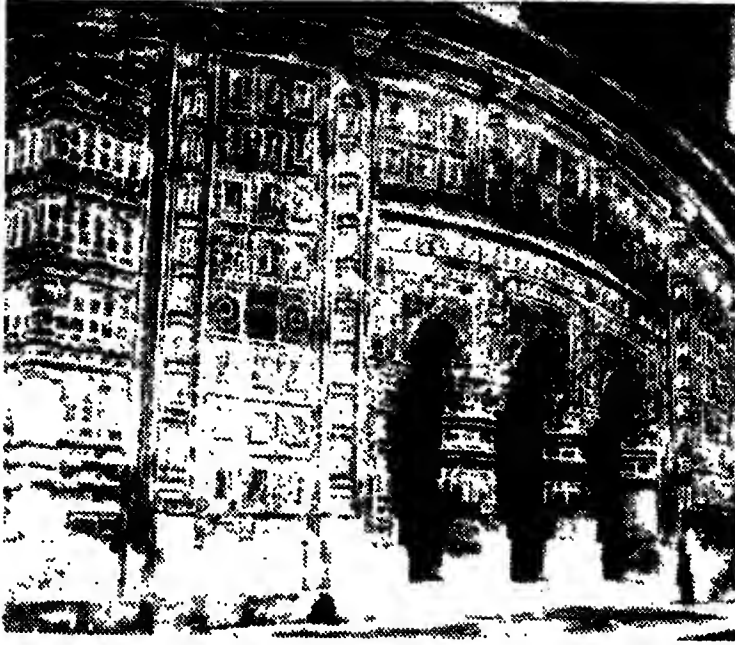
আরও বলা যায় সরকার যে সমস্ত প্রযা ও সেবা সরবরাহ করে তাদের ক্ষেত্রে দাম বাড়াকার আগে বার বার চিন্তা করতে হবে। এতে কার্ণিজাল নীতি বা উপপাদন-ব্যয় ও দামের অগাধ সম্পর্ক খানিকটা ব্যাচত হলেও ক্ষতি নেই। কারণ অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করেও প্রযাতি সরবরাহ করলে অর্থের সরকারের লাভ হয়—সরকারী আরবায়-নীতির এ একটা স্বীকৃত সত্য। রেলপথ পরিচালনার দ্বারাও হলোই যদি মাল্য বৃদ্ধি করা হয়, ডাক-বিশাগ পরিচালনার দ্বারাও দেখা দিলেই যদি খাম-পোস্টকার্ডের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে বেসরকারী ব্যবসা-কাগজের ক্ষেত্রে বর্ধিত দাম বা মুনাক্কা হ্রাসের দরুন দাম বাড়ান হলে অত্যন্ত নৈতিক দিক দিয়ে সরকারের বিশেষ কিছু বলবার থাকতে পারে না।

সুতরাং দাম কার্ণের মত দাম বৃদ্ধি রোধের কার্যও সরকারী উপপাদন ক্ষেত্র থেকে শূন্য হলে ভাল হয়। এর ফলে আর কিছু না হোক অত্যন্ত নৈতিক ক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হবে—বেসরকারী ক্ষেত্রের স্বাভাবিক মুনাক্কার ব্যবধান আবার কিছুটা ফিরে আসবার চেষ্টা দেখা দেবে। মোট কথা প্রতি বার দাম বৃদ্ধি ঘোরণার আগে বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করবে।

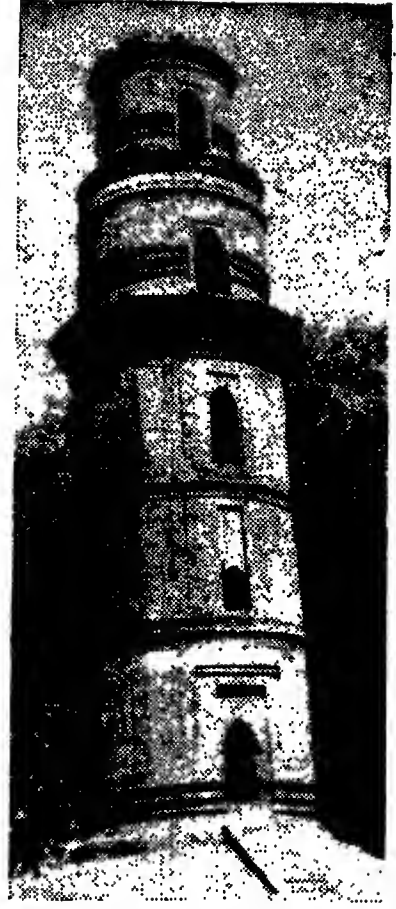
পরিশেষে, দ্বার্টিত বয়সের পথে অতি-সতর্কভাবে চলতে হবে এবং সর্বতোভাবে লোককে সম্মুখে উপস্থাপিত করে ঐ সম্মুখের বখারোগ্য বিনিয়োগ-ব্যবস্থা করতে হবে।

এইভাবে একদিকে যদি ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং অপরদিকে উপপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায় তবে আয়করের দিনের গাড়িমারে চলা মূল্য-স্ফীতি ইতাব লক্ষ্য দিয়ে উঠে অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যয় করতে সমর্থ হবে না।

অবশ্য এ ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে—মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয়, এই রকম নৈরাশ্যবাদ পোষণ করা চলবে না, ব্যাচ করা ত নয়ই। কারণ ঐ রকম ধারণা ও উক্তি মজুতদারী ব্যবসায়ী ইত্যাদিরই আশাবাদ সম্প্রসারণ সহায়তা করে। তার বদলে আইন-কানুন, বিরতিহীন প্রচলন ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধিরোধ সম্বন্ধে সরকারের নিজের এবং সমাজের শোভিত-শোণী আশাবাদ এবং শোষক-শ্রেণীর মাধ্যমে ভর গড়ে উঠতে হবে। এও অবশ্য এক পরিকল্পনার প্রদন। কিন্তু অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার চেষ্টা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।



কিন্দুপুরের পুণ্ড্রতাম্বিলের পোড়ামাটির অলঙ্করণ



কিরোর মিনার, গোড় (মালদহ)

।। ১ ।।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের আকর্ষণ আগেকার ভুলনায় এখন সে অনেক বেশি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাস্তাঘাটের অভাবে আগে সেসব প্রমুখস্থান ছিল দূরধিগম্য, এখন তা সঙ্গম হয়ে উঠেছে। পাকা সড়ক বিস্তৃত হয়েছে শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে, রেলপথ যেখানে নেই সেখানেও এখন নিত্য যাতায়াত চলেছে বাসের দৌলতে। আগে অনেক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে পৰ্বটকেরা খাওয়াওয়ার যেসব অসুবিধা ভোগ করতেন, এখন আর সেসব অসুবিধা নেই। সরকারী পৰ্বটনা দপ্তরের কল্যাণে বহু জায়গায় এখন আরাম-প্রদ পৰ্বটিক-আবাস বা ট্যুরিস্ট লজ চালু হয়েছে, অনেক জায়গা খোলা হয়েছে হু-ব-আবাস বা ইউথ হোষ্টেল। গাইডেরও ব্যবস্থা আছে বিশেষ বিশেষ পর্যটনক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন আছে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-বন্যস্তর, তেমন আছে শ্যামল শস্যপ্রান্তর আর সুনীল সমুদ্র। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত পার্বত্য অঞ্চলে যারা হ্রদের বেড়াতে চান, তাঁদের জন্যে আছে দার্জিলিং কালিঙ্গাং, কাশিরাং। সমুদ্র-সৈকতে যারা অবকাশ হান্সন করতে চান, তাঁদের জন্যে আছে দ্বীপা ও বকখালি। প্রাচীনকালের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক প্রাসাদ, দুর্গ,

মঠ, মন্দির, মসজিদ, মিনার, সমাধি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ যারা প্রত্যক্ষ করতে চান, তাঁদের আকর্ষণ করবে, গোড়, পাণ্ডুরা, ধানগাড়, মর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, কিন্দুপুর। তীর্থধর্মের আকর্ষণে যারা পশ্চিমবঙ্গে বেড়াতে চাইবেন তাঁদের হাতছানি দেবে নব-ম্বীপ, কালীঘাট, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, রিবেণী, কালনা, কাটোয়া, তারাপাঠ, জয়-রামবাটী, কামারপুকুর। অরণ্যগঞ্জে যারা ভ্রমণ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য রয়েছে উত্তর-

## মনোজ্ঞঃ বসু

বঙ্গের জলদাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জরন্তী, আর দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা। শিকার ও সংস্কারের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করতে হলে ভ্রমণ করতে হবে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে, বোগ দিতে হবে জয়দেব-কৈদুলা ও গঙ্গাসাগরের সৈকল এবং মালদহের গম্ভীরা আর পুন্ড্রিল্লার ছোট-বড়োয় আসরে। ডাছাড়া, শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে হুগলি বেড়াতে হবে-আলাদাল, চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুর-এলাকার, মন্সুরাকী ও কংসাবতী অঞ্চলে আর কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-চম্পা পরগণার হুগলি নদীর ধারে ধারে।

।। ২ ।।

পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল বলতে প্রধানত দার্জিলিং জেলাকেই বোঝায়। ছোটো-খাটো পাহাড় অবশ্য বাঁকুড়া-পুন্ড্রিল্লার অঞ্চলেও আছে। কিন্তু সেগুলি নেহাতই পাহাড়, পার্বত্য কোলাহলার দিক থেকে তাদের আকর্ষণ অকিঞ্চৎকর। দার্জিলিং হলে ভ্রমণের অন্যতম স্রোত শৈলাবাস। নগাধিরাঙ্গ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে এভারেস্ট এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার অনির্বচনীয় শোভা দেশী-কিশোরী সকল প্রেমীর পৰ্বটকের কাছেই বিরাত একটা আকর্ষণ। ডাছাড়া 'টাইগার হিল' থেকে সুন্দরীর নিরীক্ষণ, পার্বত্য উপত্যকাস্থিত নৃত্যগীত উপভোগ, এবং তাদের তৈরী নান্দরসম্বলিত-শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করার আগ্রহটাও নড়ো কম নয়।

দার্জিলিং শহরকে বলা হয়েছে 'কুইন অব দি হিলস্টেশন', শৈলজনগরীর রানী। এই উচ্ছ্বাসিত উত্তর কারণ বোঝায় এখান থেকে হিমালয়ের ভূবারাখ্যাত শৃঙ্গগুলি যে অপূর্ব শোভা নিয়ে চোখের সামনে উপস্থিত হয়, উত্তর ভ্রমণের আর কোনো শৈল-

বাস থেকে তেমনটা হয় না। শহরের কেন্দ্র-বিন্দুতে অবস্থার ভেতর হিল—তার মাথায় গায়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে কাম্বুজা ও তুসারাজ্যের অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ ও মৈলগিরি শোভা। অবশ্য ঘন মেঘ বা কুয়াশা না থাকিলে। এই অবস্থার ভেতর হিলের নিচেই বৃত্তাকারে বিন্দুত হয়েই ম্যাল বোড বা প্রধান ভ্রমণ সড়ক। বেড়াতে বেড়াতে ভ্রমণকারীরা চলে যাবেন জলাপাহাড়, সেখান থেকে আবার দুই ঘন্টা পথ পর্বত। ভ্রমণপথ উপরে-নীচে কত বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য কতরকমের গাছ-পালা রক্তবেরঙের কতো ফলের ও অকিউর সাদা-কালো-সবুজ কত রকমের পাখির বৃন্দ। শীতলগাড়ি থেকে দার্জিলিং পথান্ত, বিস্তৃত সড়ক পথে বা বেল-পথে যাওয়া যুরে বেড়াবেন তাঁদের চাথে স্মৃতি, একটা জিমিস ধবা গড়বে। জা হিলে পার্বত্য বন্যজীবন-সমৃদ্ধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লো কবি সত্যেন্দ্র নাথ বসন্ত 'পাগলাঝোরা'। মালের নিচে হিটরা বাসিত। বোধ স্মৃতি। ম্যাল বোডের এক পাশে রাজভবন, বাচ'হল পাক। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের শোভার বাঁবা মংগ বাচ'হল থেকে তাঁবা সূর্যাস্তের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করত ও ভোজেন না। দার্জিলিং শহরের অন্যান্য দৃষ্টবোধ মধ্যে বসন্তে মিউ জিয়াম কোটানিব্যাল গার্ডেন ভিকটোরিয়া জলপ্রপাত, দেশবন্দু চিত্ররঙ্গনব স্থান, একজিত বাসভবন স্টেশনআসাইড ইত্যাদি। দার্জিলিং শহরের আশেপাশে আবার কত দর্শনীয় স্থান।

কলকাতা থেকে উডোকাহাজ বাগ-ডাগবা ব্রহ্মানঘাটতে পৌঁছাতে সময় লাগে। মাত্র দেড় ঘণ্টা। তারপর, সেখান থেকে মোটরগাড়ীতে দার্জিলিং শহরে হাজির হতে ঘণ্টা আড়াই লাগলেও পাব তা। পথ সেই স্ট্রেটবাইসেব একটা আসাযা আনন্দ আছে। কলকাতা থেকে দার্জিলিং এর দূরত্ব প্রায় ৬৬৭ কিলোমিটার—যেখানে যেতে গোটাকিছু দিনই লেগে যায়। শেষ ৮৯ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় নিউ জল-পাইগাড়ি স্টেশন থেকে খেলনা বেলগাড়ীতে চলে, বিভিন্ন লুপ লাইনে। তাড়াহুড়ো যাদের সেই এবং ধৈর্য ধরে পার্বত্য শোভা নিরীক্ষণের ঝোঁকটা যাদের একটু বেশি তাদের কাছে খেলনা বেলগাড়ী কিন্তু আদৌ কেমন নয়। সমস্ত বেশি লাগলেও তাঁবা এ পথটাই বেছে নেন। আর, তড়িগাড়ি দার্জিলিং শহর যাঁবা পৌঁছাতে চান বা স্পীডের খিলটো যাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় তাদের জন্য ট্যাক্সি বাস ইত্যাদি হাজির থাকে শীতলগাড়ীতেই। সাম্প্রতিক কাল-বাঙ্গালী পরিবহণের কল্যাণে কলকাতা থেকে বালু ও দার্জিলিং যাওয়া হচ্ছে। আর তাতে সময়ও যে খুব বেশি লাগে তা নয়। সব ঠিকঠাক থাকলে, মাত্র সাড়ে বোলো ঘণ্টার বাস-যাত্রা।

দার্জিলিং এর পথে কালিমং আবার একটা জম্বুজ মৈলশহর। শীতলগাড়ি থেকে এর দূরত্ব ৫৯ কিলোমিটারের মতো, আর দার্জিলিং থেকে ৩২ কিলোমিটার। কালিমং

থেকে যে-দৃশ্যটি ভ্রমণকারীদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, তা হলো দক্ষিণাঞ্চলস্থ বালোর সূর্যাস্ত সমুদ্র তুমির সৌন্দর্য। এখানে দার্জিলিং থেকে শীত অপেক্ষাকৃত অনেক কম হলেও শীত পাত হর বেশি। শহরের চারদিকে পাহাড়ের গার গারে অনেকগুলি চা বাগান। তাই দৃশ্যও চমৎকার।

কালিমং হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল আর একটি শৈলাবাস। এখান থেকেই হিমালয়ের দক্ষিণবর্তী বেন বেশি করে উপভোগ করা যায়। দার্জিলিং শহর থেকে কালিমংয়ের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। এর পাশচমে বড় রপ্যাত মদীর শ্যামল উপত্যকা, দক্ষিণ পাশে সিংল পাহাড় ও বন, পূর্বে বালি নদীর উপত্যকা, আর দক্ষিণ পাশে বঙ্গের সমতলভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এখানই কালিমং-এর বড়ো আকর্ষণ। তাছাড়া, কালিমং থেকে পর্ব-চকবা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক গিয়েও খাজিবে আসতে পারেন দিমকয়েকের জন্য।

দার্জিলিং অঞ্চল পর্য্যটনের সুযোগ সুবিধা যে আপসবার চলে আসে এবং তাতে সমুদ্র নেট। এ বিষয়ে ব্যাভাব্য পথের বিভাগের ভূমিবা উন্নয়ন। গড় ক্রমক বছরের মধ্যে তাঁবা দার্জিলিং ও কালিমং এর মোট পাচাচ যাত্রীবাস যাত্রণ করেছেন তিনটি দাঁতিনতে আর দুটো কালিমং এ দার্জিলিং ওয়াবস লক। বলাসবহুল এবং আধুনিক যোগ্য বিভিন্ন উপকরণ সমৃদ্ধ। মাল বোড অবস্থিত এই লকল দুই বছর ১৯৭০ চেষ্টা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার। দৃশ্য শস্যাবিশিষ্ট পর্বত শ্রমকর আছে। তাই মধ্য তিনটি বেশ বড়মড। ভাড়া শস্যাবিশিষ্ট, ত্রিংশ টাকা দৈনিক। আর গোটাকিছু নিল পণ্ডাশ টাকা। অন্য যে বাবাটি ডবল দুই আছে সেগুলিও প্রত্যেকটি দৈনিক ৬০ বা ততোধিক টাকা বা শস্যাবিশিষ্ট পাচশ টাকা হবে। অফ সিজনে বাস যাত্রণ ও পাওয়া

যায়। ভাবতীয় ও ইউরোপীয় সব বকনব খানাপিনাব ব্যবস্থা আছে এই লক। খাওয়া-খরচ বেড চা থেকে লক, করে প্রাচ্যবাস, শ্রমপ্রাহারক আহাৰ, বৈকালিক চা ও মেশ-ভোজ সম্রুত পাড় পণ্ডাশ-ছাশিশ টাকাব মতো। বাবা বছরের ক্রমবর্ধমান ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে পানব-খল টাকা। এই হিসেব থেকে মপটই এটা বোঝা যাবে যে, দার্জিলিংয়ে এই ট্যাবিস্ট লক প্রধানত বিস্মান পর্বতের জন্যই। তবে মধ্যবিস্ট পর্বতকয়ের জন্যও দার্জিলিং একটি অসামান্য যাত্রানিবাস স্থাপন করেছেন স্টেট ট্যাবিস্ট ডিপার্টমেন্ট। সেটি হলো জলাপাহাড় রোডের শৈলাবাস। রেল স্টেশন থেকে দুই তিন কিলোমিটার। মোট সতেরটি ঘর আছে এখানে। তার মধ্যে দুই শস্যাবিশিষ্ট ঘর একটি, ভাড়া শস্যাবিশিষ্ট দৈনিক আট টাকা পাচ ও হয় শস্যাবিশিষ্ট নয় শস্যাবে ছটি ও চারটি—ভাড়া শস্যাবিশিষ্ট ছ' টাকা রোজ। তাছাড়া আট শস্যাবিশিষ্ট ঘর আছে পাচটি এবং একটি ঘর আছে নয় শস্যাবিশিষ্ট। এই দুটি ঘরের 'খ' কানো একটি ঘর আশ্রয় নিল শস্যভাড়া দৈনিক মাত্র পাঁচ টাকা। অন্যান্য ঘরের ক্ষেত্রে লাগোয়া গেমসখানা থাকলেও দৈনিক দৈনিক বাখবুমাট অংশ বসন। শৈলাবাসে ৬ কাল আশ্রয় ও নিরামিষ দুইরকম খাবারই আপান পাবেন, তবে ইউরোপীয় নয়, মপুণ দাঁত খাবাব। প্রাচ্যবাসে খরচ পাড় পাচাসবের মতো শ্রমপ্রাহারক ও স্নাতক প্যাব তিন বাবা কবে বৈকালিক চা পাচাব প্যসা। আর ভোববলার চা পট-মুদ্র পণ্ডাশ প্যসা থেকে দাঁতবা। সান্তিস ঢাক শ্রবকা পাচ টাকা।

সিগ্গেলব ক্রাবহাউস অ্যান্ড চ্রাসেট ও কাক আকর্ষণীয় যাত্রানিবাস। ঘর বেল-স্টেশন থেকে এব দুই চাব কিলোমিটার। চা শস্যাবিশিষ্ট দুটি ফ্যার্মিন স্নাত আশ্রয় এখানে। প্রতি সতের ডান দৈনিক ত্রিশ টাকা অর্থাৎ শস্যাবিশিষ্ট মাত্র সাড়ে সাত

বোলারসী ও সিক্ক  
মোহিনী মোহন  
মজিলাল ও সন্স  
কলেজ স্ট্রীট জম্বুজ  
বলিকাতা



## দীঘা সমুদ্র-সৈকত



টাকা আর একটা সন্নিবে এই যে, পরিবারে বাড়তি দু-একজন থাকলে অতিরিক্ত খাটের সন্নিবে পড়বে। আর অতিরিক্ত খাট অবশ্য দাঁড়িয়ে বেশ এক সন্নিবে দেয়। আর না। খাটের ভাড়া পড়ে প্রত্যেকটির জন্য পাঁচ টাকা করে। ছয় শয্যা বিশিষ্ট দুটি ডবল-ব্লিটের আছে এই প্রাইভেটসে। রেলগাড়ির টাওয়ার স্ট্রীপার কোচের মতো ওপরকার বিছানা পিছনে ভাড়া পাঁচ টাকা, আর নিচে কার প্রতিটি বিছানার ক্ষেত্রে সাত টাকা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু-রকমের খানাপিনার ব্যবস্থা আছে এখানে। টাইগার হিলের সূর্যোদয় দেখবার জন্য যেসব পর্যটক বিশেষ আগ্রহী, তাদের পক্ষে এখানেই রাতিশাপন সন্নিবেজনক। কেননা, কাছেই টাইগার হিল। পার্কে যেতে ধীরে-সুস্থে প্রতীক্ষিত ও উদয়পর্বের আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছানো যায়। সূর্যোদয় মিস করবার দরভাবনা থাকে না।

কালিঙ্গপুত্রের যাত্রীনিবাস দাঁড়ির মধ্যে একটি হলো ভারতীয় ও ইউরোপীয় আহরণের ব্যবস্থা সমন্বিত ট্যুরিস্ট লজ, অন্যটি 'শ্যাংরিলা' পর্যটক-আশ্রয়। শিগ-গার্ডি রেল স্টেশন থেকে প্রথমটির দূরত্ব একাশী কিলোমিটার, দ্বিতীয়টির দূরত্ব তার চেয়ে তিন কিলোমিটার কম। প্রথমটিতে এক শয্যা বিশিষ্ট শয়নকক্ষ আছে দুটি এবং তিনটি কামরা আছে দুই শয্যা বিশিষ্ট। এক শয্যা বিশিষ্ট শয়নকক্ষের ভাড়া দৈনিক পঁচিশ টাকা। দুই-শয্যা শয়নকক্ষের মধ্যে একটি বেশ বড়। একজন যাত্রী গোটা ঘরটো নিজে ভাড়া পড়বে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক। কিন্তু একই দলের দুজন প্রান্তবসক থাকলে ষাট টাকা, তৃতীয় যাত্রী তেরিশ টাকা, আর চতুর্থজন থাকলে পঁচাত্তর টাকা বা যাত্রাপ্রদর্শন পাঁচ টাকা দক্ষিণ। সাধারণ ডবল-ব্লিট আর বেস-দাঁড়ি আছে সেক্ষেত্রে

শয্যাপ্রদর্শন চারশ টাকা পর্যন্ত হলেও ঘন-পিছন তিন টাকা কম। এই ট্যুরিস্ট লজে অর্ডার-মাসিক খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং খাদ্যের পরিমাণ ও শ্রেণী হিসেবে দাম ধার্য হয়ে থাকে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রায় অভিজাত হোটেলের মত। 'শ্যাংরিলা' পর্যটক আবাসটি মধ্যবিত্তদের থাকবার উপযোগী। এখানে চার শয্যা বিশিষ্ট ও ছয় শয্যা বিশিষ্ট ঘরে আছে দুটি করে। নিচেকার বিছানার ব্যবস্থা মোট বারোটি, দক্ষিণা বিছানাপাশে দৈনিক আট টাকা। বাৎসরিক মতো ওপরকার বিছানা আছে আটটি—সেক্ষেত্রে প্রতি বিছানার ভাড়া ছয় টাকা দৈনিক। প্রাতঃরাশ ও লৈকালিক চা ছাড়া এখানে আহাৰ্য্যিক কোনো আয়োজন রাখা হয়নি। দুপুরকার ও রাতির খাওয়া-পাওয়াটা তাই ইচ্ছামতো অন্যত্র সেরে আসা যায়।

দার্জিলিং ও কালিঙ্গপুত্রের পর্যটক-আবাসগুলিতে থাকতে হলে আগে থাকতেই বুকিং করে যাওয়াটা নিরাপদ। কলকাতায় বুকিং হয় রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। ঠিকানা—৩।২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, কলকাতা-১ (ফোন : ২৩-৮২৭১)। আর, সরাসরি দার্জিলিং-এর রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতেও বুকিং করা যায়। ঠিকানা—'অজিত স্যানসন' নেহরু রোড, দার্জিলিং (ফোন : দার্জিলিং-৫০)।

দার্জিলিং একাকার ভ্রমণ সমাপ্ত করে সমতলভূমিতে নেমে আসবার পথে কোটহলী ভ্রমণকারীরা ইচ্ছে করলে জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়া জলস্রাবাটী ও এবার ঘুরে দেখে আসতে পারেন। অরণ্যে বিরলশীল বাঘ, হরিণ, জলকুক, গাড়ার প্রভৃতি কন্যাপ্রাণী প্রত্যক্ষ করবার এ একটা ভ্রমণকার সুযোগ। হোলং-এ বন-বিভাগের বে রেস্ট-হাউস আছে, সেখানে অনায়াসে

রাতিশাপনও করা যায়। সেখানে খাল-খাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তা মোটামুটি ভালোই করতে হবে।

।। ৩ ।।

এবারে বলা যাক পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র-সৈকতে ভ্রমণের কথা। ভারতবর্ষে পশ্চিম-বঙ্গেই একমাত্র রাজ্য যেখানে তার মাঝার আছে হিমালয়ের তুষারকিরীট, আর পার্শ্বের কাছে আছে পড়ছে কেনিডোজল সাগর। শহর থেকে দূরে, কোলাহলের বাইরে সমুদ্রসৈকতে দিনকতক কাটিয়ে আসবার পক্ষে মেদিনীপুর জেলার কথি মহকুমায় অতগত দীঘা একটি উপযুক্ত স্থান। কলকাতা থেকে খলপূর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরে যেমন সেখানে পৌঁছানো যায়, তেমনি কলকাতা থেকে সরাসরি দীঘা পর্যন্ত আরামপ্রদ বাস-সার্ভিসও আছে। খলপূর থেকে দীঘার মধ্যে সারাদিন অনেক প্রাইভেট বাস এবং ট্যাক্সিও চলাচল করে। সড়কপথে কলকাতা থেকে দীঘার দূরত্ব ২৪০ কিলোমিটার। কাসে বা মোটরে গেলে সমুদ্র লাগে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা। কলকাতা থেকে যেমন বাসসার্ভিস আছে, তেমনি আছে বর্মহান, দুর্গাপুর, আসানসোল, সিউড়ি (শান্তিনিকেতন), বাঁকুড়া এবং বাড়গ্রাম থেকেও। কখন, কোথা থেকে এই সব বাস ছাড়ে তার ধরারখবর এবং বাসে সাঁট রিজার্ভের জন্য কলকাতার যাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারেন রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে ভ্রমণের স্থান হিসেবে দীঘা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ হলো দীঘার শান্ত ও মনোরম পরিবেশ এবং থাকা-খাওয়ার সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা। তাছাড়া, প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শান্ত সমুদ্রসৈকতের আলোদা একটা আকর্ষণও আছে। খাউবীথি ও বালি-রাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে পূর্বদিকগত সূর্যোদয় এবং সমুদ্রবক্ষে সেই সূর্যের অস্তগমন নিরীক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটা পুলকানন্দ অনুভব করা যায় বৈকি। তাছাড়া, সারা বছর ধরে দীঘা সমুদ্র-সৈকতের আবহাওয়াও থাকে মনোরম। সাম্প্রতিককালে দীঘার সমুদ্রে শাঙন ধরেছে, কিন্তু চেণ্ডাও চলেছে সেই ভাঙনের হাত থেকে দীঘাকে রক্ষা করবার।

সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়ানো ও সমুদ্র-দ্রাব্যের আকর্ষণ ছাড়াও দীঘার আশেপাশে দর্শনীয় স্থান কিছু কিছু আছে। যেমন, চার কিলোমিটার দূরবর্তী একটি প্রাচীন শিবমন্দির। তাছাড়া, কথিখর কাছে আছে কপালকুণ্ডলা মন্দির, আর আছে দীঘা থেকে চান্দ কিলোমিটার দূরবর্তী লক্ষ্মেশ্বরী বিগ্রহ। দীঘার নুনের কারখানাটিও দেখবার জিনিস। দীঘা থেকে তার দূরত্ব হবে বাইশ কিলোমিটারের মতো। জুন-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে গেলো নতুন অভিজাত সঙ্কল

বকখালিতে যাওয়ার বিশেষ কোনো  
 বাসনা নেই। রপ্তানীর পরিবহনের এস-  
 'স্যান্ডেড অফিস' গিরে বাসের টিকট কিনে  
 নিজে বাসে চড়েই যাবে। এই বাস গিরে  
 নামখানা পর্যন্ত। নামখানায় নদী পার হতে  
 হবে। ওপারে পৌঁছাইলে দেখবেন একস-

পড়ে আনন্দ পাবেন

দাখিলিঙ্গ নহরের কেন্দ্রস্থল মন্ডলে একটি রেস্টোরাঁ



প্রশ্ন রয়েছে দাঁড়িয়ে। সেই বাসে চেপে সোজা ফেজারগল। সেখান থেকে বকখালি খুব কাছেই, দু' কিলোমিটারের মধ্যে। সব-সুস্থ ঘণ্টাপাঁচেকের মতো লাগবে সমুদ্র-তীরবর্তী বকখালি পৌঁছতে। আহারাঙ্গির জন্য আছে 'চীপ ক্যান্টিন'। মোটামুটি ভালো ব্যবস্থা। প্রাথমিক একটা চিকিৎসা কেন্দ্রও আছে এখানে। তাছাড়া, পুলিশ-ক্যাম্পের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বিপদ-আপদের কথা ভেবে।

।। ৪ ।।

বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাসের বহু স্মৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে পশ্চিম-বঙ্গের নানা জায়গায়। সেগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান গোড়-পান্ডুরা আদিনা, মুর্শিদাবাদ, আর বাঁকুড়া-বিক্রমপুর। সমগ্র সংরক্ষণের অজবে বহু জায়গায় বহু পুরাকীর্তি আজ লুপ্ত-প্রায় হলেও, উল্লিখিত জায়গাগুলোতে এখনও অনেক কিছু দেখবার আছে।

গোড় - পান্ডুরা - আদিনা—মালদহের তিনটি ঐতিহাসিক স্থান। শহর থেকে দক্ষিণ দিকে সাত-আট মাইল গেলেই আপনার নজরে পড়বে গোড়ের ধ্বংসাবশেষ। পিয়ান্সবাড়ি ছাড়িয়ে আধ মাইলের মধ্যেই পড়বে রামকলি গ্রাম। বন্দোবস্তের পথে মহাপ্রভু ত্রিচৈতন্য এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই স্মৃতি বহন করছে এখানকার তমালতলা। রূপ-স্নাতনের স্মৃতিও ছড়িয়ে আছে এখানে। যেমন—রূপ-সাগরদাঁড়ি, মন্দনোহন ঠাকুরবাড়ি, গ্যাম-কুন্ড প্রভৃতি। গোড়ের ষটকর্ণালির মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় সুলতানী আমলের বহু হাবেলি, মসজিদ, মিনার, দুর্গ বা দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, যেমন—বার-দুর্গ বা বড়-সোনা মসজিদ, দখল বা

দাখিলিঙ্গ দরওয়াজা, হাবেলিখাস, ফিরোজ-মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদমরসুল, চিকা মসজিদ, লোটন মসজিদ, ছোটো-সোনা মসজিদ প্রভৃতি।

কাস্তুবিদ্যার বিস্ময়কর নিদর্শন বার-দুর্গার বা বড় সোনা মসজিদ গোড়ের সবচেয়ে বড়ো আর জমকালো অট্টালিকা। ছোটো ছোটো ইট আর পাথরের খিলান দিয়ে এটি তৈরি হয়েছিল ১৫২৬ খৃঃ অব্দে, সুলতান নসর শাহের আমলে। অনেকের ধারণা, গোড়ার দিকে এটি বাদশাহী দস্তরখানা হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে মসজিদে পরিণত হয়। এক সময় এর ওপরে কারুকার্যচিত ৪৪টি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ ছিল। তার বেশির ভাগই ভেঙে গেছে, টিকে আছে গুটি-কয়েক। দখল বা দাখিলিঙ্গ দরওয়াজা গোড়-দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার, ছোটো ছোটো লাল ইটের তৈরি। এর বতটুকু অংশ আজও টিকে আছে, তার কারুকার্য দেখে অবাক হতে হয়। এর চারকোণে যে চারটি গম্বুজ বা টাওয়ার আছে, সেগুলি পাঁচতলা উঁচু। ঐতিহাসিকদের অনুমান এই তোরণবারটি নির্মিত হয়েছিল ১৫-শ শতকের গোড়ার দিকে। এই দরওয়াজা থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে গেলেই নজরে পড়বে ফিরোজ শাহের আদেশে নির্মিত ৮৪ ফুট উঁচু এক বিজয়-স্তম্ভ, ফিরোজ-মিনার নামে যেটি চিহ্নিত। এই স্তম্ভের ভিতরে ৭০ ধাপ-বিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিঁড়ি আছে। আগে এই মিনারের মাথায় একটি গম্বুজ ছিল। এখন আর সেটি নেই। এই মিনারের কাছেই রয়েছে গোড়দুর্গের পূর্বদিক বা লুকোচুরি দরওয়াজার ধ্বংসাবশেষ। তার পাশেই কদমরসুল মসজিদ। ভিতরে গেলে নজরে পড়বে কশিপাথরে খোদিত একখোড়া পদ-চিহ্ন। লোকের বলে, পদ্মস্বর-রসুলের পারের ছাপ। চিকা মসজিদের দরজার ও

খিলানে একটা অশুভ জিনিস গেছে পড়ে। তা হলো পাথরের কারুকার্যের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। অনেকের তাই ধারণা, গোড়ার এটি হিন্দু-মন্দিরই ছিল, পরে মসজিদে রূপান্তরিত হয়। ১৫-বর্ষের-এর মিনার কারুকার্য ইট দিয়ে তৈরি লোটন মসজিদটিও দেখবার মতো। মসজিদটি তৈরি হয় ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে, সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, বাদশাহী দরবারের কোনো এক নর্তকী নাকি এই মসজিদটি তৈরি করিয়েছিলেন।

মালদহ শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরবর্তী পান্ডুরা এক সময় ছিল গোড়-বঙ্গের আর এক রাজধানী। অনেকে মনে করেন, পান্ডুরা ছিল হিন্দুজন-অধিবাসিত শহর। কেননা, সেখানকার মসজিদ ও দরগাহ হিন্দু-আমলের বহু ইট-পাথরের স্থান পাওয়া গেছে। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি হলো একজন খাঁ মসজিদ। ১৪১২ থেকে ১৪১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্মিত। এই মসজিদের সম্মুখ-দ্বারের খিলানে একটা হিন্দু দেবমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে দেখা যায়। পান্ডুরার অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেখানকার বড়-দরগা ও কুতুবশাহী মসজিদ।

সুবিখ্যাত আদিনা মসজিদ আপনি দেখতে পাকেন পান্ডুরার পূর্ব সীমানায়। মসজিদটি ১০৬৪—১০৭৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে তৈরি বলে অনেকের অনুমান। অর্থাৎ, প্রায় ছ'শ বছর আগেকার। অংশত বিধ্বস্ত হলেও মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব এক নিদর্শন। মালদহ মিউজিয়মে গেলে গোড়-পান্ডুরা-আদিনার ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত বহু পাথরের মূর্তি, মূদ্রা, শিল্পালিপি প্রভৃতি দেখে চমকিত হবে যে-কোনো অনুসন্ধানকারী।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো এইসব প্রাচীন কীর্তির সংগে পরিচিত হবার সুযোগ ছাড়া মালদহের আরও অনেক আকর্ষণ আছে। তার মধ্যে বিভিন্ন কুতীর-শিল্প, বিশেষ করে তসর, গরল, মূদ্রা-জাতীয় রেশম-কর্নশিল্প যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমন হলো আমের মরশুমের রকমারি আম, আর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা-উৎসব। এই উৎসবের মধ্যে থাকে মেলা, গান ও নাচ। বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গম্ভীরা-গানের বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। শিবের গাজনই গম্ভীরা-গানের প্রধান উৎস। শব্দ, গান দিয়ে গম্ভীরার আসর জমে না বলে অভিনয় ও বাজনার আরোহণও থাকে।

ফারাকার গজার ওপরে সড়কসেতু নির্মিত হওয়ার এখন মালদহে বাঙালী সহজতর হয়েছে। কলকাতা থেকে মালদহ পর্যন্ত ৩০৮ কিলোমিটারের পাকা সড়ক রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে অতিশয় কমতে সময় লাগে আট ঘণ্টার মতো। ট্রেনও হওয়া যায়। থাকা-খাওয়া সবসময় সুব্যবস্থা



আমার মা  
লোকেদের জামাকাপড়  
সেলাই ক'রে  
আমাকে পড়িয়েছেন !  
তবে আমি শিক্ষা-বিসয়ক বৃত্তি  
বীমা'র পলিসি নিয়ে রবিকে  
উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

“যখন আমার রবির জন্ম হয় তখনই আমি ওর তত্ত্ব  
৭,০০০ টাকার ১৬ বছর মেয়াদের একটি পলিসি নিয়ে  
নিই। এর জন্ম মাসিক প্রিমিয়াম মাত্র ৩০ টাকা ৮০ পঃ।  
পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হ'লে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পো-  
রেশন আমাকে পাঁচ বছরের জন্ম প্রতি ছয় মাস পর পর  
৭০০ টাকা ক'রে দেবে। এই টাকার রবি সহজেই  
কলেজে পড়াশুনা করতে পারবে। এমনকি আমার  
অবসরকালেও রবি ওই টাকা পেতে থাকবে (সেই ক্ষেত্রে  
আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না)।”

আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা

আপনিও লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এই ধরনের

পলিসি নিয়ে আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত  
ক'রে ফেলতে পারেন। এর প্রিমিয়াম—আপনার বয়স,  
বীমার প্রেমী, আর পলিসির মেয়াদের ওপর নির্ভর করবে।  
আপনার ছেলেমেয়ের জীবনকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা  
থেকে রক্ষা করার জন্ম বীমা-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য  
উপায়।

আপনার সব রকমের প্রয়োজন মেটাবার জন্ম লাইফ  
ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের অল্প আরও অনেক রকমের  
পলিসি রয়েছে। আজই লাইফ ইন্সিওরেন্স  
কর্পোরেশনের একজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।



জীবন বীমা নিয়ে ওদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা করে তুলুন



## দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ



পৰ্বতন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজে। রেল-স্টেশন থেকে তার দূরত্ব মাত্র দু' কিলোমিটার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু' শয্যার দুটি এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রণবিহীন দু' শয্যার দু'টি শয়নকক্ষ আছে এই লজে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে শয্যাপিছ ভাড়া দৈনিক পনের টাকা। আর, দু' শয্যার ছটি ঘরের প্রতিটি শয্যার দক্ষিণা বারো টাকা। দু' শয্যাবিশিষ্ট আর যে চারটি শয়নকক্ষ আছে, তাতে ভাড়া অনেক কম, শয্যাপিছ সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু'রকমেরই খাবার পাওয়া যায়। খরচ পড়ে এই রকম—বেড-টী পঁচাত্তর পয়সা, প্রাতঃরাশ তিন টাকা, দুপুরের আহার তিন টাকা থেকে সাত টাকা, বৈকালিক চা পোনে দু' টাকা, অন্য নৈশ-ভোজ সাড়ে তিন থেকে সাড়ে সাতটাকার মধ্যে।

মালদহ থেকে ফেরবার পথে, কিস্বা সেখানে বাবার পথে আর্গনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদটাও ঘুরে দেখে যেতে পারেন। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২১৯ কিলোমিটার। সরকারী বাসে বা টেনে করে কলকাতার মাস্টার মার্গ। এখানে ছাড়িয়ে আছে সম্রাট ওরঙ্গজেবের অধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন অট্টালিকা, মসজিদ, উদ্যান প্রভৃতি। লাল-বাগের কাটা মসজিদের অনেকাংশ ভেঙে গেলেও এটি দেখার মতো। এই মসজিদটি তৈরী করিয়েছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ, মক্কার মসজিদের আগলে। মুর্শিদকুলি খাঁর কবরও আছে এখানে। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ বর্তমানে একটি জাদুঘর বিশেষ। ১৩৫ বছর আগে মীরজাফরের উত্তরাধিকারী নবাব হুমায়ুন এই প্রাসাদ ভবনটি তৈরী করেন। সিরাজদ্দৌলার আমলের বহু অশ্ব-

শ্বত, কাপড়-চোপড়, চীনেলটির বাসন-কোসন, অলংকার, মূর্তি, পুঁথিপত্র ও বই, ভৈরবী প্রভৃতি রক্ষিত আছে হাজারদুয়ারী প্রাসাদে। অন্যান্য দৃষ্টব্যের মধ্যে 'জাফরগঞ্জ দেউড়ি' অন্যতম। লোকে বলে, বিশ্বাস-ঘাতকের দেউড়ি বা নিম্নকহারাম ফটক। এক সময় এখানেই ছিল মীরজাফরের বাসভবন। কিংবদন্তী এই যে, এই দেউড়িতেই মীরজাফর হাতে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়, হতভাগ্য নবাব সিরাজকে। কঠিনোদ্যানে উদ্যানবাটিকাটিও দর্শনীয়। কোন এক ধনী জৈন ব্যবসায়ীর বাগানবাড়ী ছিল এক সময়। পুরনো আমলের একটি জৈন মন্দিরও আছে এখানে। জাফরগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র থেকে দু' কিলোমিটার দূরে নজরে পড়বে ১৮ শতকের ভারত-বর্ষের সবচেয়ে ধনী ও মহাজনদের সমাধিস্থ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের প্রাসাদ। নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ ভবনের মাইল দেড়েক দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে সুবিশিষ্ট মোতিঝিল। আলিবর্দী-কন্যা ঘসেটি বেগম থাকতেন এইখানে। মীরজাফর এটিকে উপঢৌকন দেন ইংরেজদের। লালবাগে ভাগীরথীর অপর পাড়ে রয়েছে আলিবর্দী, সিরাজ আর সিরাজের বেগম লুৎফুন্নেসার কবর।

মুর্শিদাবাদের অন্যান্য দৃষ্টব্যের ডালিকার পড়বে পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত বরানগরের রাণীভবানী মন্দির, জাহানকোবা কামান, কালিমবাজারের প্রাসাদ, কুজঘাটার অবশিষ্ট মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ, আর পল্লবী। পলাশী বর্তমানে নদীয়া জেলার প্রান্তসীমায় অবস্থিত হলেও আগেছিল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ সম্বন্ধিত হয় এই পলাশীর অশ্বকুলসংলগ্ন প্রান্তরে।

পৰ্বতিনদের কাছে মুর্শিদাবাদের আরও একটা আকর্ষণ আছে। এখানে এখানকার

হস্তশিল্প। কেমন—গজদন্ডে তৈরী নানা রকমের শিল্পসামগ্রী, রেশম বস্ত্র, খাঁড়ি-বাসন ইত্যাদি। বহরমপুরে বাঁরা বেড়াতে যান তাঁরা সেখানকার বিখ্যাত মিস্টার্স হানাবড়ার স্বাদ নিতেও ভোলে ন।

রাজ্য সরকারের পৰ্বতন বিভাগ থেকে এখানেও একটি ট্যুরিস্ট লজ খোলা হয়েছে। রেল স্টেশন থেকে মাত্র দু' কিলোমিটার পথ। এই লজে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু' শয্যার কামরা আছে দুটি, ভাড়া মাথাপিছ দৈনিক পনের টাকা। আর শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-বিহীন দু' শয্যার কামরা আছে মোট সাতটি। সেখানে শয্যাপিছ দৈনিক ভাড়া কামরা টাকা। কিন্তু চার শয্যার যে দুটি শয়নকক্ষ আছে এখানে, তার প্রতি শয্যার দৈনিক ভাড়া মাত্র চার টাকা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু'রকমের খাদ্যবস্তুই মেলে এই লজে। প্রাতঃকালীন চা সমেত চার কেলসার খওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ পড়ে মাথাপিছ দশ টাকা থেকে আঠারো টাকা। বহরমপুর শহরে কম খরচে থাকবার আরও অনেক জায়গা আছে এবং সস্তা হোটেলেরও অভাব নেই।

পৰ্বতন তথা শিল্পপর্যটক ভ্রমণকারীদের কাছে বাঁকড়া-বিক্রপুপুরের আকর্ষণটা যে অনেকখানি সেকথা বলাই বাহুল্য। কেননা, সম্রাট পশ্চিমবঙ্গে পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত এক মন্দির বাঁকড়া-বিক্রপুপুরে ছাড়া আর কোথাও নেই। মমুরাজাদের আমলের বহু কীর্তি এখানে ছড়িয়ে রয়েছে বাঁকড়া-বিক্রপুপুরে এখানে-ওখানে। বিক্রপুপুরের অধিকাংশ মন্দিরই এদেশের প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্করদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জোড়বাংলা, শ্যাম রায় ও মদনমোহনজের মন্দির। জোড়বাংলা মন্দিরের গঠনসৌন্দর্যে কোন কোন তুলনাই হয় না। মদনমোহনজ মন্দিরটিকে 'পঞ্চম মন্দির'ও বলা হয়। কলকাতা দিয়ে তৈরী এত কড় পঞ্চরত্ন মন্দির বাংলাদেশে আর নেই। বিক্রপুপুরের আর একটি দৃষ্টব্য হলো লালবাধ। মমুরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এই বাধটি তৈরী করেন। এই বাধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ইরানী-সহচরী লালবাই-এর স্মৃতি।

বাঁকড়ার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামের কলকটি মন্দির ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরও প্রাচীন যুগের স্থাপত্যকলার অনেক নিদর্শন প্রাপ্য। লহর থেকে ছাতনার দূরত্ব মাত্র দু' মাইল। টেনে ও খালে যাওয়া যায়। বৈষ্ণব কীর্তিকৃতিক কলকটি মন্দির স্মৃতিবিজড়িত বাগদৌলী দেবীর মন্দির এখানকার অন্যতম দৃষ্টব্যস্থান। বাঁকড়ার লু মাইল দূরে স্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে আছে একেশ্বর শিবের মন্দির। এরকম সুন্দর ও সুন্দর গঠনসৌন্দর্যবস্ত মন্দির বাঁকড়ার আর কোথাও পড়ে না। শশুনিয়া পাহাড়টিও বাঁকড়া পৰ্বতিনদের কাছে একটা রক্ত আকর্ষণ। লহর থেকে এর দূরত্ব মাইল

পাশ্চাত্যবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য  
শৈবতীর্থ হলো ভারকেশ্বর। ঠাণ্ডা থেকে  
রেলপথে এই স্থানের দূরত্ব ৩৬ মাইল।  
স্বাধীনতালাভের পর কলকাতা থেকে ভার-  
কেশ্বর পর্যন্ত যে পাকা সড়কটি তৈরি হয়েছে  
বাসে বা মোটরে করে সেই পথেও আজ-  
কাল সহজেই যাতায়াত করা চলে। ভারকেশ্বর  
শৈবের মন্দিরটি এখানকার প্রধান দর্শনীয়  
স্থান। ভারকেশ্বর বসন্ত শৈববিগ্রহ বলে  
বর্ণিত। তাই, টের মন্দিরটিও বসন্তের মতো  
ছাড়াও সারা বছর পরেই ভারকেশ্বরে তীর্থ-  
যাত্রীদের সমাগম হয় থাকে। পুনর্জী কেন্দ্র  
আর একটি তীর্থস্থল হলো হিরোণী। প্রায়  
সোয়ান গঙ্গা, যমুনা ও সপ্তধর্মী নদী ত্রিভুজ  
মস্তকের। হিরোণী এই ত্রিকোণের কেন্দ্র  
ভায়া মস্তকের। হিরোণীর গঙ্গোত্রী মন্দির  
তাই পুনর্জী বলেই অভিহিত হয়ে থাকে।  
ঠাণ্ডা থেকে বাগডোজ রেল স্টেশন হয়ে ষোল  
দশ মাইল পথের ব্যবসায় থেকে মাত্র পঁচি  
মাইল। এখনও একটি স্টেশন আছে। সড়ক  
পথে বাসসহ হাওস গায় লিহনগড়। লিহনগড়  
বারানী, মকরস্রোতি প্রভৃতি বিহার-বিলাস



[ উপন্যাস ]

# ফুল ফোটার আগে

শৈলেন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিভার চোখ কৌতুকে নেচে উঠল।  
বলল, 'আপনি মহাভারত পড়েননি?'

'হ্যাঁ পড়েছি, ঠিক মনে নেই। তা ছাড়া  
কথাটা বিশ্বাসও হচ্ছিল না। ইচ্ছে করে  
কেউ মরে কিনা, বা মরলেও যে ভীষ্মের  
ইচ্ছামতো হয়েছিল তার কোন সাক্ষী সাবদ  
নেই—'

কথার মাঝখানেই বিভা অসহিষ্ণু হয়ে  
বলে উঠল, 'না মরলে মহাভারতে শূর-  
শূর ভীষ্মেরই ইচ্ছামতের কথা লেখা হবে  
কেন। আরও তো অনেকে সেইভাবে মরতে  
পারতেন, যেমন বর্ধিষ্ঠন, ভীষ্ম, অর্জুন,  
কিন্ধা দুর্যোধন, কিন্ধা শ্রীকৃষ্ণ নিজে।  
শ্রীকৃষ্ণকে তো বাণ মেরেছিল : একটা পাখি  
ভেবে। এমন সুন্দর লাল টুকটুকো পু  
ছিল।' বলতে বলতে বিভার চোখ দুটো  
বুজে এল। ও বেন চোখের সামনে একজোড়া  
রাঙা চরণ দেখতে পাচ্ছিল।

অনিমেব নড়ে-চড়ে শূল। অনিমেব যে  
যুগ্মোদন, বোকা গেল।

বিভা আবার বলল, 'বিশ্বাসে মিলার  
হরি, তর্কে বহু দূর। আপনি যদি বিশ্বাস  
করেন, ভগবান আছেন, তিনি আছেন। যদি  
শলেন, নেই। কেন নেই, না থাকলে গাছ-  
পালা পশু-পাখী মানুষ জন্মাচ্ছে কী করে,  
মানুষ মরছে কেন, কেউ সুখ পাচ্ছে, কেউ  
কষ্ট পাচ্ছে—নানা প্রশ্ন। তার চেয়ে বিশ্বাস  
করাটা অনেক সহজ। প্রশ্ন থাকে না। প্রশ্ন  
না থাকলে অশান্তিও হয় না।'

'প্রশ্ন না থাকলে বর্ধিষ্ঠ অশান্তি হয়  
না?'

'হবে কী করে? আপনি যদি ভাবেন,  
একটা গাছে কী করে কল ফোটে আপনি  
জানবেন, তবেই না আপনাকে সেই গাছটার  
কাছে ছুটতে হবে। ফুল ছিঁড়তে হবে।  
টুকরো টুকরো করে চেখে মাইক্রোস্কোপ  
লিখলে কত কী ভাবতে হবে। কিন্তু যাদের  
মনে সেই প্রশ্ন নেই, দেখবেন, তারা খুব

শুখে আছে। ফুলটা দেখে ভাল লাগল,  
কেউ খোঁপায় পরলো, কেউ কোটে গুঁদে  
দিল, কেউ বা বৈঠকখানার এনে সাজিয়ে  
রাখলো।' কথা বলে বিভা অনেকক্ষণ আমার  
মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় বলল,  
'সত্যি না?'

বাড়ি হেলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, খুব সত্যি।  
তুমি আরও লেখাপড়া শিখলে পারবে। খুব  
ভাল রেকর্ড হতো তোমার।'

বিভাকে বিমর্ষ দেখাল। ও বলল, 'দাদা  
আর পড়তে দিল না। আমি পড়াশুনোর  
ভাল ছিলাম।'

অসন্তর্ক মূহুর্তে কখন স্পর্শকাতর  
জাগরণ এসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বল  
উঠলাম, 'তার চেয়ে অনেক ভাল করেছো  
রামা শিখে। পড়াশুনো করলে মানুষের  
নিজের হয়তো জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু সবাইকে  
কী এমন আনন্দ দেওয়া যায়! এই ঘরো না  
আজ যেমন খাওয়ালে, কোনদিন ফুলতে  
পারবো!'

বিভা সলজ্জ হেসে বলল, 'আপনি খুব  
পেটুক। খেতে ভালবাসেন।'

'আমার পেটে অনেকগুলো ডিল আছে।  
মা বলে, যাদের পেটে ডিল থাকে, তারা  
খুব খেতে ভালবাসে।'

বিভা খুব হাসতে লাগল। সামান্য কথার  
বিভা কী সুন্দর হাসতে পারে। ওকে খুব  
পরিচয় আর সরল দেখাচ্ছিল। এক সময়  
বললাম, 'যদি কোনদিন কোলকাতার মাও  
আমি তোমাকে পেরারা পেড়ে খাওয়াব।'

বিভা আনন্দের নেচে উঠল, 'সত্যি,  
নিজের হাতে পেরারা পেড়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ গাছে চড়ে নিজে পেড়ে দেব।  
আমি নীচে ফেলবো, আর তুমি কোচড়ে  
ভরে নেবে।'

হাসতে হাসতে বিভা বলল, 'আপনাকে  
দেখলে একটুও মনে হয় না যে আপনি গাছে  
চড়ে পারেন!'

আমাকে দেখলে কি মনে হয়?'

মনে হয়, আপনি খুব খেয়ে-দেয়ে  
যুগ্মোদন পারেন।'

'অচ্চ সেই তখন থেকে তোমার দাদাই  
ঘুমোচ্ছে।' বলে অনিমেবের পিঠে সুড়ঙ্গদাঁড়ি  
দিতেই অনিমেব লাফিয়ে উঠে পড়ল।

হাসতে হাসতে বিভা উঠে দাঁড়াল,  
দাঁড়ান, আপনাদের চা নিয়ে আসি, চারটে  
বেজে গেল।'

জামসেদপুরে আগে কোনদিন আসিনি।  
কিন্তু অনিমেব এমন সুন্দরভাবে জাগরণ  
নর্ণনা দিয়ে দিয়েছিল যে টেনে নেমেই  
মনে হল কতদিনের চেনা জায়গা। প্রথমেই  
গেলাম আগরওয়ালার কাছে। আগরওয়ালার  
অফিসেই ছিল। খাতির করে বসাল। একথা  
সেকথার পর কাজের কথা শুরুর হল।  
আমি বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর মত সাবধানে কথা  
বলার চেষ্টা করছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,  
'মার্কেট বর্ধি খুব ভাল এখন? আপনি  
র্যাকে দেখছি বহু মোটর গুঁক করে রেখে-  
ছেন?' র্যাকে বহু ইলেকট্রিক মোটর সাজান  
ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে আবার বললাম,  
'অবিশ্যি আপনারা ঠাকাওয়ালার লোক,  
আপনাদের মাল স্টক করতে গারে লাগে না।'

মিষ্টি কথার জগৎ তুচ্ছ। আগরওয়ালার  
খুশী মনে বিনর দোঁখরে বলল, 'আমি আর  
কী বড়মানুষ চ্যাটার্জি সাহেব। বা কিছ,  
সবই আপনাদের শৌক্যে।'

আগরওয়ালার কথা শুনতে শুনতে উঠে  
দাঁড়াল। হাটতে হাটতে মোটরগেলোর  
কাছে গিরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ-তো দেখছি  
বিভিন্ন কোম্পানীর।'

আগরওয়ালার সহজেই ফাঁদে প্য দিল।  
বলল, 'হ্যাঁ। বা এখন সুবিধা হয়, ভুলে  
রাখি।'

'কিন্তু চুটি অনুসারে আপনি ডা  
পারেন না।'

'কেন?' আগরওয়ালার কিশোরী হাসিত  
কিছুটা বা বিরত।



সেহেতু আমার কোম্পানীর সঙ্গে  
আপনার সে রকম একটা চুক্তি হয়েছিল তিন  
বছর আগে। যদিও সেই চুক্তি কিছুদিন আগে  
সেই হয়ে গেছে।

‘তার মানে এই না যে আমি আর কোল  
কম্পানীকে পরিত্যাগ না।’ আগরওয়ালার  
চোখের কলসি খসে উঠছিল।

‘একটা ভেলকি বসে, অবশ্য আপনি করতে  
পারবেন। সে কিভাবে বাধ্য হবার ক্ষমতা  
আজকে নেই, চাইও না। কিন্তু আপনার  
কোম্পানীর সঙ্গে আমার তিন বছর হওয়া  
পর্যন্ত, একই সময়ের বাড়ি কথা হল  
সিদ্ধে। একই ধরনের বিজ্ঞান কলকাতার  
কম্পানীর আপনি এক ভেলকি বসিয়ে  
পারেন না। আইনের চোখে সেটা দৃষ্টান্ত,  
কারণ সেইরকম একটা অপেক্ষাপত্র  
আপনি সেই করেছিলেন তিন বছর আগে।  
কপি যদি না থাকে, আমার কপি আপনার  
সম্মুখে পড়ি।’ কথামতো খুব ধীরে ধীরে  
শিখর ভাবে বলল।

‘কিন্তু ভাল হল। আগরওয়ালার নুর  
হল। বলল, ‘আইন নিয়ে দাঁড়াইনি করে কী  
হবে চ্যালেঞ্জ সাহাব।’ যা হয়ে গেছে যেতে  
দিল। আমার লোকগুলোও হয়েছে ভেলকি,  
কেন কিছু দেখবে না মনে না শুধু গল্প  
করবে।’ হঠাৎ আগরওয়ালার হাঁক ছেড়ে  
জাকতে লাগল, ‘ভট্ট, হই ভট্ট।’ একটা  
মোটা মোটা মতন ছেলে এগিয়ে এল।  
আগরওয়ালার হিন্দীতে বলতে লাগল, ‘কত-  
দূর জোকে বসেছি না অন্য কোম্পানীর  
মাল ভুলি না করে। কথা শুনিস না কেন  
তোরা। জোদের জন্যে বুঝে বসলে কি জেল  
খাটবে। যা, জিনিসগুলো সব সমস্তা নামে  
বিক্রি করে দিবে আর, একদিন।’

‘হেলেটা হুজুড় করে চলে যাচ্ছিল, বাধা  
নিয়ে বলল, ‘কোথায় যাচ্ছে?’

‘ছেলেটি অজ্ঞান বদনে বলল, ‘সমস্তার  
বিক্রি করে দিবে আসতে।’

‘প্রশ্ন করলাম, ‘সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে  
পারবে?’

‘আগরওয়ালার বলে উঠল, ‘পরবে না  
কেন, দাঁড়ি লাগলে সেনেসে যে কেউ লক্ষ্য  
করে থাকবে। আর দেরী করিস না ভট্ট, যা।’

‘ভট্ট, বোঝের খেতে বললাম, ‘ও আপনার  
কে হয়?’

‘আগরওয়ালার দাঁড়ি জায়ে বলল,  
‘আজকে বড় ছেলে। দেখেছেন এইটুকু  
করসেই লাখটা কীরকম লাভ। বড় হল ও  
আমার চেরেও বড় বললার হবে।’

‘আপনার কণ্ট হয় না?’

‘কেন চ্যালেঞ্জ সাহাব?’

‘এই যে আপনার বড় ছেলেকে জাহা-  
জারের দিকে তৈলে দিচ্ছেন?’

‘আগরওয়ালার চোখ দুটোকে প্রশ্ন করল,  
‘কেন?’

‘আপনি কি বিশ্বাস করেন, ভট্ট, সব  
জিনিসগুলো মাটির নামে বিক্রি করে দিবে  
আমার?’

‘আগরওয়ালার খতমত করে আজকে  
প্রশ্ন করে বলল, ‘বিক্রি না করে মালগুলো  
কি করবে ভট্ট?’

‘সেহেতু দরজা দিয়ে গুলোকে তুলে  
রাখবে।’

‘আগরওয়ালার সমস্ত দাঁত বের করে  
হাসতে লাগল। ধরা পড়ে গিয়ে মানব যে  
এরকম নির্লজ্জভাবে হাসতে পারে জানা  
ছিল না। কিছুক্ষণ হাসার পর আগরওয়ালার  
আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘আপনার  
ব্রেন খুব চমৎকার পরিষ্কার আছে বার-  
সাহেব। এরকম মানব সঙ্গে শেলে আমি  
জানি বসে যেতে পারি।’

‘উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘আমি খুব  
দখিখি আগরওয়ালার, যে আপনাকে  
হাসা বানাতে পারলার না। আজ চলি, পরে  
দেখা হবে। নমস্কার।’

‘সে কী কথা বাবুসাহেব। একটু কণ্ট  
করে এলেন। গরীবের চ্যালেঞ্জ পা রেখে  
চলে যাবেন, তা কি হয়। একটা চা-টা খেয়ে  
যান। আরে ভট্ট।’ আগরওয়ালার গলা  
কাটরে সমানে চীৎকার করতে লাগল।

‘বললাম, ‘ভট্ট, এখন কুলী ডাকতে  
গেছে, শুনতে পাবে না। আর কোনদিন যদি  
সুযোগ সুবিধে হয়, এসে চা খেয়ে যাব।’  
বলে চলে আসিলাম।

‘আগরওয়ালার হস্ত-বস্ত হয়ে সামনে  
এসে দাঁড়াল। ‘চা না খাবেন না খান, কিন্তু  
ডিলারশীপ আমার চাই-ই মিস্টার চ্যাটার্জি।  
আমি এক ওপর ভরসা করে বসে আছি।’  
‘কাজটা আপনি ভাল করবেন।’

‘কেন, কেন, চ্যাটার্জি সাহাব। কোন  
গোলমাল দেখা দিয়েছে কি। যদি কিছু,  
গোলমাল থাকে, আপনি বাবুসাহেব না মশাই  
সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ভি পেট  
ভরবে, আমি ভি ভুখা হবে না।’ আগর-  
ওয়ালার হাসি-ফাঁস করতে লাগল।

‘বললাম, ‘দেখা যাক, সবই ভগবানের  
হাত।’

‘ভগবানটান কিছুই না মশাই, সবই  
মানুষের হাত। মানুষের হাতই বা বলাই  
কেন, সবই তো আপনার হাত। যাকে  
রাখেন, যাকে মারেন, দয়া করবেন হুজুর।’  
আগরওয়ালার মূখ কাঁচাকাঁচ করে আমার  
সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

‘আমি গিয়ে কোলকাতার রিপোর্ট  
পাঠাবো, ডিলারশীপ দেওয়া বা নেওয়া  
তাদের ইচ্ছে। তবে এতদিন বেভাবে কাজ  
পেরে এসেছেন, সেইভাবে পেতে চেষ্টা  
করলেন না কেন?’

‘আগরওয়ালার হঠাৎ দু-হাত দু-দুই  
গেল। ওর মুখ কণ্ট কানে এল, সেভাবে  
আর হয় না মশাই। আপনার ম্যানেজার  
এক চামর লোক। দস্তুর এগুত কোম্পানী  
নিজের লোক বলে অন্যভাবে তাকে ডিলার-  
শীপ দিতে চাইছে। কিন্তু চাইতেই তো  
হবে না। আইন আছে, বিচার আছে, আর  
আছে টাকা। খেলা দেখিয়ে ছাড়বে না।’

‘যদি তেঁকে বোঝানো আসতে  
বললাম, ‘তবে তাই দেখান।’

‘আগরওয়ালার আর বাধা দিল না। পের-  
বারের মত খসল, ‘আমি বাজারে বদলার

হুজাবো। সমরমত মাল দিতে পারে না যে  
কোম্পানী, সেই মাল বকে করে ডিলার পথে  
বসবে। আরও বলবে, আপনার মালের  
চাহিদা শুধু নামের জোরে, আসলে মাল  
বহুই দাঁড়ি। বহুসেন মশাই, খুব সাবধান।  
আমি—’ ওর শেষ কথামতো আর শোনা  
পেল না।

‘ভালো ভাল দস্তুরকেও আঁকি, দেওয়া  
গেল। বহুই ডিলার, কলি কলি কলি।  
শনিবার দিন ডিলারশীপ-কাইর দিয়ে জাহাজ  
আগে তেওয়ারী কানের সঙ্গে বহুই লাগিয়ে  
চুপি চুপি বসে দিরাইলেন, কিন্তু একটা  
নাম দেখবেন, দস্তুর এগুত কোম্পানী।  
দেশপাণ্ডে সাহেবের খুব বহুই লোক।’  
‘তেওয়ারী, আর অপেক্ষা না করে চলে  
গিয়েছিলেন। আজকে বাইরে বাসারে রেখে  
দস্তুর ধীরে ধীরে কাজ সারলেন। কচির  
ভেতর দিয়ে দস্তুরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।  
এমন কিছু পরকারী কাজ নিয়ে বাস্ত  
রয়েছেন বলে মনে হল না। কিছুসংখ্যক  
মানব যে এভাবে নিজের পদমর্যাদা বাড়ার  
সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিছুক্ষণ  
পরে ভেতরে ডাক পড়ল। হাত দিয়ে চোখের  
দেখিয়ে বলতে বলে দস্তুর একটা কাগজ  
গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন।  
অবশ্য আমি জানি কাগজটা তেমন জরুরী  
কিছু না। জরুরী কাগজ আসতকের  
সামনে বসে পড়া যায় না।

‘এক সময় দস্তুর মূখ তুলে তাকালেন।  
চমকার আজলে বহুইদাঁড়ি চোখদুটি  
হারিয়ে বারানি। ছোট চোখ, কিন্তু মূখ  
উজ্জ্বল। বললাম, দস্তুর বহুইমান মানব।  
বললাম, ‘আপনি কি আমার মালের  
ডিলারশীপ নিতে ইচ্ছা?’

‘আপনার কী কী মাল?’ দস্তুর  
এমনভাবে বললেন, ‘কেন আমি কেন ছোট-  
খাট দস্তুর কোম্পানীর প্রতিনিধি, যে  
কোম্পানীর নাম এখন পর্যন্ত জাহাজে  
হুজায় নি।

‘বললাম, ই-ডাউনাল পাম্প, জেনা-  
রেটিং সেট, মোটর, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফর-  
মার আরও কিছু কিছু জিনিস।’

‘দস্তুর বললেন, ‘আপনার কাছ থেকে  
যদি সুবিধাজনক সত্তা পাওয়া যায়, আমি  
ডিলারশীপ নিতে ইচ্ছা।’ উনি একদম  
তাকালেন, যাতে আমার কৃতার্থ খোঁচ করা  
উচিত।

‘দস্তুরকে ভাল করে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা  
তখনও প্রবল। বিনীতভাবে বললাম,  
‘আপনার নামকরা কর্ম। আপনার সঙ্গে  
কাজ করতে পারলে আমরাও বহুই  
হব।’ কাজ হল, দস্তুরের শীর্ষ মূখ  
উজ্জ্বল দেখাল।

‘উনি বললেন, ‘কাজ করা না করা মিথ্যার  
করছে অনেক বহুইদাঁড়ি ওপর।’

‘কি করলো আপনি চান?’ ‘কেন একটা  
সময় তাই করা কাজ দস্তুরের সামনে তৈলে  
লিখল।

দম্ভুর সোথ বসে কিছুক্ষণ কী ভেবে  
নিরু একটা পোশাক দিয়ে কাগজের ওপর  
লিখতে লিখতে পড়তে লাগলেন, প্রথম,  
পার্সেন্টেজ অব কমিশন বাড়িয়ে দেবে।  
শ্রীমতী, ফ্রিডম ফোর্সিবিটি। হাত পুঙ্খলি-  
নিটি। কোথ, মাল শট করার মত পোজাউন  
আমার নেই। একটা গুদামঘর ভাঙ করে  
দিতে হবে। কলা বাহাদুর সেই জাড়া  
আপনারা দেখেন। কিছু, আপনার সার্ভিস  
সবকিছু ছোট খাটো কমিশন খুঁজে পাই।  
আমি চাই না ভবিষ্যতে সে জাতীর কোন  
কমিশন আমার কানে আসে।

সেখা এবং পড়া দুইই শেষ হল।  
দম্ভুর মন খুলে জাকিয়ে রইলেন। হাসি-  
হাসি মধ্যে বললাম, শ্রীমতীর সেনাপত্যকে  
দিয়ে আপনার প্রোগ্রামসমূহ দেখ। কমে-  
জারিদের রায়স্ব ভাড়া এ সম্বন্ধে মতামত  
দেওয়া হবে না। আপনার সতর্গর্ভিল যদি  
একটা চিঠি আকারে দিয়ে দেন, আমাদের  
কালের খুব সুবিধা হয়।

হুত্ব রায়স্বও এক এক সময় হেসে-  
মানুষের মত কান করে ফেলেন। কিছুক্ষণের  
মধ্যেই দম্ভুর অন্তর সতর্গর্ভিলো চিঠির  
আকারে আমার হাতে দিয়ে ফেলেন, 'আপা-  
কীর আমাদের ও আপনারদের মধ্যে মৈত্রীর  
বন্ধন চিরস্থায়ী হবে।'

বললাম, 'আমাদের দিক থেকে সে বিষয়ে  
কোন চেষ্টা হবে না।' বলে বেরিয়ে এলাম।  
মাত্র কয়েকটা দিন হল নতুন এই পদে  
এসেছি। নিজের গল্পে নিজেই মন্থ হয়ে  
গেলাম। এক চালে দম্ভুরকে কীভাবে মাং  
করে দিয়ে এলাম! প্রথমত আমাদের  
কোম্পানী ধরে কারবার করে না। আত্মতাপ  
দিয়ে বেখানে মাল পাওয়া যায় না, বাকীতে  
কারবারের প্রথম সেখানে ওঠে না। শ্রীমতীর  
বাল্যের সতর্ আলার কথা আমাদের তরফ  
থেকে, দম্ভুরের কাছ থেকে না। চিঠি পেরে  
কোম্পানীর সম্মানে লাগবে, স্বভাবতই  
দম্ভুর আত্ম কোম্পানী খসে পড়বে, যেটা  
কিনা আমি আর অনিমেব চেয়েছিলাম।  
বাকী রইল, ই-ডাউনমাল অ্যাকসেসেরি  
প্রাইভেট লিমিটেড। অনিমেব বলে দিয়েছে,  
বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, যদি সুবিধা হয়,  
একটাই ডিলারশীপ দিতে।

তখন লাগের সময়। হোটেলের ফিবে  
পেরে আমার এদিকে আসতে ইচ্ছে করল  
না। ভাবতেরে একবার দেখাই থাক না,  
যদি ওদের কাউকে পাওয়া যায়। প্রাথমিক  
কথাবার্তা পেরে গিয়ে বাকীটা না হয় চিঠি-  
পত্রে শেষ করা হবে। না হয়, আর একবার  
আসাও যেতে পারে। টেনে চড়তে আমার  
জো ভালই লাগে।

ই-ডাউনমাল অ্যাকসেসেরিয়ার ম্যানেজি:  
ডাইরেক্টর এস কে মৃধাখি' চেয়ারে  
জিল। হাত তেতরে পাঁজির দিতেই ডাক  
পড়ল। উল্লিখিত ডায়ালগীর পিছনে পিছনে  
যে ঘরে গিয়ে চুকলাম, একটা ছোট-খাট  
কোম্পানীতে এই ধরনের চেয়ার দেখা  
যায় কমিশন। প্রকৃত মন। জল্পিত ঘর  
ছোট ছোট কাপড়। প্রতি পদক্ষেপ পা

ছুবে ছুবে বাজিল। নরম শিথি আলো হবে  
একটা মোহমর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখতে।  
দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কানে এস, 'লীজ  
কাম ইন।' তারপর হাত দিয়ে চেয়ার বোঁধে  
অলম্বনসী এক ভল্লোকে উঠে দাঁড়াল।  
ভল্লোককে ভাল করে দেখার সুযোগ হল।  
লম্বা ছিপছিপে শরীর। স্যান্ড করা চুল।  
কাফা-দ্রুস্ত সাদা পল্লনে। উন্নত নালিকা  
আর প্রকৃত জলটি, যা কিনা সমস্ত চেয়ারায়  
একটা ব্যক্তিগত এনে দিয়েছে। ভল্লোক  
একটা দামী সিগারেট কেস আমার নামনে  
খুলে ধরে বললেন, 'লীজ হ্যাভ এ স্মোক।'।  
বলে নিজে একটা প্লাসে চুমুক দিলেন। মন  
না খেলেও মনের গম্ব আমার তরুণা নয়।  
বুকলাম, ভল্লোক দিনে-দুপুরে অফিসে  
বসেই ড্রিম্ব করতে অভ্যস্ত। কোন কোন  
বিরল মন্থত পিছনের একটা অংশ  
অভীর্কিতে কক্কাহ হরে চোখের সামনে  
এসে পড়ে। তখন সেই অংশটার দিকে ঃ  
ডাকিয়ে উপার থাকে না। লেখতে দেখতে  
মন ভারী হয়ে ওঠে, তবু সেইদিকে  
ডাকাবার কী প্রচণ্ড প্শ্বা! হঠাৎ করবী  
শ্রেন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল,  
'আপনি কোর্দাম মদ খাননি?' টান্ডিতে  
যেতে যেতে করবী একদিন আমাকে এই  
প্রশ্ন করেছিল। অভীর্কিতে শব্দের লহরী  
ভেদ করে সেই কথাটা ছিটকে এসে আমার  
কানে বাজল। চোখের খুব কাছে মন্থতের  
জন্য করবীকে দেখতেও পেলাম যেন। শূধ  
করবী না! করবীর পাশে ওর ছেলেও  
দাঁড়িয়ে রয়েছে। করবীর ছেলে কাদিছে  
আর আঙুল দিয়ে একজন লোককে দেখাচ্ছে।

এই সেই লোক। আমার কয়েক হাত  
দূরে বসে আছে সে। মাঝের ব্যবধান শূধ  
মাত্র একটা টেবিল। অনেকক্ষণ বসে থাকার  
পরও কোন কথা বলতে পারলাম না। মৃধাখি'  
মাঝে মাঝে প্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর  
সিগারেটে টান মারছে। কথা বলছে না।  
আমি যেন সহসা অনা একটা জগতে চলে  
গিয়েছিলাম। পারিপার্শ্বিকতা বলে গিয়ে  
অন্য একটা জগৎ—আমার পিছনের একটা  
জগৎ। আমার বাস্তবে ফিরে এলাম। শীত-  
তাপনিরাসিত ঘর, ঘরের নীচে আলো,  
পারের নীচের নরম গালিচা, দূ হাত দূরের

একজন উদ্ভত মানুষ, আমার চোখে মাধবতার  
সৃষ্টি করেছিল। আমার 'এপের মদ' একটা  
গম্ব। যে গম্বের ম্যাদ আমার অজানা। কিন্তু  
গম্বটা অজেনা নয়। এই লোকটি করবীর  
স্বামী কিনা জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার  
মনে হল, এ-ই করবীর স্বামী। করবীর  
স্বামী মদ খায়।

বললাম, 'আর ইউ এস কে মৃধাখি?'  
'নয়টস রাইট।' ভল্লোকের গলাটা বেশ  
ভরাট, পদুমমানুষের গল বেরকম হওল  
উচিত।

বাংলার বললাম, 'আমার নাম অংশুমান  
চট্টোপাধ্যায়।'

মৃধাখি' হেসে কল, 'আপনার হাত'  
দেখেই জেনেছি। আমার নাম লশ্যাককুমার  
মৃধোপাধ্যায়।'

বললাম, 'আপনি অনিমেব দত্তকে  
চেনেন?'

'আমরা একসঙ্গে ভল্লোকে পড়তাম।'

'এজেন্সির ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট  
জেনে আমি অনিমেবের কথামত আপনার  
সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'অনিমেব আমাকে ভালবাসে।  
ভালবাসে বলেই উপকার করতে চায়।  
যদিও আমাদের বন্ধুত্বটা গঢ়, কিন্তু  
চারিত্রিক দিক দিয়ে আমরা দুজনে দুই  
পোলের বাসিন্দা।' বলে হো হো করে  
হেসে উঠল লশ্যাক। ভারী গলার কেউ  
যদি উচ্চৈঃস্বরে হাসে আমার রক্ত দোলা  
লাগে। মনে হয় একটা দুরন্ত ঝোড়া যেন  
টংকটিগয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কথা বলতে  
বলতেও লশ্যাক অনবরত প্লাসে চুমুক  
দিচ্ছিল।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কিন্তু যদি মনে  
না করেন, এ ধরনের কথা হলিহ, শূধ মাত্র  
অনিমেব আমাদের দুজনেরই বন্ধু, বলে,  
অফিসে বসে ড্রিম্ব করলে কাজের কী  
হয় না?'

'না।' লশ্যাক যেন হাত নেড়ে একটা  
মাছি তাড়াল।

'আমি এসেছি আমাদের 'প্রডাকটের'  
ডিলারশীপ আপনাকে দিতে।'

'আমার ইতিকথা কিছু না জেনেই  
এতবড় কাজটা করে ফেলবেন? তাহাড়া,

# জাটা

উডা মশলাই

## কৃষ্ণচন্দ্রদত্ত

### (কুকর্মী)

প্রাঃ লিঃ এরঃ

### একমাত্র ব্র্যান্ড

জাটা-ব্রহ্মান হাইকোর্ট কড়ক স্বীকৃত ও গণপ্রশংসিত অঙ্গুর্যাদিত  
৬০৭, মর্ঘবি' বেকেন্স রোড, কলিকাতা-৭ কোল : ৩৩-১৩৩৭

আমি বললাম, আমি আপনি চাইলেও সে কাজ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শশাঙ্ক খুব প্রসন্ন সুরে কথাগুলো বলল।

‘কেন?’

‘আপনাদের ম্যানেজারটি বে কী চিকিৎসা আবার জানা আছে। এখানে, ক্লাবে লোকটিকে কতবার মিট করেছি। এতদূরে গাড়ি ছাড়িয়ে আসে কেন জানেন? মল পেতে। অথচ মল পেলেই বেশী কোনদিনই থাকে না। কোনদিন মাতালটাকে আউট হতে দেখলাম না। একটা জন্ম চরিত্রের লোক মশাই।’ শশাঙ্ক এমনভাবে নাক মুখ কোঁচকাল যেন এই মূহুর্তে পরিচয় দেকের খুঁ খুঁ কেসে বসবে।

‘অন্য কেন? মাতাল হয় না বলে?’ শশাঙ্ককে সাপাতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

‘ইয়েস। একশোবার ইয়েস। যে লোক মল খেয়ে নেশা করে না, সে কেন মদ খায় বলতে পারেন? মেরেবানুকের কাছে যাবে কুল? স্যার, প্রথম দিনেই মূখ খুলে ফেললাম। আমার দুজনেই অনিমেবের কথা। অনিমেবের দোহাই, কিছু মনে করবেন না।’ বলে শশাঙ্ক টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর হাতটা দুই হাতের মধ্যে নিতে কিতে বললাম, ‘না না, কিছু মনে করিনি। তবে আপনাকে এভাবে ড্রিং করতে দেখে সত্যি কথা বলতে কী আমার ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। অবিশ্যি আপনাদের বড়বরের ব্যাপার হলতো আলাদা।’

শশাঙ্ক একটা হাত বাড়ালে নেড়ে দিবে বলল, ‘কিসসো না মশাই, কড় খর ছোট ঘরের ব্যাপার না। মোট কথা, এবং মোদা কথা হচ্ছে, ন একর তালব্য শ আকার। নেশা। নেশা জমানো নিয়ে কথা। নেশা করতে আমার ভাল লাগে, তাই আমি মদ খাই। কায় কি?’ বলে শশাঙ্ক হঠাৎ বুক টান করে রক্তা-রক্তা জ্বকে বসল।

সামান্য লোভটা সামলাবার চেষ্টা করলাম না। বলে ফেললাম, ‘আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না?’

‘আমার স্ত্রী!’ বলে চোখ কুঁচকে শশাঙ্ক আমার মধ্যে যেন ওর স্ত্রীকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল। বিড় বিড় করে আমার বলল, ‘কোথার আমার স্ত্রী? সি-ইক ডেড। সে মারা গেছে।’ খেঁচের সিকে শশাঙ্কর কথা স্তম্ভিত হলে এল। বুকলায় ওর নেশা হয়েছে। ওর সমস্ত মূখ মুখই রক্তক হয়ে উঠছিল। চোখ বুজে বসে আসছিল। আমার দুজনে ওপর থেকে আসতে লাগল।

অফিসের চেম্বারে যে এ ধরনের একজন মত মানুষ দেখে ভাবতে পারি নি। প্রথমটার কী রকম হকচকিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, ‘শশাঙ্কবাবু, মিস্টার মূখার্জি।’

শশাঙ্ক কিক করে হেসে ফেলল, ‘মাতাল হওয়া আর অজান হওয়া এক কথা না বিকাশবাবু।’

ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘আমার নাম অংশু। অংশু চট্টোপাধ্যায়।’

শশাঙ্ক মূখ বিকৃত করে বলল, ‘নামটা খটোখটো, ভাল লাগল না। তার চেয়ে যদি কিশা কিম্বা অশোক বা এই ধরনের কিছু হতো অনেক সহজ হতো। পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্ত কী জানেন? সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে, সহজ হওয়া। বি-ইজি। সহজ হয়ে যান, দেখবেন কোন কষ্ট নেই। আমরা কষ্ট পাই, শূধুমার সহজ হতে পারি না বলেই না! এই যে সন্ধ্যা-সন্ধ্যা কেন, কোন কোনদিন গভীর রাত পূর্বন্ত আমাকে এই কথ ধরটার নিজেকে আটকে রাখতে হয়, কেন? হোয়াই? যেহেতু আমি সহজ হতে পারি না। আশ্চর্য্যকার আমাকে এই আড়াল থেকে বাইরে আসতে দেয় না। নিজের ইচ্ছার আজ আমি বন্দী।’ বলে দু হাত অসহায়ভাবে তুলে ধরল শশাঙ্ক।

এই অবস্থায় ব্যবসার কথা তোলা না তোলা সমান। উঠবো উঠবো করছিলাম, হঠাৎ শশাঙ্ক বলে উঠল, ‘আপনি বিরত কেশ করছেন, বন্ধতে পারছি। যদি লাগে আগে আসতে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলতে পারতাম। তা ছাড়া আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল। অবিশ্যি এমন ঘটনা প্রতি মাসে একবার দুবার ঘটেছে। তবু, অন এ স্পেশাল অকেশন, একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করা উচিত। তাই আজ এই বথেক মদ্যপান।’ বলে এক চুমুকে গ্লাস খালি করে ফেলল শশাঙ্ক।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কি স্পেশাল অকেশন আজ?’

‘আজ আমার স্ত্রী কোলকাতার চলে গেলেন।’ বলে মৃদুবেশ হাতের ওপর নিজের কপাল চেপে ধরল শশাঙ্ক। মানুষের এই অসহায় অকথা দেখতে খুব খারাপ লাগে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘পরে একদিন আসবো।’ জিটি গিথে জালবো। সেদিন ড্রিং করবেন না। চেষ্টা করবো লাগে আসেই আসতে।’ বলে জব্বারভাড়া খর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিগারেট আর মদের মধ্যে আমার মন বন্ধ হয়ে আসছিল। বাইরে এসে কিছুক্ষণ পাড়িয়ে থেকে গভীরভাবে নিশ্বাস নিতে লাগলাম।

কাছ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, কললাম, ‘আপনাদের আর কোন সাহেব আসেন নি এখনও?’

‘লোকটি কাল, ‘ও’রা সবাই লাগে পরে আসবেন। আপনি বসবেন?’

‘না’ বলে বেরিয়ে এলাম। অফিসটা আকারে বিশেষ বড় না। এখন মাধ্যমিক বিরাতি, কিন্তু মনে হল লোকজনের সংখ্যা বা ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি ভালই। অথচ এই কোম্পানীর বড়সাহেব একটা বন্ধ কামরার মত এবং অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাইরের ফেটে তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না। এর জন্য অফিসে কোন কাজের ব্যাঘাতও ঘটে না হয়তো। করবার কথা আবার মনে পড়ল। ইচ্ছে করলে করবী শশাঙ্ককে বাঁচাতে পারত। একটা অসহায় পশু জীবনের বিনিময়ে সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন তাকে দিতে পারত। করবীকে এই মূহুর্তে আমার দারুণ ঘণা করতে ইচ্ছে করল। বলতে ইচ্ছে হল, তুমি শুয়ানক নিষ্ঠুর করবী। একজন মদমর্দ মানুষকে ইচ্ছা করলে তুমি নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারতে। কিন্তু সেই চেষ্টা না করে তুমি কোলকাতার চলে গেলে।

দ্রুত পারের বাইরে বেরিয়ে এলাম। কর্মবাস্ত শহর। মানুষজন হাটছে, গাড়ি চলছে। কর্মমুখর জগতের মধ্যে নিজেকে ভুবির দিয়ে পরম সুখ পেলাম।

ট্রেন চড়তে চিরদিন আমার ভাল লাগে। আজও লাগল। অশ্বকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। কলকাতা ছেড়ে যেদিন আসি, সেদিনও অশ্বকারের মধ্যে ট্রেন ছুটে চলেছিল। মার কথা খুব মনে পড়ছিল সেদিন। আজ করবীর কথা মনে পড়তে লাগল। সেদিন করবী টার্মিনে যেতে যেতে বেসব কথা বলেছিল, সব মনে পড়তে লাগল। অথচ স্মৃতি রোমন্থন করতে আমার ভাল লাগে না। অতীত মানুষকে পিছনে টানে। জীবনের শেষ আমি সামনে এগিয়ে কেতে চাই। তাই অতীতের সঙ্গে আমার বড় বিরোধ। কিন্তু কোন কোন অসত্যক মূহুর্তে পিছনের জানালা দিয়ে কেসে আসা জীবনের কিছু কিছু অংশ দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বলেই তাকিয়ে দেখি। দেখি করেক মূহুর্ত। কিন্তু করবী আজ একটি জেদী মেয়ের মত ধারণার আমাকে টেনে টেনে পিছনে নিয়ে আসছিল। ধারণার ওর দিকে আমাকে আকৃষ্ট করতে চাইছিল। আমি সিগারেট খেতে ভালবাসি না। কিন্তু বন্ধ হাতে কিছু করার থাকে না, কিম্বা অজস্র কতগুলো চিন্তা এসে মন জারাজস্ত করে দিতে চায়, তখন আমি সিগারেট খাই।

খুব সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে সিগারেট টানতে হার। এই সন্তুষ্টতার মধ্য দিয়ে আমি একটা একঘেরে চিন্তাকে ছুঁতে চাই। অল্প আয় আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল। করবীর চিন্তাটা একটা নাছোড়-বাঁসা মাছির মতই উড়ে উড়ে আমার মগজে এসে কসছিল। করবী একদিন বলেছিল, ভূমি বোকা না, ভূমি ভীষণ ছেলেমানুষ। কথাটার মধ্য দিয়ে ও আমার অন্তর স্পর্শ করতে চলেছিল। জানি না, ওর সেই চেষ্টা সফল হয়েছে কিনা। আমার ধারণা, হয় নি। কারণ এতগুলো দিনের মধ্যে বিশেষ করে করবীর কথা আমার আর একদিনও মনে পড়ে নি। ব্যর্থতাকে আমি ঘৃণা করি। প্রেম ব্যর্থতা দিয়ে জাগে। ঠিক সেই কারণেই আমি করবীর প্রণয়প্রার্থী হতে চেষ্টা করি নি। করবীর প্রণয়ী না হলেও আজ আমি করবীর কথা ভাবছি, শশাঙ্ককে করবীর ম্যাক্সিমা করে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই উজ্জরণ করলাম, না। করবীর ম্যাক্সিমারূপে শশাঙ্ককে সম্পন্ন করিনি। ওকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবো, সে শশাঙ্কর অনিমেষের বন্ধু বলে। সমর সমর নিজের মনে এক গভীর অরণ্য বলে ভ্রম হয়। মনে হয় অশংকারাজ্য এক গহন অরণ্য আমার বুকের মধ্যে বাসা দেবে রক্তের, আর আমি সেই অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রাঙ্গিকরূপে একটি প্রাণী, পৃথু, চক্কা করে ঘুরেই মরিছি। এ যোয়ার নিরাম নেই, ভেদ নেই, উদ্দেশ্য নেই, শূন্য আবহমানকাল ধরে নিজের মধ্যে এই যে ঘরে ঘরা, কী বলে একে। আত্মসম্মান বা নিজেকে প্রকাশ করবে চেষ্টা? কিন্তু সে চেষ্টা তো আমার নেই। আমি বক্তব্যের সামান্য একজন মানুষ। আমি নিজেকে উপলব্ধি করতে চাই না, জগৎ সংস্পর্শে আমার কোন কোঁড়হল নেই। আমি শূন্য নিজেকে নিয়ে বিরত এবং আমার পারি পারিষদতা সম্বন্ধে সচেতন থাকি। অথচ এই মহাভূতে আমার চরিত্রগত দোষ কিম্বা গুণ (বা যাই হোক না কেন, একটা কিছু, যেটা কিম্বা শূন্য, মাত্র আমারই মত) হারিয়ে ফেলে আমি অন্য একজন মানুষের মত ব্যবহার করতে শুরু করে দিলাম। করবী, যে কিনা আমার জীবনে কেনদিন প্রেমিকারূপে আসে নি, বা আসার সম্ভাবনাও নেই, সেই কিম্বা এক রোমান্টিক গভীর মিলনে আমার সঙ্গে সন্দেহজনক ব্যবহারে লিপ্ত হবে পড়ল। রোমান্টিক নিশীথ বলতে আজকের রাজ্যটাকেই মনে হচ্ছে আমার। বাইরে অন্ধকার, ভেতরেও তাই। এই কারণেই আর যে ভিন্নজন যাত্রী রয়েছে, তারা রয়েছে। বাজেনে একটা ঠান্ডা ভাত। সর্বাঙ্গের মিলিয়ে এইরকম মহাভূতগুলো আমার মনে রোমান্ট হাড়িয়ে দেয়। করবী এখন আমার সঙ্গে রিহাভেই

হাড়ল না, আমি করবীকে নিয়ে নতুন খেলার মেতে উঠলাম, ধরা বাক, সমস্ত দিন পরে শশাঙ্ক করে ফিরে এসেছে। সন্ধ্যার দিকে খেয়ে ওর মন কতটা উত্তেজিত, কতটা মনোহর লাল, অসংলগ্ন কথাবার্তা। করবী আমার সঙ্গের করে গেছে। ওর গা দিয়ে শূন্য মন, গন্ধ বেরোচ্ছে। হঠাৎ কোন পাউডার বা সেন্টের গন্ধ। করবীর রক্ত চলে কোন তেলের আভাষ নেই। সুতরাং করবী যে তেল মাখে না তা নিশ্চিত। করবী বাই মাথুক না কেন, ওর শরীর দিয়ে মনে মিলিত গন্ধ বেরোচ্ছিল। কিন্তু একটা চড়া গন্ধ সেই গন্ধকে জ্বলন্ত করে ফেলল। জলদস্যুর মত করবীর সামনে এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক। নিমেষে করবীর মন মূর্খ কতগুলো কুটিল রেখা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ আগেও করবীর মনে আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিটা হারিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল, দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা আর শ্মশান। একটা কদম মানুষ বেন দুই হাত দিয়ে শশাঙ্ককে দূরে ঠেলে দিতে চাইল। কিন্তু পাওয়ার নেয়ার জলদস্যু আজ উদ্ভব হয়ে উঠেছে। সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই করবীর। করবী উচ্চস্বরে চীৎকার করে নিজের জীবনভিক্ষা চাইতে লাগল। কিন্তু কেউ করবীর কাছে এগিয়ে গেল না। হঠাৎ করবী আমার খুব কাছে এগিয়ে এল। ওর চোখে মূর্খ আগুনের শিখা। সেই আগুনে দিয়ে করবী আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইল। আমি ভর পেরে পালিয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু আমার সামনে পিছনে শূন্য আগুনের শিখা। আমি নড়ানো হয়ে করবীর কাছে নিজের জীবন ভিক্ষা চাইলাম। করবী আমাকে করুণা করল। আমাকে ভিক্ষা দিল।

জানি না, এভাবে নিজের সঙ্গে খেলা করে মানুষ সুখ পায় কিনা। আমি গভীর সুখ পেলাম। আমার ভারাক্রান্ত হৃদয় খুব হালকা হয়ে গেল। করবী আমার পিছনে থেকে সরে গেল। বাবার সময় সব আলাপগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেল।

টোন ছুটিছে। সঙ্গে সঙ্গে দুলছে ও। এলাহ চেনের সঙ্গে কাঠের টোকটাক হচ্ছে। চাকার খটখট শব্দ হাঁপিয়েও সেই

টোকটাকের শব্দ কানে আসছে। একক মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বুঝতে পারছিলাম। অনেকগুলো শব্দের সমষ্টি একটা বিরাট শব্দ হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চাকা গড়ছে। ঘর্ষণের ধাতব শব্দ, সঙ্গে এসে মিশেছে তাঁর গতির রুদ্ধ আত্মশব্দ। গতি বড় বাড়ছে, আত্মশব্দও তত বাড়ছে। অথচ এই আত্মশব্দ যে কার, টেলের না গতির, না চারিপাশের বায়ুমণ্ডলে প্রচলিত আলোড়ন সমৃদ্ধি হবার ফলে—কিন্তু পাচ্ছি না। শব্দ মনে হচ্ছিল, যে কোন মহাভূতে প্রচলিত হৃৎকার ছোঁতে মহাকাল ধাক্কা টেনেটেনে লাইন থেকে তুলে নিয়ে যে কোন একটা দিক হুড়ে ফেলে দিতে পারে। ধীরে ধীরে চোখ ধূমে জড়িয়ে আসছিল। সেই আত্মশব্দ বা ক্রম চাপা গর্জন আর আমার কানে আসছে না। শব্দ হাওয়া কাটার মিলিট শব্দ শব্দ একটা আসছে। মনে হচ্ছিল বিরাট আকাশের নীচে অসংখ্য বড় বড় পাখি জানা নেড়ে উড়ে চলেছে। ওরা উড়েছে, ওদের পাখার কম্পনে চারিদিকে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। সেই শব্দটা খুব ঘনিষ্ঠ বলে মনে হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে পড়ল। মনে পড়ল রাজভবনের নীচু পার্শ্বদেয়, পাশ দিয়ে যেতে যেতে রেড রোডের ট্রিক ওপার মাঝে মাঝে আমি একটা নীল আকাশ দেখতে পেতাম। সেই আকাশ দেখতে দেখতে একদিন আমি বলেছিলাম, এমন একটা আকাশ, যার রং গাঢ় নীল, নীচে চিমা রংয়ের প্রকাশ বড় মাঠ, আকাশে বড় একটা সাদা পাখি, পাখিটা উড়ছে না, শূন্যে ডাসছে।

সুপ্রিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিল। কথাটা বলে ফেলে আমার মনে হয়েছিল, এই কথা সুপ্রিয়াকে না বললেই ভাল হতো। সুপ্রিয়া হয়নি তারপে হাসবে। কিন্তু সুপ্রিয়া হাসে নি। চকিতে শূন্য একবার রেড রোডের ওপরে আকাশটাকে দেখে নিল, তারপর ঘেরকম হাঁটছিল, সেরকমই হাঁটতে লাগল।

করবীর কথা ভাবতে ভাবতে ইস্টার্ন সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ (কর্মসং)





# বিজ্ঞান কথা

## জীববিজ্ঞান ও প্যালিও ইঞ্জিনিয়ারিং

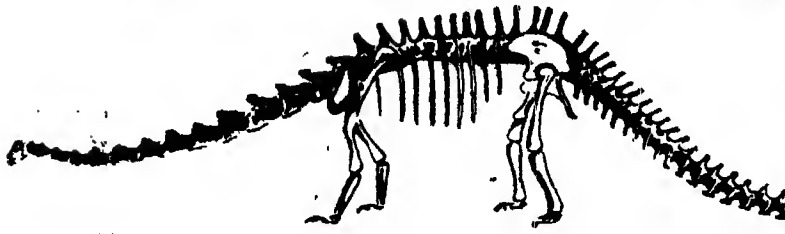
অনুবৃত্ত

পৃথিবীতে মানুষ এসেছে মাত্র ৫০ লক্ষ বছর আগে। 'ম্যান' বললাম এ-কারণে যে তার আগে প্রায় দু-শো কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো আকারে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। এবং এই সময়ের মধ্যে প্রাণের একটি বিবর্তনও ঘটে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় ছবি আঁকার মতো করে বলে দিতে পারেন কি-ভাবে আদিম সময়ের জলে এককোষী একটি জীব থেকে প্রাণের বাতাস শূন্য, কোন পর্বের মেরুদেশী, কোন পর্বের উত্তর, কোন পর্বের স্থলচর, কোন পর্বের খেচর, কোন পর্বের সরীসৃপ, কোন পর্বের স্তন্যপায়ী ইত্যাদি। এখনো পর্যন্ত মানুষ হচ্ছে প্রাণের বিবর্তনে উচ্চতম প্রকাশ কিন্তু তাই বলে দু-শো কোটি বছরব্যাপী প্রাণের বিবর্তনের সঙ্গে অ-সংস্পর্কিত নয়। যদি কেউ বলেন, আজ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে ট্রিাসিক কালের ডাইনোসরদের সঙ্গে মানুষও এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছে তাহলে কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তেমনি বলা চল না যে আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে ক্যাম্ব্রিয়ান কালে ট্রাইলোবাইট-দের সঙ্গে ডাইনোসরদেরও দেখা যেতে পারত। প্রাণের বিবর্তনে কোন সময়ে কোন জীবের উদ্ভব ও প্রায় ছকবাঁধা। পুরো একটি নিখুঁতভাবে জানা গিয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা অবশ্য দাবি করেন না। কিন্তু তাই বলে এতটা অসম্পূর্ণও নয় যে অস্বীকার করা চলে। এবারে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, এতটাই বা জানা গেল কি করে? কোনো মানুষ তো ডাইনোসর বা ট্রাইলোবাইটকে চাক্ষুষ দেখেনি, আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তাহলে ডাইনোসর বা ট্রাইলোবাইট বা এ ধরনের আরো হাজারটা জীব সম্পর্কে মানুষকে কে খবর জানাল? লিখিত ইতিহাস পড়ে বড়োজোর গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস জানা যাচ্ছে-কিন্তু তার আগের? সেই বিবরণ কোন পুঁথির পাতার লেখা আছে? কি ভাবে? প্রাণের বিবর্তনের বিবরণ সম্পর্কে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা তা উদ্ধার করেছেন ফসিলের পন্থা থেকে। অতীতের প্রাণীরা অনেক সময়েই তাদের অস্তিত্বের কিছু একটা নিদর্শন রেখে গিয়েছে--একটা হাড়, একটা দাঁত, পাথরের গায়ে অব্যবহৃত আকৃতির একটা ছাপ--ওরই নাম ফসিল বা জীববস্তু। বিজ্ঞানীরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এই সমস্ত ফসিল খুঁজে বার করেন এবং এই ফসিলের মাথোই খুঁজে পান পুরো জীবটির বিবরণ। ফসিল থেকে জীবের বিবরণ

সংগ্রহ--বিজ্ঞানের- একটি বিশেষ শাখা- হিসেবে ভারী নাম প্যালিওন্টোলজি বা জীববস্তুবিদ্যা। এই বিদ্যার চর্চা বারি করেন তারা হচ্ছেন প্যালিওন্টোলজিস্ট বা জীববস্তু-বিজ্ঞানী।

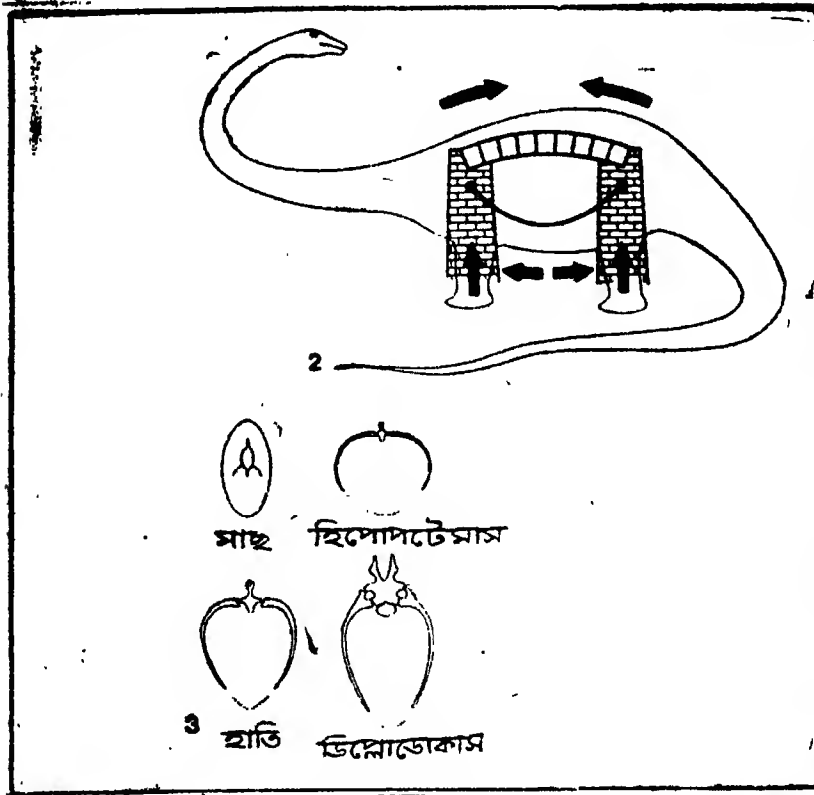
জীববস্তুবিদ্যার শুরুর বলা চলে, আজ থেকে দেড়শো বছরেরও কিছু আগে। একেই পৃথিবীর হিসেবে বারি নাম স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন ফরাসী বিজ্ঞানী জর্জ কুভিএ (১৭৬৯-১৮০২)। বহু কীর্তির অধিকারী এই বিজ্ঞানীর একটিবার কীর্তি উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে, জীববস্তু-বিজ্ঞানীরা কী আশ্চর্য কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে কুভিএর বরস হুড়ি, অর্থাৎ পূর্ণ বৃদ্ধ, তবুও তিনি এ দুনিয়া-কাপানা ঘটনা সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করেন নি, নরমাণ্ডির উপকূলে ঘুরে ঘুরে সাময়িক জীবের নমুনা সংগ্রহ করতেন। নিজের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি যে কতখানি নিবেদিত ছিলেন, খুঁড় এটুকু বোঝাবার জন্যেই এই ঘটনার উল্লেখ। তখনো পর্যন্ত এ ধারণা স্পষ্ট ছিল না যে, প্রাণের নানা রূপে প্রকাশের মধ্যে একটি নিয়ম আছে, একটা সম্পর্কের সূত্র। তবে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে প্রেণীবিভক্ত করা চলে। প্রেণী-বিভাগের একটি পন্থাতি আবিষ্কার করে-ছিলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস। এই পন্থাতিই এখনো পর্যন্ত অনুসৃত। প্রেণীবিভাগের আসল কথাটি কী? বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্য অনুসারে তাদের বিভিন্ন প্রেণীতে ভাগ করা চলে। যেকোনো ব্যাখ্যা করে লিনিয়াস যে বইটি লিখেছিলেন তার প্রকাশ-কাল ১৭০৬ সাল। তার-উইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' আরো একশ্রেণি পৃষ্ঠি বছর পরের ঘটনা। কুভিএর বৈজ্ঞানিক অনুসন্धानে লিনিয়াসের এই বইটিই তাঁকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছিল। তারপরে ১৮০২ সালে, কুভিএ বখন ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক, প্যারিসের জিপ্সোম থিন-অগুলের কতকগুলো ফসিল তাঁর হাতে এসে যায়। ফসিল বলতে টুকরো টুকরো হাড় ও দাঁত। তখন তিনি ঊঠপড়ে লাগলেন এই সামান্য হাড় ও দাঁত থেকে পুরো জীবটির গতি খাড়া করতে। সে সময়ের পক্ষে প্রায় এক অসম্ভব প্রয়াস বলা চলে। দাঁত পাওয়া গিয়েছিল দু-ধরনের--পেশন ও শব। পেশন দাঁতগুলোয় মধ্যে আমল নেই, কিন্তু শব-দাঁতগুলোর কোনোটা



ডিপ্লোডোকালের ফসিল। এই জীবটি লম্বা ছিল ৮৫ ফুট এবং তার ওজন অন্ততপক্ষে ছিল ৪০ টন।

২।। ডিম্বোডোকাসের শরীরের কাঠামোগত ডিজাইন। ওপরের দিকে আর্চ সেতু, নিচের দিকে সাসপেনশন সেতু। ৩।। মাছের শরীরের ক্রস-সেকশন বা প্রস্থচ্ছেদ। শিরদাঁড়া শরীরের মাঝখানে। অন্য তিনটি ছবি যথাক্রমে হিপোপটেমাসের, হাতি ও ডিম্বোডোকাসের।



ছোট কোনোটা বড়ো। মাথার খুলির হাড়ও এই অস্থি। কুঁড়িও লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে জোড় সেলাতে লাগলেন।

এবং শেষ পর্যন্ত অসাধ্যসাধন করলেন বলা চলে। সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন : পেষণ-দাঁতগুলো একালের গন্ডারের সঙ্গে তুলনীয় কোনো জীবের। পুরু, চামড়াওলা তুণ-ভোজী জীব। দু'ধরনের, কেননা শব্দ-দাঁত জিম। একটির নাম দিলেন 'অ্যানোসেলো-থেরিয়ারাম' (অস্ত্রহীন বন্য জন্তু), অপরটির 'প্যালিওথেরিয়ারাম' (প্রাচীন বন্য জন্তু)। শুধু এই সিদ্ধান্ত নয়, সূত্র জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত জন্তুটির সম্পূর্ণ আকৃতি সম্পনা করতে পারলেন এবং কাগজে-কলমে ছবি এঁকে দেখালেন। যে জীব পৃথিবী থেকে পঁচ কোটি বছর আগে লোপ পেয়েছে, সামান্য কয়েকটা হাড় ও দাঁত অবলম্বনে তার পুরো ছবি এমনভাবে সম্পনা করতে পারলেন যেন তিনি চোখের সামনে দেখছেন।

কিছুকালের মধ্যেই এমন প্রমাণ পাওয়া গেল যাতে মনে হতে পারত, তিনি প্রকৃতই চোখের সামনে দেখছেন। কিছুকাল পরে সেই জিপসাম খনি-অঞ্চল থেকে পাওয়া গেল প্যালিওথেরিয়ারামের আস্ত একটি কঙ্কাল। তখন দেখা গেল, সামান্য কিছু খণ্ডিতমাত্রের ব্যাপার বাদ দিলে কুঁড়ি-এর আঁকা ছবির এবং কঙ্কালের হুবহু মিল। পর্যালোচনাচার্য হিষ্ট্রি মিউজিয়মে

আঁকা ছবি ও কঙ্কালটি পাশাপাশি রাখা হয়েছে। দেখে মনে হয়, কঙ্কাল দেখেই ছবি আঁকা।

এই আশ্চর্য কান্ডটি ঘটিয়ে কুঁড়ি-এ একটি নতুন বিজ্ঞানের পত্তন করলেন : জীববাস্তববাদ। তারপর থেকেই ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবের সম্পূর্ণ মূর্তিটি খাড়া করার চেষ্টা চলছে। গত একশো বছরে এট বিশেষ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব ও গ্নেহকর্মান। যেসব জীবের কোনো-না-কোনো ফসিল পাওয়া গিয়েছে তাদের মোটামুটি একটা চেহারা এখন আমরা সম্পনা করতে পারি। আরো একবার বলি, বিজ্ঞানের 'ম-শাখাটির চর্চায় এ-ব্যাপার ঘটেছে তার নাম প্যালিওন্টলজি বা জীববাস্তববাদ।

#### প্যালিও-ইঞ্জিনীয়ারিং

ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবের ক্রিয়ণ সংগ্রহ—এই হচ্ছে জীববাস্তববাদ। এই ফসিল হতে পারে একটা দাঁত বা একটা হাড় বা শরীরে একটা ছাপ মাত্র। এই সামান্য পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ মূর্তিটি সম্পনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সাধারণত তুলনামূলক শারীরবিদ্যার সাহায্য নিয়ে থাকেন। আর ফসিলের বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার ও রসায়নবিদ্যার, ভূবিদ্যার তো বটেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আরো একটি বিদ্যার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। তা হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং। বিজ্ঞানীরা দেখছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্রগুলো (যেমন, সেতু

নির্মাণের সূত্র, বিমান নির্মাণের সূত্র ইত্যাদি) বলি জীববাস্তববাদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যায় তাহলে ফসিল থেকে সংগৃহীত বিবরণের অনেক ফাঁক ভরাট হতে পারে। বলা হচ্ছে, এ এক নতুন বিজ্ঞান : প্যালিও-ইঞ্জিনীয়ারিং। এই বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পৃথিবী থেকে লুপ্ত প্রাণীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানা যেতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগেকার কালের জীব টেরোডাকটিল টেরানোডন সম্পর্কে জানার চেষ্টা হচ্ছে। এই জীবটি আকাশে উড়ত, এত বৃহৎ আকারের উড়ন্ত জীব জগতে আর কখনো দেখা যায় নি। এই জীবটি সম্পর্কেই এতদিন পর্যন্ত যাকিছু জানা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী জানা গিয়েছে প্যালিও-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য নিয়ে—শুধু তার চেহারা সম্পর্কে নয়, বৈশিষ্ট্য থাকার ধরন সম্পর্কেও।

জীববাস্তববাদ্যার এতদিন পর্যন্ত কি করে এসেছেন? ফসিলের বয়স নির্ধারণ করতেন ভূবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সাহায্যে, ফসিলের সংরক্ষণ রসায়নবিদ্যার সাহায্যে এবং ফসিল থেকে সম্পূর্ণ জীবটির মূর্তি সম্পনা করতে চেষ্টা করতেন জীবন্ত জীবের শারীরগত কাঠামোর তুলনামূলক বিচার থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিংকে মোটামুটি উপেক্ষা করতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য অনেক বেশী লাভজনক। কেননা প্রত্যেকটি জীবেরই রয়েছে একটি বাস্তবিক কাঠামো আর সেই কাঠামোটি হওয়া চাই এমন যাতে তার ওপরে চাপানো ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে ও শক্তপোক্ত হয়। প্রত্যেকটি জীবকেই নড়াচড়া করতে হয়, কাজেই মাংসপেশী হওয়া চাই যথেষ্ট বৃহৎ ও সঠিকভাবে স্থাপিত। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য নিয়েই এই বিচার হতে পারে।

বিশেষ করে বড় মাপের জীবগুলোর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য বিশেষ ফল-প্রসূ। যেমন, ৮৫ ফুট লম্বা শরীরবিশিষ্ট ডাইনোসর ডিম্বোডোকাসের কথা ধরা যাক। এই জীবটির পুরো শরীরের ভার বহন করতে চারটি পা। তাহলে সেই বিশাল শরীরটি মাঝখানে দিয়ে ডেবে কেত না কেন? কান্ধা হিসেবে বলা হত, ডিম্বোডোকাস সাধারণত থাকত জলে এবং জলে থাকার দরুন তার শরীরের ওজন কমে যেত—ফলে পায়ের ওপরে বেশী ভার পড়ত না। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র প্রয়োগ করে ডিম্বোডোকাসের শরীরের কাঠামোর দিকে তাকালে বোঝা বাবে, এটির গড়ন এমনই যে, ওপরের দিকটি আর্চ সেতুর মতো আর নীচের দিকটি সাসপেনশন সেতুর মতো। আর লম্বা গলা ও লেজ যেন শরীর থেকে উন্নত ক্যান্টিলিভার। এক্ষেত্রে কমপ্রেশন চেষ্টার হচ্ছে শিরদাঁড়া আর জীবিত অবস্থায় শিরদাঁড়ার উপরে যে পেশীকণ্ঠ ছিল সেটাই টেনশন মেম্বার। বোঝা দেখানে সবচেয়ে বেশী শিরদাঁড়ার শিরা দেখানে সবচেয়ে লক্ষ্য।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র ধরে এমনিভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, ডিস্লামডোকাসের কাঠামোটিই এমন যে তার ভারটি পা জ্ঞার শরীরের পুরো ভার বহনে সক্ষম। সেক্ষেত্রে এই জীবটির জলে আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ডাঙাতেই দাঁবিা চলা-ফেরা করতে পারত। একালের হাতীও ডাঙার জীব, তেমনভাবেই তার শরীরের কাঠামো তৈরী। কিন্তু হিপোপটেমাস ডাল-কাসে জলে থাকতে। হাতীর শরীরের গড়নের সঙ্গে ডিস্লামডোকাসের মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে। পুরোপুরি জলের জীব মছের শরীরের গড়ন ভিন্ন ধরনের—হাতীর মতো সর, নয়। হিপোপটেমাস ডাঙাতেও চলে, অতএব হিপোপটেমাসের শরীরের গড়ন দুয়ের মাঝামাঝি।

ইঞ্জিনীয়ারিং কাঠামোটি যদি হয় বড় আকারের তাহলে সেটির অবশ্যই হওয়া চাই এমন শক্তপেঁক্ত যে, নির্মাণ কার্যের সকল স্তরে নিজস্ব ভার বহনে সক্ষম হয়। যেমন, পশু-পাখির ডিম। এই ডিমের খোলসটি হালকা চাই এমন শক্ত যাতে ভিতর-কার তরল পদার্থের চাপ সহ্য করতে পারে, আবার এমন নরম যাতে সময় হলে খোলা ভেগে ছানা বেরিয়ে আসতে পারে। কাজেই ডিমের খোলা কতখানি শক্ত হওয়া সম্ভব তার একটা সীমা থেকে যায়, যত বড় আকারের ডিম-ই হোক।

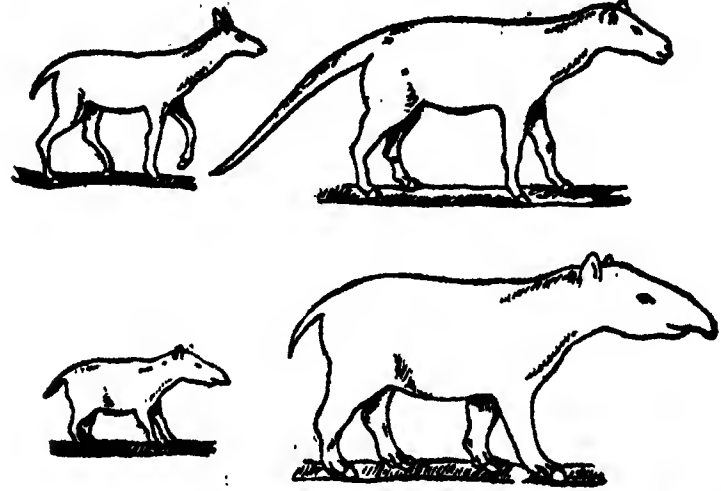
আর উদ্ভূত জীবের কেসায় তো ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্রগুলো আরো কড়াকড়ি মেনে চলা দরকার। আর জীবটি যদি আকারে বড় হয় তাহলে ডানা আপটিয়ে বাপটিয়ে উড়ে চলার সমস্যাটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে। টোবানোফটিল টোবানো-ডন এতাবং কালের সমস্ত উদ্ভূত জীবের মধ্যে আকারের সবচেয়ে বড়। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র ধরে বিচার করলে এই জীবটি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যেতে পারে। জানা গেছেও। যেমন, জীবটির শরীরের ওজন, ডানার বিস্তার ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক হিসেব, ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী এই নতুন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। আশা করা চলে, অতীতের পৃথিবীর অততপক্ষে বহুং আকারের জীবগুলো সম্পর্কে অচিরেই আরো বিশদ বিবরণ জানা যাবে।

আ্যাপোলো-১৭ অভিযানে চাঁদে জলের চিহ্ন আবিষ্কার

আ্যাপোলো-১৭ অভিযান নিশ্চুতভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর এইটেই শেষ অভিযান। আগামী একপুরুষের মধ্যে চাঁদে আবার মানুষের পা পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

চাঁদের মাটিতে পা দেওয়া এবার নিয়ে চ-বার। প্রথমটি ছাজ স্কিটার থেকে পঞ্চম অভিযান সম্পর্কে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এট সমালোচনা শোনা গিরেছিল যে চাঁদের দেশে কারো কারো একই ধরনের অভিযান চলানো বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নিরর্থক,

(ওপরে) আ্যাপোলো-১৭ (নিচে) প্যালিওথেরিয়াম করেক টুকরো ফসিল থেকে কুড়িএ এই দুটি জীবনের সম্পর্ক আর্কাত কল্পনা করতে পেরেছিলেন।



মানুষকে চাঁদে পাঠিয়ে যতোটুকু করা যাচ্ছে তার সবটুকুই অনেক কম খরচে যন্ত্রে সাহায্যে করা যেত। যত অভিযান নিয়ে তাই অনেক মহলেই খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই এবারের অভি-যানেই এমন এক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে যাতে বিজ্ঞানীমহল রীতিমতো সচকিত। বর্তমান শতাব্দীতে যে আরো কোনো অভিযান হাচ না, এটা এখন আক্ষেপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবারের অভিযানে চাঁদের মাটিতে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যা থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় চাঁদ একেবারে জলশূন্য নয়। চাঁদে জল পাওয়া যাবে, এমন একটা ধারণা মানুষ এতকাল শুধু স্বপ্নে পোষণ করতে পারত। মঙ্গলবার রাতিগুণে এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়েছে। চাঁদের মাটিতে নভশচররা এমন কিছু চিহ্ন পেয়েছেন যাকে তাদের অসিতা সূচক ঘোষণা বলে মনে হতে পারে। অর্থাৎ এতকাল চাঁদ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল—মৃত জড়পিণ্ড মাত্র—তা যথার্থ নয় এমন ধারণা করার কারণ ঘটেছে। এখন জানা যেতে পারে, পৃথিবীর বহু মরুভূমি যেমন পৃষ্টি হয়েছে তেমনই উপযুক্ত বাসস্থা গ্রহণ কবলে চাঁদেও একদিন ফুলে-ফলে মানুষের বাস-যোগ্য করা সম্ভব।

নভশচররা কি চাঁদের মাটিতে জলের ধারা আবিষ্কার করেছেন? না, তা নয়। কিন্তু এমন নিদর্শন যদি পাওয়া যায় যা থেকে মনে হতে পারে চাঁদের মাটিতে জল আছে—খনিজ আকরে আবদ্ধ অবস্থাতেই হোক বা শিলাস্তরের উবে যাওয়া অবস্থাতেই হোক—তাহলেও তা থেকে জল নিষ্কাশিত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয়। আ্যাপোলো-১৭ অভিযানের নভশচররা চাঁদের মাটিতে এমনি এক নিদর্শনেরই সন্ধান পেয়েছেন।

সোমবার সারাটা দিন নভশচররা কাটিয়ে ছিলেন ক্রমশঃ সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় করায় কাজে। অধিনায়ক সেরগান এগিন ৯ ফুট গভীর গর্ত খনিত হলে

কালো অগারসদৃশ আন্তরের তলা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। প্রচণ্ড পরিপ্রভ বহতে হয়েছিল এজন্যে। তবুও আন্তরের নিচের শিলাস্তর থেকে নমনা সংগ্রহ করাছিলেন।

পরদিন তারা গাড়ি চালিয়ে গিবে-ছিলেন দক্ষিণের কেন্দ্রীয় পর্যন্তের দিকে। সেখানে ছিল এক মাইল উঁচু পর্বতচূড়ো থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের চাঁই। মানুষ ৩০ থেকে যতো নমনা সংগ্রহ করে এনেছে তার মধ্যে এই পাথরই সম্ভবত বয়সে সবচেয়ে প্রাচীন। সেখান থেকে চালেকারে ফেরার পথে একটা গহররের পাশ দিয়ে, বার আলোকচিত্র আগে থেকেই নেওয়া ছিল। জানা ছিল যে এটি এমন এক গহরর যা থেকে উৎক্ষিপ্ত মাটি-পাথর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েনি, আবার সেই গহররের মধ্যেই হুমা হয়েছে। ওপরে তেমনি ধূসর আন্তর, চাঁদের সবটুকু দেখা যায়। আন্তর সরাসরেই অধিনায়ক সেরগান দেখলেন, জামির হু কমলা, হলুদ ও লাল। তার মানে, কোনো একসময়ে এই ভূমি জলের সম্পর্কে এসেছিল এবং তারই ফলে মরচে পড়ার মতো চিহ্ন। তখন নভশচররা জমি খুঁড়তে লাগলেন। প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত খুঁড়েও দেখা গেল, জমি একই রকমের লাল ও কমলা। শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল কালো লাড়া। তখন নভশচররা দৃষ্টিতে পারলেন, আগ্নেয়গিরি থেকে গ্যাস পৌরায় আসার সময় যে ধরনের কাটল সৃষ্টি হয় এখানেও তাই। পৃথিবীতেও আগ্নেয়গিরির কাছে এমনি নিবর্শন পাওয়া যায়।

এমনি এক নিদর্শন আবিষ্কার করা যাবে তা ভেবেই আ্যাপোলো-১৭ অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল স্টিফেন্স-উরাস এলাকা। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন নিদর্শনটি পাওয়া গেল তখন এমনি পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রের অত্যন্ত হিসেবী বিজ্ঞানীরাও উত্তেজনার দিশেহারা। নভশচররা

টেরোজাক-টিল টেরোজাক, উজ্জ্বল জীব হিসাবে এখনও পর্বন্ত আকারে সবচেয়ে বড়। ডানার দৈর্ঘ্য ২৩ সেন্টিমিটার।



খুঁড়ে চলেতে। নিরাপত্তামূলক সমস্ত হিসেবের বাইরে গিরে কাজটি তুলি ফেলেন। ফলে নভেলেরদের অকসিজেনের ভাঙার এতই কমে গিয়েছিল যে পরে

ফেরার সময়ে যদি মোড়ার খাউন্টি স্টাট না নিত তাহলে আব তাদেব জীবন্ত অবস্থায় ফিরতে হত না।

এখানেই সেই কথাটি ওঠে। যারা বলেন,

## কৃষিদরদী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

উনিবিংশ শতাব্দী আমাদের বাংলাদেশের লক্ষে একটি খুবই বিস্ময়কর যুগ। জ্ঞানের সংকট, কর্মের নিষিদ্ধ সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে যুগের সূচনা করেন সেই যুগে অসাধারণ সব মনীষীরা, যেমন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিশ্বকুমার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ—এদের পর এক এসে বাঙালীর মানসকে সর্ব দিক থেকে উদ্ভাসিত করেন।

এই উনিবিংশ শতাব্দীতে, ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে পূর্ববাংলার ঢাকা বিভাগের জেলায় এক বিত্তশালী বৈদ্য পরিবারে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত—গ্রন্থকারের জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাংসারিক সমস্যা সত্যি হোস পায় এবং এদের ভিতর ঘিরেই তাঁদের দিন কাটে। রাজেশ্বর দাশগুপ্ত শিবনাথ ঠাকুরের ইংল্যান্ডে কলেজ কৃষিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করেন ও পরে নানা প্রকার কল্যাণ পর গভর্নমেন্টের কৃষিবিজ্ঞানে নিযুক্ত হন। লন্ডন যোড়ান সময় থেকে গভর্নমেন্টের কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রে

করবে এ বিশ্বাস বিদেশী গভর্নমেন্টের আদর্শেই ছিল না।

কৃষিবিজ্ঞানী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত যখন প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশের কৃষকের ঠিক মতো শিক্ষা দিতে পারলে তারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী আয়ত্ত করতে পারবে। তিনিই সর্বপ্রথম ডেমনস্ট্রেটর পদ সনাক্ত করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করেন। উৎকৃষ্ট বীজভাণ্ডার স্থাপন, কৃষি প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা, চুঁচড়ার কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন, গভ্ৰিত কৃষি সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেন। বাংলা ভাষার কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে কোনও সই ছিল না। তিনিই প্রথম দই খণ্ড 'কৃষি-বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উনিবিংশ শতাব্দীর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ও সফট সাফল্যের ব্যাপক সম্ভাব্য। এ চাউন্ড তিনি খাঁন কৃষি-বিজ্ঞান এইটিতে নানা রকমের দেশী ও বিদেশী সবজী ও ফলের চাষ সম্বন্ধে এ কি করে জমি প্রস্তুত করতে হয় ও সব প্রসঙ্গ করত হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে আমাদের এই কৃষিক্ষেত্রে দেশে চাষের উন্নতি না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও কল্যাণ

চাষের দেশে মূল্যবোধ উপস্থিত হয়ে মানব বা কিছু করেছে সেই যন্ত্রের সাহায্যে করা যেত। তারা একেই বেকারদার পড়তেন। নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের বাইরে মন্ত্রের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। মানবই পেরেছে প্রোগ্রামকে অগ্রাহ্য করে মাটি গহবরের জরি খুঁড়ে চলেতে এবং চাষের মাটির সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারটির সন্ধান নিয়ে আসতে।

এ থেকে বোঝা গেল এখনো চাষের মাটিতে অনেক কিছু অনস্বাদ্য করার আছে। ছুটি অজিয়ারের পুরো দেশ সম্পর্কে জানতে অনেক কিছু জরি। সেখানে আরো অভ্যাস চাই। চাষের ক্ষমতা করা ও চাষের দিন করেই কৃষিক্ষেত্রে আসা খুব একটা বিপজ্জনক ব্যাপার নয়। এ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকার এই শতাব্দীর মধ্যে চাষের দিকে আর পাঁচ বাড়ানো না, তাও ঠিক। আরো কয়েকটি অ্যাপোলো অভিযান হলে ভালোই হত। অন্যতমক্ষে চাষের আরো একটা হাতের মতোই পাওয়া যেত। চাই কি হয়তো এই শতাব্দীর মধ্যে চাষের মনুষ্য বাসযোগ্য করে তোলার কাজও শেষ হয়ে যেতে পারত। কিছুই অসম্ভব নয়। ১৯৫৭ সালের প্রথম স্পেসনিক থেকে ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো-১৭ পর্যন্ত সময় পার হয়েছে মাত্র পনেরো বছর। এইটুকু সময়ই এতখানি। আগামী আশা বছর তখনো কী হতে পারে, আরো কী হবে— তা কে বলতে পারে! চাষে বাতাসগত সে এমন নির্বিশেষ ও এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে, অ্যাপোলো-১৭-র আগে তাও কি ভাবা গিয়েছিল।

—অরুণাচল

কিছু থেকে যে আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয় সেটা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গো বিজ্ঞানময় শিক্ষাগত, জাতীয়তাবাদী খাণ খাইয়ে নিতে হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ছোট ছোট ক্ষেত্রে নিজস্ব কৃষি জমির পক্ষে ধাক্কাটান দিয়ে দায় যে সম্ভব নয় সেটা তিনি বুদ্ধিভাজন ও সেই কারণে একটি হাফা মরনের লগাল ভিত্তি করেছিলেন। শ্রম বাংলাদেশে নয় মারা ভারতবর্ষে তাঁর মতো কৃষক-দরদী কৃষি-বিজ্ঞানী আর একজনও ছিলো না তাঁর সময়।

গভর্নমেন্টের উচ্চপদ প্রতিষ্ঠিত থেকেও তিনি নিজ গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে তাদের উন্নতি সম্বন্ধে অগ্রান্ত চেষ্টা করেছিলেন।

১৯২৬ সালে যখন রাজ্য কমিশন অব এগ্রিকালচার ভারতবর্ষের কৃষি অবস্থা তদন্ত করবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত গভর্নমেন্টে তাঁকেই সেই কমিশনের লিডার্স অফিসার নিযুক্ত করেন। কঠিন পরিপ্রাণে তাঁর স্বাস্থ্য ঝেঁপে যায় ও ১৯২৬ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে



# সম্মোহন দৈবচিহ্ন

# नमस्कार आन

সম্মত হইল কথটা। সরাসরি বলিল যে  
 হইল হইল এম সপ্তে ডাউন্স আঁহ ডাউন্স  
 একটা পক্ষি। বালক-বালিকা নবব্রাহ্মণ  
 স্বাক্ষর পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি কি  
 ডাউন্স? একটা তলিমে দেখিল যে সমস্ত  
 মানব বর্ণের জোড়ের বড়ই করে বেড়ান  
 হুঁরি কি সম্মত হইত হস্তাধ্য বখণ্ড পড়েন  
 নি বলে বক বাজিয়ে বলতে পারেন?

সম্মোহনের সংগে এদেশের গ্রামা  
জানিয়ার নাম বেশ জড়িয়ে আছে। সে স্থানটি  
কামরূপ-কামাখ্যা বলে খ্যাত। সেখানে গিয়ে  
খর্ব অত্যাশঙ্কিতসম্পন্ন বাকিও নিজস্ব সব  
বিচার-বিশ্বচিন্তা শক্তি খুঁটয়ে বসতেন। লোক-  
এজনক হাওয়া—এখানে গেলে মানস ভেঙে  
বনে যায়।

সম্মোহনের ক্ষমতার সঙ্গে পদব্রজে  
চেয়ে মহিলাদের নাম বেশী জড়িত। যাকে  
বলে মোহিনীর, মায়া। চলকি বখায় নগদ  
ডাইনীরা খাম্পার।

এই সম্মেলনকে উইন্সটাফট ও শ্য  
হান উপাসনা ছেবে নিয়ে তথাকালত প্রগতি  
উপাসকদের পাশ্চাত্যবীর সময়ে অনেক  
হায়লা-নিবর্তনও চলেছে। কসর কম কিছু  
নেই। কোনও ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা  
দিতে সক্ষম না হলেই সেটাকে স্নেহ  
বজ্রবর্ষিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাচার্য  
বিজ্ঞান ও বজ্রের উপাসকদের কাছেও চল  
পাওয়া মর্মান্তিক।

তবে এটাকে দিয়ে নাড়াচাড়া করে পরখ  
করে দেশের চেষ্টাও কম হবনি। ১৮৮৫ খ্রঃ  
খাস কন্ডনে গড়ে ওঠে 'সোসাইটি ফর  
সাইনিক্যাল রিসার্চ'। সাইনিক কথাটা আসা  
বা মাস জটিলত্ব ব্যাপারে বোঝাবার জন্যেই  
ব্যবহার হয়ে থাকে। প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত  
হয়েছিল 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটিক্যাল  
টেকনিক্যালিটী'। একালের প্রবল উপর অববের  
ইজ্ঞানবির প্রভাব বিজ্ঞানের ক্ষয় ও তার  
কর্মকারিতা নিয়ে এটা অনেক কথা

ভেবেছেন ও বলেছেন। এটাই বলে হিগ-  
নটিন। অপরাপর ইজমের মত ব্যাকরে  
এবং একটা মরশুম এসময় এসেছিল।  
আপো একই বলা হত মাসমোরজম।  
অস্থিয়ার খাতানামা চিকিৎসক ফাঁজ আদৌ  
মসম বৈব নাম থেকে ঐ নাম প্রচলিত।  
মোমদার হিগ্গিনসের বড় চিকিৎসক  
ছিলেন। অপরাপর রোগে তিনি হাত  
লাগাতেন। তাঁর চিকিৎসার আশ্রয় ছিল এই  
সময়ান শক্তি। মেমবারের মতে তাঁর শরীর  
থেকে একটা শক্তি বোগীর শরীরে গিয়ে  
প্রভাব বিস্তার কব রোগ সারাত। তিনি  
তাকে বলেছেন 'এ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম'।  
তিনি অস্থিয়ার ও প্যারিসে পসার জমিয়ে  
তুলেও তাঁর গোটা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে  
যজুরকি বলে খেঁচ খসে চলে যায়। সরকার  
তাঁর ঐ ধরনের চিকিৎসা বন্ধ করে  
দেন। ১৮৯৫ খঃ পৰ্যন্ত তিনি বেচ  
ছিলেন।

মেসমার সাহেবের নান্য থেকে এই  
পদ্ধতিকে বিবর্ত্ত করেন জেমস হেড সাহেব।  
হিপনটিজম কথাটার প্রচলনের সঙ্গে তখন  
জেকেই। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের  
চতুর্থ দশক পর্যন্ত এর বাক্য অব্যবহৃত  
জন্মট ছিল।

ডঃ ইউজিন ওয়িগের মেমোয়ারসিক  
ইন্টারন্যাশনালের একজন বড় পান্ডা ছিলেন।  
‘তিনি সুপার নরম্যাল ফ্যাকালটিজ ইন মান’  
নামে একখানা বই লেখেন। এই বইটাকে  
হিপনোটাইজড অবস্থার বিশ্লেষণের সংশ্লিষ্ট  
বহু উদাহরণ দিয়ে এই পশ্চাত্তম বৈজ্ঞানিক  
ভিত্তির ওপর স্থাপনের একটি চেষ্টা চালান  
যেতেছে। সাইকেমেট্রির মূল ব্যাপারটা ‘সিক’  
স্বাভাবিক নয়। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায়  
ও ব্যবহার ব্যাখ্যা মানদণ্ডের বুদ্ধিভিত্তিক  
মানসিক দখল করে উঠতে সমর্থ হয় না।

[illegible]

জগতে খুব হয়েছিল। পরবর্ত্তে : সম্ভোগ  
কর্ম : কাজই : সর্বোচ্চ ফলনা বলে : ব্যাপার  
হেলোর ইতি : করে : অনেক : জাতি : ও : বিশ্বাসের  
পদপাদভাব হতে : শান :

সম্বোধিত বা হিঙ্গলদিত করে সান্না-  
তকর আনন্দিক ও সাম্প্রদায়িক ব্যাপি নিয়ন্ত্রণ  
করার ঘটনা শ্রবণ বিবরণ নয়। আবার নানা-  
রকম প্রবণতা থেকেও হিঙ্গলদিতের সাক্ষ্য  
মুক্তি পেতে দেখা গেছে।

কিন্তু আর একটা দিকও আছে।  
অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানসিক শক্তিসম্পন্ন  
ব্যক্তিকে হিপনোটাইজ করে অশ্রদ্ধাভাবের  
কাজও করা যাবে সম্ভব।

হিপনটিক্সের গোড়ার কথা হল এক জনের ইচ্ছাশক্তিকে অস্বপ্নের ওপর প্রয়োগ। আর শেষের কথা হল হিপনটিক্স স্ট্রোল সংগ্রাহিত ব্যক্তি নিজে কি কি করেছে সে কথা পরে তার মনে থাকে না। স্বপ্নের মতো সময় ভেবেও আসে। হিপনটিক্সের কথা শুনেই কয়েক জনের কথা হল: ধর্মের উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত হবার কথা যার কেটে গেছে-যুগের দ্বারা-বলি কিন্তু নির্ধারিত সময়ে হিপনটিক্স সংগ্রহের মত নির্দেশ দিক পালন করে যাবে।

এরই সংশ্লেষে বারি হাজার পরও  
আজ্ঞার প্রতিবেদে বিশ্বাসী ভাবের  
পরলোকগত জাহান্নাম সন্তান সন্তান  
সারি সংযোগ স্থাপনের ব্যর্থপর্যটও  
এসে পড়ে। পিঙ্গাঙ্গুস্বামীস্বামীর আশ্রয়  
সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য যে ঐক্য  
তাকে বাংলার বলে প্রোত্বেদন অনেক সময়  
এর জন্য মাধ্যম বা বিভিন্ন প্রকার করা হয়  
কেন্দ্রেরই ভাল বিভিন্ন। কেন্দ্রেরও যে না  
হয় এখন নয়।

কাজটা আছে, কানাইটো, কিন্তু সব  
টুকুই এক, সবাইকেই একভাবেই  
বোঝাই উঠবে, সবাইকেই একভাবে  
উঠবে, কানাই, কানাই, কানাই, কানাই  
কানাই, কানাই, কানাই, কানাই, কানাই



করে প্রেমের উত্তর দিতে থাকে। মানব মিডিয়াম শুধু কথাই বলে না পঙ্খু অনেক সময় লিখেও জবাব দেয়। হাটের লেখার ধরণও অনেক সময় পাশ্চাত্যের।

মিডিয়ামের ব্যবহার হতে হুড়ে এর বিশালী গ্রন্থে খুব কদর বাড়িতে। 'দি প্রফিক' পত্রিকায় ১৯৩১ খৃঃ ১০ অক্টোবর সিলেটিয়া টিমসন সাহেব এক মহিলায় বর্ণনা দিয়েছেন তার কুড়ো-স্বামীরই শব্দ বিশেষ ভিন্ন না—তিনি বাৎসর্য ছাল পরতেন এবং চুলের একটা রঙীন ওড়না থাকতো। কাল কাটনের ঢাকনা দেওয়া গদ্যে বসতেন। এর কাছে সেই বসুর জাদিয়েল রাণী-নায়কের স্বাক্ষরিত স্তম্ভীরও ছিল। কিন্তু লেখক তাঁকে একেবারে ভুলিয়ে ছেড়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী একটুও ফলেনি।

হাতের গঠন ও চোখের ওপরকার রেখা নিয়েও এই লাইনের লোকদের বাণ-বিত্ততার রসালো জবাব এ প্রবন্ধে রয়েছে। দেহের গঠনের ধরণ দেখে মানসিক শক্তিরও

মানসের ক্ষমতার কথাও এরা ব্যাখ্যা করেছেন। চেহারা ও হাতের গঠন মিলিয়ে বাঁজির ওপর গ্রন্থ লক্ষ্যের প্রত্যক্ষ এবং তার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁরা অনেক ভবিষ্যৎ বাণী করে থাকেন।

এইসব ভবিষ্যৎবাণী ও মিডিয়ামের অনেক সময় ছল-চাতুরী চালিয়ে থাকেন। খাদ্যবিদ্যায় যাদের জ্ঞান আছে তারা এঁদের ছল-চাতুরি অনেক সময় ধরে ফেলেন। ফকিরারীর কেরামতি এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই সেইদিক খাব না।

জাগতিক দর্শন হার ব্যাখ্যা মেলেনা এমন আর একটি ব্যাপার হল ঘুম। ঘুমিয়ে থেকে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, সচেতন, অব-চেতন-অচেতন মনের বাসনা, চিন্তা, পরিকল্পনা ও ফেলে আসা দিন এবং হালিমুল্লার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মানবের মনের পটে ছবির খেলা দেখে। ঘুমের মধ্যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চল তারও ছবি চোখে ভাসে।

ঘটনার সঙ্গে একই সময়ে সমঘটনার রেখা মনে ভাবকে প্রভাব করে। ঘটনা কিছু নিহিত আছে। এমন কি উপস্থিতির ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে।

ঘুমের মাঝে মানবের আত্মা সুন্দর শরীরে অপর জায়গায় ঘুরে আসতে পারে এবং অপর জীবিত কিম্বা মৃত মানবের আত্মা বা মনের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে বলে বলা হয়ে থাকে।

তুফুড়ে ব্যাপারটাকে এ প্রসঙ্গে ধরা অন্যায় হবে না। ঘরের মধ্যে হঠাৎ গাউন বাওলা, দমকা বাতাস, গানের সুর ইত্যাদি অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। অসুস্থ বাসনা, প্রেম প্রকৃতিতে একেবারে নিভতি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

মনস্তত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকে বা বিজ্ঞানভিত্তিক যুগের ভিত্তিতে এসব ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা খাই হোতা প্রমাণের মধ্যে দিয়ে এইগুলি এক নতুন বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছে।

## দূষিত পরিবেশ অলোক সেন

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজও আজ ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ উন্নতি নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের কারণ হতে পারে। দেশে নিউ নতুন কলকারখানা স্থাপন, যানবাহনের আধুনিকীকরণ, কৃষির উন্নতি, চাঁকৎসা-শাস্ত্র নিউ নতুন আবিষ্কার এ সবই আমাদের মঙ্গলের দিশারী। কিন্তু সভ্যতাব এ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। পরিবেশ হয়ে পড়ছে কলুষিত। সামাজিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত জীব-বন্য-প্রাণীজগৎ ও জীবন ধারণকে শঙ্কিত অবস্থায় ফেলেছে। এ নিয়ে চিন্তাও তাই বিবর্তনোপায়ী। পশ্চিম-বাংলাতেও দেশের স্বাস্থ্যাবস্থা ও অসুখাওয়া বিশৃঙ্খল রাখার জন্য দুটি ক্ষয়তান কর্মটি গঠন করা হয়েছে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর্বকরণের স্বাধীন ব্যবস্থাপনা।

অসুখাওয়া দূষিতকরণ কথাটি এখন বহু মধ্যে শোনা গেলেও প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ঠিক কতখানি জ্ঞানকরুণ একটা হিসেব করে দেখা থাকে। আমরা সাধারণত ধরে নিই অতীতের সুন্দর স্বাস্থ্যকর এবং উপভোগ্য পৃথিবী আজকের মতো দূষিত ছিল না—বিবাক ছিল না সেদিনের নিঃস্বাস-বায়ু। নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসের পক্ষে উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। বাড়ীর বা পুকুর বহু বৃন্দ-বৃন্দা এ ব্যাপারে একেবারে নিঃস্বাসের এবং অতীতের সেই জলবায়ুগত পরিবেশের জন্য তাঁরা অনেক

মানব সভ্যতার সূত্রের অতীতেও মানুষ প্রকৃতিতে দূষিত করেছে নানাভাবে। বিবাক করেছে জল-বাতাস-মাটিতে। এমন কি মানুষ এ ধরাধারে আসার বহু আগেও পৃথিবী বন্যমত্ত ছিল না। বারো বারে এই হল, এই মাটি দূষিত হয়েছে নানা কারণে। তবে সেদিনের থেকে আজ এর মাত্রা বেড়েছে নানা-ভাবে ও বহু গুণে আর আগামী দিন-গুলিতে মানবসভ্যতা ও কলুষের পরিমাণকে এক ভয়াবহ আকারে বাড়িয়ে তুলবে। সেদিন প্রকৃতির প্রতিশোধ কীরে আসবে প্রাণী-উদ্ভিদ সমস্ত জীবিত সমস্তের উপরে। বিজ্ঞানীরা তাই চিন্তিত বেশ কিছু দিন আগে থেকে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সম্মতকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁরা নানা-কার্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইদানীং শূভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। নানা দেশের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘও বিশেষভাবে ভাবিত ও সক্রিয়। কিছু দিন আগে 'স্টকহোলমে' 'ইউনেসকো' আয়োজিত আলোচনা সভায় গ্রীষ্মকালী ইন্দুরা গান্ধীও পরিচয় বিশৃঙ্খল রাখার দিক বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

সাঁজের আদিকাল থেকেই প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছিল উদ্ভিদ প্রাণী জল হাওয়া মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে। আর এ আশ্বিন্যবর্গের পিছনে ছিল বন্যপ্রাণী। খাদ্যাদিক সম্পর্ক এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু সভ্য মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোর বহুকোণে উদ্ভিদ ও

উদ্ভিদ শব্দে জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে যা উদ্ভিদভোজী প্রাণীকে আহাির খোঁগায়। প্রাণীর দেহ ও দেহজাত প্রোটিন চর্বি হত্যাদি মাংসাসী বা মিশ্র আহািরে অত্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতির এ বিন্যাস-ব্যবস্থাকে মানবসভ্যতা বানচাল করেছে নানাভাবে ফল হয়েছে মারাত্মক। মানুষের বসতিকে নিবিঘ্ন করার জন্য কোথাও বা সাপ মারতে বেজী আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে সাপ নিবংশ হওয়ায় ইন্দুরের উপদ্রব বেড়েছে বহু গুণে। লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যসম্পদ ইন্দুরের পেটে গিয়ে মানুষের আহাির্য ঘাটতি সৃষ্টি করেছে। ফসল নষ্ট করে ব ল পৃথি তাড়াতে গিয়ে পোকাকার উপদ্রব বেড়েছে। রাসায়নিক প্রমাণে পোকা ধ্বংস করতে গিয়ে মাটিতে জমেছে নানা বিষাক্ত উপাদান যা কৃষকের বহু বহু বিচিত্র ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাককে ধ্বংস করেছে—মাটির শৌণিক গঠন পাশ্চাত্য গিয়ে জলধারণ ক্ষমতা কম গেছে। উন্নততা বড়োতে ইচ্ছা-মত্ত। সার প্রমাণে এ অবস্থারটিকে আরো ঘোবালো করে তুলেছে। একই জমিতে আর বার লাভজনক ফসল বুনে জমিকে অকাল-বন্দ্যাবে বন্দী করা হয়েছে। দীর্ঘ দিনের বন্দ্যাবে ও জলধারণ ক্ষমতার অভাব, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণে ঘাটতি এনেছে। এখানে-সেখানে বন কেটে ফেলা এ অবস্থাকে আরো ঘনীভূত করেছে। তাই জলভরা মেঘ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেও উপযুক্ত আর্দ্রতার অভাবে তার বৃষ্টি থেকে পারে না উপাধার ভিনিয়ে নিতে। লক্ষ লক্ষ একর জমি খরার কবলে পড়ে উঠে উঠে কোটি কোটি লোকের জীবনব্যয় ব্যয় দূর্বিবহ করে তোলে।

দূরদর্শিতার অভাব অনেক সময় আমাদের জীবনব্যয়কে মারাত্মক বিপাকে নিয়ে যায়। পাকিস্তানের সিলেট উপত্যকায় খাল কেটে কৃষিকার্যে সেরে বান্ধা করা হয়।

কিন্তু উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে প্রায় এক কোটি একর নীচ জমি জলবন্দী হয়ে যায় বেশ কিছু দিনের জন্য। ফলে মাটির নীচে জমে থাকা লবণ, জলে গুলে উঠে আসে জমির ওপরে—ফসল ও জমিকে চিরকালের জন্য নষ্ট করে দেয়। আর এর পরিমাণ নিত্যন্ত কম না—প্রতি পাঁচ মিনিটের হিসাবে প্রায় এক একর জমি। মাটির গভীর গভীর থেকে তুলে আনা খনিজ সম্পদ মানব সভ্যতার চাকা ঘুরিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ আজ অনেকাংশেই খনিজ-নির্ভর। কিন্তু প্রকৃতির শক্ত ভিতকে আলগা করে দেওয়ার শহর নগর বসে গেছে, কৃষি ভূমি বিনষ্ট হয়েছে, নদীর খাত পাশে গিয়ে থরা অথবা বন্যা এনেছে। কিম্বা এখানে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ ভূমিকম্পের হোলো শব্দ-সহস্র প্রাণের বলি হয়েছে। আর এরই সংগে রয়েছে বড় বড় বীধ প্রকম্পের প্রতিক্রিয়া। কোনো জলাধারে হঠাৎ জমিয়ে তোলা কোটি কোটি ঘনফুট জলের অতিরিক্ত চাপ স্থানীয় ভূ-পৃষ্ঠের বহন ক্ষমতা বানচাল করে দেয়। দক্ষিণ ভারতের কয়লা ভূমিকম্পের পিছনে ছিল এমন একটি কারণ। মানুষ এমন করে ধীরে ধীরে দুর্বল ও সশঙ্ক করে তুলেছে।

এক কথায় প্রকৃতির সংগে আমরা যেভাবে ব্যবহার করবো, প্রকৃতি ঠিক সেই অনুপাতে আমাদের ফিরিয়ে দেবে তার আচরণ। বড় বড় শহরগুলো জমিকে ইন্ট-পাথরে বাঁধিয়ে ফেলে এক দিকে সভ্যতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে। গাছপালা জলাশয় ইত্যাদি কমে যাচ্ছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে ওই অঞ্চলে জলের চাহিদাও বাড়ছে। গাছপালা কমলে এবং একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ইন্ট-পাথরে বাঁধিয়ে দিলে সেখানকার তাপধারণ ও বিকিরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে স্বাভাবিক বাষ্টির মাত্রা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে মাটির বাঁধানো অঞ্চলে মাটির তলায় জল বেতে পারছে না। ফলে ভূতলে জলের পরিমাণ ঘাটতি হচ্ছে। বছরের পর বছর এভাবে জলের সমগ্র অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, জলের স্তরগুলি শূন্য হয়ে পড়ছে। মাটির ওপরকার বড় বড় অটালিকা প্রকৃতির প্রবল চাপে এই শূন্য স্তরগুলি ক্রমশ ভরাট হয়ে বাবে। তখন দেখা যাবে সমগ্র শহরটি বসে যাচ্ছে। এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। কেননা বসে যাওয়ায় পরিমাণ সব জায়গায় সমান না হওয়ায় রাস্তাঘাট বড় বড় প্রাসাদ সেতু ইত্যাদির প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে তীব্র জলাভাবও সমগ্র শহরটিকে ক্রমশ গ্রাস করবে। ফলের ব্যবধানে বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানী মহলে তাই প্রশ্ন জেগেছে : কলকাতা কি সেরিকই এগিয়ে চলেছে? প্রশ্ন অবশ্য কেবল কলকাতাকে নিয়ে নয়—পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরগুলিই আজ বিজ্ঞানীদের আঁধারে রয়েছে।

পরিবেশ-এর আর একটি অঙ্গ হল বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয় কী ভাবে? এর নানাদিক রয়েছে। কলকারখানা, মোটর-অস ইত্যাদির অর্ধশতাধিক কার্বন কাণিকা, জল তেল এবং নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের বাষ্প, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বহু মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসজাত কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি, আবহাওয়া এবং পরিভ্রম্য নানা পদার্থের পচনজনিত বিষাক্ত নানা গ্যাসের উৎপত্তি। এছাড়া তেজস্ক্রিয় ভাসমান পদার্থের সমাবেশও বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করছে। নির্মল নিঃশ্বাস-বায়ু থেকে আমাদের প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করছে।

শহর সভ্যতার দুটি বিধ বাণ হল শব্দ ও আলো। দিন-রাতের অবিচ্ছিন্ন বিরক্তিকর শব্দের ফল অত্যন্ত মারাত্মক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মানুষের স্নায়ু-দুর্বলতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব গ্রাম অপেক্ষা শহরে বহু গুণে বেশী। অবিরাম শব্দের প্রবাহ মানুষকে এ রোগের মূখে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে। কিশোর বয়সে শহরের মধ্যে বা খুব কাছে রয়েছে বিমানবন্দর, সেখানে এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক। বধিরতা, নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, তীব্র ভাবারের মাথাধরা, অস্থিরতা প্রভৃতি রোগের পিছনে অবিরাম শব্দ প্রবাহের যোগাযোগ অপরিহার্য। পৃথিবীর বহু শহরে শব্দ রোধের নানা চেষ্টা চলছে। যানবাহন ও অন্যান্য শব্দ সূচীকারী যন্ত্রে 'শব্দ' নিরোধক লাগানো হচ্ছে। বিমানবন্দরে 'শব্দ' শোষণ দেওয়াল' গেঁথে শহরবাসীকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। শহরের বাড়ী ঘরও শব্দ শোষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শব্দের জোয়ার কি কোনোদিন মানুষের এ শাসনে বন্দী হইবে?

পৃথিবীর বড় বড় শহরের আলোক ব্যাবস্থাও পরিবেশকে নির্মল থাকতে দিচ্ছে না। নানা রঙের নানা উজ্জ্বলতার আলো প্রতিফলিত হয়ে কেবল শহর বৃকই নয়, বায়ুমণ্ডলের বহু উর্ধ্বস্তরেও প্রভাব বিস্তার করে। আরার বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণায় পুনঃ প্রতিফলিত হয়ে বায়ু-মণ্ডলে বে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে তাতে গগনচুম্বি প্রাসাদের সুউচ্চ কক্ষেও সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। জীবজন্তু কীটপতঙ্গ এমন কি গাছপালাও এর প্রভাবে তাদের জীবনযাত্রার কতিপয় হয়ে পড়ছে। সমুদ্রে নিঃসঙ্গ বাতিঘরগুলিতে প্রতি বছরে হাজার হাজার নিশ্চর পাখি প্রাণ দিচ্ছে—আলোর হাতছানি এড়াতে না পেরে। নগর উপকণ্ঠের মানমন্দিরগুলিও এ আলোর জন্য কতিপয় হচ্ছে নানাভাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই গভীর রাতে উজ্জ্বল বাতিগুলিকে নিভিয়ে দিতে বলেছেন। আলোর এ দৌরাণ্য এড়াতে না পারলে একদিন নগর সভ্যতার বৃক নানা অনর্থও নেমে আসবে। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা তাই

কিন্তু মনে রাখা দরকার কোনো একটি স্থানের দূষিতকরণের ব্যাপারে দারিদ্র শব্দ সে অঞ্চলেরই নয়। বায়ুপ্রবাহ কিম্বা নদীর জলে বয়ে আনা নানা দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে যায় দূর-দূরান্তে। আবহাওয়া দূষিতকরণ সমস্যা তাই কোনো একটি বিশেষ স্থানের নয়। এ সমস্যা আজ সামগ্রিকভাবে সমস্ত পৃথিবীর। দারিদ্র ও তাই পৃথিবীর সমস্ত দেশের। শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আবহমণ্ডল যেভাবে কলুষিত হয়ে পড়ছে তা দূর করার জন্য, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী ও তৎপর হওয়ার সময় এসেছে।

পরিবেশ আমাদের আশ্রয়, বিকাশ ও উন্নতিক প্রভাবিত করে। বাইরের প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা এবং পৃথিবীর নানা আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত ও জ্বিরা-প্রতিক্রিয়ার মোট ফলাফল রূপান্তরিত হচ্ছে পরিবেশের মাধ্যমে। দারিদ্র দূর করার জন্য দেশে শিল্প বাড়তে হবে কিন্তু তার ফলে যাতে আবহাওয়া দূষিত না হয় সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। আবহাওয়া ও মরুভূমি যতদূর সম্ভব অন্য কাজে লাগতে হবে। কারখানার চিমানি নিঃসৃত ধোঁরা যাতে বহু উর্ধ্ব বায়ুস্তরে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মোটর বাস প্রকৃতির ধোঁয়াকে বাইরে ছড়াতে না দিয়ে শোষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের পরিভ্রম্য জলকে পরিষ্কৃত করে পুনরায় ব্যবহারোপ-যোগ্য করে তুলতে হবে। নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। কলকাতাতেও এই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের চেষ্টাও হস্তান্তর অদূর-ভবিষ্যতে সফল হবে। সেদিন পৃথিবীতে পানীর জলের সমস্যা অনেক কমে যাবে। কল-কারখানায় প্রমিক কিম্বা স্ট্রিক পলিশনের অবিরাম ধোঁরা ও দূষিত বাতাসের মধ্যে কাজ করতে হয় বলে তাদের নিয়মিত অক্সিজেন গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে পৃথিবী-পাশ্বে অক্সিজেন সরবরাহের বন্দ বসিয়ে। পশ্চিম জার্মানী এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। জনসংখ্যার বিকল্পী-করণেও মন দিতে হবে। এক কথায় প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর কাজটি করতে হবে গভীর চিন্তা অভিনিবেশ ও পরিকল্পনা সহকারে। তা না হলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টেনেনবার্গ ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য প্রমাণিত হবে : 'প্রকৃতিকে মোহন করে মানুষের মূখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে তার ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন প্রকৃতির সব দারিদ্র্য ক্লান্ত হয়ে যাবে।' সেই দারিদ্র্য দূরযোগে যাতে মানুষকে পড়তে না হয় তার জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। উপ-করণের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সীমিত না রাখলে প্রকৃতির প্রতিশোধ সভ্যতার সম্মুখে ধ্বংসের বাঁধ স্থাপন করে। পৃথিবীর আশ্রয় ভূমি হস্তান্তর আমাদের

## প্রতিবন্ধী নিজের পোশাকে ॥

কক ধর

রোজ সেই প্রতিবন্ধী দেখি  
প্রতিবন্ধীর পোশাকে  
বাহবা বুড়োর দৃ হাতে।  
একদম এক  
চুলের ছাটি, বুকের বোতাম  
জামার চিকণের ফুলকারি  
সব ঠিকঠাক মিলে যায়।  
হাততালি অবিরল  
কান পাড়া যায় না  
এমন নিখুঁত অভিনয়  
সঙ্গে রাজ্যের গানলাল।  
তার রোমাঞ্চে সবাই  
হৃদয় থেকে পড়ে  
দেখে অশ্রু হতে হয়।  
তার চোখ খলসানো আলোয়  
দেখি বেন অশ্রুকার বিশম উদ্ভার।  
আমাকে সে বিহীন করে  
বিশ্রান্ত করে  
মাতাল করে।  
আমি তার অনল-উজ্জ্বল পোশাকের  
প্রাপ্ত চুম্বন করে বলি,  
স্বাস্থ্য ভূমিই জিতে গেলে।  
করমর্দনের জন্য হাত বাড়াতোই  
হাতের চোটোতে রক্তের দাগ লুকেমত  
আড়াল করি ফুলদানিটা।

শ্রুতির হাসির দমকে  
প্রতিবন্ধী বলে ওঠে,  
দরকার হবে না,  
এই দ্যাখো—  
তার পোশাকের আড়ালে  
হাহাকারে পুড়ে ছাই হচ্ছে  
অবিকল আমি।

## চোখ ॥ সামসদে হক

আমাদের নিজস্ব ও একমাত্র করণবোলা ভূমি  
চোখ,  
ওখানেই গর্ভাধানের দ্রাব্য-উৎসব জন্মে ওঠে,  
আর লস—  
সেও আমাদের, মানবের, রসে চলে যায় আমাদেরই  
পৃথিবীর বোধ গোলায়।

আজকাল উৎসবের আয়োজন থাকে, করণ হয় না,  
শ্রবণ কিংবা অনাবৃষ্টি বেন চোখের নিয়তি,  
শস্যের নিয়তি—  
সেও আমাদের, রসে মানবের থেকে সরে যায়  
মানবের বোধ সত্যতা।

## বিকোভ ॥ আইডি রাহা

সবাই বলে নাকি হতাশা থেকেই হয় এমন;  
এই বেপরোয়া ভাব, কিছুরে ভর না করা,  
সব ছড়িয়ে ফেলা, ছাড়িয়ে যাওয়া।  
রাখতে ইচ্ছে হয় না মনটাকে  
কিংবা কোন বিশ্বাস, সম্মে, সংলোপনে  
হৃদয়ের নিহৃত কোন কোণে।  
ভালবাসা, প্রেম? বাজে।  
একদম বাজে মনে হয় ওসব।  
কেমন বেন বোকা বোকা  
অবাচীন মৃত্যুর মত।  
বিত্তী অসহ্য মনে হয় সব  
কঠিন চাপা মাথা হাসি।  
মনে হয় ছিঁড়ে ফেলি একটানে  
ভরতায় নির্মোহ—আর ওই  
সবের ঢেকে রাখা ফাঁকি।  
হরতো লজ্জা এসব—  
এই;—হতাশা আর না পাওয়ার জন্যে থেকে  
খিরোখী হয়ে যায় মানবের মনোভাব  
নিজের প্রতিবন্ধী হয়ে।





সারাদিনের ভাবনায় গঙ্গার পেছটা যেন আরও বড়িয়ে গেছে। বরসের সীমা আরো কয়েকটা বছর এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে যেন আরো সামনে এনে দিয়েছে। গঙ্গা বারান্দার এক কোণে বাঁশের খাটতে হেলান দিয়ে বসে ভাবছে। ওধারে চৌকিগুলোর উপর ভীড় করে বসে আছে মক্কেল আর মৃদুরী। সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে রয়েছেন উকিল সাহেব। আর তার পাশের চেয়ারটার চৌধুরী সাহেব নিজে—স্নেহের বাবা। দুজনে গভীরভাবে পরামর্শ করছেন।

গঙ্গার কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই। মাথায় হাত দিয়ে ও বসে আছে। বরসের সঙ্গে মাথায় সব চুল ঝরে পড়ে গেছে। শব্দ খড়ে গোটা কয়েক চুল বরসের প্রান্ত সীমার কথায় শ্রবণ করিয়ে দেয়। কপালে কাঁকাঝাকা অসংখ্য কুণ্ডিত রেখা। চোখে উজ্জ্বল নেই, বিবর্ণ দৃষ্টি। বিশৃঙ্খলভাবে গাঁজের ওটা শব্দের মত সোফা, শব্দে চিবুক পর্বত এসে চৌকি। আর সেটা শব্দের সত্য বাস্তব জীবন।

বাঁশ ছোট-বড় রেখাসহ চামড়ার নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে—বোধহয় বরসের বোকা মইতে না পেরে।

গঙ্গা নড়ে চড়ে বসে।

হাটের ঘাটার চারপাশে কয়েকটা মাছ পিনপিন করে খরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে ঘাটাকে বৃত্ত করে বসছে, আবার উড়েও গাচ্ছে। কিন্তু ওদের জাভাবার জন্য কোল চেঁচা আর আগ্রহ গঙ্গার নেই। ও শব্দে ভাবছে। ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে। নিশ্চল নিখর প্রান্তের মৃত্যুর মতই নিশ্চল হয়ে বসে শব্দই ভাবছে।

বানুর বাবা চৌধুরী সাহেব ডাকছেন : 'শোন ভো বাবা গঙ্গা, এদিকে এস।'

প্রথম ডাকে সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়বার গঙ্গাটা আরো বেশী মোলারেম করে চৌধুরী সাহেব বলেন : 'কই বাবা গঙ্গা, শোন এদিকে এসোতো একটু—'

গঙ্গা চমকায়। অরপনে সামনে এসে দাঁড়ায়। উকিল সাহেব আর বানুর বাবার দিকে।

উকিলসাহেব কাগজের ভিত্তি টেনে গঙ্গার মৃদুখানা আরও বেশী গঙ্গার করে তুলে পুরু লেসের চশমার ভিতর দিয়ে গঙ্গার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন। ওর জরগ্রস্ত খড়িপড়া দেহের দিকে জাকিল উকিলসাহেব প্রশ্ন করেন—

: তুমিই গঙ্গা?  
: জী, হুজুর, আমিই গঙ্গা জিউ।  
: সেদিনের ঘটনাটা তুমি জান?  
: কী হুজুর।  
: তুমি শব্দেছ, না গেছে?  
: শব্দেগা কাহে হুজুর—আপনার কাহে লিখে দেখা।

: বেশ। বেশ। এবার তবে বলুন সেদিন কখন, কোথায় এবং আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল। উকিল সাহেব জানতে চান।

মুহুর্তে গঙ্গার চামড়ার টান পড়ে, কৃষ্ণ মেঘদণ্ডটা সোজা হয়ে যায়। প্রান্ত ঘোলাটে হাঁদপড়া চোখের আড়ালে এক প্রচণ্ড শব্দের আগমন করে উঠে। উকিল সাহেব গঙ্গার চামড়া কটন হয়ে ওঠে। সেদিন হুজুর।

রূপ ধারণ মূখ বিকৃত করে কপালে ছাত্ত জোড় করে বলে : হুজুর, হামি ও পাপ কথা মূখে না আনতে পরবে। এত বড় পাপ। হিঃ! হিঃ! রাম, রাম। এরূপ পাপ হামি জিন্দগী যে কভি নোই দেখা, হুজুর!...

উকিল সাহেব মাথা দোলালেন। তারপর হাত নেড়ে বলেন : তুমি বস গণ্গা। গণ্গা ধপ করে আবার মাটিতে বসে পড়ে। সিগারেটটা দেশলাইয়ের বকে ঠুকে নিয়ে উকিল সাহেব আবার জেরা শুরু করেন : আচ্ছা গণ্গা, সেদিন কলেজ ছুটির পর তুমি ওদিকে গিয়েছিলে কেন?

: ঘরমে ভাল লাগাতে, হুজুর।

: গিরে ওদের দেখলে?

: জী হুজুর।

: আর কি দেখলে?

: পাপ, হুজুর পাপ।—কাঁপতে থাকে গণ্গা : হামি এত বড় পাপ কভি দেখিনি হুজুর। চলিল সাল ইয়ে কলেজে নোকরী ক্রিয়া হুজুর, লোকিন এইসা বড় পাপ ই-কলেজে ঢোকেনি। প্রফেসর হোক ছাত্রাবসগে—হিঃ হিঃ রাম! রাম! আপনায়াই কন হুজুর—কভি এয়াসা পাপের কথা শুনিয়েছেন?

উকিল সাহেব চুপ করেন।

চৌধুরী সাহেব এককণে মূখ খোলেন। বলেন : গণ্গা এ কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে আছে। কলেজকে সে প্রাণের চেরে বেশী ভালবাসে। পত্রতুল্য ওর সে ভালবাসা এ-কলেজের জন্য।

: হুঁ, উকিল সাহেব একটা শব্দ করলেন। তারপর সিগারেটটা জ্বালিয়ে বলেন : আচ্ছা গণ্গা, তুমি কি চাও এ পাপের শাস্তি হোক।

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে গণ্গা : শাস্তি হুজুর, জরুর শাস্তি হারাত হাবি। এ পাপকে খতম করতি হাবি বাবু।

: তা হলে আগামীকাল তোমাকে আদালতে সব খুলে বলতে হবে, গণ্গা।—গণ্গার কথার মাঝখানে বলেন উকিল সাহেব।

: আদালতে!—মুহূর্তে ফুটো বেলনের মতো চুপসে যায় ও।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, গণ্গা আদালত। ওখানে সব কথা তুমি খুলে বলবে। কোন ভয় নেই তোমার। আমরা তো আছি।

—উকিল সাহেব আশ্বাস দেন।

: কিন্তু।

: না গণ্গা, এখানে কোন কিন্তু টিস্তু নয়। আদালতে সব খুলে না বললে পাপী যে-শাস্তি পাবে না। কলেজেরও কলঙ্ক থাকে না—বানির বাবা চৌধুরী সাহেব বলেন।

: পাপী—শাস্তি—কলঙ্ক—অস্বচ্ছন্দ্যের উচ্চারণ করে গণ্গা। তারপর অকস্মাৎ গলার বেশ জোর দিয়ে বলে উঠে : জরুর বোলেগা হুজুর, জরুর বোলেগা—সব বোলেগা একশরার বোলেগা।

ওর গালে দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাঁত চিৎকারের ঠোঁট চেপে ধরে। হ্যাঁ, সেসব

বলবে, খুলে বলবে, যা স্ন দেখেছে সব—সব। কেন বলবে না? কলঙ্কতার, নোংরাবীর সঙ্গে ভীরা আপোষ সে করতে থাকে না—পারে না, পারবে না। পাপের উচ্ছেদ করতেই হবে। পাপকে, কলেজের কলঙ্কে খসে করতেই হবে।

বিড় বিড় করে গণ্গা। গণ্গা জিউ।

সন্ধ্যার কাড়ি থেকে বাইরে এসে বসে গণ্গা। কলেজ সংলগ্ন গণ্গার ছোট কুপাড়ি। হুঁসরতার চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে।

—চারিদিকে ভাষানীন নীরবতা, সামনে দিগে সরু রেখার মত বয়ে যাচ্ছে 'রাণাবিল'। তার উপরই কলেজ। ধবধবে সাদা দোতলা দালান। ধাপে ধাপে কলেজ উপরের দিকে উঠেছে। বড় হয়েছে। আর ওর খানিকটা করে রক্ত চুষে নিয়ে বাধা'কার দিকে ঠেলে দিয়েছে ওকে।

আরো ভালো করে তাকায় গণ্গা সাধা চুনকাম করা দালানটার দিকে। মনে পড়ে যায় ওর অতীতের কথা। প্রথম এদেশে যখন এসেছিল, তখন চল্লিশ বছরের শক্ত জোয়ান দেহে ভরা বৌবন। শক্ত-সামর্থ্য-সম্পন্ন পেশী-বহুল দেহটা তার সেকালের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হক, সাহেবের চোখে আটকে গিয়েছিল।

পরদিনই ডেকে বোলছিলেন তিনি—

: তোমার নাম কি?

: গণ্গা জীউ, হুজুর।

: কি কর?

: কুছ নোই।

: কুছ নেহা? চাকরী করবে?

: নোকরী! নোকরী পেলে তো সে বর্তে যায়, কেন সে করবে না?

তাই বলে : জরুর করগা হুজুর। দিজিয়ে না একটো নোকরী।

: কাল থেকে তবে কলেজের দারোয়ানের চাকরী কর—কেমন?

: জবী হুজুর।

সৌদন গণ্গা জীউ হক সাহেবের এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। সেলাম করে চলে এসেছিল। সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের পুরানো কথা। তারপর থেকে আজ চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে কলেজে চাকুরী করেছে। দিনে কলেজ বেয়ারা, রাতে কলেজ পাহারাদারের চাকুরী।

এ চাকুরীকে সে চাকুরী বলে মনে করে নি কোন দিন। এ চাকুরী তাকে আর তার বাল-বাচ্চাদেরকে দু'মুঠো ডলভাত এবং রুটি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এতো চাকুরী নয়—কলেজ তো তার বাপ-মা। মা-বাপ তো জন্ম দিয়েই খালাস। কিন্তু এ চাকুরীর দৌলতেই আজ তারা ছয় ভ্রাতৃ প্রাণী দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে। তাই সে কলেজ ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে ভাল-বেসে এসেছে তার সমস্ত পিতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে। এ কলেজের গত চল্লিশটি বছরের সব ছাত্রছাত্রী গণ্গাদা বলতে অজান হয়েছে। কলেজের বেয়ারা বা পাহারাদার বলে তারা কামিনিকালেও ভাবেনি। এ কলেজের অধ্যাপক মহল থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপর তার অধিপত্যই আলাদা। নতুন

কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাকে নতুন এসে হের নজরে দেখলেও দু'দিনে গণ্গা তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। অধ্যাপকরাও তাকে সম্মান করে। ছাত্রছাত্রীরা 'গণ্গাদা' ছাড়া গণ্গা বলে কোন দিন ডাকেনা। পুরানো জামজুতো বা দিনে দু-শশ কাপ চা'এর জন্য তাই গণ্গাকে কোন দিন অন্যান্য বেয়ারার মত টাকের পরসা খরচ করতে হয়নি। না চেরেই পেয়ে এসেছে এতোকাল।

তাকে সবাই ভালোবাসে। আর তাই হয়তো বা এই আশি বছরেও ওর চাকুরীটা ঠিক রয়েছে। আর তাই ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সবার কাছেই সে আজও মনে মনে কৃতজ্ঞ।

আর একবার তাকায় সে কলেজের সাদা দোতলা দালানটার দিকে। কোথাও এত-টুকুও দাগ নেই। সাদা বকের পাথর মত ধবধব করেছে।

হঠাৎ গণ্গার শিরায় শিরায় উত্তেজনার শিহরণ বয়ে যায়। দাগ পড়েছে। সাদা চুন করা কলেজটার গায়ে দাগ পড়েছে—কলঙ্কের দাগ। এ দাগ আর কামিনিকালেও উঠবে না। সাদা দেওয়াল আর সে দেখতে পার না। দু'হাতে সজোরে চোখ ঘেঁষে সে। কিন্তু কে, কোথায় সাদা দেওয়াল? শব্দ পোকা—কাল কাল পোকা—কিলবিল করছে এর দেওয়ালময়। সাদা দেওয়ালটাকে ছেয়ে ফেলেছে। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে গণ্গা। কিন্তু তবুও দেখতে পায়। যেখানেই তাকাচ্ছে সেখানেই দেখতে পাচ্ছে পোকা—কাল কাল পোকা—টবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আফিস সবত্র।

চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে গণ্গা; শাস্তি, এই শাস্তি! মেরা লাঠি দো।

পিছনে কার যেন পদশব্দ শুনে ছুবে তাকাতেই দেখে প্রফেসরের বিবি নূরজাহান বেগম ছেলে কোলে করে বাঁড়িয়ে আছে।

নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে অস্বচ্ছন্দ্য একটা শব্দ বেরায় শব্দ গণ্গার মূখ থেকে : মার্মি তু?

প্রফেসরের শরীর ঠোট দুটো বারকয়েক কেঁপে যায়। বলে : গণ্গা আমার স্বামীক...

: আমি কি করবে মার্মি?

: তুমি সব করতে পার গণ্গাদা। আমার স্বামী জেলে গেলে আমাদেরক যে না খেয়ে মরতে হবে গণ্গাদা।

: মার্মি, ও পাপ করেছে।

: তুমি ওকে ক্ষমা করো গণ্গাদা।

: না, না মার্মি, হামি মাফ না করতে পারবে। ও পাপ করেছে। ওর জেল হাবি, ফাঁসি হাবি। তবে না পাপ হাবি। ওকে মাফ করলে ভগবান হামি মাফ না করবি।

: গণ্গাদা!—ব্যাকুল আতর্জনাদ করে ওঠে নূরজাহান বেগম। প্রফেসর জলিলের শরী। হাটু গেড়ে ওর সামনে বসে কোলের নাকটাকে এঁগিয়ে ধরে। বলে : এর দিকে তাকিয়েও কি তুমি ওকে ক্ষমা করতে পার না গণ্গাদা? নিজেকে আর শির রাস্থতে পারে না গণ্গা। সমগ্র সত্তা কামা হয়ে প্রকাশ পায়। দু'হাতে চোখ চেপে ছোট্ট বার ও অন্যদিকে। আত্মশ্রমে বলে : আমি

পারবে না আমি। আমি পারবে না তু চলে  
বা। বাসার বা।

এবার শেষ জন্ম জন্মের মূরজাহান।  
আঁচলের গিট থেকে এক তোড়া কলকড়ে  
নোট গম্ভীর দিকে এগিয়ে ধরে বলে :  
গম্ভীর।

: কেয়া?

মূরজাহানের হাত কাঁপে। তবু বলে :  
নাও তোমার ছেলেকে দিলাম।

চমকে ওঠে গম্ভীর। রাগে কাঁপতে  
কাঁপতে শব্দ বলে : নেহি আমি, তু বা।  
তু-বা--

রাত্রে শব্দে গিয়েও গম্ভীর মূর্খি পায়  
না। সমগ্র চিত্তা জ্বল হয়ে য়িবে। ধরেছে  
দু' হাতে। অনেক চেষ্টা করেও চিত্তার  
কাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে  
না সে।

আদালতের কথা মনে পড়ছে।

—চোখের সামনে ভেসে উঠছে আদালত  
কক্ষে। দৃশ্য। সাক্ষীর কাঠগড়ায় ও  
দাঁড়িয়ে। সামনে মহামান্য বিচারপতি।  
আর এদিকে সহস্র জনতা উনগ্রীব হয়ে  
অপেক্ষা করছে গম্ভীর জবানবন্দী শুনবার  
জন্য। কলেজের পাণের প্রতিষ্ঠা কেমন করে  
হয়েছে—শুনবার জন্য। গম্ভীর জবানবন্দী  
দিয়ে গেল। যা যা দেখেছে সব বলে গেল  
ধীরে, অকম্পিত গলায়। এব গলাটা এক-  
দারের জন্যও এতটুকুও কাঁপলো না।  
জনতা উনগ্রীব হয়ে সব শুনলো।

বিচারক ওর কথা শুনে রায় দিলেন :  
শিখর পবিত্র মন্দিরে শিক্ষক হয়ে একটি  
জাতীয় সংগে এই জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকার  
জন্য শিক্ষকের সারা জীবন কারাদন্ড  
দাঁড়ত করা হলো। কলেজ তার ট্রিশ  
বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কলঙ্কিত  
হলো। কলঙ্কিত হলো কলেজ আর এক।  
গম্ভীর জবানবন্দীতে। এ পাপ চিরদিনের  
জন্য স্থায়ী হয়ে গেল কলেজের ইতিহাসে।  
কলেজে সাধা মেওয়ারে যে কলঙ্কের  
কালিমা লেপন হলো তা কোন দিন উঠবার  
নয়।

হঠাৎ গম্ভীর আতর্নাদ করে উঠে : নেহী,  
নেহী—কিভি নেহী।

শান্তি চমকে উঠে : কিয়া হ'খজী?

গম্ভীর জবাব দেয় না। বোবা চোখ  
জ্বলিয়ে শব্দ তাকিয়ে থাকে শান্তির দিকে।  
শান্তি আবার বলে : চিন্তাশীল কিউ জি?

: এইসি—

গম্ভীর জবাব দেয়। ছেলোটর দিকে  
একবার ডাকায়। শেষ জীবনের নিখি।  
শান্তি পিন ধরে অসুখে ভুগছে। টাকার  
গড়ায়ে চিকিৎসা চলছে না। বেচারী শান্তির  
কালে পড়ে আছে। এক টুকরো কাপড়ের  
ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। শান্তি অভিযোগের  
পরে বলে : আভিতক তুম ইসকা কুছ না  
এরো হো?

: করোগা রে, জরুর করোগা—কিউ  
নেহী করোগা—ও মেয়া মনিয়া হায় না?

শান্তি ওকে বলে : মাগাব কব? খছকা  
বোখার যে ছোর রাঁহা নেহী।

একটুকু চুপ মেরে কি যেন ভাণে  
গম্ভীর। তারপর প্রায় উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে :  
জানিতি শান্তি, চোখেরী মাঝে কাহা,  
গম্ভীর তুম আদালতের সব পাচি সাচ  
কইনেছে হাম তোমে শ' রুপেরা এনাম  
দেগা।

: শ' রুপেরা!

: হারে, হ্যা। ও শ' রুপেরা মিলনেছে  
হাম মনিয়া কো বড়ী ডাগটার জলাফকার  
হাসান সাবকো পাছ লে জারেন্গে। গম্ভীর  
কথা শুনে শান্তি মনিয়াকে আরও নিবিড়-  
ভাবে বুকের কাছে ঝাঁকড়ে ধরে। আশায়  
ওর জ্ঞাত চোখের আড়ালে স্নিগ্ধ হাসি  
ফুটে উঠে। তার মনিয়া ভাল হয়ে উঠবে।  
চোখেরী মাঝে শ' রুপেরা এনাম দিবে। বড়ি  
ডাগটার আসবে মনিয়াকে দেখতে।— ভাণে  
সে।

গম্ভীর দিকে তাকিয়ে শান্তি বলে :  
শোন জি, আদালত মে তুম সব সাচ পাচ  
বলনা, হ্যা!

: আরে বোলেগা কিউ নেহী? চোখেরী  
সাব রুপেরা নেহী দেবেছে তী করুর  
বোলেগা, সব সাচ সাচ বোলেগা—গম্ভীর  
গম্ভীর দৃঢ়তা ফুটে উঠে।

তারপর ওরা দুজন নিশ্চলত শব্দে  
পড়ে ঘুমের কোলে।

পরদিন।

বেলা দশটা পর্যন্ত। কাঠগড়ার  
দাঁড়িয়ে আসামী প্রফেসর জলীল আহমেদ।  
বিশ-বিশ বছরের সুন্দর বয়সক অব্য-  
পক সাহেব। সুদর্শন, স্বাচ্ছন্দ্য ও সদা  
হাস্য গোঁবর্ণ চেহারা তার এ কদিনেই জ্বল  
হয়ে গেছে। চোখের নীচে কালী জমে  
আছে। চুলগুলো এলোমেলো উল্কা-  
খুস্কো। জামা-কাপড় গ্রীহীন। মাথা নীচু  
করে দাঁড়িয়ে আছেন আসামীর কাঠগড়ার।  
নিশ্চল নিখর হয়ে। লজ্জার কড়সড়। মনে  
মনে হয়তো বা বলেছেন : 'মা ধীরেই তুমি  
বিধা হও। আমি তোমার কোলে আমার  
লজ্জাকে লুকাই।'

ডানদিকে ধসে মহামান্য বিচারপতি।  
আর বিরাট হলঘর ভাঁড় লোক। শহরের  
জলে বড়ো কৌতুহলী শতশত দর্শক।  
গম্ভীরকে উকিল জলীলুল ইসলাম সাহেব  
জেরা করতে থাকেন। দু' হাতে কাঠগড়ার  
বেরিৎ দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে অকম্পিত কণ্ঠে  
উঁচুর দিতে থাকে গম্ভীর—গম্ভীর জীউ।  
আদালত এক প্রথমত বরাহ।

ওর জবানবন্দী শুনবার জন্য সবাই  
উনগ্রীব। নিঃশব্দ বন্য করে সকলে শুনছে  
ওর প্রতিটি কথা। জবানবন্দী।

উকিল সাহেব জিজ্ঞাস করেন : তুমি  
কি প্রতিদিন কলেজের দরজা বন্ধ করতে  
পাও গম্ভীর?

: জী হজুর।

: তুমি কি কলেজ গেট বন্ধ করার  
পূর্বে গোড়া কলেজ ঘুরে দেখে নাও?

: জী হজুর।

: তুমি কি গত শনিবার কলেজ গিয়ে-  
ছিলে?

: জী হজুর।

: তুমি সেদিন বিকেল পাঁচটার কলেজ  
হাটের পর প্রফেসর রুমের কোন গিরেছিলে?  
: তালা লাগিয়ে হজুর।

প্রতিটি প্রশ্নের জবাবের পরে সে ঠিক  
ঠিক। এতটুকুও গম্ভীর কাঁপে না। একবারের  
জন্য না।

উকিল সাহেব শেষ ও ফোকর প্রশ্ন  
ছোড়েন ওর দিকে। বলেন : তালা লাগাতে  
গিয়ে প্রফেসর রুমের তুমি কাউকে দেখে-  
ছিলে গম্ভীর?

মুহুর্তে গম্ভীর জনতার দিকে তাকায়।  
ওদের শব্দ-সহস্র চোখ কান জিহবী হয়ে  
আছে কলেজের চরিত্র বন্ধুর ইতিহাসে  
প্রথম পালের প্রতিষ্ঠা দেখার জন্য।

এক মুহুর্ত।

কি কেন ভেবে নেয় সে শেষবারের জন্য।  
ওর গম্ভীর কণ্ঠে ওঠে। বলে : জী নেহী  
হজুর। আমি কাউকে দেখিনি।

: গম্ভীর!

উকিল সাহেব আকাশ থেকে যেন মর্মে  
গম্ভীর করে ছিটকে পড়েন। তার গলা থেকে  
কেন আতর্নাদ বের হয়। একি বলছে গম্ভীর?

দর্শকদের মাঝেও বিশ্বাসের গুঞ্জরণ  
ওঠে। সবাই ফিস-ফিস শব্দ করে, এতো-  
কণে। এ ওর মুহুর্ত দিকে তাকায়। ওদের  
মধ্যে কেউবা একটু জোরেই বলে—

: মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই।

কেউবা তার উত্তরে বলে : না, ও শালা  
হাতুখোর, প্রফেসরের কাছে থেকে মোটা  
টাকা ঘুরে খেয়েছে। নইলে একথা বলবে  
কেন?

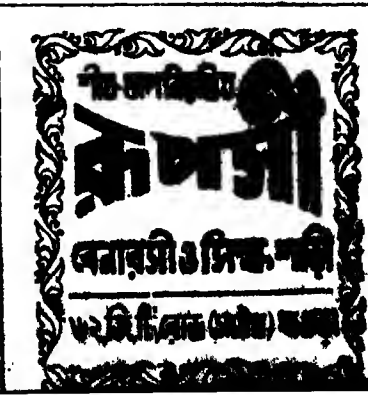
উকিল সাহেব বক্তৃকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—

: মিথ্যা কথা বলো না গম্ভীর। তুমি  
তোমার ভগবানের শপথ নিয়ে বলে :  
কাউকে দেখেছিলে কিনা?

কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে বিচারকের  
দিকে তাকিয়ে গম্ভীর বলে : ধর্মবিশ্বাস, ভগ-  
বানের শপথ করেই আমি বলছি, তাহাি সাচ  
সাচ কলেজে সেদিন কাউকে দেখিনি  
হজুর।

বক্তব্য শেষে গম্ভীর অজ্ঞান হয়ে মোষতে  
পড়ে যায়।

গম্ভীর কলেজে পাপ প্রতিষ্ঠা হতে  
দিল না। কোন লোভ নয়—কোন প্রার্থণ  
খাতিরেও নয়। সে বে'চে থাকতে ভাব  
পিড়তলা, সন্তানভুগা কলেজের ইতিহাসে  
পালের প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না।



উনচালিশ বছর আগেকার কংগ্রেস সভাপতিকে মশজুপে নিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। সঙ্গে আছেন শ্রীমতী মায়ী রায় এম-পি।



## অঞ্জনা

### মহিলাদের রাজনীতি সচেতনতা

কমল প্রকাশ, জাতীয় কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনে যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। যেও প্রতিনিধির সংখ্যা পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য কথা হলো এ সংখ্যা অনেকখানি বেশি। যতদূর জানা যায়, এমন বিশাল সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি ইতিপূর্বে আর

কোন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেননি। অথচ প্রাক স্বাধীনতা যুগে দেশের রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয় মহিলারা এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কমলা নেহরু, তখন মহাত্মা গান্ধীর, জওহরলাল নেহরু জেলে বন্দী। বৃটিশ তত্ত্ব

ধর্মেরসাফল্যের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হল যে, তিনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন, দণ্ডভোগের যে মোকদম এখনো থাকে তাতে সে সময়ে তিনি রাজনীতির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখবেন না এবং অস্বাস্থ্য সৃষ্টিকে দেখার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আত্মহত্যা করা এ দুয়ের মধ্যে কোন উত্তর দিল না পণ্ডিতজীর কাছে। মহাত্মার জন্য বিবেচ্যবসিদ্ধ হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু অতি দ্রুত সব শব্দর কাটিয়ে উঠলেন। আর এ শব্দ সম্প্রদায় হলো পত্নী কমলারই ধন্য। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন, সেক্টেম্বরের পর এলো অক্টোবর। তাকে (কমলা নেহরু) দেখার জন্য আমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া

হলো। সে আজকের মতো শরোঁছিল। গারে বিষম জ্বর। সে আমাকে দেখতে চেয়েছিল, আমাকে তার কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আগার জেলে ফিরে খাবার-সময় হ'লে সে আমাকে কিছু ইঁটে বসে। আমি কিছু হলো। আমার কাছে সে ফিসফিস করে বললো—সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কি হলো? এ প্রতিশ্রুতি তুমি কি করে দাও—এই হচ্ছে কমলা নেহরু।

তার মৃত্যুর পর শাস্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভার স্মৃতিস্মনাথ কমলা নেহরু কলকাতা জেলেছিলেন। এই নারীর বিরুদ্ধে শত্রুর সবচেয়ে প্রচেষ্টা যে দলীয় সংগ্রাম চলেছিল, সে সংগ্রামে তিনি কোনােদন পরাজয় স্বীকার করেননি। সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সন্দীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচ্যুত চিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। দীর্ঘবয়সের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ডাকেননি। নিজের কথা তুলে সংকটের মুখে থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁকে বেদনা জানাননি। স্বামীর ব্রতরক্ষা তিনি আপন প্রাণপ্রকার চেষ্টাও বড় করে জেনেছিলেন। এই দৃষ্টান্ত সাধারণ জোরে তিনি মৃত্যুর পরও স্বামীর নিষিদ্ধ সঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

এমন যোগ্য স্ত্রী না পেলে জওহর-লালের জীবনসাথী হওয়া অসম্ভব হতো যেত। কংগ্রেসের কর্মসূচির জীবনযাত্রার প্রথম সারির নেতাদের গৃহিণী, যাঁ এবং যৌন-সুখেরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হুমিকা ছিল। এবং সে হুমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বসন্তে গেলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন রূপেই তাঁরাই ছিলেন মূল প্ররণাদাতী।

এলাহাবাদের আনন্দ ভবন ছিল জাতীয় কংগ্রেসের এক বিরাট রীতি। সেদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেশের পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। পশ্চিম গতিসাল নেহরু ছিলেন তখন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্মসূচী। আর তিনি মরি কাছ থেকে নিরন্তর প্ররণা প্রেরণ করছিলেন। তাঁর পত্নী স্বরূপে স্বামী। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনে তিনি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা-আকাংক্ষার গান্ধী-স্বপ্নকে তিনি প্রতিটি কণ্ঠে স্বামীরে জাগ্রত জাহাঙ্গীর করেছিলেন।

দেশকল্যাণের বাসন্তী দেবী স্বাধীন দেশানুরোধের প্রতি ছিলেন উৎসাহিতপ্রাণা। শত্রু দেশকল্যাণের নয় সেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর মনে তিনি বিরাট প্ররণা জাগিয়েছেন। সত্যজিৎ বোস তাঁকে মা বজ্রই সম্বোধন করতেন। সত্যজিৎব্রহ্ম নেতাজী হওয়ার পিছনে বাসন্তী দেবীর মান-অনুকরণ। স্বামীর সকল কাজেই ছিল তাঁর অবিসল আস্থা। তাই দেখা যায় যে, দেশকল্যাণে বহন বাড়ি-ঘর সম্বন্ধে প্রশংসক দাঁড় করে

নিরন্তর তখনও বাসন্তী দেবী হাসিমুখে স্বামীর হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। দিনের পর দিন দেশবাসী কারাওতালে দিন কাটিয়েছেন আর বাসন্তী দেবী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরো প্রশস্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলার কাজে করেছেন আত্মনিয়োগে।

গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরবাও খুব একটা স্বামী সান্নিধ্য পাননি। গান্ধীজীর জীবন কেটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর ইংরেজের জেলে। কস্তুরবাও সেজনা কথনো কিস্তি-মুদ্রা কার্তরতা প্রকাশ করেননি। গান্ধীজীর মন-বিশেষ কাজে ব্যস্ত তখন তিনি তাঁর কাজ-আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন, মেয়েদের মতো মাদি গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে।

প্রধানভাবে দেখা যায় যে, এরা সকলে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি বটে কিন্তু এদের প্রথম ব্যক্তিত্ব এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষে কাজ করাই ছিল একরকমের অসম্ভব। আরার মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা থেকে শত্রু জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মহিলাদের যোগাযোগ ছিল। ১৯১৭ সালে তাঁরা এগিয়ে এলেন প্রত্যক্ষভাবে। সে বছর কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীমতী আনি বেসান্ত। এই সর্বপ্রথম একজন মহিলা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত্ত হন। সেদিন তাঁকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল দেশবাসী-কন্যা অর্পণা দেবীর প্রতিষ্ঠা থেকে তার কিছুটা উদ্ভূতি দেখা যায়। যাক : বিপুল সমারোহে শ্রীমতী বেসান্তকে স্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে আনা হলো। জাতীয় পতাকার গ্রিবাং রঞ্জিত পোশাকে কিশোর-যুবকদের অসং-চালনা, জাতীয় সেবকদের ছেলেমেয়েদের শোভাযাত্রা ও সবশেষ পুষ্কাজ্জ্বলিত গাড়িতে শ্রীমতী বেসান্তের প্রত্যাবর্তন চিত্তকর্ষক হয়েছিল সন্দেহ নেই। জনাকীর্ণ পথের দু-পাশের বাড়ি লোকে লোকারণা। যেখান দিয়ে তাঁর গাড়ি যাচ্ছিল সেখান থেকেই তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করে সমগ্র দেশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ব্রিটিশ আইনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আইন-কবলিত সত্য মতিপ্রাপ্তা দেশ-নায়িকার প্রতি জনগণের হ্রস্বা তাঁকে সত্যজীর মহিমায় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এরপর ১৯৩৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির মর্যাদা লাভ করেন শ্রীমতী নেলি সেনগুপ্তা। দেশীয় বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিণী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন অল্প থেকে ৩৯ বছর আগে। দেশীয় প্রেরণা কাজে তিনি ছিলেন স্বামীর বিশ্বস্ত সহচরী। সে বছরও কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। আজ অধির বহন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আবেগভরে প্রধানমন্ত্রীকে কলকাতায় করে তিনি বসে বসে ইন্দিরা গান্ধীকে ডেকে ডেকে তাঁকে কাছে কাছে ফিরাতে ফিরাতে বলেন। স্বামীর কিস্তি-মুদ্রা কার্তরতা দেখতে ডেকে ডেকে দীর্ঘা-হাসিনের কান্না ফেটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমতী নেলি সেনগুপ্তা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও স্বামীর অঙ্গীকৃত পন্থায়ই ছিলেন। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। আর সেখানে স্বামীর বাসায়ই তাঁর প্রতীতি বসে।

এরপর সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে স্বামীর সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীর শ্রীমতী সত্যজিৎ সাহু। দেশের যে অসংখ্যক মহিলা তাঁরা, জিজ্ঞাস্য আর দেশের অসংখ্যক মহিলা ছিলেন তাঁদের প্রাণে তিনি শীর্ষস্বামী। গান্ধীজীর কিস্তি-মুদ্রা-গান্ধীজীর তিনি অসংখ্যক। স্বামীর কিস্তি-মুদ্রা নানা সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর বিশেষ বলিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সন্তোষে তিনিই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি কংগ্রেস সভাপতির সম্মান লাভ করেন।

তারপর আর অনেকদিন কংগ্রেস সভাপতির মর্যাদার কোন মহিলাকে দেখা যায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনীতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহও অনেকখানি কমে গিয়েছিল। তাই সেসময়ে কংগ্রেস অধিবেশন যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও তেমনভাবে সাদা লাগতেনি। দেশ স্বাধীন হবার দীর্ঘদিন পরে ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির সম্মান লাভ করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আজকের ভরতের রূপকার। এ দু'বার কংগ্রেসে অধিবেশন বসে স্বাক্ষরে গৌরাটি এবং নাগপুরে।

তারপরের ইতিহাস অনেক মোড় নিয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত স্বরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। নানা প্রতি-কূল অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সূযোগ কাণ্ডারীর মতো তিনি দেশ-তরণীর পরিচালনা করেছেন। এখানের কংগ্রেস অধিবেশনের তিনিই প্রধান। তিনি আমাদের নারী জাতির গৌরব। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক রাজনীতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। যার প্রতিফলন ঘটেছে এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে। একে বলা চলে মহিলাদের রাজনীতি-সচেতনতার পূর্ননবীকরণ। এর সবটাই নেহাত সাময়িক না সূর্যপ্রসারী প্রতিভার ইংগিত বহন করছে তা বোকা বাবে দূর ভবিষ্যতে। সে সূর্যপ্রসারের প্রসঙ্গ অনাকূল সময় নয়।





# রুমা গৃহীকুরতা

## সন্ধ্যা সেন

‘রুমা গৃহীকুরতা’—নামটি শুনলেই মনে ভাসে নিটোল একটি মূর্তির ছবি। আরতনে বিশাল নয়, কিন্তু তার দীপ্তিতে? টলটলে পূর্ণতায়? মূর্তি না হয়ে উপায় আছে?—এ দীপ্ত প্রখর নয় বলেই মনের কোথায় যেন এমন একটা সিন্দূরমাখিত বিকীরণ করে, যার দাহ নেই কিন্তু আলো আছে। ব্যক্তির এই স্বয়ংপ্রভ আলোতেই রুমা উদ্ভাসিত।

রুমাকে দেখেছিলাম অনেক দূর থেকে। কখনও মঞ্চে, কখনও বা পর্দায়। আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবের নানান অনুষ্ঠানে যখন অকুপণ ঐশ্বর্যে টেলে দিচ্ছেন নিজেকে তার অতি আদরের ইয়্যুথ কয়ারের নতোর জোয়ারে, গানের বজতানে, উৎসবসভায় সতপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। উজ্জ্বল করে তুলেছেন সেই পূর্ণামধুর লসনকে। সেই আলোতেই শব্দ দেখলাম না, নতুন করে চিনলাম রুমাকে। নামেরই মত মধুর যার প্রতিটি সৃষ্টি, শিল্পচিন্তা ও গানের তরঙ্গ।

নাচ, গান, অভিনয়, সংগঠনশক্তি সব-কটিতেই তিনি শব্দ প্রথম প্রণয়ীর নন, যাকে বলে জাত-প্রতিভা তাই। কিন্তু এমন বহু-মুখী প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও শিল্পী যেন তাঁর বধ্যাযোগ্য স্বীকৃতির আসনটি পেলেন না। রুমার সংবোধ এইরকম একটা অস্বস্তি কোড মনের মধ্যে জমা ছিল। বার-বার মনে হয়েছে শিল্পচক্রের অনেক ঘটনার মধ্যে এটাও একটা জায়গা ঘটনারই সামিল। কিন্তু আরো আশ্চর্য ঘটনা যেটি, সেটি হচ্ছে এই যে তিনি নিজে এর জন্য এতটুকুও কৃষ্ণ নন। তাঁর ইয়্যুথ কয়ার নিয়েই তিনি ভরপুর রসউজ্জল—কি পাইনি সেই হিসাবের ক্ষুদ্রতা এ আনন্দকে হারাতে পারেন তিনি যাক।

‘অনেকটলি বলছি—আমার ইয়্যুথ কয়ার নিয়ে আমি এত আনন্দে আছি, যে কোন অপূর্ণতার বেদনা আমার এতটুকুও বাজে না। কারো সংবোধ আমার এতটুকু অভিযোগ নেই।’—মাত্র কয়েক দিন আগে নানান আলোচনাপ্রসঙ্গে শিল্পীর এই নিষ্ঠুর দৃঢ় উক্তি শুনে এক নিখাদ আত্ম-প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছিল বলেই বোধ তা মনকে এমনভাবে স্পর্শ কবল। এই ইয়্যুথ কয়ার রুমার সারাজীবনের শিল্প, ধ্যান, স্বপ্ন ও সংস্কৃতির ফলপ্রসূতি—এ তাঁর প্রাণের চেয়েও বড়।

এই ইয়্যুথ কয়ার প্রসঙ্গেই শিল্পী ফিরে গেলেন সুদূর অতীতে। ওঁর সেই সঙ্গে আমারও চোখের সামনে ভেসে উঠল লোকালয় ও তার কলরব থেকে অনেক, অনেক দূরে আলমোড়ার নত্যাগুরু উদয়শঙ্করের সাধনশীতের ছবি। মাত্র সাত বছর বয়সেই উদয়শঙ্করের ধ্যানলোক সেই আলমোড়ায়

ছোট রুমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মা—(তখনকার দিনের প্রখ্যাত গায়িকা সীতা দেবী)। চেতনা জাগবার আগেই রুড়ীতে মা ও বাবার (সদ্বিখ্যাত শিল্পশাসিক ও সাংবাদিক মণিটাবাদ) সংগীত ও সংস্কৃতির আওতায় মনের সুকুমার বসন্তগুলি জল-সিঁপ্ত লতার মতই সতেজ শ্যামল হয়ে উঠছিল। পাখীর মতই কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত গানের গুঞ্জন সুরু হয়েছিল সেই শিশুকাল থেকেই। গানের ঘরে জন্মানো ছাড়াও আবদুল রহমানের কাছে স্বপ্নাঙ্গিনীর শিক্ষাতেই সজ্জাত প্রতিভার শান লেগেছিল। ঠিক এই সময়েই আলমোড়ার পরিবেশ রুমার শিল্পমানসে গঠনে মণিকাণ্ডন যোগের মতই ভূমিকা গ্রহণ করে।

‘আলমোড়াতে মা গান শেখাতেন। সেখানে নাচ ও গানের শিক্ষা চলল একই সঙ্গে। শব্দ কি নাচগানের শিক্ষা? কেমন করে চলতে হয়, সুন্দর করে কথা বলতে



ইয়্যুথ কয়ারের লোকনৃত্য ;

হয়, গুরুজন ও প্রাণের সকলের সঙ্গে আচরণে কেমন নমন হতে হয়—সকল মানুষের মর্যাদা রেখে ব্যবহার, শোভনসুন্দর বেশাবাস—সে সব শিক্ষা লেখাপড়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ ছাড়া প্রতি পুজো, বড়দিন, মুসলমানদের পরবে—সবই হয়ে উঠত আমাদের সকলের উৎসব। এ-সবকে কেন্দ্র করে সবাই মিলে সেই হুজুড়, আনন্দ কেউ কি কম্পনা করতে পারে? আনন্দের মোতেই জাতিগত, ধর্মগত ভেদ-বৈষম্য কোথায় ভেসে যেত। আনন্দের হাটেই সকলের মিলিত সুখের শূভ্রশ্রুতিতে এই উপজাতি জাগত যে আমরা বাঙালী। হিন্দু, মুসলমান সবই সত্য—কিন্তু সবার ওপর বড় সত্য হোল আমরা ভারতীয়। এ এক অভিনব আশ্চর্যচর। এ পরিচয়ে মানুষের শূদ্র দৃষ্টিভঙ্গীই নয়, গোটা চারিদিকই বদলে গিয়ে একটা অপূর্ণ বিকাশে যেন দল মেলে।

এ সবেরই উৎস ছিলেন দাদা—যেমন অভিনব তার শিক্ষাপন্থিত, তেমনই অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। এত স্নেহকোমল, এমন কোমল, উদার, কিন্তু কি শিষ্টকটু তিসিলিন! স্টেজের ক্ষেত্রে সকলের নড়ানো, এক আঙুলের চলার ছন্দে এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। টোনার হিসাবেও দাদা অতুলনীয়।

“এই শোম্যান শিপের শিক্ষা অন্তঃপ্রবাহী শক্তির মতই আপনাব ইচ্ছা ক্যার গঠনে সাহায্য করেন কি?”—শিল্পীর উচ্ছাসমুখরভাষা বাধ্য দিয়ে বাল।

‘আপনি ঠিকই ধরেছেন। জানেন, আল-মোড়ার জীবনের মত অমন সার্থক সুন্দর দিন শিল্পীর জীবনে আসে না। দাদা শু মধ্যমণি হয়ে ছিলেনই, তার চারপাশে বেসব ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল গড়ে উঠল তাদের আকর্ষণই কি কিছ্র কম? সিমকাজী, জোহরাজী, অমলাদি, শঙ্করম নন্দদরী, আরও কত গুণী—সন্নিগীল শিল্পী। এদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করাটাও একটা মস্তবড় সৌভাগ্য।

দাদা সবাইকে নিয়ে অল ইন্ডিয়া ট্যুরে বেরোলেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। যেখানেই বাই ইতিহাসের রাজাবাদশাদের মতই যেন এক একটা রাজ্যের হয়ে যায়। এ ট্যুরকে দাদার ট্রুপের দীক্ষকের বাবা বললেও অত্যাঁজ হয় না। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে বোম্বে এসে দাদা থেকে গেলেন। এই সময় থেকেই এবং বোম্বেতেই ‘কম্পনার’ রিহাসিয়াল সুরু হয়েছিল।

এই শোভেই আমার নাচ দেখে আর গান শুনে দৈবিকারণী খুবই প্রভাব হয়েছিল। উনি মার সঙ্গে দেখা করে আমার ছবিতে সেনার জন্য অনুরোধ জানালেন। সেই আমার প্রথম ছবিতে কাজ।

‘মা আপত্তি করেননি?’

‘একেবারেই না। আমাদের বাড়ীর সবাই বিশেষ করে মা, বাবা শিল্পকে সীতা করে ভালবেসেছেন বলেই এ, যিহা গভীরগাভিক

ইন্দু কল্যাণের নাগাম, তে



‘আর একটা কথা—আলমোড়ার অমন ধ্বংসের মত পরিবেশের পর চিত্রজগৎ ত বলতে গেলে আশমান জমীন তফাৎ—এর জন্য মনে কোনো শিথ্যা আসেনি?’

‘আসাটাই হয়ত স্বাভাবিক—তবু যে আসেনি তার কারণ দৈবিকারণী ও হিউ-মামা (হিডেন জোখুরী) তখন খুব ছোট ছিলাম বলেই হয়ত এরা আমার এমন স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখতেন যে স্টুডিওটা ঠিক বাড়ী বাড়ী মনে হতো।’

‘কি কি ছবিতে ছিলেন?’

‘জোয়ারভাটা’ ও ‘দিন কা তারা’—এরপর মা পুষ্করিয়া কাপড়ের খিরেটেরে যোগ দিলেন। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হলাম।’

‘তখন কি শিল্পীজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল?’

‘ছিন্ন হয়ে গেল বললে ভুল বলা হয়। এই সময় জোহরাজী ও তাঁর স্বামী কয়েক ম্বরজী বোম্বেতে নাচের স্কুল করেছিলেন। ওদের কোনো অনুষ্ঠান হলেই আমার যোগ দিতে বলতেন।

এই সময়ই মাত্র ১৩ বছর বয়সে নীতিন-দার আমন্ত্রণে বন্ধিমবাবুর ‘রজনী’ ছবির নামভূমিকার হিন্দী বাংলা ডবল ভার্সনে অভিনয় করলাম। তখন পড়াশোনার কিছুটা

ছেদ পড়ল। ‘রজনী’ হিট পিকচারই হয়েছিল এবং আমার গান ও অভিনয় শিল্প-বাসিকদের উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন পেয়েছে।

‘রবীন্দ্র ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া’ সুরু করলেন। ভারতের কত বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। গ্র্যান্ড হলে দেখতাম তাদের কাজের ব্যারা, ভাবনার ছবি। এই সময় আই পি টি এ গড়ে উঠল। ভারতের সেরা শিল্পীদের মিলনমেলা যেন। আর সকলেই তখন যৌবনপ্রাচুর্য ও সৃষ্টির প্রেরণার উচ্ছল, উৎসব। সেনাব আনন্দের দিন জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

‘এর পরই এল জীবনের এক উজ্জ্বল-যোগা পটপরিবর্তন। ছবিতে কাজ করতেই স্টুডিওতে অবসর পেলেই স্টান-দার ঘরে গিয়ে বসতাম। উনি সুরু রচনা করতেন, কত আর্টিস্ট আসতেন তাঁদের ছবির গান তোলাতেন। খুব ভাল লাগত। তাছাড়া মানবটাও ছিলেন বড় মজলিসী।

‘এইখানেই দেখলাম কিশোরকে। শিল্পের মত চম্পল, প্রাণপ্রাচুর্য যেন টগবগ করছে। আর কি অপূর্ব কণ্ঠ। আরো অশ্রু-ব্যাপার হচ্ছে নোটেশন, পদ্য, সরগাম’ কিছ্রই ও জানেন না। কিন্তু সে কোন সুরু, এক লহমায় তুলে নিয়ে এমন আকর্ষণীয় ট্যু

শ্রীধৃত  
শুভ্র ও শ্রেষ্ঠ

অন্যোক্তিক রচিত প্রাইভেট লিঃ

২৬, কলি বটী, কলিকাতা-৭



গাইতে পারেন যে শব্দে মনে হয় বেন অনেক শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা এই 'গায়কী' তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা। তবে তার কাছেই জানেন না যে গায়কী হল বিধির মতো। ওর কাছে শিখার প্রক্রিয়াই মতই হয়।

**কেন? উচ্চারণের ক্ষেত্রে মৈত্রীকর এবংকর শব্দের অধিকারী ছিলেন—**

**আমিও জানি।** গানের ওপর আমার সবচেয়ে অধিকার ছিল। এই গান শুনতে শুনতেই মনোহর হয়ে উঠে। এসে গেলাম। আমারই গানের প্রথম উল্লাস। তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল। তখন আমার ১৬ বছর বয়স।

**সুইট-টিকিটের প্রেমের মতই তার হোয়ার শিপকাজের নিম্নে মনোহর পরিণতির দিকে ছোড় দিলে?** —সকৌতুলে জিজ্ঞেস করি।

**একবারেই বন্ধ হয়ে গেল।** বাইরের কর্মজীবনে একটা সাময়িক বিরতির ভেন পড়ল এটা বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়।

**কেন?**

**তখন বর-সংসার-গৃহস্থালীর কাজটা এত ভাল লাগে গেল যে তাতেই একবারে জিজ্ঞেসে হারিয়ে ফেললাম—**

**'বিভিন্ন স্বাদ?'**

**'খানিকটা' বলেই মন্দ হেসে চিন্তিতলপরে বুঝা হলো—** 'তাছাড়া বিবাহিত জীবনটা আমি খানিকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিরে-ছিলাম'—

**কেন?**

**কারণ এ বিয়েতে আপত্তি ছিল জিজ্ঞেসের বাড়ীর সবার।** সবার আপত্তি অস্বীকার করে বিয়ে করেছিলাম বলেই জেনে চলেছিল সবাইকে জয় করতে হবে, আমার বিরোধিতার শক্তি দিয়ে নয়। আমার প্রথা ভালবাসা সেবা দিয়ে। আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হবার। কিশোরের মা থেকে সবার স্নেহ, ভালবাসার এমনভাবে ডরে উঠেছিলাম যে কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দঃ আমায়

মনকে স্পর্শও করতে পারিনি। তবে এ বন্ধন রইল না—ইংরেজ অন্যমনস্কতার দ্বারা পড়ক হবার জায়গা থেকে।

**কেন? কুল বোকাখানি?**

**একবারেই নয়।** বরং তার উল্টো। বোকাখানি হবে মজা, মজা এবং প্রাণ-খোলা ছিল। বলেই মনে পড়ায়ের পক্ষে এ জীবন থেকে বিদায় নেওয়াটা সম্ভব হয়েছিলো। প্রথমতঃ ওর উচ্চ কণ্ঠস্বর, আমি চাইতাম ও তার অপটুতা করে পূর্ণ সার্থকতার পৌছক গানকেই পথে। কেন না-তারই ছবির গানের জনপ্রিয়তার মধ্যেই পূর্ণ সার্থকতা সীমিত থাকবে? গানের প্রচারের আর্থনিকায়ন করক, গান গান বা কণ্ঠস্বর দে, শুননা, সাময়িক পক্ষক মলিক, কমন লেবীর গানের মতই হাওয়া গানের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে। এর জন্য ছবির কাজ যদি একটু কমাতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি?

**কিন্তু প্রাগোচ্চল কিশোরের পক্ষে শব্দ গান নিরে থাকটা সম্ভব হোলো না।** তাছাড়া তখন অত নাম, ডাক, স্লামার, টাকা, টেমবল, বিশালসে মিলেছে আকর্ষণ ছাড়াটা কারোর পক্ষেই সহজ নয়। এজন্য আমি ওকে একটুও দোষ দিই না।

**কিন্তু এই ছবির কাজেই ও এমন বিভোজ হয়ে গেলো যে কাজ ছাড়া ওর জীবনে আর কিছুই রইল না।** তখন বোম্বের ছবির ক্ষেত্রে ওর চাহিদা এও বেড়ে গেল যে অন্য কোনো রিল্যাকসেশন বা গহ-জীবনের ডাকে সাড়া দেওয়ার কোনো অবকাশই ছিলো না।

**আমার কাছে কোনোদিনই টাকাটা বড় ছিল না, আজও নয়।** আর সব বাদ দিলে অথবা ধরলেও একগা ত অস্বীকার করা যায় না যে আমি নারী। নীড় বধবার সাথ আমায় মজায়। কর্মজীবন আমি ভালবাসি নিশ্চয়, কিন্তু দিনের শেষে সব কাজ সারা হলে মনটা যে পাখীর মত ডানা গুটিয়ে আগ্রহ নিতে চায়—সৌন্দর্য ও শান্তি নিশ্চয়।

**কখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই ঘরমুখী জীবনে জীবন যোগ করা কিশোরের পক্ষে সম্ভব নয়—তখন মনে হোলো** তবে আর এ নিরর্থক বন্ধনে জড়িয়ে থাকার বিড়ম্বনা কেন? এও ত এক ধরনের আত্মপ্রতারণা—জীবনের অঙ্গুর। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোমতকম কটাক না করেই বলাই—চিরজগতের পরিবেশ এখনও সেরকম হুসিদি হয়ে ওঠেনি।

**যাই হোক, বখন যুক্তলার পরস্পরের প্রতি প্রাণ ও কিশোরের অভাব না থাকলেও স্বধর্মের তফাৎটা বড় বেশী।** তখনই আমাদের জীবনের পথও আলাদা হয়ে গেল। এর জন্য আমরা কেউ কাউকে মেরজোপ করি না। আমাদের বোঝাপড়া, বন্ধু-সম্পর্ক আজও অটুট।

**জীবনের এতবড় একটা ওলট-পালটের পর একাকীত্বের প্রাস থাকে আত্মরক্ষা করবার**

**ঠিক কিছু পরিকল্পনা করে কোনো কাজ করিনি—বিবর হেসে বুঝা হলো—** 'সবটাই যোগাযোগের ব্যাপার।' এই সময়, মানে ১৯৬৬ সালে সলিলদা আমার কাছে এলেন ইউথ ক্লবের গড়বার পরিকল্পনা নিয়ে। ও'র আইডিয়া আমার খুব ভাল লাগল—আমি সামলে এই গড়ার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

**'আইডিয়াটা কি?'**

**সলিলদা বললেন, এখনকার যুগে ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আইডিয়া দেখানো, বিশেষ করে যুগের পরিবর্তনের কিশোরদের এমন কিছু একটা সনাক্ত করা উচিত।** হেরিড-ট্যাকি সও তার কোনো খবর না জানতে পারছে না, আর না জানলে জানবেই বা কি করে? আমাদের রবীন্দ্র, অভুলপ্রসাদ, শ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত, নুজরুনের গান, এত বকমের লোকসংগীত—এর মধ্যের রসের অফুরান সম্পদ, রঙের বাহার, ভাবের গভীরতা, আবেগের দোলার কাহিনী ওদের সামনে মেলে ধরার দায়িত্ব ত আমাদেরই। এসব গান শুনলে ওরা গল্প করবে না এ হতেই পারে না।

**—সলিলদার কথা শুনে মনও খুব সায় দিল।** নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে গড়বার কাজে নেমে গেলাম—

**'একটা কথা বুঝা—** শিল্পীর উচ্চাঙ্গে বাধা দিয়ে বলি—'মাকের কটা বছর কি গান বাজনার সঙ্গে একেবারেই কোনো সম্পর্ক ছিল না?'

**আমি নিজে কোনো অমুঠানে অংশ গ্রহণ করিনি—তবে সবরকম সংগীত সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক আসরে সুযোগ পেলেই যেতাম।** ইংরিদি মনেইনের বাল্যনা শুনছি, বিলায়ে খাঁ সাহেবও প্রায় আসতেন আমাদের বাড়ী। অন্যান্য সব শিল্পীদেরও আনাগোনা ছিল—আমি পারফরমিং আর্টিস্ট না থাকলেও শিল্পজগতের থেকে একটুও বিচ্ছিন্ন হইনি।

**এবার বন্দন আপনার ইয়থ করারের কাহিনী।**

**সে আমাদের জীবনে তীব্রভাবে বে'চে ওঠার এক যোগাযোগের অধ্যায়।** বিমল গায় প্রেসিডেন্ট, শৈলেন্দ্র ও আমি হলাম জরেনট সেক্রেটারী। সলিলদা ও আমিই শব্দ নয়—কম্বারের প্রত্যেকটি সভা যে কি অমানবিক পরিগ্রহ করেছেন ভাবা যায় না। বোম্বে ত কমমোপলিটান শহর জানেনই। নানরকম জাতি, নানা ভাষাভাষীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে করতে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' কথাটির সত্যতা যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম। আর এত সব লোক-সংগীত কিভাবে সংগ্রহ করেছি জানেন? 'নানরকমের কলেক্ট' গিয়ে গোয়াল লোক-সংগীত তুলে এনেছি, পঞ্জাবের শিল্পী খুঁজে পাওয়া, মাদাজের শিল্পীরা তার মাদাজী—এইরকম বিভিন্ন দেশের মানবের কাছ থেকে গান তুলে এনেছি।

**হালা দাখতোর বিশ্ব অবদান বিশ্ব পদী আদী মণীষী প্রদাসিত লেখক এন হুয়াখাখায়ের**

**অপরিখীতা**

**বুৎ চিন্তাশীল সামাজিক উপন্যাস**  
মূল্য ১৮/- ১৯৮৮ পত্রা

**অজলি**

**পীতিকাল। ৩৫৪টি গানের সমাবেশ।** মূল্য ৫/-। মূল্য প্রতিকালীত সম্পীড়ও ধারা। **সম্পীড় সম্প্রদায় অবশ্য প্রত্যা।** মূল্যপ্রদায়ের পক্ষে ও ধরনের পুস্তক আর ব্যতির হয় না। পুস্তক ল'খার মূল্যবিতর এ আকর্ষণীয় কতক উচ্চপ্রাণীসত্ত। প্রে. ও প্রাণের প্রকাশ ও সম্ভার বিকাশ। জ্ঞানী প্রাণ।

**মি বর মটর**

**১৫ কলকাতা কোয়ার, কলিকাতা-১২**

**সবচেয়ে সাদা**  
ক'র কাপড় ধোয়ার  
পাউডার

**সবচেয়ে উজ্জল**  
ক'র রঙীন কাপড়  
ধোয়ার পাউডার

**কাপড়**  
আর গরুরও পক্ষে  
**সবচেয়ে নিরাপদ**  
পাউডার



## নতুন তিত ভাবে কার্যকর ডেট

নতুন ডেটে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'র কাপড়  
ধোয়ার জন্যে সাদা করার একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।  
নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি।  
এটি কাপড়ের পুরনো ময়লা দূর ক'রে দেয় আর  
রঙীন কাপড় উজ্জল ক'রে তোলে।

নতুন ডেটে প্রচুর কেনা হয় আর এই কেনার  
রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ।  
এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের থেকে  
সবচেয়ে নিরাপদ—তেনি আপনার হাতের  
পক্ষেও সবচেয়ে নরম।



সাদা ডেট



নীল ডেট

নতুন সাইজ : ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০,  
৮০০, ১০০০ প্যাক

আরেকটি উৎকৃষ্ট  
ডেট উৎপাদন

**ডেট**



সারানের জলদ্বারা  
১১-গুণ বেশী কাপড়  
ধোয়, আপনার জামাকাপড়  
অধিক বেশী নরম।  
হয়—আপনার হাতের  
পক্ষেও নরম।

ইয়ুথ কয়ারের গরবা নৃত্য



ভুলিয়েছি। কি প্রচণ্ড পরিপ্রথম, কিন্তু কি বিশাল উল্লাসাদনা আনন্দ। কাজে সে এত আনন্দ আগে বোধিনি।

কেন, আলমোড়াব?

তখন বয়স খুব অল্প। তাছাড়া সেটা ছিল শিক্ষার বয়স। তবে রথীমহারথীদের কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে একটা সংগঠন করবার সংস্কার গড়ে উঠছিল। সেই সংস্কারটা এখন কাজে লাগল। একথা নিশ্চয় বলা যায়।—প্রথম শো—দারুণ সাক্ষ্যস। আমাদের সবাইয়ের মনে হয়েছিল যেন একটা রাজ্য জয় করলাম। সালিলদা বললেন, রুমাদি দেখলেন ত? বলিনি? আমাদের গানের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যদি ওদের সম্মুখে খুলে দেওয়া যায়—ওরা অ্যাকসেস্ট করবেই?

সালিলদার দূরদৃষ্টিকে আমি প্রমাণ করি। আর একটা জিনিস ইয়ুথ কয়ারে আমরা সবাই খুব মনোনিবেশে মিশেছি, কাজ করেছি, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমশীল ছিলেন। সালিলদা অত বড় কমপোজার সংগঠক,

ইয়ুথ কয়ারের একাধারে পরিবক্ষণনা, রূপ-দানকারী কিন্তু তার জন্য এতটুকু সচেতনতা কোনো দিন দেখিনি। আমাদের উনি আজও 'রুমাদি রুমাদি' করে কথা বলেন। সব ব্যাপারে এমনভাবে আলোচনা করতে, পরামর্শ চাইতেন যেন আমিই সব উনি কিছু নন।

১৯৬৮তে কলকাতার এল্যাম সাজেন-বাবুর অনুরোধে ফিল্মে যোগ দিতে।

ইয়ুথ কয়ার ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়নি?

শুধু ইয়ুথ কয়ার নয়, একটা গোটা জীবন—জীবনের আলোমাখা একটা অংশ ছেড়ে আসার বেদনাও বড় কম নয়। তাছাড়া ইয়ুথ কয়ার আমার যে কিভাবে ধরে রেখেছিলো বলে বোঝাতে পারব না।—বোম্বে ছাড়ার সময় জেন ছাড়বার আগে কত দিনের আনন্দ বেদনার স্মৃতি মাথানো শহরটাকে একবার ভাল করে দেখতে চাইলাম কিন্তু চোখের জলে সব কাঁসা হয়ে গেল। কিছু দেখতে পেলাম না।—অশ্রু আজসে ফিকিরে প্রীমিস্তানীর দৃষ্টি বিশাল নমন।

এরপরই কলকাতার চিত্রজগতে রুমার আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী ছাড়াছাড়া রূপ পাচ্ছে শুনে কৌতূহল হয় আবার শঙ্কাও হয়। বাংলা উপন্যাসের স্বপ্নাত্তর সৃষ্টি কি যথার্থ রূপ পাবে? যদি নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় তবে নাই বা গেশাম সে ছবি দেখতে? এমন একটা সংশয় এসেছিল যখন 'রজনী' ছাড়াছাড়া আসে। সেদিন কিন্তু অল্প সময়ের অভিনয় দেখে নিরাশ হইনি। অভিনেত্রীকে বরণ করেছিলেন প্রমাণশূন্য শব্দেচ্ছা দিয়ে।

প্রকাশই শিল্পকলা। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রকাশভঙ্গী তখনই আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় যখন কাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে আইডেণ্টিফাই করতে পারেন। শিল্পী তখন ভুলে যান তাঁর নিজের সত্তা—চলে যান অন্য এক লোকে। সেটা আনন্দলোকও হতে পারে, বেদনালোকও হতে পারে।

রূমা গৃহঠাকুরতার কমপাল বা পরিচিতি বিস্তার। বিভিন্ন ভূমিকার দেখেছি তাঁর অভিনয়—কিন্তু কখনই মনে হয়নি যে চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে আইডেণ্টিফাই করতে পারেননি।

গল্পার তাঁর অভিনয় কি ভালোবাসে? অথবা 'পলাতক' বলার ভূমিকার তাঁর অভিনয়? 'পলাতক' কল্পনাবল্লভের স্রোতে কলে কি ডাকে করে ফরনি? পি-এর রূমা দেখেই কি দেখছি 'পলাতক' তাবতে ভালো লাগে যে শিল্প আটকিসম্মান হয়ে বারনি। 'পলাতক' রূমা

শাহমা  
ফোন্স

বেনারসী • সিন্ধু • তাঁত  
মিল বস্ত্র • গোস্বাক  
হোমিস্মারী

৪৫/৩, জি.টি. রোড (সউথ) হাওড়া

ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱର ଶ୍ରବଣେ, ବାଦନେ, ଗାନପଦ୍ୟା  
 କଲେ ଏକାକିୟା ମୋହାଦିନି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ  
 କଥାମି ବାଦନାକ୍ଷେତ୍ରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାଦନେ ଶ୍ରୀମଦ୍  
 ମତ୍ତେ ବାଦନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନୀ : କଳିକା  
 ହାତୀମାନଙ୍କର କାବିରୀ, ୨ମ ଶ୍ରବଣେ (ସେମ୍)  
 ମତ୍ତେ ବାଦନା, ହାତୀମାନଙ୍କର : ବାଦନା : ୦୦  
 ହାତୀମାନଙ୍କର ମତ୍ତେ, ହାତୀମାନଙ୍କର : ୧।  
 ମତ୍ତେ : ୦୨-୨୦୦୧।

হয়ে উঠেছিল। চিত্রকক্ষে হিরো-হিরোরিন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। হিরোর সবসময় হিরো, হিরো ভাব হিরোইনেরও তদ্রূপ। সবাই মিলে জেট বেধে বসে হৈ হৈ আনন্দে। মধ্যে কান্না কান্না—পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদেরই আমি অনুভব করি। তার কাঁধে কাঁধে ঘন ঘন পড়ি দেয়, কান্না ও বিলাপ করে জেলে।

তাই ঠিক এই মুহূর্তে নতুন করে ইরুথ করার গজার কাজ শেষে আমি যেন বেঁচে গেলাম। স্টাটিং-এর কাজে ফাঁদে পড়িনি। রিহার্সাল চলেই লাগল। নতুন প্রোগ্রাম। খুব শীগগির শো দিয়ে সবাইকে ক্যালকাটা ইরুথ করার একজিসটেন্ট জানতে হবে। এই উদ্দেশ্যই সব ক্রান্তি ঘুরিয়ে দিল।

কিন্তু প্রথমবারে অকম্পিত সাফল্য সত্ত্বেও একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমাদের পথকে দাঁড়াতে হোলো।

‘কি, সেটা?’

আমি চেয়েছিলাম ক্যালকাটা ইরুথ করার ফাঁদে শো কলকাতাবাসীকে সজাগ করে নিবেদন করুন। একদল আমার সমর্থন করলেন। আর একদল (এঁদের অধিকাংশই ছিলেন সালিসদার পরানো ছাত্র) এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তি শুনেন না। স্টাটিং তার কল্পনার রূপমূর্তিকে মেলে ধরবেন। হার যা সম্মান প্রাপ্য তাঁকে সেটুকু দিতে হবেই। আমার কান্নাই রইল। ১৯৫৯ সালে নিউ এম্পায়ারে ক্যালকাটা ইরুথ করার প্রথম অনুষ্ঠানের সে যে কি বিপুল সাফল্য ভাবা যায় না। হাউসফুল! শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ১০ মিনিটের জন্য শো দেখতে এসে প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে রইলেন—আর শোয়ের পর জ্বর সে কি উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন। আমার কথামত সালিসদার প্রজেক্ট করে ছিলেন।

কিন্তু আনন্দের এই চরম মুহূর্তেই টিকের অধিকাংশ সভাই টেজে দাঁড়িয়েই রিলাইন দিলেন। সব আনন্দের হাজারো বাঁচ

বেন এক কদরে নিতে গেল। সালিসদারকে বললাম, কি হোলো ভ; প্রথমেই বলিনি? সালিসদার হাসলেন। কিন্তু রে হাসি বড় লাল।

‘আমি কিন্তু দমিনি।’ অলমোদনে দাদার শিক্ষা মনের পরতে পরতে খেঁচ পাঁচা ছিল। এনি সর্ট অফ চ্যালেঞ্জ—ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাকসেস ইন লাইক। সেই শিক্ষাই আমার শক্তি বোগাল।

মাত্র ১০ জন নিয়ে রিহার্সাল শুরু করলাম। আর দশদিনের মাঝারি হিন্দুস্থান পার্ক ওপেন এরার শো দিলাম। উদ্যোক্তা ছিলেন কমল ঘোষ। কনার-এর সাধনা সব বাধাকে জয় করল। এই শো-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল লোকের মধ্যে মধ্যে। স্নেহ ও আশীর্বাদ ধরা হোলো সেই পদ্মমুহূর্তে।

‘তারপরের ইতিহাস ত সবই আপনাদের জানা। আপনাদের সবার ভালবাসার আমাদের বাতাপথ আজ বাধামুক্ত। এই কনার নিয়ে ভারতের কত জায়গা গেছি, ঘুরেছি সব জায়গাতেই শো-এর শেষে সকল দর্শকের চোখে ধূশীর আলো জ্বলে উঠতে দেখেছি—বস আলো! আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে আরও, আরও বেশী এগিয়ে যেতে।’

‘বদি কনার ও ফিল্মের মধ্যে যে কোনো একটিকে আপনাকে বেছে নিতে বলা হয় আপনি কি করবেন?’

অফ কোর্স কনার উইল বি মাই ফার্স্ট চয়েস। এখানের মেম্বারেরা সবাই মিলে যেন একটি এককমতের পরিবারের মতো। কারো বদি সম্মত হয় আমরা সবাই মিলে হৈ-টৈ করি। কারো বিবাহ হলে একসঙ্গে দলবেঁধে হুজুড় করি—মুহূর্ত হলে সবাই শোকাছন্ন হই। আমাদের সবার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের আনন্দ দুখে আমরা এক হয়ে গেছি।

কখন টারে বাই দলবেঁধে থার্ড ক্লাসে যেতে যেতে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে বতখানি আনন্দ পাই—ঠিক ততখানিই মজা লাগে নানা জায়গার খাওয়া-শোওয়া বসার সুবিধা-অসুবিধা উপভোগ করতে। একবার ভারী মজা হয়েছিলো। দিল্লীতে গভর্নমেন্টের ডেলিগেট হয়ে আমরা গেছি। বিরাট এয়ার কন্ডিশনড হোটেলের আলোদা আলোদা অ্যাপার্টমেন্টে সকলকে থাকতে দিয়েছে। কিন্তু এত কমফোর্টস পেয়েও কেউ ধূশী নয়। বলে রুম্মানি বড় অসোকারিত লাগছে। একসঙ্গে বসা, গল্প করা হৈ হৈ ত হচ্ছে না? মহাশয় ব্রেকফাস্ট ডিনারের চেয়ে সবাই মিলে বসে কাগজ পেতে ম্যাগি বাদাম আর কলা-পাতার গড়িয়ে বাওয়া কোলভাত খাওয়ার মজাটাই আমাদের কাছে বড়।’

সংসারজীবনের সঙ্গে বাইরের কর্ম-জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করাটা কঠিন লাগে

‘লাগত, বদি না আমার শব্দরবাড়ীর সবার এমন সহস্র সহযোগিতা পেতাম। আমার স্বামী অরুণ গুহঠাকুরতা ত করারই একজন। আর আপনি ত জানেনই এদের বাড়ী সংস্কৃতির একটা কেন্দ্রস্থল—কললেও অভ্যস্তি হয় না। কলকাতার অনেক নামকরা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের কর্ম এখানেই থেকেই।’

‘মাত্র কয়েকটা আসরে গেলেই অমিত ঘোষের নাম করেছে। ওর কণ্ঠও শিক্ষা-মাজিত। ও কি কোনো ওস্তাদের কাছে শিখেছে?’

‘গুলাম মোস্তাফার কাছে অল্প-দিন শিখেছিল। তবে গুন শুনই ও নিজেকে তৈরী করেছে। তাছাড়া কনারে ও তালমশ্রী বাজার।’

‘আপনি ত অনেকবার বাইরে গেছেন ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ নেবার উপলক্ষ্যে ছাড়াও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি ওদের আদর্শটি ঠিক কি ধরনের?’

‘মিউজিকের ট্রিমেন্ডাস রেসপন্স আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কোর্স-স্টোর ওপরই ওদের কোঁক বেশী। ইনডিভিডুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে গেয়ে ইমপ্রেশ করা কঠিন—বিশেষ করেকজন ব্যক্তিগত শিল্পী ছাড়া। আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে লোক-সঙ্গীতের এমন বহুধাবৈচিত্র্য ওদের মন্থ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এমিকে পরকারের নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।’

‘বর্তমান বাংলাসঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধে আপনার মতটা জানতে ইচ্ছে করে।’

‘এখন সমাজ, শিক্ষা, দেশের সবক্ষেত্রেই একটা অস্থিরতার যুগ। এই অস্থিরতার হোঁরা সঙ্গীতেও লেগেছে। তবে একটা কথা। পপ্ সং ভালই হোক আর মন্দই হোক—পপ্ সং বলে এখন যা গাওয়া হচ্ছে তা কিন্তু মোটেই “পপ্ সং” নয়। কথা ও সুর এত কঠিন সেও বোধহয় সুস্থিরাচিত্তের চিন্তাজাত নয় বলেই। তবে কোনো দরোঁগই স্বামী হই না। বাংলা গানের এ শাপগ্রস্ত মুহূর্তের অবসান নিশ্চয় ঘটবে। এ আশা না রাখতে পারলে আমরা বাঁচব কি নিরে?’

‘আমাদের পটিকার সঙ্গে আপনার আত্মীয়স্বজন চিরন্তন থাকবে ত?’

‘সম্মানিত শিল্পীরাও ত মানুষ। অন্তরের স্নেহশক্তিগণের আগ্রহ না পেলে তারা বা চলেবে কি করে? আপনাদের এ স্নেহকে কখনো ভুলে না। আমার সবার

সুকুম্ব কাজ করা  
নাশী এবং দামী  
**কামিনী শাল**  
ছেলেদের এবং মেয়েদের)  
জামিনার, পান্নাদার বড়টাদার  
ইত্যাদি  
প্রচুর এসেছে  
**হরলালকা**  
২০৬।১, রাসবিহারী এভেন্যু  
**গাড়ীহাট জংশন**



১৯৭২ সালের মূর্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির প্রেক্ষাবিতান, মূর্তির তারিখ ও প্রযোজক সংশ্লিষ্ট মালিকানা তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ছবির নাম	প্রযোজক সংস্থা	মূর্তির তারিখ	প্রেক্ষাবিতান
১।	জনতার আদালত	জনতা ফিল্ম প্রসারেনশন	২১-১-৭২	রাজনৈতিক
২।	বিরাজ বৌ	কে. সি. হাস প্রোডাকশন	১৮-২-৭২	সামাজিক
৩।	আজকের নারক	সফলিতা ফিল্মস	২৫-২-৭২	সমসাময়িক
৪।	মা ও মাটি	সংগীতা প্রোডাকশন	২৫-২-৭২	সামাজিক
৫।	আগো আমার আগো	চার্চিট	১৭-৩-৭২	সামাজিক
৬।	অনিশ্চিতা	গীতাঞ্জলি	১৪-৪-৭২	গার্হস্থ্য
৭।	অপর্ণা	সরকার প্রোডাকশন	১৪-৪-৭২	বিশ্বব্যাপী-জীবনীমূলক
৮।	শপথ নিলাম	মুশ ও বাপী	৫-৫-৭২	গার্হস্থ্য
৯।	জীবন ঠেকতে	সাধারণী পিকচার্স	১২-৫-৭২	গার্হস্থ্য
১০।	শেষ পর্ব	শুভাঙ্গ পিকচার্স	৫-৭২	গার্হস্থ্য
১১।	নয়া মিছিল	মুনমুন ফিল্মস	২-৬-৭২	সামাজিক
১২।	অর্চনা	সাহা ফিল্মস	১৬-৬-৭২	গার্হস্থ্য
১৩।	অশ্ব অতীত	উষা ফিল্মস	৭-৭-৭২	সামাজিক
১৪।	নারিকার ছমিকায়	চিত্রযুগ	২১-৭-৭২	গার্হস্থ্য
১৫।	হায়াতীর	রমেশ সাইগাল প্রোডাকশন	২১-৭-৭২	সামাজিক
১৬।	নতুন কালের গন্ধ	এটিসেট্রা ফিল্মস	২৭-৭-৭২	গার্হস্থ্য
১৭।	বহুরূপী	দীপেন চিত্রম	৪-৮-৭২	সামাজিক
১৮।	স্বা	কেবী মুন প্রোডাকশন	১৮-৮-৭২	সামাজিক
১৯।	পিকনিক	ইকান্স ফিল্মস	১-৯-৭২	সামাজিক
২০।	বিগলিত করুণা জাহাঙ্গীর কনুনা	জাহাঙ্গীর চিত্রম	১৫-৯-৭২	প্রথমমূলক
২১।	মেমলাহেব	পার্সি ফিল্মস	১৬-১০-৭২	প্রথমমূলক সামাজিক
২২।	কলকাতা ৭১	ডি এস পিকচার্স	১২-১০-৭২	সমকালীন সামাজিক
২৩।	ছিন্নপত্র	কলামন্দির	২০-১০-৭২	গার্হস্থ্য
২৪।	পদি পিনীল বসী বাজ	অনিশ্চয় চিত্র	৩-১১-৭২	কিশোরকাহিনীমূলক
২৫।	জবান	মুভ প্রোডাকশন	৮-১২-৭২	সমকালীন সামাজিক
২৬।	হার মানা হার	সবাক চিত্রশিল্প	৩০-১২-৭২	গার্হস্থ্য

# প্রেক্ষাগৃহ

১৯৭২ সালে মূর্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির মালিকানা

ওপরের তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বাংলা দেশে তোলা নতুন ফুলের গন্ধ ছবিটি সমস্ত মোট ২৬টি বাংলা ছবি কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মূর্তি পেয়েছে সদ্য অতিক্রান্ত ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। আমরা এর সঙ্গে বাংলা ভাষার ডাব-করা মুশ ছবি “বাহাদুর ছেলে”কে তালিকাভুক্ত করিনি এই কারণে যে, দক্ষিণ ভারতীয়দের মতের বাংলা সংলাপ ও গানকেই যখন আমরা ভিন্ন চোখে দেখতে অভ্যস্ত, তখন মুশ অভিনেতা অভিনেত্রীর মতনিসাও বাংলা সংলাপ ছবিটিকে আমাদের কাছে কিছুতেই বাংলা করে তুলতে পারবে না।

মোট ১৯৭১-এ যেখানে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ২৮ খানি ছবি মূর্তি পেয়েছিল, সেখানে ১৯৭২-এ মূর্তিলাভ করেছে ২৫ খানি। কারণ অন্যতম ধর্ম কবিতা বেশী

সাধারণত বাংলা ছবি দেখিয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ৮টি একনাগাড়ে কথ ছিল ১২ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পঁচিশ দিন ধরে যদি ছবিবর্গগুলি বন্ধ না থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আরও গুটি কয়েক ছবি দর্শকদের মুখ দেখতে পেত। এ-হাড়া বছরের গোড়ার দিকে অস্বচ্ছন্দতার ফলে ‘ভারতী’ চিত্রগৃহ বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল।

ছবির তালিকা থেকে দেখা যাবে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বিরাজ বৌ” দ্বিতীয়বার ছবির রূপ পেল মান, সেনের পরিচালনায়। আশাপাশা দেবী ও জগদীশ সেনের দু’খানি এবং ডায়াবল্লভ, হিন্দল মিত্র, প্রীতভা বসু, শঙ্কু মহারাজ, নীহার-রজন গুপ্ত, শৈলেশ দে ও নিমাই কট্টাচারীর একখানি করে উপন্যাস চিত্ররূপে পরিণত হয়েছে। পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহের দু’খানি ছবি এ-বছর মূর্তিলাভ করনি। পরিচালকদের মধ্যে মান, সেন ও হিন্দল মিত্র একখানি করে ছবি উপহার দিয়েছেন। সঞ্জিল সেন, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, হরিহর নাগ ও পীতাম্ব গঙ্গুলীর দু’খানি করে ছবি মূর্তিলাভ করেছে। কতনু তিরুন পরিচালককে আরার পেয়েছি (১) প্রথম কুমার মুখোপাধ্যায়, (২) দ্বিতীয় চট্টোপাধ্যায়

অনিশ্চিতা, বহুরূপী ও জবান ছবির মধ্যে। এবারে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নতুন নাম হচ্ছে বাপী লাহিড়ী (জনতার আদালত) ও সুরুয়ার মিত্র (শপথ নিলাম)। বহুরূপী প্রবীণ সুরাঙ্গীণী পঞ্চকুমার মল্লিক বহুদিন পরে একখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন (বিগলিত করুণা জাহাঙ্গীর কনুনা)।

এবারে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবি হচ্ছে মৃণাল সেন পরিচালিত “কলকাতা ৭১”। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার জীবনীমূলক সম্পর্কে এমন চমকপ্রদ ছবি ভারতবর্ষে এই প্রথম। ঠিক বিপরীতভাবে নির্মিত হয়েছে জীবনের আদর্শবাহী, ভারতের ইন্দ্রমুকুতার ছবি “অনিশ্চিতা করুণা জাহাঙ্গীর কনুনা” নামক প্রথমমূলক ছবি। কতমানের বুদ্ধবুদ্ধি ও মানসিকতা রূপে পেতে করেছে “জনতার আদালত” “আজকের নারক”, “মা ও মাটি”, “শপথ নিলাম”, “নয়া মিছিল”, “বহুরূপী”, “জবান” প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে।

দেখা যাবে, অবিসংবাদীভাবে নির্মিত নারক উত্তমকুমার এবারেও অস্বস্তি সৃষ্টি করি ছবিতে নারক। অবশ্য ওয় থেকেও একখানি বেশী অর্থাৎ আটখানি ছবিতে





প্রেস ফটোগ্রাফার্স' আসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমতী সখ্যা মল্লোপাধ্যায়, ইলা-  
য়া এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত মল্লোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সখ্যা মল্লোপাধ্যায়, চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, ইলা-  
য়া, মানবোদয় মল্লোপাধ্যায়, বিজেন মল্লোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, প্রতিজা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনদী সেনগুপ্ত, শ্যামল মিত্র-  
এবং অননুপ ঘোষাল।



## স্টুডিও সংবাদ

গৌতম চিত্রমের সংগীত গ্রহণ : গত সপ্তাহে গৌতম চিত্রমের প্রথম ছবি 'জীবন-মই নাটক'-এর কয়েকটি গান বিজন পালের সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে দে, কণ্ঠে রেকর্ডিং হয়ে গেছে। গণীষ রায় ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। কাহিনী : ফণী সত্তবতী। শ্রীমত ভদ্র ও আরতি ভট্টাচার্য ছবির নায়ক-নায়িকা।

অনিমিত্ত : তানাকা চিত্রমের প্রথম ছবি 'অনিমিত্ত'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ চলছে। এগিয়ে চলছে। অজিত গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। গৌরীপ্রসাদ মল্লোপাধ্যায় এর গান লিখেছেন।

নটিকতা ঘোষ এর সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিরেছেন। কণ্ঠ সংগীতে আছেন মামা দে, সখ্যা মল্লোপাধ্যায় ও নটিকতা ঘোষ স্বয়ং। রামানন্দ সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে আছেন। ছবির প্রধান চরিত্রাঙ্গিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সখ্যা রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, বিদ্যা রায়, চিত্রা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং নায়ক চরিত্রে আছেন নবাগত কোলিক-বসু।

জীবন রহস্য : তপেশ ঘোষ ও জয়ন্ত দেব প্রযোজিত জায়ন্ত শিকদাসের প্রথম ছবি সলিল রায় পরিচালিত 'জীবন-রহস্য'-এর কাজ সমাপ্তির পথে। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমত স্বয়ং। চিত্রনাট্য লিখেছেন তপেশ ঘোষ। স্টুডিওতে বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সুরকার। ছবির বিশেষ আকর্ষণ হিন্দী

চিত্রগ্রহণের সর্বজনপ্রিয় চিত্রতারঙ্গ গ্রুপ। প্রায় বাংলা ছবিতে এই প্রথম এককভাবে দশ দিন স্টুডিও চক্রে ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে শর্টটিং শেষ করে প্রায় ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বোম্বে রওনা হয়ে গেছেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, শ্রীমত চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অঙ্গনা দেবী, হরিশচন্দ্র, জ্ঞানেশ, মলিকা রায়চৌধুরী, মল্লিক, দিলীপ রায়, কল্যাণী বসু, শ্যামল মল্লোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। অঙ্গনা চক্রবর্তী ও মামা দে ছবিতে গান গেয়েছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন পূর্ণা কলেক্টর বিদ্যা সিংহ। ব্যবস্থাপক—প্রশান্ত পাট্টদার।

অনো অজিত : সারা প্রত্যক্ষণের নতুন ছবি 'সপ্তম মূল' সচিত্র 'অজিত' অজিতের কাজ সংগীত পরিচালক অজিত

মাসের পরিচালনায় মানা দেব দুইখানি ও মণ্ডল চক্রবর্তীর একখানি—মোট তিনখানি গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শ্রব্য হয়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কাহিনীকার সুনন্দন দাস। পরিচালনার আদর্শ জায়েদ হুসেইন পাখ্যার ও সুনন্দন দাস। গেল ২২ ডিসেম্বর থেকে হবির একটানা চিত্রগ্রহণের কাজ নিউ-থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। ভূমিকালিপিতে এখন পর্যন্ত যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন—স্বরূপ রত্ন, সুনন্দন দাস, রবি ঘোষ, জায়েদ হুসেইন পাখ্যার, সত্যীন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোগেন সাহু, অজয় ভট্টাচার্য মেনকা দেবী, রত্না ঘোষাল ও নুসাগতা সেন। দে। নন্দীনা চিত্র হবিখানির পরিবেশন গ্রহণ করেছেন।

উত্তরা, পূর্ববী ও উজ্জলার সতুন বিবির আলো : ইরোজী নতুন বছর শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই বাদল শিকড়সেঁর অজিত গান্ধী পরিচালিত ও নটিকতা ঘোষ সন্মারোপিত নতুন দিলের আলো জি আর শিকড়সেঁর

## রজনী নন্দীকার

৬ই জানুয়ারী শনিবার ৬টা  
৭ই রবিবার ৩ট ৩৫টা  
৩১-১৬তম অভিনয়

## তিনপয়সার পালা

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টার থিয়েটার  
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়  
৩৫ ১১৩৩

আশাপূর্ণা দেবী এটি  
**মজিরা**

নির্দেশনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত  
সত্যীন্দ্র কুমার সেন  
সত্যীন্দ্র কুমার সেন  
সত্যীন্দ্র কুমার সেন

৬ই জানুয়ারী শনিবার ৬টা  
৭ই রবিবার ৩ট ৩৫টা

পরিবেশনার উত্তরা, পূর্ববী উজ্জলা ও অন্যান্য চিত্রগ্রহণ হাট পাবে। হবির প্রধান চিত্রগ্রহণে জায়েদ হুসেইন চট্টোপাধ্যায়, সত্যীন্দ্র রায়, বীণাশঙ্কর রায়, বিজয় রায়, প্রদীপ কলিতা, চিত্তর রায়, বিদ্যা রায়, হাসু, কেশবপাখ্যার, মিনতা রায়, দেবরাজ, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, কল্যাণ রায়, অনন্তরায় ও সত্যীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

## মণ্ডাভিনয়

একজন ও রজনী বিজয় রায় : হবির ক্রীড়নের সর্বজনীন প্রযোজনা 'মণ্ডাভিনয়' আগামী এগারো জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর সখে সড়ে হটার এগারো অফ ফাইন আর্টসে এবং চোপ জর্জের রবিবার সকাল দশটার রপ্পাতে অভিনীত হবে। নাটক ও নির্দেশনার আছেন নীল-কণ্ঠ সেনগুপ্ত।

কোনর আইডিয়াল সোলাইটি : সংস্কৃতি চর্চার মঞ্চবল বে পিছরে নেই কেবল আইডিয়াল সোলাইটির নাট্য বিভাগ কর্তৃক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নবম নাটকের' অভিনয় তারই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১০ ডিসেম্বর, বঙ্গ-রপ্পার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। নাটকের প্রগোস্তাপ আসে সংযুক্ত অভিনয়ের দৃষ্টান্ত। এদিক দিয়ে সোলাইটির সজ্জা সাধকতা লাভ করেছেন। যে কজন শিল্পীর চরিত্র চিত্র প্রথমেই সবার মনে পড়া করেছে; তারা হলেন শিবানী ভট্টাচার্য (কোয়া), জগদীশ গান্ধী (জ্যোতি-মশাই), বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘেটু), শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিবাবু), বলরাম আদক (রায়), বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (অক্ষর) এই কজন শিল্পীর অভিনয় সামগ্রিক প্রয়োজনকে যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে বলে মনে হয়। ২। ৩টি ছোট ছোট চরিত্র অভিনয়ে নিম্নাই ঘোষ (সবাসাচী), অনন্তকুমার মিত্র (কাশীদাস) অনুলীনের অভাবে প্রাণহীন মনে হয়েছে। বিনয় খাঁর (অনন্ত) অভিনয় একবারে অচল।

ফেরারী ফোজ অভিনয় : গত ১১ ডিসেম্বর 'রপ্পা' মঞ্চে কমাশিয়াল রিক্রেশন কবের দশম নাট্যার্থ উৎসব দ্বিতীয় 'ফেরারী ফোজ' অভিনীত হয়। শিল্পীদের দলগত অভিনয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংখ্যক সত্য সত্য ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নাটকটি সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। চিত্রগ্রহণে হিতেন দাশগুপ্তের মত দূর-দূর ভূমিকায় বলরাম রায়, জ্যোতিময়ের চরিত্রে নারায়ণ গান্ধী, বোগেনের ভূমিকায় মৈলেন-মজুমদার ও অশোকের চরিত্রে হরিপঙ্কর চক্রবর্তী পেশাদার অভিনেতাকেও হারিয়ে যায়। অন্যান্য ভূমিকায় অমরনী ঘোষ, হিরণ্য চ্যাটার্জি, মাখন দত্তচৌধুরী, সন্দীপ-শোমার, লহাস চক্রবর্তী, পঙ্কজ

ভট্টাচার্য, সন্তোষ সমাজপতি, রবি-রায়, মজুমদার গুপ্ত, দেব সান্যাল, অধীর কর ও হরিপাল পাল বলিষ্ঠ অভিনয় করেন। শ্রী-চরিত্রে বঙ্গবাসীর ভূমিকায় মলিনদেবী, মাঝা মলিনা দাস ও শচীর ভূমিকায় রণু, বড়াল দশকদের মন্তব্য করে রাখা। শিশু শিল্পী মায় অংশুমান ও কুমারী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীও অভিনয়ে প্রচুর আনন্দদান করে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ : এই বৎসন উজ্জলনীতে কালিদাস সমারোহে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠান 'শকুন্তলম' নাটক অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণ-কলস লাভ করেছে। পরপদ তিন বৎসর এই সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ প্রথম স্থান লাভ করে রেকর্ড স্থাপন করে। এই নাট্যাভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্যে পরিচয় দেয় শকুন্তলার ভূমিকায় ভাস্বতী সেন, ভরতের ভূমিকায় শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, দম্ভস্তের ভূমিকায় দীপক চট্টোপাধ্যায়, কেশব ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনুসূয়া গীতা সোম এবং পরিচালক ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়।

সাখা আগরের নাট্যার্থ 'রং বদলায় :

জ্যোৎস্নাময় বসন্ত বিরচিত 'রং বদলায়' নাটকটি বর্তমান নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস। নাটকের কাহিনীর মূল স্রবণে উঠেছে কয়েকটি চরিত্রের আনাগোনা। সেখানে নাট্যকারের মৌলিক চিন্তামোহিত এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে। সম্প্রতি ফারাজা ব্যারের প্রকল্পের প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা 'সাখা আসর' স্থানীয় রিক্রেশন হল তাদের নাট্যার্থ 'রং বদলায়' সাফল্যে মগ্নে মগ্ন করেন। জ্যোৎস্নাময় বসন্ত নির্দেশনায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—অগ্নিমা বসু, দত্তা মখার্জি, রণু ঘোষ, অরুণকুমার সরকার, অসীম মখার্জি, স্বদেশরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ সেন এবং জ্যোৎস্নাময় বসু। আলোকসম্পাত, আবহ সংগীত ও মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব পালন করেছেন—পারমল দত্ত, বাদ্য মণ্ডল, ইউনিক অর্কেষ্ট্রা ও মানব ব্যানার্জি।

একাত্তর প্রতিযোগিতা : চন্দননগরের 'নাটারঙ্গ' দ্বাব জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে একটি একাত্তর নাটকের প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। যে-সব সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চান, তাদের রঞ্জন চক্রবর্তী, সম্পাদক 'নাটারঙ্গ' পোঃ গোদলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জীবন্ত স্টাফ : শৈলেশ গুহ নিয়োগীর প্রাপক নাটক 'জীবন্ত স্টাফ' সম্প্রতি বিশ্বনাথের মঞ্চে পাবলিশিং হোলে।

প্রযোজনা করলেন 'হাইকোর্ট' কর্মচারী সমিতি'। প্রথমেই বলে রাখি এমন সুষ্ঠু প্রযোজনা অফিস ক্লাবের ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই সার্থকতার নেপথ্যে বীর শৈল্পিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা লুকিয়ে আছে, তিনি হলেন নির্দেশক শ্রীবাঞ্ছম ঘোষ। নাটকটির প্রতিটি মুহূর্তেই শ্রীঘোষের স্বাভাবিক চিন্তার প্রোজেকশন তাকেই ভুলে ধরে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শিল্পীদের আন্তরিকতার কোন অভাবই ছিল না। শ্রীবাঞ্ছম ঘোষ 'পরিভ্রমণ' ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। তাঁর অভিনয় এতো সাকলীল হয় যে, দর্শকরা তাকে বারবার স্বীকৃতি জানায়। মনে হয় মণ্ডে 'ক্যাপিকা বিদ্যালয়'র 'ধনশ্যাম'-এর চরিত্রের অসামান্য সফলতার পর আর একটি অসাধারণ সৃষ্টি হোল 'জীবন্ত স্ট্যাচু'র 'পরিভ্রমণ'।

সুঅভিনীত নাটকটির অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীময় মৈত্র, অমিত মল্লিক, পাথ মিত্র, কান্তি রায়, রবীন চক্রবর্তী, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, দীপকর, ভট্টাচার্য, 'বমলেন্দু' ঘোষ, সন্তোষ বসু, দীপক মজুমদার, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, তমাল প্রামাণিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায়, আরতি বসু।

**সাহেব বিবি গোলাম :** বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামের মণ্ডসফল্য আজ আর নাট্যানুরাগীদের কাছে অজানা নেই। বহুখ্যাত এই নাটকটিকে সেদিন স্টাডে পরিবেশন করলেন 'টেকসম্যাকো স্টাফ' প্রযোজন ক্লাবের শিল্পীরা। মোটামুটিভাবে নাটকটির মর্মকথাকে মণ্ডের আলোয় পরিষ্কৃত করতে পেরেছেন শিল্পীরা। এ-ব্যাপারে নির্দেশক শ্রীভূষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়েছে। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ ভাষা পেয়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে খিমান বল (বাংলা), শ্রীধরদেব মদুখাশি (কোম্বুডমনি) ও মণিদরা রায় (জবা) চরিত্রচরণে নৈশ্চল্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। তবে পটেশ্বরীর ভূমিকায় শমিতা বিশ্বাস আমাদের হতাশ করেছেন। পটেশ্বরীর অন্তর্বেদনা শ্রীমতী বিশ্বাসের অভিনয়ে মনে হয় কোন মুহূর্তেই ধরা পড়েনি। অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের 'চুণীদাসী'ও একটি স্বচ্ছ চরিত্রচরণ হতে পেরেছে।

**দুই মহল :** বি বি জে (ডি ডব্লিউ) স্টাফ ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'মিনার্ভা' থিয়েটারে মণ্ডস্থ করলেন জোহন দমিত-এর 'দুই মহল' নাটকটি। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। সামগ্রিক প্রযোজনাটি দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্যই হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের ব্যাপারে খারা বৈশিষ্ট্যের নজর রাখতে পারেন, তাঁরা হলেন অরবিন্দ

বারিলা হায়। সর্জিত সেন — পরিচালনাঃ সর্জিত সেন।





কল্লু (কল্লুয়া), রবীন্দ্র রায়চৌধুরী (রজন সানিয়ার), অশ্বপূর্ব মুনোপাধ্যায় (ছোনেহাম), অজলি ভট্টাচার্য (ওসমানী)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন জয়দেব মুনোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, পুলক বসু, সচিত্র চ্যাটার্জি, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভবতোষ গাঙ্গুলী, শৈলেন কর্মকার, অমিয় রায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে সি বারিক, শশাংক চট্টোপাধ্যায়।

## বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ওস্তাদ তালি আহমেদ খান

আলাউদ্দিন সংগীতসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাকল্প ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ সাহেব তাঁর সংগীত-প্রতিষ্ঠান ও গৃহ ১০০'ক, সীতাবাম ঘোষ স্ট্রীটে পরলোক-গমন করেন গত ২৭ ডিসেম্বর। ঐ

প্রতিষ্ঠানে তিনি শিল্প সম্মেলনেরও প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম যৌবন থেকে শুরুর করে মৃত্যুকাল (৬৮ বছর অবধি) ইনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে অগণিত শিষ্য-শিষ্যাকে শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। গত দু' বছর ধরে পক্ষাঘাত, হাঁপানী ইত্যাদি নানান রোগ-বশত তাঁর উদ্যমকে স্তিমিত করতে পারেনি। কায়মনোবাক্যে, সর্বপ্রকারে খ্যাতি-অখ্যাতি সকল সংগীতানুরাগীকে ইনি প্রয়োজনমত সাহায্য করেছেন।

খাঁ সাহেবের জন্ম অধুনা বাংলাদেশ-ভূমি টিপুয়া জেলার রাজশবৌড়িয়া মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে। তাঁর সংগীতগুরু ছিলেন তাঁরই পিতা বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফকির গুল মহম্মদ খানের কাছে। পরে গুরু আলাউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

ওস্তাদ আয়েৎ আলি খানের কাছে। 'আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ফকির আসতাউদ্দিন খাঁ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি। শেষ-দিন অবধি তিনি সংগীত-সম্মেলন যত্নে করায় চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক মহান সংগীত-প্রমিত, উদারহৃদয় শিল্পীর জীবনাবসান ঘটল।

লোকান্তরিত ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ

প্রখ্যাত সরোদী ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ গত ২৮ ডিসেম্বর ৯৫ বছর বয়সে তাঁর দিল্লীস্থ বাসগৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সেনী ঘরাণার অন্যতম শিল্পী হাফেজ আলি খাঁ ছিলেন সুরসিদ্ধ। তাঁর সরোদা হাতের টিপ সংগীতজগতে কিম্বদন্তীরই মত হয়ে আছে।

স্বী ও তিনটি পুত্র রেখে তিনি গেছেন। কনিষ্ঠতম আমজেদ আলি খাঁ—ভারতবিখ্যাত সরোদবাদক। ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ ওস্তাদ আলাউদ্দিনের গুরুভাই ছিলেন।

পরলোকে প্রখ্যাত চিত্রসাংবাদিক বিজন দত্ত

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক বিজন দত্ত, ২২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। বিজনদত্ত—চিত্রসাংবাদিক মহলেই ছোট

সংবাদপত্র, সমালোচক ও বহু পঠক-পাঠিকা কৃত্তক প্রশংসিত  
মৃণাল গৃহঠাকুরতর সর্বাধুনিক উপন্যাস

**আশা-বিহঙ্গ ৫.০০**

আজ্ঞা প্রকাশনী C/o এন. ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোং  
১০ কলেজ রো : কলি-৯



বড়, সকলেরই তিনি বিজন—পরীক্ষা  
বেশ কঠোর করে, খরচপত্র খাটাই, রুচ-  
চাপ, কায়দাটিন প্রভৃতি কোন ভুলে পড়েন  
কসরিত। কিন্তু এ সবের পরে কলমও  
যেমন সোমেন, তলাকেই ও তরসই বস  
হরনি শেখালেই হবার মত দিন সাতক  
আগে তিনি লক্ষ্যধারী হয়ে পড়েন। এবং  
শেষ পর্যায়ে ইতিবাচক রোগে আক্রান্ত  
হন।

অধুনা সংবাদপত্রের খুলনা জেলার  
করাপাড়া গ্রামে ১৯১১ সালে বিজন কবীর  
জন্ম হয়। হাওড়া শিবপুরের বি কে  
পাল ইন্সটিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরী-  
ক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি বিদ্যাসাগর  
কলেজ থেকে আই এসসি এবং প্রেসি-  
ডেন্সী থেকে বি এসসি ডিগ্রি করেন।  
কিছুদিন তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় এম-এস-  
সিও পড়েছিলেন। চলচ্চিত্র দেখা ও চল-  
চ্চিত্র বিষয়ে পড়াশুনা করার কৌতুক তার  
কৈশোর থেকেই। এবং এ-বিষয়ে তার  
প্রথম প্রবন্ধ 'টু আওয়ার ক্যামেরামেন'  
(ইংরেজী) প্রকাশিত হয় ইংরেজী সাস্তা-  
হিক দীপালিতে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। সেই  
সময় থেকে প্রায় মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি  
চিত্রসাংবাদিকেরই জীবন যাপন করে  
গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। ইসানী তার  
লেখা প্রধানত প্রকাশিত হত উদ্ভোরখ,  
সিনেমা জগৎ এবং ইংরেজী স্টার আন্ড  
কটাইল পত্রিকায়। তিনি বেঙ্গল ফিল্ম  
জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বরা-  
বরই যুক্ত ছিলেন এবং এর সম্পাদক পদও  
অলঙ্কৃত করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে  
তিনি ছিলেন অল্পভাষী ও নিজের মতামত  
সম্বন্ধে দৃঢ়।

তার পরলোকগমনে আমরা একজন  
ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম। তার নিঃসন্তান  
শ্রীকে সান্বনা জানাবার ভাষা নেই। আমরা  
তার পরলোকগত আত্মার লাগিত কামনা  
করি।

**যাত্রাভিনেতা তারাপদ সাউ স্মরণার্থ :**  
বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি  
উৎসব উপলক্ষে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন  
৪৫মহল থিয়েটারে গত ৫ই ডিসেম্বর  
অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে সঙ্গীতা-  
চার্য নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ মহাশয়কে  
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন সভাপতি  
মম্বখ রায়, রতনরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুমারেন  
ঘোষ, প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা 'বাংলা সাম্য সমাজ'  
নামক পারিবারিক বাছার দল প্রতিষ্ঠাতা  
নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ কতৃক পল্লী অঞ্চলে  
লোক-শিক্ষামূলক যাত্রাগানের বিনামূল্যে  
পরিবেশন রতের তুমসী প্রশংসা করেন।

সম্বর্ধনা সভার পর বাংলা সাম্য সমাজ  
অবলীনাথ গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীবামাক্যাপা'  
নাট্যাভিনয় দ্বারা উপস্থাপিত সকলের আনন্দ  
বর্ধন করেন। নাম ভূমিকায় নাট্যশ্রী তারাপদ  
সাউ-এর অভিনয় লক্ষ্যকর অভিজুত করে।

মিঃ মৃণোপাধ্যায়।



**রাজা রামমোহন রায় জন্ম শতবর্ষ**  
**বার্ষিকী উৎসব :** গত ১৫ই পৌষ (ইং ২৪শে  
ডিসেম্বর) রবিবার মিঃ সাহিত্য গোষ্ঠীর  
উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডস্থ  
মিলন মন্দিরে ভারত পৃথিক রাজা রাম-  
মোহন রায়ের শ্বশত জন্মবার্ষিকী উৎসব  
প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য  
করেন ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী। তিনি তাঁর  
ভাষণে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ  
ও শিক্ষা সংস্কারের প্রতি আলোকপাত করে  
বিস্তৃত আলোচনা করেন। মিত্র সদস্যরা  
রামমোহন রায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র প্রশস্তি পাঠ  
ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অবশেষে  
শ্রীঅরুণ মৃণোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী  
লিঙ্গপীরা এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান 'ভারত  
পৃথিক রামমোহন' গীতি আলোচ্য পরি-  
বেশন করেন।

**সাংস্কৃতিকী হাওড়া :** গত ৭ ডিসেম্বর  
১৯৭২, সংখ্যা ৭টায় 'সাংস্কৃতিকী হাওড়া'  
বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 'বঙ্গ রূপ-  
গণ্ডের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব' উপলক্ষে  
সংস্থার কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব  
করেন অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত এবং  
বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ  
সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সাংস্কৃতিক সম্মেলন :** সম্প্রতি আশা-  
পাড়া স্বরলিপি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছাত্রের  
স্বাক্ষর সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন  
করেছিলেন। স্থানীয় যুগবাণী 'সংঘ' কর-  
্মদানে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক রমানন্দ চক-  
বর্তীর সম্পাদকীয় ভাষণের পর সম্মেলন  
সম্পন্ন হয়। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের  
একভাবে বন্দনপাতি, দ্বিতীয় ভাগে



ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্যতম গত ২৮ ডিসেম্বর ৭৪তম নির্বাচন ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সাংস্কৃতিক মঞ্চ বিতরণ পক্ষে চারটার ভারতীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক একটি সঙ্গীত-সম্মেলন পরিবেশন করেন। এই আলোচ্যটি রচনা ও পরিচালনা করেন লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার ছিলেন সধাক্রমে মনীষালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শান্তি রায়। অংগ্রহণ করেন মণিলাল ঘোষ, প্রণব চৌধুরী, পাৰ্শ্বসারথী বসু, সর্বিজা দে, শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, শিখা রায়, মঞ্জুবা রায়, শিবেন্দ্র বিশ্বাস, অমিতা বিশ্বাস ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

# খেলাধুলা

দলীয়

## ভারত বনাম ইংল্যান্ড

প্রথম টেস্ট খেলা

ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে ভারতের বিপক্ষে ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৩ টি উইকেটে জয়ী হয়ে নিজের সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে এই মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে চারটে টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল ২ ০ এবং ইংল্যান্ডের জয় ১। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস নিঃসন্দেহে খুবই ভাগ্যবান এবং ইংল্যান্ডের পরম্পরাগত অধিনায়ক এট কারণে যে, তিনি ইতিপূর্বে কোন টেস্ট ম্যাচ না খেলেই বর্তমান ইংল্যান্ড দলের অধিনায়কের পদ লাভ করেছেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট খেলাতেই শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে জয়ী হয়েছে। অপরদিকে অজিত ওরাদেকারের নেতৃত্বে ভারতের পরাজয় এই প্রথম। ইংল্যান্ড বনাম ভারতের বিগত ৪১টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৪, ইংল্যান্ডের জয় ১৯ এবং খেলা ৬।

ভারতবর্ষ টেসে জিতে প্রথমই ব্যাট করার দান নেয়। প্রথম দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৫৬ রান উঠেছিল। প্রথম দিনটা ইংল্যান্ডের সাফল্যেরই দিন ছিল। অধিনায়ক টনি লুইস খেলার তিকমত বোলার বদল করে যথেষ্ট সাফল্য লাভের সূত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের রান ছিল লাগের সময় ৩ উইকেট পড়ে ৪৩



আবদ আলী

এবং চা-পানের সময় ৬ উইকেট পড়ে ১০৪। চা-পানের বিরতির সময় খেলায় অপরাধিত ছিলেন আবদ আলী (২০ রান) এবং সোলকার (৭ রান)। এই ৭ম উইকেট জুটিই ৫৬ মিনিটে দলের ৪৩ রান তুলে ভারতের মুখরুক্ষা করেছিলেন। ভারতের ১২০ রানের মাধ্যমে সোলকার নিজস্ব ২০ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১৭০ রানের মাধ্যমে শেষ হয়। এই দিন তারা মাত্র ৩৭ মিনিট খেলে বাকি ৩টে উইকেটের বিনিময়ে প্রথম দিনের ১৫৬ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে ১৭ রান বোল করেছিল। ৪ম উইকেটের জুটিতে ভেঙে



একনাথ সোলকার



টনি গ্রীস

(১৭ রান) এবং আবদ আলী ১৫ মিনিটে দলের ৪৬ রান তুলেছিলেন। তাদের ৩ম উইকেট জুটির এই ৪৬ রানই ভারতের ১ম ইনিংসের খেলায় যে-কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান। ১ম ইনিংসে আবদ আলী ৫৮ রানই ছিল দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ১৫১ রান উঠেছিল। চন্দ্রশেখর ৫৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৫৯ রানে ২টা উইকেট নিয়ে ভারতের অন্তর্কালে খেলার সোজা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে 'গোল্ডেন' করে মাত্র থেকে ফিরে যান।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের অসমাপ্ত ১ম ইনিংসের খেলায় গ্রীস (৪০ রান) এবং আরনল্ড (১২ রান) অপরাধিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে লাগের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩৬ (কোন উইকেট না পড়ে)। লাগের পর তাদের ৬৯ রানের মাধ্যমে সঙ্কট সূত্র



কারমু ইমিনিয়ান



বি এস চন্দ্রশেখর

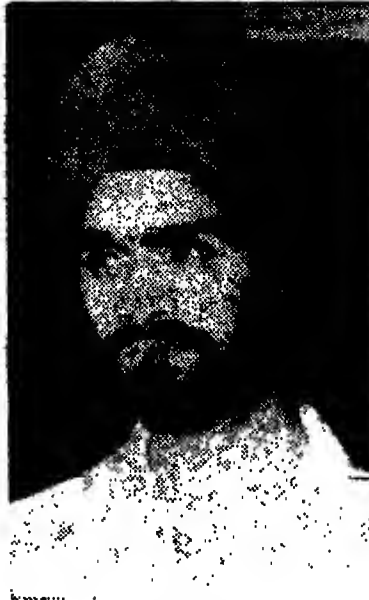
হল। ৬৯ রানের মাঝারি, ২৯ এবং ৭১  
রানের মাঝারি ওর ও ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়।  
এক কক্ষ সময়ের মধ্যে তিনটে উইকেট পড়ে  
যে, টেন ব্রীজ তার 'আবডোমেন গার্ড'  
সময় সমর পাননি, মাঠে খেলতে নেমে  
যে, কুল খরা পড়ে।

কৃত্রিম দিনে প্রায়ের ২০ মিনিট আগে ইল্যান্ডের ১৯ ইনিস ২০০ রানের মাধ্যমে হলে তারা নিশ্চয় ২৭ রানে এগিয়ে যায়। ইল্যান্ড তাদের শেষ ৪ উইকেটে ৪৯ রান খোঁস করেছিল। টনি গ্রীগ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৬৯ রান করে নটআউট থেকে যান। গ্রীগ ২৭০ মিনিট খেলে তাঁর নটআউট ৬৯ রানে ৮টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। এই নটআউট ৬৯ রান তাঁর টেস্ট খেলার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান।

ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে চন্দ্রশেখর ৮০ রান চটা উইকেট পান। তাঁর আগে ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের টেস্ট খেলার এক ইনিংসে চটা উইকেট পেয়েছেন মাত্র দুজন—ভারতবর্ষের পক্ষে ভিন্দু মানকাড (৫৫ রান ৮টি উইকেট, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২) এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে ফ্রেডা ট্রুমান (৩১ রানে ৮টি উইকেট, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২)।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ ২২ ইনিংসের ৫৬০ উইকেট খুইয়ে ১৯৩ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলার অপরাধিত ছিলেন সোলকার (৩০ রান) এবং ইজিনিয়ার (৩ রান)। এইদিন মরদেশাই ২০ রান সংগ্রহ করার আগে সরকার। টেস্ট ক্রিকেটে তার ২০০০ রান পূর্ণ করেন। আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলার শেষে তাঁর টেস্ট পারসংখ্যান দাঁড়ায় : খেলা ৩৭, ইনিংস ৫৫, নাটআউট ৬ বার, মোট রান ২৫৫০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১২ (বিশ্বকর্মে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৭১) এবং সেরকারী ৫ (দার্ট ডাবল সেঞ্চুরীস)।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চেজ ৬৯ মিনিট পর ভারতবর্ষের ইয়ং ইমিগ্রেশন ২৩৩ রানের মাধ্যমে শেষ হয়। ভারতবর্ষ চতুর্থ দিনের খেলায়



বিশেষ সিং বেদী  
শেষ ঠোঁট উইকেটে পূর্বা দিনের ১২০  
রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান যোগ  
করেছিল। লাগের সময় ভারতবর্ষের রান  
ছিল ২০৬ (৫ উইকেটে)। শতকের পর মাত্র  
২০ মিনিটের খেলায় ৩০টি উইকেট খুব  
স্বাভাৱিভাবে পড়ে রান দাঁড়ায় ২১১ (৮  
উইকেটে)। সেলকার এবং ইঞ্জিনিয়ার ৬৬  
উইকেটের জুটিতে ১০৩ রান তুলে খেলার  
মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সেলকার  
২৪৫ মিনিট খেলে তাঁর ৭৫ রানে ১১টি  
বাউন্ডারী করেন। অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ার  
১৭১ মিনিট তাঁর ৬৩ রানে বাউন্ডারী  
করেন ৮টা।

ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২০৩ বাতের  
নাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড জয়লাভের  
প্রয়োজনীয় ২০৭ রান তুলতে ২য় ইনিংস  
খেলেতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে  
১০৬ রান সংগ্রহ করে। উড (৪৫ রান)

এবং অধিনায়ক লুইস (১৭ রান) খেলা "অপরাজিত খেতে যান। এইদিন বিশ্ব ঐক্য বৈদ্য কিত ফ্লোরার উইকেটে নেওয়ার সূত্রে তাঁর সরঞ্জামী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দাবান ১০০ উইকেটে পূর্ণ করার গোব্দ লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর আগে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ১০০ উইকেটে পূর্ণ করেছেন এই তিনজন—ভিন্দ, রানকাড (১৬২টি উইকেট), সুদাতা দেশে (১৪৯টি উইকেট) এবং এরাপল্লা প্রাস (১২৪টি উইকেট)।

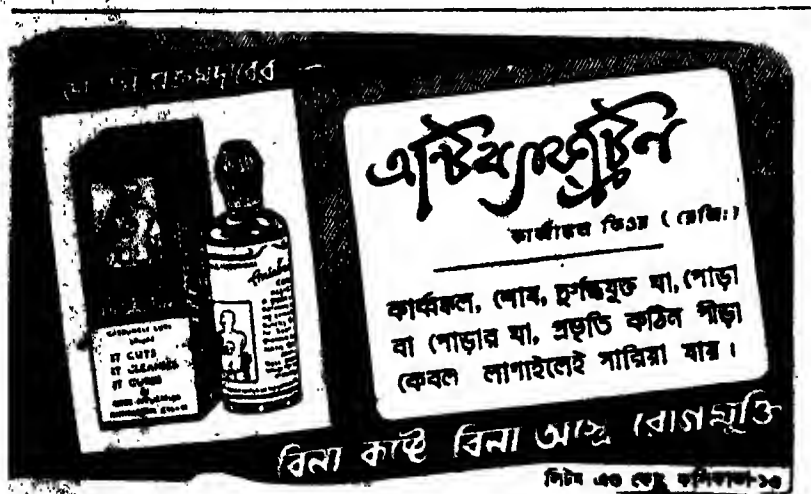
मःकिभूत यन्मायक

ভারতবর্ষ : ১৭৩ বান (আবিদ আলী ৫৮  
বান। আরনন্দ ৪৫ বানে ৬, কোটাম  
৬৬ বানে ২ এবং গাঁগ ০২ বানে ২  
উইকেট)।

৩ ২৩৩ রান (সোলকার ৭৫ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৬৩ রান। আন্ডারউড ৫৬ রানে ৪, আরনল্ড ৪৬ রানে ৩ এবং পোকক ৭২ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড: ২০০ রান (প্রাগ নট আউট ৬১  
এবং অ্যাডিস ৪৬ রান। চম্পুশেন  
৮০ রানে ৮ এবং বেদী ৫৯ রানে  
উইকেট)।

● ২০৮ বান (৪ উইকেটে)। উড ৪৫, লুইস  
নট-আউট ৭০ এবং গ্রীণ নট-আউট  
৪০ বান। বেদী ৫০ বানে ৩ উইকেটে)।



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (काशी)

কার্যকর, শোর, হুজুয়ুত বা, শোড়া  
বা শোড়ার যা, প্রভৃতি কঠিন শব্দ  
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

বিনা কাষ্টে বিনা আশ্র বাণহুতি

ਲਿਟਿਅ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਕਲਿਕਾਤ-੧੦

# নিয়মাবলী

বিশেষ বিভাগ

## লেখকদের প্রতি

১। অমৃত প্রকাশের জন্য প্রেরিত লম্বিত রচনার সকল স্বেচ্ছা পাঠাবেন। অমরেনীত রচনার খবর পূ-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমরেনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। পত্রের সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠার স্পষ্টাক্ষর লিখিত হওয়া আব-  
শ্যক। সম্পর্ক ও পূর্বোধ্য ব্রহ্মকর্ম  
লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত  
হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও  
ঠিকানা না থাকলে 'অমৃত'  
প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টের নিয়মাবলী এবং সে  
সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য  
'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা  
জ্ঞাতব্য।

## গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে  
অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত'  
কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক।  
২। ডি-এস-এ পত্রিকা পাঠানো হয় না।  
গ্রাহকের চিঠি নিম্নলিখিত দ্বারা  
মিনিমুমিয়াম 'অমৃত' কার্যালয়ের  
পাঠানো আবশ্যিক।

## চাঁদার হার

	কালকাতা	মুম্বাই
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০ টাকা ৩০.০০	
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০ টাকা ১৫.৫০	
ত্রিমাসিক	টাকা ৬.২৫ টাকা ৮.০০	

বিঃ প্রঃ—উৎপাদন পুঙ্খবস্তু হার  
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা ০.৫২
ত্রিমাসিক	টাকা ০.২৬

## 'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি সেন  
কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

অমৃত

৩৬ পৃষ্ঠা  
মূল্য—৫০ পয়সা  
প্রতি—২ পয়সা  
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 12th January, 1973 শ্রবণ, ২৮ পৌষ, ১৩৭১ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিবরণ	লেখক
পৃষ্ঠা	বিবরণ	লেখক
৭৮৮	একনজরে	—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৭৮৯	সম্পাদকীয়	
৭৯০	দেশেবিশেষে	—শ্রীপদুন্দরীক
৭৯০	কাঁদ	(গল্প) —শ্রীসুধাঙ্কর ভট্টাচার্য
৭৯৯	ভগিনী নিবেদিতার পরে শ্রীঅরবিন্দ	—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
৮০০	বাড়ী	(উপন্যাস) —শ্রীদেবল দেববর্মী
৮০৯	নেবুতলার সেই দুঃসাহসিক নামক	—শ্রীনারায়ণ দত্ত
৮১০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅভয়শঙ্কর
৮১৮	পদনন্দ	—শ্রীকপণক
৮২০	চিঠিপত্র	
৮২১	ফুল ফোটার আগে	(উপন্যাস) —শ্রীশৈলেন রায়
৮২৮	অর্থনৈতিক সমীক্ষা : বেকার সমস্যা	—শ্রীশান্তিলাল মধুপাধ্যায়
৮৩১	বিলম্বিত রাজধানী : গোড়—	
	লক্ষ্যাবর্তী—লখনৌতি	—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
৮৩৯	প্রদর্শনী	—শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৮৪১	কর	(গল্প) —শ্রীহিমাদ্রি চক্রবর্তী
৮৪৭	চল্লিশের ধোরগোড়ার এলে	(কাব্যতা) —কায়সন্স হক
৮৪৭	তিনটি কাব্যতা	(কাব্যতা) —শ্রীপ্রতিমা সেনগুপ্ত
৮৪৭	নির্জনতা	(কাব্যতা) —শ্রীঅমল রাহা
৮৪৮	অপ্যনা	—শ্রীপ্রমীলা
৮৫০	বানের কথা কটু জানে না	—শ্রীঅরুণ্ডতী সেনগুপ্ত
৮৫১	ফ্যাশান স্মারী নয়	—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৮৫২	যাত্রাঙ্গলের যাত্রা বদল	—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৮৫৪	ভারতীয় চলচ্চিত্রে	
	সবুজ আলোর পদধ্বনি	—শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী
৮৫৬	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৮৬২	বেলাধূলা	—শ্রীদর্শক

# VANGUARD

JHAMAPUKUR  
HOSIERY CAL-9

★ COOLTY & TURKISH  
★ WHITE & COLOURED  
★ ALL SIZES AVAILABLE

\* 22A Kalidas Singha Lane Calcutta 9. 35-4832

# এক নজর

**ছুটির হিসাব :** মহামানবের সাগরতীর এই ভাষিত হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-পারশিক ও মুসলমান-খৃষ্টানের মাতৃভূমি হওয়ার সূফল কোথায় এদেশের চাকুরিজীবীরাই সর্বাধিক ভোগ করে থাকেন। নতুন বছরের ক্যালেন্ডারটি দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মোটামুটিভাবে বাহ্যিকটি রবিবার বাদে সরকারি ছুটির দিন আছে আরও ২৩টি। নিঃসন্দেহে এটি ভারতের একটি রেকর্ড বিশেষ। ইংল্যান্ড সরকারি ছুটির দিন মাত্র পাঁচটি। এমনকি পয়লা জানুয়ারিও সে দেশে ছুটির দিন নয়। অথচ এই ইংরাজরাই এদেশে শাসক থাকাকালে যে একদা খৃষ্ট বর্ষের প্রথম দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন বলে চিহ্নিত করেছিলেন তা আমরা আজও অপরিবর্তিত রেখেছি। খৃষ্টমাবলম্বীদের কথা স্মরণে রেখে, এবং সঙ্গত কারণেই, ভগবান যীশুর আবির্ভাবের শুভ দিন 'ক্রীষ্টমাস ডে' বর্ডিনকেও আমরা সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছি। ইংল্যান্ডও বর্ডিন ছুটির দিন, কিন্তু ব্রুটেনেরই অপর অংশ স্কটল্যান্ডে ঐদিন ছুটি থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় ও লৌকিক মিলিয়ে সাতা বছরে মোট সাতদিন সরকারি ছুটি। শুধু ইহুদিদের জন্য আরও একদিন বেশি ছুটি। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা শিখ ধর্মের পূর্ণ্যদিনে খৃষ্ট দুনিয়ায় ছুটি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একই কারণে মুসলিম দুনিয়াতেও ছুটির দিন সীমিত। সূর্য্যাস্ত বহু ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য এটা আমাদের একটা উপরি লাভ বলা যেতে পারে। ছুটির তালিকায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, নানক সকলেই স্থান করে নিয়েছেন।

তবে এর অন্য একটা দিকও আছে যা মনে রাখলে আমাদের এই বিশেষ সুবিধাটাকে আর তেমন একটা সুবিধা বলে মনে হবে না। পশ্চিম দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এখন ছয়দিন-সপ্তাহের বদলে পাঁচদিন-সপ্তাহ চালু হয়েছে। সূর্য্যাস্ত সপ্তাহে দুদিন ছুটির দৌলতে ঐখানেই ওরা ছুটির ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বাহ্যিক দিন এগিয়ে গেছে। আমাদের ছয়দিন কাজের সময় ওদের দেশে পাঁচ দিন কাজের সময়ে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তাদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু সপ্তাহান্তে শনি-রবি দুদিন ছুটির ব্যবস্থা থাকলে এই অতিরিক্ত পরিশ্রমটুকু মনে নিতে বোধহয় কারও আপত্তি হবে না। তখন যাবতীয় পূজাপর্ব উৎসব অনুষ্ঠানে ছুটি পাওয়ার ব্যাপারটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না।

**অভিযোগ মতি :** খবরটি ফ্রান্সের পূর্ণাঙ্গলের বেলফোর্ট শহর থেকে প্রচারিত। সেখানকার এক উচ্চ বিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিকোল মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, ছাত্রীদের কাছে যৌন প্রচার পঠিকা পাঠ করে তিনি সমাজজীবনের নৈতিক মান ক্ষয় করেছেন। আদালতে শ্রীমতী মার্সিয়ার অভিযুক্ত হওয়ার পর তা নিয়ে এমন টেঁকে পড়ে যার যে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে একটা জাতীয় চাপ্তালয় খুলে পড়েছে। মামলার বিবরণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়

প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীমতী মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রীর অভিভাবক।

অভিযোগের উত্তরদানকালে শ্রীমতী মার্সিয়ার বিচারপতি সমীপে নিবেদন করেন যে, ফ্রান্সের ছাত্রীদের অনুরোধেই তিনি 'লেট আস লার্ন টু লাভ এন্ড এনজয় আওয়ার সেলভস' পুস্তিকার কিত্তি কিত্তি অংশ পাঠ করে শোনান ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আগে কারও আপত্তি আছে কিনা তাও তিনি ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রেমকে কিভাবে সাধক ও সুন্দর করে তোলা যায়, কিভাবে প্রেম দাম্পত্যজীবনের বন্ধনকে মধুর করে তোলে—তাই ছিল এই রচনার আলোচ্য বিষয়।

শ্রীমতী মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিই আদালতের কাছে অভিযুক্তাকে নির্দোষ বলে অভিমত দেন। শ্রীমতী মার্সিয়ারকে অভিযুক্ত করা নিয়ে বেলফোর্টের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এমন বিক্ষোভ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেখানকার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জিসেম্বর মাসে পাঁচদিনের জন্য বন্ধ রাখেন।

**মৃত্ত কারাগার :** একদা কারাদণ্ডকে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা বলেই মনে করা হত। সে কারণে কারাদণ্ডের সঙ্গে নানা কঠোর শ্রমের ব্যবস্থা ছিল কারার অভ্যন্তরে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে এবং কারাদণ্ডকে শাস্তি না ভেবে সংশোধনের কাল বলে মনে করার প্রস্তাব ওঠে। আর সেই প্রস্তাব মত জেলের অভ্যন্তরেও সংস্কার শুরুর হয়। জেলে কয়েদিদের শাস্তির বদলে শিক্ষাদান শুরুর হয় এবং যাতে তারা মৃত্তির পর স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই পরিবর্তিত চিন্তাধারারই পরিণতিরূপে মৃত্তকারাগারের প্রস্তাব ওঠে। ভারতে প্রথম বাঙ্গালোরে একটি মৃত্ত কারাগার গঠিত হয় এবং সে কারাগারে ২৫ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিতকে প্রেরণ করা হয়। সেই ২৫ জন বন্দী গত এক বছরে ১২৫ একর জমিতে যে আধুনিক কৃষি খামার গড়ে তুলেছে তা মুগ্ধ করেছে মহাশূর সরকারকে, এবং সেই উৎসাহে মহাশূর সরকার আরও একটি মৃত্ত কারাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাঙ্গালোর জেলার কোরামপল গ্রামে কৃষির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু'শ' বন্দীকে নিয়ে এই মৃত্ত কারাগার শুরুর হবে এবং কর্তৃপক্ষের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, এই পরীক্ষাও কার্য হবে না।

যারা অভাবের তাড়নায়, বিপথচালিত হলে অথবা মদহস্তের উন্মত্ততায় একটা কঠিন অপরাধ করে বসে তারা যে ক্ষমার অযোগ্য নয় এবং সুযোগ পেলে তারাও যে মানবসমাজের কল্যাণে সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, মৃত্ত কারাগারের সাফল্য তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে যা পাওয়া যায়, শাস্তি দিয়ে বা রক্তচন্দ্র দেখিয়ে তা পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

—প্রত্যকদর্শী



# সম্পাদকীয়

## অম্ম ও আসামে অশুদ্ধ সংকেত

অম্ম ও আসামে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন সারা ভারতে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। উভয় রাজ্যেই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। আসামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপন্ন, নিৰ্ধারিত এবং ব্যাপকভাবে বিতাড়িত। অম্মে একই ভাষাভাষী লোক আঞ্চলিকতার নামে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; অবিকাস ও সংশয় গোটা রাজ্যের ঐক্যবন্ধ অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। দুটি রাজ্যের অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দোহাই দিয়েও অবস্থা আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। বিধাননগরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণই হল তার মধ্যে মূখ্য। অম্ম কিংবা আসামের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে আমরা এই ভেবে শংকিত না হয়ে পারি না যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতিবোধের যেখানে অভাব সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। কার্যত তাই হচ্ছে। অম্ম ও আসাম তাদের নিজস্বের পায়েই কুড়ুল মারছে এই আত্মঘাতী বিস্ফোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়ে।

আসামের ঘটনার জের চলছে এখনও। কিছুতেই আসাম সরকার তাঁদের ভাষানীতি নমনীয় করতে রাজী হচ্ছেন না। আসামে যে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু বাংলাভাষী আছেন এবং অননুমীয়াভাষী খণ্ডজাতি আছেন তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে আসাম সরকার, গোহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি অদৃশ্য দৃষ্টি ভাষা-প্রস্তাব মেনে নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে একদলদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, আমরা আশা করেছিলাম আসাম সরকার তার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজের রাজ্যের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সেই ভাষানীতির পরিবর্তন করবেন। দৃষ্টান্তের বিষয়, আঞ্চলিকতাই আজকাল জাতীয়তার স্থান নিয়েছে; সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের নিৰ্ধারিতই গণতান্ত্রিক অধিকাররূপে পরিচিত হচ্ছে। তার ফলে আজ পর্যন্ত বিতাড়িত বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীরা ফিরে যেতে পারছে না বন্ধপুত্র উপত্যকায় তাদের স্কুল-কলেজে। মধ্যমশ্রেণী শ্রীশরণচন্দ্র সিংহের আশ্বাসও তারা মেনে নিতে পারছে না। কারণ, উগ্রভাষাপন্থীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে আসাম সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। কাছাড় জেলার বাংলাভাষীরাও শংকিত। কারণ সেখানে বাংলাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আসাম সরকার সেখানে এসমীয়া ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করতে বন্ধপরিবর্তন। এ এক আশ্চর্য ভাষানীতি। গণতন্ত্রের এমন বিকৃতি দেশের ভাষগত সংহতির মূলে কুঠারঘাত করছে।

অম্মের অবস্থা আরও বিচিত্র। এখানে সবাই এক ভাষাভাষী: তেলুগুভাষী অম্ম ও তেলুগুগোষ্ঠী সংযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে। অম্মপ্রদেশ। এখন মূলকি বিধি রাখা এবং না-রাখার প্রশ্নে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে চলছে এক সাংঘাতিক লড়াই। অম্ম এলাকায় বিস্ফোভ এমন মারাত্মক আকার নিয়েছে যে, সেখানে পদূলিশের গুলিতে হতাহত হয়েছে লোক। নন-গেজেন্টেড সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘট করে সরকারী কাজকর্ম দিয়েছে অচল করে। কয়েক বর্ষ আন্দোলনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অকথা খুবই সাংঘাতিক। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে পার্লামেন্টে মূলকি বিধি সংরক্ষণের জন্য একটি আইন পাশ করিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হল অনগ্রসর তেলুগুগোষ্ঠী অঞ্চলের জন্য আরও কিছুকাল চাকুরির সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা। কিন্তু রাজধানী হায়দরাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে এই আইন চালু রাখতে দিতে অম্মবাসীদের আপত্তি। একটি রাজ্যের রাজধানীতে যদি সকল শ্রেণীর লোক সকল সুযোগ-সুবিধা না পায়, তাহলে আপত্তি হবেই। তাই তারা এখন চাইছেন, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল: সরকার নেই। বিশাল অম্মের, তেলুগুগোষ্ঠী আলাদা হয়ে যাক। ঘটনার গতি দেখে মনে হচ্ছে, অম্ম বিভাগ ছাড়া গতি নেই। অথচ অম্ম-স্বাভ্য গঠনের দাবিতেই ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলনের সূত্রপাত। অম্মবাসীরাই একদিন সাগ্নহে প্রাচীন নিজামশাহীর অন্তর্গত হায়দরাবাদ রাজ্যকে, যার অন্তর্গত তেলুগুগোষ্ঠী, নিজস্বের বৃহৎ পরিবারে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন।

আসল ব্যাধি অন্যত্র। শূন্য ভাষার পালিশ দিয়ে রাজ্যের বনিয়াদ শক্ত করা যায় না। ভাষা নিশ্চয়ই ঐক্যবন্ধনের একটি বড় উপাদান। কিন্তু তা একমাত্র উপাদান নয়। অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ বাধলে ভাষার স্বর্ণসূত্রও যায় ছিন্ন হয়ে। তেলুগুভাষী অম্মরাজ্যে তেলুগুগোষ্ঠী অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর। বর্তমানে এই অঞ্চল রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সমান অগ্রসর হতে না পারবে, ততদিন থাকবে এই বিস্ফোভ। সুতরাং তার সমাধান আগে করা দরকার। তাহলেই তেলুগুগোষ্ঠী ও অম্মের প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হবে। আসামের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে এক শ্রেণীর উগ্রভাষাপ্রেমী সংকীর্ণ আঞ্চলিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গোটা রাজ্যে অশান্তি জেকে এনেছে। মাতৃভাষার প্রতি আবেগ যখন উৎকট হয়ে ওঠে, তখন অন্য ভাষাভাষীদের পক্ষে তা হয় বিপজ্জনক। আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষার অপূর্ণতাই এর জন্য দায়ী। এই অশান্ত শক্তি দূর করতে না পারলে জাতীয় সংহতির বনিয়াদ ভেঙে পড়বে। অম্ম ও অম্মপ্রদেশ মন্ত্র সূচনা, তা অন্যত্রও দেখা দেবার অশংকা। সুতরাং এখনি সমাধান হবার সময়।





কর্মিটির তিনজন সদস্য—শ্রী ওয়াই বি চানন, শ্রীঅমলবিন রায় ও সত্য ককরুজিন আলি আহমেদ—অপেক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে অল্পে মে একটা প্রমল স্বাভাব্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকারি কর্মচারী ও চাকররা বিপুলসংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। 'জয় অশ্ব' পতাকা তোলা হচ্ছে।

এই 'জয় অশ্ব' আন্দোলন উপলক্ষে গত ২ জানুয়ারি মে বন্ধ পালায় করা হল সেই বন্ধ নানাস্থানে প্রচণ্ড সম্বর্ধের আকার ধারণ করে। নেতাদের পুলিশের সঙ্গে এক সম্বর্ধের ফলে তিনজন আন্দোলনকারী মারা গেছেন। রেল স্টেশন, সরকারি অফিসার, গাড়ি ইত্যাদি আক্রমণ করা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বিশৃঙ্খলার মোকাবেলা করার দিক্তি অশ্ব সরকারের নেই। অশ্বের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিং রাও এমনিতেই দুর্বল মানুষ। তিনি তেলেশ্বানার প্রতিনিধি। দলের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য। এদিকে উপমুখ্যমন্ত্রীসহ আটজন মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যাতে পদত্যাগ করেন সেজন্য তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

অশ্বের ১১ জন স্বাভাব্যবাদী এম-পি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে বলেছেন, 'প্রশাসন ভেঙে পড়ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলি ও সরকারি অফিসগুলি অনিশ্চিন্ত-কাল যাবৎ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অনাস্থার যে সংকট দেখা দিয়েছে তাতে এক অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিবিচার ও বর্বরোচিত গুলিবর্ষণের ফলে সেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে।'

এই পরিস্থিতিতে শ্রীনরসিং রাওয়ের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্তই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। দিল্লির খবর হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত হরত মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে অশ্ব সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হতে পারে।

এদিকে ওড়িশায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপাথার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি শত্রু চালকাজ তৈরি হচ্ছে। সেখানে প্রাচীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব ও আরও চারজন বিধানসভা সদস্য কংগ্রেস থেকে দেরায় এসেছেন। তাঁরা 'স্বতন্ত্র কংগ্রেস' নামে একটি নতুন দল গঠন করেছেন। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে শ্রীমতী শতপাথার বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ডঃ মহতাবকে এর আগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আরও একজন সাসপেন্ডড সদস্য

শ্রীমুখ্যমন্ত্রীর কোয়ার্টারে মহতাবের সঙ্গে খোঁপ দিয়েছেন।

এই পরিজন দলভাগ করার এখন ওড়িশা বিধানসভার মোট ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে যার ৭৯ জন কংগ্রেসে রয়েছেন। এদিকে খবর এই যে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা উৎখাত করার জন্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আরও দু'জন প্রাচীন মুখ্যমন্ত্রী—উৎকল কংগ্রেসের শ্রীবিজয় পট্টনায়ক ও স্বতন্ত্র পার্টির শ্রীরাধানাথ সিং দেও। শ্রীপট্টনায়ক এক বিবৃতিতে ডঃ মহতাবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, দলভাগ করে তিনি ওড়িশাবাসীদের নববর্ষের উপহার দিলেন। এটা উপহারের প্রথম কিস্তি। পরে আরও আসছে। কংগ্রেসের আরও কিছু সদস্য এখন দল ছেড়ে ছয় উৎকল কংগ্রেসে অথবা নবগঠিত স্বতন্ত্র কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি বলে ওড়িশায় এখন জোর গুজব। বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই এর একটা হেফজেন্দা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান অ্যান্টোনিও শহরের কাছে র্যান্ডলফ এয়ার ফোর্স বেস নামে মার্কিন বিমান-বাহিনীর একটি ঘাঁটি রয়েছে। ঐ বিমান-ঘাঁটির একটি বিশেষ বিভাগ আছে হাউসের দায়িত্ব হচ্ছে, নিহত, আহত অথবা নিখোঁজ আমেরিকান কৈমানিকদের আত্মীয়পরিজনদের কাছে দুঃসংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সম্প্রতি ঐ বিভাগের অফিসাররা খুব ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ করতে গিয়ে অতিক্রম বি ৫২ ও অন্যান্য বিমানগুলি যে হারে উত্তর ভিয়েতনামী প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে ধারেল হাফিল অতীতে আর কখনও সেই হারে আমেরিকাকে দামী বিমান ও বৈমানিকদের খোয়াতে হয় নি।

বিশেষ করে উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে আমেরিকা যেভাবে বি ৫২ বিমানগুলি খুঁইয়েছে তা অভূতপূর্ব। পেট্রোগনের নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই পাঁচ দিনে এক ডজন বি ৫২ বিমান নষ্ট হয়েছে। একজন বৈমানিক মারা গেছেন, ৪০ জন নিখোঁজ। উত্তর ভিয়েতনামের হিসাবে বিধ্বস্ত বি ৫২-এর সংখ্যা দুই ডজন। অথচ, এর আগে সাত বছরে আমেরিকার একটি মাত্র বি ৫২ বিমান ইন্দোচীনের আকাশে নষ্ট হয়েছিল।

বি ৫২ বিমানের অন্য নাম হল 'সিগন্যালফোর্স'। এই বিমানগুলির আর্টিকল করে ইঞ্জিন, ইয়াকনের জু নিয়ে সেগুলি চলে। প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এগুলিতে খুব উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা আছে। আসলে এগুলি তৈরি হয়েছিল পারমাণবিক বোমা ফেলার জন্য।

আর এই বি ৫২ বিমানের প্রতিরোধ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার 'এস-এ' পর্বতের কেমপাসগুলি। টেলিফোনের খামের আকারের এই বিরাট বিরাট কেমপাসগুলি মাটি থেকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে এই 'এস-এ' কেমপাসগুলির সঙ্গেই মোকাবেলা হয়েছিল আমেরিকান বি ৫২ বিমানের।

অন্য সময়ে ও অন্য স্থানে সবহারের জন্য তৈরি দুই পক্ষের অস্ত্রের এই সম্বাদের যে ফলাফল দেখা গেল সম্প্রতিই আমেরিকা তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার চেয়ে আকাশ থেকে বোমা ছুঁড়ে চলে আসা আমেরিকার দিক থেকে অনেক নিরাপদ, এই গণনা করেই প্রেসিডেন্ট নিকসন বড়দিনের আগে উত্তর ভিয়েতনামে টিহাসের প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন। এই নিবিচার বোমাবর্ষণ থেকে কেউ বাদ যায় নি, কোন কিছু বাদ যায় নি। হাসপাতাল, মার্কিন মুখ্যবন্দীদের শিবির, সিনেমা ভবন সবই আক্রান্ত হয়েছে। এই বর্বর বোমাবাজির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে ধিকার উঠেছে। কিন্তু সেই ধিকারেও



মিডিয়াম ওয়েভ,  
১৩০ মিটারের শুধু—  
**ভয়েস আমেরিকা**  
**বাংলা অনুষ্ঠান**

প্রতিদিন রাত ১-৩০ মি: থেকে  
১০-৩০ মি: পর্যন্ত  
শুণতে মাত্র ১০ মি: ব্যাপ্ত  
১১, ২৫ ও ৩১  
মিডিয়াম-ওয়েভ ১১০ মিটার

প্রেসিডেন্ট নিকসন সম্ভবত ততটা বিচলিত  
হন নি যতটা হয়েছেন বি ৫২ বিমানগুলি  
খুইয়ে। আমেরিকান সৈন্যরা যদি হতাহত  
না হন তাহলে এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের কি  
ক্ষতি হল তা নিয়ে আমেরিকানরা মাথা  
খাম্বাবেন না এবং ঐ যুদ্ধ থামাবার জন্য  
তাঁর উপর চাপ দেবেন না, এটাই ছিল  
প্রেসিডেন্ট নিকসনের হিসাব। কিন্তু  
ছূপাতিত স্ট্যাটোফোয়েসগুলি তাঁর সব

হিসাব ভুল করে দিয়েছে। র‍্যাডলফ  
বিমানখানা থেকে যতবার মার্কিন বিমান-  
বন্দরের বাতাজীবীরা আমেরিকান গৃহস্থের  
কাছে দুঃসংবাদ নিয়ে গেছেন ততবারই  
আমেরিকানরা বুঝেছেন, আকাশের যুদ্ধে  
বসে সুইচ টিপে যুদ্ধ চালানও এখন আর  
আমেরিকার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।  
অন্যান্য কারণের মধ্যে সম্ভবত এটাও  
একটা বড় কারণ যেমন প্রেসিডেন্ট

নিকসন হ্যানর ও হাইকং এলাকার বোমা-  
কর্ষণ স্বাগত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং  
আর একবার ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির  
সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য  
প্রেসিডেন্ট নিকসনের পরামর্শদাতা  
কিন্সগার প্যারিসে উত্তর ভিয়েতনামের  
প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন আলোচনা  
বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

৬-১-৭০

—পত্নীক

## বাড়ারের একমাত্র মোলজানা খাঁটি:



## সিংহমার্ক নারকেল তেল

চুল থাকতে চুলের যত্ন নিন। অল্পবয়স থেকে চুলের  
সর্বাঙ্গীন যত্ন নিতে সিংহমার্ক নারকেল তেলের জুড়ি নেই।  
বাছাই করা নারকেলের শাঁস ভেজে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়  
যন্ত্রের সাহায্যে এই তেল তৈরী হয়। ফলে সিংহমার্ক  
নারকেল তেল হয়ে ওঠে খাঁটি, গাঢ় এবং বিশিষ্ট গন্ধে  
ভরপুর।

চুলের পোড়া শক্ত করতে, চুলকে ঘন এবং চিকন কালো  
করে চুলতে সিংহমার্ক নারকেল তেল অমিতীয়।

হিন্দুস্থান কোকেনাট অয়েল মিলস্



সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎই প্রবীর আর মীরার সংগে দেখা হলে গেল। শতদল ভাবতেই পারেনি যে, এতদিন পরে ওদের সংগে এভাবে হঠাৎ দেখা হবে। সে ভীড় থেকে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। অনেকদিন পর প্রবীরকে লগ্নে শতদলের মনে হল যে ওর চেহারাটা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে।

—কী ব্যাপার! হঠাৎ তোকে এখানে দেখব ভাবতে পারিনি।

—আমিও পারিনি। প্রবীর বলল।

—আপনিও এসেছেন! এবার মীরাকেই শতদল কথাটা বলল।

মীরা ঈষৎ হেসে বলল, কেন, আপনিও জানে?

শতদল বলল, না, আপনি থাকবে কেন?

—তারপর বলুন কেমন আছেন? মীরার শ্রদ্ধা।

—ভালোই। আপনি?

—আমরা ভালোই আছি। মীরা কথাটা বললিক বেন ভাবল। তারপর শ্রদ্ধা, বিয়ে করেছেন?

—না, কমলে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারতেন।

—আর কবে করবি? এবার করে ফ্যাল। প্রবীর বলল।

—দেখি—বলো শতদল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল।

—না আর দেখি-টোখি না। এবার বিয়ে করে ফেলুন।

মীরা প্রায় অস্বস্তিতে ভীর্ণ কথটা বলল। তারপর শ্রদ্ধা, আপনার জন্যে মেয়ে দেখব?

শতদল খুব অস্বস্তিতে পড়ল। এ ধরনের প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে? সে চুপ করে রইল।

মীরা তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগল, আমার একজন কলিন আছে। এম-এ পাশ। দেখতে মনেতে ভালো। বলেন তো দেখি—

শতদল পরিহাসের সুরে বলল, দেখুন—

মীরা বলল, না ঠাট্টার কথা নয়। সিরিয়াসলি বলছি। আপনারা তো বামুন, অলকারও তাই। আপনার আবার গোছ-টোয় নিজে-আপনি নেই তো?

শতদল দেখল, মীরাকে খামোচে গেলে এখন তাড়াহুড়ি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া

দরকার। সে বলল, আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করব না কোন চাকের দোকানে গিয়ে বলব?

সিনেমা হলের সামনের ভাঁড় তখন কমে গেছে। শো ভাঙার পর দর্শকেরা প্রায় সবাই চলে গেছে। পরের শো-এর দর্শকেরা একে একে আসতে শুরু করেছে।

—চল, কোথাও গিয়ে বসি। প্রবীর বলল।

কয়েক পা এগোতেই ওরা একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেল। যদিও বাইরে এখনও বিকেলের আলোয় পুরোপুরি নিশিট হয়ে যায়নি, রেস্টুরেন্টের ভিতরে এর মধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে। রেস্টুরেন্টটির আসবাবপত্র বেশ দামী। সেওয়ারলের খায়ে বিচিত্র কারুকার্য সবার আগেই চোখে পড়ে।

ওরা তিনজন ভিতরে গিয়ে ঢুকল। প্রবীর শুধোল, কী খাবি বল।

—আমি কিছু খাবো না। শুধু চা।

—তা কি হয়। মীরা বলল।

—সত্যি বলছি। আমার খিদে নেই।

—কিছু একটা খা। প্রবীর বলল।

—আচ্ছা বল, তোদের যা ইচ্ছে।

প্রবীর বেরারাকে ডেকে তিনটে চিকেন রোল আনতে বলল।

মীরা শতদলের ঠিক সামনের সিটে বসার শতদল মীরার চেহারার পরিবর্তনটা ভালো করে লক্ষ্য করতে পারল। আগের চেয়ে মীরার চেহারা আরও ভালো হয়েছে। দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে সে। ওদের বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। এখনও কোন সন্তান হয়নি। বিয়ের পর মীরাকে সে এক-আধবার দেখেছে। তারপর প্রায় দু বছর মীরার সঙ্গে দেখা হয়নি। এর মধ্যে প্রবীরের সঙ্গে দু-একবার দেখা হলেও মীরার সঙ্গে হয়নি। প্রবীরদের বাসায়ও যাওয়া হয়নি বহু দিন।

—তারপর তুমি কী করছিলস বল। প্রবীর বলল।

—কী আর করবো? একটা চাকরি করি, ছুটি-ছাটীর দিনে আড়া দি। না হলে সিনেমা দেখতে যাই।

—আমাদের ওপিকে মাঝে মাঝে গেলেও তো পারেন। মীরা বলল।

—কেন যাবো? প্রবীর কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে?

কথাটা বলেই শতদল ভাবল, একটু রুগ্ন হয়ে গেল। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যা নয়। বিয়ের আগে প্রবীর তাদের আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিত। বিয়ের পরও দু-এক বছর অনিয়মিত হলেও আড্ডায় আসত। এখন সে তাদের আড্ডায় যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

—তুমি আমার বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ করলি? প্রবীর হাসতে হাসতে বলল। বোকা গেল প্রবীর তার কথার রাগ করেনি।

—কেন করবো না? আমার অভিযোগটা কি মিথ্যা?

—না, মিথ্যা নয়। কিন্তু এখন আমার কি আগের মত আড়া দিয়ে বেড়ানো সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয় শুন।

—বিয়ে কর, তবে বুঝবি।

—এটা বুঝবার জন্য বিয়ে করার দরকার হয় না।

—সংসার তো কখনোদিন করলি না।

—তোমার এই একটা ভুল ধারণা। বিয়ে না করলে কি কেউ সংসার করে না? আমি দোকান-বাজার, রেশম-তোলা, ডিপো থেকে দুধ আনা সবই করি। তুমি এর চেয়ে বেশি কী করিস?

—ওর কথা আর বলবো না। এবার মীরা বলল—কোনদিন আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। একদিন বাজার করতে যেতে বললে যেতে চার না। সব আমার দেখর করে।

—তবে—বলে শতদল এমনভাবে হাসল যার অর্থ, কি, আমার কথাই ঠিক হল তো? বেরারা এসে খাবারের প্লেটগুলো টেবিলের উপর রেখে গেল।

প্রবীর এবার মীরাকে ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলল, আরে দোকান-বাজার করাটাই কি সব? সংসারের একটা দায়িত্ব আছে না? শতদলের আর কি। ওর তো তিন জনের সংসার। দাদা মা আর ও নিজে। আমাদের মত তো আর বিরাট সংসার নয়।

শতদল চিকেন রোল-এ কামড় বসাতে বসাতে বলল, তোমার আবার উপরে দু দাধা আছে। তোমার বাবা-মা এখনও বেঁচে আছেন। তোকে কতখানি সংসারের ভারনা ভারতে হয় তা আমার জানা আছে।

এবার আর প্রবীর কোন কথা বলল না। সে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল।

মীরা একবার প্রবীরের দিকে তারপর শতদলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। প্রবীর যে তাকে ছেড়ে গেছে তাতে সে খুশিই হয়েছে মনে হল। সে শতদলকে বলল, এরা কিন্তু চিকেন রোলটা বেশ করে, না?

শতদল বলল, ফাইন। আমার এতকণ খিদে ছিল না। কিন্তু এটা খেতে খেতে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেরেছিল।

প্রবীর এবার হেসে বলল, আমরাও তা জানতুম।

বেরারা শুন্য প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চা দিয়ে গেল।

চারের কাপে চুমুক দিয়ে প্রবীর 'আঃ' বলে একটা তৃপ্তির শব্দ করল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিজে একটা নিল, শতদলকেও একটা দিল।

মীরা আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল।—তাহলে কবে আসছেন আমাদের বাড়ী?

শতদল কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একটা লম্বা

টান দিল। তারপর বলল, একদিন যাওয়া হবে।

—না একদিন যাবো বলে এতদিনে গেলে চলবে না। কবে যাবেন, ঠিক করে বলুন।

শতদল দেখল মীরাকে একটা বেকোন উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। ও বেকোন নাছোড়বান্দা তাতে ওকে স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে হবে।

—আপনাদের বাসায় গেলে তো কোন রবিবার বা ছুটির দিনে যেতে হবে। নাহলে তো দুজনকে পাওয়া যাবে না।

মীরা বলল, আমার স্কুল তো সকালে। অবশ্য আপনার বন্ধু অফিস থেকে সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে না।

—সেইজন্যই তো বলছিলাম যে কোন ছুটিছাটার দিনে আপনাদের বাসায় যেতে হবে।

—তাহলে এক কাজ করুন। আসছে রবিবার সকালে আসুন। আমাদের ওখানেই থাকুন।

শতদল দিনটা যত পিছিয়ে দেওয়া যায় সেজনা একবার শেষ চেষ্টা করল। বলল, আসছে রবিবার? আসছে রবিবার তো পারবো না। একটা বিশেষ কাজ আছে।

শতদলের ঐদিন কোন কাজই ছিল না। তবু মিথ্যা করে কথাটা বলল।

—তাহলে তার পরের রবিবার আসুন। সেদিন নিশ্চয়ই কোন কাজ নেই।

শতদল মীরার পীড়াপীড়িতে বিস্মিত হল। সচরাচর মেহাৎ ভ্রমতার খাতিরে বন্ধু-পরীরা তাদের বাড়ীতে যেতে বলে। তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকে না। তাই সে কোন বন্ধুর বাড়ীতে পারতপক্ষে যায় না। কিন্তু মীরার অনুরোধের মধ্যে সত্যিই আন্তরিকতা ছিল। যদিও শতদলের সঙ্গে তার দু-একদিনের বেশি কথা হয়নি তাহলেও মনে হয় সে প্রবীরের মধ্যে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনছে। প্রবীরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তো কম দিনের নয়। সেই কলেজ-জীবনের স্মৃতি থেকে।

—কি, আসছেন তো?

শতদল দেখল, আর এড়াবার উপায় নেই। সে যেন একটু চিন্তা করে বলল, তার পরের রবিবার? আচ্ছা যাওয়া হবে। মনে হচ্ছে তো কোন কাজ নেই। মেহাৎ যদি কোন জরুরী কাজ না পড়ে যায়—

—পড়লেও আমরা শুনছি না। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে ঐদিন যেতেই হবে।

—তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। এবার প্রবীর বলল।

—দুপুরের কিন্তু আমাদের ওখানে থাকুন। মীরা কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল।

—আচ্ছা। তাই হবে। শতদল আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে বলল।

বেরারা বিল নিয়ে আসতেই শতদল পকেট থেকে টাকা বার করে দিতে গেল। কিন্তু প্রবীর তাকে দিতে দিল না। মীরা



তার ব্যাপ থেকে টাকা বার করে প্রবীরের হাতে দিল।

শতদল বলল, আমার কাছেই তো টাকা আছে। আমি দিই দিচ্ছি।

মীরা বলল, থাক।

প্রবীর বেচারার হাতে টাকা দিয়ে দিল। রাস্তায় নেমে প্রবীর শূন্যে, কোন দিকে যাবি?

—ভাবছি একটু কলেজ স্ট্রীটে যাবো।

—পুরোনো আড্ডার।

—তাড়াডা আর কোথায় যাবো?

মীরা বলল, আর দূরত্ব করতে হবে না। আপনার যাবার যাতে জায়গা হয়, তার একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

—তাই নাকি? শতদল শূন্যে।

—হ্যাঁ। আমি কালকেই অলকার গোট-টোয় সব জেনে নেবো। রবিবার গেলেই জানতে পারবেন।

শতদল ভাবল মীরা তার সহকর্মী-টিকে তার বাড়ি না চাপিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না মনে হচ্ছে। সে বলল, তাহলে তো আর আপনাদের বাসার যাওয়া হল না দেখছি।

প্রবীর মীরাকে বলল, কি ছেলোমান্দুবা করছ বল দেখি।

তারপর শতদলের দিকে ফিরে বলল, তোর কিন্তু অবশ্যই আসা চাই। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করবো। ফেল করবি না।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, আমাদের বাস্তু অত পেটে খিদে মখে লাজ নেই। খিদে পেলে আমরা বলি।

শতদল বলল, আপনি আমার খিদে কখনো জানলেন কী করে? আমি কি আপনাকে বলছি?

—ও বলতে হয় না। আপনিই টের পাওয়া যায়।

শতদল শূন্যে, তাই নাকি?

মীরা চোখ-মুখের একটা মধুর ভাঁজ করে বলল, হ্যাঁ।

একটু পরে ওরা একটা ডবল-ডেকারে উঠে চলে গেল। যাবার আগে মীরা এবং প্রবীর আর একবার তাকে তাদের বাসার যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি। শতদল ভাবল, এখন তো অনেক দেরী। তার মনে থাকলে হয়।

যাবো না যাবো না করেও শেষ পর্যন্ত শতদল নির্দ্বিষ্টমনে প্রবীরের পাইক-পাড়ার বাসার গিয়ে হাজির হল। অনেকদিন সে এ বাড়িতে আসেনি। প্রথমে ভয় ছিল ফ্যাটটা ঠিক চিনতে পারবে কিনা। শেষ-পর্যন্ত অবশ্য কোন অসুবিধে হল না। শতদল প্রবীরের ফ্যাট ঠিকই খুঁজে পেল।

সবদরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা সর-প্যাসেজ ভর এক পাশে রামাঘর। আর এক পাশে বসার ঘর। তার পাশে বেড-রুম। মীরা রামাঘরে ছিল। আর একজন বিধবা মহিলা তাকে সাহায্য করছিল।

শতদলকে দেখে মীরা বলল, বাক শেষপর্যন্ত তা হলে এলেন। আমি তো ভাবলাম আপনি ভুলেই গেছেন—

শতদল বলল, কথা বখন দিয়েছি তখন—

মীরা বলল, বান ভিতরে গিয়ে বসুন।

—প্রবীর নেই? শতদল শূন্যে।

—একটু বেরিয়েছে।

শতদল বৈঠকখানায় গিয়ে বসল।

বৈঠকখানা বলা অবশ্য ভুল। এককালি জায়গা সোফা-কোচে সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসলে এ ঘর এবং বেড-রুম নিয়ে প্রবীরের ফ্যাটটাকে দেড়খানা ঘরের ফ্যাট বলা যায়। প্রবীরের দাদারা কলকাতার বাইরে চাকরি করেন। সেখানেই থাকেন। প্রবীরের মা-বাবা বড় ছেলের কাছে থাকেন। একমাত্র ছোট ভাইটি প্রবীরের কাছে থাকে।

শতদল সোফার উপর বসে সৈদিনের খবরের কাগজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মীরা রামাঘর থেকে বলল, আপনাকে একটু একা বসে থাকতে হবে।

—তাই তো দেখছি।

—চা খাবেন?

—প্রবীর এলেই খাবো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সে একা বসে রইল। মনে মনে সে প্রবীরের উপর একটু বিরক্ত হল। তাকে আসতে বলে প্রবীর কোথায় গেল?

মাকখানে প্রবীরের ছোট ভাই গৌতম একবার এ ঘরে এসেছিল। অনেক দিন পর তাকে দেখে মনে হল সেই গৌতম আর

নেই। শতদল বখন তাকে লক্ষ্যে তখন সে ছিল বালক, এখন সে যুবক।

গৌতম তাকে দেখে বলল, শতদলদা! আপনি কখন এলেন?

—এই তো মিনিট চার্লশেক হল।

—দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—নাঃ। কোথায় তোমার দাদা!

—বাই। দাদা আপনাকে আসতে বলে কোথায় বেরিয়ে গেল!

—তুমি একটু দেখো তো ভাই, পাড়ায় কোথাও আছে নাকি।

—আচ্ছা দেখছি—বলে গৌতম রামা-ঘরে চলে গেল। তারপর সেখানে তার বোদীর সঙ্গে কী কথা বলে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের চিটর শব্দ মিলিয়ে যেতে শুনল শতদল।

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সৈদিনের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল।

একটু পরেই প্রবীর এসে হাজির হল।

শতদল বলল, তুমি তো আচ্ছা লোক।

আমাকে আসতে বলে কোথায় গিয়ে বসে-ছিল?

—একটা বিশেষ কাজ ছিল। তুমি কত-কণ এসেছিস?

—তা প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

—চা খেয়েছিস?

—সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

—দাঁড়া, আগে চায়ের কথাটা বলনি। প্রবীর রামাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল, আমাদের দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিও তো।

## সারদা-রামকৃষ্ণ

—সম্মানিত শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

অল ইন্ডিয়া রেডিও বেতারে বসেছেন,—  
বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করলে।  
যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন  
আলোচ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল  
হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

বহুচিত্রসোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

## গৌরীমাতা

—শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের অপূর্ণ জীবনচিত্র—  
দুর্গামাতাঃ—তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা  
তপস্বিনী, কন্মী এবং আচার্য। ঘটনার  
পর ঘটনা চিত্রকে মন্থ করিয়া রাখে।...  
গৌরীমাতার অলোকসামান্য জীবন  
ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে।

বহুচিত্রসোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৫

## সাধনা

বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি  
শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু স্তোত্র,  
সাত্ত্বিক তিন শত বাংলা, হিন্দী ও জাতীয়  
সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।  
কলমতী বলেন,—এমন মনোমগ্ন স্তোত্র-  
গীতি পুস্তক বাঙ্গালার আর দেখি নাই।

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ—৬

## দুর্গামাতা

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর রচনাকল্প্য।

—শ্রীসরস্বতীদেবী দেবী রচিত—

অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং বিভিন্ন পত্রিকা  
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গাপী

ভারতবর্ষে বঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন  
...জীবনীটি পড়ে এইটিই একটি বিস্ময়ের  
মন্ত মনে হয় যে, এমন একটি মানব  
আমাদেরই সমসাময়িক কালে, অতি দ্রুত  
পরিবর্তনশীল কালের পটভূমিকায় সমাজ  
এক আলোককে আপনার জীবনে ধারণ,  
লালন ও প্রতিষ্ঠিত করে জীবন  
অভিযান করে গেলেন। এ জীবন  
পবিত্র, এ জীবন সুন্দর, সুসোজান ও  
মহিমাম্বিত। ...আমি এই জীবনকথা পড়ে  
ভূতলাভ করেছি; এবং পাঠকজনের কাছে  
অকৃতজ্ঞাবে বইখানি ছুঁলে ধরে ফলাতে পারি  
তারাও এই গ্রন্থপাঠে অনুপ্রাণিত ভূতি লাভ  
করবেন।

বহুচিত্রসোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

## শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আলম

২৬ গৌরীমাতা সরনী, কলিকাতা-৩



—বলতে হবে না। তোমাকে আসতে দেখেই চায়ের জল চাপিয়ে দিচ্ছি।

প্রবীর আরাম করে সোফার উপর কসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। তারপর নিজেকে একটা ধরিয়ে শত-দলের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, চা—

শতদল বলল, এই তো খেলায়। চা-টা আসুক। তারপর খাচ্ছি।

প্রবীর শূধোল, তুই দাবা খেলতে পারিস?

—একটু-আধটু পারি।

—গুড্। তাহলে এক হাত দাবা হয়ে থাক।

প্রবীর দাবার সেট বারকরে খুঁটি সাজাতে লাগল।

মীরা এসে একটা স্লেটে ওমলেট ও দু-কাপ চা টি-পয়ের উপর রাখল। তারপর শতদলকে লক্ষ্য করে বলল, নিন, খেয়ে ফেলুন।

শতদল বলল, এখন কে ওমলেট খাবে?

—কেন, আপনি।

—এত বেলায় ওমলেট খেয়ে খিদে মট করার কোন মানে হয়?

—কটা বাজে? মীরা শূধোল।

হাত-খড়িটার দিকে তাকিয়ে শতদল বলল, প্রায় বারোটা—

আপনার খেতে এখনও দু-ঘণ্টা দেরী আছে।

শতদল প্রবীরকে দেখিয়ে বলল, ও খাবে না?

—ও খেয়েছে। মীরা রান্নাঘরে চলে গেল?

প্রবীর বলল, আরে কাবা, খেয়ে নে না। ভারি তো একটা ওমলেট।

শতদল চামচ দিয়ে ওমলেটটা দু-টুকরো করল। তারপর নিজেকে একটা টুকরো তুলে নিয়ে স্লেটটা প্রবীরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, নে খা—

প্রবীর বলল, একটা ওমলেট খেতে পারিস না। কি পেট রে তোর!

শতদল বলল খেতে কি আর পারি না? তবে ভাগ করে খাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে সেটা একা খেলে পাওয়া যায় না।

প্রবীর আর আপত্তি করল না। সে স্লেট থেকে ওমলেটের টুকরোটা তুলে মখে শুরুর দিল।

শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা পরিভ্রমিত নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনেকক্ষণ ধরেই তার চায়ের তৃপ্তি পেরেছিল।

প্রবীর তার ঘোড়াটা শতদলের রাজার আড়াই ঘর সামনে বসিয়ে বলল, মে, তোকে কিস্তি দিলাম।

শতদল কিস্তি সামলাতে বাস্তব হয়ে পড়ল।

দাবার কতকগুলি ধরে যে তারা দাবা খেলত তা দুজনেরই খেলায় ছিল না। শতদল প্রবীরের কাছে দুবার হারে গেল। প্রবীরকেও অসম্মত সে একবার হারিয়েছে।

দু-ঘণ্টা কখন যে পার হয়ে গেল তা কারোরই খেয়াল হয়নি। খেলায় হল তখন যখন মীরা রান্নাঘর থেকে প্রবীরকে বলল, তুমি এবার চান করে এসো। আমার রান্না হয়ে গেছে।

প্রবীরের অবশ্য আর একহাত খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মীরা বারবার তুগাদা দেওয়ার শেষ পর্যায়ে আর খেলা হল না। বাধ্য হয়েই তাকে স্নান করতে যেতে হল।

মীরা এ-ঘরে এসে বলল, দেখুন আপনাকে কথা দিয়েছিলাম দুটোর মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে। ঠিক তাই হল।

শতদল বলল, একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়েও এই?

মীরা বলল, গোপালের মায় কথা বলছেন? শুধু দিয়ে কোন কাজ হয় না। সব দেখিয়ে দিতে হয়।

মীরা দু-হাত পিছনে নিয়ে তার চুল খুলে দাঁড়াল। শতদল দেখল, মীরার অনেক চুল আছে। ওর গায়ের রঙও খুব ফরসা। কালো স্মিডলেস রাউজের ফাঁক দিয়ে ওর গলা কাঁধ এবং পেটের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল।

শতদল চোখ নাড়িয়ে নিল।

প্রবীর স্নান করে এসে শতদলকে বলল, তুই চান করবি না?

—আমি চান করেই এসেছি।

প্রবীর মীরাকে বলল, তুমিও চান করে নাও। তারপর একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

মীরা বলল, না আমার অনেক দেরী হবে।

প্রবীর বলল, তা হোক।

মীরা বলল, তোমরা খেয়ে নাও। শতদলকে দেখিয়ে সে বলল, ওর খুব খিদে পেরেছে।

শতদল হাসতে হাসতে বলল, আমার খিদে পেরেও আমি আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারবো।

—আমার আধঘণ্টার হবে না। এক ঘণ্টা লাগবে।

—বেশ, তাই হবে। শতদল বলল।

অগত্যা মীরাকে নিতান্ত অনিচ্ছায় স্নান করতে যেতে হল।

মীরার স্নান করতে অধিষ্ঠাও লক্ষ্য না। শতদল খড়ি দেখল। মীরার আধ-ঘণ্টারও কম সময় লেগেছে। বোধহয় শতদলের কথা ভেবেই ও সংক্ষেপে স্নান করেছে।

ওরা তিনজনে যখন খেতে বসল তখন আড়াইটে বাজে।

—গোতম খাবে না? শতদল শূধোল।

—ওর এক বম্বুর বাড়ীতে পৈতের নেমস্তর আছে।

মীরা অনেক রকম অয়োজন করেছে। ভাতের পালার চার পাশে নানারকম বাঁটি সাজিয়ে দিয়েছে।

শতদল বলল, এ যে এলাহি ব্যাপার।

মীরা বলল, মোটেই না। আপনার জন্য বিশেষ কিছুই করিনি।

শতদল বলল, এই যদি সাধারণ হয়, তাহলে বিশেষ কিছু হলে না-জানি ব-ই হবে।

মীরা বলল, আপনি কি খুব ভাল খান? আমি কিন্তু মোটেই ভাল দিইনি।

—ভালো করেছেন। আমি ভাল খেব কম খাই।

—আপনাকে একটু মাংস দেবো?

—আরে না না। যা দিচ্ছেন এই আগে খেয়ে উঠি।

—কিছু ফেলতে পারবেন না কিছু।

মীরা যেন আদেশ করল।

খাওয়া-দাওয়া পারতে পারতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ছুটির দিনে শতদলেরও দেরী করে খাওয়া অভ্যাস। কিন্তু তা বলে এত দেরীতে নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর সে সোফার উপর দেহটা এলিয়ে দিল। প্রবীরও এসে আর একটা সোফার উপর বসল। সে একটা সিগারেট ধরাল। শতদলও প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল।

মীরা একটা কাগজের ঠোঙার কতক-গুলো পান নিয়ে এ-ঘরে ঢুকল। বলল, পান খাবেন?

—মিষ্টি না জল?

—মিষ্টি।

—দিন একটা।

অবেলায় খেয়ে গা-টা কেমন গুলোচ্ছিল। পানটা গেয়ে ভালোই লাগল।

শতদল ভেবেছিল তিনটে সাড়ে তিনটে নগাদ এখন থেকে বোড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তার আর এখন উঠতেই ইচ্ছে করাছিল না।

প্রবীর শূধোল, গান শুনবি?

—কে গাইবে?

—রেকর্ডের গান।

—আপত্তি নেই। তবে রবীন্দ্রসংগীত হলে শুনবো।

—তাই শোনাবো—বলে প্রবীর ঘরছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে সে একটা রেকর্ড-প্লেয়ার নিয়ে এল। তার পিছনে আর একটি ছেলের হাতে কতকগুলো রেকর্ড।

শতদল উঠে বসল। তারপর ছেলের হাত থেকে রেকর্ডগুলো নিয়ে বাছতে বসল।

তারপর শতদল একটার পর একটা রেকর্ড বেছে দিতে লাগল। আর প্রবীর সেগুলো বাজিয়ে চলল।

এক সময় রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে মীরাও এ-ঘরে এসে বসল।

—আপনি সোফার উপর শুরুর পড়ুন না। মীরা বলল।

শতদল বলল, আমার শোয়ার দরকার নেই। বরং আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন।

মীরা বলল, আমি দুপুরে ঘুমোই না। ছেলেরি একসময় উঠে চলে গেল।

তবে বেলা পড়ে এল। শতদল জার্মান-কাটা জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল পাশের বাড়ীর পুরোনো ইস্ট-বার-করা দেয়ালের উপর গাছের উপর কোন শেখের রোদ এসে পড়েছে। কয়েকটা চড়াইপাখি পাঁচিলের উপর লাফালাফি করছে। ডাকছে। প্রবীরের বাড়ী আর পাশের বাড়ীটার মাঝ-খানের গলিটার মধ্যে ছায়া পড়ে এসেছে।

রেকর্ড-পেজারের একটার পর একটা রবীন্দ্র-সংগীত বেজে বাজছে। সে ভাবল বিয়ে করে প্রবীরের জীবনে যেন একটা পরিপূর্ণতা এসেছে। বিয়ে করার পর প্রবীরের জীবনে যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগে ও ছিল বাড়ি-ভুলের মত। সারাক্ষণই আঙা দিবে বেড়াতে। এখন প্রবীর শান্ত হয়েছে, শিথিল হয়েছে।

কী ভাবছেন? মীরা শুধোল।

না, কিছু ভাবছি না। গানটা শুনছিলাম।

—আর একবার শুন?

—দে।

প্রবীর আর একবার রেকর্ডটা চালিয়ে দিল।

গানের কথাগুলো শতদলের মনটাকে কি রকম বিহ্বল করে তুলল। বেদনার ভরে গিয়েছে পেয়লা, নিরো ছে নিরো/হৃদয় বিদারী হয়ে গেল ঢালা, পিঙ্গো ছে পিঙ্গো... দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

প্রবীর মীরাকে বলল, একটু চা খাওয়াবে না?

মীরা বলল, তুমি করো না! তুমি তো! সেদিন খুব ভালো চা করে খাইয়েছিলে।

—ঠিক আছে। আমি করছি, বলে প্রবীর উঠে যাঁড়ল।

শতদল ঠাট্টা করল, তুই চা করবি। তাহলে তো মত্রে দেওয়া যাযে না।

প্রবীর রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, একবার খেয়েই দ্যাখ না। আমি কি রকম চা করি।

এমন সময় প্যাসেজে যেন কার আসার শব্দ শোনা গেল।

মীরা জানলা দিয়ে প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে বলল, এসো, এসো। এত দেরী হল যে?

শতদল জানলার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। সে মৃদু স্বরিত্তর একটি মেয়েকে দেখতে পেল।

মীরার কথা শুন মনে হল মেয়েটির আসবার কথা ছিল। হঠাৎ এসে পড়েনি।

মেয়েটি কিন্তু প্রথমে মীরাদের ঘরে এল না। সে রান্নাঘরে গিয়ে প্রবীরের সঙ্গে কী-সব কথা বলতে শুরু করল। শতদল একবার শুনতে গেল প্রবীর পরিচালকের সুরে বলছে, আর বলেন কেন? আমি এমনই বিয়ে করেছি যে, বৌকেই চা করে খাওয়াতে হয়।

মেয়েটি উত্তরে কী বলল জা বোকা গেল না।

একটু পরেই মেয়েটি এ-ঘরে এসে ঢুকল। মীরা তাকে তার পাশে টেনে নিয়ে বসাল। শতদলের মনে হল মেয়েটি একবার তার দিকে তাকিয়েই মৃদু নিঃশ্বাস নিয়ে নিল।

মীরা বলল, পরিচয় করিয়ে দিই—এ আমার ফিল্ম জলকা মুখোপাধ্যায়, আর ইনি শতদল বোমাল—ও'র অনেকদিনের বন্ধু—

জলকা নামটা শুনলই শতদলের মনে পড়ে গেল মীরা সেদিন এর কথাই তার

কাছে বলেছিল। কথাটা মনে পড়তেই সে মেয়েটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছেটা দমন করতে পারল না। মেয়েটির গায়ের রঙ বেশ কালা। আঁত সাধারণ চেহারা। বয়স একেবারে কম নয়। তার ফলে অল্পবয়সী মেয়ের শরীরে যে লাবণ্য লক্ষ্য করা যায় তাও নেই। মৃদু-চোখ আকর্ষণ করাব মত নয়।

শতদলের মনে হল মেয়েটি আড়চোখে তাকে দেখছে। শতদল তার দিকে তাকাতাই মেয়েটি লজ্জায় মৃদু নামিয়ে নিল। সে এ কথা ভেবে খুব বিস্মিত হাঁচিল যে মীরা সত্যি সত্যিই এই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দেবার ফন্দি এঁটেছে। এই কথা ভাবতেই তার খুব অস্বস্তি হাঁচিল। মীরার উপর তার খুব রাগও হাঁচিল। সেদিন যখন মীরা তার কাছে মেয়েটির কথা বলেছিল তখন সে সেটাকে নিছক ঠাট্টা বলে মনে করেছিল। মীরা যে সত্যি সত্যিই মেয়েটিকে তার সামনে হাজির করবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

একটু পরে প্রবীর দু-কাপ চা নিয়ে এ-ঘরে ঢুকল। সে শতদল আর জলকার সামনে কাপ দুটো রাখল।

শতদল অনেকটা অস্বস্তি কাটাবার জন্যই বলল, খাওয়া খাবে তো?

—খেয়ে দ্যাখ। বলে প্রবীর আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

তারপর আরও দু-কাপ চা নিয়ে এল।

মীরার সামনে একটি কাপ রেখে বলল, লিন, মহারাণী সেবা করুন।

ওর কথা বলার ভিগতে মীরা এবং জলকা দুজনেই হেসে উঠল।

শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিতেই প্রবীর শূন্যল, কি, কেমন হয়েছে?

—ফাইন।

—আমি চা খালাস করি?

—মোটাই না।

প্রবীর একটা সিগারেট ধরিয়ে মীরাকে বলল, কি, শুনলে তো? আমি তোমার চেয়ে খালাস চা করি না।

মীরা মিটি-মিটি হাসছিল। সে বলল, আমিও তো তাই বলেছিলাম।

# অশোক স্টেইনলেস নং ১ যাহার বিশেষত্ব অনেক

ASHOK  
STAINLESS

১. ভারতের সর্বপ্রথম স্টেইনলেস স্টেট।

২. ভারতের সবচেয়ে বিস্তারিত স্টেট।

৩. ভারতের সবচেয়ে প্রচুর স্টেট।

ASHOK

অশোক স্টেইনলেস—ভারতের স্টেট ১ স্টেট।

অলকা ওদের কথা উপভোগ করছিল। সে শতদলের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারছিল না। মীরা তাকে কী বলছে কে জানে।

প্রবীর চারের কাপে একটা লক্ষ্য চুমুক দিয়ে শতদলকে বলল, তোর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে?

শতদল খাড় নাড়ল। বলল, একটু আগেই হয়েছে—

—উনি কিন্তু ভালো গান জানেন। অতুলপ্রসাদী, রবীন্দ্রসংগীত, শ্বিজেন্দ্র-গীতি সব—

অলকা লজ্জিতভাবে বলল, ধোং, আপনি যে কী—

প্রবীর হেসে বলল, আরে এতে লজ্জা পাবার কী আছে। গান জানেন অথচ সেটা বললেই হত আপত্তি?

প্রবীর যেভাবে মেয়েটির গল্পগম্বা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল—তাতে শতদলের মনে হল যে অলকাকে এখানে আনার চক্ৰান্ত একা মীরাই করেনি। প্রবীরও করেছে।

—অলকা কিন্তু লেখাপড়ারও খুব ভালো। বি-টি-তে ফাস্ট ক্লাস পেয়েছিল। এবার মীরা বলল।

মীরা হত অলকার প্রশংসা করে যাচ্ছিল, শতদল ততই আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল। সে তখনই উঠে পড়তে পারলে বাঁচি। কিন্তু এখন উঠে যাওয়াও এক অসম্ভবিকর ব্যাপার। মীরা-প্রবীর যে তাকে এরকম একটা বেকারদার ফেলবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ওদিকে অলকা নামে মেয়েটিও যে খুব অসম্ভবিত্তে পড়েছিল তাও বোঝা যাচ্ছিল। সে প্রায় সারাক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার কালো মুখটা লজ্জার ঘেমে উঠেছিল।

প্রবীর এবং মীরা আরও কিছুক্ষণ অলকার গল্পগম্বা ব্যাখ্যা করে তারপর এক সময় চুপ করে গেল। বোধহয় শতদলের উৎসাহহীনতা লক্ষ্য করে তারা আর এ-বিষয়ে কথা বলতে খুব উৎসাহ পেল না।

মীরা এক সময় উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অলকা তার শাড়ীর আঁচল টেনে ধরে তাকে বসাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে 'তোমরা গল্প কর। আমি আসছি—' বলে এ-খর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রবীর অলকাকে লক্ষ্য করে শুধোল, আপনার তো গানের ডিস্কোলামা আছে তাই না?

এটাও যে শতদলকে জানানোর জন্য বলা তা বন্ধুতে তার অসম্মতি হল না।

অলকা মূর্খে কিছু বলল না। শুধু খাড় নাড়ল।

প্রবীর এবার শতদলকে লক্ষ্য করেই বলল, গান শুনবি?

শতদল খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ল। তার গান শোনার এখন আদৌ ইচ্ছে নেই। কিন্তু গান শুনলেই না খাওয়া যায় না। তাহলে মেয়েটিকে অনুমতি করা হয়। সে কী বলবে ভেবে পেল না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অলকাই তাকে বাঁচাল। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, তাহলে আমি চললাম—

প্রবীর বলল, আহা-হা। করেন কী? আচ্ছা বসুন বসুন। আপনাকে গান গাইতে হবে না।

অলকা একটু হেসে বসে পড়ল। প্রবীর শতদলকে বলল, তুই যে একেবারে বোবা হয়ে গেলি—

—কী বলব বল? শতদল শুধোল।

—একজন উদ্ভ্রমহিলার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিলাম। তুই কিছু বললিস না?

শতদল বুঝল প্রবীর চাইছে সে-ও মেয়েটিকে কিছু জিগ্যাস করুক। কিন্তু সে সে-দিক দিয়েই গেল না। বলল, আমি আর কী বলবো? তোরাই তো বললিস।

অলকা পলকের জন্য শতদলের দিকে তাকাল। মনে হ'ল সে কিছু জিগ্যাস না করার সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

—এক মিনিট। আমি একটু আসছি— বলে প্রবীর পাশের ঘরে চলে গেল।

এখন এঘরে শুধু শতদল আর অলকা। শতদল লক্ষ্য করল অলকার মুখটা যেন আরও নরম পড়েছে। সে লজ্জার মতো তুলতে পারছে না। শতদল দারুণ অসম্মতিতে পড়ল। প্রবীর তাকে এ কোন বিপদ ফেলল? সে কি ভেবেছে যে তার আড়ালে শতদল অলকার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে? সে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে প্রবীর যখন এঘরে এল তখন শতদল বলল, আমি এবার উঠবো রে।

—সে কি! এখনই প্রবীর বিস্মিত হল।

—হ্যাঁ। এবার আমার উঠতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে—

সে উঠে দাঁড়াল।

রান্নাঘর থেকে মীরা বলল, ও কি! এখন চললেন কোথায়? আমি চা করছি।

খেয়ে যাবেন।

শতদল বলল, না, আর চা খাবো না।

সে দরকার দিকে পা বাড়াল। অলকা যেন এতক্ষণে স্বচ্ছন্দে তার দিকে একবার তাকাল মনে হল। শতদল তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, চলি—

অলকা খাড় নাড়ল। তার মূর্খে সৌজন্যের হাসি।

মীরা রান্নাঘর থেকে বলল, অলকা তুমি কিছু উঠো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শতদল রান্নাঘরে উণ্ডি দিয়ে মীরাকে বলল, আসি—

—আবার আসবেন।

—আচ্ছা।

মীরা যেন কি একটা কলতে গিয়ে বলল না। শুধু ওর দু'দৃষ্টির মধ্যে যেন কী একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল।

শতদল রান্নাঘর বোরিয়ে দেখল প্রবীরও তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ ছাটের পর প্রবীর বলতে শুরু করল। অলকার বাবা নেই। ওর দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না চেষ্টার অভাবে। অলকা মূর্খে তো হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম তোর যদি পছন্দ হয়—অবশ্য দেখতে খুব ভালো না—তবে মেয়েটা খুব ভালো—ওর আরেই ওদের সংসার চলে—

শতদল কিছু বলল না। সে প্রবীর এবং মীরার উপর খুব রাগ করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাও সে পারল না। পারল না অলকার কথা ভেবেই। কী অবস্থায় পড়ে মেয়েটিকে এই অপমান মেনে নিতে হয়েছে তা সে অনুমান করতে পারবে। আর এটাও সে বুঝতে পারছিল যে, মেয়েটি খুব দুঃখী। কিন্তু তার জন্য শতদলের কিছু করার নেই। অলকার প্রতি এই মূহূর্তে সে কোন আকর্ষণ অনুভব করছিল না। বরং তার জন্য সে যে কিছু করতে পারছে না সেজন্য তার খুব খারাপ লাগছিল। অলকার যদি কোন উপকার সে করতে পারত তাহলে সে সন্ধ্যা হত। কিন্তু অলকাকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব।

শতদলের মনে হল প্রবীরের বাড়ীতে ছাটের দিনটা বেশ ভালোভাবেই কাটিছিল। হঠাৎ যেন তাল ভঙ্গ হয়ে গেল।

# ডাট

## শ্রী ডা মশলাই

# কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত

## (কুকুমী)

প্রাঃ লিঃ এর ঃ

## একমাত্র ব্র্যাণ্ড

# ভগিনী নিবেদিতার পত্রে শ্রীঅরবিন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু সংবাদ এবং কিছু বিতর্ক ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি। বিতর্কের শুরুর বহু বছর আগে—যখন ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'উন্মোচন' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের রাজ-নৈতিক জীবন সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। শ্রীমতী লিজেল রেম'র নিবেদিতা-জীবনী (বা তার অনুবাদ) বের হবার পরেও পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্য-মারফত সঠিক সংবাদ দিতে চেষ্টা করেন। বর্তমান রচনায় এসব বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা আমার নেই: এমনকি সর্বস্বীকৃত সংবাদগুলিও পুরোপুরি পরিবেশন করতে চাইছি না। বিশেষ প্রয়োজনীয় মাত্র দৃষ্ট একটি সংবাদের উল্লেখ করব।

প্রথমত শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন—নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য একই সঙ্গে বলেছেন, যোগে নিবেদিতার সহজ অধিকার ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথাই কলা চলে, নিবেদিতার সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের যোগ না থাকলেও নিবেদিতার গুরু বিবেকানন্দের এবং তস্য গুরুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তা ছিল। সেই আধ্যাত্মিক সংযোগের কথা স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের ভক্তি নিশ্চয় নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পথ খুলে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সংগঠিত প্রথম বিপ্লব-পরিষদের পাঁচ সদস্যের একজন ছিলেন নিবেদিতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে কিছু অধিক সংবাদ আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই বিপ্লব-পরিষদ গঠিত হবার আগেই নিবেদিতা ভারতে ঐক্যবিক প্রচেষ্টার জিগ্মুষু হয়ে পড়েছিলেন—তা হয়েছিলেন স্বামীজী জীবিত থাকা কালেই। এ ব্যাপারে কাউন্ট ওকাকুরার বড় ভূমিকা ছিল। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে অজ্ঞাতসূর্য সংবাদ সংগ্রহ করে স্বামীজী বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রকাশিতব্য একটি গ্রন্থে আমি তা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করেছি। নিবেদিতাই ভারতীয় গণ বিপ্লবের ব্যাপারে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবেদিতা সম্পর্কে

অরবিন্দও উৎসুক ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থ অরবিন্দের কাছে রাজপ্রহরকর মনে হয়েছিল।

তৃতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, নিবেদিতার একটি নিজস্ব দল ছিল।

সেকথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য, অরবিন্দের দলের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এবং অরবিন্দের বাংলা-দেশ-ভ্রমণের পিছনে নিবেদিতার যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। এই প্রস্তাবকে কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রাখতে নিবেদিতা অরবিন্দের 'কম্বোদিনী' পত্রিকার কয়েক সংখ্যা কেন্দ্রে সম্পাদনা করে বার করেছিলেন।

বেসব সংবাদের উল্লেখ করলাম, সেগুলি মোটামুটি অলসান্বিতদের কাছে পরিচিত। কিন্তু জানা নেই—এমন কিছু সংবাদও আমাদের কাছে আছে।

শ্রীমতী লিজেল রেম' নিবেদিতা-জীবনী লিখবার সময়ে নিবেদিতার বিপুল পরিমাণ চিঠি ব্যবহার করেছিলেন। এইসব চিঠির অধিকাংশই মিস ম্যাকলাউডকে লেখা। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবেও তিনি সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। ইউরোপ আমেরিকার আরও কিছু ব্যক্তি (নিবেদিতার জাই ও বোন তাঁদের মধ্যে ছিলেন) তাকে মূল্যবান সংবাদ দেন। ভারতবর্ষে এসেও তিনি বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তার

পরেই তিনি নিবেদিতা-জীবনী লিখেছিলেন। রেম'-লিখিত জীবনীর নানা তথ্য কিন্তু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়—বিশেষত নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিষয়টি।

নিবেদিতা-বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করে আমি নিবেদিতার বিপুলসংখ্যক চিঠিপত্রের কথা জানতে পারি, এবং শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর মারফত সংবাদ পেয়ে শ্রীমৎ অনিবার্ণের কাছে হাজির হই। কী অপূর্ব মহাপ্রাণতার সঙ্গে শ্রীমৎ অনিবার্ণ আমাকে নিবেদিতা-পত্রাবলী দিয়ে দিয়েছিলেন, তার কাহিনী আমি লিখেছি 'নিবেদিতা লোক-মাতা' গ্রন্থের ভূমিকায়। ষাইহোক, সেই চিঠিগুলি পরীক্ষা করে নিবেদিতার রাজ-নৈতিক ধারণা ও কার্যাবলীর বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ পাবার পরেও কিন্তু আমাকে একটি বিষয়ে একেবারে হতাশ হতে হয়েছিল—এই চিঠিগুলির মধ্যে অরবিন্দ-প্রসঙ্গ একেবারে নেই! একথা ঠিক, এই চিঠিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকবার নিবেদিতা বলেছেন—গুরুতর কোনো কথা আর চিঠিতে লিখব না, চিঠিপত্রে অবিরত হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—এবং আমরা জানি, অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার গুরুতর বিষয়েই সম্পর্ক ছিল—তবু অরবিন্দের উল্লেখ মাত্র না থাকে। বিস্ময়কর। একটি জিনিস অবশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—কহু চিঠিই ছোঁড়া, বিশেষ

বেনারসী শার্ভী

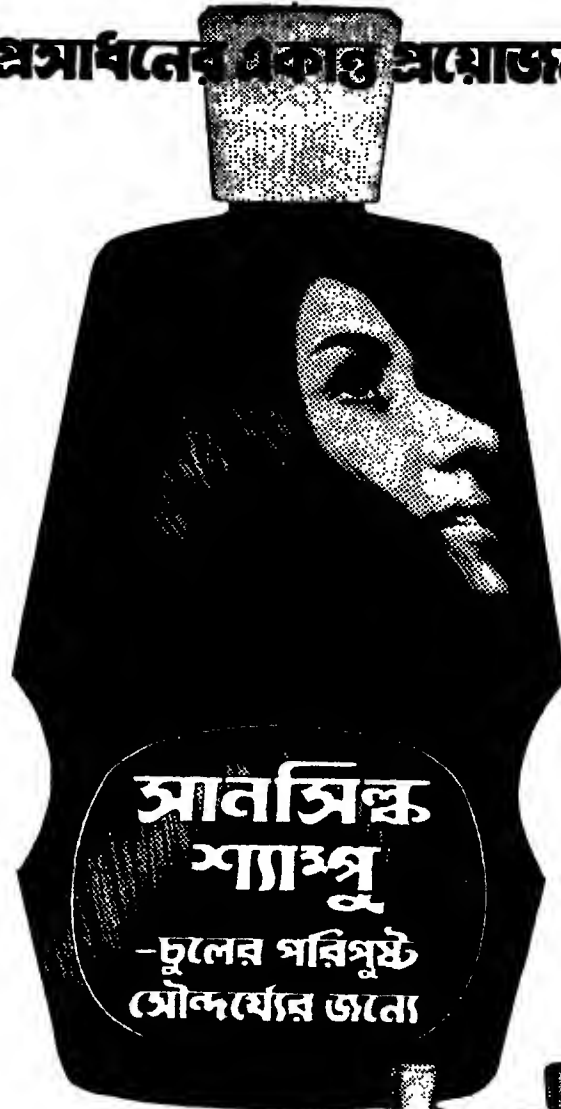
ইন্ডিয়ান

সিল্ক হাউস

কালেক্টর ষ্ট্রিট মার্কেট

কলিকাতা

## আপনার প্রসাধনের একান্ত প্রয়োজনীয় আধার



আপনার চুলও আপনার সৌন্দর্যের এক অঙ্গ। তাই, মুখের  
বেকআপের আগে চুলের বেকআপ করুন—সানসিল্ক শ্যাম্পু দিয়ে।  
সানসিল্ক আপনার চুলকে এমন পরিপুষ্ট আর চরৎকার মৌল্যবের  
করে তুলবে—মনে হবে যেন কালো বেশর। আপনার চুল যেমনই হোক—  
তার উপযুক্ত বিশেষ ব্যবস্থার সানসিল্ক শ্যাম্পু পাওয়া যায়। আপনার চুল  
ঠিক কি ব্যপের বুঝে নিয়ে, আপনার চুলের উপযুক্ত সানসিল্ক বেছে নিন।  
অন্য যাবতেন, সানসিল্ক আপনার প্রসাধনের একান্ত প্রয়োজনীয় আধার।  
এখন ইকনমি সাইজেও পাওয়া যায়



**চটচটে, খসখসে বা স্বাভাবিক... সত্যেক রকমের চুলের প্রসাধন - সানসিল্ক**

সিআইসি-৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

হিমুহান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন



‘প্রয়োজনীয়’ অংশে। শ্রীমতী জিহেল রেম’কে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান—মিস ম্যাকল্যাউড তাঁর সামনে বসে বহু চিঠি গোটাগুটি বা অংশত ছিঁড়েছিলেন—‘খুবই ব্যক্তিগত’ এবং ‘খুবই রাজনৈতিক’ বলে। আমাকে অগত্যা সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল—ছিঁড়ে ফেলা অংশের মধ্যে অরবিন্দ ছিলেন—এই কথা ভেবে।।

কাহিনীটি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। শ্রীমতী রেম’ পরে আরও একতাতা চিঠি পাঠিয়ে দেন, যেগুলি লেখা হয়েছিল ইংলণ্ডে অবস্থিত এস কে র্যাটার্জের কাছে। র্যাটার্জ স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন সূচনার সময়ে। নিবেদিতা জালে ধরা পড়ে তিনি ভারত-প্রেমিক হয়ে দাঁড়ান। ফলে তাঁকে চাকরি ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-লেখক হয়ে উঠেছিলেন। উচ্চ রাজনৈতিক মহলে তাঁর গতিবাহি ছিল। নিবেদিতা তাঁকে ভাবতীয়া অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত কবতেন পত্রযোগে। নিবেদিতার এসব চিঠি সাধারণ ডাকে যেত কিনা সন্দেহ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেত এক্সপ্রেস-মারফত। এইসব চিঠির মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এবং ইঙ্গিতে তৎকালীন রাজনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যা যা মনে কতেন নিবেদিতা উপব-উপব রাজনীতি কবতেন, তাঁদের ধারণা যে কত উপব-উপব, তা প্রমাণের মত যথেষ্ট উপাদান এই চিঠিগুলিতে রয়েছে।

এবং এই চিঠিগুলির মধ্যেই অরবিন্দের উল্লেখ পেয়েছি। উল্লেখগুলি সাধারণভাবে খুব বিস্তৃত নয়, কিন্তু মূল্যবান। প্রত্যেকটি উল্লেখের পিছনেই খণ্ড ইতিহাস রয়েছে যার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা বর্তমানে সম্ভবপর নয়। কেবল এইখানে স্মরণ করিয়ে দেব নিবেদিতা তাঁর বন্ধুকে সংবাদ দেবার জন্যই এইসব সংবাদ পাঠাতেন না—অন্য উদ্দেশ্যও ছিল : এইসব সংবাদ পেয়ে র্যাটার্জ বখাশ্বাধানে কলকাতা নাড়ানেন এবং সম্ভবক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ ক’বন।

যেমন ধরা যাক, অরবিন্দের দ্বিতীয়াব গ্রন্থের-সম্ভাবনার কথা অনেকগুলি চিঠিতে জানানো হয়েছে। এইসব সংবাদ সংগৃহণ নানা সূত্রে নিবেদিতার ছিল, এবং অনেক সময়েই তিনি কথাগুলি বাতাসে জাসিয়ে দিতেন—এ-বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক ও সচেতন করবার জন্যে।

১৯০৯, ৩০শে জুলাই তারিখে নিবেদিতা মিঃ র্যাটার্জকে লেখেন—‘শুনতে পাচ্ছি, তিনি (বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর) এখনো বাংলার ম্যাট্রনিকসে এই অগস্ট তারিখে (বলকট-দিবসে) চালান দেবার কথা ভাবছেন। পুলিসের কাছ থেকে এ-বিষয়ে আবেদন পেলেই ও কাজ তিনি করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী গভর্নরের বরাতের কথা, সেইসঙ্গে আসামীর জনপ্রিয়তার কথা ভাবলে, তাঁর এই কাজকে চরম বেপরোয়া আচরণ বিবেচনা করতে হবে।’ বাংলার এই

নবনির্ভর গভর্নর যে খুব শক্ত মানুষ, সেখানেও নিবেদিতা এই চিঠিতে লিখেছিলেন।

একই চিঠিতে সরকার পক্ষে কৌশলী নটন সম্পর্কে নিবেদিতা বা লিখেছেন, তাকে মোটেই প্রাশাস্য্যক বলা চলে না।—‘তোমাকে জানাতে চাই, একথা বলাবলি করা হচ্ছে যে, নটন একটা পুরো আহাম্মক—আইন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব অল্প বা একেবারেই নেই। ... মাঝে মাঝে লোকালো ব্যাপকভাবে অনুদ্রুত হয়েছিল, (আশুতোষ) বিশ্বাসই সরকার পক্ষের মেরুদণ্ড, তিনি সরে গেলেই সব ভেঙে পড়বে।’ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ তারিখে একই বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—‘আপলি-মামলায় চিত্ত দাশ অপূর্ব কাণ্ড করেছেন। আব প্রতিদিন সবাই সবিস্ময়ে ডাকছে, কি কবে নটনকে কেউ মামলায় ডাকতে পারে! করিষাদী পক্ষে আশুতোষ বিশ্বাসই ছিলেন সত্যাকার শক্তিস্তম্ভ। তাঁর ‘অপসারণই’ দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে কাজের কাজ হয়েছিল।’

এর আগে ৬ অগস্ট, ১৯০৯-এর চিঠিতে নিবেদিতা, সরকার কেন অরবিন্দকে গ্রন্থের করতে চায়, সে-বিষয়ে লিখেছিলেন—‘অরবিন্দ ঘোষের নির্বাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য তুমি আসল কারণটা বুঝতে পারবে। ৯ জন নেতাকে যখন নির্বাসনে পাঠানো হয়, তখন দেশের উপরে যে হতাশ স্ফুটন নেমে আসে, তা দেখে সরকার নিজের বিরূপ বর্ষাধর কাজের মহিমা বুঝতে পাবে। আলিপুর বন্দীদের মুক্তির পরে আবার জাগরণ দেখা দিতে থাকে। সুতরাং সার কথা হল—জাগরণের হোতাঁকে পাকড়াও করো এবং গারদে পোবো!’

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এর চিঠিতেও ম্যাকল্যাউডের নেতাকে গ্রন্থের করে জামিন না দিয়ে আটকে রাখা হবে—এমন কথা পাচ্ছি।

অরবিন্দের প্রকাশ্য কল্যাণাদি কিভাবে বিপদের সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়ে নিবেদিতা ২৪শে জুন, ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন, ‘(সংবাদপত্রে) বেরিয়েছে, অরবিন্দ বরিশালে বৃত্তা-প্রসঙ্গে অশ্বিনী (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রশংসা করেছেন এক বলকট করতে প্ররোচিত করেছেন। পুলিশ তার নোট নিয়েছে।’ এইসব বৃত্তা সম্বন্ধে নিবেদিতা নিচের অরবিন্দকে সতর্ক করেছিলেন। অরবিন্দ নির্বাসনে আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হবে তিনি মনে করতেন। অরবিন্দ এইসব সতর্কবাণীতে বিশেষ কান দেননি, এবং সব কিছুই ‘প্রেরণা বলে’ গ্রহণ করে—এইরকম কৌতুক দিয়েছিলেন। নিবেদিতা অবশ্যই প্রেরণার বিশ্বাস করতেন, তবে বাস্তববোধের ঠিক দিচ্ছিলেন বলে সন্দেহ থাকে না—এই ধরনের ভুলটোয়ারী ধারণাও তাঁর ছিল। রাজনীতিতে তিনি নৈকশ্য আধ্যাতিক ব্যাপার মনে করতেন না। সুতরাং কিছুটা হতাশা ও বিদ্বেষ মিশিয়ে তিনি ২১শে জুলাই, ১৯০৯ তারিখে

(ইউরোপ থেকে ফেরার পরেই) লিখেছেন : ‘অরবিন্দ চতুর্দিকে বৃত্তা করে বেড়াচ্ছে, এবং আমার বিবেচনার এটা বিশেষ অবজ্ঞা-চিত্ত কাজ হচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেই স্বপ্ন-প্ররোচিত মনে করছেন, সুতরাং গ্রন্থের হতে পারেন না। আমরা অবশ্য অনেকের অনেক অশ্রুত কাজ করে থাকি, তার হেতু কেবল আমাদেরই জানা থাকে, ‘আমরা কারো পরোয়া করি না’ ইত্যাদি। কিন্তু স্বপ্নের অবশ্যই আমাদের ‘বাচন্যের’ প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখেন! জোয়ান অব আর্কেব ঘটনা একটি স্থায়ী বিরোধী দৃষ্টান্ত। ... বাইহোফ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধনীতি কোনোমতেই এক বস্তু নয় এবং উভয় বস্তুকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।’

অরবিন্দ অবশ্য শেষ পর্যন্ত গ্রন্থের হয়নি। তাব পিছনে নিবেদিতার সুযোগ-সংধানী রাজনৈতিক বৃত্তি এবং স্বপ্নের—কার ভূমিকা পরিমাণে বেশী, তা নিজে তর্ক থামবে না। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ-ব্যাপারে নিবেদিতা এবং দিব্যাবাণী উভয়ের ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। এই সূলে আমবা নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে বুঝতে পারি, স্বপ্নের কিছু কাজ স্বপ্নেরনির্দেশী হিসাবে নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন, এবং অরবিন্দ যাতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থের না হন, সর্বাঙ্গিকভাবে তাব চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সবকিছু মহলেও নিবেদিতার বন্ধুবান্ধব ছিল। অরবিন্দ গ্রন্থের না হওয়া সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংবাদ পাচ্ছি নিবেদিতার ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এর চিঠিতে : ‘অবশ্য শান্ত মনে হচ্ছে। অরবিন্দকে যদি নির্বাসনে পাঠানো না হয়, তা সম্পূর্ণত ম্যাককার-নেসের এবং ইংলণ্ডে তোমার (মিঃ র্যাটার্জের) প্রয়াসের জন্যই।’

অরবিন্দ ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকার বিষয়ে উল্লেখ নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে পাই। ২১ জুলাই, ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন, ‘বর্তমানতবমের জায়গায় একটি নতুন সংবাদপত্র কর্মযোগিন, বেরিয়েছে ও অগস্ট তাবধি লিখেছেন : ‘আমার বিশ্বাস, এই সপ্তাহে তোমার কাছে কর্মযোগিন পৌঁছবে। এর মধ্যে যে খোলা চিঠি রয়েছে, তা ও-মহলে চাপুলের সৃষ্টি করেছে। আমাও বিশ্বাস, মার্চ এবং সকল সাংসাদিককে এর কপি পাঠানো হয়েছে। তবে সেগুলি পৌঁছতে নাও পারে।’ নিবেদিতা আলবার্টকে (লেডী স্যাডউইচ) কর্মযোগিন পাঠিয়েছিলেন গোপনে। পাঠাবার কারণ ‘আগামী দিন-দুয়েকের মধ্যে যদি খোলা চিঠির লেখককে নির্বাসনে পাঠানো হয়—তাহলে ওরা কেন বখাট’ বা পালন করেন। র্যাটার্জকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আব এক কপি কর্মযোগিন পাঠাচ্ছেন—তাও লিখেছেন।

নিবেদিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহা-তাগী, কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে প্রশংসা বিতরণে বদান্য নন। না হতে পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং উচ্চাঙ্গের লেখিকা। এই নিবেদিতা, আমরা দেখছি পাই, অরবিন্দের



রচনার সর্বশেষ অনুরাগী। ২০ জানুয়ারী, ১৯০১ তারিখে তিনি সোম্বোনে লিখেছেন। 'তুমি প্রতি সত্যকে যাতে কর্মযোগিন পাও তা কীভাবে যে চাইছি কি বল! আমার মতে, কর্মযোগিন চিন্তা ও স্টাইলের বিজয়বাদ। অরবিন্দ অসাধারণ। অপরপক্ষে অবশ্য একথা বলা উচিত হবে, যিনি দল চালান তাকে আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করল করার স্বার্থে নিতেই হয়।' অরবিন্দের প্রস্থানের পরে নিবেদিতা ১৯১০ তারিখে জানিয়েছিলেন যে, 'কাজে কর্মযোগিনের কোনো কপি পেলোই তাকে প্রেরণ করা হচ্ছে। তার আগে ৬ জুলাই, ১৯১০ তারিখে লিখেছিলেন, অরবিন্দ এখনো প্রেরণার হননি, যদিও তাকে ধরবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

এক তারও আগে, ৭ এপ্রিল, ১৯১০-এই চিঠিতে পাচ্ছি : 'এই সত্যকে কর্ম-যোগিনকে আক্রমণ করা হয়েছে। একই অফিস থেকে 'ধর্ম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বেরুতে। ২০০০ টাকা জমা না দেওয়ায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ ও কর্মযোগিনের মন্ত্রাঙ্ককে প্রেরণার জন্য চেষ্টা—কর্মযোগিনের প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি এই সপ্তে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধটিকে ইংলন্ডে তুমি প্রচারিত করতে পারবে। প্রবন্ধটি কি রাজপ্রোহকর? অরবিন্দ ঘোষ উশও। ১৮ই জানুয়ারী দিন স্থির হয়েছে। 'মাসিক' নামে মাসপত্রটি যদি জেতা যায় তাহলে অন্য ওয়েবসাইটে বরবাদ হয়ে যাবে।'

অতঃপর নিবেদিতা বিস্মৃতভাবে লিখেছিলেন—সরকারের এই 'কঠোর' ব্যবস্থা বলবৎ থাকলে হত্যার পক্ষে প্রচার এবং গোপন সংবাদপত্র প্রচার ছাড়া আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না।

এই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছিলেন, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, কর্মযোগিনের আরও দুটি সংখ্যা বেরুবে।

কর্মযোগিনের শেষের কয়েকটি সংখ্যা নিবেদিতা প্রকাশ করেছিলেন—অরবিন্দের প্রস্থানকে ঢেকে রাখবার জন্য—এ ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু জানি কত সামান্য! কিন্তু নতুন সংবাদ নিবেদিতার পত্রগুলি থেকে উপরে উপস্থিত করলাম, এবং তার থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারা যায়—বিবেকানন্দ-প্রদত্ত নিবেদিতা নামটি সাধারণ কবাবার জন্য, এবং ভারতের সৈনিক বাধ্যবী গুরু হবার আশীর্বাদ সফল করবার জন্য, রাজনীতিতেও ভারতের জন্য নিবেদিতাকে কতখানি করতে হয়েছিল।

অরবিন্দের প্রতি নিবেদিতার সর্বোচ্চ প্রাণী ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' ধর্মক্ষেত্রে নরনারায়ণকে পেরিয়ে আছেন—তা জাতীয়তার প্রবর্তা অরবিন্দ সন্দেহই। এমনকি একথাও বলা যায়, 'রাজনৈতিক' অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতা বিশেষ মনোযোগ

নাও হতে পারেন। নিবেদিতা রাজনীতির যে গহন, জটিল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন—সেখানে তিনি অনেক সময়ই বাস্তব রাজনীতির প্রসঙ্গে অরবিন্দকে অনুপ্রাণিত মনে করেছেন—অন্তত আমার তাই মনে হয়। অরবিন্দ প্রতি বিবেকানন্দের সমাদর করেছেন—অরবিন্দের প্রতি উন্মোচিত প্রতিবেদন। অরবিন্দের প্রতিবেদনকে অরবিন্দের প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন। অরবিন্দের প্রতিবেদনকে অরবিন্দের প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন। অরবিন্দের প্রতিবেদনকে অরবিন্দের প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন।

নাও হতে পারেন। নিবেদিতা রাজনীতির যে গহন, জটিল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন—সেখানে তিনি অনেক সময়ই বাস্তব রাজনীতির প্রসঙ্গে অরবিন্দকে অনুপ্রাণিত মনে করেছেন—অন্তত আমার তাই মনে হয়। অরবিন্দ প্রতি বিবেকানন্দের সমাদর করেছেন—অরবিন্দের প্রতি উন্মোচিত প্রতিবেদন। অরবিন্দের প্রতিবেদনকে অরবিন্দের প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন। অরবিন্দের প্রতিবেদনকে অরবিন্দের প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন।

নিবেদিতার কাছে 'জাতীয়তা জননী আমার'—অরবিন্দ সেই জাতীয়তার প্রবর্তা—সুতরাং অরবিন্দ 'বরণীয়'। এই মনোভাব নিবেদিতা প্রকাশ করেছেন ১৮ আগস্ট, ১৯১০-এর চিঠিতে। অরবিন্দের পশ্চিম-চেরীতে প্রস্থানের পরে এই চিঠি লেখা হয়। এই চিঠির মধ্যে নিবেদিতা কিছু কিছু ভাব-ভাবে একটি বিষয়ে আলোচনা করেন—রাজনীতিককে বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত করে দেবার জন্য—এবং সেই প্রসঙ্গেই অরবিন্দ সম্বন্ধে তার চরম কথাটি বলেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সরকারপক্ষ এবং সরকারের জীবনের লোকেরা বলেছিলেন—এই আন্দোলন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রতিষ্ঠান আন্দোলন। এই কথাটি ইংলন্ডে মহান প্রচারিত হয়। এই উদ্ভট প্রচারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে নিবেদিতা বলেন—এই আন্দোলন 'জাতীয় আন্দোলন'—যা তথ্য-কথিত জাতীয়তাকে নষ্ট করে ভারতবর্ষে 'কেন্দ্রীয়' হতে অখণ্ড সমাজের পতন করবে। নিবেদিতা তীব্রভাবে বলেছিলেন—ইউরোপীয়রা কোনো আন্দোলন করবার সময়ে আগে 'অভ্যন্তরীণ' কথা আছে—ভারতবর্ষে তা কিন্তু হয় না। 'স্বদেশী' আন্দোলন একটা দিবা জগৎ—মহাভারতের দিকে ধাবিত 'স্বদেশী' গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা আরও বলে-ছিলেন—এই আন্দোলনের 'মূল' সত্যটা স্বাধীন নব-কাল। 'গোটা জিনিসটিকে

সৃষ্টি করেছে বিবেকানন্দের হৃদয়'—বিনি কালম্ব বা করিয়। এবং ভারতীয়গণের মধ্যে 'কালম্ব অরবিন্দের' মনীষাই একমাত্র জাতীয়তাকে 'কালম্ব' সৃষ্টিশীলরূপে ধরতে পেরেছে। জগদীশচন্দ্র বসুও তা পেরেছেন, কিন্তু নিষ্করভাবে। নিবেদিতা আরও কয়েকজন কালম্ব/করিয়ের নাম করেছিলেন এই প্রসঙ্গে—কিন্তু পরের থাকে বলেছেন—সিদ্ধান্ত-কোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র বসু, ইত্যাদি। নিবেদিতার এই কালম্ব-প্রতিভা, 'কালম্ব' 'করিয়' 'ভাতি', এই সমালোচনা উভয়েই প্রকাশিত এবং জাতভেদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের কথা বলবার পক্ষে তিনি একটি বিশেষ জাতির নেতৃত্বের উপরে জোর দিয়েছেন, সে কথাও বলা যায়—কিন্তু নিবেদিতা সংকীর্ণ কোনো মনোভাব নিয়ে এই কথাগুলি বলেননি—সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণা করেই তা বলেছিলেন। তার বক্তব্য—করিয়ের চিরদিন নতুন জীব আত্মসাৎ করে তার পক্ষে লড়াই করেছে—করিয় জাতিই জাতি ভেঙেছে সর্বাধিক—তার চরম দৃষ্টান্ত বৃদ্ধ। নিবেদিতা নিজেকে 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং করিয় জাতিকে জাতি-বোধহীন জাতি ভাবতেন।

অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার উক্ত শ্রেষ্ঠ প্রশংসাবাণী ছিল এই—

'Arabindo Ghosh, may be said to be the one Indian mind that has really grasped nationality in a creative sense.'

নিবেদিতার কাছে নিখিল সত্যের স্বার উন্মোচন করেছিলেন বিবেকানন্দ। তারপর সেই বিবেকানন্দই একদা নিখিল সত্যকে সাময়িক সর্নির্দিষ্ট নদীখাতে প্রবাহিত করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—'আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই পরম জননী গাভ্রুমিই তোমার আরাধ্যা দেবী হউক।'

নিবেদিতা সেই সূত্র তুলে নিয়ে জাতীয়তার মন রচনা করেছিলেন :

'আমি বিশ্বাস করি—ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।'

সম আবাস, সম স্বার্থ এবং সম প্রেমের উপর নির্মিত হয় জাতীয় একা।

'আমি বিশ্বাস করি—যে-শক্তি ব্যক্তি হয়েছে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে, ধর্মসমূহ ও সাম্রাজ্যের সংগঠনে, বিশ্বাসের বিদ্যায়, ধর্মের দ্বায়ে—সেই শক্তিই পুনর্বীর আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মধ্যে—আজ তার নাম জাতীয়তা।'

'আমি বিশ্বাস করি—কর্তমান ভারত অতীতের মধ্যে গভীর-প্রাণিত এবং তার সামনে রয়েছে জ্যোতিষ্মত ভবিষ্যৎ।'

'হে জাতীয়তা! আমার কাছে আবির্ভূত হও আনন্দ ও বেদনারূপে; হে জাতীয়তা, তোমারি করে নাও আমারকে।'

এই 'জাতীয়তাকে' অরবিন্দ ভাষা দিয়েছিলেন—তাই তার প্রতি নিবেদিতার অসীম কৃতজ্ঞতা।

# বাঁহা

শৈল  
দেবর্মা

উপন্যাস

—একশ—

মনোরমা পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে যেতেই চোখের সামনে অন্ধকার খসে হ'ল, হাত বাড়িয়ে সে শূন্যে একটা কিছু আশ্রয় খুঁজছিল।

চোখের থেকে উঠে কিরণ তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলল। বিছানার উপর একটা খালিশে হেলান দিয়ে তাকে ভালো করে লসাল। বলল—‘এত বাস্তব হচ্ছিলে মা? বিস্তার কি হয়েছে আগে শুন।’

মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল,—‘আর কি শুনবি বাবা? ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজ নেই। কাগামুখী আমার কাছে সব স্বীকার করেছে। কিছু গোপন করেনি। অচলের কোণে চোখের লগ্ন মূচ্ছতে মূচ্ছতে ফের বলল,—‘সেই বডমানেরের ছেলে। সেই রতীশ আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করল।’

সব শুনলে কিরণ প্রায় নিঃশব্দ হ'ল। মায়ের নির্ণয় বোধহয় অস্বাভাবিক। প্রকৃতির নিয়ম-টিত্ব হিসেবে কবলে ঠিক এরকম একটা কিছু ধরে নিতে হয়। কিন্তু কি সাংখ্যিক অবস্থা। খুব শীগগীর একটা বিবর্ত করা প্রয়োজন। কণাটা বাড়ির কি কিম্বা বাইরের কোনো লোকের কানে গেলে আর রক্ষা নেই। পাড়ায় একটা চি-চি পড়ে যাবে। তারপর দশজনের কাছে মূখ দেখানো লজ্জার ব্যাপার হবে না?

একটু আগে সকালের সোনা-রোদ জানালা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এতক্ষণ চাদের গাড়ির চুপ করে বসে থাকতে কি সুন্দর লাগছিল। রোদ্দরে পিঠ রেখে রীতাবরীর কথা ভাবছিল কিরণ। তার নিজের সমস্যা। এরপর সে কি করবে? রীতাবরীর বাবার সঙ্গে দেখা করবে কি-না। চুপ করে থাকতে ভাবতে কখন অকচেতন ভাবে সে নানারকম স্বপ্নের জাল বুনছিল।

মায়ের কথা শুনলে কিরণ যেন ধোঁসে উঠল। এখন তার একটুও শীত করছে না।

টান ফেরে গানের চাদরটা বিছানার উপর ছুঁড়ে কেলে সে আলনা থেকে হ্যাঙগারে টাঙানো জামাটা টেনে নিল।

মনোরমা বাস্তব হয়ে শূঁধোল,—‘সাবি কোথায়?’

—‘সেই ভদ্রবেশী শরতানটার কাছে। কিরণ দাঁতে দাঁত ঘষল। তারপর নীচের টেটিটা ঝেঁপে কামড়ে একটা শপথের ভাণ করে জানাল,—‘ওর সঙ্গে কলসালো করব আমি। বিস্তার এই অবস্থার জন্য সে দারী। সুতরাং তাকে কিরণ করতে হবে।’

দুঃখ করে মনোরমা বলল,—‘বিয়ের কথা আমি অনেক দিন ধরে ভুলেছি কিরণ। তোর কাছে, মিস্তুর কাছে। তোর বাবাকেও জানিয়েছি। কিন্তু কেউ গা করিস নি। সবাই মিলে আমারে শূঁধে নাকির দিল, বিস্তি ছেলেমানুষ, ওর এখনও বিয়ের বরস হয় নি।’ একটু থেমে সে ফের যোগ করল,—‘এখন বুঝতে পারাছিস তো? তোর বোনের বরস না হলে কখনও এমনি সব লজ্জার ব্যাপার ঘটে?’

উত্তরে কিরণ অনেক কিছু বলতে পারল। কিন্তু সে চুপ করে রইল। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। এখন কত কাজ। মায়ের সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক করে লাভ নেই। আজ সকালে প্রথমে সেই ছেলেটার সঙ্গে বোকাপট্টা করতে হবে। কিন্তু রতীশ যদি দায়িত্ব অস্বীকার করে? তার কোনকে এখন বিয়ে করতে রাজি না হ'ল? তাহলে কি করবে কিরণ? একটা ছোট্ট, চেঁচামেচি করে পাড়ার ছেলেরের সাহায্য চাইবে? কিংবা থানা-পুলিশের স্মরণ হবে?

দরজার কাছে এসে মনোরমা চুপ চুপ জানাল,—‘শোন বাবা। এসব কলঙ্কের কথা। বেশী চেঁচামেচি, রাগ-রোষ করিসনে বেন। হিংসে, বিপরীত হতে পারে। তারপর এদিক-ওদিক ডাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—‘তোর বাবা, কিন্তু এখনও কিছু জানেন না। রোগ্য মানুস, আর এই তো মনের অবস্থা। শুনলে, এখনই অস্থির হয়ে

উঠবেন। তখন মেয়েকে সামলাব না তোর বাবাকে দেখব বলতে পারিস?’

—‘বিস্তি কোথায় মা?’ কিরণ এতক্ষণ পরে বোনের খোঁজ করল।

ওর গড়ার ঘরে। বিস্তিকে দেখলে তোর মায়ী হবে কিরণ। মূখখানা ভয়ে কালি। হিরুর খাটে চুপ করে শূঁয়ে আছে।’

আমহাস্ট শ্রুটিতে কিরণ ট্যাকসি নিল। অবশ্য ফাঁকা বাস ছিল। কিন্তু এসল্যান্ডে গিয়ে আবায় বদল করার ঝামেলা। মিছিমিছি খানিকটা সময় হবে। সাদান আডেনিউ অবশ্য অনেকখানি পথ। পিঁ-হ টাকা নির্ঘাত গচ্ছা। কিন্তু এই দুঃসময়ে পরস-কাড়ির হিসেব করলে চলবে না। যেমন করে হোক রতীশকে রাজি করাতে হবে। সে যদি বিস্তিকে না বিয়ে করে তাহলে সামনে গাঢ় অন্ধকার। কি করবে কিরণ ভেবে পাচ্ছে না।

সাদান আডেনিউয়ে বাড়ির নম্বর সে খুঁজে বের করল। কি সুন্দর শান্ত নিজ'নতা। বাগানে কত রকম মরশুমী ফুল। এক-একটা বড় জাতের গোলাপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কলিং বেল টিপতেই ধূতি আর হাফ সার্ট-পরা একজন বাজার সত্তকার গোছের লোক বেরিয়ে এল। ছেলেবেলায় ওর বসন্ত হয়েছিল। মূখে অল্প-বিস্তর সেই ক্ষতের চিহ্ন।

—‘রতীশবাবু আসেন? তাঁকে একটু ডেকে দিন—’

—‘আপনি দাদাবাবুকে খুঁজছেন?’ লোকটি তার মুখের দিকে ঝেঁপে সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকাল। ‘তিনি তো এখানে নেই।’

—‘নেই মানে?’ কিরণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। ‘কোথায় গেছেন?’

—‘কেন, আপনি জানেন না? দাদাবাবু তো গত বুধবার কিলত গেলেন।’

—‘কিলত গেলেন?’ কিরণ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বাড়ির উপর করতল চেপে

বলল,—তার বামা-মা কাউকে ডেকে  
দিন না।

—কেউ নেই বাড়িতে। তারা সবাই  
দুপুরে আছেন। এক মাস পরে কলকাতায়  
ফিরবেন।—

কিরণ অনেকক্ষণ মন্থ নীচু করে  
দাঁড়িয়ে রইল। তার পারের তলার জমি-  
কম্পের মত মাটি কাঁপছে। সে পূর্ণ শব্দ করে  
দাঁড়বার চেষ্টা করেও পারছে না। একটা  
শীতল ভয়ের স্রোত পিঠের শিরশ্চাপে বেয়ে  
কর্মাগত উপরে উঠছে আবার নীচে নামছে।  
এখন কি করবে কিরণ? কেমন করে বিলি  
কলকাতায় হবে? তার মাকে, বাবাকে লোক  
হাসি আর অপমানের হাত থেকে রক্ষা  
করতে পাবে?

প্রায় টলতে টলতে সে রাস্তায় এসে  
দাঁড়াল। এই মুহূর্তে তার একজনের  
কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছে করলে সে তাকে  
বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু  
পরিচয়। বিলি করতে পারেনি।  
করে সে আঘাটায় নেমে পড়েছিল। তুই  
পারো-হাটতে নোংরা কান। সকলের  
অলঙ্কা সেটুকু ধুয়ে-মুছে দূর করলেই  
হয়। পরিচয় বলে, আমাদের দেশের  
মেয়েরা পানকোড়ি নয়। ওরা হাটের মত,  
—ভাতার উঠলেই পালক থেকে জল ঝরে  
পড়ে। তখন আর অনায়েসে ছিটে-ফিটি  
গায়ে লেগে থাকে না।

হাসপাতালে গিয়ে সে পরিচয়কে খুঁজ  
বার করল। প্রায় টানতে টানতে মাঠের  
এক কোণে তাকে নিয়ে গেল। জন্মগাটা  
বেশ নিজনি। ডাক্তার-নাস' কিম্বা হাস-  
পাতালের অন্য কর্মচারীদের আন্যগোনা  
কম। তার চিন্তিত মুখ শূন্যের দিকে  
প্রায় অকিন্তিত চুল এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি  
দেখে পরিচয় রীতিমত অবাক হল।

ভুরু কুঁচকে সে প্রশ্ন করল—কি  
হয়েছে তোর?

—ভীষণ বিপদে পড়েছি। তুই যদি  
আমার একটা উপকার করিস।

—কোন ভো, কি করতে হবে তাই  
বল।

কিরণ একটা ঢোক গিলল। কয়েক  
মুহূর্ত ইতস্তত করে অবশেষে বলল—  
ইয়ে, মানে একটা মেয়ের খুব বিপদ।  
আমার বিশেষ জানাশুনো। কি হয়েছে  
বুঝতে পারছিস? শী ইজ আমমারেড।  
তুই যদি একটা ডি এন সি করবার ব্যস্ততা  
করে দিস। মানে যেখানে হোক, আমি  
সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত।

—হি, হি! পরিচয় বিরক্তিত  
মুখখানা শক্ত করল। বন্ধুকে তিরস্কার  
করে বলল,—তোমার গালে একটা থাম্পড  
মারতে ইচ্ছে করছে। এমন আস্ত গবেট।  
নিজে ডাক্তার হয়ে রীতাবরীর এই সর্ব-  
নাশটি করলি। আজকাল রাজারে কত রকম  
জিনিস বেরিয়েছে, তার একটাও খুঁজে  
পেলিনে?

লজ্জায় দুঃখে কিরণের দু চোখে  
জলের ফোটা টলমল করছিল। চোখের কোল  
বেয়ে অবধা অশ্রুর ফোটা এখনই গড়িয়ে

পড়বে। রীতাবরী নয়। পকেট থেকে  
হুকুম করে কয়েক টুকরা মুছল। তাকে  
রক্ষা করছে। বোম—আপন  
জানি বোম পরিচয়।

—হাই গড। কিস কি তুই?  
পরিচয় বিবর্তিত মুখে তাকাল।  
—হ্যাঁ, আমি সম্মানে উঠে গেছি  
কোউ-এলটার বাড়ি ছুটো ছলাম। কিন্তু সে  
ভীষণ চলাক। গত বুধবার ইংল্যান্ড চলে  
গেছে, এমন কি বাড়িতে তার মা, বাবা কেউ  
নেই। সবাই এখন দিল্লীতে। পরিচয়  
হাত দুখানা করে কিরণ মিনতি করল।  
—আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর  
তুই।

—নিশ্চয়। পরিচয় আশ্বাস দিল।  
একটা ভেতর বসল।—তুই কাল ওকে নিয়ে  
আয়। কোউ-এলটার নাম। আমার এক  
বন্ধু হুজিয়ার একটা নাসিং হোমের মত  
আছে। সেখানেই সব ব্যবস্থা হবে। দাঁড়া,  
তোকে কাউটা লিখি।

কিরণ নিরন্তর দেখে সে ফের  
বলল—ভয় নেই তোর। এটা আর্লি স্টেজ,  
—সুতরাং রিস্ক নামমাত্র। তাছাড়া জায়গাটা  
খুব সেক। আর মোটে দেড় দিনের ব্যাপার।  
কোথায় কি হল। পাকের বাবাও টের  
পাবে না।

বেলা দুটো নাগাদ কিরণ বাড়িতে  
ফিরল। ঘরে এখন শুধু মা আর বিলি।

## আশ্বাসপূর্ণ দেবীর

অন্য সমাজিক

### কখনো দিন

### কখনো রাত

আগামী সংখ্য থেকে  
গল্পালাভিক পেরোবে।

নাগরিত অফিসে তাই কথা কইবার সুবিধে।  
সব শব্দে মনোরমা কপালে করাঘাত করে  
বলল—আমার অদেপ্ট বাবা। নইলে  
ইস্কুলে-পড়া কুমারী মেয়ের এমন কলঙ্ক  
হয়? কি কলঙ্কে আমি ওকে থিয়েটার  
করতে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন পাপপুণ্য,  
ভালো-মন্দ কিছর করবার অবসর নেই।  
যেমন করে হোক এই বিপদ থেকে উদ্ধার  
পেতে হবে।

বিলির ঘরে ঢুক সে প্রায় চিৎকার  
করে বলল—দ্যাখ, হতজ্ঞাড়ি। কেমন ছেলের  
সঙ্গে পিরীত করেছিলি। কেউটাকুর এখন  
বিলিতে গিয়ে মেমসাহেবদের নিয়ে হাওয়া  
খাচ্ছে। তোর কথা তার মনেও নেই।

কিন্তু বিলি চুপ। আজ সকাল থেকে  
সে বোবা। ঠিক পাশাপাশি প্রতিজ্ঞার মত।  
একটি কথাও বলছে না।

মনোরমা ছেলেকে কাছে ডাকল। গলা  
খাটো করে বলল—দোহাই কিরণ। তোর  
বাবাকে কেন একটি কথাও বলিস নি। কেমন  
মানুষ জানিস তো? এই সব অনাচারিষ্ট  
খবর শুনলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে  
বসবেন। কাল তাকে অফিসে, রাগিয়ে  
আমায় বেরিয়ে পড়। আর মোটে একটা  
মিনিট। বলব, বিলি ওর এক বন্ধুর জন্য  
দিনে গেছে। রাতের সেখানেই থাকবে।  
আমলে আর কোন চেষ্টা মচি করবে না।

খাটো-খাটোর পর চাদর মুড়ি দিয়ে  
কিরণ কিম্বার শূয়েছিল। আজ সকাল  
থেকে সে মনোমগ্ন একটা কথাও বলে  
নি। তার কাছে যার নি। আর বিলি কি  
অসম্ভব ঠাণ্ডা। ঠিক মরা মাছের মত কাঠ-  
কাঠ আড়ন্ত। এখন কথা বলতে গেলে সে  
তাকাতাই পারবে না। লজ্জার বালিশে মুখ  
গুঁজে শূয়ে থাকবে।

কি প্রয়োজনে মনোরমা এ-ঘরে ঢুক-  
ছিলেন। ইতঃ তার দিকে তাকিয়ে বলল—  
ওই বাঃ। তোকে একটা কথা বলতে ভুলে  
গেছি। সকালের ডাকে তোর নামে একখানা  
চিঠি এসেছে কিরণ।

—চিঠি! সে তড়াক করে বিছানার  
উপর উঠে বসল।

মনোরমা কোথা থেকে খামটা এনে  
দিতে কিরণ বুঝতে পারল। মেয়েলি  
হস্তাকারে তার নাম পরিষ্কার লেখা।  
নিশ্চয় রীতাবরীর চিঠি। খামটা না খুলেও  
কিরণ নিতুল বলে দিতে পারে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে বাতাসদায় গেল  
সে আপন মনে মর্মেত হাসল। আশ্চর্য।  
এতদিন বাদে রীতাবরীর তাকে মনে হল।  
প্রায় এক মাস পরে মেয়ের তাহলে রাগ  
পড়েছে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিরণ খামটা  
ছিঁড়ল। যা ভেবেছিল তাই। রীতাবরীর  
চিঠি। সে লিখেছে—

আমাব ভালবাসার বিরণ

তুমি এখন এই চিঠি পাবে তখন আমি  
অনেকদূরে চলে যাচ্ছি। আর একজনের  
সঙ্গে, যার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার  
কুমারী মনোম লজ্জা-অনরাগ মেমনো নরম  
রাগা মাটিতে কোনোদিন তার ছাড়া  
পড়িনি। তবু সেই অচেনা মানুষটির হাত  
পরে তালগাছের বক চিরে গামানো কোঁড়া  
ডিফির মত আমরা দুজনে সংসার-সম্প্র  
ভেসে পড়লাম। নিশ্চয় অদৃষ্টে তাই লেখা  
ছিল। নইলে যাকে চিনলাম, জানলাম।  
সে আমার কেউ হ'ল না। আর যাকে কোনোদিন  
দখিনি, সেই মানুষ কেমন করে আমার  
জীবনভরীর হাল পরবার অধিকার পেল?

সেদিন কলেজ গুটী থেকে রাগ করে  
চলে এসেছিলাম। তুমি নিশ্চয় তা বুঝতে  
পেরেছ? সমস্ত পথ আমি শুধু চিন্তা  
করেছি। তুমি কেমন করে আমাকে দুমাস  
অশ্রু কবতে বলতে পারলে? তোমার  
কাছে আমার অবস্থার কথা একটুও গোপন  
করিনি। আমাদের রক্তগণ্ডী বাড়ি। বাপা  
হল গৌরবের চোখের মণির মত সম্বন্ধে  
রক্ষা করতে চান। তার কাছে অবশ্য বিয়ের

অনুভূতি চাওয়া অথবা পাখরে মাথা ঠেকে  
দুঃখ প্রায় এক কথা।

তুমি কত সহজে আমার কাছে সময়  
চেরে নিলে। আরো দুটি মাস আমাকে  
অপেক্ষা করতে বললে। কিন্তু আমার একটা  
প্রশ্নের উত্তর দেবে কিরণ? মা-বাবা, বাড়ির  
লোকের আরো দৃষ্টিতে অপেক্ষা করবে কিনা,  
একটা তো তুমি একবারও জিজ্ঞাসা করলে  
না? আমার সৌভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্য বাই  
বল। বাবা আমাকে পছন্দ করেছেন, তারা

বাবার কাছে এসে বিরল দিন স্থির করতে  
চাইবেন একথা কি তোমার মনে ভেসে উঠে  
না?

আমি বহুতে পেরেছি কিরণ। তোমার  
অনেক দারিদ্র, নানা সমস্যা। বাড়ির কথা  
তোমাকে বেশ ভাবতে হয়। তোমার ছোট-  
ভাই গ্রামে চলে গেছে। তাই মায়ের মনে সন্দেহ  
নেই। দাদা আমেরিকার বাসেন। বাবা অবশ্য  
নিরে জীবনের বাকি দিনগুলি দেশের  
বাড়িতে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন। এই

মহুতে তোমার কারো দিকে তাকানো  
অবশ্য নেই। বলতে গেলে দারিদ্র এখন  
একর। বাড়ির তাকনা শব্দ তোমার কিরণ।  
আর দৃষ্টিতে মিলে বলা, অস্তিত্ব আরো কিছু  
দিন না গেলে দুই কাঁধে তুমি কিছুতেই  
শক্তি পাবে না।

বিশ্বাস কর, তোমার মনের দিকে  
তাকিয়ে আমার মায়ী হল। এত সমস্যা, তাঁর  
ভারে তুমি অক্লান্ত। বোকার উপর শাকের  
জাতির মত নিজের ভাবনার কথা বলে



সব হেয়ার অয়েলই তো আপনার চুল  
পরিপাটি রাখে, কিন্তু

**স্বাস্থিক পারফিউমড  
ক্যান্ডার হেয়ার অয়েল**  
আপনার চুলকে ক'রে তোলে ঘন আর  
চকচকে ও নিরোগ। তাছাড়া,  
চুলকে রাখে সুন্দর সুবিস্তৃত ক'রে।

তাই তো প্রতি বছর হাজার হাজার পরিবার সুখি  
স্বাস্থিক পারফিউমড ক্যান্ডার হেয়ার অয়েল ব্যবহার করতে শুরু করেন।



Shilpi-NIPMA-22/72 BM

তোমাকে বিরত করা আমার উচিত হয়নি। তাই আমি বিদায় নিচ্ছি কিরণ। লক্ষ্যটি, আমাকে জল বন্ধে তুমি দৃষ্ট পেরে না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এই বিষয়ে মত দিলাম। মা আমাকে বারবার বলেছেন, বোকা মেয়ে, তোর ভালো-মন্দ আমি অনেক বেশী বুঝব। নিজের ভাবনা-চিন্তা আমাদের উপর ছেড়ে দে। দেখবি তুই জীবনে কত সখী হয়েছিস।

নিজের সন্তের জন্য নয়। তোমার কথা ভেবে বিদায় নিচ্ছি কিরণ। আমি চলে গেলে হয়তো তুমি একটা হালকা বোধ করবে। ভালো করে বাড়ির কথা জবাবে পারবে। তোমার দ্বিধা নিয়ে আমার কথা, আমার কথা। ছোট বোন বিমিত, আর বিয়ের জন্য তোমাতেই এবার কোমর বেঁধে তৈরি হতে হবে।

আমার মা বলেন, এসব কাঁচা রুট। বিয়ের জল পড়লেই সব খুঁসে যাবে। আমি একথা মানি না কিরণ। ভালোবাসার রঙ কোনোদিন কাঁচা হয় না। দূরে সরে যাচ্ছি বলেই কি মন থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারব?

আবার কোনোদিন দেখা হবে কিনা জানি না। কিন্তু কলকাতার গঙ্গার ধারে এসে গাউলে তোমার কথা বড় বেশী মনে পড়বে। এই মাঠে-ঘরখানে, লনলনে হাওয়ার সবচেয়ে ঘাসের উপর বসে দূরত্ব কত গল্প করেছে। আমার সেই স্মৃতির বাড়ির ছবি মনের আরম্ভের কতবার ভেসে উঠবে।

কোনোদিন অনেক রাত্তিরে হঠাৎ মনে ভেঙ্গে গেলে পুরোনো দিনের হাজার স্মৃতি মনের বসে বসে মনে ভিড় করবে, আমি চোখ বুজে আশ্রয় প্রার্থনা করব। তোমার কথা চিন্তা করব কিরণ। আমাদের ভালোবাসার কথা। সেই বন্ধনকে স্বর্গের কলসে পুটিয়ে দূরত্ব দূরত্ব থেকে ছুটে এসে একই ট্যাক্সি ধরতে চেষ্টা করলাম। আবার কোনোদিন প্রাণের আশা কালো মেঘে ছেঁয়ে যাবে। খন বোর বর্ষা নামলে তোমার কথা সর্বদা মনে হবে।

ভালোবাসার দিনগুলি বড় ছোট। শীতের বেলার ঢেয়েও স্বপ্ন পরিসর। কিন্তু তারা স্বাধীন। কোনোদিন মন থেকে মুছে যাবে না। আর আমার কুমারী জীবনে

তুমি প্রেমের প্রথম কিরণ। তোমার কথা কি এখনও ভুলতে পারি?

বিদায়—

ইতি

রীতাবরী

চিঠিখানা পকেটে রেখে কিরণ আবার চাদের মন্দির দিয়ে দূরে পড়ল। তার মনে রাগ বা অভিমান নয়। কেমন একটা বিচিত্র পুণ্যের অনুভূতি ধীরে ধীরে মূস নিখিল। অন্তরের কোন নিখুঁত প্রদেশে বিবর মেঘের ছায়া কমেই য়ন হচ্ছে। অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ল তার। কলকাতা এক বন্দু ভীষণ তরু করে বসেছিল,—আমেরা আদৌ ভাবপ্রবণ নয়। ওরা খুব প্রাকৃতিক। এতদিন পরে সেই বন্দুভাষী কেমন মাঝার হয়েছিল। আর সত্যি কথা, রীতাবরী তাকে ঠিক-নিখুঁত ভাষায় বিচার করেছে। তার মাঝার একদল অনেক গারিহ। গালা-আমেরিকার, হিন্দু বাড়িরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁয়েছে। সুতরাং তার মাকে-বাবাকে কে দেখবে? আর বিমিত? এই দুইজনে তাকে নিয়ে কি ভাবনার শেষ আছে? আরো কতদিন এই দুইজনেরা চলবে তাই বা কে বলতে পারে? ৭০ মাস কেন, ৮০ মাস কিম্বা এক বছর হয়তো কিরণকে বাড়ির কথা জবাবে হবে।

কিছুক্ষণ পরে সে বিদায় থেকে উঠে পড়ল। বাইরে কোথাও ঘরে এলে ভালো লাগবে? সেহে-মনে কেমন বিমিত অবলাদ। একটা ভিত কটগল ওখু খাওয়ার পর মনের বা দশা হয়, কিরণের মনের অবস্থাও তাই। সে ভাবছিল এসপ্পায়সেতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসবে কি না? কিম্বা কলকাতা পুটিয়ে কাকি-হাউসে। সন্ধ্যার সময় দেখানো হয়তো পুরোনো বন্দু-খান্ধবদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

জামাটা মাঝার গায়ে কিরণ ঘেরোবার জন্য তৈরি হল। এই জামাটা এখন সে ছাড়া আরো দুটি প্রাণী। তার মা ও বিমিত। তবু সমস্ত বাড়িটা কি অক্ষুত নিশ্চয় আর চুপচাপ। বেন সব মত। প্রাণহীন এক প্রেত-পুরীর মধ্যে কিরণ আটকা পড়েছে। কিন্তু বিমিত? অমন প্রাণচঞ্চল ছোট্ট মেয়েটা। কলকাতার কথা মনেবার পর সে কি বোঝা হয়ে গেছে?

সমস্ত রাত্তির কিরণের মনে হয়নি। রীতাবরীর চিঠিখানা তার পকেটে। চোখ বুজলেই পুরোনো দিনের কথা কেমন মনে হয়। সেই গঙ্গার তীর। দূর ওপারে শিব-পুরের কল-কারখানার গাছের মাঝার হলে পড়েছে। রাত্তিরের মত একটা শাদা মোটর লগ তরতর করে জল কেটে রক্ত ভেসে যাচ্ছে। সেই হায়াটকা বিকেল সবচেয়ে ঘাসের উপর বসে তারা দুজনে শব্দ-স্বপ্নের জাল বুনত। কতদিন শিলালস স্টেশনে নেমে রীতাবরী তার জন্য অপেক্ষা করেছে। হাসপাতালের উল্টোদিকে খানিকটা দূরে সিনেমা হলটার কাছে দাঁড়িয়ে। এই কলকাতার পাশে পাশে তারা দুজনে-বিকলে ঘুরে বেড়িয়েছে। অমন সোনার দিনগুলি পাখির মত ডানা মেলে কোথায় হারিয়ে গেছে।

কিন্তু এখন বিদায়ের শব্দে রীতাবরীর কথা ভেবে তার মন খাম্বা করলে চলে না। কাল অনেক কাল। বিমিতের জন্য সে খুব দুঃখবোধ করে। পরিতোষ অবশ্য তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সামান্য। আলি স্টেডে গেলে রিকের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু একটা কিছু থেকে যায়। সে নিজে চিকিৎসক। আর ডাক্তার তো জন্মের নয়। সুতরাং ভুলচুক অ্যাকসিডেন্ট সবই ঘটতে পারে। কিছুই বিচিত্র নয়।

খুব সকালে তার মনে ভেঙে গেল। মনোরমা কেন তাকে ব্যাকুলভাবে ডাকছেন। কিরণের মনে হল কথা বলতে গিয়ে মায়ের গলা কান্নার বুকে আসছে। এই শীতের সকালে তার মস্তিস্কের ভিতর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত একটা চিন্তার প্রবাহ শব্দ হল। কি হয়েছে মায়ের? দুঃখিন্তায় আতঙ্কে সে খড়মড় করে বিদায়ের উপর উঠে বসল।

—“ও কিরণ, তুই একটা ওঠ বাবা।” মনোরমা তেরমি ব্যাপারকে কণ্ঠে বলল, “একবার দেখবি চল। বিমিত কেন জেগে উঠেছে না? এত ডাকাডাকি, তৈলাঠিস করলাম। তবু ওর মনে আর কিছুতেই ভাগে না।”

—“তাই নাকি?” কিরণ বেশ অবাক হল। তারপর বিদায় থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মায়ের উপর বিমিত নিশ্চিন্তে শব্দে। এখন তার মূখখানি ঠিক নিশাথ রাতের জ্যোৎস্নার মত। বড় শান্ত, বড় সুস্থ। চিন্তা নেই। ভাবনা নেই। বিমিত যেন পরম সখে নিদ্রা যাচ্ছে। তার বাবা বিদায়ের পাশে বসে গালে করতল চেপে গভীরভাবে চিন্তা করছে।

মনে চোখে প্রথমটা সে ধরতে পারেনি। কিন্তু ভালো করে জাকিয়ে কিরণ চমকে উঠল। মাঝার বালিশের কাছে পরিতোষের দেওয়া সেই নীল শিশিটা খালি পড়ে আছে। বিমিত একটাও রাগেনি। তার বাবা মাকে-মধ্যে দু-একটা ব্যবহার করে থাকতেন। বাঁকগুলি বিমিত খেয়ে দাঁড়িয়েছে। কলে

# শ্রীধৃত

শ্রীধৃত ও প্রেস

অন্যোক্তিক রচিত প্রাইভেট লিঃ  
২৬, কলি পীঠ, কলিকাতা-১



গাফ নিয়া। তারপর মনের সেন পৌরসে আর এক অজানা দেশের ঘাটতে সে পা দিয়েছে। সেখান থেকে আর কেউ কিলে আসে না।

একটু বৃষ্টিতেই বাগানের নীচে একটা ছোট কাগজ পাওয়া গেল। তার শেষ চিঠি। কিরণ যা চেয়েছিল তাই। বিপ্লব আত্মহত্যা কবেছে। চিঠিতে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

কাগজটা মনোরমার হাতে দিয়ে কিরণ মাথা নীচু করে দাঁড়াল। 'একটু শব্দ হও না। বিপ্লবকে ডাকাডাকি কর না। ওকে মৃত্যুতে দাও। ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার সম্মুখে সে কের বলল, 'ওর মৃত্যু আর কখনও ভাববে না।'

মনোরমা ছুকে কেঁদে উঠল। মেরের মৃত্যুদেহটা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তুই অভ্যন্তর করে চলে গেলি মা। তোকে কল্যাণী বলায়, তাই—।' মনোরমা তার কথা বলতে পারল না। সে বিছানার উপর মূখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাদিতে লাগল।

বাণীরত আশ্চর্য মানব। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি গম্ব হরে বসে রইলেন। এমন একটা দুর্ঘটনা। তবু চোখে এক কোঁটা জল পড়ল না। ভাবলেনহীন দাঁড়। বাপেব এমন শূন্যে গম্বীর মর্মে কিরণ জন্মে দেখেনি।

তবু সে একবার ভবে ভবে বলল, 'তুমি এমন হুপ করে বসে থাকবে বাবা? এখনও তো অনেক কাজ। আমার বাকী মন খারাপ হবারি?'

বাণীরত চৌকি ফাঁক করে একটু হাসলেন। কেমন পাগলের মত হাসি। চোখ দুটো বড় বড় করে ছেলের মতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেমন অশ্লীল ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। 'আমি তোকে বলিনি? হুটা বেজেছে কিরণ। এবার হুটা বেজেছে। আর দাঁড় কবিস নে বাবা। তুমি তো ডাকাতের চন্দন-পথে পাড়িয়ে দে—।'

মা-বাবাকে প্রায় জোর করে বারান্দার এনে কিরণ আর একবার ঘরের ভিতরে ঢুকল। একটা শাদা চাদরে মৃতদেহটা ঢাকতে গিয়ে সে কতক্ষণ ছোট বোনের মতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'তুই হুস করলি বিপ্লব। অকারণে মা-বাবাকে এত দুঃখ দিলি। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেছিলাম বে। এই কলঙ্কের কথা কারো কানেও পৌঁছে পোত না। মিছিমিছিম সব ভেঙে দিয়ে অকালে চলে গেলি—'

শব্দ পাড়ার ছেলেরা নয়। পরিতোষ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করল। সমস্ত দিন চুপেচুপে। কাটা-ছেঁড়া, পোস্তমটের হাওয়া। সমস্ত কাজ ছুঁকিরে কিরণ যখন বাড়িতে ফিরল, তখন অনেক রাতের। প্রায় দুঃখত শব্দ। এগারোটা কখন বেজে গেছে।

পরের দিন সকাল হতেই বাণীরত আশ্চর্য হয়ে উঠলেন। তিনি আজই চন্দন-

পথে থাকেন। কলকাতার আর এক মৃতদেহও নয়। অবশ্য দেবার করকটা দিন থাকি ছিল। বাণীরত তাই কোম্পানীকে চিঠি লিখলেন। আর থেকেই তিনি রিটার্ন করিতে গেল। এই শব্দে আর একটা দিনও থাকবার অভিযুক্তি নেই। মনোরমা ছুকে জোর প্রার্থনা মনোরমার করল।

চন্দনপুর্বে যেতে মনোরমার এগল আপত্তি নেই। কি হবে কলকাতার থেকে? অমির বারিক লেনের এই রাস্তাটা তাকে হাঁ করে গিলতে আসছে। সমস্ত ঘরে হিন্দু আর বিপ্লবের হাজার জড়িত। মনোরমা কোনদিকে তাকাবেন? কেবল তার কামা পাছে। এখানে থাকলে সে নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে।

স্টেশনে অনেক এল। অকিলের আদ-নাথবাবু আরো দু-তিনজন সহকর্মী। পাড়ার কণ্ট ছিলে। এবং পরিতোষ। কিরণ তাদের সঙ্গে দু-একদিনের জন্য চন্দনপুর্বে যেতে চেরোছিল। কিন্তু বাণীরত মালি হননি। এক রাতিরেই তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। কত বড়ো। চুলগুলি উস্কাখুস্কা, নিশ্চাপ দাঁড়। যেন অন্য মানব। ভীষণ খটখটে, শব্দ মেকাজ। স্টেশনেও বসলেন—'তোমার বাবার প্রয়োজন নেই। আমরা বড়ো-বড়ি দাঁড়ি কেতে পারব। আর যিহেন তো নয়। নিজের গারে যিহের বাজি। অত চিন্তা-ভাবনার কি আরহে?' একটু থেমে ছেলেকে সাবধান করে বললেন—'তুমি কলকাতার বেশীদিন থেকে না। পাবলে জন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে বেও, বরকলে?'

পরিতোষ শব্দে পেরে বলল—'যা মেসোমশার আমি ওর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। দাখিলেদের কাছে, বেশ বড় চা-বাগানের হাসপাতালে। ভালো মাইনে। তাছাড়া ফি কোর্টের। কিরণ রাজি আছে।' মনোরমা গাড়ি থেকে মূখ বাড়িয়ে বলল, 'তুই চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছিস কিরণ? কই আমাকে তো কিছু বলিনি?—'

—'পবে তোমাকে চিঠি লিখতাম মা', কিরণ মৃদু হেসে জানাল।

মনোরমা হুপ করে রইল। ছেলের মূখ-খানা যেন বড় সরু। আর কি রকম রোগ্য হবে গেছে। চোয়ালের হাড়গুলি স্পষ্ট। কে জানে ওব মনে কিসের দুঃখ। বা চাপা ছেলে। মূখ ফুটে তো বলাবে না। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, নইলে হঠাৎ চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যেতে চাইবে কেন?

ট্রেন ছাড়ল। বাণীরত মনোরমার কাছে দাঁড়িয়ে। ওরা সন্ধ্যা হাত মাড়ছে। একদিন পরে কলকাতা ছেড়ে তিনি সত্যি চলেছেন। ভবেছিলল কত আনন্দ করে ছেলেরেরের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। এমন দীনহীন প্রিয়ানন্দ হৃদয়ে তাকে বিহার নিতে হবে, একথা কোমোদিন স্পষ্টেও মনে হয়নি।

শব্দেব মনোরমা। অল্প অল্প প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। কাকিটো শব্দ করে শোনার গাড়ি

চলছিল। এদিকে বাস কাটা শেষ। দুপাশে ন্যাড়া মাঠ। কোথাও মোরাম মাটির অর্ধের প্রান্তর। ছোট একটা জলসের মধ্য দিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে পৌরসে এল। পথের ধারে খেজুর গাছ। মোসা, ডিলিডেন ছেলের গলার, বড় একটা মানদিলির মত গাছের মাথার ছেজুর ফলের হাড়ি ঠাকসো। তার বাবার এক পিসী ছিল। বসে গান্ধালা বড়। ছেলেরেরের বাণীরতকে সে বলত,—'খেজুর গড় পুজোর আগে মা, জান তে তাই?'

বাণীরত প্রশ্ন করতেন,—'কেন ঠাকসো?'

—'কেন আবার? খেজুর গাছের গলা কেটে দিলে তবে তো রস পড়ে। সেই রস থেকে গড়। তাতে কি কখনও ঠাকসের পুজো হয়?'

কতদিনের কথা। কুলাশাভরা পিঠের সকালের মত যেন আবহা দেখা যায়।

মনোরমা চারপাশে তাকিয়ে দেখাছিল। অনেকদিন সে গ্রামে আসেনি। কি গাফ নীল আকাশটা। কত গাছপালা, উন্মত্ত প্রান্তর। দুই হাতীর পিঠের মত শব্দনিয়া পাহাড়ের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। বিপ্লব থাকলে এতক্ষণ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ত। হরতো আত্মরসে গাম করত। প্রজাপতির মত এমন সুন্দর মেয়েটা। মনোরমা মূখ ফিরিয়ে আঁলের কোলে চোখের জল মূহুতে লাগল।

শিবচন্দ্রের হীরালীল সেস লাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গরুর গাড়িতে নতুন মানব দেখে সে তাড়াহুড়া এগিয়ে এল। কাছে এসে চিনতে পেরে বলল—'তাহলে গ্রামে বাস করতে চলে এলেন?' তাবপর ছইয়ের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'তা আপনারা বড়লেন? ছেলেমেয়ে কই?'

বাণীরত গাড়ীর মূখ জবাব দিলেন,—'তুমি পরে এস হীরালীল। সব কথা এক সময় বলব।'

কেমন বিবর দাঁড়। কপালে চিন্তার রেখা। হীরালীল তাই আর কোনো প্রশ্ন করল না। সে লাইকেলে চেপে অন্যদিকে রওনা হল।

উঠানে পা দিয়ে মনোরমা কিছুক্ষণ হুপ কবে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটা তার চোখে নতুন লাগছে। মোড়গাটা হরুর পর মনোরমা আর আসেননি। তাছাড়া পুজোর পরেই বাণীরত এসে ঘরবার পারিরে দুঃখাম আর রং করিয়ে গেছেন। সেওরালে কঁকে হলদে রং...কর্ণিশের একটু নীচে পর্যন্ত ঘরেরী বড়ার। তার শব্দরুর আমলে এসব কিছুই ছিল না। একতলা বাড়ি। বাড়িতে, জলের কাপড়ার বিকল রাত। তার কিরণ সময়েও বাইরের সেওরালে রং হয়নি।

মনোরমার মনে পড়ল এ বাড়িতে নব-মুখের সাথে সে উঠানের ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাশেই তাকে বসে করলেন। পাশের-কলার দুঃখ আর আলতা গোলা। মনোরমা তার উপর উঠে দাঁড়াল। একতলার



ওই কোণের ঘরটায় তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। তারপরও এই বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছে মনোরমা। বাণীপ্রভ তখনও বাসা করেননি। ওই ঘোড়ানিমের গাছটা খুব ছোট ছিল। ঝকড়া ফুলওলা দেয়ালের মত এমন প্রকাশ হতে গঠনি।

সমস্ত দিন একটা অবসরভার মধ্যে কাটল। আগাছার জঙ্গল সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। এদিকে সেদিকে যোগেট রয়েছে। কিন্তু বাণীপ্রভের কোনো উৎসাহ নেই। হাতে পায়ে জোর কোথায়? আগে হলে সকালেই লোকজন ডাকতেন। সূর্য মাথার ঊঠে না উঠতেই সব পরিষ্কার। উঠানের একটি ঘোশও বাকি থাকত না।

সন্ধ্যার পর মনোরমা অল্প অল্প গোছ-গোছ শব্দ করল। বিছানাটা খুলতে হয়। জিনিসপত্র এবার সবিয়ে তুলে রাখা দরকার। আরো কত কাজ। কতকাল বাদে শব্দশব্দে ভিটের আল সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়েছে মনোরমা।

বাণীপ্রভ চুপ করে দাওয়ার বসেছিলেন। হঠাৎ স্ত্রীর কামা শব্দে চমকে উঠে

শব্দধ্বনন—কি হল? ওগো কি হল তোমার?

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাণীপ্রভ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। একটা বাধানো ছবির দিকে তাকিয়ে একদিকে করে কাঁদছে মনোরমা। হির, কলিঙ্গ, পদ্মশাশি, দুই-ভাই-বোন দাঁড়িয়ে। বাণীপ্রভের মনে আছে, পঁচ-ছ বছর আগে মিলনের এক বন্ধু ছবিটা তুলে দিয়েছিল।

স্ত্রীর হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলেন বাণীপ্রভ। সন্ধ্যাে বললেন—কেন ওসব দেখছ? মিছিমিছি মন খারাপ হবে।

মনোরমা তার বকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—ওগো, কার জন্যে তুমি এই বাড়ি করছ? এখানে করা থাকবে? শব্দ তুমি আর আমি? তোমার ছেলেরা কেউ এ বাড়িতে আসবে না? আমি কি এখানে একলা পড়ে থাকব?

বাণীপ্রভ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন—আমি বন্ধুতে পারিনি

মনোরমা। যখন ওরা ছোট ছিল, তখন আমরা সবাই এক বাড়ির কথা ভাবতাম। তারপর কখন ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। ওদের মনের মাটিতে নতুন নতুন রংগে বাড়ি তৈরি হল। আমি তার খোঁজ রাখিনি, বন্ধুতে পারিনি। জন্মার জন্মদায়ের বাড়িতে ওরা কেউ বাস করবে না। একলা কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?

অশ্বকার রাতি। কলিকাতার চেয়ে মাঝা অনেক বেশী। মাথার উপর গ্রহ-উপগ্রহ, নির্বাক তারার দল। কিস্তীর্ণ ছায়াপথ আকাশের এক কোণ থেকে অন্য কোণে প্রসারিত। বাণীপ্রভ ভাবছিলেন, এই বাড়িতে তার পূর্বপুরুষেরা বাস করে গেছেন। তার বাবা এখানে জন্মেছেন। এই উঠানের মাটিতে খেলাধুলো করে বড় হয়েছেন। ওই অনন্ত আকাশ, নীহারিকাশ্রয়, গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য-তারার দল। ওরই আড়ালে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষেরা অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলছেন—তুমি আমাদের বংশধর। তোমাকে ভালবাসি। সময় পূর্ণ হলে একদিন আমাদের মধ্যে তুমিও এসে দাঁড়াবে। আমরা অপেক্ষার আছি।

রামাঘরের ঢালার পাশে সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে বাণীপ্রভ মদ হানলেন। আর কয়েকদিন পরে শাদা শাদা ফুলে ভরে উঠবে গাছটা। মায়ের হাতের রামা সজনে ফুলের চর্চাড়ির স্বাদ মনে হল তার। কতদিন আগের কথা। তার মা জিজ্ঞাসা করত—আর একটু চর্চাড়ি নিবি খোকা? তুই ভো খেতে 'ভালবাসিস'। শৌবের স্তম্ভ রাতে মায়ের কণ্ঠস্বর কানের কাছে স্পষ্ট মনে হল।

কখন মনোরমা এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে। বাণীপ্রভ প্রায় ফিসফিস করে বললেন—জানো, ওই সজনে গাছটা আমার মায়ের হাতে লাগানো। এখন কত বড় হয়েছে।

মনোরমা স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। অশ্বকারে তার একটু ভর ভর করছিল।

বাণীপ্রভ স্বগতোক্তি মত বললেন—এস, আমরাও একটা গাছ লাগিয়ে বাই। কোনোদিন ছেলেরা নিশ্চয় এই বাড়িতে আসবে। ততদিনে সেই ছোট গাছটা অনেক বড় হবে। আমরা হয়তো বেঁচে থাকব না। কিন্তু তার নীচে দাঁড়িয়ে ওরা ঠিক বলবে—এই গাছটা আমাদের মা আর বাবার হাতে লাগানো। ছায়ার বসে আমাদের স্নেহ-ভালবাসার কথা ওরা অন্ততঃ একবার স্মরণ করবে।

কোথার দূরে একটা রাতজাগা পাখি ককল শব্দে ডেকে উঠল। বাণীপ্রভ স্ত্রীকে আর একটু কাছে টেনে নিলেন। নক্ষত্রের আকাশ। মৌন রাতি ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল। নিশ্চয়, স্বপ্নমত গ্রাহ। আর সেই অশ্বকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদের শব্দ কামনার ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা জানাল।

(শেষ)

# বিনামূল্যে!



## একবারে নতুন ফরহ্যাঙ্গস পুস্তিকা “দাঁত ও মাড়ির যত্ন”

তথ্যপূর্ণ এই বর্তমান পুস্তিকাটি মিন, বিনামূল্যে! এই ফরহ্যাঙ্গস আজই তবের পাঠিয়ে দিম।

ম্যানার্স ডেটাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাংক নং: ১০০৩১, বম্বে-১  
অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে এক কপি “দাঁত ও মাড়ির যত্ন” নামে ফরহ্যাঙ্গস  
পুস্তিকাটি পাঠান। এই সঙ্গে ডাক খরচ বাবদ ২৫ পয়সার টিকিট পাঠান।

নাম \_\_\_\_\_ বয়স \_\_\_\_\_  
ঠিকানা \_\_\_\_\_

অনুগ্রহ করে যে তারিখ চান তার নিচে দাগ কেটে দিন: ইংরিজি, ফিল্মী, মারাতী,  
উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, অরিন, তেলুগু, মালয়ালম, কান্নাডী। A 78A

ফরহ্যাঙ্গস-টুথপেস্ট-এক দাঁতের জরুরের তৈরী।

100F-152 BEN

# নেবুতলার সেই দঃসাহসী নায়ক

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার



## নারায়ণ দত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ। কারাক-পুত্র বংশ কয়েকটা সেনাবিদ্রোহ হয়ে উঠে। কিন্তু ভারতজোড়া সিপাহী বিদ্রোহ এখনও। বারো অশ্বপায়ে ফেটে পড়ে নি। পাইকপাড়ার সিংহীরা, কলকাতার মাস্তুলার মাস্তুল, এবং বেহুলের বংশ কয়েকজন মাতঙ্গররা মিলে মাত্র কয়েকটা বছর আগে মেডিকেল কলেজ বসিয়েছে। মধ্যসূচন দেশে রাক্ষস দে প্রমথেরা মড়া কেটে মৃত্যুদণ্ডে শলাবিদ্যার নববংশের সূচনা করেছেন। ডাক্তার ভোলানাথ বসু, 'টাগোর কলার' হয়ে বিলেত ঘুরে এসে সুকিয়া নেশের ডিপেন্সারী আর হাসপাতালের মার্কেন্ট-সিপারিয়েন্ডেন্ট হয়ে বসেছেন। সেও কয়েক বছর হয়ে গেল। সারা দেশ থেকেই ছেলেরা পাঁচি গাউ এগিয়ে আসছে। মেডিকেল কলেজে পড়ার বলে।

সেই সময়ের ঘটনা। 'সেদিন হয়েছে' ক. আউটডোর ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার অধ্যাপক রাস নিচ্ছিলেন। ফিফথ ইয়ার রাস। ছাত্ররাও অধ্যাপকের সঙ্গে রোগীদের পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় আরচণে রোগের চোখ ও আলোকতত্ত্ব সম্পর্কে বেমজা ব'লকটা প্রশ্ন করে বসলেন। ছাত্ররা ত থ। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু জবাবের কোন কিসারা করতে পারলে

না। প্রশ্নটা ভার হয়ে যেন সারা ক্লাসটায় বুক বসে বইল।

এহেন অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিলে এক নাটকীয় ঘটনা। অপেক্ষমান রোগীদের ভিড়ে সেদিন একটা রোগীপান্য ছেলে বসেছিল। এসেই কলকাতার নেবু-তলা থেকে। এসেছে তার এক দুস্থ আত্মীয়কে সঙ্গে করে, তার চোখ স্ফীত হয়ে দেরি বলে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সেই বেপারেরা ছেলেটি বলে উঠল, সার যদি অনুমতি করেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ইংরাজ অধ্যাপক আর বিমম্বিত হয়ে চোখপোশো সব একসঙ্গে গিয়ে পড়ল নেবুতলার সেই সাহসী ছেলেটির দিকে। কিছু-বা হাজিরের হাঙ্গি ভেসে উঠে থাকবে ডাক্তার আরচণের মুখে। বললেন 'ইয়েস, গেস'। অপরক্ষণ রোগী, জাট সবাই নতুন করে 'তাকাল' অচিনা ছেলেটির দিকে। কারও চোখে কৌতূহল - 'সেটা ই বেশী, কারও বা বিদগ্ধ কাবও ল'ল, বিস্ময়।

আউটডোরের বিশাল হলঘরের বিপুল জনসমষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি কিসা বিদগ্ধ আলোকবিজ্ঞানের 'সেই' কঠিন প্রশ্নের সঠিক সরল জবাব দিয়ে দিলে। বিস্ময় থেকে এবার কৌতূহলের পালা। কে

এই ছেলেটি? কিন্তু কেউনগরের এক-কলের সিভিল সার্জন ডাক্তার আবচণ ছেলেটিকে আরও ব'জিয়ে নিতে চাইলেন। তাকে আরও প্রশ্ন করলেন তিনি। আলোক-তত্ত্বের দুরূহ থেকে দুরূহতর প্রশ্ন। আর জবাবীলার সেগুলিও নিভুল জবাব দিতে লাগল নেবুতলার সেই প্রাণত্যাগ তরুণ। এবং শেষবেশ অধ্যাপকের অনুবোধে ফিফথ ইয়ার ছাত্রদের সামনে চক্ষু ও আলোকতত্ত্বের ওপর একটা 'লেকচার'ও দিয়ে ফেলল সে সেদিন বিশ্বপ্রহরে।

অচিরেই অবশ্য জনা গেল, নেবুতলাব ছেলেটি আর কেউ নয় মহেন্দ্রলাল সরকার। মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তবে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষের। যদি বাড়ী পাইকপাড়া। পাঁচ বছর রাস বাবা মারা গেলে মারবে হাত ধরে এসে ওঠেন মামার বাড়ী নেবু-তলা। মাও এককালে গত হলেন। কিন্তু মৃত্যুর জ্ঞান হল না। মাতুল গরীব কিন্তু আটকাল না লেখপড়া। হেমনর মকল পিছনে ফেলে সত্যপিত পদক্ষেপে চুকলেন হিন্দু কলেজের মস্ত গাম আর গণিক খিলানের ওলা দিয়ে। কিন্তু সেখানেও ক্ষেমন যেন মন বসল না। মহেন্দ্রলাল তাঁর বিশাল স্বমতি পূর্ণাঙ্কলেন না। এলেন মেডিকেল কলেজের চক্রে। আঠারশ পঞ্চাশ সাল।

রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরে পটীর কড়ীতে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। দিকে দিকে নীল বিদ্রোহের লাল আগুন জ্বলে জ্বলে উঠেছে। হরিণ মন্থেন্দ্রো তার কাগজে চুটিয়ে সাহেবদার সেনাপ। বাঙলা ছায়খার করার খবর ছাপছেন, 'বেংগলী'তে কলম ধরেছেন গিল্লি খোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরোলেন—এল-এম-এস। আঠার'শ সপ্ত। বড়ন তিনেকের মধ্যেই এম-ডি। কলকাতায় স্থিতীয় এম-ডি। প্রথম চন্দ্রকুমার দে।

এক মহেন্দ্রলাল ডাক্তার হয়ে বসতে যা দেবী। দেখতে দেখতে জোর প্রসার। একেবারে এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম। নাইবার খাবার সময় নেই—এত নামডাক। হাত সেন জাদু আছে। 'দিকে দিকে নাম-বশ ছড়িয়ে পড়ল। মহেন্দ্র সরকার ত নয়, শ্বিতীয় ধর্মবতরী। নাম শুনাই যেন রোগীর অর্ধেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়, ওষুধ পত্রের কথা। এমনি সুনাম।

এহেন সময়ে ডাক্তার সূর্যকুমার গুণ্ডিত চক্রবর্তী এগিয়ে এসে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শাখা খুললেন বাংলা-দেশে শহর কলকাতায়। কিন্তু মহেন্দ্র সরকার ছাড়া কি কোন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হয় এদেশে? কাজেই মহেন্দ্রলালও এলেন এই সংস্থায়। এবং সভার উদ্‌যোজনী অনুষ্ঠানে গুরুত্ব এক বক্তৃতা দিলেন। সার-গর্ত ভাষণ। ভাতে অ্যালোপ্যাথি সায়ন্সের ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ আর অবৈজ্ঞানিক ও হাড়ভেঙে হোমিওপ্যাথির নিদারুণ নিন্দা। সদা এম-ডি হয়ে বেরিয়েই অ্যালোপ্যাথির খণ যেন এমনি করেই শোধ করতে চাইলেন মহেন্দ্রলাল।

আর তাই নিয়ে লাগ-লাগ ভেঁসিক নাটকের সুরু। সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট চোখে পড়ে থাকবে খোঁজার সেকালের বিখ্যাত মানুস রাজেন্দ্র দত্তর। অকুর দত্তের বংশের ছেলে তিনি। ছোটবেলা থেকে নান্য স্কুলে পড়ে হিন্দু কলেজ মায় মেডিকেল কলেজ পাঠ নিয়ে, বোধকরি সাঙ্গ নাকশী, তখন মনেপ্রাণে হোমিওপ্যাথি করছেন। মহেন্দ্রলালকে চিনতেন তিনি। তার বক্তৃতার রিপোর্ট পড়েই আর থাকতে পারলেন না:

মহেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'এক বলেছেন আপনি?' বড়ভক্তের দাঁধ' সপান-উতোর। এই সময়ে আর একটা ঘটনা ব্যাপারটাকে বেশ ঝোঁলো করে তুললে। 'ইংল্যান্ড ফিল্ড' কাগজের মস্ত ইংলিজিনবিশ সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র একদিন পালকী চেপে এসে হাজির মহেন্দ্র সরকারের বাড়ী। হাতে একখানা ইংলিজ বই, মরণান সাহেবের লেখা—'ফিলজফি অফ হোমিওপ্যাথি'। সরকার মশারকে বললেন কিশোরীচাঁদ—একটা কাজ করতে হবে মহেন্দ্রবাবু। বইটার একটা কড়া 'রিভিউ' করে দিতে হবে আমার কাগজের জন্য।

সেদিন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের কথা নিয়েই ফিরলেন কিশোরীচাঁদ। কিন্তু কি যে বিপদের মধ্যে ফেলে গেলেন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে তা বাদি জানতেন! তার চিন্তাধারায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। 'হোমিওপ্যাথি' দর্শনের সঠিক সমালোচনা করতে ধলে তাঁকে হোমিওপ্যাথি বিশদভাবে জানতে হবে। ভালো করে জানতে হলে তার প্রয়োগের ফলাফল লক্ষ্য করতে হবে। নান্য পুথ্যঃ। সেই ভাবা, সেই কাজ। বাড়ীর কাছেই রাজেন্দ্র দত্ত। তারই শরণাপন্ন হলেন। হোমিওপ্যাথিতে কি কি রোগ কেমন সারে তা পরীক্ষণ করতে লাগলেন বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল। এবং এক সময় হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির ওপর তার বিশ্বাস জন্মে গেল। মহেন্দ্রলালের নিজের ভাষণঃ 'আই সিজড্ টু থিন্ক হোমিওপ্যাথি ওয়াজ দি ব্রেস্ট হামবাগ দ্যাট ইট ওয়াজ রিপ্রেজেন্টেড।' শিবনাথ শাস্ত্রীও একই কথা বলেছেন : 'হ্যানিম্যানের অব-নিষিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল।'

এই ব্যাপারে আরও অনেক বিদ্যা-গণের মশারকে টেনে আনেন। বিহারীলাল সরকার মশারের গুপ্ত এটা। কাজ মশারকা-নাথ মিত্রের তখন ভারী অসুখ। মহেন্দ্র-ডাক্তার গিয়েছিলেন 'কলে'। গিবে দেখেন বিদ্যাসাগর মশারও এসেছেন। মশারকানাথ বন্ধু,লোক। কাজেই অসুখের খবর পেয়েই কার্ণাভলম্ব না করে দৌড়ে আসবেন, এ আর আশ্চর্য কি : মহেন্দ্রলাল রোগী দেখলেন। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। তারপর ফেরার উদ্দেশ্য। তিন নিকের ঘোড়া গাড়ী। বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'আবেদা, নাকি : বিদ্যাসাগরও অনেক-কাল এসেছেন। ফিরবেন : ভাবছিলেন। বললেন, চম। দুজনেই গাড়ীতে এসে চাপলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

আর সেদিন সেই গাড়ীর মধ্যে বাইরের ঘোড়ার কুরের একটানা টগবগ টগবগ শব্দের সঙ্গে পাখা দিয়েই বাকি একটো জোর তর্কের ঝড় বয়ে গেল। এবং তারই তলজ্বলিত হিসেব নেওয়া হল এক ঐতি-ক্রাসিক সিদ্ধান্ত। অ্যালোপ্যাথির মস্ত ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার হোমিওপ্যাথিকে বাকি হয়ে দেখতে রাজী হয়ে গেলেন। মহেন্দ্র-লালের বৈজ্ঞানিক মন না স্বীকার করে

প্যারেনি কার্যকারণে বাই মেলে হোমিও-প্যাথির গণ তিনি মেনে লেবেন। বিহারী-লাল লিখেছেন : 'গাড়ীতে বিদ্যাসাগর ও মহেন্দ্রলাল সরকারের মধ্যে হয় ক্রমান-বাদানুবাদ। বিদ্যাসাগর বলেন যে, হোমিও-প্যাথিও বখেট উমত চিকিৎসা।' এবং মহেন্দ্রলালের উচিত সে বিদ্যা শিক্ষা করা। মহেন্দ্রলাল প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাড়বার পায় নন। অবশ্য তার কারণ ছিল। একসময় বিদ্যাসাগর নিজেই মাধার বন্ধুগায় বিবম ভুগেছিলেন। কিছুতেই ভালো হয় না। এ ডাক্তার, সে ডাক্তার, মায়-খাবারাজী। সব বিফল। রোগের স্বন ফোন-কমেই সুখা হা হল না, রাজেন্দ্র দত্তর কাছে হাজির হলেন বিদ্যাসাগর। শিশির পর শিশি ওষুধ খেয়ে যা হয়নি, এক ডোজ হোমিওপ্যাথি পরিমায় তাই সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগর সেই থেকেই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করতে সুরু করেন।

শুধু নিজের ব্যাপারেই নয়। রাজকুম বন্দোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের পুরণো বন্ধ। তিনি একবার দারুণ 'পাইলস'এ ভুগে-ছিলেন। ওষুধে ডাক্তারে মেলা বসে গেল। কিন্তু নিরাময় দূরমস্ত! অবশেষে সেই অগতির গর্তে হোমিওপ্যাথি। বাজকুম দাঁবা ভালো হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগরের আস্থা বেড়ে গেল। তারপরও বিদ্যাসাগর স্বয়ং বাজক-বই নিয়ে বসে পড়েন। সে গুপ্ত : অজানা নেই। তবে এই বিদ্যা প্রচার করতে ধলে কোন দিকপাল প্রতিভার ডাক্তারের মদত চাই। 'প্রাকটিক্যাল' মানুস বিদ্যা-গাগরের সেটা বুদ্ধিতে কণ্ট হরনি। আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডির মধ্যে সেই ঈশ্পিত মানুসটিকে শেষে থাকবেন তিনি। এবং সেদিনের সেই আলাচনার সূত্রে তার মনোবাছা পূর্ণ করে নিলেন তিনি!

অবশ্য মহেন্দ্রলাল ছাড়াও সেকালের তাবড় ডাক্তার — বিহারীলাল ভাদুড়ী অন্নপূর্ণ খাস্তগীর—অনেকেই তাঁ-হোমিওপ্যাথি করতে উৎসাহিত করেন। এবং এটা শুধু বিহারীলাল সরকার বা ডাউচরণ বন্দোপাধ্যায়ের কথা নয়। ক্ষুদি-রাম বসুও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মহেন্দ্র ডাক্তারকে ত তিনিই একরকম হোমিওপ্যাথিতে হাতেখড়ি দেন।'

রামগোপাল সান্যালের কেভাবে রয়েছে মহেন্দ্র সরকার নিজেও এ ব্যাপারে বিদ্যা-গাগরের প্রভাব স্বীকার করেছেন। আরও একটা ঘটনার কথা বলেছেন তিনি। বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম রচয়িতা সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মাথা, রাজা রাধাকান্ত দেবও নাকি একদা হোমিওপ্যাথিতে খুবই উপকা-পেরেছিলেন। মহেন্দ্রলাল লিখেছেন : 'দি কেস অফ রাজা রাধাকান্ত, দি কনজারস অফ বিদ্যাসাগর এন্ড দি পার্সিসিসেট এ্যাপীলস অফ বাবু রাজেন্দ্র ফর এ ফেরাং ফিয়ারিং এন্ড এ্যাবন্ড অল এ ফেরাং ট্রায়াল, কোরসড হোমিওপ্যাথি আপন রাই-এ্যটেনশন।'—অসমর্থ, 'রাজা রাধাকান্ত



দেখেন কেস বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ এবং বাবু রালেন্দ্র দত্তর ব্যাপারটাকে কেবল দেখবার এবং সর্বোপরি পরখ করে দেখার জন্যে বারবার অনুরোধ হোমিওপ্যাথির প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে বাধ্য করে।

অবশ্যে কোন প্রভাবটি বেশী জোরালো—রাজ্য স্বাধীনতা পেরে কেস বিদ্যাসাগর না রাজেন্দ্র দত্তর 'অনুরোধ উপযোগ' না সবকয়টি প্রভাবই একই সঙ্গে মহেন্দ্র সরকারকে উৎসাহিত করেছিল, বা মহেন্দ্র সরকার নিজেরই অভ্যাসে অন্য কোন যুগপ্রভাবে পড়েছিলেন সেকথা হালফ করে বলা শক্ত। তবে এই সব সত্যাসত্য কৃষ্ণাঙ্গার মধ্যে একটা খটনা কিন্তু দিবালোকের মত স্পষ্ট। বহু সময়ের অ্যালোপ্যাথি প্রাকটিস হেড়ে ডাক্তার সরকার একটা হোমিওপ্যাথি সুরু করে দিলেন। এবং কোন ঢাক ঢাক গড় গড় নয়। লড়াকিরে হুরিরেও নয়। যেই হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক সারবত্তার তাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন হল। তিনি একবারে ডব্বা বাজিয়ে সাফল্যের সেকথা ঘোষণা করলেন। এবং সে কাজ করলেন খাম অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদেরই এক বিরাট সড়ক। সেটা সেই ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখার ৮৩র্থ বার্ষিকী সভা। আঠারশ' সাওয়াট। বোলই ফেরয়ার সঞ্চায়। শ্বান, মেডিকেল কলেজের থিয়েটার। অদূরে গোলাদিঘার আসন্ন শীতের রাতির অন্ধকার ধীরে ধীরে জমতে সুরু করেছে। পটল-ডাক্তার বাড়ীবাড়ীতে শাঁখ বাজছে। কোথাও বা কাসিরঘন্টা। তখনও বেলেগাছিয়া ভিলাতে হিন্দু মেলায় অধিবেশন বসেন। তবে বেশ হোজজোর চলছে। বাঙালী মৌজ করে অগতিসংহীতলোভার 'রোম্যান্স' পড়তে সুরু করেছে। সেই অবকাশে মেদিনের সভায় মহেন্দ্রলাল কলিকতা মোকদ্দম কথা বলে বসলেন। 'তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজনীনবিশিষ্ট কতকগুলি দোষকর্তন করিয়া হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর বস্তুস্বত্ব প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন।' দুরারোগ্য কলেরা রোগে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ 'অরসেনিক' ও 'উরারামের' সফল প্রয়োগের প্রমাণ দিলেন তিনি।

আর লাগে কোথা? কেউতে সাপের লেজ পা। মহেন্দ্র সরকার কতটা শেষ করতে পারেন—কিন্তু ডুজপোয় মত সাহেব ডাক্তাররা সব কেসিফাই করতে লাগল। লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল। তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যপট ডাক্তার ওয়েলারের। স্বেপে গিয়ে একেবারে-হা মর তাই বলতে লাগলেন মহেন্দ্র সরকারকে। তবে নেবুডলার সেই দুঃসাহসী আত্মক হুমকির পর নন। তাঁর বহুব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দক্ষা বৃদ্ধি দেখাতে উঠলেন তিনি। ডাক্তার বাই না ওঠা, হিন্দু প্যাট্রিয়টের রিপোর্টার তাঁর প্রতিবেদনে লিখলেন : ওয়েলার টেম্পে চাপড়ে অসভ্যের মত চিৎকার করে উঠলেন, 'পটল ডাক্তার সরকার, ইফ ইউ ডাক্তার এ ওয়া'র্ড মোর, আই উইল ক্রাইট ইউ আউট অফ দিস বম'—খাচ্ছে ডাক্তার সরকার আপনিস বদি

আর একটা কথা হলেন, আপনাকে আমি এই মর থেকে বার করে দেব।' সত্যি বাক্যের তিনি আরও শাসতে লাগলেন, মহেন্দ্রলাল বাই এই অ্যাসোসিয়েশনের কাঁচা প্রেসিডেন্ট থাকেন তিনি এই সভা স্থগিত করবেন। তবে সব ডাক্তারই যে ওয়েলারের মত বেহুদ পণ্ডেলি করছিলেন, তা নয়। অনারও ছিলেন। আর এক ইংরেজ ডাক্তার কলেন বললেন, তা কি করে হয়। এ সভার মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁর সমালোচনার জবাব দেবার অধিকার দিতেই হবে। ডাক্তার ইউ মার্ট সর্বাধিকার চক্রবর্তী প্রমুখেরা কিন্তু ডাক্তার ওয়েলারের কথায় মার দিলেন। ডাক্তার শ্যামাচরণ মধুজে করলেন মহেন্দ্রলালকে সমর্থন।

এমনি করে রাতের নাটক জমে উঠল মন্দ নয়। কিন্তু নেবুডলার নামক ত মাথা হেঁট করার বাম্পা নন। তর্কবিতর্কের চাপানউতোরের মাঝে অনেক রাতে সভা গখন জাঙল, শীতের কলকাতা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কেবল সভা-ফের ডাক্তার বাবুদের কারও পাক্ষী বেরারাদের চাপা টানা সুর, কারও ফটিনের চাকর শব্দ, ঘোড়ার কন্ডের আওয়াজ পটলডাক্তার পাতলা-ঘুম বাবু-বাবুদের কারও কারও খুঁমের ব্যাঘাত করে থাকবে। তবে সেই সভা থেকে মহেন্দ্রলাল যখন ফিরলেন, সসম্মানেই ফিরলেন। কেননা, তখনও তাঁর বিরুদ্ধে হোমিওপ্যাথি সমর্থনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে সেটা মার করে দিলেন জন্যে। অন্যতরাল পরেই তাঁকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আর সেই সঙ্গেই সুরু হল মহেন্দ্র সরকারের ওপর অত্যাচার! একেবারে একঘরে করার ব্যবস্থা। মহেন্দ্র সরকার নিজেই থাকে বলেছেন, 'প্রফেশনাল একসকমিউনিকেশন'। শহুরে কলকাতা সৈকি ভোলপাড়। কাগজে কাগজে উদ্ভাস্ত আলো-টনা। সাহেব অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের মহেন্দ্রলাল সরকারের ব্যতুলতা নিয়ে বহুটা দিনে লাগলেন মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন গরম গরম নামা বৃত্তির বন্যা বইয়ে দিলেন। তাঁর পৌ ধরে কাগজে লিখতে লাগলেন ডাক্তার ইউআর্ট। কিন্তু মহেন্দ্র সরকারের কোন প্রস্পেক্ট নেই। নতুন চিকিৎসায় সহজেই নিরাসয় হচ্ছে রোগীরা। হোমিওপ্যাথি গরীবের চিকিৎসা। তাতেই তিনি খুঁশি। মশগুদ। সেই আনন্দেরই তিনি বিভোর। সকল বাধাবন্ধ হেলায় তুচ্ছ করে সেই দুঃসাহসী মানবটি স্থির কিস্বাসে ম্বাস্ত বিবেক নিয়ে এগোতে লাগলেন। একটুও টললেন না।

টললেন না শত অত্যাচারও। উনিশ শতকের বাংলাদেশের শ্বিতীয় ধ্বংসাত্মক মহেন্দ্র সরকারকে একঘরে করা হল যাতে তাঁর কাছে রোগী না যায়। তাঁর ডাক্তারিক বন্ধ হয়ে যায়। মহেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন, প্রফেশনাল কমিউনিকেশন ইজ স্ট্রং এগেনস্ট মি। এন্ড ইজ লাইফল টু বি শ্রপার।

এটার ওয়ানস আমস সীমস টু বি এগেনস্ট মি। অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে একই জীবিকার জোট বেশ কবর। কালক্রমে এই জোট আরও জোরদার হবার আশংকা। আমার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই বেশি মড়গহস্ত। অবস্থা এমনি সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, মহেন্দ্র সরকারের কাছে একদম রোগী আসত না। সেদিনের দুঃসহ অবস্থার কথা লিখে শিবনাথ শাস্ত্রীমশায় জানিয়েছেন, 'কয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না।' বন্ধুবান্ধবরা ম্বভাবভঙই খুঁবই উৎসব করে পড়লেন। কেউ কেউ হস্ত বা ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। জিগ্যেস করে থাকবেন, এমনি চললে খাবে কি? শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন, বন্ধুটান করে জবাব দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সরকার, 'আমি চাখীর ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব, তাতে কি? কিন্তু সত্যি বা তা ত বলতেই আর করতেই হবে।' করেও ছিলেন তাই। শেষ পর্যন্ত এই কঠিন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলা-বাহুল্য, সে লড়াই ফতে করেছিলেন। তাঁর আদর্শ, তাঁর বিবেককে একটুও ছোট, সামান্যতম খর্ব করেননি তিনি। এবং একসময়ে দেখা গেল, সারা দেশের মানুষ তাঁর ইন্সট্রাকশনের মত বাস্তবিক, তাঁর দুঃসাহসী মনকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাচ্ছে। নবযুগের মানুষ মাথা হেঁট করে তাঁকে সেলাম বাজাচ্ছে!

আরও দেখা গেল, বহু দিন যেতে লাগল, নেবুডলার সেই অসমসাহসী নারকের চারিধারে বাঙালীরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'—ইন্ডিগান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালিউভেশন অফ সায়ান্স প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেন তাঁর চিকিৎসা-বিষয়ক কাগজ—কালিকটা জারনাল অফ মেডিসিনে। এই সভার 'প্রসপেকটাস' বেরস হিন্দু প্যাট্রিয়টের পাতায়। বিক্ষিপ্তের নজর পড়ল এই গুরুতর বিষয়ে। তিনি এর বাঙলা করে সেটার

বাংলা ভাষায় একমাত্র 'ইয়ার-বক'

বর্ষপঞ্জী

১৩৭৯ (২৬শ বর্ষ)

চলিত দিনমাস সংগে বিনামূল্যে সম্পর্ক রাখতে হলে যে গ্রন্থ চাই-ই। ৬০টি বিভাগে বিশ্বের সকল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ' ও 'বাংলা পরিচয়' দুটি বিশেষ বিভাগ।

৮০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ টাকা  
ভি. পি. বার ম্বতর

এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং

৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন কলকাতা-৬

সঙ্গে এসেছে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার ওপর একটা প্রবন্ধই লিখে ফেললেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন তাঁর দয়ার ভাণ্ডার নিয়ে এই জাতীয় সৃষ্টিযজ্ঞে। কলকাতার বাঙালী বলতে যারা—তাবৎ সবাই এলেন এগিয়ে। 'ডোনারদের লিপিটতে' বেঙ্গালী কাগজের পাতা ভরে গেল লেখা। পাথুরেঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, জ্ঞান রমেশ মিশ্র, মৌলভী আবদুল লতিফ খান, বিদ্যাসাগর সবাই 'ট্রাস্টটী' হয়ে এলেন 'বিজ্ঞানসভার' মহেন্দ্র সরকারের পাশে। ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল হলেন সভাপতি। তিনিই বিপুল সমারোহে বোম্বাইয়ের বিজ্ঞানসভা ভবনের স্বারো-ম্বাটন করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। মহেন্দ্র-লাল নিজে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন ছবি দেখিয়ে। পরোজ রাগিণীতে সবাই মিলে গান গাইলো : 'বিজ্ঞান সাধনে হও আগুমান, উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত সন্তান।...

হিন্দু-বংশ-সৌরভে ধরা আমোদিত হবে, ভারত-জননী পুনঃ পাইবেন মান।।' 'আঠারশ' ছিরাভর। উনত্রিশে জুলাই। সারা দেশ তখন সাহেবদের অঙ্কুঃ এই মানবটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তাঁর হোমিওপ্যাথির প্রতি আস্থা তখন সারা জাতির। নবযুগের মানবের মনে নব ভাব।

আর এই ভাব নিয়েই নতুন ভাবনা। ভাবনা এই যে নবযুগের এই নবভাব—'ইউজ্যানিজম'ও কি মহেন্দ্র ডাক্তারকে হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট করেছিল? যুগের ছাওয়ার কি কিছু ভূমিকা ছিল এ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে উত্তরণ? উনবিংশ শতকের সেই মানবিকতার চেই যা' বাংলা

সাহিত্যকে জালিয়ে নিয়ে গিরোজিল, চিন্তার, সাধনার শাবন এনৌল, ভা' কি মহেন্দ্র-লালকেও অভিভূত করেছিল, রেহাই দেয়নি? দীনবন্ধু মিশ্র তাঁর 'সুরধনী কাব্য' প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেন মহেন্দ্রলালকে। উৎসর্গ পত্রে দীনবন্ধু একটি ঘটনার উল্লেখ করেন :

'কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক-দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগাল লোক,—বাংগালি, হিন্দু-স্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডারমান রহিয়াছে : তুমি তাহাদিগের পীড়া নিবরণ করিয়া ওষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ একপাশে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীত মনোরম—ইচ্ছা হইল আলোচ্য লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই।' বলাবাহুল্য, 'সুরধনী কাব্য' সেকাজ করে-ছিলেন দীনবন্ধু। 'ভিষক'-কুল-পঞ্চক-সবিতা' মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে লিখে-ছিলেন—

'নানা বিদ্যা বিশারদ মহেন্দ্রপ্রবর, নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ারসংগর, উষার বসিয়া ঘরে করে বিতরণ অকাতরে দীনবন্ধু, ঔষধ-রতন।' এই যে দীনবন্ধু দয়ার সাগরের ঔষধ বিতরণ—এই যে মানবিকতা, যার কথা মহেন্দ্রলাল তাঁর জীবনবন্দীতে একথা বলেও-ছিলেন যে তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়, রোগীদের যে কল্যাণ হরেছিল, আতের যন্ত্রণার যে শান্তি দিয়েছিল তাঁর তুলনায় তাঁর উপর বিরোধীদের অত্যাচার কিছুই নয়—নাথিং কমপেয়ারড্ টু দি বেনিফিটস্ গাই পেসেন্টস্ এনজয়েড—এটাও বোধ করি তাঁর

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বেছে নেওয়ার অন্য-তর প্রধান কারণ।

বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথি প্রচারের আদ্য-কালে রাজেন্দ্র দত্তর পাশে ছিলেন ডাক্তার বেরিনি। অন্যান্য বিদেশী ডাক্তারদের মতো দেশে ফেরার সময় মোটা টাকার ছাঁদা 'বে'থে নিয়ে যেতে পারেননি এই ডাক্তার সাহেবটি। তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা সভায় দুখে করে মূলে-ছিলেন রাজেন্দ্র দত্ত মশার, কত সাহেব কত বড় বড় টাকার আশির্ভল নিয়ে গেল, আর তুমি বাচ্ছ শব্দহাতে। জবাবে বেরিনি নাকি হেসে বলেছিলেন, 'কে বলে? আমার পকেটে পাঁচ হাজার টাকার চেক। রাজেন্দ্রবাবু, ত অবাক। বললেন, কি রকম? বেরিনি বুঝিয়ে বললেন, মহেন্দ্র বে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছে—তার দামই ত পাঁচ হাজার টাকা! তাঁর সেই বিদায় সভায় বেরিনি নাকি আরও বলেছিলেন, 'স্ব' উঠলে চাঁদের আর দরকার হয় না। মহেন্দ্র সরকার হোমিও-প্যাথির স্ব'।

বেরিনি সাহেবের উপমা মোটেই অত্যাধি নয়। তবে এটা ঠিক এই স্ব'কে কোন সুন্দর সহাস্য প্রভাত সাদর অভ্যর্থনা জানায়-নি। এ্যালোপ্যাথ সাহেব ডাক্তারদের চক্রান্তের ঘন কালো মেঘ, তাদের সংঘবন্ধ আক্রমণের দৃষ্টিরোধকারী কুয়াশা—এই স্ব'র অজু-দয়কে ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছিল। তদু-ধন্যারি পাগল স্ব' বলেই না তাকে আট-কান যায়নি। রোগী বন্ধ করেও না। কেশব সেনের বহুতা, দীনবন্ধুর 'দীন্দপ'গের' অভি-নয়, বঙ্কিমের উপন্যাস বা স্মারকানাথ বিদ্যা-ভূষণের 'সোম প্রকাশের' আবির্ভাবের মতই মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথ আলোচন বাংলাদেশের নবযুগকেই দ্রুত সম্ভব করে তুলেছিল, সন্দেহ নেই।

বেড়ে উঠতে  
অনেক সময়  
লাগবে বলে  
মনে হতে পারে---

কিন্তু দেখতে দেখতেই সময় চলে যায়।

এখনই আপনার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলুন।

কোনো ভাবনা নেই। লোভা এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে গলে যাবেন এবং যে কোম কন্ট্রি সাহায্য দিম। আপনি ব্যাঙ্ক ০, টাকা ভর্য দিয়েই নক লয়ে নিকের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। বড় অমই হোক, নিরমিত অমিরে দেবন—আপনিও ভর্য টাকা এবং ভাড়াভাড়া ব্যাঙ্কে যে আপনি দিজেই অবাক হয়ে যাবেন। এছাড়াও এই ব্যাঙ্কে আরো অনেক বরগের সুবোধ-সুবিধা ও সেবা আপনি পেতে পারেন—

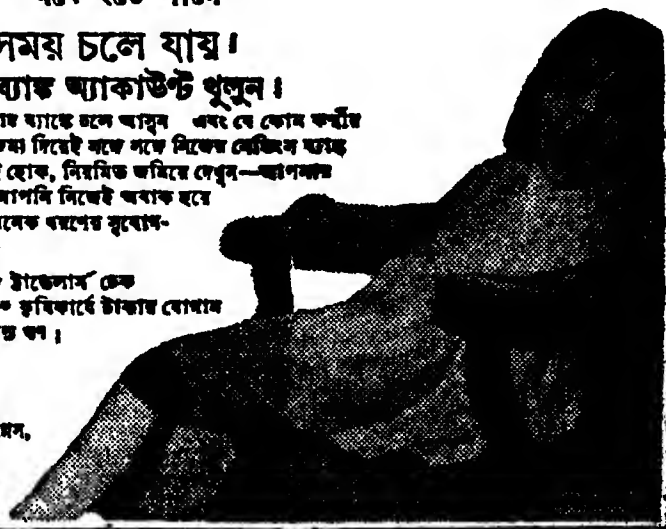
- রেকার্ডিং ডিপোজিট • কারেন্ট অ্যাকাউন্ট • ট্রান্সফার চেক
- ফিক্সড ডিপোজিট • সেক ডিপোজিট অকার • কুঝিয়ারে টাকার বোঝান
- কুহারজন শিরায় অক ৩৭ • সুভিক্তীবিদের অক ৩৭।



এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

বেড অফিস : ১৪ ইতিহা এলভেড রোড,  
কলিকাতা-১

এই ব্যাঙ্কে এসে আপনার আপনজনদের  
বাক্যে জায়েব বলেই মনে হবে।





গত সপ্তাহে এই বিভাগে এক বিশিষ্ট পত্র-সাহিত্যের আংশিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে—এই সংখ্যার তার পরবর্তী অংশ পরিবেশিত হচ্ছে।

১ এপ্রিলের চিঠির শেষে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রেরিত উপহার 'এলিজাবেথান পেরেটস' পেয়ে হলেন লিখলেন—১৬ এপ্রিল সবাইকে সম্বোধন করে—

“ধন্যবাদ, কি সুন্দর বই। আগে এমন সোনার জল দিয়ে মোড়া বই বখনও হাতে করিনি। বিশ্বাস করবেন না হয়ত, বইটি আমার জন্মদিনেই হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনারা বইটির পৃষ্ঠাতেই উপহার-স্বাক্ষর উৎকীর্ণ না করে আলোচনা করে লিখেছেন কেন? পুস্তক-ব্যবসায়ীর মনোভঙ্গী একবারে ফুটে উঠেছে। ভেবেছেন হয়ত সেভাবে লিখলে বইটার মূল্য হাস পাবে। কিন্তু বর্তমান মালিকের কাছে এর দাম বাড়ত। আপনারা নাম সই করেন নি কেন, সবাই মিলে? বোধহয় ফ্রাঙ্ক আপনাদের লিখতে দিত না। ও হয়ত চায় না আর কাউকে আমি প্রেমপত্র দিই!”

সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধু ম্যাকসিনে লিখলেন হেলেনকে ডিয়ার হার্ট সম্বোধন করে :

“আমাদের চমৎকার পুরানো বই-এর এই দোকানটি চমৎকার। একেবারে ডিকেন্সের বই-এর পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। দোকানটি দেখে একেবারে মূগ্ধ হবেন।

ভিতরটা অন্ধকার। দোকানটি চোখে পড়ার পূর্বে এর গন্ধ পাবেন। চমৎকার গন্ধ। ঠিক যে কি বলা সহজ নয়, তবে এতে আছে খলি আর ধূসরতা। বই একেবারে ছাদ ছুঁয়েছে, দেওয়াল আর মেঝে সবই কাঠের। আর বই-এর সেলফ্ কেন শেষ হতে চায় না। তার ওপর অনেক বছরের ধুলো।

একটা লম্বা টেবলে আছে চমৎকার ইংলিশ ব্যালচি, এই সব চিত্রকর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না—আর কিছু সচিত্র পুরাতন পত্রিকা আছে। আমি আধ ঘণ্টা যোরাধুরি করেও আপনার ফ্রাঙ্ক বা অন্য কাউকে দেখতে পাইনি। তবে তখন একটা বাজে—সবাই বোধহয় টীকিনে গিয়েছিলেন। আমি অপেক্ষা করতে পারিনি।...”

১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হলেন ম্যাকসিনেকে লিখলেন : “তোমার মঙ্গল হোক। কি অপূর্ণ বর্ণনা। আমি ভিতর আর আমের না এনে বসেছি, চাই, কোন পদ্যবলে ইশ্বর তোমাকে আমার বই-এর দোকানে পাঠিয়েছেন এদিকে আমি ১৫তম স্ট্রীটে টি, ভি-র জন্য আউটলেটস অব এলেরী কুইনের স্কিপট ভেরী করছি।”

সামরেল পের্পিস-এর ডায়েরী সম্ভবত হলেন চেয়েছিলেন এবং ফ্রাঙ্ক হয়ত কোনো এক সংস্করণ (সংকলিত) পাঠিয়ে থাকবেন—বই ফ্রাঙ্ক পেয়ে হলেন লিখল :

“ফ্রাঙ্ক : এটা পের্পিসের ডায়েরী নাকি। এ কোনো মাতৃস্বর সম্পাদক কর্তৃক

## সাহিত্য ও সংস্কৃতি

### বিশ্ব বছরের পত্রগুচ্ছ—(২)

‘পের্পিস ডায়েরী’র সংস্কৃতির সংগ্রহ। এ বইটিতে থুডু ফেলা যায়।

১২ জানুয়ারী ১৮৬৯-এর পৃষ্ঠা কই? যেখানে তাঁর স্ত্রী একটি জ্বলন্ত শিক নিয়ে বিছানা থেকে উঠিয়ে তাড়া করেছিলেন সেই বিশ্বরূপ-দেওয়া আছে? আপনি আমাকে আসল পের্পিস পাঠান, টাকা পাঠালাম, তারপর এই বাজে বইটা পাতার পর পাতা ছিঁড়ে তাই দিয়ে জিনিষপত্র মড়ক।”

এই সপ্তে আবার সহস্র প্রশ্ন আছে, বড়দিনের জন্য টাকাটা ডিম ডেনমার্ক থেকে পাঠাব না পাউডার করা ডিম? জোট নিয়ে মতামত জানাবার অনুরোধও আছে।

এই চিঠি পেয়ে ফ্রাঙ্ক মিস হানফকে দুটো স্বীকার করে কমা প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন। তিনি বললেন—বিশ্বাস করুন আমি ভেবেছিলাম এইটাই একেবারে নির্ভেল পের্পিস! আমি একটা উপহাস মূল্যের ভালো কপি পেলেই আপনাকে পাঠাব।

এই সূত্রে তিনি জানালেন যে একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী সংগ্রহ থেকে ‘লে হার্ট’ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সপ্তে ভলগেট ও নিউ টেসটামেন্ট।

আর ডিম সম্পর্কে মতব্যা—এখানকার সকলের মত টাকাটা ডিমই ভালো হবে।

বই পেয়ে ভারী খুসী মিস হানফ। তিনি লিখলেন—আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ‘লে হার্ট’, ভলগেট আর ‘নিউ টেসটামেন্ট’ সব এক সপ্তে একেবারে। আপনার হয়ত স্বরণে নেই, প্রায় দু বছর পূর্বে আমি এসব বইগুলির অভ্যাস দিয়েছিলাম। ...সত্যি আমার জন্য যা করছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তা না করে আমি কেবল খোঁচা দিই। চিঠিটার ওপরে একটা কফি চলাকে পড়েছে তার জন্য দুঃখিত।”

এরপর ফ্রাঙ্ক একটি বড় চিঠি লিখে জানালেন যে ডিম যথাসময়ে এসেছে। তার সংগ্রহভাগ দেওয়া হয়েছে জর্জ মার্টিন নামক একজন বয়স্ক কর্মচারীকে, কারণ তিনি অনেক দিন ধরে অসুস্থ। এরপর দোকানের কর্মচারীরা সকলে মিলে একটা ছোট ক্রিসমাস উপহার পাঠালেন বড়দিনের জন্য। একটি হাতে কাজ করা টেবলক্লথ। ক্রিসমাস গিটিংস এবং নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ সেই উপহারের সঙ্গে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানীর নাম লেখা।

এর পরের চিঠিটি লিখলেন ফ্রাঙ্কর স্ত্রী নোরা ডোয়েন ২০শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে, তিনি জানালেন—

“অনেক দিন ধরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো মনে করি আমাদের সংসারে আপনার প্রেরিত উপহারের অংশের জন্য—এখন একটা সুযোগ এসেছে, আপনি নাকি জন্মতে চেয়েছেন যে ভরমাহিলা টেবল-ক্লথের লিনেনটিতে সূচিকর্ম করেছেন তাঁর নাম? কাজটি চমৎকার—তাই না? তাঁর

নাম মিসেস বলটন—তিনি পাশের বাড়ি ৩৬ নম্বরে থাকেন। তাঁর হাতের কাজ এটল্যান্টিক পার হয়ে যাবে শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেন খুব। আমাদের সুখী পরিবারের একটা ফটো আপনাকে শীঘ্রই পাঠাব। আমাদের বড় মেয়ে শীলা গত আগস্ট মাসে বারোয় পড়েছে। সে আমার রেডিও-মেড কন্যা; ফ্রান্সের প্রথমা শ্রী যুগের সময় গত হয়েছেন। আমাদের কনিকা কন্যা মেরী গত বসন্তকালে চার বছরে পড়েছে। শীলা যে কনচেপ্টে পড়ে সেখানকার নান-রা বিস্মিত হয়েছিলেন শীলা যখন আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে শ্বেডজা কার্ড পাঠালো। শীলা বলেছিল ড্যাড আর মামির মাত্র চার বছর বিয়ে হয়েছে। পরে অনেক করে তাঁদের সব বোঝাতে হয়।

আপনি আমাদের নববর্ষের শ্বেডজা নিন। আপনাকে ইংল্যান্ডের মাটিতে দেখবার বাসনা আছে।...

এরপর হানফ তাঁর লন্ডনস্থ বন্ধু ম্যাকসিনকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন—তোমার মার কাছে শুনলাম তুমি নাকি দু'জন নাইলনের জোড়া নিয়ে গেছ লন্ডনে। আমার জন্য চারজোড়া বক-সপে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সকে দেবে। বলবে, তাঁর তিন কন্যা এবং শ্রীর জন্য এই উপহার। ও'রা আমাকে হাতে কাজ করা আইরিশ লিনেনের টেবলক্লথ দিয়েছেন। আমার কাজের জন্য এলেরী কুইন স্ক্রিপট-২৫০ ডলার বাড়িয়েছেন। যদি জন পৃথক চলে তাহলে আমি ইংল্যান্ড যাব এবং নিজের চোখে বকসপ দেখব...তাদের জানাবো না আমার পরিচয়—”

এই নাইলন উপহার পেয়ে ফ্রান্স মহা খুসী। লিখলেন—“কি করে পাঠালেন! অবাক করে দিয়েছেন। আমার মেয়েরা আপনাকে চিঠি দেবে ফিরে করেছে। আপনার অজ্ঞ উপহার পাচ্ছি। কি ধন্যবাদ দেব। যদি কখনও ইংল্যান্ড আসেন তাহলে মতাদর্শ থাকবেন, আমাদের বাড়িতে আপনার জন্য একটি বিছানো পাবেন।”

এইভাবে আরো অনেক চিঠি চলল। অনেক বই সংগ্রহ করল হেলেন হানফ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়া হল না। যে বাসায় তারা থাকত সেই বাসায় সরকার ভেঙে দিচ্ছেন রাস্তা উন্নয়নের জন্য। ফলে নতুন বাড়িতে যেতে হল। সেখানে নতুন আসবাব ইত্যাদি কিনতেই ইংল্যান্ড যাওয়ার জমানো টাকা খরচ হয়ে গেল।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তারিখে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানীর তরফে তাঁদের সেক্রেটারি মিসেস জোয়ান উড হেলেনকে একটি চিঠি লিখলেন :

...৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা ফ্রান্সের নামে পাঠান চিঠি এই মাত্র দেখলাম। দুঃখের সংখ্যা জানাচ্ছি ২২ ডিসেম্বর রবিবার দিন থেকে পরের গমন করেছেন। তাঁর অ্যাপেন্ডিসিস ফেটে যাওয়ার অপারেশন

করতে হয়। দুঃখের বিষয় পেরিটোনাইটিস আক্রমণ করল এবং সার্জিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এই দোকানে চীলশ বছর কাজ করেছেন, তাই এই মৃত্যু মিঃ কোহেনের কাছে বিশেষ বেদনাদায়ক হয়েছে। বিশেষ করে মিঃ মার্কসের মৃত্যুর অপর্যায় পরেই এই ঘটনা ঘটল। আপনার জন্য ‘অস্টেনস’ সংগ্রহ করব কি?”

জানুয়ারী মাসে নোরা একটি চিঠি পাঠালেন হেলেনকে...“আমি চারদিক থেকে ও'র জন্য চিঠি পাচ্ছি। বই ব্যবসারে যারা আছেন তারা সবাই প্রশান্ত জানিয়েছেন। বই-এর ব্যাপারে উনি অনেক জানতেন এবং সকলকে সাহায্য করতেন। যদি চান আপনাকে সেসব পাঠিয়ে দেব। আপনাকে বলতে বাধ্য নেই আপনার ওপর মাঝে মাঝে ঈর্ষা হত—আপনার চিঠি ফ্রান্সের ভালো লাগত, বিশেষ করে আপনার রাসিকতার সঙ্গে তাঁর মনোভঙ্গীর মিল ছিল। আপনার লিপিকুশলতার আমি হিংসা করতাম। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পর-বিরোধী চিরদিন। উনি ভয় এবং সহৃদয় আর আমি সংগ্রামী। সবদাই অধিকার আদায়ের চেষ্টার লড়াই। উনি আমাকে বই বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আমার মেয়েরা ভালো। ওদের জন্য আমি খুসী। ভাবি পৃথিবীতে আরো অনেকেই ত আমার মত নিঃসঙ্গ।”

সেই বছর ১১ এপ্রিল তারিখে নোরা চিঠি লিখলেন তাঁর এক বাণ্ধবী ক্যাথারিনকে—

—জানো, রায়ান আমাকে প্রশ্ন করেছিল—তোমার বড় ইংল্যান্ডে যাওয়ার ভাড়া থাকত, সত্যি যেতে?

একথা আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমি জানি না, তবে কোনো দিনই ওখানে না যাওয়াই শ্রেয়। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি। আমি বিলাতী ছাত্রা হব দেখতাম। ইংল্যান্ডের পথঘাট কেমন, তা দেখার জন্য।

যে ভদ্রলোক আমাকে সব বই বিক্রী করতেন তিনি কয়েক মাস পূর্বে গত হয়েছেন। দোকানের মালিক মিঃ মার্কসও নেই। তবে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানী আজো আছে। তুমি যদি ৮৪, চেম্বারিং ক্রসে যাও তাহলে আমার হয়ে সেই বাড়িটা চূষন করবে। আমি ওর কাছে অনেক ধনী।”...

এইখানেই পত্রগৃহের সমাপ্তি। দুঃখের বিষয় এই চিঠি লিখিত হওয়ার কুড়ি মাস পরে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবসা উঠে যায়, আর ৮৪ নম্বর চেম্বারিং ক্রসের বাড়িটাও নেই, উন্নয়ন ব্যবস্থায় সে বাড়ি ভাঙা হয়েছে।

এই পত্রগৃহগুলির সর্বাঙ্গত বৈ পরিচয় দেওয়া হল তাঁর মধ্যে মানবমনের এক সংগঠন সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্রন্থও সম্রাটের চোখে পড়ে না।

—অজিত

## সাহিত্যের খবর

শিরোনাম : সন্তোষকুমার ঘোষ

প্রায় দু'বছর আগের কথা। সন্তোষ ঘোষের একটা উপন্যাস। সন্তোষ সন্তোষ হে-টে পড়ে গেল। দারুণ সাদা জামালা পাঠকমহলে। বইটির নাম ‘কিন্দু গোলালার গলি’। লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। আর এই আলোড়নকারী উপন্যাসটি হল লেখকের প্রথম উপন্যাস। সেই আপন সৃষ্টির স্বয়ং নায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ পেলেন এবারের সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার। ১৯৭২ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের জন্য এই সর্বভারতীয় সাহিত্য পুরস্কার।

শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেশ্বর মা-কে’ হল তাঁর আকাদেমি সম্মানিত উপন্যাস। অনন্যকল্পণীয় রীতিতে লেখা বাংলাভাষার অনন্য নজির এই উপন্যাসটি লেখকের নিজস্ব জীবনের এক আশ্চর্য অঙ্গুলি। একজন পঙ্গুপদ কলস্ক মানুষ নিজেকে যেন দেখলেন ফালা ফালা করে। নিজের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতকে ঘিরে গাঁথলেন শব্দমালা, চিত্রলিপি। ঘুরোয়াভাবেই মাকে শোনালেন নিম্ন নিম্নের নিজের কথা। কখনো স্বীকারোক্তি করছেন কখনো লিখছেন যেন চিঠি, করছেন স্মৃতিস্মরণ। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস। আন্তরিক হ্যাঁ মানবিক অন্তর্ভুক্তিতে বড়ো বৌদি আন্তরিক এক পরিণত বয়সের মানুষ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন সত্যের স্বরূপ। কড় নিম্ন সত্যকে শেখালেন চিনতে।

সাহিত্যের প্রায়-সব শাখাতেই রয়েছে তাঁর বিলম্বিত স্বাক্ষর। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যকল্পনা, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, এমনকি কবিতাও তিনি লিখেছেন। এখনো লিখছেন। বিকল্পবস্তুর নতুন, আগন্তকের কিশিষ্টা, ভাষার কারুকার্য, বুদ্ধির দীপ্তি, চিন্তার মৌলিকতা, সর্বোপরি মানবিক অনুভূতির প্রকাশে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাসাহিত্যে সন্তোষকুমার ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর ‘কিন্দু গোলালার গলি’, ‘নানা রঙের দিন’, ‘মোমের পতল’ যুগের রেখা, জল লাগে, স্বয়ং নায়ক, রেখা, তোমার মন, দিনরাত, শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেশ্বর মা-কে, সমস্ত, আমার সমস্ত প্রভূতি উপন্যাস; অজাত, অপার্থিব নাটক; প্রবন্ধ সংকলন ‘সোজাসজি’, কুসুমের হাস, চীনে মাটি, শ্রেষ্ঠ গল্প, কড়ির খাঁটি প্রভূতি ছোটগল্পের সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকাদেমি পুরস্কৃত আরো কয়েকজন

বাংলাভাষাকে বাদ দিলে আরো বারোটি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক

\* 84, CHARING CROSS ROAD —  
By HELEN HANF Publishers:  
ANDRE DEUTSCH, LONDON:  
Price 40 Shillings only.

১৯৭২-এর আকাদেমি পুরস্কার। ইংরেজি, গুরুপ্রতিভা, সোমিতা, সংস্কৃত, উর্দু ভাষার কোন বই এবার পুরস্কার পায়নি। অসমীয়া সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন অসমীয়া আশ্রম কাহিনী, উপন্যাস, সৈয়দ আবদুল মালিক : হিন্দি : বাণী হোই রসসি, কাব্যগ্রন্থ, ভবানীপ্রসাদ মিত্র : কানাড়া : শুনকসম্পাদনের পরামর্শে, ভাষা, এস এস ভূষণরমণ : কাশ্মীরী : শূইয়া, নাটক, জলি মহম্মদ লোন : মালয়ালম : ওরু, দেসাইথিনতে কথা, উপন্যাস, এম কে পোট-ককাট : মারাঠি : জেভা মানব জাগা হোতো, আশ্রমকথা, গোপাবারি পারুলেকার : ওড়িয়া : মনোজ দাসক কথা ও কাহিনী, দ্রুতগণপ সংকলন, মনোজ দাস : এছাড়া পাজাবী, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু ভাষার লেখকগণ পুরস্কার লাভ করেন।

### পশ্চিম বার্লিন থেকে

অনেকের হয়তো মনে আছে সে-কথা। ষাট করেক মাস আগেই ঘটনা। নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন জার্মান লেখক হাইনরিশ বোরহল। এবং তাঁর কথা বলতে গিয়ে অনুভূত প্রকাশিত হয়েছিল একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাহিনী। বোরহল ছিলেন তাঁদেরই একজন। সেই সাহিত্য-গোষ্ঠীর নাম 'গ্রুপ ৪৭'।

ঠিক পশ্চিম বছর আগের এক সপ্তেম্বর। হানস ভেরনার রিশটার আমন্ত্রণ করলেন পনেরোজন তরুণ লেখককে। বাভারিয়ান ফ্রুশেনের কাছে 'লেখিকা ইলগে স্নাইডার জেগেলের মতো বসল আসর। জমজমাট আদল পেল কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডাটি। যে কাঁর নিজের লেখা কবিতা পড়লেন, পাঠ করলেন স্বরচিত ছোটগল্প। কেউ কেউ পড়ে শোনালেন নিজের লেখা অপ্রকাশিত উপন্যাসের অংশবিশেষ। তারপর চলল আলোচনা। কাঁঝালো সুরেই একে অপরের দোষ-গুণ খরিয়ে দিলেন খোলাখুলি।

এই আসরটিই জন্ম দিল একটি গোষ্ঠীর। সাহিত্যজগতে তাঁরা পরিচিত হলেন 'গ্রুপ ৪৭' নামে। যুগ্মতন্ত্র জার্মান সাহিত্যে, বিশেষ করে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির সাহিত্য-আন্দোলনে এই গোষ্ঠীর লেখকদের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজো এই গ্রুপের চিন্তাভাবনা পশ্চিম জার্মানির তরুণতর লেখকদের মধ্যে বেশ জোয়ালা।

হানস ভেরনার রিশটার এক সময় এই গোষ্ঠীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, এটা নিছক কিছু লেখককে পাদ-প্রদীপের সামনে নিয়ে আসার জন্য তৈরি হয়নি। বরং রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে ধারা ক্রিটেড অথচ সাহিত্যিক হবার জন্য চেষ্টার কলমাই নেই, তাঁদেরই চোখের মণি 'গ্রুপ ৪৭'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের প্রথম দিককার বোম্বো আবহাওরর কথা মনে রাখলেই এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে পড়বে।

প্রাপকত এই গ্রুপের সদস্য ছিলেন সাহিত্য-সমালোচক ওয়াগন কাইজার। তিনি বলেছিলেন, এই গ্রুপের সদস্যদের সাফল্য যেমন দলগতভাবে ঘটেছে তেমনই হয়েছে ব্যক্তিগতভাবেও। এর সত্যতা মাচাই হয়েছে সময়ের কাছ থেকেই। তাই গ্রাস, ভালসার, বোরল, বাখমান, এনসেনবার্গার, আইখ, হাইসেনব্রুটেল, আইসিংগার, হিল্ডে-সাইমার, হোলোরার, বামকফ এবং আরো অনেক লেখকই ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

মাঝখানে সাহিত্যিকদের এই স্বর্ণ-গিয়েছিল ভেঙে। কেউ কেউ খেয়েছিলেন নিষিদ্ধ ফল। ব্যক্তিগত কথুখে ধরেছিল চিড়, কাজকর্মের তাগিদেও কেউ কেউ এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়েছিলেন। অবশেষে আরার তাঁরা মিললেন। মিলেছিলেন ঐতিহাসিক মে দিবসে। নানান দেশের শ্রমিকরা যখন পালন করছেন মে-দিবসের উৎসব, তখন পশ্চিম বার্লিনের হানস ভেরনার রিশটারের বাড়িতে বসল মজালাস। পুরনো দিনের লেখকবন্ধুগা হলেন জেডো, বরসের বাঁদ গেল ভেঙে, ফিরে পেলেন যৌবনের দিনগুলি, রাত

গুলি। গ্রাস, জনসন, রুগো, ভাই, হোলোরার, ভোমান, সালুক, শ্নুরে, কউন-গাট কাঁপিয়ে তুললেন আসর। হালকা চালের কথাবার্তার মাঝখানে কেউ কেউ বেশ তত্ত্বকথা জড়ুলেন। কখনো বোয়ালের কথা, কখনো আবার বাখমান, আইসিংগার, হিল্ডেসাইমার, ভালসারের কথা বারবার ঘুরিয়ে দিলেন এল। চলল স্মৃতিরোমন্থন, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও।

সকলেই বললেন, সাহিত্যে অনেক এলোমেলো হাওয়া বইলেও আজো 'গ্রুপ ৪৭'-এর প্রভাব সক্রিয়। তাঁদের সমাজ-পচেতনতা পশ্চিম জার্মানির সাহিত্যিকদের মধ্যে আজো রূপটি।

### যুগোস্লাভিয়ার হৃদয় হতে

বাঁরা দেশ-বিদেশের সাহিত্যের খবরা-খবর রাখেন তাঁদের কাছে যুগোস্লাভিয়ার লেখক ইভো আশ্রিক মোটেই অস্বীকার্য নয়। ১৯৬১ সালে তিনি পেয়েছিলেন 'নোবেল পুরস্কার'। সম্প্রতি তাঁর ৮০তম জন্মদিন যুগোস্লাভিয়ার পালন করা হলো বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গ। এই উপলক্ষে নানান রকমের সম্মানও দেখানো

### প্রকাশিত হল

### তৃতীয় খণ্ড

## গিরীশ রচনাবলী

(সম্পাদনা : ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য)

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা চারটি খণ্ডে সংকলিত হচ্ছে। গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট ও প্রযোজকগণ। সাম্প্রতিককালে রঙ্গমঞ্চে যে আলোড়ন চলছে তার দিশারীও তিনি। আজকের নাট্যসাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে বকেতে হলে গিরিশচন্দ্রের অনুশীলন অপরিহার্য। গিরিশচন্দ্রের নাটক ছাড়াও তাঁর রচিত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও গদ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত থাকিছে সংগ্রহ করা সম্ভব, সবই বিভিন্ন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে গিরিশচন্দ্রের জীবনী সংযোজিত হয়েছে এবং প্রতি খণ্ডে প্রকাশিত রচনার সাহিত্যিকীর্তি আলোচিত হচ্ছে। তৃতীয় খণ্ডের সূচী :

### নাটক

অভিশাপ। নন্দদল। গ্রুব-চরিত্র। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। প্রহ্লাদ-চরিত্র। লক্ষ্মণ বন্ধন। হর-গৌরী। রূপ-সনাতন। কালাপাহাড়। শঙ্করাচার্য। হরপতি দিবাকী। চণ্ড। প্রফুল্ল। অশোক। বাসর। মনের রতন। মলিন রাজা হীরক জুবিলী। যামিনী চন্দ্রমাহীন। গোপন চন্দ্রন। ডোটরমণ্ডল। সত্যমীতে নিসর্জন। কাঁসীর রাণী।

### গদ্যরচনা

স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন। কবিবর রজনীকান্ত সেন। সমাজ-সংস্কার। শ্রী-শিক্ষা। গরুড়। পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী। অভিনেত্রী সমালোচনা। কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় : কুমিকা। অভিনয় ও অভিনেতা। বছর-পাঁচ বিদ্যা। নৃত্য। সম্পাদক। ভারতবর্ষের পথ।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেরাস্ত হরপতি দিবাকীর পুনর্মুদ্রণ এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ। ১৯০১ সালের একটি ইস্তাহারের পুনর্মুদ্রণ। কয়েকটি আর্ট পোস্ট। প্রথম দুই খণ্ড-প্রতিটি কৃষ্ণ টাকা। তৃতীয় খণ্ড-পশ্চিম টাকা।

### সাহিত্য সংসদ

৩২এ আজম্বা প্রকল্পের প্রথম ৪৪ কপিগ্রন্থ-১

হয় তাঁকে। পেন্সন করেকটি রাজস্বীয় পদক। জনসাধারণের অকুরন্ত ভালো বাসারই স্মারকটিই রাজস্বীয় পদক।

রাষ্ট্রপতি টিটো দিলেন অর্ডার অব ইয়োজ অব সোসালিস্ট লেয়ার। বোসনিয়া এবং হের্সেগোভিনার রাজধানী সারাজেভোর এক অনুষ্ঠানে তাঁকে জানানো হয় বিশেষ সম্বর্ধনা। তাঁর সম্মানন প্রাচীনকালের প্রথম নাগরিক হিসেবেও পান তিনি বিশেষ সম্মান।

## নতুনবই

মুক্তির সম্মানে ভারত-কংগ্রেস পার্ক বঙ্গ (প্রথম সংকলন) যোগেশচন্দ্র বঙ্গ। প্রকাশক : দি মডার্ন পাবলিশার্স, ৮ এ, কলেজ রো। দাম ১৭ টাকা।

কংগ্রেস গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। তারপরই জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় হয় দশক পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে তার সফল পরিণতি ঘটে। কিন্তু এ জারজের আগে আর এক আরম্ভের ইতিহাস আছে, কবির ভাষায় যাকে বলা যায়, সম্মানার্থে প্রাচীন জনতার আগে সকাল বেলায় সলাতে পাকানোর কাহিনী। প্রখ্যাত লেখক যোগেশচন্দ্র বঙ্গের 'মুক্তির সম্মানে ভারত' গ্রন্থটিতে এ 'সকাল বেলায় সলাতে পাকানোর কাহিনী' পুনরুদ্ধারের ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পরলোকগত লেখকের উদ্দেশ্যিত গ্রন্থটি অমূল্য কোন সাম্প্রতিক কালের রচনা নয়। ১০৮৬ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ত্রিংশ বছর আগে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন তার ভূমিকা লেখেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। গ্রন্থটির বিস্তারিত সম্পর্কে এ ভূমিকাতে বলা হয়—যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সারিষিষ্ট হয়েছে তাহা ভারতের ব্যবসায়িক বা রেনেসাঁর ইতিহাস।

যোগেশবাবুও তাঁর ভূমিকায় লেখেন, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতে রেনেসাঁ বা নব্য-জাগরণের সূচনা হয়। এ সময় থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব ইতিহাস, লালিত-কলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন জীবনপন্থা অনুভূত হয়। দীর্ঘ পাঁচশী বছর ধরে ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালী, যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা করছিল তার একদিক দ্বারা প্রথম কংগ্রেস রূপ পেল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙালির এই কংগ্রেস পার্ব পঁচালি বছরের জাগরণ ও সংগঠন প্রক্রিয়ায় এই গ্রন্থের বিস্তারিত। তবে প্রথম মধ্যকালে গ্রন্থটিতে যোগেশ-

বাবুর লেখা 'হিন্দু মেলা'র ইতিবৃত্তটি ছিল না। আলোচ্য সংস্করণে এই অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে। প্রথমটির একটি বড় ফাঁক পূরণ হয়েছে।

যোগেশ বাবু ভেঙে পড়ার পর বেশ কিছুকাল 'এ' শিশুখলা দেখা দেয় ইংরেজ শাসনকালে তার অবসান ঘটে এবং সেনিটের শাস্ত ও সম্মেলন পরিবেশে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ভারত নব যুগের সূচনা হয়। এ যুগে নারী আধিপত্য হন মোটামুটিভাবে তাঁরা সকলেই ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দীক্ষিত কেউ তার ব্যতিক্রম নন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট এক অভ্যুত্থান ঘটলেও দেশের ইংরেজ শাসিত গহল এই অভ্যুত্থান থেকে অনেক দূরে ছিলেন। উনিশশ শতাব্দীতে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে তার সবগুলির মধ্যেও ইংরেজের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল এবং কংগ্রেসও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

১৮৮৮ সালে গঠিত হয় জনিদার সভা—বঙ্গোল ল্যান্ড হোমার্স এসোসিয়েশন যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ষিওডর ডিকেন্স, জর্জ প্রিঙ্গল, আরকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব ও দুজন সম্পাদক হন—প্রমথকুমার ঠাকুর ও 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক উইলিয়াম কব হারি। ১৮০৯ সালের জুলাই মাসে বিলাতে গঠিত হয়—ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৫১ সালে এ দুই প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে গঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' যাকে ইংরেজ শাসিত ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলা যায়। ১৮৬১ সালের ঠিক সংক্রান্ত থেকে শুরু হয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'হিন্দু মেলা' তার উদ্দেশ্য 'হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা' এবং জাতীয় চেতনার উদ্দেশ্যে তার ভূমিকা সামান্য ছিল না। তারপর ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা। এই সবকটি সংগঠনই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অগ্র-পাখ্য। তবে ১৮৮০ সালে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ কার্যের স্বার্থের সংগে ভারতের সত্য আগ্রহ জাতীয় চেতনার প্রগতি সংঘর্ষ হয়, দু'বছর পরে গঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস।

উদ্দেশ্যিত সংগঠন ও আন্দোলনগুলির ইতিহাসে অতি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সংগে যোগেশবাবু তাঁর 'মুক্তির সম্মানে ভারত-কংগ্রেস পার্ব বঙ্গ' গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছেন। সত্যতা বলা বাহুল্য যে, এ গ্রন্থ ইতিহাস, রাজনীতি ও সাহিত্যের অনু-সন্ধান, পাঠকের কাছে একটি অপরিহার্য আকর্ষণ। বলে বিবেচিত হবে। বইটির ছাপা প্রায় নিঃশুল, প্রচ্ছদটিও সুকল্পিত। হবে দাম, একটু কম হলেই ভাল হত।

ভারত-সভার (কবি সংকলন)—শরৎচন্দ্রীকালীন নন্দী। অর্ধ প্রকাশনী ১, হাটুবাড়ী লেন, কলকাতা-১৪। তিন টাকা।

বিশ্ব স্বভাব। অগ্রসর নকশের দ্বারা হয়ে করে ছাত্র বলে, বুদ্ধের মধ্যে 'আমি' একটি বড় হাতছানি দেয়, 'আমি' শব্দটির কাছে ঘিরে, যেতে হয় বুদ্ধের—এই সমস্ত পংক্তি রচনা করে 'ভারত-সভার' কার্যক্রমের কবি শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী নিজ কবিতাভার পরিচয় রেখেছেন। আলোচ্য কবি 'রোমান্টিক' বিবাদ নিয়ে কবিতাগুলির 'বিশ্ব', 'লক্ষ' ও 'ইমেজ' প্রমাণ করেছেন। ভালবাসা, দুঃখ, দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আঁতি প্রত্যাশাপ্রত্যাশাহীনতা, নিজেকে দেখার দর্পণ-অবেদন—এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র বিষয়কে কাব্যের সার্থক শব্দ, চিত্র, ছন্দ, কবিতার সূক্ষ্মতার সূক্ষ্মাঙ্গিত করেছেন। কোমল আন্তরিক কবিকণ্ঠ স্বভাবী পাঠকের সংগে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপনে সক্ষম। কিন্তু কয়েকটি লক্ষ, লক্ষ্য ও চিত্র ও চিত্র-কল্পের একাধিক ও পৌনঃপুনিক প্রয়োগ অত্যন্ত ক্রান্তিকর লাগে, যেমন—'জল', 'জলের গভীর', 'বকে', 'জলাশয়', 'বুদ্ধের গভীর' নকশা ইত্যাদি। ভাষাবাসার 'ফোকাস' লক্ষ্য শব্দগুচ্ছের অন্তর্নিহিত 'নিম্নাধার' ও সূক্ষ্ম চিত্রের কল্পনা-সৌন্দর্য সূক্ষ্ম কাব্যিকতা পায় নি।

যা দেখেছি বা বুকেছি (প্রথম)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আলফা-বীটা পাবলিকেশনস ৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট তেতলা, কলকাতা-১৪। দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভারতের পাতার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সে সমস্ত চিত্রের উদ্ভব লেখা ছিল, সেগুলিকে লেখক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেইভাবেই গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'যা দেখেছি বা বুকেছি' গ্রন্থে। রচনাগুলি লেখকের নিজস্ব চিত্রা-ভাষা ও ব্যবহারিক জীবনের উপলব্ধি জানেরই লেখা রূপ। জীবন কর্মমুখর। কর্মের সূত্রে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়—তা বাইরের এবং ভিতরের—দুইই। প্রতিটি মানবের সাধ, সাধ্য, সাধনা ভিন্নমণী। জীবন, জগত, সমাজ, বাসনা—কামনা, দুঃখ-বোধ, সুখ-ভাবনা সবই অভিজ্ঞতার আলোয় বাস্তবীকৃত বৈশিষ্ট্য পায়। এইরকম ব্যক্তি-চিন্তিত কয়েকটি স্মৃতি-অনুভবজাত জগৎ ও জীবন সমীকার কথা বর্তমান প্রক্ষেপিত হয়েছে। লেখকের দার্শনিক, দৃষ্টি-ভঙ্গিটি স্বচ্ছ। প্রকাশভঙ্গির সহজ ও সাবলীলতার গ্রন্থটি 'মননমণী' হয়েও সুখপাঠ্য।

...এবং অন্যান্য কবিতা। অশোক চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান। ১।০ টোয়ার লেন, কলকাতা-১। দাম : তিন টাকা।

অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতার বইটির দ্বারা পরিচয়পত্রের নিম্নলিখিত লোক সম্বল করতে পারেন নি। কবিতার নাম খুব সম্ভবতঃ নকশা এবং অন্যান্য কবিতা। কবিতার দু'পাঠ্য নিয়ে কবি

বিস্তার পূর্ণাঙ্গ-নিবন্ধের মূল, কবির বর্তমান রচনাগুলি তাই প্রমাণ করে। কবিতা, পোস্তার কবিতা (কবিতার সীমা হ্যাণ্ড-বিল?) প্রাক ইত্যাদি দ্রুত পূর্ণাঙ্গমূলক কবিতার জটিলতা পেরিয়ে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মূল কবিসত্তাটি আবিষ্কার করতে হয় তাঁর কবিতার মধ্যে, যেখানে কবি অনুভূতির গভীরে পৌঁছে বেনাবোধে পণ্ডিত, বিজ্ঞ। —‘পরিচাপে পরিচাপে মূখর সারাটি বেলা ধরে/একটি রঙীন পাখি পাতার আড়ালে ঘসে থাকে।’ (পাতার আড়ালে)। ...‘কেন সব দৃশ্য উড়ে বাসে, কেন’ স্মৃতি, নাম দিলে/সেদিন প্রদোবে অমন সতর হাতে কল দিলে কেন—/তোমার সত্যায় চাই, অবরোধী বিশাল নীলিমা/সেদ করি এনে দিতে হবে ফুলগুলি।’... (চিঠি)।

কল সাহা অঙ্কিত প্রজ্জ্বলিত তাৎপৰ্য-মণ্ডিত।

আজ ও আগামীকাল (উপন্যাস)। দেব-দত্ত রায়। গ্রন্থ-পরিচয়; কলিকাতা-৩০, মূল্য : ছয় টাকা।

‘আজ ও আগামীকাল’ কোন সাধারণ প্রেমকাহিনী নয়; একটি ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের গত নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক জোটের পরাজয় এবং অন্য একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার আসীন হওয়ার ঘটনার পূর্ব ও পরবর্তী কয়েক মাসকাল মেটামর্মেটিভাবে এই উপন্যাসের পটভূমি। একশ্রেণীর সমাজ-বিরোধী, সম্প্রদায়বাদী উগ্রপন্থীদের নাশ-কতামূলক কাজকর্মের ফলে দেশে এমন একটা সমুদ্র এসেছিল যখন সাধারণ মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব ঘটেছিল, শিশু-প্রতিভানে, শিক্ষারতনে—সর্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আদর্শবাদী কিছুর বৃদ্ধ জীবনের স্বাভাবিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্য অথহেলা করে দেশে স্থায়ী মঙ্গল প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এই হল উপন্যাসের বিষয়। এই ধরনের উপন্যাস রচনার সাধকতা-লাভের জন্য লেখকের যে ধরনের বলিষ্ঠতা থাকা দরকার—চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনা নির্বাচনে, বর্ণনায়, বিশ্লেষণে, ভাষায়—বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মধ্যে তার প্রতি-প্রদীপ্ত লক্ষ্য করা গেছে এবং বর্তমান উপন্যাসটি সেই পরিমাণেই সাধক।

এতো জালো অন্ধকার (কাব্য সংকলন)। কলীপল কোঙার। সখী সংবাদ প্রকাশনী, ৪৬৪, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪। তিন টাকা।

কাকতল্যের সর্বশেষ কবিতাটিতে কবি-জগন্নাথ সিংহকে এসে উদ্বুদ্ধ কবি কলীপল কোঙার একজন শ্রুতানুধারীর কথাকেই নিজের মত করে বলেছেন, ‘তুমি হারিয়ে মৃত্যু-বস্ত্রকে খেঁচি বহি মৃত্যি চাও/পৃথিবীতে কোনো কিছুর আশা কোরো না।’ কিন্তু এই কবি তাঁর ‘এতো জালো অন্ধকার’

গ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই অত্যন্ত সঠিক থেকে পাঠকের বক্ষ্যেছেন — ‘কবু, জেগে ওঠো, দেখ কি রক্ত/পায়ের তলার থেকে সেরে যাচ্ছে মাটি/যেদোবার এখন সময়?’ আশা-নিরাশার কবিতায় বিশ্বাসিত। কবি বাচতে চান। কবির কাছে—‘তাই মৃত্যু শেষ নয়/এবং দৃষ্ট অশেষ।’ একেবারে সাম্প্রতিক কালের আধুনিক কবিতার মধ্যে কলীপল কোঙার প্রতিপ্রদীপ্তসঙ্গম কবি নিঃসন্দেহে। কাব্যের ‘উডকশন’, চিত্র রূপ ও ছন্দে তিনি সত্যক, সচেতন কবি।

শ্রীমত্তাগবস্মীতা (১৬৮ খণ্ড)—শ্রীঅনিলা-বরণ রায়। গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৪/১১, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৬। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীমত্তাগবস্মীতার সঠিক ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বড় বড় টীকাকার ও সাধু-মনসী গীতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পরিচয় বহন করে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। এই ক্ষেত্রে গীতার সপ্তম অধ্যায়টি বিস্তারিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রথমার্ধে বর্ণিত অধ্যায় পর্বন্ত ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রায় পূর্ববর্তী পনেরোটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির সূচনার রূপায় কৃৎসন্ত সমর্থ।

গঙ্গাপদ বন্দু স্মারকগ্রন্থ—অম্বেবা। ১।২এ, বল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দাম : ছ'টাকা।

‘শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার্থে’, শিল্পরসিক মানবদের জ্ঞাতার্থে একজন আত্মনিবেদিত শিল্পীর কর্মের জীবনকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।’

শিল্পরসিক মহলে গঙ্গাপদ বন্দু সুপরিচিত নাম। নাট্যকার, সাংবাদিক, সংগীত এবং অভিনেতা হিসাবে আধুনিক বাংলা শিল্প সংস্কৃতির জগতে গঙ্গাপদ বন্দুর বিশিষ্ট ভূমিকাটি কোনদিনই বিস্মৃত হওয়ার নয়। ‘ছিন্নমূল’-এর ‘বিশ্ব চক্রবর্তী’, ‘জলসায়র’-এর ‘মহিম গাঙ্গুলী’, ‘পরশপাথর’-এর ‘কুপারাম কাচাল’, ‘অবাস্তবিক’-এর ‘মামাবাবু’ এবং ‘শাপমোচন’, ‘বিশ্বকন্যা’ থেকে সাম্প্রতিক কালের ‘এখানে পিজুর’ ‘নিশিগম’ ইত্যাদি বহু ছায়াছবির বিভিন্ন চরিত্র শ্রীবন্দুর অভিনয় প্রতিভার স্মারক বহন করবে সর্বাধিকাল; যদিও চলচ্চিত্রে গঙ্গাপদ বন্দুর অভিনয় ক্ষমতার সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে পরোক্ষ। কয়েকটি বর্ষের দরবারে শিল্পীর স্বাধীনতা অত্যন্ত কিছুটা ক্ষয় হতে বাধ্য।

গঙ্গাপদ বন্দুর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে—যে নাট্যশাস্ত্রের প্রাপ্যরূপ ছিলেন তিনি, সেই ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রবো-জনায়। ‘হেঁচা তাঁর’-এর ‘ব্যক্তিগত’, ‘রঙ-

করবার’ ‘অধ্যাপক’, ‘ডাকঘর’-এর ‘মহা-দত্ত’, ‘রাজা’ ‘ওরাদিগণ’-এর ‘সেবাপালক’-এর ভূমিকার তাঁর অভিনয় বাংলায় নাট্যশাস্ত্র-দেব হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চিত্র-স্মরণীয় হয়ে থাকবে ঐতিহাসিক বাংলা নবনাট্য আলোচনার অন্যতম পথিক গঙ্গাপদ বন্দু—অবাস্তবিকের ‘পরাণ মন্ডল’, ‘নবান’-এর ‘হার দত্ত’।

শিল্পে নিবেদিতপ্রাণ এই মহৎ শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনের বহু দিকেও আলোকপাত করেছেন বর্তমান বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের পুরোধা কয়েকজন গুণী। গুণীবৃন্দের মধ্যে আছেন—সত্যজিৎ রায়, স্বর্গীয় স্বর্গীয়, মৃণাল সেন, মন্মথ রায় বিজয় ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার, বিবেকানন্দ মূখোপাধ্যায়, দক্ষিণরঞ্জন বন্দু, এন কে জি, সমরেশ বন্দু, সত্যজিৎ মূখোপাধ্যায়, শঙ্কর বোষ প্রমুখ।

স্বদেশ বন্দুর ভূমিকা গ্রন্থের একটি মূল্যবান অধ্যায়। সুসম্পাদিত গ্রন্থটির বাহিরে সৌন্দর্য ও সূর্যটির স্বাক্ষর বর্তমান।

উর্নতিরশ্রুতিরশ্রুতির গান (কাব্যগ্রন্থ)—অভিজিৎ সেনগুপ্ত। প্রাইমা পাবলিকেশনস, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। আড়াই টাকা।

রহস্যময় এক মাল্লাবী বস্ত্রায় কণ্ঠ পাল্লেন লেখক। অত্যন্ত এ-বইয়ের কবিতা-গুলি পড়ে, সেরকম একটা ধারণাই তৈরী হয়। ‘সম্মা’ ‘আকের ডাক’ ‘শতাব্দীর শির’ প্রভৃতি শব্দ ও শব্দচিত্রের অলঙ্কারে-জগৎ উন্মোচিত হয়, তার সঙ্গে কবিতা-পাঠকের পরিচয় অত্যন্ত অঙ্গুষ্ঠ।

## সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম (চতুর্থ বর্ষ ১২তম সংখ্যা) : শচীন্দ্রনাথ মূখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৫ বন্ধিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম দশটাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা কালি ও কলমের বর্তমান সংখ্যাটি কবি সূর্য্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা পঠের প্রতি অনীহা যে সমাজে প্রকট, সেখানে একজন যুগস্রষ্টা কবি স্মরণে বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে দূরসাহসিক প্রয়াস। ম্যাক্সিম গোর্কির ওপর লেখা সূর্য্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রথমেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্যামসুর রহমান, আবদুল রহমান সৈয়দ এবং আরো কয়েকজন সূর্য্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। সূর্য্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত রচনাপঞ্জী ও জীবনীপঞ্জী রচনা করেছেন শেখ মূখোপাধ্যায়।



# চিঠিপত্র

## সেলেই ও'দের সংস্থান করা হোক

একুশে পৌষের সংখ্যায় অপরাধিতা-সেনগুপ্তের চিঠিটি পড়লাম। তিনি যেহেতু আলোচিত বিষয়কেই আবার নতুন করে ফুটো ফরসেন। কিছুদিন আগে আমার বিশেষ যাকার সুযোগ ঘটেছিল। গিয়েও ছিলাম। সেখানে কর্মকর্তাদের সঙ্গ পরিচয় হয়। সকলেই চাকরি করছেন। ব্যবহারিক জীবনে রয়েছেন বহাল-ভাবিতই। কাকে বলে হাতের মতোয় লগনুখ করে রাখা ঠিক তাই খটেছে। তবু তাঁরা ঠিক ফুঁপ্ত পাচ্ছেন না। বা শিখলেন, দেশের কাজে লাগাতে পারছেন না বলে লক্ষ্যে অরুপ। আর কাঁহাতকই বা পরদেশী ভাষার কথা বলা যায়? মনের বুে ভারতীয় পরিবেশ তাঁদের পছন্দ, তাও মেলে না। ফলে দেশে আসতে চান, দেশে কিরে কাজ করতে চান। কিন্তু কে তাঁদের চাকরি দেবে? সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় পরিকল্পনা নিয়ে যদি না এগোন তাহলে দুঃসময় ঘনিয়ে আসতে আর ব্যাক থাকবে না।

সুনীল রায়, নতুন দিল্লি

## ভারাপীঠ প্রসঙ্গে সঠিক তথ্য

গত ৭ই গোঁষ, (১৩৭৯) শুব্বাব্বারের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রভুল দত্তের লেখা 'কিংবদন্তীর বীরভূম' পড়লাম। বীরভূমের প্রেষ্ঠ পাঠস্থান 'ভারাপীঠ মন্দির প্রতিষ্ঠার কিংবদন্তীর তথ্য প্রভুলবাবু ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারেন নি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন নাটোরেশ্বরী রাণী ভবানী নয়। মন্দিরপুত্রের বাসিন্দা 'জগন্নাথ রায়। মন্দিরের গায়ে এখনও তাঁর নামধাম এবং সুন তাঁর লেখা আছে। 'ভারাপীঠ মন্দির' (শারঙ্গীয়া শুরা চতুর্দশীতে) এখনও মন্দিরপুত্র রায়বাড়ী হতে পূজার সামগ্রী এবং বলিদানের পাঠা ইত্যাদি যায়। পূজা-বলিদান দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করে থাকে। ভারাপীঠের বাসিন্দা 'যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের ভারাপীঠ মাহাত্ম্য বইতে জগন্নাথ রায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লেখা আছে। ভারাপীঠ সেকা সংস্থার সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র প্রামাণিক (জানবাবু) মহাশয়ও এ বিষয়ে সর্বিশেষ জ্ঞাত আছেন। কিছুদিন পূর্বে কলকাতার কোনও এক ভক্ত মায়ের মন্দিরে চুনকাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জানবাবু অনুরোধ নেওয়ার জন্য আমাদের বাড়ী অর্থাৎ মন্দিরপুত্র রায়বাড়ী গিয়েছিলেন। অনুরোধ না দিয়ে রায়বাড়ী থেকেই চুন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বীরভূমের কিংবদন্তী নিয়ে বীরভূম যে সৌরিক কন্যা বই লিখেছেন, তাতে দেখা যায় এক বর্ণিক সম্প্রদায়ের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বর্ণিকই

হয়েছেন জগন্নাথ রায়। আমি এই বর্ণনের সেরে। আমরা শুনিয়েছি এই জগন্নাথ রায় মন্ত চালের কবলারী ছিলেন। বেনারস থেকে কাটোয়া পর্যন্ত তাঁর চালের ব্যবসা ছিল। গরুর পিঠে বস্তা মেঝাই করে তিনি চালের সওদা করে বেড়াতেন। তখনকার দিনে এতবড় চালের ব্যবসারী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি 'জেলো জগন্নাথ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব ধনবান এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপদ্রব্য। তাই তাঁর দুঃখ ছিল—তাঁর অধিক্ত ধন কে ভোগ করবে? কেই বা তাঁর বংশ রক্ষা করবে? একদিন গরুর পিঠে কড়া মোঝাই করে চণ্ডীপুর গ্রামে (ভারাপীঠ) নদীতীরে জগলে রাখিতে বিদ্রাম করছিলেন। স্থানে মায়ের আদেশ পেলে বশিষ্ঠারীতিতারা তারা দেবী আমি এইখানে অবস্থান করছি, এইখানে আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর এবং মন্দিরপুত্রের বিশ্বাস বংশে বিবাহ কর। তোমার বংশ রক্ষা হবে। পরদিন জগন্নাথ রায় তারাদেবীর অনুস্থান করে মায়ের শিলামূর্তি দেখতে গেলেন, এবং সন্মিকটে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন। তাঁর কাছে গত রাত্রির স্বপ্নের কথা এবং মন্দির তৈরীর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সন্ন্যাসী রুপ্ত হয়ে বললেন, এই মন্দির আমিই ডিকা করে তৈরি করব স্থির করেছি। জগন্নাথ রায় ক্রম হলেন। নিজের কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দর্শন্যত মনে চলে গেলেন। নদীতীরে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই সন্ন্যাসী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। জগন্নাথ রায়কে তিনি আশীর্বাদ করে মন্দির তৈরির অনুরোধ দিলেন। জগন্নাথ রায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মন্দিরপুত্রের বিশ্বাস বংশে বিবাহ করার পর বংশ রক্ষা হলো। তারপর তিনি মন্দিরপুত্রেরই বসতি করলেন। আকও বিশ্বাস বাড়ী এবং রায় বাড়ী পাশাপাশি আছে। ভারাপীঠে বশিষ্ঠদেবের যজ্ঞকুণ্ড বা জীবিকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ তাঁর আকার ছিলো ছোট। জগন্নাথ রায় তার আয়তন বৃদ্ধি করে পূজারীণীর আকার দিয়েছিলেন। মন্দির সংলগ্ন ভোগ ঘরগুলিও তাঁরই নির্মিত। তিনি খুব খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। বহু দেব-দেবী উনি স্থাপনা করে গেছেন। এবং সেবার ব্যবস্থাও করে গেছেন। মন্দিরপুত্রের মন্দিরপুত্র শিবের দেওয়ান ছিলেন তিনি। এই শিবের পায়সাম ভোগের ব্যবস্থাও তিনিই করে গেছেন। দুধ, মিন্ট, জ্বালানির জন্য জমির ব্যবস্থা আছে। আধনের করে আতপ চাল এখনও প্রত্যহ রায়বাড়ী হতে যায়। মন্দিরপুত্র শিবের সম্মুখে পঞ্চ মন্দির তিনি স্থাপনা করে গেছেন। নিজের বাড়ীতে পঞ্চজননী দেবী মূর্তি স্থাপন করে নিজের কুলগুরুকে সেবাইত নিবৃত্ত করেছিলেন। তার জন্য গুরুদেবকে ১৮ বিঘা নিষ্কর জমি, পুতুর এবং বাম্পুজীতা সান করে-ছিলেন তা আকও তাঁর কবলারী ভোগ করছেন। দর্শন্যত, সন্ন্যাসী পূজা

ইত্যাদি আরও বহু কীর্তি তিনি রেখে গেছেন যা এখনও তাঁর বংশধরের চালাতে হয়। মন্দিরপুত্রের বহু ভূসম্পত্তি তিনি করেছিলেন বর পরিশোধ ছিল ১৬ দশ বিঘা। মন্দিরপুত্রের মন্দিরপুত্র বাড়ীর দুই পাশে বহুটি সর্ববহু দীঘি ছিল তাঁর ভোগী ছিলেন তিনি। এখনও সেই দুই দীঘি রক্ষিতই আছে।

জগন্নাথ রায়  
মন্দিরপুত্রের বাসিন্দা

## শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত লোক মারা যান?

শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এককরম গোটা শান্তিকামী মানুষই দাঁড়িয়ে ছিলেন জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধে কোন ১ কোটি লোক মারা যান, তেজান অনেকের মতে সাড়ে ৫ কোটি মানুষ নিহত হন শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। একথা জানা আছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যেখানে ৩০টি দেশ সোজাসৃজি যুদ্ধের কথা ঘোষণা কর, সেখানে শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ খোলাখুলিই স্বীকার করেছিল যুদ্ধের অস্তিত্ব।

কিন্তু শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সত্যি সত্যিই কত লোক মারা যান, আহত ও পঙ্গু হন, তার সঠিক সংখ্যা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। 'হিস্টরিক মেমোরিয়াল অব দ্য পটসডাম এগ্রিমেন্ট : সের্সিলিনহোক' পুস্তিকায় স্পষ্টভাবেই এক জার্মান উদ্দেশ্য করেছে ফ্যাসিস্ট মিলিটারিস্ট আক্রমণে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যান শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। এই গ্রন্থখই দেশ-ভিত্তিক যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা হল : সোভিয়েত ইউনিয়ন ২০,০০০,০০০; পোল্যান্ড ৬,০০০,০০০; জার্মানি ৮,০০০,০০০; যুগোস্লাভিয়া ১,৭০০,০০০; রুম্যানিয়া ৭৭০,০০০; গ্রেট ব্রিটেন ৬ কমনওয়েলথ ৬৬৫,০০০; ফ্রান্স ৬২০,০০০; ইতালি ৬৭০,০০০; গ্রীস ৫৭০,০০০; চেকোস্লোভাকিয়া ৮৫০,০০০; আন্ড্রিয়া ৮৪৭,০০০; হাংগারি ৭৯০,০০০; জার্মানিক বৃত্তরাষ্ট্র ৩৬৭,০০০; হল্যান্ড ২৫৫,০০০; বেলজিয়াম ১৬০,০০০; ফিনল্যান্ড ১৭,০০০; বালগেরিয়া ৩২,০০০; আলবানিয়া ২৬,০০০; নরওয়ে ১,০০০; ডেনমার্ক ৩,০০০ জন। অর্থাৎ ৪১,৯৩১,০০০ জন মারা যান। অবশ্য ৮ কোটির মতো লোক আহত বা পঙ্গু হয়। আবার অধ্যাপক ডঃ স্তেফান ভোকে-বেগের ভূমিকাসংবলিত গ্রন্থ দ্য পটসডাম এগ্রিমেন্ট-এ ৫ পৃষ্ঠার লেখা আছে যে শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ৫ কোটি লোক মারা যান। অর্থাৎ উভয় ভিন্ন ভিন্ন মতই আসান্য পরিসংখ্যান দিচ্ছেন। এবং এদের মধ্যে তারতম্য ঘটেছে প্রায় পঞ্চাশ লাখের মতো। কোন পরিসংখ্যানটি সঠিক ও তথ্যনিষ্ঠ তা বলি কোন ঐতিহাসিক জানান ব্যক্তি হবেন।

পারমিতা দেব মজুমদার  
যানবাবু, বিহার।

[ উপন্যাস ]

# ফুল ফোটার আগে

শৈলেন রায়

( দশ )

অনেক খেটে-খুটে একটা রিপোর্ট তৈরী করে কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে দিলাম। ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসেসারিজের হয়ে অনেক করে লিখলাম। লিখলাম, আমি নিজ গিথে ওদের ম্যানোজিং ডাইরেকটরের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। চমৎকার লোক। অমায়িক, বিনয়ী, সবচেয়ে বড় কথা ভদ্রলোক ব্যবসা বোঝে। এব হাতে আমাদের ভাল ব্যবসা হবে বলেই মনে করি। সুতরাং নতুন ডিলারশীপ এই কোম্পানীকেই দেওয়া হোক। শেষের দিকে আরও লিখলাম, আমি এক রকম কথা দিয়েই এসেছি। জামসেদপুর একটি আশাপ্রদ ভাষণ, ঠিক মত কাজে লাগাতে পারলে এখান থেকে মোটা টাকার ব্যবসা হওয়া সম্ভব। কিছুদিন আগে এগ্রিমেন্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায়, সেখানে আমাদের স্বার্থ দেখার কেউ নেই। এইসব কথা বিবেচনা করে আশা করি লেটার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাঠাতে দেরী হবে না। এখানকার অফিস সম্বন্ধেও লিখলাম। নতুন করে ঢেলে নিতে হবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা। হয়জন লোক নিয়ে আমরা একটা সেকশন তৈরী করছি, যাদের কাজ হবে ঘরে-ঘরে অর্ডার নিয়ে আসা এবং ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। গরমের সময় পাম্পের চাহিদা হয় প্রচুর। সেই অনুপাতে আমাদের সান্সাই খুব কম, ফলে ন্যাক দামের অনেক বেশী প্রিমিয়াম দিয়ে মাল কিনতে হয়। এই অবস্থার জরুরী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমি প্রস্তাব করি, মাল রক্ষিত রাখার জন্যে এখানে অফিসে একটা গ্যারাম ঘর ভাড়া নেওয়া হোক। সেখানে নতুন মেশিনপত্রের সঙ্গে থাকবে পেয়ারার পার্টস, বেটা কিনা এখন বাইরে থেকে চড়া দামে কিনতে হচ্ছে আমাদের। জেনে-মানে বাইরের এক্সপোর্টের হাতে অথবা টাকার ফুলে দেওয়াটা সমীচীন হবে কিনা আশা করি কতৃপক্ষ সেই কথা বিবেচনা করে, দেখবেন। রিপোর্টটা অনিমেসকে দেখালাম। অনিমেস হেসে বলল, 'খুজি তো

সার্বেসের স্ট্রুডেন্ট ছিলে কাকর, কিন্তু বেশ গাছের ইংরেজী লিখতে পার তো। তোমার উন্নতি মারে কে!'

অনিমেসকে টিপ্পনী কাটলাম, 'আমার তো মনুষ্বের জোর নেই।'

মনুষ্বের চেয়েও বেশী কিছু আছে তোমার।'

যেমন?'

অনিমেসের মুখ থেকে সুপ্রিয়ার নাম শুনতে ইচ্ছে করছিল। এতদিনের মধ্যে অনিমেস সুপ্রিয়ার নাম উচ্চারণ করে নি। কি জানি কেন, অনিমেস যেন সুপ্রিয়ার কথা উঠলেই বিরত বোধ করে, ওকে এড়িয়ে যেতে চায়। অথচ সুপ্রিয়া তো সহজভাবে বলেছিল, অনিমেস ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

'মিস্টার কাপুর।' অনিমেসের সুরে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ছিল না। ওর গলা খুব শান্ত মনে হল।

হাসতে হাসতে বললাম, 'এইসব কর্তারা কি রকম জানো। প্রচুর আয়োজন করে করে যখন ওদের জীকনটা একত্রে হয়ে যায়, তখন নতুন কোন খেলার দিকে দৃষ্ট পড়ে। ডাক পড়ে নিবোধ কোন লোকের। সেই মানুষকে ওরা বর করে ধুচে-মাখায়, পোশাক-পরিচ্ছদ পরায়, তারপর সকাল স্টেজের ওপর তুলে দিয়ে বলে, আমরা বাজনা বাজাচ্ছি, তুমি তালে তালে নাচো। যদি নাচতে পারলে ভাল, যদি মুখ খুঁড়ে পড়ে যাও, ওরা আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠবে, এ গ্রেট ফান, ওদের এই ফান কথাটার মানে আজ পর্যন্ত আমরা জানা হল না। তারপর ওরা আর একজন নিবোধ মানুষকে ধরবে, তাকে নাচাবে, ফান করবে।' হাসতে হাসতে কথা বলতে শুরু করেছিলাম। কখন যে আমার হাসি ঝন্ড হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি। শেষের দিকে আমার গলা বিষম ভারী শোনাল, 'অজ্ঞ, নাচার তো বিরাম নেই।-মর জেনে বুঝেও নাচতে ইচ্ছা আমাদের।'

আমার কথা শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেও অনিমেস কথা বলল না। এক সময় বলে উঠল, 'হয়তো এই নাচাটাই আমাদের পার্ট। শব্দে আমরা কেন, যারা আমাদের নাচাচ্ছে, দেখে নিও, তারাও নাচছে। নেচে নেচে মুখ খুঁড়ে পড়ে যাক।-পড়ে যাওয়াটাই তো মানুষের শেষ পরিণতি। তাই না?'

অনিমেস যেন মানুষের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে আমার মস্তামস্ত জানতে চাইল। কাড় নেড়ে বললাম, 'আমি শেষ পরিণতি-টার্ননাট বুঝি না ভাই। আমি বুঝি শান্ত সু-স্থল জীবন। নদীর তরঙ্গে সত্যি' কাটতে পারি, কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আমাকে দিশাহারা করে তোলে।'

অনিমেস শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এই যে বড় বড় ঢেউ উঠছে-পড়ছে-ভাঙছে-আবার গড়ছে, একেই তো জীবনের স্পন্দন বলে, না কি! জীবন মানে তো সৃষ্টিশক্তা না। ডোবার জলের মত স্থির অচঞ্চল—'

'কিন্তু এ দুইয়ের মাঝামাঝিও তো কিছু একটা আছে। যেমন নদীর ছোট ছোট তরঙ্গ, যা মনে সংশয় আনে না, জীবনকে অস্থির করে তোলে না, অথচ ওদের গতিও আছে, ছন্দও আছে।'

অনিমেস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'অস্থিরতা নিয়েই আমাদের জন্ম। দেখ না, জন্মবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু কি বিকটভাবে কাঁদতে থাকে, হাত-পা ছেঁড়ে। কেন? সে অস্থির বলে।'

'এ সব উপমা।'

'না অংশু। মানুষ ছোটকে দেখে বড় করে। একটা বীজ দেখে আমরা কিরাট বনস্পতির কল্পনা করতে পারি। এক বিশুদ্ধ জল দেখে বিরাত সিংহকে কল্পনা করা মানুষের অসাম্য না।'

'কী জানি ভাই, জীবন সম্বন্ধে আমি খুব জাবিনা। কারণ ছেবে কোন লাভ নেই। সবচেয়ে হতাশ হচ্ছে পড়ি কখন-কান। যখন দেখি, নিজের ওপর নিজেই কোন প্রভাব নেই।'

সেদিন সমস্ত রাত ঘেনে বসে আবেল-ফাবেল কত কী চিন্তা করে গেলাম। অমচ সেইসব চিন্তা আমার মনে হওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। 'হ্যাঁ এমন কোন রকম জাভার জিনিস রাখার ফিট করা থাকতো, যা চাপলেই চিন্তা থেকে যেত—'

অনিমেব গম্ভীর মুখে বলল, 'মানুষ চিন্তা করতে ভালবাসে বলেই চিন্তা করে। সে যদি চিন্তা করতে না চাইতো, পথ খুঁজে পেত ঠিকই।'

কি ভাবে?'

'খরো সেদিন যে সমস্ত রাত তুমি ঘেনে চিন্তা করতে করতে এলে, ইচ্ছে করলে ঘুমের অমর খেয়ে খুঁজে পড়তে পারতে। অবিশা ঘুমের অমর খেও।' মানুষ সব সময় ঘুমের না, তার প্রমাণ বিভা। কিন্তু সেই চিন্তা না করার ইচ্ছাটা তোমার মধ্যে ছিল না। ঘেনের সময়টা তুমি চিন্তা করে কাটাতে চেয়েছিলে, ওপরের মন নীচের মনের সেই খবরটা রাখে নি পরিত।'

কয়েক দিন অনিমেবের বাড়ি যাওয়া হয় নি। বিভার কথা উঠতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিভা কেমন আছে?'

অনিমেব বলল, 'বিভা মাঝামাঝিভাবে বাঁচতে পারে না। বখন ভাল থাকে খুব বেশী ভাল থাকে। সব সময় হাসে, আনন্দ করে, বখন খারাপ থাকে, তখন ও খুব কষ্ট পায়, কাঁদে, চিৎকার করে।'

বললাম, 'ওকে একবার কোলকাতায় নিয়ে গেলে হয় না?'

'কিছদিন আগে সুপ্রিয়া এসে নিয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসা করিয়েছিল, কিন্তু বিশেষ উপকার হয় নি।'

অনেক দিন পর সুপ্রিয়ার নাম শুনলাম। বেন কত যুগ-যুগান্তর পর।

'সুপ্রিয়া তোমাদের কীরকম আখ্যার?'

'শুনছি মার পুত্র সম্পর্কের বোন।'

'তা হলে ভো তোমার মাসী সম্পর্ক?'

'হ্যাঁ।' বলে অনিমেব চুপ করে রইল।

সুপ্রিয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে অনিমেব চুপ করে বার। অমচ অনিমেবের মুখে সুপ্রিয়ার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে। বললাম, 'সুপ্রিয়া কী অফিসের কাজে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি জানতে পারি নি।' কথাটা অনেকটা নিজেকে শুনিয়ে বলার মত করেই বলিয়েছিল।

অনিমেব শুনতে পেল। বলল, 'ও কি সব কাজ তোমাকে জানিয়ে করে?'

'ঠিক জা মা। তবে এক অফিসে কাজ করি, কেউ কোথাও এলে-গেলে জানা যায়।'

'কাপুরও এসেছিল?'

'ভাই, সত্যি?'

অনিমেব হেসে কেলল, 'বড় অফিসে কেউ কোথাও এলে-গেলে বোকার উপর থাকে না। ছোট অফিসের কথা আলাদা। তুমি যে কাম্পেন্সার খুঁজে এসেছো, হয়ত সমস্ত পাটনা শহরের লোকই সেই কথা জানে।'

আমার মনে তখন সুপ্রিয়ার কথা ঘুরছিল। সুপ্রিয়া যে পাটনার এসেছিল কথাটা প্রেক আমার চোখে গিয়েছিল। 'কিন্তু চাপা কেন? সপ্তে সপ্তে মনে পড়ল উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিম্নস্থ কর্মচারীকে কাজের কৈফিয়ত দেয় না।' পদমর্যাদার বা কমতায় সুপ্রিয়া আমার চেয়ে অনেক বড়। সেই সুবলে ওর গতিবিধি আমার জানার কথা না। 'কিন্তু অফিসের সম্পর্ক' হাড়াও সুপ্রিয়ার সপ্তে আমার আর একটা সম্পর্ক একরা গড়ে উঠেছিল। ইদানীং সে সম্পর্কটা হয়ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একদিন সম্পর্কটা খুব মধুর ছিল। হঠাৎ বলে কেললাম, 'সুপ্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে।' কথাটা বলে কেলই লম্বা পেলাম। আমি যে এতকাল ধরে সুপ্রিয়ার কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি, এটা বেন চুর করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবার মতন।

অনিমেব কিছুকাল চুপ থেকে বলল, 'কম্পেন্সার সপ্তে সপ্তে ভো মানুষকেই বদলান।'

'কিন্তু কম্পেন্সারের মধ্যে সুপ্রিয়া এমন কিছু বড় হয়ে বার নি।'

অনিমেব হাসল। হেসে বলল, 'মানুষ একদিনেই অনেক বড় হয়ে যেতে পারে।' একটুকু খেয়ে থেকে আবার বলল, 'আমার বাবার মাথায় একটা চুলও আগে পাকা ছিল না। যে রাতে বিভা পাগল হল তার পরদিন সকালেই বাবার মাথায় অনেকগুলো পাকা চুল নজরে পড়েছিল।'

অনিমেবের মূণ্ডির অখণ্ডতা খণ্ডন করা গেল না। কিন্তু মধ্যে সেকথা স্মীকার না করে বললাম, 'তোমার বাবার চুল পেঁকেছিল দৃষ্টিভার, কিন্তু সুপ্রিয়ার সে ধরনের কোন চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।'

'বাইরে থেকে মানুষের অনেক কিছুই বোকা যায় না। একটা বড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব যে ওর কাছে, সেকথা কি বাইরে থেকে বোকা যায়?'

অনিমেব বন্ধুত্ব পারে নি, যে সুপ্রিয়ার সংসারের কিছু কিছু কথা আমার জানা আছে। বলে কেললাম, 'শুধু ভো এখন চাকরি করছে, সুপ্রিয়ার তার অনেকটা লাভ হওয়া উচিত। মনে হল চাকির জন্য অনিমেবের প্রদুটো ইংব কুণ্ডিত হল। নাকি দেখার কুলা।

কিন্তু সপ্তে সপ্তে সেই ভাব কাটিয়ে কেল বলল অনিমেব, 'হ্যাঁ, ওর তার অনেকটা লাভ হয়েছে। কোন দুটোর বিয়ে হয়েছে আর চিন্তা কই।'

হেসে কেললাম, 'চিন্তা শেষ পর্যন্ত মানুষের থেকেই যায়। নিজের বিয়ের ব্যাপার নিয়েও তো চিন্তা করতে হবে ওকে। আফটার অল সী ইজ এ উওয়ান। মেয়েদের বিয়েটা অফসন না, নিডাস্তই প্রয়োজন।' ভেবেছিলাম, আমার কথার ধরনে অনিমেব হেসে উঠবে। অনিমেব হাসল না, গম্ভীর মুখে শব্দ বলল, 'তা খটে। বেললাম অনিমেব সুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের ওপর বন্ধিকা টানতে চাইছে।

আমার ঘরে বসে কথা হাছিল। ঘরে ঢুকল জয়ন্ত দেহাই। জয়ন্তকে খুব প্রফুল দেখাছিল। ঢুকেই জয়ন্ত আনন্দে ফেটে পড়ল। অনিমেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার লেডী-লাভ এসে গেছে।'

অনিমেব উত্তর দিল, 'কিন্তু উচ্ছ্বাসটা তোমারই বেশী।'

জয়ন্ত কী বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। অনিমেবের দিকে আরও দূ-পা এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু খবরটা তুমি জানলে কী করে?'

অনিমেব মুচকি হেসে জবাব দিল, 'স্টেশন থেকে আমাকে ফোন করেছিল।'

'আর তুমি এখানে বসে আছ? উত্তে-জনর মাথায় জয়ন্ত একটা পা অনিমেবের চেয়ারে তুলে দিল।

আমি একবার অনিমেব, একবার জয়ন্তের মুখের দিকে তাকাছিলাম। অনিমেব আমার অবস্থা বুঝতে পেয়ে বলল, 'লীলাবতী দেশপাণ্ডে আজ পাটনার এসেছেন।'

'সেই লীলাবতী, হার কেমল বাহুতে শরীর ছেড়ে দিলে কাপড় সাহেব গাড়িতে এসে উঠেছিলেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেব কথা বলল না। শুধু মূখ লম্বা করে ওপরে-নীচে মাথা দোলাতে লাগল।

জয়ন্ত বলল, 'দ্যাখো ডাট, তোমার আশ্চর্যের ভাল। এক-এক সময় তোমার সংবন্ধে আমার আশ্চর্যীড় বলে মনে হয়।'

জয়ন্তের মুখে এ-ধরনের কথা মানার না। শরতের মেঘের মত হাসকা আর হুত ওর গতি। কোন ভারী কথা ওর মুখে শুনলে কেমন বেন বে-সুরো লাগে। মনে হয় জয়ন্তের বেশ ধরে অন্য কেউ এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তের পাটনার লোভ সামলতে না পেয়ে বললাম, 'অনিমেব তখন কান্ত ছিল, কিন্তু আগনি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে পারতেন।'

জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে বলল, 'লীলা গাড়ির জন্যে অনিমেবকে কোন করেনি। ওর বাবার গাড়ি খুব ভোর থেকেই স্টেশনে পড়ে আছে।'

'দেশপাণ্ডে বাড়ি মেয়েকে খুব ভাল করেন?'

অনিমেঘ নির্বিকারভাবে সিগারেট টানতেই লাগল। যেন এইসব কথাবার্তা কিছুই ওকে স্পর্শ করছে না। অনিমেঘ এক এক সময় কী ভয়ানক বিগ্ট্রী পল্লি-স্থিতির সৃষ্টি করতে পারে! ও যে কোন কথা না বলে নির্বিকার চিত্তে ঘোঁরা ছেড়ে দাচ্ছে, এ যেন লীলাবতীকে অগ্রাহ্য করার একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস। অথচ এ-ধরনের ব্যবহার করার কোন ব্যঙ্গিল্পগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনিমেঘের এই ব্যবহারের জন্য আমি 'ভেতরে ভেতরে' লীলাবতী দেশপাণ্ডের কাছে যেন নিঃশব্দে অপসাদা কল ভাকত শুনর করলাম। লীলাবতীকে লক্ষ্য করে বললাম, অনেকটা



পথ চেনে করে এলেন, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, দুপুরে ঘুমোলেই পারতেন।'

লীলাবতী বিম্বভাবে হেসে বলল, 'কিন্তু তুমি হয় না। তাছাড়া মনের মধ্যে একটা জেন্ডও ছিল, ভেবেছিলাম, আমাকে দেখে আপনারা সবাই খুশী হবেন।'

'কী অশ্চর্য! এখনও অনিমেব কথা বলল না। বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হল, কিংবাস করুন, আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি।'

লীলাবতী খুব জোরে হেসে উঠল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি দেখছি খুব ভদ্র আর আদর লোক। মানুষকে কষ্ট দিতে কষ্ট পান।'

লীলাবতীর এই হাসিতে সত্যি সত্যি ভয়ানক বিরত বোধ করলাম। জোর গলায় বলে উঠলাম, 'জগতের মধ্যে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখার শব্দ ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছেটা যে এত ডাড়াডাড়া হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারি নি।'

'বিরল্লাস?' লীলাবতী যেন আনন্দে নড়ে উঠল।

'সত্যি কিংবাস করুন।'

লীলা চোরাচোর উপরে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, 'কিংবাস করলাম। শব্দ শুধু কিংবাস করলাম তা-ই না, ভীষণ খুশীও হলাম।'

নিজেকেই নিজের আদর করতে ইচ্ছা করল। সামান্য দুটো মিষ্টি কথা দিয়ে একজন মানুষকে খুশী করতে পারলে কাব না আনন্দ হয়। তাছাড়া লীলাবতীর মত সুন্দরী মেয়েকে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখলে কার কি লাগে জানি না। আমার খুব খারাপ লাগে। মনে হয় সমস্ত ছন্দপতনের জন্য আঁকি যেন দায়ী।

অনিমেব সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বললাম, 'চোখায় চলল?'

অনিমেব বলল, 'একটা ব্রেক-ডাউন কল আছে, দেখে আসি।'

'আর একটু পরেই তো ছুটি হয়ে যাচ্ছে। কাল ভোরেই না হয় যেও।'

'নাঃ, কাজটা সেয়েই আসি।' বলে অনিমেব দরজার দিকে পা বাড়াতো যাচ্ছিল, হঠাৎ লীলাবতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার জন্যে আপনাকে যেতে হবে না অনিমেববাবু। আমিই চলে যাচ্ছি।'

আমি উঠে এসে লীলাবতীর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আর একটু পরে সবাই একসঙ্গে উঠবো। আপনাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আমি আর অনিমেব চলে যাব। তুমিও একটু বসে যাও অনিমেব। তোমরা দুজনে গল্প কর, আমি একটা চিঠি ড্রাফট করছি।' বলে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেলাম। অল্প লিখবার মত কোন চিঠি

আমার ছিল না। চিঠি লেখার অবকাশে আমি ওদের ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করিলাম। ওদের রহস্যজনক ব্যবহার আমাকে অসম্ভব বিস্মিত করেছিল। কিন্তু অনিমেব আর লীলাবতী একটাও কথা বলল না। মুখ না তুলেও বুঝতে পারছিলাম, অনিমেব স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও টেক্সেলের উল্টো দিক থেকে আমার চিঠি পড়া অনিমেবের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়, তবু আমাকে ষাখাসাধ্য সতর্ক হয়ে চিঠির খসড়া করতে হচ্ছিল।

হঠাৎ লীলাবতী কথা বলে উঠল, 'কাজের সময় এসে পড়ে আপনারের কাজ করলাম বলে মনে কিছু করলেন না তো মিস্টার চ্যাটার্জি।'

হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'আপনি এসে নিশ্চয়ই আমাদের কাজ করতে দেখেন নি।'

লীলাবতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনারা ভীষণ ফাঁকিবাজ।'

'হা বলেছেন।' বলে মুখ তুলে তাকাতেই অনিমেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অনিমেবের চোখে মুখে 'কোথাও কোতুক ছিল না। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ডাক্তার তোমাকে সিগারেট ধোতে স্বরণ করেছেন, তবু এত সিগারেট খাও কেন?'

অনিমেবের চোখে নীরব হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আমি এখন সিগারেট খাচ্ছি না।'

অপ্রস্তুত না হওয়ার ভান করে বললাম, 'কিছুক্ষণ আগেই অসম্ভব সিগারেট খাচ্ছিলেন।'

'তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার ওঠ।' বলে অনিমেব উঠে দাঁড়াল। চোখের সামনে কাগজের দিকে চোখ গেল। সেখানে কয়েকটা কাটাকাটি ছাড়া একটাও অক্ষত লাইন নেই। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

একসঙ্গে এসে অফিসের গাড়িতে উঠলাম। লীলাবতী মাঝখানে বলল। আমি আর অনিমেব দু'পাশে।

গাড়ি চলেছে। তিনজন পাশাপাশি বসে রয়েছে। কাগজও মুখে কথা নেই। হঠাৎ লীলাবতী বলে উঠল, 'রোববার কোন এন-গেজমেন্ট আছে?'

বললাম, 'আমার তো একটাই এনগেজমেন্ট। প্রতি রবিবার অনিমেবের বাড়িতে খাওয়া। ওর বোন বিডা খুব ভাল রাখে।'

'আমি ওর রান্না খেয়েছি। নৈস্কৃত্য করে কেউ খাওয়ায় নি অসম্ভব। জোর করে একদিন খেয়ে এসেছি।' লীলাবতীর দিকে না তাকিয়েও বললাম, 'ও চোখের ফাঁক দিয়ে অনিমেবকে দেখে নিল। অনিমেব উত্তর দিল না। যেমন বসে ছিল, তেমনভাবেই বসে রইল।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার আলো এসে গাড়ির মধ্যে পড়ছিল। অনিমেবকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওর গভীর কোন চিন্তার ডুবে রয়েছে। এখানেই অনিমেবকে আমি বুঝতে পারি না। যখন সবার মধ্যে থেকেও অনিমেব এক গভীর নিঃসঙ্গতায় তলিয়ে যায়, তখন আমার ভয় করে। মনে হয়, একজন অতিপরিচিত মানুষ যেন কুয়াশার গাঢ় পর্দার আড়ালে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

'আপনাকে নৈস্কৃত্য করে খাওয়াবার কোন উপায় আমার নেই লীলাবতী। আপনি আমাকে কমা করুন।' হঠাৎ অনিমেব যে এভাবে কথা বলে উঠবে বুঝতে পারি নি। আমি আর লীলাবতী একসঙ্গেই প্রশ্ন করে উঠলাম, 'কেন?'

অনিমেব নিজের মনেই যেন উচ্চারণ করল, 'কেন? এই কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে এটুকু জেনে রাখুন, সে উপায় যদি আমার থাকতো, আমি খুব খুশী হতাম। আমরা এখানে নামবো। এসো অংশু।' গাড়ি দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে অনিমেব নেমে গেল। বাধ্য হয়ে আমাকেও নামতে হল। গাড়ির জানালা দিয়ে লীলাবতীর মুখ দেখা যাচ্ছিল। লীলা হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। রাস্তার আলো এসে লীলাবতীর মুখে পড়ছে। ওকে একজন নরম আর দুঃখী মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

রাস্তায় নেমে অনিমেব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। ফুরুরে হাওয়ায় শরীর ও মনের ক্লান্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। এক সময় বললাম, 'মেয়েদের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় প্রীতি যখন বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়, সময় সময় প্রচণ্ড বিরাগও কিছু খুব সুখকর হয় না।'

অনিমেব উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল। এতক্ষণ হয়ে গেল, অনিমেব একটা সিগারেটও ধরাল না। এমন কী ভাবছে অনিমেব যে সিগারেট খেতেও ভুলে গেছে। বললাম, 'তোমার কোন কাজ নেই, তা সন্ডেও নেমে পড়লে কেন? বাড়ি তো এখনও অনেক দূরে।'

অনিমেব নীচু স্বরে বলতে লাগল, 'কি জানি কেন নেমে পড়লাম। অল্প না নেমেও আমার উপায় ছিল না। আমার দর বন্দ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন ক্রমশই একটা অশ্ভকার গহবরে তলিয়ে যাচ্ছি। জানি না, আমি কি করবো।' কি করতে পারি আমি।' বলতে বলতে আবেগে অনিমেবের গলা কাঁপতে লাগল।

অনিমেবের অসহায়তা আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, 'যদি আপনি না থাকে, তোমার কথা আমাকে বলতে পার। সাহায্য করতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু বললে তোমার মনের ভার লাঘব হবে অনিমেব।'



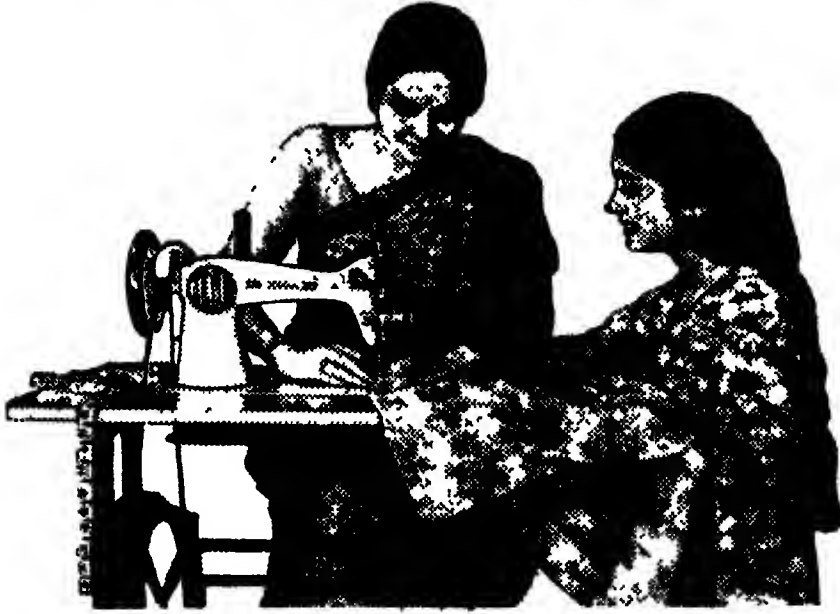
অনিমেব আমার একটা হাত চোপে ধরল, ওর হাত বামে ডিকে উঠেছে। অনিমেব বেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে অনিমেব বলে উঠল, কী বলবো, কেমন করে বলবো! থাকে কলো পোত মন চায়, সে কাছে এলে কেন দূরে সবে যেতে চাই। সেকথা আমি কেমন করে বোঝাবো। কে আমার কথা বুঝবে! এঁদকটায় রাস্তা একটু ফাঁকা। আলো-গালা অনেকটা দূরে দূবে। অনিমেবেব

মুখ দেখা কাঁছিল না। দূ হাত দিয়ে অনিমেবের হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুমি বজো অনিমেব। আমি তোমার কথা কোবার চেষ্টা করবো।'

অন্ধকারের মধ্যে অনিমেবের কথা কানে আসতে লাগল। অনিমেব বেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। ওর কথা অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল। 'লীলা আমাদের বাড়িতে যে দিন গিয়েছিল—বিভার রামা খেয়েছিল, সেদিন বিভা সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। শুধু

চোঁচিয়েছে, আর ঘরময় লাগ লাগি করে বোঁড়িয়েছে। শেষ পর্বন্ত লীলা মনে করে নিজের গলাই টিপে ধরেছিল বিভা। আমি গিরে না পড়লে নিজেকেই নিজে খুন করে ফেলতো।' অনিমেব থামল। কিন্তু অনিমেবের কথাগুলো বেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। অনিমেব গিরে না পড়লে বিভা নিজেকেই নিজে খুন করে ফেলতো! কেন নিজেকে খুন করে ফেলতো বিভা!

## ওকে আদর্শ গৃহিণী করে তুলুন...



## একটি উঁয়া সেলাই মেশিন কিনে দিন

ইয়া, তুমি আগনিই পারেন ওকে একজন হুসক ও বিদেশী গৃহিণীতে রূপান্তরিত করতে... যে বয়স-সংলগ্নের এক মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠবে।

অল্প বয়স থেকেই ওকে শেখান। ওকে একটা উঁয়া সেলাই মেশিন কিনে দিন। রেবকেন, সে নানা রকম নকশা, ডিজাইন ও সেলাইয়ের কৌশলে জামা-কাপড় ও গৃহসজ্জার কত বাহার জুটিয়ে তুলে আপনাকেও আনন্দ দেবে। তারি পর্বা ও গদির ঢাকা থেকে ছোটদের হৃদয় পোশাক এবং শিশুদের সুন্দর কাপড় ত্রুক পর্যন্ত সব কিছুই উঁয়া সেলাই মেশিনে তৈরী করা যায়।

আপনার সময়, যেকোনও ও পরমাণ্ড বাঁচবে। কারণ উঁয়া সেলাই মেশিনগুলি :

- সহজে, অবাধে ও কম খরচে সেলাইয়ের অল্প কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং নৈপুণ্য দিয়ে তৈরী।
- বিক্রয়োত্তর নকশাভিষ বাবস্থা দ্বারা যুক্ত—আপনি যেখানেই থাকুন না কেন।
- ২০০০ বায়েরও বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় যাতে সবলীলভাবে কাজ করতে পারে।
- নানা রকম মডেলে পাওয়া যায় এবং হাতে, পায়ে বা ইলেকট্রিকে চালানো যায়।

মূল্য ১৮০০ টাকা ও তার উপরে। কিত্তিতেও কেনা যায়।

কেবল কাল সম্ভাব্য কাল

অনিমেব আবার চক্রে লাগল, 'অনিমেব লীলাকে একথা বলি যার না। লীলা বন্ধবে না। মনে মনে বিস্মিত হবে, আমাকে পাগল ভাবে'।

কিন্তু এ বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত, বিভা শুধুমাত্র লীলাকে দেখলেই কিম্বদন্তি হয়ে ওঠে?'

'শুধু লীলাই না। সুপ্রিয়াকে দেখেও একবার এ রকম হয়েছিল ওর। অথচ এখন সুস্থ হয়, তখন কিছই মনে থাকে না। ভাজাররা বলে, এ এক ধরনের পরিনির্ভর-শীলতা। বিভা আমার ওপর নির্ভর করে, আমাকে ভালবাসে। ও চায় না, এই ভাল-বাসার অংশীদার আর কেউ হয়। ভাকতে পারো, এমন কি মাও ওর সামনে আমার সূপে বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে পারে না! বিভা সম্প্রহের চোখে তখন মার দিকে তাকায়।' কথা বলতে বলতে অনিমেবের গলা ভারী হয়ে এল। অনিমেব চুপ পড়ল।

বললাম, 'আমার মনে হয়, লীলাকে এ বিষয়ে জানানো উচিত।'

'ও বন্ধবে না। বন্ধলেও মানতে চাইবে না। তার চেয়ে ও যদি বন্ধতে পারে, আমি ওকে এড়িয়ে যেতে চাই, একদিন হঠাৎ দূরে সরে যাবে ও।'

হাটতে হাটতে অনিমেবের বাড়ির কাছে চলে এলাম। অনিমেবের বারান্দার আলো জ্বলছে। বারান্দায় একটা ছায়া ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনিমেব বলল, 'একটা ভালবাসার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে বিভা। এ যে ওর কী শান্তি, আর কেউ না বন্ধবে, আমি বন্ধতে পারি। বতরুণ না ফিরবো, ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। থাকে না, বসবে না, কারও সূপে কথা পর্যন্ত বলবে না।'

একটা কথা বলবো অনিমেব?'

অনিমেব বলল, 'বলো।'

বিভার বিয়ে দাও। চেষ্টা করলে এমন ছেলে পাওয়া অসম্ভব না, যে অত্যন্ত কিছ-টাকা পণ নিয়েও—'

## হাওড়া কুঠকুটীর

বর্তমানের প্রয়োজন, বাস্তব জীবনকে  
কল্যাণ একত্রিত করে রাখার জন্য  
কল্যাণ জীবনের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া  
পত্র প্রকাশ পটন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত  
গজেন্দ্রনাথ বসু, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ  
সময় বরেন্দ্র, হাওড়া। পাতা: ৩৬  
কালীনাথ রায়, কলিকাতা-১।  
ফোন: ৬৭-২৩৬১।

কথা শেষ হবার আগেই অনিমেব চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, এ কী বলছো তুমি!'

হঠাৎ নিজের কাছে নিজেরই বেল খুব ছোট হয়ে গেলাম। খুব ছোট একজন মানুষ। আর অনিমেবকে খুব বড় কেউ বলে মনে হতে লাগল।

গেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনিমেব ডাকল, 'এসো।'

বিভা তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এসে অনুরোধের সূত্রে বলল, 'এত দেরী যে আজ। কথা ছিল না, সকাল সকাল এসে বেড়াতে নিলে যাবে।' আমাকে যেম বিভা এইমাত্র দেখল। দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'একী, আশনি বাইরে কেন? আসুন, আজ কীরের চপ করছি, ভাল হয় নি তোমন, তবু খেয়ে দেখবেন, আসুন।'

'আজ না, আর একদিন।' বলে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত রাস্তা দিয়ে ছুটে চললাম। বিভার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত শক্তি আমি কেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আরও কিছুকণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হোটেল ফিরে এলাম। এসে লুনলাম, এক ভরলোক আমার খোঁজে দ্বার এসে ফিরে গেছেন। হলে গেছেন, আবার আসছেন। ঘরে এসে কাপড়-জামা ছাড়তে না ছাড়তেই দরজায় শব্দ উঠল। দরজা খুলতেই চোখের সামনে বাক দেখতে পেলাম, তাকে দেখার কল্পনা এই মূহুর্তে ছিল না। চোখের সামনে রতন রত্নচারীর বিশ্রান্ত মূর্তি আমাকে বিস্মিত করল। বললাম, 'এই অসময়ে?'

রত্নচারী হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফেটে পড়লেন, 'আমিও ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার বাপ-ঠাকুরা সন্ধ্যা-আহিক না করে কোনদিন জলপান করেননি। সেই বংশের সন্তান আমি। অভিশাপ দিলে ফলবেই ফলবে।' সার্ভের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রত্নচারী বোধ করি উপবীতের স্থান-কমতে লাগলেন।

বললাম, 'ব্যাপার কি রত্নচারী মশাই? এত উত্তোজিত হবেন না। বসুন।'

রত্নচারী না বলে দাঁড়িয়েই রইলেন। বড় বড় নিশ্বাসে ওর ভারী বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল যে-কোন মূহুর্তে প্রচণ্ড আবেগে রত্নচারী খণ্ড খণ্ড হয়ে ধরমর ছাড়িয়ে পড়বেন। এক সময় উনি বলে উঠলেন, 'জানেন স্যার স্কাউট-ড্রলটা কী করেছে।' রত্নচারীর শরীর আবার থর থর করে কাঁপতে লাগল। অত্যধিক উত্তেজনার মানুষের হৃদপিণ্ড সময় সময় বিকল হয়ে যেতে পারে এমন একটা ধারণা থাকার ভয় পেয়ে গেলাম।

রত্নচারীকে ধরে ডেরারে বসিয়ে দিতেই উনি দুই হাতের আড়ালে মুখ

ঢেকে ফেললেন। কিছুকণ সেইভাবে বসে থেকে রত্নচারী মুখ ফুললেন। অসম্ভব লাল আর কোলা কোলা চোখ দুটো। সমস্ত মুখে বেল কালি মাখানো। সামান্য দিলে বললাম, 'প্রত্যেকের জীবনেই এক সময় বিপদ আসে, কিন্তু তাকে মুকড়ে পড়লে তো চলে না।'

কথার দারুণ কাল হল। রত্নচারী বুক টান করে বসলেন। মাথা উঁচু করে বললেন, 'রত্নচারীরা একমাত্র ভগবান আর বাপ-ঠাকুরা ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। আমিও দেশপাণ্ডেকে সেখে নেবো স্যার। দেশপাণ্ডের নাম বলে ফেলেই যেন রত্নচারী বিব্রত বোধ করলেন। নিমেষের মধ্যে সেই ভাব কাটিয়ে বলে উঠলেন, 'বেইমানী স্বারা আর যাই হোক, কোন মহৎ কাজ হয় না। আপনিই বলুন, হয় কি?'

ভালমন্দ উত্তর না দিয়ে রত্নচারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। রত্নচারী রত্নশই সন্তোষিত হয়ে পড়তে লাগলেন। উনি যেন কথা হারিয়ে ফেলছেন, বিশ্বাস করুন স্যার, খাওয়ার-দাওয়ার পর সবমাত্র চোখ দুটো বজে এসেছে, জমিন ফাদাস' কমান্ড, রতন, একুনি চাটাজি' সাহেবের বাড়ি যা। সং ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁকে দুটো মিষ্টিমুখ করিয়ে আয়। দেখুন স্যার, বলতে বলতে লোম কী রকম দাঁড়িয়ে গেছে। দেখুন—' বলে লোমশ একটা হাত আমার চোখের খুব সামনে তুলে ধরলেন রত্নচারী।

বলার মত কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে ছিলাম। রত্নচারী হঠাৎ আমার একটা হাত টেনে নিয়ে একগোছা নোট সেই হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললেন, 'ব্রাহ্মণ-সন্তান স্যার, ফাদাস' কমান্ড না মেনে উপায় নেই। ছুটেতে ছুটেতে চলে এলাম। মিস্ট্র কিনে খাবেন স্যার। আগরওয়ালা ব্যাটা কী কম শরতান স্যার। উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাবার শরণাগত হল।'

'আগরওয়ালা আপনার বাবার সন্ধান পেল কি করে?' বলতে বলতে সমস্ত রহস্য হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। হাত সন্ধিরে নিত নিতে বললাম, 'একটু ভুল করেছেন, রতনবাবু, টাকার কথাগুলো দিন, কাজ হবে। আমার কন্যতা খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত কোলকাতা অফিসই নেবে। আপনি এখন আসুন।' বলে উঠতে বাঁজলাম, হঠাৎ রত্নচারী আমার পা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে, গেলেন। সরে গিয়ে বললাম, 'করছেন কী।' রত্নচারী শুনলেন না, পা চেপে ধরে শব্দ করে কে'দে উঠলেন। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ যে এভাবে কাঁদতে পারে জানা ছিল না। বিস্মিত হয়ে পড়লাম।

বাধা হচ্ছে ব্রজচারীকে জোরে ধাক্কা দিতে হল, 'আপনি যদি এভাবে নাটক করেন, বাধা হবে আমাকেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

ধমকে কাজ হল। ব্রজচারী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের জল মুহূর্তে মুহূর্তে কললেন, 'আপনি কোনদিন বয়স্ক কোন মানুষকে কাঁপতে দেখেছেন স্যার? দেখেননি। আমিও কাঁদি না। আজ হঠাৎ কী বে হল! হয়ত প্যালে মানুষ দেখলেই মানুষের কামা পায়।'

'শান্তভাবে বললাম, 'আমি দয়ালু মানুষ না। তাছাড়া আমার কাছ থেকে দয়া বা করুণা আপনি নেননি বা কেন? ও দুটোই মানুষকে ছোট করে দেয়।'

'আপনার কাছে আমার ছোট হতে আপত্তি নেই স্যার। আগরওয়ালা যদি 'উন্নয়নশীল না পায়, আমি মুখ দেখাতে পারবো না।' একটু থেমে ব্রজচারী আবার বললেন, 'শব্দ মুখ দেখানো না, আমাকে দেখাড়া হতে হবে।'

আমার কিয়ামত ভয়শয় চরমে উঠছিল। 'আপনাকে দেশ ছাড়তে হবে কেন?'

ব্রজচারী কিছুকণ কী ভেবে নিলেন। 'দুপুর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার কাছে মিথ্যা বলবো না স্যার, আগরওয়ালা কিছু টাকা খরচ করেছে।'

'আপনি টাকা খেয়ে ক'স আছেন? ওগো সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক থাকা উচিত না।'

ব্রজচারী একটুও দমলেন না। সংগে সংগে উত্তর দিলেন, 'কার যে কোথায় কী সম্পর্ক গড়ে উঠছে কে বলতে পারে স্যার। আপনিই কি ভেবেছিলেন, জামসেদপুরে কে আপনাদের কোম্পানীর ভাল কেটে না এটার তার জনো আপনাকে সেখানে বেত দেবে। শব্দ যে বেত দেবে তাই না, একটা কোংরা কাজ আপনার হাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে।'

আবার গোলক-মাধার মধ্যে পাক খেতে শুরু করলাম। বললাম, 'কোংরা কাজ?'

'কোংরা কাজ ছাড়া কী বলবেন একে। দস্তুর কোম্পানী কি সত্যি সত্যি ডিলার ওয়ার উপযোগী?'

'কে আপনাকে বলেছে যে, দস্তুর কোম্পানী আমাদের ডিলার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে। আমার রিপোর্ট এখন পর্যন্ত কোলকাতার পৌঁছেছে কিনা সম্ভব, 'প'হলেও ডিসিসন হয়তো এখনও নেওয়া হয়নি।'

আমার কথা শুনে ব্রজচারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'আমাকে লুকোচ্ছেন কেন স্যার। আমি আপনার বন্ধু লোক, বিশেষ বাড়ীলী, বলতে গেলে আমরা তো এক ফেমিলিরই মেসার, তাই কিনা স্যার, বলুন। আপনি বা করেছেন বেশ

করেছেন। দস্তুর ডিলারশিপ পাক আমার আশ্রিত নেই। আগরওয়ালাকেও আর একজন ডিলার করে দিন স্যার। গরীবের এই কথাটা রাখুন, না হলে খনে-প্রাণে মার্যা বাব।'

ব্রজচারী আমার হাত ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিলেন। দূরে সরে গিয়ে বললাম, 'আপনি যদি না বলেন, আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাব। কে আপনাকে বলেছে যে, দস্তুর ডিলার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে?'

ব্রজচারী কিছুকণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'সত্যি আপনি জানেন না? কী আশ্চর্য! আমি নিজের চোখে চিঠি দেখে এসেছি। আজকের ডাকেই চলে গেল।'

'কে আপনাকে চিঠি লিখেছে?'

'কেউ না।' ব্রজচারী অস্বাভাবিক বলে ফেললেন।

'কেউ না দেখালে চিঠি উড়ে এসে আপনার হাতে পড়তে পারে না। চিঠি দেখানোর প্রস্তুতি বাড় না। প্রস্তুতি হচ্ছে আমার সাজেসন না নিয়ে হঠাৎ এই কাজ করা হল কেন?'

ব্রজচারীর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তবেই বুঝুন স্যার কী সব হচ্ছে এখানে। দু'দিন পরে এখানে ফ্যাক্টরী হবে, লাখ লাখ টাকার লেনদেন হবে, তখন যে কী হবে!'

আমার মাথা ভয়শয় গরম হয়ে উঠছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'কিছুই হবে না। কিছুই হতে দেব না।'

'কিন্তু সবার বিরুদ্ধে একা লড়াই করার মত শক্তি কি আপনার হবে স্যার?' কথা বলে সাগরে ব্রজচারী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গইলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললাম, 'একা কেন, সেদিন কি আপনাকে সংগে পাব না?'

'নিশ্চয়ই-পাবেন স্যার। ন্যায় বোধিকে, আমি সেই দিকে। ক'বা কেঁচে থাকতে বলতেন, দাখ-রতন—'

অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলাম, 'আবার কথা থাক। একটা কথা শুনুন আমাকে বলে বান, এই অফিসে বন্ধু বলে আমি কাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

ব্রজচারী কিছুকণ চোখ বুজে রইলেন। 'আপন মনে বাড় নেড়ে নেড়ে কী সব কিড় বিড় করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, 'কিও লোকটাকে আমি কোনদিন ভাল চোখে দেখি না, তবে মিথ্যা কেন বলবো স্যার, আপনার বন্ধু হবার উপযুক্ত লোক এখানে একজনই আছে, অনিমেব দস্ত।'

'অনিমেব দস্ত লোক কেমন?' অনিমেব সম্পর্কে আরও পরিষ্কার করে জানতে ইচ্ছে

করল, বিশেষ করে ওর সঙ্গে লীলাবতীর সম্পর্ক আমাকে কোতিলী করে ফুলেছিল।

'ব্রজচারী বললেন, 'লোকটি সম্পর্কে ভাল বা মন্দ এক কথা কিছু বলা যায় না। ও দারুণ ভাল, আবার দারুণ খারাপ। ভাল বলতে পরলা-কড়ি ছোঁর না। মেরে-মানুষের দিকে ঝোঁক নেই। কাজেও নাম আছে। খারাপ বলতে অসম্ভব অহংকারী। মানুষের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ক'টা কথা হয়েছে গুনে বলা যায়।'

'ওর সঙ্গে তো দেশপাণ্ডে সাহেবের মনের খুব ভাব বলে মনে হয়।'

'আপনি কি করে জানলেন স্যার?' ব্রজচারী পালটা প্রশ্ন করে বললেন।

'যে করেই হোক, জানি, কথাটা সত্যি কিনা বলুন।'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'এ নিয়ে দেশপাণ্ডে কিছু বলেন না?'

'কল না আবার! প্রচণ্ড গজনির স্যার। যেন শেকল-বাধা সিংহ। সেবারে তো আর একটু হলে আমার মুখেই একটা বুদ্ধি জন্মিয়ে দিতে যাচ্ছিলো দেশপাণ্ডে। দোষের মধ্যে আমি বলছিলাম, করণিষ্ঠ অ্যাণ্ড ফলগেট। লীলা আর অনিমেবকে নাকি বাজারের দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখেছিল কে, এই নিয়ে কী হলোপলো কাণ্ড। অথচ লোকটা এমন কাওরান স্যার, নিজের মেরেকে একটা কথা বলতেও সাহস করে না। অনিমেবকে দেখলে তো সাত হাত দূর থেকে পালায়।'

'কেন?'

ব্রজচারী কী বলতে গিয়েও মেনে বললেন না। শব্দ বললেন, 'লুকোলের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে শব্দ মাথার ব্যাথা বাড়বে তো নয়। আমি গরীব। গেরগেব মানুষ, সেইভাবেই থাকি। আর দেরী করবো না স্যার। আজ উঠি। বড় আশা করে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম, আপনি শক্তিমান লোক, কিন্তু এভাবে ল্যাং খেয়ে যে পড়ে যাবেন, বুঝতে পারিনি।'

ব্রজচারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার আগে আমার দিকে ব'কে পড়ে ফিস ফিস করে বলে গেলেন, 'বাক একটা কথা খুব বলতেন। বলতেন, শয়তানের সঙ্গে শয়তানি না করলে শয়তান জন্ম হয় না। কথাটা খুব দামী। আজ চালি স্যার।' ব্রজচারী দু'হাত কপালে ছুঁইয়ে রেখে পিছু হটে হটে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার বললেন, 'আমি ব্রজগ-সন্তান স্যার। বয়সেও আপনার চেয়ে অনেক বড়। আমি বলে থাকি: ন্যায়ের পথ ধরে এগিয়ে চলুন, একদিন না একদিন আপনি জয়ী হবেনই।'

(কল্পনা)

# অর্থনৈতিক সমীক্ষা : বেকার সমস্যা

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

## কেন বেকার?

যদিও বেকার বৈশ্বিক অর্থকাল পায় না তবুও বেকার বৈশ্বিক। ধরুন, আমার শ্রমী-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের বন্ধু—এটা ঠিক কলেন যে চাকরি করছেন। কারণ এতে পারে, বর্তমান শ্রমী-স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক যুগে শ্রমীর ওপর নিষ্ঠুরতাবাদী থাকা তিনি আর যুক্তিবদ্ধ মনে করেন না, কিংবা ছেলের মতো দুটি বড় হয়ে খুলে যেতে শুরু করেছে বাকি ফলে দুপুরে তার কোন কাজ নেই, কিংবা হরত মনে মনে ভেবেছেন ভগ্নলোকের মতো! থাকতে হলো এই দুর্মূল্যের বাক্যের আরও কিছুটা আর বৃষ্টি করা দরকার বা তাঁর অর্থ-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সার্বভৌম কল্যাণ না, কিংবা এই রকম আর কিছু। তা কারণ যাই হোক, এতদিন তিনি ছিলেন 'নিরাকার'। তবুও হ'লে গেলেন বেকার (শ্রমী-মধ্যবিত্ত ঠিক কী হয় জানি না)। ফলে দেশের বেকারের সংখ্যার এক বোঝা হল। এতদিন কোন ফরম পূরণ করতে হলে পেশার ঘরে তিনি হরত লিখতেন 'গৃহস্থালি' বা ইংরেজীতে 'হাউস-হোল্ডি' (হাউস-হোল্ডি)। এখন থেকে হরত লিখতেও কম 'প্রার্থী' (প্রার্থী) বা 'জব-সিকার'।

চাম্পন পরগনার এক গ্রামের খুলে পড়ত সাধন কর্মকারের ছেলে রতন, হাপরশালে বৃষ্টিতে সমাধাও করত। কিন্তু জন্মবাসনা সার চলে না, প্রাচীন কর্মকারের তৈরী জটিল-কলঙ্ক এতদিন লাঙলের ফলারও আর বিশেষ চাহিদা নেই। আর পড়ানোও রতনের ভাল লাগে না। সাধন তার তাঁর পরগণা বসে করে রতনকে পরগণার কাছে নিছাটীতে পাঠিয়ে দিলে—বাবা একটা কাজ-টাজ পাওয়া যায়। পরগণা সেখানে এক চট করে চাকরি করে।

কিছরের আর জেলা থেকে এসে শহর-উল্লীতে খাটাল খলোছিল রামবোলা রাই। দুধের বাবসা আর ভাল চলে না, পদ্মদেবীর পায় বেহারে বাড়ছে, সেই অন-পাতে দুধের দায় বাড়লো হলে খলো পাকে না। তা'ছাড়া খাটালের জমি নিয়েও নিরত আমোলা লেগে আছে। এর ক্ষেত্রেও আমোলায় কলকারখানার যদি একটা চাকরি পড়ত।

শেখপাড়া রামবোলা খাটাল একরকম। তুটেই দিল, বা তুলে দিতে বাধা হল। কিন্তু সে আর আমোলা জেলার ফিরে গেল না। ফলে

নগরাজলে বেকারের অলিখিত তালিকা 'অদৃশ্য কাল্পিতে' আর একটা সংখ্যা বোঝে হল।

কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্নাতক পরীক্ষার ফল বেরুল (আজকাল আর একসঙ্গে, এমনকি কাজকাঁছও বেরোয় না)। ফল ছাড়া-ছাড়ীর সংখ্যা ৫০ হাজারের মত। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ পেল বা এই শিক্ষার গেল ১০ হাজারের মত (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সহ-সভাপতি ডাঃ অজিতকুমার বসু প্রদত্ত পরিসংখ্যান)। বাকী ৪০ হাজার রাতারাতি হ'লে গেল বেকার—যাদের বোধহয় একটা 'সংখ্যা' করেই বলা হয় 'শিক্ষিত বেকার'।

স্নাতকোত্তর শিক্ষার যে ১০ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী চুকল তাদের অধিকাংশই পাস করে বা ফেল করে বা মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই পর্ব-রত্ন হ'বে। সত্যম্ব এই অধিকাংশও সম্ভাব্য বেকার। অশ্রম ছাত্রীদের অনেকে বরমালোর দৌলত এই আশংকা থেকে আপাতত মুক্ত থাকবে, এবং পরে আমার শ্রমীর মত কর্ম-প্রার্থীরা তালিকা পূর্ণ করবে।

আমার শ্রমী, চাম্পন পরগনার গ্রাম থেকে আগত রতন, পর্বতন খাটাল ওরাশা রাম-বোলা এবং নিরবদ্যলগ ও শিক্ষা পর্বদের জাপ দারা শিক্ষিত বেকার ছাড়া আরও এক-রকম কর্ম-প্রার্থী আছে বা প্রচ্ছন্ন বা অর্থ-বেকারদের কলনে পড়িত। এরাও নিরোগ-হীন, তবে পরোপদ্রব নয়—মাত্র আংশিক-ভাবে। সত্যম্ব সমস্যা হ'ল উভয় প্রেক্ষাপটে নিরোগ, এবং সমস্যাকে ব্যাপক অর্থে নিরোগ-হীনতার সমস্যা বলা হয়।

## নিরোগহীনতা ও লাভজনক নিরোগ :

অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে কোন উপা-দান—জমি প্রায় মূলধন সংগঠন—অলস অবস্থার থাকলেই তাকে নিরোগহীনতা বলে অভিহিত করা হয়। প্রায়ের ক্ষেত্রে এই নিরোগহীনতার ফলে ঘটে সম্পূর্ণ অপচয়, কারণ প্রমই সর্বাপেক্ষা ধনসম্পন্ন উপাদান। একটি প্রমহীন দিন চলে গেলে তা আর ফিরে আসবে না, প্রম দস্তারের খাতার হরত লেখা পড়বে : বরান ধ্যান-ওড় লণ্ট। জমি না

প্রাকৃতিক সম্পদ। মূলধন-দ্রব্য বা সম্পদটি এভাবে অব্যবহারের দরুন সম্পূর্ণ অপচয় হয় না, বেশীদিন অব্যবহারে থাকলে কিছুটা অক্ষেপে হর পড়তে পারে মাত্র।

প্রমিক যদি পরোপদ্রব বেকার থাকে অপচয় হ'ল সম্পূর্ণ, আর নিরোগহীন হয়ে থাকলে অপচয়কে আংশিক বলে ধরা হয়। যারা এইভাবে আংশিক নিরোগহীন হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অর্থনীতির ভাষায় তাদের বলা যায় : লাভ-জনকভাবে নেযুক্ত নয় নট গেনফুলি এম. পলয়েড। অর্থাৎ তারা দেশের উৎপাদন কার্যে মতটা সহায়তা করে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারত তা বর্তমান অর্থব্যবস্থার তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লাভজনকভাবে নিযুক্ত। এই দেশে প্রায় অপচয়ের পরিমাণ সম্পূর্ণ ধারণা করার জন্যে বোধহয় আর কোন তথ্য বা পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই।

## বেকার-সমস্যার দরুন :

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উৎপাদনের উপাদান হ'ল সংখ্যার দুই : প্রকৃতি ও মানুষ। অর্থাৎ প্রকৃতির দানকে কাজে লাগিয়ে—প্রাকৃতিক-পরিবেশকে উপযোগী করে তুলে মানুষ তার মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা—অর্থাৎ মোটের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। সত্যম্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায়ের অপচয় বিশেষ পূর্ব-সম্পূর্ণ ব্যাপার। যে সমস্যা-বাবস্থা এই অপচয় হতে দেয়, তাকে অর্থ-অপারগতার অভিযোগে অভিহিত না করে উপায় নেই। এই কারণে প্রায়ের অপচয়ের সমস্যা বা চলতি ভাষায় বাকে বলে বেকার সমস্যা আর তৎক্ষণাত আলোচনার জন্যে পূর্ণ-পদক্ষেপে নিবন্ধ নেই—তা আর রাজনৈতিক-অপেক্ষাসময় উল্ল হলে সাক্ষরিত হবে। ক্ষেত্রবিশেষে সমাজবিজ্ঞানের পূর্ব-সম্পূর্ণ হতে পারে।

বলা হয়, সরকারের অর্থনৈতিক কার্য-কর্মের মৌল উদ্দেশ্য হ'ল জনসংখ্যারকে অর্থাৎ থেকে আলাদা দিদের জাতিবা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু জনসংখ্যার একাংশেরই সম্পূর্ণ বেকার এবং আর এক অংশ আংশিক নিরোগহীন অবস্থার থাকে তবে সামাজিক-হস্যমানে সরকারী অর্থনৈতিক কর্ম-প্রক্রিয়ায়

যার দ্বারা আর কি বলে অভিহিত করা যায়? তাই বেকার-সমস্যার সমাধান-সকল দেশেরই অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য-অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

#### বিশ্বজনীন সমস্যা :

অবশ্য সামাজিক-রাজনৈতিক বাইরে অতীত, উন্নত বা স্বল্পোন্নত কোন দেশই স্থায়ী পূর্ণনিরোগাবস্থার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তাই দেখা যায়, তারা প্রায়ই নিরোগহীনতার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। গত নব্বইয়ের দশকে অনর্ন্তিত কানাডার সাধারণ নির্বাচনে অন্যতম 'ইসরা' ছিল এই বেকার-সমস্যা। বিশদ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, বিরাট মৎস্য-সম্পদ সম্বন্ধিত কিন্তু জনবিরল দেশ কানাডার বেকারের পরিমাণ হল ৭ শতাংশের ওপর। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উগান্ডা থেকে এশিয়ানদের বিতাড়নের মতো এই সমস্যা-উগান্ডাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক খোলা এবং প্রচুর নিরোগহীনতা।

#### প্রকার ভেদ :

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি অতীত বা উন্নত দেশ এবং ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের বেকার-সমস্যার মধ্যে বিশেষ প্রকার ভেদ আছে। অতীত ও উন্নত দেশের বেকার-সমস্যা প্রধানত দু' ধরনের : ঋণাত্মক বেকার এবং সাইকিক্যাল বা মনোবাজারজনিত বেকার। বহুরের কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ জিনিসপত্রের চাহিদা কমে গেলে ঐ সব জিনিসপত্রের উৎপাদন হ্রাসের দরুন যে নিরোগ হ্রাস ঘটে তাকেই ঋণাত্মক বেকার বলা হয়। যেমন, শীতকালে আইস-ক্রীমের চাহিদা কমে গেলে যে বেকারের সৃষ্টি হয় তা হল ঋণাত্মক বেকার। অপর দিকে ব্যবসাবাহিক ভেদেই তাদের পর মনোবাজার দেখা দিলে সব জিনিসপত্রের চাহিদাই কমে যায়। ফলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারই মনোবাজারজনিত বেকার বলে অভিহিত।

#### ভারতের বেকার-সমস্যা :

কৃষিপ্ৰধান এবং ঋণাত্মক দেশ ভারতে ঋণাত্মক বেকার ব্যাপক হলেও বাকি মনোবাজারজনিত বেকার বলে তার সাক্ষাৎ বর্তমানে ঠিক পাওয়া যায় না। এর আরগার দেখা যায় বাকি বলে টেকনোলজিক্যাল বা কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত এবং শ্রমচা-রাল বা সংগঠনজনিত বেকার। এর ওপর অবশ্যই আছে কৃষিগত বেকার-সমস্যা এবং শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। শেষোক্ত সমস্যাই বোধহয় জটিল। কারণ, এই সব শিক্ষিত বেকারের মধ্যে নিরোগহীন নয়, তাদের অধিকাংশ নিরোগযোগ্যতাহীনও নয়। অপর দিকে তারাও কিছু আবার বেকারদের মধ্যে সবচেয়ে লোভার শ্রেণী।

কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে কি পরিমাণ বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে তা চারদিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। ইলেকট্রিক

ইল চাল, হবার সঙ্গে সঙ্গে কামারদানদের আর কোন প্রয়োজন রইল না। এই সাইকেল রিকসার বৃদ্ধি বোড়ার গাড়ী অচল হয়ে গেছে; বস্ত্রচালিত তাঁত অনেকক্ষেত্রে হস্ত-চালিত তাঁতে নিবৃত্ত প্রায়িকের অন্ন মেরেছে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি কৃষি-প্রমিকদের কর্ম-চ্যুত করে চলেছে। এই সব কৃষি-প্রমিক বেকার নয়, ভিত্তারী হয়ে শহরের রাস্তার ফুটপাথে রেল-স্টেশনে আগ্রা নিচ্ছে। এরা উদ্ভাস্ত নয়, জীবিকা থেকে উৎখাত নাগরিকগোষ্ঠী। এরা কিন্তু নিরোগ-ক্ষেত্রে নাম লেখাতে পারে না, মিছিল করে বেয়োতেও শেখনি বা প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব পায় নি। তাই তারা নিরোগহীন হয়েও ঠিক বেকার নয়-ভিত্তারী।

কমিউনিক ম্যানিফেস্টো (১৮৭৮) থেকে দেখা যায়, মার্কস ও এঙ্গেলস্ ধনতন্ত্রের কলা-কৌশলের পরিবর্তনের অপরিমেয় সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। মার্কসের বিশ্বাস ছিল, ফল যেমন ফোটার পর শক্তিতে শব্দ করে, তেমনি কলাকৌশলের উন্নতি অবশ্যভাবেই প্রমিকদের কর্ম-চ্যুত করে নিরোগহীনতার পরিমাণ বাড়িয়েই চলেবে। এবং ফলে ধনতন্ত্রের সংকট ঘনীভূত হবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এখনও ঠিক তাই হয়নি। কর্ম-চ্যুত প্রমিকদের নতুন শিক্ষা-গান ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থার সাধ্যমে ঐ সব দেশ কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকার-ত্বকে সাময়িক বেকারত্বের পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানির দিনের সুইডেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুইডেনে একরকম জর্নিহতকর সেবা সংস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যার কাজ হল কলা-কৌশলের পরিবর্তন ঘটলেই শিল্পগুলিকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করা এবং কর্ম-চ্যুত প্রমিকদের পুনঃশিক্ষা দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যস্থানে নিরোগের ব্যবস্থা করা। ফলে ঐ দেশে কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকারত্ব নেই বললেই হয়। আমাদের দেশে কিন্তু পরি-বর্তনের সঙ্গে ভাল না রাখতে পারার জন্যে এই শ্রেণীর বেকারের সংখ্যাই বিরাট।

সংগঠনজনিত বেকারত্ব বলতে বোঝায় প্রমের ভুলনার উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অপ্রতুলতারজনিত বেকারত্ব। ভারতে এই ধরনের বেকারত্বের বহু কারণ একদিকে জন-সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি এবং অপরদিকে অর্থ-নৈতিক উন্নতির কৃষির গতি। বলা হয়, শিল্প পূর্ণবিস্তার শব্দ উন্নয়ন নিয়েই আসে না, উন্নয়ন পূর্ণবিস্তার কৃষি করবার সঙ্গেই হাত নিয়ে আসে। কিন্তু বর্তমান দিনে কৃষি হাতই বন্ধেই নয়, ক্ষয়প্রাপ্ত উপকরণ প্রয়োজনীয় সংগঠন থাকলে তবেই হাত দুটো কাজে লাগে। বর্তমানে হাত কাজ করবার সুযোগ খুবই তত পরিমাণ উপকরণ সর-

বরাহ করা যাচ্ছে না। তাই অসংখ্য কাকের হাত একেজো হঠকি আছে।

আমাদের দেশে কৃষিগত বেকার-সমস্যা ঋণাত্মক হলেও মূলত সংগঠনজনিত, পান্ডাভা-দেশের মত চাহিদার সাময়িক হ্রাসজনিত নয়। এদেশে কৃষি এখনও বহুক্ষেত্রে বৃদ্ধিপাওয়ার ওপর নির্ভরশীল বলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষিজীবীরা ৩ থেকে ৬ মাস বসে থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ না হলেও অর্থ-বেকার বা প্রচুর বেকার। তা' দ্বারা বিকল্প নিরোগের অভাবে কৃষিতে বত মোত ভিড় জমিয়েছে তত লোকের দরকারই নেই—এদের একটা মোটা অংশকে কৃষি থেকে সরিয়ে আনলে উৎপাদন হ্রাস পায় না। সুতরাং কৃষিতে বেকার-সমস্যা সংগঠনজনিত বেকার-সমস্যারই একটা দিক-বর্তমান জন-সংখ্যাপ্রসূত বর্তমান প্রমের বোঝানোর সঙ্গে ভাল রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণের বোঝানোর সমস্যা তাই এর কারণ।

গ্রামাঞ্চলে এই প্রচুর বেকারত্ব ছাড়াও ওপন বা খোলা বেকারত্বও আছে, তবে তা হল প্রধানত কৃষি-প্রমিকদের মধ্যে, কলা-কৌশলের পরিবর্তনের দরুন কৃষিক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ উদ্ভাস্ত হয়ে পড়েছে। এদের অর্থ-কাংশই উদারদের জন্য শহরে গিয়ে জিড় জমিয়েছে। অবশ্য তারা অর্থ বা প্রচুর বেকার তাদের অনেকও শহরে গিয়ে ঠিক জিড় না জমালেও ভিড়ের কাছে উপকর্ষক মারছে।

তারপর আছে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। এর মূলে আছে চূড়ি-পূর্ণ শিক্ষা-পরিবর্তন বা আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় চূড়ি-পূর্ণ ম্যানপাওয়ার বা মানবশক্তি পরি-বর্তন। এর জন্যে অবশ্য আমাদের পরি-বর্তন কতৃপক্ষ ততটা দারী নয়, ততটা দারী হলো প্রথম বৃহত্তর শ্রেণী অর্থনীতিবিদরা। এই সব অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল যে শিল্প প্রসারের ওপর যতটা ব্যয় করা হবে মোট জাতীয় আর ততই বৃদ্ধি পাবে। এই ধারণা ব্রহ্ম সত্য বলে মনে করে নিয়ে এশিয়ার অনেক দেশের মত ভারতও শিল্প-প্রসারের জন্যে 'গ্লাস গ্রোভারের' পথ বেছে নিয়েছিল। ফল হয়েছে ভয়াবহ—শিল্পের মানের অবনতি, শিল্প-জগতে নৈরাজ্য, উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ নৈবাধ্য, শিক্ষিত লোকের অকল্পিত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রে নিরোগযোগ্য-তাহীনতা।

#### পারিসংখ্যানের দৃষ্টান্ত :

ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের পরি-মানের পরিসংখ্যান না দেখাই ভাল, কারণ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের মধ্যে কোনটি নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। যেমন, পশ্চিমবঙ্গেই পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ধরা হয়েছে ২০ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ—অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ। এই ধরনের পরিসংখ্যানের মূল কি? তাই বেকারত্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে রিব্রের বিশেষজ্ঞ কমিটি (দাঁতওয়াল কমিটি) পরিসংখ্যানের পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে।



কবি হোক, আমাদেব দেশে অজসংখ্যার  
মুক্ত ফেলারদেরকে বিস্ফোরণ ঘটবে। এর চাপ  
প্রতিক্রিয়ায় দেশের নগরগুলোই বেশী পড়বে।  
কারণ, আধুনিক নব্যনীতিভিত্তক অর্থ-ব্যবস্থার  
আবির্ভাব। নব্য নব্যীর আকর্ষণে লোকে  
প্রতিক্রিয়ায় অসামান্যক ব্যক্তি যেহেতু  
নগরগুলো এসে অপ্রার্থী হচ্ছে আর ব্যাধী  
কলকবের নগরকে পাহরে অজসংখ্য তারা ত  
কাজেই।

**संस्कृतविद्यालय, काशी, भारत**

কর্তৃপক্ষ অবশ্য বেকার-সমস্যার গুরুত্ব  
সামনে স্পষ্ট হোকেই সচেতন এবং কল্যাণ  
সে-অন্যদের মধ্যে পূর্ণ নিরোগাক্ষা সৃষ্টি  
করা জাতির কর্তৃপক্ষ পরিচালনার  
সকল। প্রায় পরিচালনার মণ্ডার বলা হয়ে-  
ছিল : উদয়ন পরিচালনা পূর্ণ নিরোগের  
উপকারী অবস্থা সৃষ্টি করা প্রচেষ্টা ছাড়া  
কিছুই নয়। এই পরিচালনার এক ২১-সফা  
কর্তৃপক্ষী ভিত্তিতে নিরোগ সম্প্রসারণের  
কল্যাণ করা হয়।

‘‘ହାରମର ସିଧାଠିର, ଛଡ଼ାଠିର, ଚଢ଼ୁଆ ଏବଂ  
ଛୁଆଁର ଏ ଚଢ଼ୁଆଁର ମଧ୍ୟରମ ତିନି ବସନ୍ତେ  
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାରିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିତ  
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଓମର ମୁଦ୍ରା ଆରୋପ  
କରା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱତ୍ୱେ ଏ ଦେଖା ହାର ହେ,  
ପ୍ରକାଶକାର ମତ, କଲ୍ୟାଣୀୟ ମତ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର  
ସମ୍ଭାବନା ତିନି ମିଳି ବାନ୍ଧି ପାରେ ।

এখানেও পরিবর্তনকে পরিহার করা  
হয়। জৈবিক পরিবর্তনকে কামিনাও এই  
পদে উল্লেখ—চ্যাপ্ত-চ্যাপ্ত পরিবর্তনকে  
কামিনাও বলে। সত্য নিশ্চিত না-করাই  
কামিনা বলাই বলা হয়েছেন। এই চ্যাপ্ত  
পরিবর্তনকে পদ বলা হয়েছে : যে সকল  
জৈবিক-কামিনা পদই হয়েছে সেগুলি

কার্যকর করা হলে বেশী পরিশ্রমে নতুন  
কাজ জড়িষ্ট হবে।

নতুন কল সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রসারিত  
নিয়োগ দৃ. রকমের: উপাধায়নপাল নিয়োগ  
এবং মিলিক বা চাপমূলক নিয়োগ। সম্প্রতি  
এই চাপমূলক নিয়োগের ওপরই বেশী ঘোঁক  
পড়েছে দেখা যায়। এতে হরত অনিষ্টার  
ওষধের মত কিছুটা আশা উপকার হতে  
পারে। কিন্তু নিয়ামকের পথ এ . নয়—এক-  
শিক্ষক বিদ্যালয় ইত্যাদির দীর্ঘকালীন  
উপযোগিতা বিশেষ নৈই। তাই আশা কল-  
প্রসারী বটিকা নেকনের মত চাপমূলক  
নিয়োগের ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও এর  
ওপর নির্ভরশীলতা দিন দিন কমাতে হইক।  
তা ছাড়া কল প্রচলনকারীদের জ্ঞান সার্বিক  
চাপকাষেই নিয়োজিত হতে পারে, বর্ধমান  
হায়ে চিরন্তন গ্রাহকার্য নয়। এর ফলে  
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও বাহত হতে বাধ্য।

কিভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে:

মৌল সমস্যা হল কর্ম-প্রাধিকার সংখ্যা এবং উৎপাদনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে সূত্র সমতা স্যবধান করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায়।

বিনিময়োগের এক অর্থ মূলধন গঠন—  
 উৎপাদনের উৎসে বস্তুগত ইচ্ছা  
 মূলধন-সুযোগ পরিমল বাড়ানো। এই  
 উৎসে বস্তুগত ও কৌশলিক সঙ্গ  
 সংগতি বজায় রেখে বৈদেশিক মূলধন

অন্যমন এবং বৈশেষিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করিতে হবে। এর জন্যও প্রয়োজন সুদৃশ্যটি শিক্ষণীয়তর—এবং সুদৃশ্যটি প্রদর্শনীয়ও। মোট কথা, শেখের জন্মবার যে দশটি হাত কাজ খসড়াহে তাদের কাছে লাগাবার জন্যে অন্যান্য ঊপকরণ সরবরাহ করিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থার পথে চলাতে হবে। যন জনবলসম্পন্ন কিন্তু কাঁচামালের দৃশ্যপ্রাপ্যতা নিয়ে যদি অনেক দেশ শিশুশ্রম হতে পারে, মোটামুটি পূর্বে নিয়োগব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে, জীবনব্যায়ার মানে উত্তমোত্তর বেকার সমস্যার জুগাব কেন, আর উত্তমোত্তর উন্নয়নসাধন করিতে পারে, তবে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ আশ্রয়ই বা বেকার সমস্যার জুগাব কেন, আর জনসংখ্যার দই-তৃতীয়াংশই বা দারিদ্র্য-রেখার নীচে থাকবে কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ হল হ্রদটিপূর্ণ সমুদ্র ও বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং হ্রদটিপূর্ণ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। আর বোধহয় সামাজিক উৎসাহের অভাব। অন্যান্য পরিপূরক করণীর মধ্যে আছে কৃষিকার্য ও গ্রামাঞ্চলের আকর্ষণ বর্ধিত করা। এদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সবল শিল্প এবং গড়েজাত প্রকৃতি রাজ্যে শ্বেত-শিল্প (দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন বর্ধিত), নগরীকরণ প্রকৃতি বেশ কিছুটা কার্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে হবে—অন্ততঃ নগদ মজুরির আকর্ষণ কমাতে হবে এবং কৃষি ও অনুরূপ কাজ-কর্মকে আরও লাভজনক করে তুলতে হবে। এই ব্যাপারে রাজনীতি বা কোন জাৰাদর্শকে নাক গলাতে দিলে ভুল হবে।

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা একটু স্বতন্ত্র  
 খরনের। শাস্ত্র-পত্ৰী গণ্যদেবীর মত  
 মাতৃকল্প বিম্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-পৰ্ব্বদেবীর  
 বাদের বিরোধহীনতার মনীষলে ইতিমধ্যে  
 জ্ঞানির দিনেছেন তাদের ভুলে নিয়ে পালনের  
 বাধ্যতা করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে ঐ সব  
 সংস্থা বিদ্যল হারে প্রশ্ন করে আর বেন  
 জ্ঞানির বা দেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে  
 হবে। এও হল এক পরিচালনার প্রশ্ন—  
 মানবশক্তি পরিচালনার প্রশ্ন। এই পরি-  
 চালনাতে সর্বাঙ্গক পরিচালনার অঙ্গীভূত  
 করতে হবে। সাইমন ক্রুনেটস-এর মত  
 আধুনিক সম্প্রদায়ধর্মী অর্থনীতিবিদদের  
 এই হল সচিবিত্ত অভিমত।



## গোড়-লক্ষ্মণাবতী-লখণৌতি

গোড়!

ঠিক চারশো বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে এই মহানগরী।

আজ আমি আবার এসেছি গোড়। এই নিয়ে কতবার হলো? কেম এলাম আবার! লখণৌতিপ্রিয় লক্ষ্মণাবতীর উপহাস, অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে ও লিঙ্গত্ব ভৌত-ত্ব এবং নিপুণতা, প্রত্যাশিত পরি-ভিত জনের উদাসীনতাকে কখনো/রহস্যময় নীরবতার কখনো সূক্ষ্ম আগাতে আগ্রহী করে ডোলায় ডেউলার কখনো সমীহ করে--আমাকে লিখিত করার সব উদ্যমকেই পরাস্ত করেছি, কিন্তু হার স্বীকার করেছি নিজের কাছেই। গোড়ের দুর্বীর আকর্ষণী লিখিত কাছে ধরা দিয়ে এই নিয়ে প্রায় পঁচিশ বারের মতো আমি এলাম এখানে।

গোড় আমাকে 'হন্ট' করে। আমি জাতিস্মরণের মতো করে বেড়াই গোড়ের মাটিতে! আমি জানি, বাঙালীমতকেই এই নামটি স্মৃতিচারা করে তোলে।

সে তো আজকে নয়, বহুকাল আগে থেকেই এই বিশেষ শব্দটি একটি বিশেষ দেশের, একটি জাতির, একটি বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে।

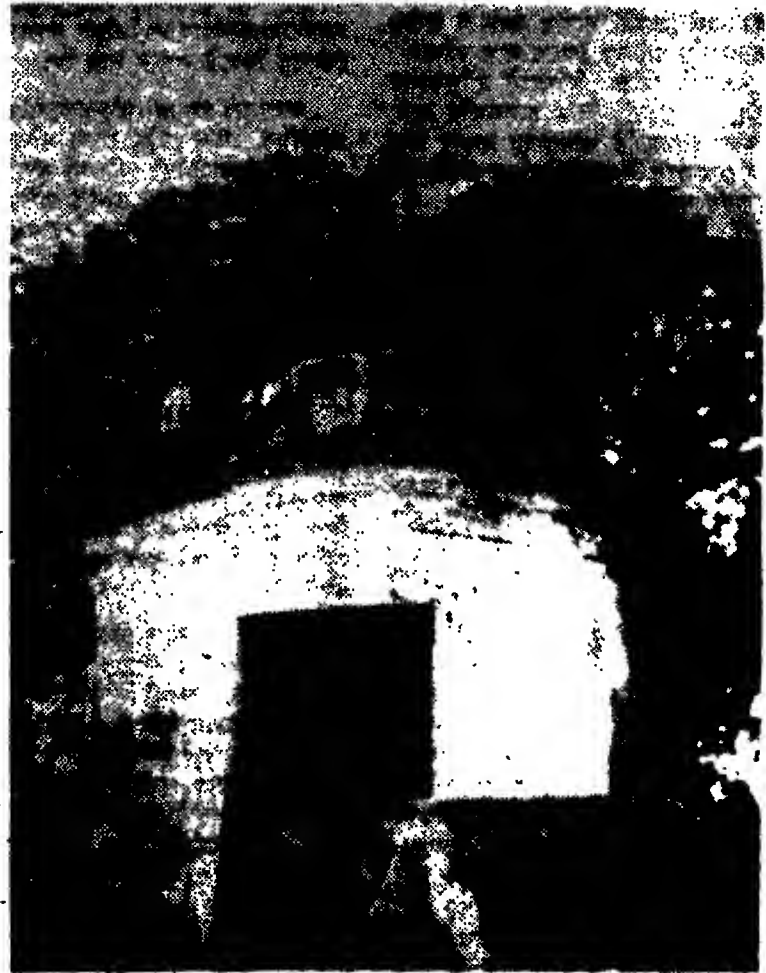
মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কর সময়ে যে গোড়ের উল্লেখ, পরবর্তী একশ' বছরব্যাপী ভরাবহ মাৎস্যন্যারে বার কলিক অবলুপ্ত এবং ভারপূর্ণ পালবংশের অজ্ঞানদের বার পুনর্জাগরণ পরবর্তী সেনবংশ, খিলজী, পাঠান, হাবশী বা বাঙালী সম্রাটদের আমলে বার চূড়ান্ত ক্ষুণ্ণ এবং আজো অসংখ্য কবির কাব্যে, লৌকিক জীবনের

নামা আভরণে বার ক্ষুণ্ণ দ্বারা কেলে-সেই সুপ্রাচীন ভূখণ্ড এসে নিজেকে অতিবৃত্ত বোধ করি।

এই কি সেই গোড়, পালবংশের রাজ-ধামী বাগগড়ের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নববংশের লক্ষ্মণাবতী বংশ সেনবংশের রাজ-ধামী গোড়-বার নাম পরিবর্তন করে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন রেখেছিলেন লক্ষ্মণাবতী! এই লক্ষ্মণাবতীই কি পরবর্তী মুনসলমান শাসকদের রাজধানী লখণৌতি-গোড়।

আমি ফিরে ডাকাই এর প্রাচীন ইতি-হাসের দিকে। গোড় নামের উদ্ভব সম্ভবত 'গুড়' থেকে। এককালে এখানে ইকুর চাষ

হতো অধিক পরিমাণে। গুড় উৎপন্ন হতো। সম্ভবত সেই থেকেই এই নামের উৎপত্তি-কোম সঠিক লিখাস্থের কথা আমার জানা নেই। শুব্দ জানি, সুপ্রাচীন পার্শ্বীয় সময়ে 'গোড়পুত্র' নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। কোটিচোর অর্থশাস্ত্রে গোড়, গুড়, বংশ আর কামরূপের লিঙ্গ ও কৃষিকলস আছে। পার্শ্বীয় টীকাকার পতঞ্জলি পরিচিত ছিলেন গোড়বেশের সঙ্গে। বাৎসর্যও কামরূপে গোড় পার্শ্বিকদের বিলাসবাসন গোড়-নারীদের বৃন্দাবন ও মৃদু অঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন।



রাজকোলর তামালতলার মন্দির। এখানে শ্রীগোরাপের পদাঙ্ক আছে।

উৎপল চক্রবর্তী

স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল আবেগ গোড়-কেন্দ্রের। বঙ্গবীরের গোড়ক পুত্র বঙ্গ সম্রাট কর্তৃক ও ডালালিত্বক নামে ছদ্মটি জগৎপন্থ উল্লেখ করেছেন। গোড়ের উল্লেখ আছে 'সত্যী' কাকাদেশে, রাজপুত্রের আবার সত্যী, সত্যীর অনর্থকভাবে কৃত পিত্রের প্রবেশভঙ্গীর নাটকে, কহুনের রাজভরসিঙ্গীতে এবং অসংখ্য জৈন বোধি হিন্দু বর্জ্যে, অজয় দিল্লীলিপি আর ভারতবর্ষে। তবে, এত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেই সংসার করেই গেছে। বিভিন্ন ব্লগে গোড় কবিতা কি একটি বিশেষ ভূখণ্ডকেই বোঝাতো?

কখনো মনে হয়, মণিদাবাদ-বীরভূম-সম্বন্ধে কর্তৃক ছিল গোড়ের সীমারেখা, আর রাজধানী ছিল চম্পানগর। সেই চম্পাই কি এখন কর্তৃক শহরের উত্তর-পশ্চিমে লাক্ষ্মণনগরের তীরে চাঁপা গ্রাম!

ভবিষ্যৎপূরণ বলে, গোড়ের উত্তর সীমায় কর্তৃক কর্তৃক। জৈন গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়, মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীই সেই পৌর। জৈন কর্তৃক মৌখরীর হড়াহালিপি অনুসারে, গোড়ানন্দ সম্রাটের নাম। অর্থাৎ মৌর্যের সীমা সম্রাট থেকে দূরে ছিল না। এই সিঁপি বড় শতকের। সপ্তম শতকে হুয়ানসাংয়ের লিপিতে 'গোড়-জ' সম্রাটের নামটিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই একটি শব্দের আড়ালে বাংলা ও বাঙালীর পরিচয় বিদ্যমান হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্মণনগর গোড় নির্মিতই মণিদাবাদ জেলার, কর্তৃক তাঁর রাজধানীর নাম, যা আজ রাণাঘাট কানসোনা নামের এক বিশাল গ্রাম হয়ে এ জেলায়ই নিহত অস্তিত্ব হুয়ানসাংয়ের অঙ্গকার আছে।

লক্ষ্মণনগর হুয়ানসাং পর গোড়ের ভাগ্যা-কাল দূরত্বের ঘনঘটা। দীর্ঘ একশ' বছরব্যাপী অরাজকতার অশুভ তাড়ব। হুয়ানসাং সম্রাট ডালালিত্বক স্বাভাবিকভাবে হিংস্র স্বভাবের হিংস্র। অতএব একদিন সেই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে আকর্ষণ হুয়ানসাংয়ের পুত্র, নিপীড়িত জনগণের ক্ষমতা, প্রতিদ্বন্দ্বী-বাংলার প্রথম গণ-সেনাপতি। প্রতিষ্ঠিত হলো পালবংশ। রাজ-ধানী স্থানান্তরিত হলো তাঁর জনকভূমি বর্তমানভাঙে-বাগড়।

গোড় নামটি আবার রাজ-উপাধিতে স্থান পেয়েছে। পাল-সম্রাটরা গোড়ধিপ বা গোড়েশ্বর বা গোড়েশ্বর নামে পরিচিত হতেন।

দুশো বছর রাজত্বের পর পালবংশ কর্তৃক সেনবংশের হাতে দেশশাসনের ভার তুলে দিতে বাধ্য হলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হলো বাগড় থেকে গোড়। বর্তমানভাঙ থেকে মালদহ। সম্রাট লক্ষ্মণনগর থেকে মালদহ। সম্রাট লক্ষ্মণনগর থেকে মালদহ। সম্রাট লক্ষ্মণনগর থেকে মালদহ।

সেই লক্ষ্মণাবতীই কি এট গোড়?

এখন যে মালদহ মালদহ শহর থেকে লক্ষ্মণনগর রাজধানীর দিকে গিয়েছে, এ পথে কিছুরই একেবারে বাগড় নামে এক জায়গায় এক অনুসন্ধানের চেষ্টা চমকে

ওঠে। দেখা যায়, ডানদিকে বিশাল গড়ের ভূস্বাক্ষেপ, নীচে হতে পরিখা। আর কিছু নেই, তবু লোকে বলে, এই হলো বলা-বাড়ী বা এখন বাগড়। নাম নিয়েছে আর এইখানেই ছিল বলাসেনের উদ্যান-বাড়ী-রাজপ্রাসাদ। কিছুদূরে অমর্তি গ্রামের কাছে গিছলি-গঙ্গারামপুর নামে এক জায়গায় ছড়ানো অসংখ্য প্রত্নচিহ্ন দেখিয়ে অনেক বলেন, এইখানেই ছিল সম্রাট লক্ষ্মণ-সেনের শেষজীবনের বাসভূমি। বলাবাড়ী, রাজভিটা, চণ্ডীপুর, পটলচণ্ডী, লোহাগড়, অমর্তি, কমলাবাড়ী ইত্যাদি গ্রামের নাম প্রাচীন হিন্দু যুগের সাক্ষ্য বহন করে আজো এবং এ কমলাবাড়ী গ্রামের কাছে সাগরদীঘির উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল দূরে কানিংহামের সমগ্র গোড়ের অন্যতম প্রধান দেবী গোড়েশ্বরী পূজিতা হতেন।

গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল গোড়-নগরী। মালদহের কালিন্দ্রী নদী দিয়েই জলধারা প্রবাহিত হতো বেশী পরিমাণে। পরে গঙ্গা খাত পরিবর্তন করে। ফলে হিন্দুযুগের সেনযুগের লক্ষ্মণাবতীও স্থানান্তরিত হয়। শূন্য গড়ের ভূস্বাক্ষেপ, পরিখার নিম্নপ্রাণ দেখে, কয়েকটি গ্রামের নাম, কিছু প্রত্নচিহ্নের বৃকে তার লুপ্ত-প্রায় অস্তিত্ব নিয়ে সে তার অতীতকে মধুর করে তুলতে চায়। এ বাগবাড়ীর কাছেই যে রাজনগর গ্রাম, ওখানে কি বলাসেনের কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে? এখন কেহনই কিছুই পাবার আর উপায় নেই।

বাগড়ের পর যে গোড়-লক্ষ্মণাবতী তার চতুর্সীমা, কোন সৌধ, কোন মন্দির আজ আর নেই। রাজধানী পরিভ্রম্য করতে এসে বিভিন্ন সংগ্রহশালার রক্ষিত প্রত্নস্মৃতি-কোন প্রত্নরত্ন, কয়েকটি স্থান, কয়েকটি গড়ের বংকাল আর সম্রাট লক্ষ্মণসেনের আমলে খনিত, মালদা শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে সাগরদীঘির মহামাফানে বাবার পথের পাশের বড় সাগরদীঘি দেখে লক্ষ্মণাবতীর অতীত ঐশ্বর্য অনুমান করে নিতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে দূর্ধ্ব বখত-ইসারের আক্রমণ থেকে আতঙ্কিত জন্য বখন অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণসেন গঙ্গাতীরস্থ তাঁর অপব রাজধানী নদিয়া ছেড়ে সংকীর্ণ বা বগের দিকে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তখন সেই নদিয়াও খংস হয়ে গেল বখত-ইসার-এরই হাতে।

তার চিহ্নও আজ কোথাও নেই। শূন্য এখনকার নবম্পীপ শহরের কাছে এক উচু ভূখণ্ড দেখিয়ে স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এ হলো বলা টিবি। এইখানেই ছিল মণিদাবাদী সম্রাট বলাসেন-লক্ষ্মণসেনের রাজবাড়ী। হতে পারে। ভূখণ্ডটির উচ্চতা এবং অসংখ্য ছোট ছোট প্রাচীন ইটের সন্ধ্যা দেখে অনুমান হয়, এইখানে সেন-বংশীয় সম্রাটদের কোন স্মৃতিচিহ্ন মটির গভীর গোপনে ছুঁতে চুকিয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এটি খুঁড়ে দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোন ব্যক্তিগত উপায়ও অনুপ-স্থিত করে, বাংলার ইতিহাসের এক

গুরুপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস আজো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

বড় বিশ্বর লাগে, বাংলার সেনবংশের রাজত্বের ইতিহাস কিছু কম দিনের নয়, এবং এ-বংশের দুজন সম্রাট বলাসেন ও লক্ষ্মণসেনের নাম আজও বাঙালীর স্মৃতিতে, লৌকিক ক্রিয়াকর্মে, প্রবাদে, জীবন্ত হয়ে আছে, অথচ তাঁদের রাজধানী, তাঁদের কোন স্মারকচিহ্ন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোথায় ছিল সম্রাট বলাসেনের সেই প্রাসাদ, যেখান থেকে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে কর্ণাট-চালুক্যরাজ শিবতীর্থে ভাগদেবমন্দিরের মেনে রাম দেবীকে নিয়ে গঙ্গা-বন্দনার সঙ্গমে নিরঞ্জনপুরে চলে যান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অমৃতসাগর' রচনা করছিলেন তিনি তখন। সেই গ্রন্থ অসমাপ্তই থেকে যায়।

কোথায় ছিল মহাকবি উষাগতি ধন, মহাপণ্ডিত হলায়ধ মিশ্র, ধোরা লক্ষ্মণ ইত্যাদি 'নবরত্ন' পরিবৃত সম্রাট লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভা। সে কোথাকার গঙ্গার তীর, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন লক্ষ্মণসেন আর হলায়ধ প্রত্যাক করেছিলেন এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখছিলেন তাঁরা, এক ফকির বেন অলৌকিক পায়ের হেঁটে আসছেন গঙ্গার ওপর দিয়ে। পায় হয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সেই ফকির জিজ্ঞাসা করেন সম্রাটকে—

—আপনি কে?

—আমি পৃথিবীপালক সম্রাট লক্ষ্মণ-সেন। উত্তর দেন বিস্মিত সম্রাট। হাসেন সেই ফকির। বলেন,

—আপনি যদি পৃথিবী-পালকই হন, তবে এ যে বকটি মাহ ধরছে, ওকে মাহ ছেড়ে উড়ে যেতে আদেশ করুন।

বিস্মিত সম্রাট এবার ভ্রোখান্ডিত হন।

—ওই বক তিব্বতগোনি। ও আমার কথা শুনবে কেন?

—আমার কথা শুনবে।

বলেন, আর বককে উড়ে যেতে আদেশ করেন ফকির। সম্রাটের বিশ্বাসকে চমকে দিয়ে উড়ে যায় বকটি। এবার ফকিরের ক্ষমতার অভিজুত বোধ করেন সম্রাট। তাঁকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। আর মন্ত্রকর মূল্য হিসেবে পাণ্ডুরা কিছু ভূখণ্ড দান করেন ফকিরকে মসজিদ তৈরীর জন্য। সেই মসজিদ আজো আছে মালদহের পাণ্ডুরায়। পীর শেখ জালালুদ্দীন তারেকজী নির্মিত সেই মসজিদ। যার ভিত্তি খুঁড়ে গেলে বহুদূর পর্যন্ত পেরে যান পীর এবং তা দান করেন লক্ষ্মণসেনেরই পারিবারিক।

কোথায় সেই প্রাসাদ, যার কক্ষ একদিন অনুতাপ অনুশোচনার তীব্র অঙ্গনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাছিলেন মহাসম্মতি হলায়ধ মিশ্র! রাজ্যের প্রত্যা-বর্গকে রক্ষা করার দায়িত্ব বীর, সুনীতি রক্ষক এবং সূচিরয়ের খ্যাতিতে যিনি গোড়ের সর্বত্র সম্মানিত, তিনি গড় হয়ে গোড়েরই এক হুয়ানসাং নদীর মালদ

জাতির জন্য যুদ্ধ হয়ে নিজের শরীরী  
পরিচর্যা নষ্ট করেছেন। সুদেহী সুকর্ণম  
ইলাহকে মোহের কাছে পরাস্ত হতে  
দেখে লন্ডন-প্রান্ত বারবধু হলে উঠেছে  
বিক্রিয়নীর মতো। আর নিজের স্ত্রী ভেবে  
বিলাস-বস্ত্র হয়ে পরে ভুল বৃত্তে পেরেছেন  
যক্ষ হুলায়ুধ, তখন তাঁর আত্মধিকারে  
নিষ্ঠুরে হত্যা করার সঙ্কল্প দৃঢ় করার  
জন্য, স্বীয় নন্দকার্য শব্দ ককছেন প্রাসাদ  
কক্ষে। অরশেবে সেই চকচকান! দৃঢ়  
অপচ পশ্যনিত্তে বিকল পারে রাজসভার প্রবেশ  
করলেন হুলায়ুধ। উল্লসন সন্ধ্যাট জাব  
পারিষদবর্গকে অকপটে জানালেন তাঁর  
কণিক মোহের ফুলের কথা! আর জানালেন,  
গোড় রক্ষার জন্য তিনি তুবানলে প্রাণ  
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এ আদেশ দেশের  
আইনরক্ষক হিসেবে, মহাসাম্রাজ্যবাহিনী  
হিসেবে নিজেই নিজের প্রতি জারী  
করেছেন। শঙ্কিত ইলেন লক্ষ্মণ সেন!  
জানালেন, পিতার আমল থেকে যিনি  
সুন্দরামশর্মা আর সুশাসনের মণ্ড হাতে  
রাজ্য রক্ষা করেছেন তাঁকে বিসর্জন দিতে  
তিনি আদৌ প্রস্তুত নন। কিন্তু হুলায়ুধ  
তাঁর সঙ্কল্পে অটল! শেষে সকলের  
অনুরোধ, আদেশ শব্দকে উপেক্ষা করে  
জন্মসংকল্পে তুবের আগুনে একটি পাবক  
শিখার মতোই জ্বলে উঠলেন মহাপণ্ডিত  
হুলায়ুধ মিশ। গোড় রক্ষাব জন্য,  
সুন্নীতি রক্ষার জন্য একটি আদর্শ স্থাপন  
করলেন!

কিন্তু বোধ হয় ভুলই করেছিলেন  
হুলায়ুধ! তিনি জানতেন না, গোড়ে  
তখন বাঙালির অন্যরের নৃনাতির কি  
প্রাণ!

ধর্মনিরপত্তা, কাব্যপ্রিয়, জ্যোতিষী-  
নিষ্ঠর সন্ধ্যাট লক্ষ্মণ সেনের সম্ভবহারের  
সুযোগ নিয়ে রাজাব্যাপী এক ষড়যন্ত্র আর  
বিলাস-বাসনের শিথিল উল্লাস দানা বেঁধে  
উঠেছে। প্রকাশ্য রাজপথে গণিকারা প্রলুপ্ত  
করাছে পথিকদের, সর্বত্রই অনাচার আর  
এই সুযোগে এক প্রোণীর লোক বিদেশী  
শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ধ্যার পতন  
ঘটনার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছে!  
ঐ পীরেরই কাছে দীক্ষা নিয়েছেন অনেকে!  
পাণ্ডুরার গোপ কাল, ঘোষ নাম নিয়েছেন  
কালী পীর এবং হিন্দু রাজত্বের অবসান  
ঘটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বংশ  
রাজা নৃদীয়ার প্রাসাদে বসে অশুদ্ধ সঙ্কল্প  
শব্দে পাচ্ছেন। কিন্তু কিছুই করার নেই  
আর! এবং একই মধ্যে শোনা গেছে  
দুরাগত এক ছুকাঁ লুণ্ঠকের দণ্ডিত অশ্ব-  
কর ধনি! উত্তর ভারত, বিহার খবর করে  
গোড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন মহাপরাক্রমী  
বৃত্ত-ইয়ার খিলজী! রাজ জ্যোতিষীরাও  
জানিয়েছেন এক দীর্ঘবাহু, কলাকার  
শব্দে হাতে এদেশ বিলম্ব হবে এমন কথা  
শোনেই আছে! সংবাদ এলোইলেন সোপান  
তে, সেই ছুকাঁ ছুকাঁ সেনানারকর সঙ্গে  
শব্দে বর্ণনায় প্রাসাদে বসে অশুদ্ধ সঙ্কল্প  
ইউজনার গোড় ছেড়ে চলে গেছেন কণিক  
ও নাগরিকেরা! নৃদীয়ার প্রাসাদে একা

অসহায় সন্ধ্যাট লক্ষ্মণ সেন। না, রাজ্য  
ছেড়ে গিয়ে তিনি পালাননি। প্রজন্মরক্ষক,  
সুশাসক সন্ধ্যার মণ্ডিতে এমন কোন  
নির্দেশ নেই।

অবশেষে ১২০১ সালের এক মধ্যাহ্ন!  
প্রাসাদে শ্মিপ্রাহারিক আহ্বারে বসেছেন  
সন্ধ্যাট। সোনার খালার পরিবেশিত ইলেক্সে  
ভোজ্যকল্প! আর সেই সময় প্রাসাদে ঘরে  
উঠল তুমুল কোলাহল। ১৮ জন কুস্তি-  
রোহীর হুমকিতে তোরণ দ্বার আতঙ্কিত  
করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন  
নিষ্ঠুর বৃত্ত-ইয়ার! হত্যার বীভৎসার  
মেতে উঠেছে তার অনুচররা! আর দেবী  
নর! আসন ছেড়ে উঠে দ্রুত পারে পঞ্চাং  
দ্বার দিয়ে গম্বু তীরে এলেন বৃদ্ধ সন্ধ্যাট!  
নৌকা প্রস্তুত ছিল ঘাটে! তাঁকে নিয়ে সেই  
নৌকা এবার এগিয়ে চলল বঙ্গ বা সংক-  
নাটের দিকে!

শেষ হয়ে গেল গোড়ে হিন্দুদের  
আধিপত্য!

এর পর দীর্ঘ সাত্বে তিনশ বছর-  
ব্যাপী তুকাঁ পাঠান হাবশী আর বাঙালী  
মুসলমানদের রাজত্বকাল।

সেনানারক বৃত্ত-ইয়ার পাসন কাজের  
সুবিধার্থে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন  
সেই প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে, তাঁদের ভাষা  
বারিঙ্গ-এ, পাল সন্ধ্যাটের রাজধানী বাণ-  
গড়ের কাছে দেবকোটে বা দেবীকোটে-এ।  
কিন্তু সে ছিল অস্থায়ী সেনানিবাস মাত্র,  
রাজধানী কিংবা এল লক্ষ্মণাবতীতে।  
কিন্তু এবার নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো  
লখনৌতি। গোড়-লক্ষ্মণাবতী এবার হলো:  
লখনৌতি-গোড়। হিন্দু বৃগের মন্দির-  
গুলির শীর্ষ লুটিয়ে পড়ল হুলায়ুধ। নতুন  
বৃগের নতুন স্থাপত্যে শোভিত হলো গোড়-  
নগরী। গড়ে উঠল অসংখ্য মসজিদ, মিনার।  
জেগে উঠল নতুন গোড়! এই সেই  
লখনৌতি! সেই গোড়।

বজ্রাসেনের নয়, লক্ষ্মণসেনের নয়  
মুসলমান বৃগের গোড়। হিন্দুবৃগের  
গোড়কে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না  
কোথাও। তবু এই লখনৌতির আড়ালেই  
যে রয়ে গেছে লক্ষ্মণাবতীর স্মৃতি, এখন-  
কার অজ্ঞান মসজিদের গায়ে যে প্রোথিত  
আছে হিন্দুধর্মের দেব-দেবীর মূর্তি বা  
তার আভাস, পোড়া মাটির অসংখ্য কাজে  
যে রয়েছে হিন্দু শিল্পকলার ইশীতময়  
রেখাচিত্র, লক্ষ্মণাবতীর শরীরই যে  
লখনৌতির সজ্জায় আজ আমার সম্মুখে  
উদ্ভাসিত—এ সভা ভুলতে পারি না  
মুহূর্তের জন্যও। তাই বাণগড়ের পর  
লক্ষ্মণাবতী পরিচর্যা করতে এসে লখনৌতি-  
তেই আসতে হয়। কৈশোর থেকে বোবনের  
প্রারম্ভিকাল পর্যন্ত যখন মালদায় ছিলাম  
তখন থেকে আজ অবধি, এত দূরে চলে  
এসেও বার বার এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে  
ছুটে কেতে হয় গোড়ে—আমি জানি, গোড়  
বাংলার ইতিহাসের এক-একটি মূল্যবান-  
কারী ঘটনার সাক্ষী। গোড় ভারতবর্ষের  
ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়  
মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনার, ঘনঘটা, রাজধানীর স্থাপত্য  
চমকে, শিল্পকলায় ও মন্দির, মসজিদ, এক-  
একজন হিন্দুধর্ম প্রতীকার, আবেগের  
ভারতের ইতিহাসে গোড় এক অনন্য মূল্য,  
বিশ্বায়কর অধ্যায়ের জনক হয়ে উঠেছে।

অথচ আজ তার সীমাহীন, সীহীন  
মূর্তি! ১৫৭২ সাল। সন্ধ্যাট অধির লৌচ-  
মন্ডলের নাম পরিবর্তন করে 'লখনৌতি'  
রাখেন। 'সৈন্যাদর্শ' মূর্তির খাঁড়ি। সন্ধ্যা  
গোড়ের শেষ প্রাচীন সুলতান দারুল-খীর  
স্বাভাব্য লাভের কসনাকে চূর্ণ করে দিতে।  
পরাস্ত হয়েছিলেন দারুল, আর তাঁর  
রাজত্বের অবসানের সঙ্গে লখনৌতি 'লি-  
কালের মতো হারিয়ে গেল গোড়-নামটি'  
এর পর শব্দ হয় বঙ্গ বা বাংলার রাজ্য!  
আর এই ভূখণ্ড? এত দিনের এক অশ্রু-  
বিজড়িত এই নামটি হারিয়ে যাবার দুঃখ  
বোধ হয় গোড় সহ্য করতে পারল না।  
এক কাল ব্যাধি গ্রাস করল গোড়কে। গম্বু  
আবার ব্যাধি পরিবর্তন করলো। কুস্তিকর  
পলগে মারা গেলেন স্বয়ং মূর্তির খাঁ।  
সম্রাজ্ঞ নাগরিকেরা ধন-সম্পদ পরিচর্যা  
করে চলে গেলেন অনন্ত। ঘন অরণ্য আবৃত  
করল গোড়ের লক্ষ্মী! বেভাক, হারিয়ে গেছে  
গংগা কণসংগে বাণগড় আর লক্ষ্মণাবতী—  
সেভাবেই হারিয়ে গেল লখনৌতি-গোড়!

সে এক বেদনাময়, পীড়াদায়ক নিম্ন  
ইতিহাস। লোভী লুণ্ঠক দস্যুর পরে এক  
এক করে অপহরণ করল গোড়ের পরিচর্যা  
সম্পদ, সুন্দর অট্টালিকাগুলির অলঙ্কৃত  
শক্তির খসিরা সন্ধ্যাট হুমায়ুনের 'জিহ্মতাবাদ'  
বা স্বর্ণগণের গোড়কে স্থানান্তরিত করল  
শূন্যতার পরিণত করল পরবর্তীকালের  
মানুষেরা। রাজধানী তান্ডা থেকে রাজ-  
মহল, রাজমহল থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে  
মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতার  
স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-  
বাংলা এই নামের আড়ালে আত্মশোষণ  
করল বাঙালীর অমৃত স্মৃতিবিজড়িত  
'গোড়' নামটি! হারিয়ে গেল বিলুপ্তির  
অতুল।

কিন্তু সত্যিই কি হারিয়ে গেল?

আজ আবার ঠিক চারশো বছর পর  
এই ১৯৭২ সালে যখন পশ্চিম বাংলায় নাম  
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তখন  
পণ্ডিতজনের প্রস্তাবে সেই 'গোড়-নামটি'ই  
আবার উচ্চারিত হলো। এখনো সন্ধ্যা প্রাতি-  
শব্দের নামের সঙ্গে অসংখ্য জীবির কলসার  
এই নামটি ছাড়া ফলে দেখতে পাই।  
স্বীকার করতেই হবে গোড় নামটির প্রতি  
বাঙালীমাত্রই একটি প্রকৃত, গর্বিত  
আছে।

বাঙালী আমি তাই স্মৃতিবিজড়িত করার  
চারশো বছর পর আর একবার পূর্ণ হুলায়ুধ  
গোড়ের মাটিতে—চারশো বছর অধিকার  
রূপ কেমন ছিল তা স্মৃতির চোখে দেখে  
বলে!

সম্ভব হয় না তা। 'গোড়' বর্ণমালায়  
বিস্তৃত, আরো লক্ষ লোকের বাসস্থান, শব্দ-  
মাত্র ব্যাধি হাজার পানরই পানর স্মৃতিবিজড়িত  
বিশাল এই মহানগরীর পীঠা বেঁধে রাখা



থেকে শুরুর আর কোথায় বা তার শেষ এত-বার এসেও তার কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই না।

একাধিক সুউচ্চ বাঁধ আর গড় দিয়ে এ নগরী রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন গোড়-সুলতানেরা, মগলর প্রাসাদ আর সুরম্য অট্টালিকায় শোভিত করেছিলেন এই মহা-নগরীকে—প্রকৃতি আর মানুষের নির্মম অত্যাচারে আজ তার ইতস্তত বিকসিত ভাঙ্গাংশ মাত্র আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গড়ের মাথা লুটিয়ে পড়েছে ধলোর, পরিভ্রান্ত সম্পদের লোভে গোড়ের বন্ধ খুঁড়ে কতবিকৃত করেছে নিবাবেক লুণ্ঠকেরা, সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে মর্শিদাবাদের হীরামণি প্রাসাদ, বাসগৃহের ইট পাঁচ টাকার পাঁচশো গাড়ি কিনে উত্তরাধিকারীরা গড়ে তুলেছে মালদহ ও মর্শিদাবাদ শহর। অর্থহীন মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে শত্রু কর্মকর্তা মসজিদ—তাও ধর্মীর কারণে। আর ধর্মকে ধারা প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন তাঁদের শাবলের আঘাতে করে গেছে অনেক মসজিদে মীনাঙ্কর রত্নীন কারুকার্য!

আজো করে যায়। গোড়কে শ্রীহীন করার হীন প্রয়াসে আজও মত্ত আছেন এমন অসংখ্য দর্শনাধীর্ষ যারা দেশ-বিদেশ থেকে পিকনিক করতে বা বেড়াতে আসেন এখানে, সীমাহীন অজ্ঞতা নিয়ে যারা রান-কেলীর মন্দির, বারোদুয়ারী, দখল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, গুম্ফা দরওয়াজা, লোটন মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ দেখে ফিরে যান এবং যাবার সময় স্মারকচিহ্ন হিসেবে সংগ্রহ করেন অমূল্য প্রত্নতত্ত্ব।—সে যে-ভাবেই হোক।

কেউ নেই আর অসহায় গোড়কে রক্ষা করার। রাজপ্রহরীর অস্তিত্ব তো কবে ধলার হয়েছে ধূলি, একালেরও কোন প্রহরী নেই, একজন গাইডও নেই যিনি অন্তত একটা মমতার আবেশ তৈরী করতে পারেন! ফলে পৰ্বটকের তুফা মেটে শত্রু, দশরথান এ কটি মসজিদ, মিনার, মন্দির দেখে আর তার সামনে নীল এনামেল সেটে লেখা সরকারী পরিচরঞ্জাপক কিছু শব্দ-সম্মতি পাঠ করে। একজন কর্মচারী আছেন গোড় মিউজিয়ামে, আছেন একজন খাদেম যার কাছে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সবচেয়ে রক্ষিত আছে, কিছু তাঁরাও বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের সব পরিচর জানাতে পারেন না। চিকা মসজিদ থেকে কিছু দূরে ঐ বিশাল কাইশগঞ্জী প্রাচীরের আড়ালে যে গোড় সুলতানদের রাজপ্রাসাদ ছিল ফিরোজ মিনারের পাশে বাঁধবনের অঞ্চলাসে আজো যে নিষ্কূতে জেগে আছেন গোড়ের প্রধান আরাধ্যা গোড়েশ্বরী দেবী—সে সংবাদ কেউই পান না!!

আর, মালদহ শহর থেকে গোড়ে যাবার পথে ডানহাতি সাদরাপুর মহামুদানে যাবার রাস্তায় ধরে যে বিশাল বড় সাগর দীঘি—প্রকৃতপক্ষে ওখান থেকেই যে গোড়ের

দ্রষ্টব্য স্থান শুরুর হলো, তার খবরই বা কখন রাখেন। এই-সেই বড় সাগরদীঘি বোত খনন করিয়েছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। এবং এরই মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছিল গোড়ের নিউকবতী কিখাত কাদামাটির দুর্গ একডালা। সেই একডালা যে কোথায় আজও তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।

এক মাইল দীঘ ও এক মাইল চওড়া এই দীঘিরই উত্তরে যে উঁচু জায়গা সেটি ছিল গোড়ের বাণিজ্য কেন্দ্র। কাছে পীরগ-পীরের মসজিদে যাকর পথে যে পুরনো সঁকো আছে, তার ডলা দিয়ে নৌকো করে গোড় শহরে ভেতরে মাল সরবরাহ করা হতো।

এরই কাছে স্মারবাসিনী দেবীর মন্দির। গোড়ের অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবী। হিন্দু যুগের আর এক স্মৃতি চিহ্ন। পিরান-ই-পীরের মসজিদ বা আঁখ সিরাজুদ্দীনের সমাধিস্থান এবং বনঝনিয়া মসজিদ নিকটবর্তী আর দুটি প্রত্নস্থান। মুসলমান যুগের। সাগর দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে আঁখ সিরাজুদ্দীনের সমাধিস্থান। ইনি একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন এবং পাণ্ডুরার নর-কুতুব-উল আলমের ধর্মীয় পিতামহ হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। শোনা যায়, নর-কুতুবের পিতা শেখ আলাউল হক এর শিষ্য ছিলেন এবং আজো যখন ঈদ-উল-ফিতর এবং বকর-ঈদ উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে তখন পাণ্ডুরা থেকে ঝান্ডা, নর-কুতুবের পাজা ইত্যাদি এখানে আনা হয়। পীরের সমাধিস্থানের সম্মুখের দেয়ালের দুদিকের যে শিলালেখ আছে তা থেকে জানা যায়, সুলতান হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরুৎ শাহের সময় এখানকার প্রবেশ স্মার ও সমাধিস্থান তৈরী হয়েছিল। প্রবেশ স্মারগুলি এখন আর অক্ষত নেই। কিন্তু পোড়া ইটের কারুকার্য মণ্ডিত শোভা আজও ধ্বংস প্রাপ্ত স্মারের শোভা বরুকে ধরে রেখেছে। সমাধি বেখানে দেয়া হয়েছে সে জায়গাটি বেশ বড়। কথিত আছে, পীরের সঙ্গে তাঁর নিত্য-ব্যবহার কোরান-ই-শরিফ, তরবীহ এবং বই রাখার স্ট্যান্ডটিও তাঁর শিরের কাছে রাখা হয়েছে।

এরই কিছু দূরে ১৫৩৮ সালে সুলতান গিরাসুদ্দীন মুহম্মদ শাহর তৈরী বনঝনিয়া মসজিদ, যাকে রায়জেনশ জান-জান মিনার মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। মসজিদে প্রোথিত গিলালিপি-থেকে জানা যায় মালভী নামে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এবং নির্মাণ-সময়ের উল্লেখ থেকে মনে হয় সম্ভবত এইটিই গোড়ে তৈরী সর্বশেষ মসজিদ। এর কিছুকাল আগে বা পরে লুকোচুরি দরওয়াজা তৈরী হয়। কে ছিলেন এই মসজিদ নির্মাণকারী মালভী আজ আর তা জানা যায় না। শত্রু নীরব পাথরের অক্ষর তাঁর স্মৃতিকে অক্ষর করে রেখেছে। আঁখি কখন সেখানে গিয়ে পৌঁছানোর

তখন বিশেষ পরক উপলক্ষে সেই মসজিদের ভেতর থেকে বিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রাণনার স্বর ভেসে আসছিল। তাঁদের আত্মরিক আকুল আহ্বান, মনে হচ্ছিল, যেন এক-একটি যুগের সীমা অতিক্রম করে সেই পুরনো দিনগুলিকে স্পর্শ করতে চাইছে।

ফিরে আসতে হয় পুরনো পথেই। এবার মালদা-গোড় সড়ক। এই পথেই দুধারে ছড়ানো আছে গোড়নগরীর অন্যান্য স্মারকচিহ্ন। কিছুদূর এগোলে আগুই চোখ থমকে দাঁড়ায় বাঁহাতি দুটো বড় পাথরের স্তম্ভ দেখে। স্লোকে বলে, এ-দুটো নাকি হাতি বাঁধা খাম। রাজার হাতি বাঁধা থাকত এখানে। ইতিহাস জানায়, আসলে এ-দুটি কোন রাজকর্মচারীর বাস-গৃহের ভোজনশালা। সেই বাসগৃহ কবে ধলোর একমকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে আধুনিক মানুষ মাটির ঘর বেঁধেছেন—শত্রু নিত্যন্ত বিসদৃশ ঐ দুটি পাথরের সাক্ষী অতীতের বৈভব আর বিস্তার কথা সম্পূর্ণ জানাতে গিয়ে যেন কেমন বিব্রত বিমূঢ় হয়ে স্তম্ভ হয়ে আছে!

আর কিছু দূরেই সেই বিখ্যাত পিরাসবাড়ী দীঘি! গোড়ের বন্দীশালা-সংলগ্ন বিশাল জলাশয়। শোনা যায়, এল জল আগে দূষিত ছিল এবং বন্দীদের এরই জল ছাড়া আর কিছুই পান করতে দেওয়া হতো না! আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে বলেছেন, সম্রাট আকবর নাকি এই নিয়মটি বন্ধ করে দেন। মকর ভ্রমকালিন অবস্থা পরবর্তীকালে এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন, আসলে এর জল সুপেয় ছিল। বন্দীদের চোখের সামনে এই তুফার শাস্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের তা স্পর্শ করতে দেওয়া হতো না, ফলে আকস্মিক পিপাসা নিয়ে তারা মারা যেত। সেট থেকেই এর নাম পিরাসবাড়ী—অতীতের পিপাসার্ত কতকগুলো মানুষের তাঁর হাহাকারকে বেন আজো জাগিয়ে রেখেছে। এই দীঘির জলেরই তিন ফুট নীচে বাঁধানো ঘাটের কাছে দুটো পাথরের হাতি বাঁধা আছে। কে বেঁধেছে, কেন ওভাবে রাখা হয়েছে সে কেউ আজ আর বলতে পারেন না। শত্রু যখন এখানে ডাক-বাংলো তৈরী হচ্ছিল, তখন অসংখ্য দীঘ-দেহী মানুষের নরককাল পাওয়া গেছে মাটির গভীর থেকে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন এগুলোই সেই হতভাগ্য তুফার্ত কর্মীদের অসহায় অস্তিত্ব! বিব্রততা অনুভব করেন পৰ্বটক। কিন্তু সেই বিব্রততার ব্যথা মুছে যায় আর একটু এগোলে, ডানহাতি কাঁচা মাটির রাস্তা করে রামকোলির দিকে এগোলে।

রামকোলি! সেই রামকোলি গ্রাম, পাঁচশো বছর আগে নীলাচল যাবার পথে শ্রীচৈতন্য যেখানে এসে নিলিত হয়েছিলেন পরম-বৈক্য সাক্ষর মল্লিক ও দ্বীপ খাস সনাতন ও রূপ সোমসামীর সঙ্গে। এইখানেই ছিল তাঁদের বাড়ী। সুলতান হুসেন শাহর কিব্বত মন্দির ছিলেন তাঁরা। ঐ রূপনগর



কোথায় কেউ নেই এখন। আমার সঙ্গী ডাঃ জিতেন চক্রবর্তী উচ্চশেষে আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে তা হাহাকারের মতো লাগছিল। অবশেষে কেমন বিস্ময় লাগে, কত ঘটনার কথা নীরব হয়ে আছে এখানকার বাতাসে। এই প্রাচীরের আড়ালে কসলী একদিনের রাহুকলি গ্রাম থেকে ভেদে-আসা হরিনাম ধ্বনি শনে চমকে উঠছিলেন নরনাথ হোসেন শাহ। এই প্রাসাদেরই কোন এক কক্ষ প্রধানমন্ত্রিসহ একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন প্রজ্ঞা সম্বন্ধে।

পরিমাণ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন অনু-  
জ্ঞের। সুলতান উল্টো বক্ষে বলেছিলেন  
এক কল টাকার কি হবে। কোথায় সেই  
রক্তাক্ত-ভার! খাচারপুখানার গহ্বরে এখন  
শব্দে রক্তভা। এই প্রাসাদেই বিষ দিয়ে  
সুলতানকে হত্যা করার বড়যন্ত্র করা  
হয়েছিল। তা আগে থেকে অনুমান  
করে গোপন পেটিকার কাঁচা তেঁতুল নিয়ে  
জোজনে করেছিলেন সনাতন। বিবর্তিতা নষ্ট  
হয় তাতে। সুলতান পরে তার এই  
অসামান্য ব্যক্তিগত স্বীকৃতিস্বরূপ  
গোড়ের বদে বদে তেঁতুল গাছ রোগের  
আগুন জারী করেন। হয়ত কিংবদন্তীরই  
এক গল্প, কিন্তু অসংখ্য তেঁতুল গাছ দেখে  
এ সব গল্প মনের ভেতর আশ্চর্য আর্জ  
হয়।

এখন থেকেই তো দেখা যায় চিকা  
মসজিদ যার ভেতর একদিন খ্রীস্টোরাংগ  
জন্ম সনাতনকে বন্দী করেছিলেন সুলতান  
হুসেন শাহ। হারিনামমন্ত্র মন্তিগাল সেই  
বন্দীর কোন জলরেখা তার অন্ধকার বিবর্ণ  
দেয়াল থেকে কবে মুছে গেছে। নেই সেই  
প্রহরী হাবা শেখের পদচারণা, যাকে  
উৎসেতে বন্দীকৃত করে গঙ্গা সিতরে মহা-  
প্রকুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সনাতন  
গোলামী। চিকা মসজিদের ডান পাশে  
ডায়ে বেরা জারগার যে পাথরের খিলান-  
চাপা গড়গালা আছে, লোকে বলে ওগুলো  
নাকি ফারিস মন্দের জন্য তৈরী! সম্মুখে  
ঐ গুরুটি দরওয়াজা গোড় দূর্গে প্রবেশের  
পূর্বপ্রান্তিক গোপন পথ। এখন ওখানে  
একটি সংগ্রহশালা হয়েছে। এবং অমূল্য  
কিছু প্রত্নসম্পদ লোভী সনাতনের হাত  
না এড়াতে পেরে হারিয়ে গেছে চিকাকালের  
মতো। এরই বাপাশে লুকোচুরি দরওয়াজা—  
শাহ সুলতান তৈরী গোড় দূর্গে প্রবেশের  
আর এক ভোরগ! উপরে নহবৎখানা।  
কল্পনার গল্প বলে, এখানে নাকি বাদশা  
বোমরা লুকোচুরি খেলতেন। তারই বাপাশে  
কদম রসুল, যেখানে হজরৎ মহম্মদের পদ-  
চিহ্ন রাখা হয়েছিল। এখন সেটি নিকট-  
বর্তী মহদীপুর গ্রামের খাদেমের কাছে  
আছে। তার কাছেই ফতে খাঁর সমাধি—  
যার গঠনকোশল মনে করিয়ে দেয় এটি  
কোন হিন্দু মন্দির ছিল। ইতিহাস বলে,  
রাজা গণেশ নাকি এটি তৈরী করিয়ে-  
ছিলেন।

কদম রসুলে রীকৃত মহম্মদের পদাচিহ্ন  
নবাব সিরাজসোহা এককর মন্দিরবাসে  
নিরে বান, পরে মীরজাফর আবার তা  
গোড়ে ফেরৎ পাঠান। এটি আরব দেশ  
থেকে প্রথম আনেন একজন পীর, সঙ্গে  
একটি নিশানও আনেন। সেটি এখন  
পাণ্ডুরাতে আছে। কদম রসুলের ভিতরে  
একটি কঠোর ডাঙা বাকস দেখা যায়। কবিত  
আছে, এটিই ভিতরে কয়েই নাকি এগুলি  
আনা হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্বের বাইরে আজো  
কিন্তু বিদ্রামশালার কংকাল দাঁড়িয়ে।

কে আসবেন আর এখানে বিদ্রাম  
করতে! কোন কেউ আসেন না আর ঐ  
দূরের চিরাগদানীর মাথার আলো জ্বলে  
কোন স্পষ্ট জানাতে। ঐ চিরাগদানীরই  
অপর নাম 'পীর আসম মন্দির' বা 'ফিরোজ  
মন্দির'। এটি তৈরী করেছিলেন সেই মালিক  
আসিম। খেরালী দানবার পরাক্রমী এক  
গোড় সুলতান। আমি ঐ মিনারের দিকে  
তাকালে এখনও এক ভয়ানক দৃশ্য বেন  
স্পষ্ট দেখতে পাই। মিনার তৈরী শেষ হলে  
সম্রাট ফিরোজ শাহ, বারই অপর নাম  
মালিক আসিম, রাজমিস্ত্রীসহ উঠেছেন  
মিনারশীর্ষে। গর্বিত মিস্ত্রী বলে, আরো  
মালমশলা পেলে আরো ভালো আর উঁচু  
করে গড়তে পারতাম এই মিনার। আনন্দিত  
ফিরোজ শাহর কানে কথাটি তীর এক  
বাপের আঘাতের মতো বাজে। রুদ্ধ হয়ে  
ওঠেন অমিতব্যয়ী সুলতান। সামান্য  
মিস্ত্রীর এই স্পর্ধার উজ্জ্বল মূর্ত্যমাগ্ন  
সহ্য না করে তাকে নীচে ফেলে দেবার  
আদেশ দেন তিনি। তারপর এক মর্মান্তিক  
আত্মনাদ ভেসে ওঠে গোড়ের বাতাসে।

কিন্তু সুলতান নীচে নেমেই আদেশ  
করেন ডুতা হিঙ্গাকে—তুই এখনই মোর-  
গায়ে না। বিবৃঢ় হিঙ্গা বাবার কারণ না  
জেনেই চলে যায়। সেখানে তাকে চিন্তিত  
দেখে এক তীক্ষ্ণদী রাজা বলেন, এখানে  
রাজমিস্ত্রীর বাস, ভূমি তাদের একজনকে  
নিরে যাও।

হিঙ্গা ফিরলে চমকে ওঠেন সুলতান।  
তৎক্ষণাৎ সেই রাজাকে ডেকে উক্ত রাজপদে  
সম্মানিত করেন। এই রাজাশই সেই সনাতন।  
সনাতন হোমস্ময়ী। হয়ত এও কল্পনার  
গল্প। লুকোচুরি দরজা পেরিয়ে মহদী-  
পুরের দিকে যেতে যে সন্দেহভর লোটন  
মসজিদ তাকে ঘিরেও এমন গল্প, ঐ  
চামকাটি মসজিদ যেখানে আগে গোড়ের  
চমকাদের পাড়া ছিল বা তাঁতিদের  
পাড়ার তাঁতিপাড়া মসজিদ বা লোটনের  
সময়ের কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলে পটি-  
খিলানের সাঁকোর কাছে গুরুমন্ত মসজিদ—  
এসবকে ঘিরেই তো নানা কাহিনীর মায়া-  
জাল। ঐ লোটন বিধির কাছে নাকি প্রতি  
সন্ধ্যায় সম্রাট ব্যক্তিগতবী গোড় নাগ-  
রিকেরা সমবেত হতেন। ঐ পটিখিলানের  
পাথরের সাঁকোর নীচে থেকে গুরুতখন  
পাওয়া গিয়েছে নাকি অনেকবার।

অনুরূপ আর একটি পাথরের সাঁকো  
আছে কোতওয়ালী দরওয়াজা বাবার রাস্তার।  
কোতওয়ালী দরওয়াজা গোড় দূর্গে প্রবেশের  
দক্ষিণ প্রান্তিক ভোরগদার। এইখানেই  
আগে প্রধান সামরিক ঘাটি ছিল। এখনও  
আছে। না সেই সুলতানদের নয়, এ যুগের  
সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ওপরেই-বে-কলা-  
কুপ। আছে ছিল বা পাকিস্তান নামে  
চিহ্নিত এক অজ্ঞান স্থান।

এখন অনুমতি নিয়ে ওপারে গেলে  
চোখে পড়বে ছোটসোনা মসজিদ। তার

পাশে সাম্প্রতিক মন্দিরবাসে নিহত এক  
সেনানীর সমাধিস্থান। একই ঘাটি দুইটি  
যুগের দীর্ঘ ব্যাখ্যানকে এক সূত্রে বেঁধে  
লেখেছে মেন। যেতে পথে পড়বে তহখানা।  
নির্জন প্রান্তরে এক বিশাল আবাস-গৃহ আর  
সংলগ্ন এক মসজিদ। গোড়ে সম্ভবত  
এইটিই এখন একমাত্র আবাস-গৃহ যা কালের  
এবং অত্যাচারী মানবের হাত এড়াতে  
পেরেছে।

এখানে বাস করতেন গোড়ের বিখ্যাত  
পরিব্রাজক শাহ নিয়ামতুল্লা। এখন তারই  
এক কংশধর বাস করেন। অস্তিত, আমার  
বিস্ময়কে চমকে দিয়ে সেই নির্জন অট্টালিকা  
থেকে যে বৃদ্ধ মানুষটি বেরিয়ে এলেন,  
তিনি তাই জানালেন।

আমি বিস্মিত চোখে সেই বাড়ীটি  
এবং এই মানুষটিকে দেখেছিলাম। গোড়ের  
সুলতানদের অনেক পরিচয় নানা গ্রন্থে  
শিলালিপি পুঁথি তাললেখেতে আছে, কিন্তু  
তখনকার সাধারণ মানুষ কিতাবে জীবন-  
যাপন করতেন তার নিজের বড় একটা  
কোথাও পাওয়া যায় না। পার্ববর্তী  
মহদীপুর গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষকমশায়  
খ্রীস্টোয়ান পান্ডের প্রথমে এখন একটি  
মূল্যবান সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে।  
সেখানে গোড় নাগরিকদের ব্যবহৃত পাথরের  
একটি আশ্চর্য ট্রাঙ্ক বা সার্টকেশ, বিভিন্ন  
তৈজসপত্র, গৃহস্থের মণ্ডল শব্দ, পুর-  
নারীর গলার মালা, জলপাত ইত্যাদি দর্শন  
সামগ্রী আছে। এসব জিনিস অন্য কোন  
সংগ্রহশালায় আছে বলে আমার জানা নেই।  
যাঁরা অনুসন্ধিৎসু গবেষক, গোড়ের প্রাচীন  
জীবনযাত্রার অনেক মূল্যবান সাক্ষ্য সেখানে  
গেলে তারা দেখতে পাবেন। ঐ বিদ্যালয়ের  
শিক্ষক মহাশয়ের কাছে জাতি হিসেবেই  
আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। একবার টেন্ট  
রিলিফের কাজের সময় ঘাটির গর্ত থেকে  
সংগৃহীত এক ঘাটির হাড়িতে এক জোড়া  
সোনার খড়ম, মসলিন, কয়েক জোড়া শাখা  
এবং কাড়ি মধ্য থেকে একটি শাখা সংগ্রহ  
করি। আজো সেটির দিকে তাকালে বহু  
বয়স আগের এক গোড়নারীর শব্দশব্দ  
হাত বেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

মহদীপুর থেকে 'গোড়' চিহ্ন দেখা যায়।  
অনুমান করি, গোড় শব্দের একটি দক্ষিণ  
প্রান্তিক সীমারেখা। এর উপরে এককালে  
সেনাবাহিনীর ছাউনী ছিল, কামান গর্জে  
উঠত। বহুকাল পর, প্রায় চারশে বছর  
পেরিয়ে সেই বজনির্ঘোষ এবার আবার  
বেজে উঠেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের  
সময় ঠিক সেইখান থেকেই।

কিছু দিন আগে ওখান থেকে প্রাচীন  
যুগের একটি নরককাল পাওয়া গেছে।  
এবং এই গড় কেটে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে  
তা ধরে এগোলে যেখানে গুরুমন্ত মসজিদ  
আছে তার পাশেও এবার যুদ্ধের সময়  
সামরিকভাবে আশ্রয় বানানোর সময়  
শরণার্থীরা একজন সুলতানের কবর

আবিষ্কার করেন। কিছুই ছিল না ভিতরে, অথবা কিছু ছিল—জানার কোন উপায় নেই আর! শব্দ সেই শব্দগত্ব ইটে বাধানো সমাধিভূমি এক রহস্যময় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে নিজেকে।

এমন সমাধিভূমি অনেক আবিষ্কার করেছেন এর আগে তনুসমিহন বা রত্ন-লোভী মানবেরা! ফলে সুলতানদের সমাধিভূমি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। বাইশ-গাজীর কাছে খাজাখানার উত্তর-পূর্ব

বাগেরকোট নামে জায়গার আগে বৈশ্বাসে তাঁদের সমাধিস্থান ছিল ১৮৪৬ সাল নাগাদ তা ধ্বংস করে কেলেস সম্পদলিপ্সু মানব। এমনভাবেই হারিয়ে গেছে পিঠাওয়ালী মসজিদ এবং নিম্ন দরওয়াজা বা দেহতে অনেকটা দাখিল দরওয়াজার মতো ছিল। বাঙলাদেশের অন্তর্গত হওয়াতে এখন অনেক মসজিদই এপারের পর্বতকূলের চোখে পড়ে না। বাংলার মতো গোড়ো ও বিধা-বিভক্ত হয়েছে।

লোন্টন মসজিদের সামনে বিশেষ করে আসার সময় জাবার থমকে দাঁড়িতে হলে। চাবের জন্য অসিতে কোলাল চালানিয়েছেন এক কুবক। ঠিকরে উঠছিল ছোট ছোট প্রাচীন কালের ইট। হঠাৎই সেখানে বেরিয়ে পড়ল এক গৃহস্থ বাড়ীর ভিত। প্রুত পারে এগিয়ে গিয়ে কিম্বারে লুপ্ত হয়ে গেলাম। সম্ভবত কুমোর বাড়ী ছিল এটা। সারি সারি সাজানো মাটির হাঁড়, নানা ধরনের পাত, মৃৎপ্রদীপ। হাঁড়ের

## আরও একটি সম্ভান চাওয়ার আগে ভাব দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো  
লালন-পালন করতে  
পারছেন কি না



আপনার মনের সাথ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনার ভালো ছ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ করে তাকে মানুষ করে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অথবা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কেউ কোটি সম্পত্তি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা ভাবা ভাবছেনই না। নিরোষের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোষ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, স্ববায়ের জরনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় বলে জরনিরোধের ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে লোকে নিরোষ ব্যবহার করে আসছেন। আপনিও নিরোষ ব্যবহার করুন না? সরকারী অর্ধ সাহায্যে সর্বত্র ১৫ পরসর ৩ টি নিরোষ পাওয়া যায়



আরেকটি সম্ভান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

# নিরোষ

লক লক লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, স্ববায়ের জরনিরোধক  
সরকারী কোকান, স্থানীয় কোকান, কেমিটের কোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

৩৭৮ ৭১/৬৬০





# প্রদর্শনী

কলকাতার সাংসারিক কলা অনুষ্ঠান  
ও একজন প্রতিভাশালী শিল্পী

ভারতবর্ষের অধিকাংশ তথাকথিত শিল্পকলায়োগ্যনমূলক অতিকার সংস্থাগুলি বার্ষিক সংকলনধর্মী প্রদর্শনী সারাংসারশানা রীতিতে পরিণত হয়েছে। যে সব শিল্পী সং এবং সক্রিয়ভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রতিবছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন শিল্পকর্ম বা শিল্পপদ্ধানে নিয়োজিত আছেন তাঁদের দশ-শতাংশও আজকাল আর এইসব সাংসারিক শিল্পকলায়োগ্য পসরা সাজিয়ে বসেন না। ফলে তথাকথিত শিল্পকলায়োগ্যদরদীদে (শিল্পীদের নয়) এই শিল্পকলায়োগ্যনমূলক সংস্থাগুলির বৎসরাবৃত্তিক প্রদর্শনীগুলি অপরিণত এবং অবসরপ্রাপ্ত চিত্রকর আর ভাস্করদের না হলেও কিছু এসে-যেতে না। গোড়ের কাজের মেলা শুরু দাঁড়িয়েছে। দিল্লীর অল ইন্ডিয়ান সাইন আর্টস এন্ড বায়টস সোসাইটির বর্তমান এ-ব্যাপারটির প্রতিকারের আশা নিয়ে ১৯৭১-৭২-এর সাংসারিক পদর্শনীতে প্রদর্শনারদক্ষতাসম্পন্ন চিত্রকর এবং ভাস্করদের অংশ গ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য শব্দ যে জন জন নিমন্ত্রণ করেছিলেন তা নয় প্রতিটি এ-প্রদর্শনার ঠিকার হলের ছটি পরস্পরকে ব্যবস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু তাতেও যে প্রদর্শনীর মানের খবর একটা হেরফের হয়েছিল তা মনে হয় না।

কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীতেও আজ বেশ কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সং, সাক্ষর, প্রতিভাশালী এবং প্রতিভাশালী চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপার ছবি নিম্নোক্তরা অংশগ্রহণ করেছেন না। ভারতবর্ষের শিল্পকলা জগতে পশ্চিমবঙ্গের থেকে কয়েক অঙ্গুলিরমধ্যে শিল্পী স্বামী কুমার বলে জারণ করে নিয়েছেন, তাঁদের দু-একজন ছাড়া আর কারও কাজ বেশ কয়েকবছর ধরে একাডেমির প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে না। একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের অধীনস্থ অনর্ধিত হিন্দুস্তান বার্ষিক প্রদর্শনীতেও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রথম সারির সিরিশ শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র নীরদ মজুমদার এবং অন্যান্যদের মধ্যে গোপাল ঘোষ ও গণেশ হালদারের কাজের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জারণ থেকে যে বছর সংযুক্ত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আরনাওবাঈ জ্বাইভার

(মাদ্রাজ), বিদ্যাসুখ (হারদরাবাদ), পি ডি আনকীরাম (মাদ্রাজ), অরুণ পারিখ (বরোদা) সুপ্রকাশ (হারদরাবাদ), পি টি রেন্ডি এবং এস জি বাদুদেব (মাদ্রাজ) শিল্পী হিসাবে কথিত পরিচিত এবং বাংলাদেশের শিল্পাচার্য অরুণ আবেদীন উল্লেখযোগ্য। দিল্লী, বোম্বাই, বরোদা, হারদরাবাদ, আহমেদাবাদ এবং মাদ্রাজের অধিকাংশ খ্যাতিনামা শিল্পীর কাজ এই প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত। এমনভাবেই এই প্রদর্শনীকে কি পশ্চিম-বঙ্গী তথা ভারতবর্ষের শিল্পকলার প্রতি নিম্নমূলক প্রদর্শনী বলে অভিহিত করা যায়?

ভারতবর্ষের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও ছাপার ভবিষ্যৎ গত দশ পনেরো বছরে যে-সব দিন সমৃদ্ধ হয়েছে এবং প্রধানত যাদের কাজের কথা দিয়ে যে-সব সমৃদ্ধ প্রকাশ পেয়েছে, সেসব দিকগুলির কাজের অনুপস্থিতির কারণে ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ছাপার ছবির প্রধান প্রধান গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এ-প্রদর্শনী থেকে কোন ধারণাই প্রাপ্য জন্মায় না। ব্যতিক্রম শ্রদ্ধাশ্রম নীরদ মজুমদারের ছবি এবং আনকীরামের একটি ভাস্কর্য নিদর্শন। আনকীরামের ভাস্কর্য থেকে হিন্দু ঐশ্বরিকতার নবীকরণ এবং নীরদ মজুমদারের ছবি থেকে তত্ত্বালম্বারিক বিষয় চিত্রকলা সম্পর্কে কথিত ধারণা লাভ করা যায়। এ-দুই ধারাই সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম দুই প্রধান ধারা এবং এই দু'জন দুই প্রধান পুরুষ।

অনেকে বলতে পারেন যে নামী শিল্পীদের উপস্থিতিই কোন প্রদর্শনীর মান উন্নয়নকারক নাও হতে পারে; কারণ নামী এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যে সব সময়ে ভাল কাজ করেন, তা নয়। কোন প্রদর্শনীর উদ্যোগের যদি নামী শিল্পীদের কাজের চেয়েও অখ্যাতিনামা প্রতিভাশালী তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া তবে তা সাতিশয় আনন্দজনক কাজ বলে অবশ্যই পরিগণিত হবে। কিন্তু একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনী দেখে এবারের শিল্পকলায়োগ্য-মনস্কতার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

প্রথমেই ধরা যাক নামী শিল্পীদের কাজগুলি। নীরদ মজুমদারের ছবিতে নকশার এবং রঙের নতুন কিছুই পরিচিতি হয় না। উপরন্তু, আজ যখন নীরদ-বাবুর ছবিতে নকশার কারাগার জ্বইং প্রধান হয়ে উঠেছে তখন জ্বইং সম্পর্কে তাঁর আরও বেশী বতাবান হওয়া উচিত ছিল। সুনীল-মাধব সেনের ছবি ধনীগরের গোড়াবৃত্তিক নকশামাত্র। রবীন্দ্র মিত্রের কাজ দেখে মনে হয় যে, তিনি জ্বইং এবং রঙের ব্যাপারে শিখিল হয়ে গেছেন। দিল্লি দল্লি বালে-

শিল্পী : মাজুমদার আরনাওবাঈ



রিনার ছবিতে এ-ধারার দেবার অক্ষর অনুকৃতি পাইদামূলক। অরুণেন্দ্রলাল চৌধুরীর জল-রঙের দুটি ছবি যদিও অমল চাকলা-দারের বছর দু-তিনেক আগের ছবির বক্তৃতাচার রেখাছবির নকশাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় তবু তা হস্তশিল্পসমৃদ্ধ নকশা বলে গ্রহণ করতে আমাদের কোন বিধা থাকে না। তাঁর ছবির অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত চিত্রক্ষেত্রের অসংচার ব্যবহার। পশ্চিমবঙ্গের নামী শিল্পীদের যে স্বল্প-সংখ্যক এ-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে একমাত্র গণেশ হালদারের দুটি কাজ উল্লেখযোগ্য। দুটি নিসর্গদৃশ্য বর্ণাশ্রিতের ব্যবহার দিয়ে শব্দ চিত্রক্ষেত্রে তিনি যেভাবে অসীম দেশে পরিণত করেছেন এবং পরস্পর অসংলগ্ন খোঁচা (stroke) গুলিকে এ-ভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নিসর্গদৃশ্য একটি আপাত-শান্ত চঞ্চল অভিযান্ত্রিক সৃষ্টি করে। সূর্য পাল মশাইয়ের বিমূর্ত রচনাশিল্পে রঙ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। পশ্চিমবঙ্গের বহু নামী শিল্পী ধারা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেননি, তাঁদের কয়েকজনের ছবির স্বাদ তাঁদের অনুভবকদের ছবির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। এ-অনেকটা দৃষ্টের স্বাদ বোঝে মেটানোর মতন।

পশ্চিম শিল্পীদের কোলাজটিকে ডো এ-সমালোচক বিকাশ ভট্টাচার্যের বলে ভুল করেছিলেন। সরলকুমার দাশের পি কিংকরার ছবিটিতে বিকাশের অক্ষর



অনুসন্ধান লক্ষ্যবশত। মন্মথ মূখোপাধ্যায়ের চারি দিককে একে একে সঙ্গত কারণে সুনীল দাঁতের বলে ধুলে ধুলে করতে পারেন। অসিত গঙ্গাধর, ছবি দুটিতে গগন পাইনের বহিঃ-রঙ্গা রীতির অকম অনুরূপ লক্ষণীয়। কাক্ষ দাশগুপ্ত তাঁর দুটি ছবির ভাব-কল্পনার বিকাশকে এবং রূপায়ণ রীতিতে গগন পাইনকে অনুসরণ করেছেন। মৈনাক-শঙ্কর রায়ের এটি-এর রূপকল্পনায় এবং রূপায়ণ রীতিতে লালুপ্রসাদ সাউ এবং সাহাস রায়ের প্রভাব স্পষ্ট। নিম্নলিখিত দাঁতের কাঠের ছাপের কাক্ষকে কেউ যদি সোজা হোড়ের বলে মনে করেন তবে তাঁকে সে-কারণে ফিলিস্তাইন বলা যাবে

না। ইন্দ্রের মনজিতের পুরস্কারপ্রাপ্ত তেল-রঙের ছবিটি একটি বিমূর্ত রচনা, কিন্তু বিশুদ্ধ বিমূর্ত রচনার জন্য রঙ, রেখা এবং চিত্রকল্প সম্বন্ধে যে সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন শিল্পীর এখনও তা অনীয়ত। ওবল আর কাপরের তেলরঙের বাস্তব-ধর্মী রচনাটি দুইই এবং বর্ণনাস্তর প্রয়োগের গুণে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। বিশ্বপতি মাইতির কাজ দুটির বিন্যাসপন্থিত এবং বর্ণকাল্প ডালো। প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি সুসংপ্রকাশের। হারদরাবাদের এই শিল্পী তেলরঙ ব্যবহারে সিম্বহস্ত। প্রায় একরঙা এই ছবিটির বিন্যাস এবং বর্ণাস্তর অভিব্যক্তিমূলক; ছবিটি একটি বিমূর্ত রচনা। সুসংপ্রকাশের গুরু, বিদ্যাভূষণের

ছবিতে শিবের দক্ষতার ছাপ অনুপস্থিত। বরোয়ার অরুণকুমার জয়সওয়াল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমান-ওলসের রঙের পুঞ্জের সাহায্যে চিত্রকল্পে বিভাজিত করে একমাত্রিক রচনা গড়ে তুলেছেন; কিন্তু তাঁর কাজে তাঁর গুরু মণি সরস্বতীর উপস্থিতি সোচ্চার। বরোয়ার মন, জে পার্থ (কৈলাসের মন, পার্থমেন) দক্ষতার সঙ্গে স্নিগ্ধ এবং শেবত বর্ণ ও বর্ণাস্তরের সাহায্যে হোকুসাইয়ের ধরনের আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেয়েছেন; কিন্তু ছবির উৎকর্ষের তলবিভাজন রীতি এবং রঙ তাতে বাদ নেমেছে।

প্রদর্শনীর ছাপের ছবি বিভাগটি একান্তই দুর্বল। তারওকর্ষে ছাপের ছবি সংপ্রতিকালে যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার কোন পরিচয়ই এ বিভাগটিতে পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে শাস্তিনিকেতন থেকে আসা সোমনাথ হোড়ের কিছু ছবির এবং বরোদা থেকে আসা জ্যোতি ভাটের কিছু ছবির কাজের মধ্যে কথঞ্চিৎ মাধাম-মনস্কতা দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের কাজের মধ্যে সোমনাথ হোড় এবং জ্যোতি ভাটের প্রভাব এতই সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে এখনও তাঁদের ব্যক্তিগতপন্থি বলে ধরতে বিধা বোধহয়। এই বিভাগে মাধাম ব্যবহারের দক্ষতা দেখিয়েছেন নিম্নলিখিত পাণ (একটি লিথো-গ্রাফ ও একটি কাঠের ছাপ), পার্থপ্রতিম দেব (দুটি লিনোকট), প্রয়াগ বা (দুটি এঁচং-ও-একোয়াটিস্ট), অমিত রায় (দুটি সেরিগ্রাফ) ও হরেকৃষ্ণ বাগ (রিং নিনতাইল্ড)।

ভাস্কর্য বিভাগটিও দুর্বল। জানকী-রামের শাস্ত্র নির্মিত 'ভবানী' না মূর্তিটি দেখে কিন্তু এই প্রতিমা গড়ার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা গেল না। শিল্পী নিশ্চয়ই পূজার উদ্দেশ্যে এই প্রতিমা গড়েননি। উদ্দেশ্য যদি তা না হয়ে থাকে তবে আশা করা যেতে পারে যে শিল্পী এই দেবী সম্পর্কে কোন ব্যক্তিগত ধ্যানকে অভিব্যক্তি দানের উদ্দেশ্যে এই প্রতিমা গড়েছেন। কিন্তু প্রতিমালক্ষণের দিক থেকে এই প্রতিমা একই ঐতিহ্যানুসারী এবং অন্যথায় এতই আলংকারিক এরূপ যে প্রতিমাশরীরে কোন ব্যক্তিগত ধ্যান মূর্ত হয়ে ওঠে না। এর চেয়ে মাদ্রাজেরই অন্য আরেকজন ভাস্কর, এস নন্দগোপালের শাস্ত্র নির্মিত 'পদ্ম' নির্মাণ কৌশলে, গঠনে, অলংকারে এবং অভিব্যক্তির রূপেও অনেক সার্থক। এটি প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য নিদর্শন। পি চন্দ্রবিনোদের 'গৌতমী' ভাস্কর্যটির গঠন কৌশল এবং কারিগরি দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট কিন্তু রচনাটি একে-বারেই অর্থবাহী নয়। এ ধরনের ভাস্কর্য নির্মাণ না করে শাস্ত্র-নির্মিত, সুপ্রাচীন, মধ্যযুগ বানালেও তো হয়; সেগুলো অস্বস্ত, মানুষের কাজে লাগে।

প্রদর্শনীটি দেখে সাধারণভাবে যা মনে হয়, তা হল প্রদর্শনীটি পেশাদার শিল্পীদের নয়, ছাত্রশিল্পীদের।



## টেলিফোন বিল

আপুনি ভাবে তেকি যে আপোনার টেলিফোন বিল টকা সাধারণতে দিবলগীরা ধনতক শতকরা এশ ডাগতকও বেছি হৈছে?

তেহে, আমাৰ একাউন্ট অফিচাৰৰ ওচৰত দেখুৱাই উৎকালিক বিল এখন লভক আৰু লগে লগে ইয়াৰ ধন আদাৰ দিয়ক।

যদি অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত বহিৰ্ভূত ধনৰ বিল কৰা হুলি এডিপাৰ হয়; বহিৰ্ভূত ধনৰ জেঙা মাৰি লোৱা হয়।

আপোনাক ভালদৰে সেৱা কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰক।



ডাক-ডাব

৬০৭ ৭২/১০০

সকালের চনমনে রোদ্দটা জানালা গলির  
একেবারে উপড়ে এসে পড়ে সুকান্তের  
বিছানায়। প্রথমটা কোনাকুনি, তারপর শাশ  
ফিরে শতে না শতেই তত্তপোশের  
অর্ধেকটা জুড়ে সুকান্তের কোমরের নীচ  
থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত  
পোড়াতে থাকে। ঘুম ভাঙার অনেকক্ষণ  
পরেও সুকান্ত মড়ার মত কাঠ হয়ে পড়ে  
থাকে। রোদ্দরের তেজটা শেষ পর্যন্ত  
অসহ্য হয়ে উঠলে কীণ কোমরটা এক  
অদ্ভুত প্রক্সায় 'দ'-এর মত ভেঙে তত্ত-  
পোশের আরেক কোণে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা  
করে। যেন একটা বড় সাইজের গিরগিটি  
আহত হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

এইভাবেই পড়ে থাকতে হবে অনেকক্ষণ।  
অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত বাড়ীর মেজাজী

ঠিক-কি এসে উঠলে কাঁচ বিয়ে বা জন্মের  
কলে হয় আর হাসন-কোসনের ককশ  
হাতের আওয়াজ শুনে কল আনতে পারবে।  
সুকান্ত একদিন মিনিমিনে গল্পের কাম্বোইল,  
আরও একটু সকল করে আগতে পড় না  
বুঁচির মা! এক কাপ চা-এর জন্য সেই  
কখন থেকে হা-পাডেশ করে কলে কলি!  
বুঁচির মা কখনো গলার হাত-পর সারিয়ে  
জবাব দিয়েছিল, জন্ম ক'লি তোর সন্তানে  
চা খাবার লম্বা হয় না'বাবু তুনে আর  
পাচটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিও। দল  
বাড়ীর কাজ থাকলে কোন দিকটা আগে  
সামলাই বইলবে তো! সত্যিই তোর টাকা  
মাইনের ঠিক কির ক'হ থেকে এর থেকে  
ভালো সার্ভিস আর কি আশা করা যায়!

সারাটা বিছানা জুড়ে রোদ্দের বকল  
দাপাদাপি আরম্ভ করে, ছায়া খুঁজে বুঁজে  
সুকান্ত বকল রাস্তা হয়ে পড়ে, কলী বুঁজে  
অবলের চৌরা ডেকুর বকল নোনা জল কেটে  
সারা মুখ বিস্ময় করে। তেলে, তখন  
সুকান্তের তোর সকালের চা এসে পৌঁছল।  
হিড়হিড় করে চেয়ারট, তত্তপোশের কাছে  
টেনে এনে ঠকাশ করে চা-এর জন্য সিগা-  
রেটের বকল, দেখলাই ও আলমের্টে কাম্বোইল  
কপালের উপর হাত রেখে জাফ হয়ে পুরে-  
থাকা সুকান্তকে তাক। গলার ডাক দিয়ে  
জাগিয়ে বকল বুঁচির মা।

সকালের দিকে পরীক্ষা দুর্বল জন্মে।  
রেজেকার মত আজও চমকে মেলে ঠিক  
বালিশে কনই ভেঙে সন্ধ্যাহরের মত



স্বাধীন  
স্বাধীন

সুদূর পড়ে তা-এর কাছে চুপক দিল  
সুদূর। তিন বিংশ শতাব্দী। যোথ হয়  
পড়ার সুখী পোকারের সেই চামড়ার গুড়ো  
চোখে আঁকি। অলসভাবে বাহ্যে প্যাঁকেট  
থেকে সিগারেট বার করে ধীরে একটা  
দীর্ঘ টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল  
সুদূর। আরও মিনিট পনের এমন চলবে।  
আগাগের বাড়ীর সবাই যখন একজন-  
দুজন করে অফিসে বেরুতে আরম্ভ করবে,  
সুদূর কোলা কোলা চোখে, উসকো-  
খুসকো চলে, পাঁজামার দাঁড় সামলাতে  
সামলাতে খাঁল হাতে বাজারে বেরুবে।  
কোনও রকমে বাজার সেরে ফিরে খালিটা  
ঘরে ছুড়ে দিয়ে গিরে পড়াম করে বাথ-  
রুমের দরজা বন্ধ করবে। পাঁচ মিনিট।  
তারপরেই ফাইরে এসে হাঁক-ডাক আরম্ভ  
করবে, কইরে, মালা, তাতাতাতি তাত দে।  
অফিসের দেরি হয়ে গ্যালো।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জ্বলন্ত  
টুকরাটা ধরে কপে ছুড়ে দিয়ে সুদূর  
কলিখে মূখ খুঁড়ে পড়ে রইল কিছকল।  
তারপর অস্বাভাবিক চোখে মেঝেতে একটা  
আরশোনার চরকাখানি দেখতে লাগল।  
মোট কোন মালা প্লান সেরে উঠে এঘরে  
এল একজন। জানালায় পদাঙ্গুলো টেনে-  
টেনে ঠিক করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল  
মালা। তারপর ডেরাচটে চাম-দেওয়াল  
একবার ডাক। দাঁড়িতে নিরীকণ করে  
কোঁর মূখ কোচকাল, তোর ঘরটার কি  
অস্বাভাবিক রে ছোড়না? কোনও ভুল্লোকের  
মেয়ে এসে এই ঘরে থাকতে পারবে? কবে  
থেকে বলাই তোকে ঘরটা একবার চুকাম  
করা, আই দাগড়া দাগড়া গর্তগুলো মিস্ট্রী  
ডাকিয়ে ঠিকঠাক করা। তোর মত লোকের  
বিয়ে করাই উচিত নয়। বা নোংরা আর  
আলসে তুই না—।

এতদিনে সুদূর বিয়ের কথাবার্তা  
হচ্ছে। আজ বিকেলে মেয়ে দেখতে যাবার  
কথা। কোনও জবাব না দিয়ে উদ্‌ হয়ে শূঁরে  
সুদূর বিংশশতাব্দী চোখে আরশোনাটার  
কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মালায় বরস উনিশ  
আর সুদূর পয়ত্রিশ। সুদূর প্রথম  
ঘোঁষনে মালা নেহাই শিশু ছিল। মালায়  
অলসে সে একবার দেওয়ালে টাঙ্গান  
ছবিটার দিকে তাকাল। বাইশ-তেরি বছর

বরসে তোলা ছবি। স্বাস্থ্য আর লাভ্যে  
ভরপুর একটি উজ্জ্বল মূখ সিকিমরে  
বিছানায় শোওয়া গিরাসিটিটে নিরীকণ  
করছে। কয়েক বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে  
ওর সবচেয়ে সখ্যার দিকে কলশের একটা  
পাট-টাইম লেকচারশিপের জন্য যোরাফেরা  
করেছিল কিছদিন সুদূর। পার নি  
অক্যা। তখন ক্যাম্পাসের দেওয়ালের গারে  
বড় বড় করে লেখা একটা ছড়া বেশ মনো-  
যোগ দিয়ে পড়েছিল। কবির নামটাও  
দেওয়া ছিল, মনে নেই। কি কোন বলে  
এগুলোকে? উগেরেল—

উটে দিন, উটে দিন  
নামগুলো সব উটে দিন।  
সংখ্যাগুলো উটে দিন,  
আরশোলাকে দুপুর রোজ  
উটে দিন, উটে দিন।

সুদূর মনে মনে কবিতাটা আঙুল  
কয়েকবার। নিজেকে একটা উটে বাওয়া  
আরশোলার মতই মনে হচ্ছিল। একটানা  
চৌদ্দ-পনের বছর কেরানীগিরি, মাস্টারী,  
ক্যানভাসারী আর তেল-সাবান-দানের  
মলমের বিজ্ঞাপন লেখবার চাকরির পর আর  
কি বাকী থাকে? বাবা হঠাৎ মারা যাবার  
পরই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল। চারটি  
অবিবাহিত বোন, অসুস্থ মা। বায়ো-  
স্কোপের রীলের মত গভ পনের বছরের  
ইতিহাস সুদূর চোখের সামনে সারা-  
রা-রা করতে করতে হোলীর নাচ আরম্ভ  
করে দিল।

মালা নিম্নাঙ্কে বিছানায় পড়ে-থাকা  
সুদূর দিকে বিচিরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে  
রইল কিছকল। তারপর ফাঁসি গলায় বলল,  
তুই কিছক ঠিক চারটের মধ্যে অফিস থেকে  
চলে আসবি ছোড়না, দেরি করবি না। যেতে  
হবে সেই গিরিশ এডেনিউ। ওখান থেকে  
ফিরে এসে আমারকে আবার বেতে হবে  
আরেক জরিগার।

সুদূর এককণ্ঠে মূখ তুলে মালাকে  
একনজর দেখল। ছুর, হু-কে জিহ্বাসা  
করল, কোথায় যাব? মালা অস্বাভাবিক গলায়  
বলল, আছে এক-জরিগার। আমার কখন  
বাসন্তীর সপো বাব। সুদূর একটা প্রত্য  
ধমকে মালাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে  
গেল। কিন্তু ধমকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে  
মালাকে দেখল, তারপর নরম গলায় বলল,  
ও সব বাসন্তী-কালন্তী ছোড়না। পলীকা  
এসে গেছে। এইবার একটু পড়াশোনার  
দিকে নজর দাও। তারপর একটা সিগারেট  
ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মালা উদ্‌গত ফাঁসির মত বাড় বোঁকিয়ে  
কি একটা বলতে বাচ্ছিল। কিন্তু সুদূর  
ঠান্ডা নিশ্বাস চোখে কি দেখল সেই জানে।  
মিইয়ে গিরে গজরাতে গজরাতে পাশের ঘরে  
ঢুকে গেল। ছোড়নার উপর বতই ছুঁতাতা  
অক্সা দেশাক, এ বাড়ীতে একমাত্র  
সুদূরকেই বা একটু ভর করে মালা।

রোজকার মত আজও অফিসে পৌঁছতে  
দেরি হল সুদূর। একঘর লোকের সামনে  
কোলিও ব্যাগ হাতে ট্যাং ট্যাং করে ঢুকতে  
মাঝে মাঝে বেশ অস্বাভাবিক হয় বই কি। কিন্তু  
উপর কি? আই জিডে বাসে-ট্রামে ছোট-  
লোকের মত মার্জাট করে সুদূর কোনও  
দিন উঠতে পারবে না। নেকলন অফিসার  
বিরস মূখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে  
কোনও কথা না বলে আবার দূ পালের  
ফাইলের স্তূপের মধ্যে ডুবে গেলেন।  
সুদূর বুকলো আজ কপালে গেলো আছে।  
অচ্চ সকাল সকাল যেতে বলেছে মালা।  
পাখাটা ফুল স্পীডে খুলে দিয়ে শার্টের  
বোতাম আঁপা করে ধোঁয়া জমাটা কঁধের  
দূ পাশে সরিয়ে নিরাসক্ত স্পীডে সুদূর  
কসে রইল কিছকল নিজের সীটে। অফিসের  
বেয়ারাটা কোথায় গেছে। এক প্লাস জল  
এনে যে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যাবে—  
হাজার বার বললেও তার কানে যায় না।  
তেল তেল ঘামে সারা মূখ চটচট করছে।  
পাশের সীটের বিকাশ এতকণ ছাড় গুলে  
বলে কাজ করছিল। মূখ তুলে সুদূরকে  
দেখতে পেয়ে হাস্ত-সমস্তভাবে উঠে এসে  
চাপা গলায় বলল, এই যে তুই এসে গেছিস।  
আজ একটু বাইরে চললাম, একটু ম্যানেজ  
করে নিল। তারপর হনহন করে বোঁকিয়ে  
গেল। মূখবাহক দিয়ে ম্যানেজ করার  
পদ্ধতিটি বিকাশের অনেক দিনের। নানান  
রকম কাঁচার দালালি করে বিকাশ।  
অফিসের চাকরিটা হাতে-পাঁচ। অনেক  
রকম লোক আসে বিকাশের খোঁজে।  
প্রত্যেকের নাম-খাম জেনে রাখতে হয়।  
ওপরওয়ালা সাহেবের ঘরে ডাক পড়লে  
নিজালা মধ্যে কথা বলতে হয়। বাড়ী থেকে  
থেকে আসে নি, বোধহয় খেতে গেছে।  
এমন কি পেটটা বলাইল ভালো নেই,  
ল্যাডার্টার গেছে বোধ হয়। এমন সব। মাঝে  
মাঝে মেরোও আসে। দিবা সাজগোজ করা  
রজনীগন্ধার উটার মতো সতেজ চেহারা।  
অফিসের আর পাঁচটা মরা মাছের মত  
চাউনীওয়ালা মেয়ে নয় তারা।

একটু হাতম্ব হয়ে সুদূর জামার  
হাটা গুটিয়ে ফাইল খুলে বলল।  
ইমাজেস্পী কেস আছে কতগুলো। আজকেই  
ছাড়তে হবে। কিন্তু কখনো পড়ে ফাইলের  
প্রপোজালটা ভালো করে পড়বার আগেই  
বেয়ারা গোতুল এক গাঁদা মূখ ফাইল ঘাড়ে  
করে এসে সুদূরকে টোকিয়ে আছড়ে  
কেলল। কলম গুটিয়ে সুদূর কিম্ব  
গোতুলের দিকে তাকাল। বেয়ারা কোনও  
জুকেপ না করে পাশের টেবিলের কঁচের  
প্লাস তুলে নিয়ে টাং জল আঁকিয়ে চলে  
গেল। এবার একটা তীর খুঁপা মূখ দৃষ্টিতে  
সামনে তাকাল সুদূর। গভীর মনোযোগ  
দিয়ে কাজ করছে সেকলন অফিসার।  
সুদূর স্বাস্থ্য, মূখ ও লালিত অপহরণের  
মূলে এক অবদান কম নয়। একটা শীর্ণ  
বল-বেড়ালের মত চেহেরের এক কোণে বলে  
রাখে কঁদুতে লাগল সুদূর।



আলমশের মোকরা কোলসিঁড়ার  
রাষ্ট্রনৈতিক হতাশা, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ,  
ইরান স্ট্রাইক ইত্যাদি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা  
ততক্ষণ খিঁচিয়ে এসেছে। সবাই অল্প-  
বিস্তর কাছে মন দিয়েছে। নিজের চৌকসের  
দিকে আঁকিয়ে সীতামত চিন্তিত বোধ করল  
সুকান্ত। জরুরী পালিসি ভিত্তিরে কহিল  
সব। সুকান্ত মিনিমর গ্রেড ডাক। কাজেই  
প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। এদিকে  
মালা শাসিয়ে রেখেছে চারটের মধ্যে  
বাড়ী ফিরতে হবে। আজ পাহাী দেখতে  
যাওয়ার কথা। তাহলে সাতা সাতাই  
সুকান্তর বিরর চেষ্টা হচ্ছে। একটুকরো  
মৃত হাসি ওর চৌকির কোণে ফুটল।  
গত সাত-আট বছর ধরে বন্দু-বান্ধকের  
বিরেতে নিরমিত ছায়ায় দিয়ে দিয়ে  
নিজেকে ইয়ানীং কেনন বেন কিপতীক  
বা সদা টি বি মৃত কেউ বলে মনে হয়  
সুকান্তর। একটু অনমনস্কভাবে চিন্তা  
করল সুকান্ত।

...নিজের পাজারির সঙ্গে পারের  
কাছে লোটান চওড়া জড়িগাড় খুঁড়ি,  
কোলাপুদুরী শূঁড় তোলা চাঁট। ছিপাছিপে  
একহারা চেহারার ভারী সুন্দর মানিয়ে-  
ছিল কিন্তু। ইউনিভার্সিটির গল্পটা  
তখনও গা থেকে যায়নি। এক মাথা  
কোঁকড়া চুল, উমত নাক আর টালটাল  
চোখ। উত্তর কলকাতার বিরর বাড়ীতে  
কুমারী মেয়ে মজলে একটা চাপা কোঁড়ুল  
খেলা করছিল। বরের বিশেষ কথা। তাই  
আলাদা খাতির। একেবারে অল্পর মজলে  
টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। কালানুসার  
সংখ্যায় ফুরুরুরে হাওয়া দিচ্ছে। সনাই-  
এব করণ অথচ ভারী মিষ্টি সুর মীড়ের  
মাথায় এসে আছড়ে পড়ছে কানে।  
আলোর আলোময়-রমরম গমগম করছে  
সারা বাড়ী। অশ্রুত ভালো লাগ-  
ছিল সুকান্তর। কারণ-অকারণে সুন্দরী  
মেয়েরের সংগে মৃদু দৃষ্টি বিনিময়ের  
মাদকতা জ্বালায় করে রেখেছিল সুকান্তর  
সমস্ত অন্তরকে। দীর্ঘদিন জ্বল বাওয়া  
কোন স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা মুক্তিযুদ্ধের মত সেই  
গভীন মৃদুত্বটী সুকান্তর চোখের সামনে  
ফুটে উঠছিল একটু একটু করে।...

অফিসে আসার পর থেকেই পেটে  
একটা ছোট মোচড় অনুভব করছিল  
সুকান্ত। একবার টয়লেট-রুমে যেতেই  
হবে। প্রায় প্রতিদিনই এমন হয়। খেলা  
ফাইলের উপর পেপার ওরেট চাপা দিয়ে  
উঠতে বাজিল। এমন সময় পারের  
সেকশনের ডুপ্লেক্সমোহন এসে দাঁড়ালেন  
করকটা টাইপ করা কাগজ হাতে। এই যে  
সুকান্তবাবু, আপনি তো ইংলিশে  
অখারিটি। শেলারি গি ক্রাউডস-এর উপর  
একটা মেট করছি। হেঁ-হেঁ আপনারা  
ইনটেলেকচুয়েল লোক একটু দেখিয়ে  
নিলে সাহস পাই আর কি।

সুকান্ত কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে  
ডুপ্লেক্সমোহনকে দেখল। পরস প্রায়  
পঞ্চাশের কাকাকিছা দিক টুসটুসে গৌর-

বর্ণ চেহারা। নিখুঁতভাবে কমান দাড়ি-  
গোঁক। পরনে কলী কাঁচ-খুঁড়ির উপর  
গামী আঙ্গির পাজাখি। টালানী করেন  
ডবলেক। মেয়েদের পড়ান। অল্পস্বল্পসী  
বদলী ঘরের মেয়ে সব। কলসম্মিলকালে  
নারী রক্তবলা হয়... ডুপ্লেক্সবাবুকে দেখে  
কথাটার মানে সুকান্ত বেন কিছুটা বুঝতে  
পারল। সুকান্তর দৃষ্টি ধীরে ধীরে  
অস্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল চেয়ারে বসে।

...এই সুকান্ত, ভোমার বাঁদিকে। হ্যাঁ,  
হ্যাঁ, হাতটা আরেকটু বাড়ো। আঃ, এ তো  
পাতালপুরীর অক্ষলে। ঈশ, ছুঁম দেখতে  
পাছ না? অর্ধেক গলার পাশের কাড়ীর  
চৌল বছরের মিঠু আতাফল গাছটার ঠিক  
নীচে দাঁড়িয়ে সুকান্তকে পাকা আতাফল  
দোঁধরে দিচ্ছিল।

সুকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বিস্ময়ভাবে  
এক হাতে গাছের ডাল চেপে ধরে আরেক  
হাতে মিঠুর দেখান পাকা আতা খুঁজছে।  
হিস না পেরে আরেকটা ডাল বেয়ে সুকান্ত  
টলতল করতে করতে উপরে উঠল। নীচে  
থেকে মিঠু তাকায় গলার সাবধান করে  
দিল, এই সুকান্ত আর উঠো না পড়ে যাবে।  
ঠিক তখনি মড়-মড় করে ডাল ভেঙ্গে  
পড়ে গেল সুকান্ত নীচে সুকান্ত বন-  
তুলসীর বন কোপের উপর। মিঠুকে সুন্দর  
নিলে। ভাগ্যিস বেশী উঁচু থেকে পড়ে নি।  
আর স্ত্রী-এর গলীর মত খোপটা ছিল।

খোল-সতের বছর বছরের সুকান্তর  
পরীক্ষা মিঠুর নরম তুলসীয়ে দেহের চিল।  
সুকান্তর কন্ঠেই চোপে বসেছে মিঠুর  
উজ্জ্বল হৃদয়ের তপস। হিন্দুকালি কিস্তির  
মতো করেক মৃদুত্ব নিশ্চয়ই করত। পর  
আকাঙ্ক্ষা গলার মিঠু কলার কাছে পাল, এই  
হাতো, কেউ এসে পড়বে। সান্ধর বির  
পেরে সুকান্ত হৃদয় করে উঠে বসে  
তাকাল চারিদিকে। নবাবুল পছন্দে গিলিস  
দুপুর। কেউ নেই কোথাও। মিঠু ভেদেই  
অসহায়ভাবে হাঁট, ভেঙে কোপের উপর  
শোওর। দুবটো এড়ানোর উত্তরনা তার  
মামে ওর সারা মৃদু রক্ত। রেপারী হল  
উড়ে এসে কপালের সঙ্গে সোটে আসে।  
অশ্রুত দৃষ্টিতে মিঠুর শোওর। কোঁড়  
দিকে আঁকিয়ে রইল সুকান্ত কিছুক্ষণ  
হাঁটর উপর থেকে প্রকট করে থেকে।  
পছন্দ মতো মাথা সুকান্তর আর কখন  
অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক হয়ে আছে। চোখ  
সরিয়ে নিয়ে সুকান্ত অশ্রুত আসে উঠে  
দাঁড়াল। কান দূরো কাঁকা করছে।... সারথ  
পরীয়ে বেন বিশাল আয়ত হয়ে গেছে  
তার।

রক্ত কেড়েছে ঠিকঠাক করে মিঠু  
উঠে দাঁড়াল। তুলসীয়ে গোছা করে পিঠি  
পাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে চাপা নরম  
হলল, ছুঁম একটা হিমারাম। তারপর লোঁচ  
গিরে কাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।...

## বিক্রম রচনা সংগ্রহ

বাংলায় বাংলা রচনা দুই খণ্ডে ২৪০০ পৃষ্ঠা। মূল্য—১৮ টাকা।  
গ্রাহক তালিকাভুক্তির সময় ৬ টাকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সমস্ত  
কালে দুই কিস্তিতে দ্বিতীয় ১২ টাকা দিতে হবে।

নিম্নলিখিত স্কেন্সমুহে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হওয়া যাবে :

কলিকাতা—সাক্ষরতা প্রকাশন, ৩৭এ কলকাতা রো।

মেট ব্যাঙ্ক অব হারদারাবাদ, ৩২এ, ব্রাহ্মণ রোড, কলিকাতা—১১  
১৭০, শরৎ বন্দ রোড, কলিকাতা—১১।

মহাবিল্লী—মেট ব্যাঙ্ক অব হারদারাবাদ, সুবিক্রম বিল্ডিং,  
১১, কম্পুরবা গান্ধী মার্গ, মহাবিল্লী—১।

পাটনা—বিহার বাঙালী সমিতি, কলমুদ্রা, পাটনা—৩।

## বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ

বি-নিরিরের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকার রচিত এক অসাধারণ দলিল

## যুদ্ধ ও স্বাধীনতা

বিশিষ্ট সাংবাদিক কৃতিত্বস ওয়া এই গ্রন্থটি লিখারের উন্নী প্রথম  
অভিজ্ঞতার আলোকে। আনন্দনিক পৃষ্ঠা সংখ্যা—৫০০। মূল্য—১০  
টাকা। সাক্ষরতা প্রকাশন-এ ২ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হয়ে যের  
মূল্য—৫ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

আপুতোষ ভবন, কলিকাতা কলিকাতা

দুপুরে টিকিনের সমর ক্যাম্পটেন কুস কখা হুছিল। অকিসের সুকান্ত; বিকাশ, তাঁকলাদারবাবু আর মিঃ থিংড়া। জরুরি সাপাই-এর কপাকটার মধ্যবর্তী মিঃ থিংড়া। সুকান্তদের অধ্যক্ষকারী অকিস ওদের একচেটিয়া বিজনেস। অকিস স্টোকেব কাছ থেকে কি করে কাজ আদার করতে হয় মিঃ থিংড়া জানে। সুন্দর বাংলা কল। বিকাশ আর চাকলাদারবাবু অনেক দিন আগেই ওর অনুগত হয়ে পড়েছে। লুকাতকে প্রায়ই অনুযোগ করে মিঃ থিংড়া, মিঃ সান্যাল, শরীরের দিকে একদম নজর দিচ্ছেন না। ইয়ম্যান, এটা ভালো নয়। আমার সঙ্গে কিছুদিন আসুন, লাইফ কয়েক বলে দেখবেন। রোজকার মত আকর্ষণ কখাটা কল থিংড়া।

বিকাশ ক্যাম্পটেনে গলার হেসে বলল, সুকান্ত লাইফ দেখবে? তাহলেই হয়েছে। ওটা এক পেগ স্মিগস-এই কাত। তার উপর আরও কিছু হট স্টাক দিলে সম্মার অঙ্গ বাধার হটবে। সবাই হা-হা করে হেসে উঠল বিকাশের কলার ভঙ্গী দেখে।

এর আগে দু-একবার গেছে সুকান্ত ওদের সঙ্গে। লেড দেওয়া নীলন আলোর আবছা অন্ধকারে নরম গদীমোড়া চেয়ারে গম্বীরে বসে ঠান্ডা বীজের চুমুক দিতে ভুলেই যোগে। থিংড়ার চেনা মেয়েও দু-এক জন আসে। দিবা মাজালা সপ্তাহীভ চেয়ার। বেশ বিনীতভাবে কাঁধে হাত রেখে গল্প করে। বিকাশ শু-শু হেসে। দিবা উশুল করে নেয়। সুকান্তর প্রথম দিকে আগ্রহ ছিল। আজকাল মিইয়ে গেছে। আসলে মনটা ওর পেটে সহ্য হয় না। তবুও কুলা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন এগিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কালোর উপর সুন্দর মন চোহারা। ওদের আলোপের সুবিধের জন্য পাশের কাঁকা কেবিনে জোর-জোর ঢুকিয়ে দিয়েছিল বিকাশ। কেবিন মানে একটা ছোট ঘর। খাট-পালঙ্ক আরনা সবই আছে। কুঁজোতে খাবার জল পর্যন্ত।

মিঃ থিংড়া অমায়িকভাবে উদার গলার বলল, আজকেই চলুন না সম্মার? আমার নতুন বাম্ববী মীনা জহুরীর সঙ্গে আলোপ করিয়ে দেব। সী নোক হাট টু এনটার-টেইন। সুকান্তকে থিংড়ার দরকার। পাবলি-সিটি বাজেট ওর হাতে।

সুকান্ত কান্ন উল্টে ঘাড় দেখল। সোয়া তিনটে বাজে। কিছুকণ উপস্থাপ করে তারপর উঠে দাঁড়াল, 'আজ রাপ করতে হবে মিঃ থিংড়া, বাড়ীতে একটা খুব জরুরী কাজ আছে চাকটের সমর।'

ওদের সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সুকান্ত বাস্তব-সম্ভবভাবে ঠান্ডাকার উঠে গেল। সেকশন জীবসুরকে বলে টেবিল গুছিয়ে রেখে কোলিও ব্যাগ বগলে চেপে বেরিয়ে পড়তে-পড়তে সাড়ে তিনটে বেজে গেল।

রোজটা ভাঙাটে হয়ে এলেও তেজ কমে নি। রাস্তার বাসস্টোপে লোকগুলো নির্ধিকার শাস্তভাবে এই গলগলে সোদের তাপে দাঁড়িয়ে আছে খাঁচর বাঁধা গৃহপালিত অশ্বার মত। টোপাড়া তামাটে মূখ সব।

সুকান্তর হঠাৎ জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ল। অল্টাইট, বেল-সেন কিংবা লুবিংকার খেটো। সার বেধে দাঁড় করান মৃত্যুশয্যাবাহী ইহুদী নারী-পুরুষ।...ডারের অফ অ্যানি ক্রাক। এক-একটা ভাঙা নড়বড়ে বাস ঘড়ায় ঘড়ায় করতে করতে এসে কাঁচ করে থামছে কি থামছে না, লোকগুলো সব হুমড়ী খেয়ে পড়ছে গেটের উপর। দু-চারজন বলবান তেলে-গাড়ির উঠতে পারল। বাকী সবাই ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। আর অমানি জিলেলের কালো ধোঁয়ার কটু গন্ধ ছেড়ে কসটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে বাছে। নাঃ কোনও জামা নেই! একটা নিম্নবাস ছেড়ে কোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে ধরে সুকান্ত এক পাশে সরে দাঁড়াল।

সুকান্তর কটু ইন্ট্রি বলছিল, এই ভিড় ছেড়ে একটু কাঁকান সরে দাঁড়ালে একটা সুরাহা হতে পারে। হলও তাই। হুল করে একটা ট্যাকসী এসে দাঁড়াল। ভাড়া হুকিয়ে আরোহী নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত টপ করে উঠে বলল ট্যাকসীতে। প্রশান্ত গলার বলল, চলুন সাউথের দিকে। তার-পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সীটে গা এলিয়ে বসল। মনে আর ট্যাকসীতে পরসা ওড়াতে সুকান্তর ভারী মায়ালাগে। কিন্তু এই অভিজাতাটুকু না থাকলে বিয়ে-খান কথা কেন চিন্তা করা যায় না।

ট্যাকসীতে বসে অনমনস্ক হয়ে পড়-ছিল সুকান্ত। কেমন দেখতে-শুনতে মেয়েটা কে জানে! ছবিতে তো বেশ ভালই লেগেছে। পুরুর সমুদ্রের ধারে তোলা। হাওয়ার আঁচ উড়ছে, লীলায়িত ভঙ্গীতে দাঁড়ান। বি-এ, বি-টি স্কুল টিচার। এব বেশী আর কি আশা করে সুকান্ত!... আলা-ভরসা!... ঠান্ডা ফেনায়িত বাঁহার প্রথম চুমুক দেবার মত কোঁচুকাটা টোঁটের কোণে আর জিভের ডগায় অনুভব করল সুকান্ত। রেস-কলসের ধার দিয়ে ট্যাকসীটা ছুটে চলছিল। বেশ মিল আছে পুবোনা অনুভূতিটার সঙ্গে। যাত্রাজ মেলের শলীপার কামরায় ওরা এগারজন। ছিট মেয়ে, পাঁচটি ছেল। ইউনিভার্সিটি থেকে স্টাডি-টুয়ে বেরিয়েছিল। অনেক রাত তখন। ঘুম আসছিল না। জানালার মাথা রেখে একটাব পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল সুকান্ত। হু-হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধপ্রদেশের রুক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। সুকান্ত বুকতে পারছিল একটু দূরে আধা-অন্ধকারে শোওয়া নন্দিতাও ঘুমোয় নি। নিউম্যাটিক বাগলটার কোণে মাথা রেখে অপলক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে আছে। ভরসা পার নি তবু শ্যামা...স্টোক-নন্ডা স্তন্যভার নন্দিতা বোস। বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। পরসা আছে ওদের। সুকান্তর বাড়ীর অবস্থা জানবার পর কিছু দিন আকাল-কিকাল করেছে। তারপর ছেড়ে চল পাহা। ভালো বিয়ে হয়েছে কোন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এখন সুখে স্বয়ং-সংসার করছে।

অনেককণ এক নাগাড়ে বাঁ হাতটা সীটের উপর তুলে রাখার জন্য কাঁধটা টন-

টন করছিল। ট্যাকসী একটা কাকুদী দিয়ে বাড়ীর রাস্তায় ঢুকতে সত্যিকৃতভাবে সুকান্ত সেজা হয়ে বসল। কাঁটার কাঁটার চারটে। এত নিখুঁত সমরজান দেখে মালাটা আবার কি ভাববে কে জানে?

ট্যাকসী দাঁড় করিয়ে রেখে বাস্তব-সম্ভব-ভাবে বাড়ী ঢুকল সুকান্ত। মালা জমরভাবে আরনার সামনে দাঁড়িয়ে চুল কাঁচছে। শূদ্রী গলার সুকান্ত ভাড়া মিল, নে-সে জলদি কর। ট্যাকসী দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ঘরে ঢুকে থেমো শাট-প্যান্ট খুলে কেলে আ-ডারওয়ার পল্লী অবস্থার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুকণ চিন্তা করল। সন্ধ্যা প্যান্টের উপর হালকা স্টাইপ সেওয়া নীল বুল শাট আর হরিণের চামড়ার ল্যান্ডালটা পরে গেলে কেমন হয়? বেশ কম বল মনে হবে। দাঁড় করান আরনার মূখ দেখল সুকান্ত একবার। জুলফির কাছে অনেক চুলপেকে উঠেছে। নাঃ বড় বেশী চ্যাংড়া আর রোগা দেখাবে। খাঁতি-পাজাবি? উহু-বড় কেরানী কেরানী দেখায়। বিস্ক নিতে ভরসা পেল না সুকান্ত। তাড়াডাফি একটা ব্যবহৃত নেভীর টেরিলিন প্যান্টের উপর ধোপদুরন্ত ফুলপার্ট চাপিয়ে পকেটে হিন-কাগ গুঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেটটা সামান্য মোচড় দিচ্ছে। অনেক বার বাম্বুমে যেতে পারলে ভালো হত। ওদিকে ট্যাকসী-ওরাল বাইরে অধৈর্য-হন দিচ্ছে।

বাড়ী চিনে ওরা পৌঁছল প্রায় পাঁচটা নাগাদ। মেয়ের দ্বিধার বাড়ী। কোনও রকম সজীবতার লক্ষণ চোখে পড়ল না। খবরের কগজের বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের সম্পর্কের ব্যাপার প্রথমটা এই রকমই হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ী, কিন্তু খুব সাজান-গোছান। হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করে দ্বিধ ঘরে বসালেন। প্রথম দর্শনে সুকান্তকে এখনও মোটামুটি ভালই দেখায়। ধীরে ধীরে অবকয়ের চিহ্নগুলি সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই বয়সেই রোগের কাছে জুলফি বরাবর অনেক চুল পেকে গেছে। গলের হনুর হাড় দুটো অস্বাভাবিক রকমের উঁচু হয়ে উঠেছে। কথা বলার সময় ঢোললে সার্টের কলার ভিগরে গলার অ্যাক্সেস অ্যাপলটো বিপ্রীভাবে ওঠানমা করে। বেশ ক্ষোভা যায়, এই ধোপদুরন্ত জামাকাপড়ের আড়ালে একটি রস নিড়ে বার করে নেওয়া শীপ কোলকাজো মানবে সাপ্তাহে অপেক্ষা করছে কোনও সজীবনী স্পর্শের জন্য। পারীর দ্বিধ সোজাসুজিই সুকান্তকে দেখলেন। মূখের উজ্জল হাসিটা মিলিয়ে গেছে।

একটু পরেই ঘরের পদা সরিয়ে পাণ্ডী সহজ ও সপ্রতিভ ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকল এবং হাত তুলে নমস্কার করে স্মিত মুখে চেয়ারে বসল। নব বলল, প্রীমতী বানাজি, সুকান্তর বকের জিভের হু-পিপডটা একবার খুক করে উঠেই লাপ্যদাপি আরম্ভ করে দিল। স্বীতিভূত গৌরবগ, সুন্দরী ও ল্যাংখাবতী একটি হাস্যময়ল মেয়ে। সাতাশ আঠাশ বছর করে। অচ কোন জড়তা ও মালিন্যের চিহ্ন নেই।



সুকাশ্ত... কলকাতার খেলার মাঠের দাঁড়িয়ে  
সুকাশ্ত নাকি হয়ে এসেছে।

প্রাথমিক আলোচনা পরিচয়ের পর শেষ  
হবার পর সামান্য জল-খাবার এল। খ্রীমতী  
ব্যানার্জি নিজেই উঠে গেল খাবার আনতে।  
সুকাশ্ত মনুষ্য ভাষে দেখল একটি শত্রু  
রাজহসীরা, দীর্ঘাঙ্গিত গতিভঙ্গী। অনেক  
দিন পর আবার উত্তর কলকাতার সেই বিয়ে  
বাড়ীর সুনীল-এর করুণ মুখটি স্মৃতি সুর  
সুকাশ্তের কানের কাছে বাজতে লাগল।

...পাকিস্তানীদের সম্মান্যতা মনে মনে  
কল্পনা করল সুকাশ্ত। কুর ফুরে হাওয়া  
দিয়েছে। পাশাপাশি হাটতে হাটতে ওর  
দেহের রঙ-এর সিলেক্টর শাড়ী প্রায়ই খসে  
পড়ছে উন্নত সুডোল বস্ত্রের উপর থেকে।  
প্যাম্প-করা চুল উড়ে এসে পড়ছে কপালে  
গার বার। বিব্রত অথচ খুশীভাবে ও  
হাকছে চারিদিক। সামনের বড় রেস্টুরেন্টে  
চক্রে ওরা। একটু এগিয়েই দেখা হবে  
ইন্টারন্যাশনাল আডভারটাইজিং-এর কুশল  
মুখের সঙ্গে। আমেরিকান টং-এ চক্কদার  
হংকো বলে ও লেখে। মাইনে পার নাকি  
দ. হাজারের উপর। চেহারাটা অবশ্য  
চোখে পড়বার মত। সুকাশ্তকে বয়সবই  
কুশল-তাচ্ছিল্য করে এসেছে কুশল গুপ্ত।  
এবার কিছু থমকে দাঁড়িয়ে, হায়োয়া মিঃ  
সান্যাল, গুড ইভনিং, বলে হাসিমুখে  
দাঁড়াল। সুকাশ্তও সহাস্য মুখে, শত্রু সম্মান্য  
জানিয়ে দাঁড়াল। তারপর একটু ইতস্ততঃ  
করে বলল, ওয়েল মিঃ গুপ্ত, মিট মাই  
এবাইফ—। গুপ্ত স্মিত মুখে ওর দিকে  
দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করলে। কিন্তু  
বকের ভিতরটা হিংসার জ্বলে যাবে।  
গুপ্তের স্ত্রীকে সুকাশ্ত দেখেছে আগে।  
ব্রহ্মলোকের মেয়ে, কিন্তু লম্বা, সিঁড়িগো  
আনন্দিক চেহারা। ঠিক সময় বয়ে  
সুকাশ্ত, ওকে সী ইউ, বলে এগিয়ে যাবে  
এব কাঁধে হাত রেখে। সুকাশ্ত জানে  
গুপ্ত পিছন ফিরে তাকাবে। সুকাশ্ত  
দাঁড়িয়ে ভরে সিগারেটের শেখাংশ রাস্তার  
দুড়ে দিয়ে ওর কোমরে হাত রেখে রেস্ট-  
বেণ্টে ভিতরে ঢুকে দায়োরানের সেল্যাম  
হুড়োতে কুড়োতে...

কথাটা উঠল খাওয়া নিয়ে। মিষ্টি  
বেশী খেতে পারে না সুকাশ্ত। কয়েকটা  
পেটের এনামেল উঠে গেছে। মিষ্টি খেলেই  
ধবে। দাঁড়িয়ে মুখভাব এবার বেশ গম্ভীর  
হল। একটু প্রথম দৃষ্টিতে সুকাশ্তকে  
শেখ হাফা গলাতেই বললেন, খেতে  
পারেন না কেন? অবল আছে নাকি?  
সুকাশ্ত চোখ তুলে দেখল খ্রীমতী ব্যানার্জি  
কেঁচের তেলের বসে আছে—নিবাত নিষ্কম্প  
বীজভঙ্গীর ভেলাস। হুঁহু হেসে কথাটা  
এড়িয়ে যাচ্ছিল সুকাশ্ত। অল্প-বিস্তর  
অল্প অ্যাম্বিকাসিস নেই, কটা তার  
বসন্ত বাগানালী ছেলে আছে কলকাতার।  
সেই আবার কৌতুহলী অথচ দৃঢ় গলায়  
জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেতে পারেন না  
কেন, অবল আছে নাকি?

কি কথাই দেবে সুকাশ্ত? কলকাতার  
ভেলাস উল্লেখ্যভাবে অপেক্ষা করছে উত্তর  
লেনবার জন্য। নিজেকে খানায় ধরে নিয়ে  
খাসা একটা ছিটকে চোর বা পকেটভারের  
মত মনে হতে লাগল সুকাশ্তের। ওদের  
মত দাঁড়িয়ে পা দুটো কড়িয়ে ধরে কবলে  
নাকি, মাইরী কলছি দাঁদি, অম্বল-কম্বল  
কিছু নেই আমার। বেরিমাশ মীল করিয়ে  
ছিলাম, আলসার-কালসার কিছু পারিনি  
ডাকার। সেই সকাল নটার বাড়ী থেকে  
কোয়েই, ফিরি রাত দশটার পর। এই  
রেস্টুরেন্ট-ফেস্ট-এ খাই। মাঝে-মাঝে চোরা  
ডেকুর কি বুকগলা জ্বালা করে। আ—  
আমাকে আসলে মেরে দিয়েছে অ্যামি—এই  
পর্যন্ত মনে মনে বলছি তেরমিনভাবে নিঃশব্দে  
জিত কটল সুকাশ্ত; এর উপর যদি শোনে  
আরও কদর্য পেটের রোগ আছে—।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুকাশ্ত ইনটে-  
লেক্টরাল হবার চেষ্টা করল। পালিশ করা  
হাসির সঙ্গে একটু চিবিতে চিবিতে বলল  
দেখুন, ম্যান ইজ মরটাল। হু নোজ ফর  
হুয় দি বেল টোলস্। অসুখ বা রোগ নেই  
এটা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে?  
এই তো দেখুন না কয়েকদিন আগেই  
আমার পরিচিত এক ডল্লোক মারা গেলেন  
হঠাৎ। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান মিলিট চেহারা।  
পরে শোনা গেল লীডার ক্যান্সার হয়ে  
ছিল। এই পর্যন্ত বলে সুকাশ্ত একটু  
হুঁ-হুঁ করে হাসল। সম্মানে কদম পুষ্টীর  
দাঁড়ি যেন একটু চমকে উঠলেন। কলকাতার  
সিগারেট খার সুকাশ্ত, কলকাতা করে  
নাওয়া দাঁড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

এর পর আলোপটা আর বিশেষ জমল  
না। দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর  
সুকাশ্ত সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল, আজ চল।  
মালা বসিধমতী। ব্যাপারটা আগেই জট  
করেছিল। সেও নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।  
দরকার কাছে খ্রীমতী ব্যানার্জি হাত তুলে  
নমস্কার করল। ঠান্ডা নিরাসক্ত চাউনি।  
সুকাশ্তের নিরাশ্রয় দৃষ্টি মুখে হতে গিয়ে  
বিষণ হল। বিউটি অফ মেডুসা!

বাইরে জোরে এক পশলা বণ্টি হয়ে  
গেছে। তিরতির বণ্টি পড়ছে এখনও।  
সামনের মোতলা বাড়ীটার ছাদে তারের  
উপর মেলা একটা ভেলা মস্তান শাড়ীর  
উপর বসে একটা রুদন রেওয়া ওটা কাক  
মুখ খসছে আর থেকে থেকে কা-কা করে  
উঠছে। সুকাশ্ত একদৃষ্টে কাকটাকে  
কিছুক্ষণ দেখল। তারপর একটা ছোট  
নিঃশব্দ ফেলে পাশে দাঁড়ান মালাকে বলল,  
চল এ সামনে বাস-স্টপ।

কলকাতা শ্রীট ধরে, টউনিভার্সিটি  
পেরিয়ে মোড়িকাল কলকাতার কাছাকাছি  
বাসটা আলটেই সুকাশ্ত হঠাৎ উঠে  
দাঁড়াল। তারপর ভিড় ট্রেন, টাল-মাটাল  
করতে করতে এগিয়ে গিয়ে লেভিস্ সীটে  
বসা মালা হাতে টিকিটটা গুপ্ত দিয়ে

বলল, হুই রাউন্ড ট্রেন কা। আমার একটা  
কাজ আছে এগিয়ে। কলকাতা রাস্তা হয়ে।  
তারপর কলকাতা নিয়ে কলকাতা রাস্তা হয়ে  
করে লেনে ভিক্টর জোকে নিয়ে গেল।

সিগারেট ধরিয়ে বড় পল্লবপে এগিয়ে  
হেতে লাগল সুকাশ্ত। একদৃষ্টে কলকাতা  
রাস্তা টিলাগুলো ডালগোল পাকিয়ে গিয়ে  
পাক খাম্বল নরম মাটি কুড়ে ওঠা এক ভিটি  
কেঁচোর মত। মাখাটা বিলম্বল সখ আর  
হাফা লাগছে এখন। কোড়ের পানের  
গোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল  
সুকাশ্ত। তারপর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ  
লোকের মতো আর-বোঁতা চোখে চারদিক  
এক নজর দেখে নিয়ে বাঁ দিকের মার্কা-মারা  
গলিতে ঢুকে গেল।

তখন অনেক রাত। টামের খুঁ মক্কা,  
ডবল-ডেকার বাসের গজন জটিলিত হয়ে  
আসতে আসতে থেমে গেছে। মাঝে মাঝে  
একটা ট্যাক্সী হুঁহু করে কড়ের বোঁতা  
বেরিয়ে কছে। একটা খালি রিক্সা ঠুং  
ঠুং করে দাঁড়ি-বাক্সে বাজাতে ঠকাগু  
উল্টা দল-ভুল খানা-খোন্দলের উপর  
দিয়ে এগিয়ে চলছে মাতালের মত।

কিন্তু মক্কা তীর কাঁকাল উত্তরনাটা  
কেটে গেছে। একটা সুখের অবস্থার  
প্রবেশ জড়িয়ে আছে সবাপে। স্থলিত  
পরে হুঁহু করে কছে। রাস্তা পার হল  
সুকাশ্ত। কলকাতা হাফা লাগল বড় গেটটা  
তখনও খোলা। কিছু বিকলাঙ্গ ভিখারী  
আশ্রয় নিয়েছে ভিতরের শেড়টার নিচে।  
ভিতরে ঢুকে প্রশান্ত মনে সুকাশ্ত দেখতে  
লাগল ইতস্ততঃ শোওয়া অম্ব-আতুর  
মানুষকে। এ পাশে একটা বৃক্ষ কুণ্ড বোগী  
ঘায়ের উপর থেকে বাসন্তের সিরিয়ে হাটি,  
তুলে বসে হাত দিয়ে জল-ভরনে মাছ  
তাড়াচ্ছে আর হাক হাক করে খু-খু  
ছেটোছে চারদিক। আরেক পাশে, একটা  
পাগলী টিলের ভাঙ্গা থালাটা রাখায় গুপ্ত  
শোবার চেঁচটা করছে আর থালাটা বার বার  
পিছলে সরে বাছে দেখে আউ-অউ করে  
মুখ দিয়ে একটা বিজাতীয় শব্দ করে উঠছে।  
নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গিয়ে ওদের মাঝখানে  
একটু কাকা জায়গা বেছে নিয়ে সুকাশ্ত  
টান টান হয়ে শুরে পড়ল।

কপালের উপর হাত রেখে আধো-ঘুম  
আধো-জাগরণে আজম অবস্থায় চিন্তা  
করতে চেষ্টা করছিল সুকাশ্ত। দেহের  
অস্তিত্বের অনুভূতিটা ঘুমের অতল  
সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে আবার হেসে  
উঠছে হাফা শোবার মত। দিগন্ত বিষাবী  
সমুদ্র জল-কল্লোলের অশ্রুতে গজনে  
কানের কাছে আছড়ে পড়ছে বার বার।  
সুকাশ্তের ইচ্ছা হল খেন সে কুবে মরে বসে  
সেই অতলসমুদ্রে। মুহূর্তের জটিল-  
বন্দনা। তারপরও ওর নিঃশব্দ মুখ  
রোদ্দ-

করোজুল বিশাল জল-সাঁপের ডল টেই-  
এক ডালে তালি মাটিতে মাটিতে বৃগ-  
কুণ্ডলার ধরে ভেলে বৈড়কে। সামুদ্রিক  
পাখীগুলি ওর চোখ দুটো ঠুকরে ঠুকরে  
ধরে। সর্পের তীর ডাল বৃক-পিঠ  
পেঁয়জিতে থাকবে। মাছগুলো অস্ত-নালীর  
অংশ নিয়ে মহা ভোজের উল্লাসে মেতে  
উঠবে। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা নিচে  
ক'কিমে টপ্ করে স্ফাক্ত ডুবে যাবে নীল  
সমুদ্রের গভীর তল-দেশের বালুকাস্তরীণ

বৃকে জেগে-শাকা পাহাড় - পর্বত - কন্দরে  
শ্যাওলা আর অজস্র প্রাগৈতিহাসিক জলজ  
উদ্ভিদের মধ্যে। বরফের মতো ঠান্ডা নীল  
জলজোত টেনে নিয়ে যাবে ওর দেহ এক  
প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। সেই লোনা-  
জলে তার দেহ থেকে মাংসের তন্তুগুলো  
করে বেতে বেতে নরম রৌণ্ডার মত আস্তে  
আস্তে খসে পড়ে যাবে নিচে। স্ফাক্ততার  
মেরুদণ্ড, করোটি, পস্কা অনিগ্রান্ত জল-  
জোতে মেজে যবে ঝক্ ঝক্ হয়ে উঠবে।

তারপর এক সময় টেই-এর বাক্যকান্ড একটি  
শ্বেত পল্ল কক্ষাল ভেসে উঠে কোনও  
বালুকাস্তরীণ সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়বে  
মসৃণ দেহ পাংখ বা কিন্নকের মত। তারপর  
হয়তো কোনও বিমনা পৃথচারণীর পাকের  
চাপে স্ফাক্ত সান্যালের জীর্ণ কক্ষাল  
গুঁড়ে হয়ে শেষ পর্বত বালিতে রেণু রেণু  
হয়ে মিশে যাবে। এমনি এক বিকল-মধুর  
অনুভূতির আশ্রয়ে নিজেকে জড়তে  
জড়তে স্ফাক্ত এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

## ডিম বিক্রী হয় ডজন হিসেবে..

হ্যাঁ আর আপনিও ডিম কেনেন ঐ গোনা-  
ভরতির হিসেবে! কিন্তু ডিম ছাড়াও  
দৈনন্দিন আরও অনেক জিনিস তো সংসারে  
প্রয়োজন হয়।

যেমন ধরুন আপনি যোজ দুধ  
কেনেন লিটার হিসেবে; মাছ-মাংস,  
কলমূল, তরী ওরকারী বা চাল ভাল  
কেনেন কিলোগ্রাম হিসেবে;  
জামার কাপড়,  
খুতী-শাড়ী কেনেন  
মিটার  
হিসেবে...

মাপ ও ওজনের এক মেট্রিক  
প্রণালীর প্রচলন হওয়ার  
বাজার করার কাজ অনেক সহজ  
ও সরল হয়ে গেছে।  
জিরিষ কিনে তার দাম কষতে  
আর মাথা ঝামাতে হয় না।  
একথা বলা হয় তো  
বাছল্য হবে না যে এই আক্রার  
বাজারেও মেট্রিক হিসেব  
মেনে চললে দাম দিবে  
জিরিষ কিনে ঠকতে  
হয় না।

মেট্রিক মাপ ও ওজনে কেনাবেচা করুন

# চল্লিশের দোরগোড়ায় এসে ॥

কারদুল হক

কিশোর কালে

এক আশ্চর্য খেলা

আমার মাথায় বড়ো বেশি খেলা করতো:

সারা দুপুর বিকেল এমনকি সন্ধ্যা

আমি টো টো করে খুঁজছি লহর

বন্দরের নিরে বন্দ খুঁজে চলছি;

আমাদের টেঁ হুজোড়ে

দারা শহরটো

আশ্চর্য উজ্জ্বল রোদ হয়ে বেত শীতের বিকেলে।

খুঁশির ধারায় স্নান সেয়ে

আমরা সকলে পবিত্র দেশিশদু হয়ে যেতাম।

আজ চল্লিশের কাছাকাছি এসে দেখছি

কিছু কিছু অশ্রুত খেলা

এখনো মাথায় বাসা বাঁধে;

(হয়তো পুরনো সেই অভ্যাসের জের)

শব্দে পর শব্দ সাজিয়ে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা

নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন,—

এইসবের জন্য

শব্দ শব্দই এখন তার পিছনে আমাকে খুঁজে বেড়ানোর

অবাধ লাইসেন্স দিয়ে বসে আছে।

জানি না কতটা শব্দ সচেতন হতে পেরেছি।

ভিতরের মানুষকে খুঁজে নিতে

আমার নিজের ভিতরের মানুষকে খুঁজে পেতে

অনেক অনেক সময়ের প্রয়োজন

মন হচ্ছে, মানুষের ভিতরে মানুষ

এবং যথার্থ সব শব্দ

পেতে হলে

আমাকে কিশোর কালে ফিরে যেতে হবে

ফিরে পেতে হবে

সেই উন্মাদ দিনগুলোকে

এবং এই চল্লিশের পর আর যতদিন বাঁচবো

বন্দ এবং মানুষ খুঁজে খুঁজে

অবিরাম পারস্পর্যে আমাকে কেবল কান্ড হতে হবে,

আমার সময় একনিষ্ঠ সেবকের মতন একা

ঠিক ঠিক শব্দ বাছাইয়ের কাজে ॥

# জিনটি কবিতা

জাই হোক

তোমাকে যুঁকে নিয়ে আশ্রয় পাও হয়ে এলাম;

এখন যুঁকে উঠ কি?

মতো কি আগুনের চেরেও শীতল?

তবে সেই শীতলতা এসেই আমাকে লীলা দিক সাঁজবে

কি জাই?

আমার পরসেবকের জাই না

কিন্তু

তোমার দিগে কি আদায় সব জাইবা পূরণ হবে?

তবে কেন তোমার চোখের পাঁকে পড়ে আমি

জল ফেরি করে কিয়দ?

নিজ

মন কখনও তেরী হয়?

কেন কবর তবু মর্তি গড়তে পারবে?

কাদার হাতি পরা পারের বস্ত্রপার তুমি

আঁখির উন্মাদ

তারই প্রকাশ্য নিঃস্বাস এই সন্ধ্যা!

# নিজ'নতা ॥

অমল রাহা

পুরনো কবরের হাড়গোড়ে পা রেখে

উঠে এসেছে একউঠান নিজ'নতা—

নিজ'নতা কি শব্দ?

আমি: জীবন নিজ'নতার ভূগর্ভে আজকাল শব্দগোড়ায়

লাটাই-হেঁচকা মর্দ

সেখাজির মতো প্রাত্যহিক বশবৎ অভ্যাসে

সেঁকে খেঁকেও যেতে আঁকি তেমন মনে হুঁ না।

আমার, জালাল'র কাছে কামরুল গাছে কতদূর

শিশির পড়নের শব্দ হুঁ—

নিজ'নতা: কি জামর অমল শব্দে থেকে উঠে পারে?

আমার পিতা, পিতামহরা ওই সব শব্দে স্মৃটিকে

প্রতিমা গড়েছিলেন একদিন ইন্সপিরেশন, মানবীর এবং

বিখ্যাত হয়েছিলেন মানবসমাজে;

আমার প্রতিভা ততদূর না হলেও ইদানীং

ওই সব শব্দ হাতে তুলে নিয়েছি

কামরুল গাছের শিশিরের নিজ'নতার থেকে

কিন্তু কোন ইন্সপিরেশন প্রতিমা গড়ে পারিনি মানবীর না

বরং ওই সব শব্দকে নিয়ে খেলাতে খেলাতে

ওই সব শব্দ দিয়ে ইন্সপাতের ফলা ঘানিয়ে কানিয়ে

নিজেদের হত্যা করেছি...

এখন আমাদের কবরের হাড়গোড়ে পা রেখে

উঠে এসেছে একউঠান নিজ'নতা।

# অঙ্গনা



## সার্কাস শিল্পী

সার্কাস শিল্পী নর। সার্কাস চোখে কার্কে দেওয়ার কোন উপায় নেই। রিং-এর চারপাশে হাজার হাজার সার্কাস উৎসুক চোখের সামনে গুরুতর কাছে শোখা বিখ্যার প্রমাণ দিতে হয়। দিনের পর দিন সার্কাসের সাধনায় এই বিদ্যা আমরা লাভ করি। ট্র্যাপজ থেকে শুরু করে নানা খেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। সাইকেল চালনা, ব্যালান্সের খেলা, জীপ জাম্পিং এবং আরো কতোরকম খেলা। মোটামুটিভাবে সব খেলায় আমাদের ট্রেনিং নিতে হয়। তারপর বোগ্যতানুসারী এক একজনের উপর এক একটি খেলা দেখানোর দায়িত্ব পড়ে। তবে জন্তু-জানোয়ারের খেলায় আমাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। সে দায়িত্ব পালন করেন নৃত্যত: পুরুষ শিল্পীরা।

সার্কাস গলের সংস্পর্শে আমরা আসি খুব ছেলেবেলায়। আমরা প্রায় সবাই কেরালার মেয়ে। অন্য রাজ্যের মেয়েদের সার্কাসে কদাচিৎ দেখা যায়। এর পেছনে অনেকখানি অর্থনৈতিক কারণ আছে। কেরালার তেলিচেরীতে অধিকাংশ সার্কাস মালিকের বাস। সেখানকার অধিবাসীরা খুবই গরীব। ছেলেমেয়েকে মানস করার সঙ্গতি তাদের নেই। তাই তারা সার্কাস মালিকদের কাছে নিজের ছেলেমেয়েদের খেলা শেখাতে দেন। আর আশা করেন, ভবিষ্যতে খেলা শিখে ছেলেমেয়ে তাদের অভাব মোচন করবে।

আমার কথাই ধরুন না কেন। আমি সাত বছর বয়স থেকে সার্কাসে আছি। এখন বয়স উনিশ। সুদীর্ঘ বার বছর ধরে আমি কত না খেলায় অংশ নিয়েছি। নানা খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করেছি। এখন বেশ দুটি কঠিন খেলার দায়িত্ব আমার ওপর। জীপ জাম্পিং এবং একটি ব্যালান্সের খেলা। এই দুটি খেলা আমাদের সার্কাসের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এতে ঝুঁকিও কম নয়। কোনদিন এক চুল এদিক সৌদিক হলে যেমন জীপ জাম্পিং-এ জীবননাশের আশঙ্কা তেমনি ব্যালান্সের খেলায় সামান্য দুটি হলে আমার সার্কাস-জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই এখনো আমাকে নিরামিত ট্রেনিং নিতে হয় এবং অন্য সবাইকেও।

এই সার্কাসে আছি আমরা ১২০ জন মেয়ে। সবাইকে অবশ্য একসঙ্গে রোজ খেলার অংশ নিতে হয় না। খরেকিরে সন্ধ্যার ডাক আসে। তবে তৈরি থাকতে হয়। একজন বাদি কোন কারণে খেলা দেখাতে না পারে তবে আর একজনকে এগিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিভরতার ভিত্তিতেই আমাদের শিল্পীজীবন গড়ে ওঠে। সার্কাসে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। আর শিল্পীর কোন দুটি ধাক্কায় কথা নয়। সে বয়সে সবাই

বইপড়ার বগলদাবা করে শুলে ছোটো তখন থেকেই আমরা সাক্ষীসে জীবিকাজনের চিন্তা লেগে যাই। তাই শিল্পীজীবনের পটভূমি আমাদের খুব একটা ভাল হয় না।

তবে আমাদের লেখাপড়া শেখা তেমন হয় না। আমরা খেলা শিখি, লিখতে পড়তে জানি না অনেকই। সাক্ষীসে তার সুযোগও নেই। খেলাই এখানে সব। আমরাও তাই মনে করি। ভাল করে যদি খেলা শিখতে পারি তবে আর কোন কিছু করার নেই। আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারে না। এজন্য অবশ্য আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। কোন জায়গায় তাঁবু পড়লে আমরা সহসা বাইরে যেতে পারি না মূলতঃ এজন্যই। তারপর রাস্তাঘাট না চিনতে পারার অসুবিধা তো আছেই। ফলে দেশের সর্বত্র খেলা দেখিয়ে বেড়ালেও দেশ দেখার সুযোগ আমাদের তেমন ঘটে না। তাঁবুতে তাঁবুতেই প্রায় সারাজীবন কেটে যায়। বেড়ানোর সুযোগ পাই কখনো। সখনো। হয়তো একদিন দর্শনীয় স্থান ঘুরতে একসঙ্গে কয়েকজন দল বেঁধে যাই। সঙ্গে গাইড থাকে। আমাদের সাক্ষীসেই। এমনভাবে আমরা সিনেমাও দেখি।

অশোকবনে বাদিনী সীতার কথা শুনছিলাম। আর আমরাও প্রায় সাক্ষীসের তাঁবুতে একরকম বাদিনী। তবে আমাদের কতৃপক্ষ এসম্বন্ধে খুব সজাগ। তাই আমাদের প্রায়ই সুযোগ করে দেন। এবার কলকাতা এসে বেশ কয়েক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। সিনেমাও দেখেছি দু'একটি। কলকাতায় প্রথম এসেই আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা বারবার এই শহরে খেলা দেখাতে আসতে চাই।

হ্যাঁ, আমাদের এই সাক্ষীসের খ্যাতি এখন ভারতব্রোড়া। এজন্য আমাদের এবং আর সব শিল্পীর কোশল বতখানি প্রশংসনীয় তার চেয়েও বেশি প্রশংসার দাবি রাখে রামু, হাতী। 'হাতী' মেরে সাখী' ছবিতে অভিনয় রামুর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই ছবিতে রামু প্রায় আড়াই বছর খরে কাজ করে। কাজ শেষে রামু কখন আবার ফিরে আসে তখন সে প্রায় চারদিন উপোস করেছিল। প্রিয় নামের কাছ থেকে বিচ্ছেদই এর কারণ। তারপর অনেক ব্যথারসহকারে তাকে আবার খাওয়াচ্ছে হয়। এখনও কয়েকটি ছবিতে সে অভিনয় করছে। রামুর গণেশপুত্র আমাদের সাক্ষীসের বিরাট সম্পদ। আমরা তো মনে হয় তার জীভা-কোশলের কাছে আমরা স্থান হয়ে যাচ্ছি। একথা ভেবে আমরা খুব আনন্দ পাই। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেব চেপে বাপ আমরা ভাল করে খেলা দেখানোর। আমাদের বাপ-সিংহাসনও খেলার খুব পটু।

একটি কথা শুনলে সবাই অম্বাক হয়ে যাবেন যে, আমাদের সাক্ষীসের ৪৫টি বাপ এবং ৩৫টি মিংহের জন্ম এখানেই। আমরা যেমন ছেলেকো থেকে এখানে আছি তেমনি ওরাও জন্ম থেকেই এখানে আছে। তাই আমাদের সম্পর্ক প্রায় আত্ম-পরিজনের মতো।

সামাজিক জীবন থেকে আমরা যেমন নির্বাসিত তেমনি ব্যক্তিগতের সপ্নে আমাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে ছুটিমিটা পেয়ে ব্যক্তি হয়। তখনই মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়। এছাড়া আর কোন যোগাযোগ থাকে না। মা-বাবা অবশ্য প্রতি মাসে টাকা পান। আমার মাইনের টাকার একটা অংশ প্রতি মাসে সাক্ষীস কতৃপক্ষই ওদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এমনিভাবে বরষাটির কথা আমরা প্রায় ভুলেই যাই। সাক্ষীসের তাঁবুই আমাদের স্বাভাবিক জীবন। আমাদের অনেকে বিয়ে-থা করে এখানেই ঘর-সংসার পেতেছেন। বিয়ে করেছেন শিল্পীদের কাউকে। ছেলেপুলেও হয়েছে। তবে দু'তিনটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে কাউকে আর খেলা দেখাতে দেওয়া হয় না। তখন তিনি সাক্ষীসেই অন্য কাজে নিযুক্ত হন।

চাকরি আমাদের বড়ো একটা কারো যায় না। অন্ততঃ আমরা তো সেরকম কোন ঘটনা মনে পড়ে না। মাইনেও আমাদের খুব একটা খামোশ নয়। সেই মখন প্রথম খেলা শিখতে আসি তখনই সাক্ষীস কতৃপক্ষ একটা মাসোছারা দিতেন। অবশ্য মা-বাবাকে। তারপর খেলা শিখে মাইনে পড়ি। হাতে খুব কম টাকা পাই। কারণ, খরচ করার কোন সুযোগ নেই। মাইনের একটা অংশ মা-বাবা পান আর বাদশাকি টাকা জমা থাকে। প্রয়োজন মতো 'সবাকি' আমরা পাই। জামাকাপড়, খাবার, গরনা সব। এছাড়া বেনাস পাই। গ্রন্থইটি আছে। ছুটির কথা তো আগেই বলেছি। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা যে, চাকরি অওয়ার ভয় নেই। আর এই চাকরি চলে গেলে আমাদের বাটার পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা সবাই প্রায় এক জায়গায় মেরে। শব্দ, একটি চীনা, পরিবার, আমাদের মধ্যে আছেন। এরা খেলা দেখান আমাদের সপ্নেই। আমাদের তাঁবুতে অনেক নতুন মেরে ট্রেনিং নিচ্ছে। এমনি হয় সব সাক্ষীস তাঁবুতেই। আর যে বক্স এসেছিল তার চেয়েও কম বক্সের মেরেও আছে। সবাই খেলা শিখছে। তেজিচরীতেও খেলা শেখার একটা স্কুল অবশ্য আছে তবে সাক্ষীস দলই খেলা দেখার পক্ষে ভাল। সাক্ষীসই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু।

হ্যাঁ গ্রেট ওরিয়েন্টাল সাক্ষীস সার দেশেরই গৌরব। আর এ দলের শিল্পী বলেই একথা বলছি না। জীভাকোশল প্রশংসে আমাদের শিল্পীদের দক্ষতা সবিশেষ প্রশংসনীয়। রুম দলও প্রশংসা

করেছেন। আমাদের জন্মের ট্রেনার শ্রীতি মজুতে নতুন জীভাকোশলী প্রশংসার চিন্তার মন। তাঁরা শব্দ ভাবেন, দল-ক-কের কিতাবে আরো বেশি আনন্দ দান করা যায়। তাঁদের ভাবনার অনুপ্রাণিত হয়ে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনের কৃৎকি নিয়ে নানা কসরুত আমরা দেখাই। আমাদের সাক্ষীসের জন্ম আমরা শিল্পী-গুরু' কাছে যেমন কৃতজ্ঞ তেমনি ভগবানের অপার করুণাপ্রদেও আনন্দ। ভগবদ-কৃপা ছাড়া আমাদের এই সাক্ষীস কোনরূমেই সম্ভব হতো না। শিবরাত্রির দিনে আমরা সব মেরেরা ভগবান শিবের আরাধনা করি অন্ত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সোদিন আমরা রিং-এ খেলা দেখাতেও আসি না। এই দিনটা আমাদের প্রকৃত উৎসবের দিন। সকলের সব উৎসবে আমরা আনন্দের জোগান দিই খেলা দেখিয়ে, কিন্তু আমাদের উৎসব শব্দ পালন করি আমরাই। নিষ্ঠুরে। মাত্র ১২০ জনের কলহাস্য মুখরিত পরিবেশে। কথা শেষ করে উঠে গাড়িগেলেন সুনীতি। 'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সাক্ষীসের' অন্যতম সেরা শিল্পী' খেলা দেখাতে একদিন তিনি রিং-এ যাবেন। আর জীভা প্রশংসাতে অল্প দলকের হাত-তালিতে অভিনন্দিত হবেন। কিন্তু এই আনন্দের প্রশংসাপাণি তাঁর বেগমা যে জীবনে তিনি আর কোনদিন ফিরে যাবেন না। সেই জীবন বা আর পাঁচজন মেরের পক্ষে স্বাভাবিক। সাক্ষীসের উল্লেখ আলোর তাই তাঁকে অতিরিক্ত হাসিখুশি মনে হলো। হারানোর খেদনা খুলে বর্তমানের আনন্দে মগন হয়ে থাকতে চান সুনীতি। তাই কথার কথার তিনি হাসেন আর হাসিতে যেন মত্তো করে।

—প্রমীলা

## উল্লেখযোগ্য খবর

শহীদ ভগৎ সিং-এর কন্যা জন্মী ৮৫ বরষা শ্রীমতী বিদ্যাবতী -পাঞ্জাব-মাতা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পঞ্জাবের 'মুখ্যমন্ত্রী' গিয়ানী জেল সিং তাঁকে এই উপাধি প্রধান করেন। তাঁকে একটি মোটর গাড়ি উপহার দেওয়া হয় এবং মাসিক হাজার টাকা পেনসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

অন্যদানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে শহীদ ভগৎ সিং-এর কয়েকজন সহকর্মীও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের ঐতিহ্য জরায়র এক ভাষণ



এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সংসারে গৃহিণীদের উপর প্রথম আঘাত আসে। তাই তিনি তাঁদের পরামর্শ দেন, তাঁরা কেন প্রতিটি রাজ্যের কর্ম মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রত্যেক জেলায় যোগ রাখেন এবং জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ছে আর সরকারী তরফে সে ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা জরুরীকরণে, বিশেষ মহিলাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে তাঁরা

এসম্পর্কে বিতর্ক সভার আয়োজনও করতে পারেন।

\* \* \*

প্রথম মহিলা নডম্পের প্রীমতী ড্যালিগিন ভেরেস্কাডা মহাকাশ পরিভ্রমণ করেন ১৯৬৩ সালে। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। মহাকাশ পরিভ্রমণ মহিলাদের সম্বন্ধে কেউ উল্লেখ করেনি। তবে আমেরিকা যে এতদূর পর্যন্ত প্রায় মনোনিবেশ করে ফেলেছে সম্প্রতি তা জানা

গেছে। শিগগিরই কোন মার্কিন রমণীকে আমরা মহাকাশে দেখতে পাবো। এবছরের গোড়ার দিকে আমেরিকা মহাকাশে সর্বপ্রথম স্টেশন বসানোর চেষ্টা করবে। আর এ দশকের শেষার্ধ্বে ১২ জন অভিজ্ঞা-সহ আর একটি স্টেশন বসানো হবে মহাকাশে এবং এই অভিশ্রমে মহিলাদেরও স্থান হবে। নারী-পুরুষের সমাজিক জীবনযাত্রা এবং সমতানধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে এই অভিশ্রম পরিচালিত হবে।

## যাঁদের কথা কেউ জানে না

সৌন্দর্য হাটতে হাটতে রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়িলাম। বাসে উঠতে হবে। অফিসপাড়ার সমস্তটা বেশ সুবিধের নয়, কিন্তু আমি বাসে ওঠার পক্ষে।

ওটা বাজে। অফিস কর্মচারীদের জিপে বাসে স্টপে রাস্তা বেশ ভরে উঠেছে। প্রতিকাল। সুতরাং সুবিধাবঞ্চিত হুটি হয়ে গেছে। আর অন্ধকার নামতেও বেশি দেরি নেই।

একটা পয়সা একটা বাস আনাজপত্রের মতো লোকে ভাসাটাসি হয়ে চলেছে। কোনটা পরাবশত খামছে আবার কোন কোনটা খামার লক্ষণই প্রকাশ করছে না।

আমিও দাঁড়িয়ে আছি তাঁথের কাকের মত বাস ধরার তাগিদে। একটি বছর আমায়ো উনিশের মধ্যে আমার দিকে এগিয়ে এসে—জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা শ্যাম-কাকের কত নম্বর বাস বাবে বলতে পারেন?

আমি নিলাম। কিছুক্ষণ বাসেই মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা এখান থেকে কলকাতায় কোন বাস যায় না?

—হ্যাঁ। বলবে তো। একটু আগেই ওনং বাসটা চলে গেল। ওটাই তো বরাহনগর বাবে। মেয়েটির মূখতা করুণ হয়ে উঠল। একটু খেমে বলল—কোনদিন বেরোয়নি তো। রাস্তাঘাট একদম চিনি না।

এবার ভালো করে মেয়েটিকে দেখলাম। চোখাটা কয়েকটো ভদ্রমহোদয়। হৃদয়বল ও কয়েকটো ছাপ আছে। তবে বোকা খান একটা অলঙ্কারের ভাব চোখেমুখে।

কি জানি কোতাহল পেয়ে বসল আমার। প্রশ্ন করলাম,—কি কর? এখানে কেন এসেছো?

—কিছু করি না। এত চেষ্টা করছি, কোথাও একটা চাকরী পাচ্ছি না। তাই এখানে রিজিওনাল এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে এসেছিলাম।

মনে মনে ভাবলাম, হায় এখনো ও জানে না একজনকেই কেউ চাকরীর মাধ্যমে সচ্ছিকারের চাকরি খুব বেশি জোটে না। শ্রম বেকারদের নাম ভরানোই এখানকার অসীম প্রদান কাজ।

—কত অর্থ পড়ানো করেছো?

—হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেছি। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তিও হয়েছিলাম। তবে আর পড়ানো হবে না।

—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—একটা ছোট ভাই। বয়স ন' বছর। ওকে নিয়েই তো ডাবনা। সব সময় কামাকাটি করে।

—বাবা নেই?

—বাবা দেড় বছর নিম্নপেশ। মা পাগল।

বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পরই মা পাগল হয়ে বান। তারপর মামারা নিয়ে চলে যায় মাঝে। কোথায় আছেন তাও জানি না।

—তা তোমাদের কোন খোজখবর নেন না তাঁরা?

এবার একটু বিষম হাসি ফুটিয়ে তুলল মেয়েটি তাঁঠের কোণে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন আমাদের বাড়ীর এমনি অবস্থা ছিল না। দুবেলা খাওয়ার অভাব অন্তত ছিল না। সবাই আসতো তখন। দাদা কাজ করতো একটা ফ্যাক্টরীতে। ফ্যাক্টরী হোল লক-আউট। আর তাঁরই ফলে আমাদের এই অবস্থা। দুদিন কবে দাদাও কোথায় চলে গেল জানি না।'

আমি নিমন্ত্রণ হয়ে শুনছিলাম ওদের হতভাগ্য জীবনের কথা।

হঠাৎকেন বাস এসে গেল।

বাসে বোত্রে ঝেঁতে চোখের ওপর ভেসে উঠলো অসহায় দুটি চোখ। অনুভব করতে পারছিলাম ওর অবস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হোল এদের কথা ভাববে কে?

ও তো অলপশিক্ষিত। সুতরাং ওদের কথা পরে। আগে শিক্ষিতদের কথাই ভাবো। একথা বলবেন অনেকে। অথচ শিক্ষিত আর অলপশিক্ষিত—কথা সকলেরই সমান। আহা রেজের সংস্থানের জন্য কর্ম-সংস্থান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েকে পরো-জন তাদের বোগ্যতা অনুভবায়ী। কিন্তু পাচ্ছে কই?

কত অসংখ্য পরিবার আজ এ-সংকটের মধ্যে। তা পরিবারের দারিদ্র আজ একটি শিক্ষিত কিংবা অলপশিক্ষিত পুরুষ উপর তাদের হানি কেন লক্ষ্যসংস্থান না হয়, তবে তারা বাঁচবে কি করে?

যে পরিবারের পিতা অবসরপ্রাপ্ত তাঁর শিক্ষিত কন্যাটি যদি একটি কর্ম-সংস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী না পার, তবে সে পরিবারের উপায় কি হতে পারে।

কিংবা যদি ঐ অসহায় মেয়েটির মত যার কেউ নেই, আছে শুধু বাঁচবার অধিকার, সে বাঁচবে কাদের ভরসায়? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারবে না। অথচ এ দুঃমূল্যের বাক্যের কারো কারো চাকরি হচ্ছে। তার জন্য চাই লোকের জোর। এ তো মামুলি কথা।

ব্যক্তিগত ভাবে চাকরির প্রয়োজন প্রত্যেক মেয়েই, একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু যখন দেখি প্রকৃত অর্থবান বাড়ীর মেয়েরা চাকরী করে আর সে চাকরীর পরিসা ফ্যাশানের খাতে কিংবা বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে, তখন প্রকৃত অভাবগ্রস্তদের কথা ভাবলে শিহরণ হয়।

তাই ভাবছিলাম, এরকম প্রকৃত দুঃখ পরিবারের চাকরির উপযোগী মেয়েদের কথা কে ভাববে? যারা ভয়ংকর অর্থ-নৈতিক সংকটে একটু বাঁচবার জন্য একটি চাকরির জন্য হনো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শিকার হচ্ছেন মানসিক বন্ধ্যাগার, তাঁরা সত্যি সত্যি কি আলো দেখতে পাবেন না? আর না পেলে হয়তো একদিন তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে যাবা হবেন তাঁরা উপার্জনের চোরাগোপ্তা পথ ধরতে। এছাড়া উপায়ই বা কি তাঁদের? বাঁচবার অধিকার তো সকলেরই আছে। বাঁচতে সকলেই চায়।

অথচ সুদূরপ্রসারী ঐ অন্ধকার পরিণতির কথা ভাবলেই সবচেয়ে ভয় হয়। এভাবে যদি অধিক সংখ্যক মেয়েরা অবসরের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে সে-সমাজের পরিণতি হবে ভয়ংকর। মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি জন্ম দেবে অসংখ্য অস্বাভাবিক অসহায় সমাজ-জীবনের, যার থেকে হৃদয় পথ খুলে বের করা হবে অসম্ভব। তাই এ-ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়ো-জম। কারণ, যে-যে মেয়েদের প্রকৃত জগৎ উপার্জনের জন্য হাজার কষ্টের বেয়োতে হয়, পরিবারের উত্তরপোষনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব নিতে হয়, সে-যে মেয়েদের প্রতি অনেক নজর দেওয়া দরকার।

অনুভূতি সেনগুপ্ত

# ফ্যাসান স্থায়ী নয়

ট্রায়ে-বাসে, ট্রেনে চলতে বিরতে বিচিত্র সব কথা আমাদের কানে আসে। রাজনীতি, কালোবাজার, বাজারগর, খেলা-ধুলা সেরে যখন পোষাক-আসাকের আলোচনার সকলে মত হয়ে ওঠেন তখন আর তা সহজে বন্ধ হতে চায় না। এ আলোচনার বোধহয় অন্যরকম মাদকতা আছে যার কাছে জটিল রাজনৈতিক শিরীশ্ঠিও পিছ হটে যায়। আলোচনার লক্ষ্য হয়তো উপস্থিত শেন মেয়ে বা ছেলে, কম্পঃ সেটা মহামারির মত কোথায়, কবে, কখন কাকে কে কি ভাবে, কি সাজে দেখছেন তার বিশ্লেষণ চলে। মাঝে মাঝে কসাইকু লাগে আবার সবদিক দেখেশরনে অনেক কিছুই মৃদু বড়ো হয় করতে হয়।

এমনি একদিন ট্রেনের কামরার বর্তমান পোষাকের হালচালের খোশ গল্পের মাঝে নীরব প্রোতা হিসেবে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। অবশ্য পোষাকের রং-চং-এ তাদের মত কাদিনী সুর আমার গলা দিয়ে সরবে না কারণ পোষাক নানা ধরনের ফ্যাসানের আমদানী করে অথচ কোন ফ্যাসানই দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই আজকের অমার্জিত পোষাক কালকেই হয়তো অন্য রূপে দেখা দেবে। সেটা একদিকে যেমন হবে রুচির বাহক, তেমনি শোভনতার পূর্ণ রূপ।

মৃদু পালটাতে মানুষ চিরকাল ভাল-বাসে। একঘেয়ে খাবারে করণ্ড রুচি থাকে না। তেমনি ফ্যাসান বদলাতে সকলেই সম্মান আনয়ন। অনেকে স্টাইল ও ফ্যাসানকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। স্টাইল হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিরুচির কল। তাই আমরা কথায় বলি ওর কথা বলার স্টাইল অপূর্ব, অপূর্ব ওর হাটের স্টাইল। সুতরাং ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা রুচির ওপর স্টাইল নির্ভরশীল। কিন্তু ফ্যাসান হচ্ছে প্রচলিত পোষাকের ছটিকার্ট। সুতরাং স্টাইল আর ফ্যাসানের মধ্যে রয়েছে একটা ফারাক। প্রচলিত ছটিকার্টের পাশা দিতেই ফ্যাসানের জন্ম, আবার ফ্যাসানই পাশে দিচ্ছে প্রচলিত ছটিকার্টকে। তাই কোন ফ্যাসানের আর্মই স্বল্প। এই কম্পারকে নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা নেই। নতুন কি চলতে পারে বা চললে বাজারে চলবে হয় এটা চিন্তায়

একদল অস্থির। যেমন ধরুন আজকাল আমরা সবাই বলি 'ঠিক আছে জামাটাতে মাপের চেয়ে কাপড় কম হয়েছে ওতে একটু অন্য কাপড় জুড়ে দাও। তোমার জামাটাও সম্পূর্ণ হবে আবার ফ্যাসানে ফ্যাসান হবে।' অথচ আজ থেকে বছর কয়েক আগে জোড়াতালির জামা তৈরীর কথা ভাবলে আতঙ্ক হতো। তখন সেটা ফ্যাসান না হয়ে কেমন গেয়ে গেয়ে ঠেকতো। উপরন্তু হীনতার প্রকাশ হিসেবেও লেগেছে ভাবতে।

আসলে যুগটা ফ্যাসানের। জোড়াতালি হোক আর বাইহোক নতুন জিনিসই বাজারে ফ্যাসানের আয়তনীয় করে।

সেই ছোটবেলার গল্প শুনোছিলাম কান ঢেকে চুল আঁচড়ানোর। এক মেমসাহেবের যে কোন কারণেই হোক একটা কান কাটা গিয়েছিল। অথচ সেই মেমসাহেবকে বড় একটা পাটিতে নাচতে হবে। কান কাটা মেমসাহেব কান নিয়ে মহা চিন্তায় পড়লো। আহর-নিদ্রা সব বন্ধ হবার উপক্রম। অনেক ভেবেচিন্তে সে এক উপায় বের করল। পরদিন কান ঢেকে চুল আঁচড়ে বাজার মাত করলো। চালু হল কান ঢেকে চুল আঁচড়ানোর প্রথা। রাতারাতি মোটমুটি সবই কান ঢেকে চুল আঁচড়ে নতুন ফ্যাসান হিসেবে সেটা চালু করলো।

একদল সমাজসেবী গেল গেল রবে মাঝে মাঝেই অতিক্রম ওঠেন। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের সাজগোজই তাদের আতঙ্কের প্রধান কারণ। আতঙ্ক তো আছে নিশ্চয়ই। ফ্যাসান হবে সুরুচি অনব্যাহারী, পোষাক হবে শ্রী আর সৌন্দর্যের সহায়ক। তাই যদি না হয়ে ফ্যাসানটাই অশোভন রুচির পরিচয় দেয় তখন অমেকেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবেন। ভাববেন, দেশের কি হাল হল। এটা প্রকৃতই কলিকাল, ঘোর কলি। অন্ধেপে মাথার চুল ছিড়তে চাইবেন, কিন্তু সেই ফ্যাসানকে রুখবে কার সাধ্য। যা উঠেছে তা অস্তিত্বঃ কিছদিন চলা চাই। একসময় হাত-কাটা, পেট-কাটা ব্লাউজে ভারতবর্ষে প্রধান প্রধান শহরগুলো ছেয়ে গেল। প্রধান শহর ছাড়া আধা শহর বা গ্রামেও তার দের চললো কিছদিন। পোষাক পরা হল সাতা, কিন্তু

তাতে লক্ষ্য নিবারণের ব্যবস্থারও তেমনই হারিয়েছিল। অমেকে তো লক্ষ্যের মেরুদণ্ড দিকে চাইতেই পরতেন না। ভারপূর্ণ লিন গেল হাত-কাটা জামা কোথায় গেল, পেট-কাটা রুল সামান্য-সেখানে এসে উঠল, বিনামানের আমলের লম্বা বুলের টি কোয়ার্টার হাতের রুচি। শ্রদ্ধাভঙ্গির তখন আবিস্কৃত হলেন, দেশ বোধহয় একদল অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পেল।

কিন্তু সে স্বল্পমেয়াদী চিত্তবিনোদনের বেশীদিন টিকলো না। চালু হল মিনি স্কার্ট। অবশ্য মিনি স্কার্টের চলন মত ব্যাপক হয় নি। মিনি স্কার্টের সমাজসেবীর জনসাধারণ থেকে শরৎ করে পরা-পরিচয় ও বাণ্যবিদ্বেষ চলছিল, সত্যিই সর্বদা মধ্যমোচ্চ জাতোচ্চের বিপরীত। বেশী অশোভন নয় বিকৃত রুচির পরিচয়কর সত্যি সবাইকে ভাবিয়ে তুলেই শাস্তিবিধ। কিন্তু সেই মিনি স্কার্টই বা কিছদিন কতদিন? না টেকেই স্বাভাবিক-কমলাকর রনবদল তো অভ্যাসিক। সেই কারণে মিনি স্কার্টও প্রায় রনবদল দ্রুত অপসারিত হল।

এল জর্ডানের যুগ। জর্ডানের যুগে মানাস বেমানানের চিন্তারও উপলব্ধি লুপ্তি ধারণ করলো। জর্ডানের যুগে সবরকম পোষাক মানিয়ে যায়, লম্বা-কমলাকে কেন্দ্রে ভাবনা-চিন্তার অনেক কিছুই পড়ে। বড়দের ব্যবহারের জন্য পুরুষের পোষাক শাড়ীর কাছে আর বোধহয় কিছু ঘেঁষতে পারে না।

ভাল-মন্দ সব মিলিয়েই, আজকাল ফ্যাসান। মলের পালাপালি সুরুচির, মেরুদণ্ড পোষাকের চলন আমরা প্রায়ই দেখি। সুতরাং 'চাই', 'চাই' তাক হাকার মত কিছু নেই। কোন জিনিস দীর্ঘস্থায়ী নয় ফ্যাসানের ক্ষেত্রে। মিনি স্কার্ট, হাত-কাটা, পেট-কাটা সব ছাপিয়ে গলা থেকে-পা পর্যন্ত বুলের মায়িই এখন আত্মক ফ্যাসানের বাজার সরঞ্জাম করে মেয়েছে। খাপ ফ্যাসানের সমালোচনা হোক রুচির নেই, কিন্তু ট্রায়ে, বাসে, ট্রেনে, সার্বজনীন সমালোচনার ভাষাটা মৃদু না বজায়ই বাছনীর।



ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ

আজকের দিনের রাজপাটির সঙ্গ  
স্বাধীন সমাজের সাধারণ মানুষের বোম-  
বুদ সে আজকের মত নিবট হয় না। তারা

আমাদের হেলোবেলায় অর্থঃ ১২০০-

তিরিগি চল্লিশ দলকে মোটামুটিভাবে  
সম্বন্ধ রাখা চলে। শহর বাজারে আধুনিক,  
শিক্ষিত ব্যবসায়ীরা আবার কুম্ভীরের তরা  
কলকাতাই খিরেটারী হাওলাতে উল্লসিত।  
পালো-পাথরে চটক বেধে মাইকেল, ডি এন  
নার, গিরীশবাণুর নাটক মঞ্চস্থ করেন। জমি-  
দারবাণ, বা. ধনীরা বৈঠকখানার আয়েমেচার  
ক্রাফটগুলো গজিয়ে উঠল। ব্যাড়া, কবিগান,  
ভুলী, রাইবেশের দলকে গজ আর গ্রামের  
মেহের জনসাধারণের উপরই মিলিত করত  
হল। শহরে কলকাতার চন্দ্রনাথ কলকাতা হাটে,  
বাগানে, বাসা মেহের কলকাতার আশেপাশে  
ব্যবসায়ী হলে। তবে কলকাতা মেহেরবাণী  
অভিষেক শহর খিরেটারী আর চন্দ্রনাথের বাসা

দৃষ্টিতে পাশাপাশি চলেছে স্বাক্ষর-উত্তরে  
আনন্দ অবকাশের ভাগিদার হয়ে উঠল।

আমি ওসব বড় বড় বা সূক্ষ্ম বিচার-  
বিশ্লেষণের অধিকারী নই। সাধারণ আর  
পাটজনের মতোই কালে-কালিনে বাস্তব, খিরে-  
টার দেখছি। তাই হৃদয় নির্গত কুল হওয়া  
স্বাভাবিক। তবে এটা লক্ষ্য করছি যে,  
সিনেমা আর পেশাদার প্রামাণ্য খিরেটারের  
সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাস্তব রেওয়াজ একলা  
সহযোগে লুপ্ত হতে বসেছিল। উন্নত,  
আধুনিক আলোকসজ্জা আর পট, সেইসঙ্গে  
জটিল মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ—সবটা  
জড়িয়ে নৃত্যের প্রতি মোহ বাস্তবকে বোল  
আনা পল্লী অঞ্চলেই তৈরি দিয়েছিল অর্থাৎ  
যেখানে সিনেমা নেই, বানবাহনের অপরিহার্য  
জন্য এবং পেশাদার নাটকে মলের আশানু-  
রূপ শিক্ষা প্রাপ্তির দুরাশা সেইসব স্থানেই  
যাত্রা ইত্যাদি সনাতন রমণীয় শিল্প টিকে  
রইল—আর শহরে দু-একটি বড় বড় দল  
এবং সেই সঙ্গে 'হাওয়া সমাজের' মতো শখের  
দল।

কবে কিভাবে বাস্তব পুনরুদ্ধার হইল  
এটা নিরূপণ করা সহজ নয়। মনে পড়ে,  
আমরা একদা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে যেমন  
আউল-বাউল, রাইবেশে, ছৌ, কুম্ভার, পল্লীরা  
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি তার কাছা-  
কাছি সময়েই শোভাবাজারের রাজবাড়িতে  
যাত্রা-উৎসবের মহাসমারোহ হুটে। বোধকরি  
সেটিই বাস্তব পুনরুদ্ধারের পটভূমি। এক  
নাগড়ে পর পর কয়েকদিন ধরে অনেকগুলি  
দলের পালা অভিনীত হয়। মণিকন্দের মধ্যে  
উৎসাহ উজ্জীপলা হুটেছিল সেই অনুষ্ঠানে  
অসামান্য তার প্রমাণ টাকের কড়ি দিয়ে  
মন্তুরমত টিকট কেটেই দেখতে গিয়েছিলেন  
রাঁরা। হাউস ফুল।

বাঁখা স্টেজে খিরেটার দেখার অভিনব-  
বোধ মণিকন্দের মনে খিঁচিয়ে আছে।। পরন্তু  
দীর্ঘকাল পরে দেখার ফলে বাস্তবই বেশ মজুন  
বস্তু হয়ে ধরা দিল। কারণ বাঁখা হোক বাংলায়  
পরানো একটি প্রধান কলাবিদ্যার প্রতি  
মানুষের অনুরাগ অপরকালেই আপন গৌরবে  
অধিষ্ঠিত হল।

শোভাবাজার রাজবাড়ির কথাই এখন উঠল  
তখন রাজ্য নবকৃষ্ণ দেবের আমলের একটি  
কাহিনী শুনলুম। অবিশ্যি সে-আমলে  
চিৎপুরে 'অপেরা পার্টি'র ঢালাও আখড়া গড়ে  
ওঠে নি। নদীরা, বর্ষমান, ঢাকা, বীকুন্দের  
সখিক, পল্লী অঞ্চলেই ছিল সংস্কৃতির প্রাণ-  
কেন্দ্র। সে-কথা থাক। লোচন অধিকারী  
মশাই নিম্নেই 'সন্ন্যাস' পালা অভিনয়ের চমৎ-  
কারিত্ব দিয়ে রাজ্য নবকৃষ্ণকে এমনই অভিভূত  
করলেন যে, পারলে শোভাবাজারের স্বায়ত্তীয়  
সমিতিই প্রায় অধিকারী মশাইকে দিয়ে দান  
কাজ। অতোটা সা হলেও বিপ্লবের ঢাকা লোচন  
অধিকারী পেরোজান শোভাবাজারের এই  
সংস্কৃতিগত প্রাণ ব্যক্তিটির কাছে। ঠিক একই  
কায় হটে ছিল কুম্ভারটঙ্গীর বনজালী সর-  
স্বতীর বাড়িতে। মিথস্র অন্তরির যে কী  
অসঙ্গত মনকে কল কলপ পালি তার প্রমাণ  
সেইসব লোকের অধিকারী হল। তখনকার  
আমরা নয়-কুম্ভারের সঙ্গে দান-করাস্ত কল

নিউ রয়েল কীপাশাপাশি অগে রায় কলাবিদ্যার রাই-এর কল



বা ঐশ্বর্যের ঘটপড়া দেখানোই ছিল প্রতি-  
যোগিতার ক্ষেত্র। তবে এই কাণ্ড দেখে কল-  
কাতার 'টক-কর-টেক'কা দেবেবালা তাঁরা-  
জাহাঙ্গ জামিদার আর হোসের রাজা-গজা  
লোচন অধিকারীকে বারমুখ দিত ভরসা  
পেতেন না। পাছে লোকটা ভুলিয়ে মথাসব্দ  
নিরে নেয়। মথ্যে অবশ্য বসতেন তাঁরা  
লোকটা বড় কাদার। এত করণ হল পরস  
দিয়ে কেনার কোনো মানে হয় না।

আজকে যেমন পেশাদার 'অপেরা' নামধেয়  
যাত্রা দলগুলি প্রধানত কলকাতার হেড অফিস  
খানিরে কাজ করবার কলন প্রথম হাণ্ডে সে-সব  
কিছু ছিল না। এমন কি পেশাই ছিল না,  
ছিল নেশা। লোকের মধ্যে মধ্যে প্রচার হল  
ত ভাল কথা নতুবা দলটি জনসম্মুখে হাজির  
হবে শ্রীকৃষ্ণ বাস্তব অনুষ্ঠান করতেন। ভক্তিই  
ছিল মূল সোতনা। প্রথম হাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ  
বাস্তব বা কালীমদনই ছিল সে এবং অগতিয়  
বিবরণকৃত। আর পরবর্তী কালে বর্ষমানের  
কালে পাতাইয়ার পেশাদার আনন্দ  
কুম্ভার 'রামবাটা' করে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

গোপালকৃষ্ণ দাস বা পেশাদার উত্তর  
এখনো সুস্ক্রিয়ামায়ে সম্ভার পেয়ে আছে।  
বীরভূমের পেশাদার অধিকারী, আনন্দীয়ার  
কুম্ভারের লোচিন, কলৌয়ার পতিভাষ্য  
ফরাসডাল্লার গল্পপ্রসাদ কল (ইনি চম্পী-  
যাত্রার জনক), বর্ষমানের লড়সেন বর্জল (ইনি  
মনসার ভাসান গানের প্রবর্তক), মিলনপুরের  
কালোচাঁদ পাল পার্টিভলী অপেরা-এর এক  
দিকপাল।

তবে কলকলন শোভাবাজারের কাছাকাছি  
পশ্চিম সঙ্গল কলোই ছিল পল্লী। কলকলন  
পিতা ভলনবাটে বসতি করেন, শোভাবাজারেই  
আসাধারণ মূগবান এই পল্লীর কল। কলকলন  
জমিদার কলকলনের অপেরা কাছাকাছি  
এমনই মথ্য হল যে, শিল্পীটিকে কলকলন  
বললেন। ব্যাপার দেখাটিক লোকের  
চোটে কলকলনকে দিয়ে ভরি দাঁবা। কলকলন  
সেলেন। বছর ছয়েক লা-কল দিয়ে কলকলন  
পরে কলকলন আবার তার মামার মথ্য কলকলন  
পাল। বোধকরি বাস্তব এই প্রমাণী শিল্পী  
কলকলন কলকলনই তার মনে কলকলন



কী বসন করেছিল। তাই, পরে তাঁর নিম্নাই সমালোচনা করে অভিনয়ে অকৃত্রিম দরদ কুটে উঠে। কলকাতায় অনুগত সাগরেন্দ্রের উৎসাহে তাঁর সফলতা এসেছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনি সকলের মনে এমনই ছবি গঠনের স্বেচ্ছা দেখে, তাঁর আরও তাকা তাকা করা হয়েছে। তাঁর রচিত 'স্বপ্নবিলাস' 'সুই টেলিভিশন' 'বিভিন্ন বিলাস' সেকালে খ্যাতি অর্জন করে—তাঁর প্রমাণ অঙ্গুষ্ঠানের মধ্যে 'স্বপ্নবিলাস'—এই ২০০০০ কপি বই বিক্রি। কলকাতায় ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। যাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁরা বিশেষজ্ঞ। তাঁরা নিশ্চয়ই চট্টোপধ্যায়ের ইংরেজি-বাংলায় যোগাড় করে পড়তে পারেন।

আজকের দিনে যাত্রার ছন্দোবধ পরিবেশন হচ্ছে। বিমূর্ত প্রসঙ্গ অভিনয় করে বাস্তবের উপরেই কাহিনী রচনা করা হয়। তা ছাড়া রাজনীতির পটভূমিও বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হয়েছে। ইদানীং লেনিন, হিটলার, নেতাজীর জীবন নিয়ে গঠিত যাত্রার পালা জনসমাজে সমাদর পায় অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি এখন দেশের গম্ভীর ছাড়াই রয়েছে। অনেক আধুনিক উপন্যাসকেও যাত্রার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণের হাওয়া এসেছে।

এখন বিশেষণে কলকাতার যাত্রাদল আমূলিত হয়ে সফর করে বাংলার স্বায় সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আসেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমান কাঠামোর

যাত্রার পরিবেশন বাঁধা স্টেজের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছে। অনেকের মনে হয় যেন আগের সেই সরু আর রস-যাত্রার পাওয়া যায় না। সেই বীর রস, বা ভক্তি অথবা ক্রন্দ। রসের শ্রাবন এখন যেন উবে গেছে—কলকাতার অবকাশ প্রোডাকশনের অনেক করেছে। হস্ত এ সবই সত্য। তবু আজকের দিনে পেশাদার থিয়েটারের চেয়ে পেশাদার যাত্রাদলকে সাধারণ জন বেশি পছন্দ করেন। পুজোর সময় ত বটেই অন্যান্য স্থানীয় উৎসবের সময়ে এদের 'বাস' লহরে, শিল্পাঙ্গলে বা কৃষিজীবন যেখানে উন্নত সেখানে হাজার হই এবং পল পর করে দিন ধরে বিভিন্ন পালা অভিনয় করে এঁরা অন্যত্র যাত্রা করেন।



অভিনয়: স্বপ্ন/ওয়ারিহা রহমান। পরিচালনা: স্বদেশ সরকার।

## ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবুজ আলোর পদধ্বনি

### শ্যামল চক্রবর্তী

আমরা লেনিনের জীবনে সাধারণতঃ কারু কারু সম্পর্কে বলে থাকি—বরেন্দ্র হেনেও বুদ্ধি থাকেনি। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি হুজুরো গবেষণা সত্ত্বেও বোকার মত কাজ করত—কিন্তু নিজেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে উপস্থাপিত করতে পারেন না। আমাদের এদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কেও একথা বলা চলে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বরেন্দ্র প্রায় পূর্ণতর হতে গেল এবং সবাক চিত্রের বরেন্দ্র চলিলা পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও এদেশের চলচ্চিত্র নানারকম শাসন-বিধির অস্ত্রমলে, এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে সফল হতে পারেন না। অল্পকাল থেকে এই কলকাতার পরিচালনা হচ্ছে

বিভিন্ন দিকে উন্নতি করেছে, কল প্রাপ্তিও ঘটেছে; তথাপি বাণীবোধের গম্ভীর থেকে মস্ত হয়ে সবুজ প্রাণের বন্যার এগিয়ে যেতে পারেনি এদেশের চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্র—প্রথম সৃষ্টির কালে ছিল শব্দহীন ছবি। কালক্রমে ছবিতে এল বিন্যাস, এল গতি। নির্বাচকগণে সেইসব ছবি দর্শককে আকৃষ্ট করার মানসে নানা-রকম কান্ডকারখানা করতো। তারপর নির্বাচক যুগে ছবিতে গল্প বলা শুরু হল, বেশীর ভাগই কাপলিক ও উদ্ভট ঘটনার পরিপূর্ণ থাকতো। দর্শকের মন ভরতো না, শব্দ হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চলচ্চিত্র বিজ্ঞান-সম্বন্ধে শিল্প—তাই গবেষণা ও মানবের

চেষ্টা সফলতা নিয়ে এল। এল সবাক যুগ। ছবিতে কথা বোঝা হল। এক কথার বির্যট পরিবর্তন, দর্শক চমকিত। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বে, অসাধারণ প্রমোদ মাধ্যমরূপে উপস্থিত হল। পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে সমতা রেখে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পও এগিয়ে চলল—এর পরিধি বিস্তৃত রূপ নিল, বহু মানবের মন এই ছবির জগতে প্রতিবিম্বিত হল। পরে পুনে শোভিত হয়ে চলচ্চিত্র নামক বস্তুটি ক্রমেই বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাইতে ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি স্যার ফিরোজ শোভন্যায় ১৯৩৭ খৃঃ জানালেন—এদেশে বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পে ১২ কোটি টাকা খাটছে, ২০ হাজার লোক যুক্ত এবং প্রায় সাড়ে ছশো চিত্রগৃহ রয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানান যে, একটি চিত্র নির্মাণে বর্তমানে এক লক্ষ টাকার মত খরচ করতে হয়। অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃঃ সবাক চিত্র নির্মাণের মাত্র সাত বছরে এদেশের চলচ্চিত্রের এই দুর্বীর গতি। সেকালে একটি শিল্পের প্রতি এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই উদ্বেগব্যোগ্য।

চলচ্চিত্র খেমে থাকেনি—এ পরি-সংখ্যানের পর ক্রমে আরো এগিয়ে গেছে। এদেশে চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তার যে কোন শিল্পকে পিছনে রেখে এগিয়েছে লন্ডী বাঁধি পেরেছে মানবের মিলিত শক্তি ও চেষ্টা বির্যট রূপ নিয়েছে। এই সমস্ত দৃষ্টক এসে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বছরে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা খাটছে, লক্ষাধিক লোক এই শিল্পে যুক্ত এবং সমগ্র দেশে তিন থেকে চার হাজারের কাছাকাছি চিত্রগৃহ। বর্তমানে একটি ছবিতে কোটি টাকাও খরচ হয়ে থাকে এবং ভারতীয় ছবির দ্বারা বিশেষ থেকে সরকারের বেশ করেকশো কোটি টাকা খুদ্রাও আয় হয়।

ভের্নি সবাক যুগের প্রথমে এদেশের ছবিতে এল কাহিনী এবং সুরমা। ক্রমে এই শিল্প মাধ্যমটির উন্নতি হতে থাকল। আস্তে আস্তে সেট সেটিং, দুর্গা পরিচালনা, অভিনয়, ধর্ম প্রকল্পের



বহাধরতা, লক্ষ্যভেদ ব্যবহার বোঝা হল।  
 ছবি এগিয়ে চলল। ভাল ভাল ছবি সন্নি-  
 হল, কৃতী পরিচালক ও শিল্পীকুলের  
 চেতনা। ১৯৩৯ সালের মধ্যে চলচ্চিত্র পেল  
 প্রবেশ বড়দার 'সেবাস', 'ভি শান্তারামের  
 'আদমি', 'সেবকী'র বঙ্গ 'চণ্ডীদাস' এবং  
 নর্তিনী বঙ্গ 'ভাগ্যভট্ট' ছবিগুলি। দর্শক  
 ছবির উল্লসিত পরিভ্রম, হায়াছবিও সেই  
 পরিভ্রমকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার  
 চেতনা রূপ হল। সেই পরিভ্রম চলচ্চিত্র  
 এসে উপস্থিত হল 'পথের পাচালী' ছবির  
 মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে  
 নবভাবের উদ্বেগ ঘটল এই ১৯৫৫ সালে  
 এবং এক দূর্বাস সাড়া জাগল চলচ্চিত্র  
 শিল্পে। 'পথের পাচালী' ছবি নিয়ে এল  
 চলচ্চিত্রে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা। প্রস্তুত  
 সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রচলিত  
 রীতি ভেঙে নিয়ে এলেন প্রকৃত জীবনব-  
 প্ৰকাশ ছবির জগতে। এত দীর্ঘ বছর ধরে  
 ছবি কথা বলছিল, কিন্তু ঠিক এমনটি নয়।  
 রিয়ালিটি বা বাস্তববোধ এল ছবিতে, বা  
 ন্যাক ইতিপূর্বে উপস্থিত ছিল না।  
 ভারতীয় চলচ্চিত্র নতুন দিকে মোড় নিল,  
 এবার চলচ্চিত্র জীবনের কথা আরো গভীর-  
 ভাবে বলতে শুরু করল, ছবি আর  
 আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা পরস্পর  
 একসাথে হয়ে উঠল। শব্দ তাই নয়, ভারতীয়  
 চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ প্রদর্শিত পথে এগিয়ে  
 এলেন আরো কয়েকজন, বীরা চলচ্চিত্রকে  
 আরো গভীরভাবে দর্শকের নিকট আন্তরিক-  
 ভাবে উপস্থিত করলেন। এদের সবার  
 মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় চলচ্চিত্র পেল  
 গিপ্সদুখা, আশাঙ্কগত উৎকর্ষতা,  
 বাস্তববোধ কাহিনীর চিত্ররূপ ও বিশ্বের  
 সম্মান। সত্তর দশকে এসে ভারতীয়  
 চলচ্চিত্র এই পটভূমিতে বিরাজ করছে।

কিন্তু এরপরেও চলচ্চিত্রের বহু শেষ  
 হয়নি। যেহেতু চলচ্চিত্র, আজ জীবনের  
 কথা নিম্নভাবে উপস্থিত করছে, প্রচলিত  
 বাস্তববোধকে ভেঙে গভীরে এগিয়ে আসছে  
 জীবনের প্রতিটি মহত্বকে চিত্রপটে  
 তুলে ধরতে চাইছে সেজন্যই চলচ্চিত্র এই  
 মহত্ব আরো কিছু বস্তু দরজা খুলে  
 দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে  
 উদগ্রীব। তার জন্যই চলছে সংগ্রাম,  
 দূর্বাসিক মনোভাব এবং প্রচেষ্টার কিছু  
 করার তাড়না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের  
 প্রথম বস্তু থেকেই যে অনুশাসন রয়েছে,  
 যেসব সামাজিক আশঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে  
 গড়ে উঠেছে বাধানিষেধের গাউ, তাকে  
 চাইছে দূরে সরিয়ে দিতে। এই নিয়েই  
 আজকের চলচ্চিত্রের জগতে ঝড় উঠেছে।  
 এই ঝড় হল চলচ্চিত্রে যৌন আবেদন বা  
 অশ্লীলতা দেখানো হবে, কি হবে না। এবং  
 একেই বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রে সর্বজনের  
 পদধ্বনি।

এখন প্রশ্ন—চলচ্চিত্রে শ্লীল ও অশ্লীল  
 কী বোঝায়। বিদেশের চলচ্চিত্রে  
 সর্বজনীন বাধানিষেধ সেই। কারণ  
 সর্বজনীন সমাজব্যবস্থা বা দৈনন্দিন জীবনের  
 প্রতিটি আমাদের দেশের তুল্য নয়।

এদেশে বা সম্ভব হয়, এখানে আমাদের  
 জীবনে তা ঘটে না। তেমন কোন চলচ্চিত্রে  
 বা দেখানো সম্ভব, আমাদের দেশে সেই-  
 রকম কোন কিছু উপস্থিত করার অসম্ভব  
 রয়েছে। অথচ সমস্ত নিষেধ চলচ্চিত্র শিল্পের  
 একটা নিজস্ব পাথ রয়েছে, যে পাথে সবাই  
 একইভাবে চলছে। পৃথিবীর অসংখ্য দেশে  
 চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জীবনের সব কথাই  
 তুলে ধরা হচ্ছে, সেখানে কোন বাধা-  
 নিষেধের ভেতরে চলচ্চিত্র খেয়ে খায় নি।  
 মনুষ্যের জীবনকে নিয়ে যে কাহিনী  
 চিত্রায়িত হচ্ছে, সেই কাহিনীর একান্ত  
 গোপনীয় ও আন্তরিক কথা থেকে দূরে  
 গিয়ে প্রতীকের আশ্রয়ে চিত্ররূপ উপস্থিত  
 হচ্ছে না। কিন্তু এদেশে মনুষ্যের গোপনীয়  
 কথা বা মহত্ব প্রতীকের মাধ্যমেই  
 উপস্থিত করা হচ্ছে। গোল বেঁধে  
 এখানেই।

চলচ্চিত্র যদি জীবনের সব কথাই তুলে  
 ধরতে চায় তাহলে প্রতীকের আশ্রয়ে কোন  
 কোন ঘটনা উপস্থিত হবে কেন। রিয়ালিটি  
 প্রদেয় সব কিছুই উপস্থিত করতে হবে এই  
 হল আজকের মূল দাবী। আমাদের দেশের  
 রূপকণীল সমাজব্যবস্থায় সামাজিক  
 অনুশাসনের গাউর 'বারা চলচ্চিত্র শিল্পকে  
 চালিত করা হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। সময়ের  
 পরিবর্তনে চিন্তায় ভিন্ন সুর আসে—  
 বহুবাও নতুনভাবে উপস্থিত হয়। চলমান  
 জীবনে যদি সর্বত্র সমাজব্যবস্থার ভাব এসে  
 থাকে, তাহলে চলচ্চিত্র তার থেকে দূরে  
 সরে থাকতে পারে না। আজকের ভারতীয়  
 চলচ্চিত্রে এই ঘটনাদের বসবসী হয়ে  
 কিছু প্রস্তুত এসেছেন বীরা জীবনের সব কথা  
 তুলে ধরতে চান। এই চাওয়ার অশ্লীলতার  
 অনুপ্রবেশ ঘটছে এই বহুবা একপক্ষের।  
 অপরাধক বলছেন—না, অশ্লীলতা সেই  
 কোথাও জীবন যদি চলচ্চিত্রের একমাত্র  
 মুখ্য বাহক হয় তাহলে এই জীবনের সব-  
 দিকই এর সঙ্গে বসে হবে। মনুষ্যের  
 জীবনের একান্ত মহত্ব উপস্থিত  
 করতে গিয়ে যদি বিহীন দৃশ্য বা চূড়ন-  
 দৃশ্য উপস্থিত করতে হয় তাহলে সেই  
 মহত্ব থেকে ফিরে আসা হবে না। কিন্তু  
 দর্শক, তারা কি পারবেন সহ্য করতে?  
 কেন পারবেন না—যদি বিশেষী চিত্রের সময়  
 তারা কিছু মনে না করেন, তাহলে দেশীয়  
 চিত্রের সময় অন্য রকম গোপন ঠিক নয়।  
 কিন্তু ভারতীয় জীবনব্যবস্থার আমরা এমন  
 ভাবে প্রভুত যে বিশেষী নিরাশীর মন-  
 নারীর নিরাশ্রয় দেখলে সেখানে অত্যন্ত  
 উত্তী না—কিন্তু এদেশের আপসার জন্মের  
 এই দৃশ্য গড়া করা সম্ভবপর হয় না।

সেজন্যই আজ সোরগোল—'সেজন্য',  
 'অন্যত', 'অন্যত' ইত্যাদি আরো অনেক  
 ছবি নিয়ে। তবে পড়ছে কোন এক সামাজিক  
 সমস্যাতে সত্যজিৎ রায় অশ্লীলতা,  
 'বিহানার দৃশ্য' দেখাতে গিয়ে প্রতীকের  
 আশ্রয়েই উপস্থিত হয়ে যায়। যেমন  
 'খালিস', 'চাঁদ' দুইজনেই উপস্থিত  
 এবং মনুষ্যের বিদ্রোহকে উপস্থিত  
 করলেই বোকা বাবে কিছু একটা হয়ে

গিয়েছে। কিন্তু সত্যজিৎ 'সেজন্য' বীরা  
 এসেছেন তারা আরো বেশী অশ্লীল, তারা  
 আরো এগিয়ে চান। চলচ্চিত্র সেন্সার  
 কমিটি এখনও এই বিষয়ে সবুজ নিশানী  
 দেখানি নি, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেই  
 সবুজের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই তরঙ্গ  
 রাখা কি সম্ভব হবে? অতি সম্প্রতি বাংলা-  
 দেশের ঢাকার একটি চিত্রে চূড়নদৃশ্য গ্রহণ  
 করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।  
 তাহলে দেখা যাচ্ছে দুরারোই সেই পদধ্বনি  
 এসে গেছে।

এখন প্রশ্ন চলচ্চিত্রে শ্লীল অশ্লীল  
 বা যৌন আবেদনের মাপকাঠি কি হবে?  
 অর্থাৎ কিভাবে এই দৃশ্য চিত্রায়িত হতে  
 পারে। এই প্রশ্নে বলা ভাল, বর্তমানে  
 ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষ করে হিন্দী  
 ছবিতে যৌন আবেদন যেভাবে প্রকট করে  
 তুলে ধরা হচ্ছে সেটা অনেকক্ষেত্রে অতি  
 উত্তেজনার খোরাক জোগাচ্ছে। এরও কারণ  
 হল যেহেতু নন্দন দৃশ্য বা চূড়ন ছবিতে দেখাও  
 সম্ভব হচ্ছে না সেজন্যই নানাসকলের যৌন  
 আবেদনের মাধ্যমে চিত্রকে দর্শকের নিকট  
 আকর্ষণীয় করা। অথচ শিল্পসম্মতভাবে  
 প্রেমিক-প্রেমিকার চূড়নদৃশ্য বা বিহানার  
 দৃশ্য অনেক কম উত্তেজক রূপে উপস্থিত  
 করা সম্ভব। যদিও একথা সত্য যে, চূড়ন  
 দৃশ্য বা বিহানার দৃশ্য মাত্রাতিরিক্তভাবে  
 উপস্থিত হলে রসহানি ঘটবে এবং দর্শকের  
 নৈতিক চিন্তায় আঘাত হানতে পারে।  
 চলচ্চিত্র সেন্সার কমিটি এই বিষয়ে নীতি  
 নির্ধারণ করে দিলে হয়তো অত্যন্ত উত্তর  
 মতো কিছু ঘটবে না। অথচ বর্তমানে  
 আমাদের চলচ্চিত্র এইদিকে 'কোরকটের  
 অভাবে থেমে যাবার মতো। কেননা, 'কোরকট'  
 কিছু দূর্বাসিক পরিবর্তন বা মনুষ্যের  
 জন্য উদ্ভূত। দীর্ঘদিন একঘেয়ে রূপকণীল  
 মনোভাবের বাধানিষেধের ভেতরে আবদ্ধ  
 থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র দর্শক মনোরঞ্জনের  
 পাথ খুঁজে পাচ্ছে না। চিত্রপ্রস্তুতকারী  
 অসফল চিন্তাধারা চলচ্চিত্র ব্যবসারে বা  
 শিল্পকে অন্ধকারে নিয়ে চলেছেন। সারা  
 পৃথিবীর দর্শকের যদি চূড়ন দৃশ্য বা  
 মনুষ্যের একান্ত মহত্বের দৃশ্য চিত্রায়িত  
 দেখে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন না ঘটে  
 থাকে তাহলে আমাদের দেশের দর্শকেরও  
 ঘটবে না। প্রথম প্রথম হয়তো গ্রহণে অস্বীকৃত  
 বা বিতর্কের ঝড় আসবে, কিন্তু পরিবর্তী  
 সময়ে সব কিছুই সহজভাবে গ্রহণীয় হয়ে  
 উঠবে। চলচ্চিত্র বহন তার নিজস্ব শিল্প-  
 মাধ্যমে জীবননিষ্ঠ হয়ে উঠছে সে সময়  
 অবধা তার চলার পথকে সোজামুঠ  
 মানসিকতার দৃশ্য করে রেখে এই শিল্পের  
 সংকট ও ভবিষ্যৎ সমস্ত অসুখমাকে একটা  
 নির্দিষ্ট সমাধানের আটকে কোন দৃঢ় ফল  
 প্রাপ্তি ঘটবে না। কোন শিল্পকেই বাবা-  
 নিষেধের ভেতরে বেঁধে রাখা যায় না। দর্শকের  
 প্রতিটি এগিয়ে যেতে দিলেই অস্বীকারিত  
 রূপ প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্র তা থেকে  
 স্বতন্ত্র নয়। তাই এই পদধ্বনিকে সর্বাঙ্গ  
 জ্ঞানসৌ নীতিবিগহিত কাজ হবে না।

# প্রেক্ষাগৃহ

## চিত্র-সমালোচনা

নতুন দিনের আলো

ইউনাইটেড নেশনস্-এর পারি-  
সংস্থানে প্রকাশ, পৃথিবীতে এমন  
কোনও দেশ নেই, যেখানে সমগ্র  
উপার্জনকম জনসংখ্যার শতকরা বোল  
ভাগের বেশী লোককে কর্মচারী ও  
কেনারীর চাকরীর সংস্থান করে দেওয়া  
সম্ভব হয়েছে। বাকী উপার্জনকম লোকের  
মধ্যে কেউ কৃষিকারী, কেউ বা ব্যবসায়ী,  
আবার কেউ বা উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার,  
শিক্ষক বা ঐ-রকম আর-কিছু। কাজেই  
আমাদের শিক্ষিত বেকারদের উচিত,  
চাকরীর জন্যে হা-পিডোশ করে বসে না  
থেকে স্বাধীনভাবে কোনো-না-কোনো  
রকমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা এবং  
এ-ব্যাপারে সংভাবে জীবিকা অর্জনের  
কোনো উপায় বা পন্থাকেই সম্মানহানিকর,  
ছোটো জ্ঞান না করা।—এই অত্যন্ত খাঁটি,  
সত্য কথাটি বলতে চেয়েছে ১৯৭০ সালে  
ঘটিত প্রাপ্ত প্রথম বাঙলা ছবি বাদল  
শিকড়ার জন্ম নিবেদন “নতুন  
দিনের আলো”। এবং এই অত্যন্ত  
গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি আমাদের কর্ণকুহরে  
ধ্বনিত করার জন্যে আমরা অনারাসেই  
এই ছবির প্রযোজক রাশালচন্দ্র সাহা এবং  
কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অজিত  
শাল্লীকে অকুণ্ঠভাবে অভিনন্দিত করতে



কাহিনীকার, পরিবেশিত হস্তীক দীর্ঘ চিত্রে রাফেল পণ্ডে এবং আশা সচদেব

পারি। ফরাসিওলা, চানাচুরওলা, পান-  
ওয়ালা, বেতো-কব্দ-চারআনা, বা নেবে তাই  
চারআনা, ‘ইন্ডিয়া সুইটস’, ‘তাজমহল  
সুইটস’, ‘সাগর রেস্টোরা’, ‘মানসরোবর’,  
বুনবুনওয়ালা, গম্ভীরমল কলমল, নাগর-  
দাস মনোহরদাস প্রভৃতি লাখো লাখো  
অ-বাঙালী যখন এই পশ্চিমবঙ্গের বরক  
ঘসে ছোট-বড়, হরেক রকম ব্যবসায়ের  
মাধ্যমে ‘বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্যী’  
প্রবচনটিকে সার্থক করে তুলছে, মিস্ট্রিমের  
দোকান, মদীর দোকান, কুমারের কারকর  
প্রভৃতিও যখন ধীরে ধীরে বাঙালীর হাত  
থেকে অবাঙালীর কৃষ্ণগত হয়ে চলেছে,  
তখন ‘নতুন দিনের আলো’র বক্তব্যটি  
বে অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে, সে-কথা  
বলই বাহুল্য। ধান ভানতে শিবের  
গীতের মতো শোনাতেও এই স্বাক্ষরোক্তি-  
টুকুর প্রয়োজন ছিল।

‘নতুন দিনের আলো’র কাহিনীতে  
দেখতে পাই, গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত নাটকের  
অনুসরণে পরিবাস্তব তিন ডাইজের মধ্যে

সেজেকাই বহুজনের হাতে উকিল এবং কল, মাঝপন। ছোটো ভাই সজর বি-এ পরল স্বরবার পরে পচি বছর ধরে বেকার হয়ে আছে। বড়ল মৃত্যুজনের বিরতির সীমা নেই। কিন্তু কিছু করে মাসোহারা পাঠিয়ে কতবোয় দায় এড়ানোর পরামর্শকে উপেক্ষা করে যখন পরলোকগত পিসু ছুতো ভাইয়ের মেয়ে মিনুকে বাড়ীতে এনে হাজির করল সজর এবং জানল এতে সমর্থন আছে বড়ো বৌদির, তখন রোজ-গোরে উকিল মৃত্যুজর প্রতিমত কিস্ত হয়ে উঠল এবং বোষণা করল, একামবতী পরিবার থেকে সে তার স্ত্রী ও বি-এ পাঠরতা পলিকে নিয়ে পুখক হয়ে বাবে। সাধারণ কেরানী, বড়ো ভাই ধনজর পড়ল মহা ফাগরে; স্ত্রী, কিশোর সন্তান, ভাই সজর, মিনু এবং নিজেকে—এই পাঁচটি মৃত্যুর অম জোগানো তার একার রোজগারে প্রায় অসম্ভব। চাকরীর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ঘুরেও যখন কিছুই হল না, তখন একজন শিক্ষিত যুবকের চায়ের দোকানের বিক্রি দেখে সে যেন বাঁচবার পথ খুঁজে পেল এবং স্নেহময়ী বৌদির হাতের চার গাছি সোনার চুড়ী বিক্রি করে পাওয়া তিনশো টাকা মূলধন নিয়ে পারঘাটার খুলে বসল মিনু, কাফে—চা এবং টুকটাকির দোকান। মেজো ভাই মৃত্যুজর আবার ভৎসর হয়ে উঠল—চায়ের দোকানী হয়ে সজর তার প্রেসিটজ পাংচার করে দিচ্ছে। কিন্তু তার জঘনা বিরোধিতা সজরকে দম্মাতে পারল না; তার চায়ের দোকান, তার দোকানের মিনু পীজ হুয়ানি তাকে শেষ পর্বস্ত করল জয়বত।

অথবা আত্মসম্মানজ্ঞান মনুষ্যকে সময় সময় মরিয়া করে তোলে। তবু মনে হয়,



বিজয়িনী চিত্রের মিউজিক টেকের পূর্বে হেমন্ত মৃত্যুপাথ্যকে নিয়ে দিচ্ছেন সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছোটো ভাই সজর বিরুদ্ধে মৃত্যুজরের অভিযানের মধ্যে কিছুটা বাড়বাড়ি রক্তছে, যেমন রয়েছে পলির প্রণয়ীর প্রোথ মা-বাপের কথা কাটাকাটির মধ্যে অপোভনা-তার আভিভব্য। চিত্রকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলির অঙ্কনে বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম তুলির কাজ না থাকলেও সেগুলি রক্ত-মাংসের অবলম্বিবাশিষ্ট আমাদের নিভা-কাণের মোজানো মানুষ; তাই তাদের দৃষ্টি আমাদের চক্ষু যেমন আদ্র হয়েছে, তাদের আনন্দেরও তেমনই অংশীদার হতে কোনও রকম অসুবিধা হয় নি।

সু-অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। ছোটো-বড়ো, প্রতিটি ভূমিকাই সু-অভিনীত। সজরের ভূমিকার সার্থক অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার নীরব অভিব্যক্তিগুলি অত্যন্ত রাজনাসূচক। স্নেহময়ী বৌদির চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সন্ধ্যাপাথীর অভিনয়ে। পুণ্যে, যদিও বলাব, যুগোপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সার্থক অভিনয়ে আগবের প্রকাশকে বেশ কিছুটা পরিমিত স্বরবার

সুযোগ ছিল। সঙ্করের প্রেরণা-  
ধর্মী নমিতা বেগে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর  
প্রভাবসম্পন্ন স্ব-অভিনয় করেছেন। কিন্তু  
বি-এ পাঠকরা সামান্য মূল্যমান্যতার  
প্রাপ্তি অর্পণকৃত সাধাসিমা হওয়া উচিত  
ছিল। বড়ো ভাই ধনঞ্জয়ের ভূমিকায়  
প্রমোদ গাঙ্গুলী অত্যন্ত স্মার্টাধিক ও সহজ  
অভিনয় করেছেন। একদা তিনি অল্প  
কয়েকটি ছবিতে নামকরণ ভূমিকায়  
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বহুদিন অদর্শনের  
পরে প্রাচীন বয়সে তাঁর এই চরিত্রাভিনয়  
রীতিমত চিত্তাকর্ষক। প্রথমে ডেক-গণকায়  
ও পরে চায়ের পোকানে সঙ্করের দোসর  
গণেশের ভূমিকায় অনুপমুমার তাঁর  
অভিনয়চাতুর্যকে উপভোগ্যতার পর্যায়ভুক্ত  
করতে সক্ষম হয়েছেন। পদ্যের এই প্রথম  
দেখানুম তরুণ রায় ও দীপাবিত্তা রায়কে।  
থিয়েটার সেন্টারের প্রতিভাশালী এই শিল্পী

## রক্তনা নান্দীকার

১৩ই জানুয়ারী শনিবার ৬টাটায়  
১৪ই রবিবার ৩টে ও ৬টাটায়

## তিন পয়সার পালা

১৬ই মঙ্গলবার ৩টে ও ৬টাটায়  
বর্ষা অর্ধে মৌলিক ও নতুন নাটক

## নটী বিনোদিনী

১৮ই বৃহস্পতিবার ৬টাটায়

## শেখর আফগান

নির্দেশনা ও পরিচালনা বন্দোপাধ্যায়



মজরা বহুদৈনিক ও বর্ষিক ৬০টির  
মজরা বহুদৈনিক ও বর্ষিক ৬০টির

দম্পতি আলোচ্য চিত্রে স্বাধীনপন্থী উকিল  
মুহম্মদ ও তার সহধর্মিণী হেনার  
ভূমিকায় সার্থক অভিনয়ের স্বাক্ষর  
রেখেছেন। অভিনয়ই সত্যনি গ্রীষ্মক দেবরাজ  
রায় লেখাছেন মুহম্মদ-কন্যা জলির প্রথমী।  
যতক্ষণ তিনি ছবিতে আছেন, ততক্ষণই  
জালিয়া লাগে এবং এই জালিয়া নিশ্চয়ই  
প্রলংঘার যোগ্য। এ-ছাড়া উল্লেখযোগ্য  
অভিনয় করেছেন হাসু, বন্দোপাধ্যায়  
(মিন্দু), বিদ্যা রায় (পলি), বিকাশ রায়,  
বিনোদা রায়, শমিতা বিশ্বাস, অমরনাথ  
মুখোপাধ্যায়, চিত্তর রায়, বালকম ঘোষ  
প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলার বিভিন্ন বিভাগের  
কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। অনিল  
গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা, বঙ্গ চিত্রশিল্পী  
পরিষদের অনুষ্ঠান বহির্ভূত গ্রহণে  
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু  
উল্লেখ্য সিনেমার প্রেক্ষাপক বন্দ-প্রোজেক্টার  
দুটি ভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করেছিল বলে  
এবং একটি লেন্স সম্ভবত ঈষৎ স্থানচ্যুত  
ছিল বলে ছবির ঔজ্জ্বল্যেও তারতম্য  
ঘটিত এবং সময় সময় ছবির অংশকে  
আউট অব ফোকাস বোধ হয়েছিল। বিজয়  
হাসু ও সুবোধ দাসের শিল্পনির্দেশনা  
কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তব-  
ধর্মী। সুনীল বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনা  
ছবির টেম্পোকে এমন সুন্দরভাবে বজায়  
রেখেছে যে, মনে করবার উপায় নেই, এই  
ছবিতেই তিনি প্রথম স্বাধীনভাবে সম্পাদনা  
করবার সুযোগ পেয়েছেন। ছবির গান  
তিনটি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন  
মজুমদার। কিন্তু তাঁর মতো অভিজ্ঞ  
গীতিকারের কাছ থেকে 'মার দিয়া হায়  
কেলার সঙ্গে 'পরেছি বাদশাহী আল-  
খানার মতো মিল আশা করা যায় না। ঠিক  
সম্মানভাবেই আকিরাগ। করব সংগীত-  
পরিচালক নচিকেতা ঘোষের বিরুদ্ধে;  
ছবির গানে অল্পাধিক নিয়ে কতক  
করুন গান হৃদয়ঙ্গমশী হয়ে ওঠে না এবং  
সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভের সুযোগও  
হারায। কাজেই ছবির তিনখানি  
গানই হয়েছে, ছবির অঙ্কেলা অঙ্গ হয়ে  
উঠতে পার নি।

বর্তমানের নিরাশোর রাজ্যে আশার  
নবাবী বহনকারী, অভিনয়শিল্পী-ড.  
বাদল পিকচার্স-এর নির্দেশন, ড.  
গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত 'নতুন  
দিনের আলো' দর্শকমারকেই খুশীতে  
ভরিয়ে দেবে।

## স্টুডিও সংবাদ

নতুন পিকচার্স-এর 'চতুরঙ্গ'-এ  
সচিত্রা সেন

১৯৬০ সালে প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী  
চিত্রপ্রযোজনার কাজে রতী হয়ে প্রথমই  
নির্মণ করেন স্বাধীনভাবে 'চতুরঙ্গ' নামক  
অল্পলক্ষ্যে উপর সিনে পরিচালিত শিল্প-  
সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় চিত্র। এই সময় থেকেই

শ্রীগাঙ্গুলীর আন্তরিক অভিনয় ছিল  
কবির 'চতুরঙ্গ' অল্পলক্ষ্যে একদা ছবি  
তৈরী করা এবং তার নায়িকা নায়িকার  
ভূমিকাটি সচিত্রা সেনকে দিয়ে প্রদর্শিত  
করা। বছর তিনেক আগে বাঙালি পাগিনা  
মাহাতোয় প্রযোজনা শেষ করেই শ্রীগাঙ্গুলী  
'চতুরঙ্গ' করবার কথা ঘোষণা করেন।  
কিন্তু নানা কারণেই সময়ে ছবিটির কাজ  
হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি  
পূর্ণেন্দু পট্টী পরিচালিত 'স্টার পথ'  
ছবিখানিকে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে  
দেখে শ্রীগাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সেন দু'জনেই  
একমত হন যে, শ্রীপট্টীকেই 'চতুরঙ্গ'  
ছবির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক।  
বলা বাহুল্য, ঐ সঙ্গে চিত্রনাট্য রচনা  
করবার ভারও শ্রীপট্টীর ওপরই অর্পিত  
হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, হেমেন গাঙ্গুলীর  
নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রূপশ্রী পিকচার্স-এর  
পতাকাতে 'চতুরঙ্গ'-এর শ্যুটিং শুরু হবে  
এপ্রিল থেকে।

কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের  
পরিবেশনায় প্রথম হিন্দী ছবি 'হাতীকে  
দাঁত'।

রবীন্দ্র খেরা প্রযোজিত এবং বহু  
আলোচিত পরিচালক বি-আর-ইশার  
লিখিত ও পরিচালিত রঙীন ছবি  
'হাতীকে দাঁত'-এর পূর্বাবল পরিবেশন  
শুরু গ্রহণ করেছেন কালিকা ফিল্মস  
প্রাইভেট লিমিটেড। ছবিটির নায়ক-  
নায়িকার ভূমিকায় আছেন রাফেল পাণ্ডে  
এবং আশা সচদেব। সংগীত-পরিচালনা  
করেছেন রবীন্দ্র জৈন।

এম-এস-এম প্রোডাকশন্স-এর 'অভিনয়'

পাঠকদের মরণ থাকতে পারে, এম-  
এস-এম প্রোডাকশন্স-এর ইন্টরন্য কলা  
তোলা ছবি 'অভিনয়'-এর মহরৎ হয়েছিল  
গেল স্বাধীনতা দিবসে টালিগঞ্জের  
টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। হাফীবেশ  
মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সহকারী অনিল  
ঘোষ পরিচালিত এই ছবির দর্শনীয় ধরে  
ঢানা শ্যুটিং হয়েছিল অক্টোবর মাসে ঐ  
টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতেই। এরপরে  
প্রযোজকরা দলবল নিয়ে বোম্বাই শহরে  
আসেন এবং ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই  
শহর ও শহরতলীতে বহির্দৃশ্য গ্রহণ  
করেন।

ছবিটির বিভিন্ন চারটে আছেন রাধা  
সালুজা, সমিত ভট্টা, রবি ঘোষ, ঔপল দত্ত  
ও শেখর চট্টোপাধ্যায়। 'অভিনয়'-এর চিত্র-  
গ্রহণ, সরবরাহনা ও সম্পাদনায় আছেন  
যথাক্রমে দিলীপজেন মুখোপাধ্যায়, মান-  
মোহন এবং হাফীবেশ মুখোপাধ্যায়।

পারিচালক-প্রযোজক রাজেন ভট্টাচার্য  
দৃশ্যনির্মাণ

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন ভট্টাচার্য  
তাঁর কিরণ প্রোডাকশন্স-এর নতুন ছবি  
'আজকী তাজা খবর'-এর মহরৎ করেন  
ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে বোম্ব



স্বাভাবিকভাবেই হাবিট প্রথম দল  
রেকর্ড করে। হসরৎ জরুরী রচিত খনি  
সংযোজনা করেছেন শব্দকর জরুরীকে  
এক সেরেছেন কিংগকুমার।

এদিনই তিনি টাউনব্যাপী একটানা  
শুটিংও শুরুর করেন। জনপ্রিয় গল্পরাটি  
নাটক "চাকডোল" অবলম্বনে হাবিট  
চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন এস,  
খলিল। হাবিট চিত্রশিল্পী ও শিল্পনির্দেশক  
হচ্ছেন বধাক্রমে কুক সাইগল ও বংশী  
চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন কিরণ-  
কুমার, রাধা সান্দ্রজা, পদ্মা খান্না, আই-এস-  
জোহর, আসরাণী, পেটোল, অপর্ণা  
চৌধুরী ও নরেশ্বরনাথ।

রাজেন ভাটিয়া তার দ্বিতীয় ছবি  
"জ্যোতিষী" শুরুর করবেন ২০ ফেব্রুয়ারী  
থেকে। যেদ রাহী লিখিত কাহিনী  
অবলম্বনে এই ছবিটি পরিচালনা করবেন  
বি-আর ইশারা।

কিরণ প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যান  
কলারে তোলা ছবি "জগলক্ষ্মী মঙ্গল"  
শুটির দিন গমনেছে। মালারাম লেখক  
ক-পি কোট্টারাকার লিখিত "রেস্ট  
: পি"-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত  
ছবিটিতে আছেন শৈবত-ভূমিকায় প্রাণ,  
কিরণকুমার, রাণী রায়, সোনিয়া সাহনী-  
প্রভৃতি।

মোহন ফিল্মস্-এর "অনুজ্ঞান রাহে"  
মোহন ফিল্মস্-এর নবতম নিবেদন  
অনুজ্ঞান রাহে-র এক নাগাড়ে কুড়ি দিন  
শুটিং হয়ে গেল পাঁচগিরি অঙ্গমান-এ-  
ইসলাম হাই স্কুলে। মোহন রচিত,  
প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন  
ভূমিকায় আছেন আশা পারেশ, ফিরোজ  
খাঁ, আকবর খাঁ, জহীরা, জালাল আগা,  
মনমোহন, জগদীশ রাজ, আসিত সেন  
প্রভৃতি। অতিথি শিল্পী রূপে অবতীর্ণ  
হয়েছেন কিরণকুমার এবং অচল্য মচদেব।  
ছবির চিত্রনাট্য রচনা, সংলাপপরিচালনা,  
সংলাপরচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও  
সম্পাদনা করেছেন বধাক্রমে নবেদু ঘোষ,  
কল্যাণজী আনন্দজী, সাগর সহাদি, এম-  
ডাবলু মৃদাদাম, এ আর কাকডা এবং  
এস. আর. সায়ন্ত।

#### আম্বকা চিত্রের 'মজিল'

আশিস বর্মণ লিখিত কাহিনী  
অবলম্বনে পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায়  
নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আম্বকা  
চিত্রের 'মজিল' ছবির জন্যে। রাজপ্রকাশ,  
জয় পাওয়ার ও রাজীব সূর্য প্রযোজিত  
এই ছবির চারদিনব্যাপী শুটিং হয়ে গেল  
সংপ্রতি জুহুর একটি বাংলোতে। এই  
শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন অমিতাভ  
বচন, মোসুমী চট্টোপাধ্যায়, জীর্মলা ভাট  
ও সত্যেন কাপুড়। ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও  
সংলাপ পরিচালনা করেছেন কে, কে, মহা-  
জন ও রাহুল দেববর্মণ।

#### 'নরনা'র চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত

শক্তি ইন্টারন্যাশনাল-এর 'নরনা' ছবির  
চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হল আটদিন-ধরে

কিশোরবর্মান ও কোমাস, মিনে শুটিংওতে  
শুটিং হওয়ার সশেষ সপ্তে। কনক শিল্পের  
পরিচালনাধীনে এ-ছবিতে অংশগ্রহণ  
করেছেন শশী কাপুড়, মোসুমী চট্টোপাধ্যায়,  
রোহমান, ভেঁড়িড, পদ্মা খান্না, করিনা  
খালিল এবং গজানন জাগীরদার। বদলাতাই  
শাহ প্রযোজিত ছবিটির চিত্রগ্রহণ, সংলাপ-  
পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন বধাক্রমে  
কে-এইচ কাপাডিয়া, শব্দকর জরুরীকে ও  
পি-জি সুপারে।

## বিবিধ সংবাদ

#### দক্ষিণ কলিকাতার নব নাট্যমঞ্চ

অনুমান বছর আঠাশ আগে দক্ষিণ  
কলিকাতার নাট্যাগোষ্ঠীদের জন্যে স্থাপিত  
হয়েছিল কলিকা থিয়েটার। কিন্তু কয়েক  
বছর চলবার পরে এখন এই থিয়েটারটি  
সিনেমার রূপান্তরিত হয়, তখন লোকের  
মনে ধারণা জন্মেছিল, দক্ষিণ কলিকাতার  
স্থায়ী থিয়েটার চলা সম্ভব নয়। এই

ধারণাকে দ্রাস্ত প্রতিপন্ন করতে পারেন  
প্রসন্ন মৃথোপাধ্যায় রোড ও রাসবিহারী  
অ্যাডভিনিউ-এর সংযোগস্থলের 'মিহুতা'  
গণকেন অবস্থিত মঞ্চ-অঙ্গণ। 'মিহুতা'  
প্রথমে এই মঞ্চে এককভাবে অভিনয় করতেন  
শৌভিনিক নাট্যাগোষ্ঠী। কিন্তু বর্তমানে  
শৌভিনিক সম্প্রদায় ছাড়াও বহু নাট্যাগোষ্ঠী  
এই মঞ্চে তাদের নাট্যাগোষ্ঠীর প্রদর্শন-কর্ম করে।  
কলে সাতাহের সব কটি দিনই মঞ্চ-অঙ্গণ  
নাট্যরাসিক দর্শকদের কান্ডে ভরে। কিন্তু  
মঞ্চ-অঙ্গণ কোমেন্টেই পরিপূর্ণ  
রংগাল পথচালা হতে পারে না। এম-না  
আছে একটি সুদৃশ্যত ও সুসজ্জিত নাট্য-  
পীঠ, না আছে একটি আরামদায়ক অঙ্গন-  
সমন্বিত সবুহ পূর্ণাঙ্গ স্টেজহাউস।  
কাজেই দক্ষিণ কলিকাতার একটি কল্যাণ-  
সুন্দর রংগাল গড়ে তোলবার কথা দেখ-  
ছিলেন শৌভিনিক নাট্যাগোষ্ঠীর পরিচালক-  
বৃন্দ বেশ কিছুদিন ধরে। সম্প্রতি তারা  
ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কর্মসূচীকে

## অনুপম আখ্যায়িকার অতুলনীয় সৃষ্টি

কামনার পাশব-শক্তি আর প্রণয়ের পবিত্র প্রতিমূর্তির নাটকীয় প্রতিবন্ধিতার  
গড়ে ওঠা নারী-হৃদয়ের রূপ-আধুরী.....

রাভেন্দ্র কুমার, হেমা মালিনী, মেখা

শব্দকর জরুরী

# গোরা ওর কাল



নবীন কুমার লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলান

জ্যোতি-জেম-দপণা-নবীন-প্রভাত-গণেশ

(প্রথম চারটি তাপ-নিয়ন্ত্রিত)

রূপালী-তসবীরমহল

আলোহা - মৃণালিনী - শ্যামলাল  
(বেলেঘাটা) (দমদম) (খিদিরপুর)

কল (মেটেবরুজ) - নারায়ণী (আলমবাজার) - লক্ষী (টিটাগড়)  
পুষ্পঞ্জী (বেহালা) - নবরূপ (হাওড়া) - নবজয় (হাওড়া) - পূর্ণাঙ্গী  
(কসবা) - শিবালী (শালিকিয়া) - রূপঞ্জী (ভাটপাড়া) - রাজকুমার (ইছাপুর)  
চলচ্চিত্র (কোমগর) - তটিনী (ভদ্রেশ্বর) - শিল্পী (শিল্পী)  
বন্দে (বন্দেপুর) - রে (কলকাতা) - জয় (মেদিনীপুর) - দীপক (বড়ুয়াপুর)  
অজনা (রাণীগঞ্জ) - চন্দ্রা (চাল)





১৯৬৬ সালের জুন মাসে ১২ কাঠা পল্লীভিত্তিক জীবন সারথ করে ভার ওপর জীবনসংগ্রহ শিল্পকলায় অদ্বৈতীর নামানুসারে 'শিল্পকলা' শব্দটির অন্য উদ্যোগী হয়েছেন। জীবন ইচ্ছা আছে, এই মণ্ডের সঙ্গে জীবন সারথ এবং অভিন্ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় প্রকাশনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি চলাচলের জন্যে উপযুক্ত স্বেচ্ছা-স্বাক্ষর করবেন। স্বেচ্ছা-স্বাক্ষর ইতি-মুহুর্তে প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা, ন্যাটো জীবনসংগ্রহ, শিল্পকলায় ন্যাটোজীবনসংগ্রহ প্রভৃতি ও এর অঙ্গীভূত। এই বিরাট পরি-কল্পনাকে রূপদানের জন্যে বহুশ্রম অর্থের প্রয়োজন। এক জায়গায় জন্মে তার বর্তমানে একটি ন্যাটোজীবনসংগ্রহ আরোজন করেছেন জীবন সারথ মণ্ডে। আমরা তাঁদের এই মণ্ডে প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সাক্ষ্য কামনা করি।

স্বাধীনতা সারথ

জীবন সারথসংগ্রহ কলামসিদ্ধে ১৬ জুন ১৯৬৬ সালে ৩.০০ টার মারিচ প্রকাশনা করবে। রচনা ও শিল্পকলা এ-আরও প্রকাশনা করবে।

## জলসা

সাংবাদিক সম্মেলনে আলি আকবর খাঁ

পাঁচ মাস আগে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সঙ্গে সাংবাদিক মহলের সাক্ষাৎ ঘটেছিল পার্ক হোটেলে—আর পাঁচ মাস পরে আবার আমরা তাঁর দেখা পেলাম—বালিগঞ্জ সাকুলার বোডে সর্ববিখ্যাত আইনজীবী শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রথমবার তিনি এসেছিলেন অসংখ্য পিতার চিকিৎসা ও শত্রুবার তদারক করতে। আর এবার:—

‘এবার বেশীর ভাগ সময়ই কটাবে মাইহারে। কারণ আমি এসেছি বাবার সমাধি-মন্দির সম্পর্ক করতে’—

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খাঁ সাহেব এই কথাই জানালেন।

কিন্তু শিল্পকলাসকদের হাত থেকে শিল্পী কোনোদিন রেহাই পান না। খাঁ সাহেবও পাননি।

পঞ্চ ২২তম জিল্লার জজ পি-সি-সেভেরী অন্যতম কর্মসিদ্ধ শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী ও সন্তত যোনের হৃদয় নেতৃত্বে রবীন্দ্র সননে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের একটি একক সরোদ বাদনের আলয়ের আরোজন করেন। অনুষ্ঠানের আহুত অর্থ দ্রুত পালিশ কর্মচারীদের পরিবারবর্গ, বিপ্লবী নিকেতন ও আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের তহবিলে দেওয়া হয়। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে উন্নত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে চেক অর্পণ করেন শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী। মানস্তু পাঠ ও প্রদানের দারিগ্র গ্রহণ করেন শ্রীমতী অরুণাভী দেবী এবং অনুষ্ঠানে শৌর্যোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

সাংবাদিক সম্মেলনে আলি আকবর খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করা হয়—দেশবাসীকে বঞ্চিত করে বিদেশে সংগীত শিক্ষাদানের কারণ কি?

‘এদেশে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ও প্রচারের জন্য অনেক গুরুশী শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ আছেন। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের সেবদর সঙ্গীতের নাদ সাগর-পারেও যেন শোঁছর। প্রধানতঃ সেইজন্যই আমরা এই কাজে রত হয়েছি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও এদেশে মনের মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর ওখানে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক কলকাতার ঐ নামের শিক্ষারতনেরই একটি শাখা। সারা শিক্ষায় আছেন—আশিস, সন্তীক শঙ্কর ঘোষ, চিত্রেশ দাস, জাকির হোসেন—এঁরা সবাই বাঙালী এবং ভারতীয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মতই গুরুর প্রতি প্রধানমুচিতে ওদেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করেন।’

খাঁ সাহেবের সঙ্গীত প্রচারের রত যে বার্ষ হয়নি, একাধারে ওদেশের শিক্ষার্থী, সমালোচক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিকোণ প্রত্যক্ষ করলেই সে সত্য স্পষ্ট হয়।

ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বাজানো অর্কেস্টার টেপ রেকর্ড সাংবাদিকদের বাজারে শোনান হয়। ‘আড়ানা’ রাগের ওপর প্রায় আধ ঘণ্টা বাজনা। পেভার, সরোদ, ঢেঁকো, গীটার, তবলা আরো নানারকর বাদ্যযন্ত্রে এই রাগভিত্তিক অর্কেস্ট্রা শুনে কে বলবে—এ বাজনা থেকেই ভারতীয় শিষ্য-শিষ্যাদের হাতে। খাঁ সাহেব এই অর্কেস্ট্রা পাটির নাম দিয়েছেন ‘সেকেন্ড মাইহার ব্যান্ড’।

দি নিউ ইয়র্কের জর্নক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সংক্ষেপে তাঁর ধারণা প্রশ্নে আলি আকবর কলেজ, বিটোজেন ও মোজার্ট আমার অতি প্রিয় শিল্পী। এঁদের রচিত সঙ্গীতধারা আমি সরোদে বাজিয়ে থাকি, ওনালি দি মেলোডিক অফ কোস’। ভায়োলিন এবং ঢেঁকো সাজাতেও আমার ভাল লাগে। আমার কথা যে চাইতেন দেশী-বিদেশী সবরকম উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতই আমি শিখি। তাঁর মন্ত হোলো এই যে পৃথিবীর সকল রকম সঙ্গীতকলা

সংগীতের আদর্শ আদার, সমাজিক-ধর্মিক-  
পূর্ণতা করত।

আমার পরিবারের মাঝে ছিলবে  
সংগীত আমার আদার ও জীবনের পরম  
সম্পদ। কেন আমি সংগীতকে ভালবাসি তা  
ব্যাখ্যা করে যেখানে আমার পক্ষে সম্ভব  
নয়। এ আমার ধর্ম—একে ভাল না বলে  
আমার উপায় নেই।

রবীন্দ্র সননে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ  
২২ ডিসেম্বর। রবীন্দ্র সননের পূর্ণ  
প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি প্রান্তে সঙ্কল্পে  
প্রতিষ্ঠা করছেন বহুদিন ব্যস্তে বঙ্গসংগীতের  
অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ওস্তাদ আলি  
আকবরের বাজনা শোনার জন্যে। শিল্পী  
আসরে এসে বসতে তাঁদের হৃৎপিণ্ড  
ধমকতেই চায় না। অমৃত্যু পারিবেশক  
শ্রোতৃপাতিব গালাগুলি জানাজান—সেদিনের  
সংগীত-সম্মা গুরু আলাউদ্দিনের প্রতি  
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত হচ্ছে। স্বর্গত  
গুরুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মদনমজরী দেবী (৯০  
বছর বয়স্কা) ঠিক এই কারণেই উপস্থিত  
ছিলেন। সামনের সারিতে বসা—ছোটখাট  
বল দানবটিকে দেখে অতীতের অনেক  
কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল গুরু  
আলাউদ্দিনের সুকঠোর সংগীত সাধনার  
নীতি ও একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন তিনি। হয়ত  
সেইদিনই দীর্ঘকাল সংসার সম্বন্ধে চিন্তা-  
বৃত্তি হয়ে সেই মহাসাধক তান সঙ্গীত-  
তপস্যায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন।

পিতা ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনাথেই  
আলি আকবর বাজনা শুরু করলেন  
'আলাউদ্দিন খাঁ সফট থ্রুহুবেহাগ' রাগ  
লিখ। কিন্তু রাগের অন্তর্নিহিত ভক্তগাভরা  
গোষ্ঠীতে ছড়ি পরতে না পড়তেই শিল্পীর  
হৃদয় ব্যাহত হয় মাইকেল অমায়িকতায়  
যাবৎসর সুরবিদ্যুতিতে, সর্বোপরি নতুন  
চমড়া লাগানো সরোদের অবাধ্যতায়। এত-  
গালি দর্বিপাকে বাজাবার মেজাজ পাওয়াটা  
যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু  
কালের ওপর অসাধারণ কর্তৃত্ব ও দীর্ঘ-  
কালের সাধনা-লব্ধ শ্রুতির বলে সব কটি  
মধ্যমকেই অনার্যসম্বন্ধ ছাড়তার অতিক্রম করে  
কোড়ের অগ্নে আলি আকবর জাবার ফিরে  
এগেন আপন জবিচলিত মানে। লক্ষণীয়  
কত্ব হোল এই যে, যন্ত্রের বিরোধিতার কারণে  
না যে জনাই হোক শিল্পী অলংকার, তেহাই  
প্রথা লম্বা তানকে সম্পূর্ণভাবেই এড়িয়ে  
গেছেন। ছোট তান ও হুপদী মেজাজের  
সম্পদ দিয়ে রাগের মর্বাদা-গম্ভীর ছবিটি  
এক গেলেন করেছটি আঁড়ের সীমিত  
পরিমারে। কিন্তু তার মধ্যে থেকে গেল যে  
অসীমের বাজনা তা রাসকীচকে অতিভূত  
না করে পারে?

গত ধরলেন 'মাক খানজা'—জ্যোৎস্না-  
লবিত রাতে কাজভোলা মাকির উদাস  
মাতের সুর, তাকে ঘাটির গম্ব লব মিলিয়ে  
শোকসংগীতের মূল রূপটি অসীমত রেখেও  
ক্রাসিক্যাল খাঁচে পরিমার্জিত করে আলি  
আকবর তার অভুলানীর বাদনশৈলীকে স্বরূপ  
করিয়ে দিলেন।

কিন্তু আলি আকবরীর ভাব ও সম্প্রদায়  
পূর্ণরূপে পাওয়া গেল ঐতিহ্যবাহী দরবারী  
কল্যাণের আশপাশে। এই রাজকীর রাগের  
সহিত বেদনার মর্বাদাযজ্ঞক ভাবটি দ্বি-  
সত্তক মীড়ের একটি অনুরণনেই মত হয়ে  
ওঠে। এরপর স্ব-সৃষ্ট একটি রাগের গহ  
পিতার উপশেষে নিবেদিত হোল। 'সাহানা'  
এ 'শাম্ভবতীর মিলন-সফট এই রাগে ভাব-  
কারুণ্যের সঙ্গে ছন্দের বিদ্যুৎগতি মত হয়ে  
জীবনের বেদনা ও আনন্দভরা পলাতক  
মহত্ত্বের কণিক মাধবলোকে যেন মনকে  
শোঁছে দেয়।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় রঙ্গমণি শিল্প-  
রাগাশ্রিত ঠেরি দিয়ে, যেখানে নানারঙা  
সুস্পন্দবকের মত আনন্দসুন্দর রাগ-  
মালা সংগীত লক্ষীর চরণে অঙ্গণ করলেন  
তার বরদনা ভক্ত। আলি আকবরীর  
রীতিতেই তার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় ভবলিয়ার  
পরিবর্তে সঙ্গত করেছেন তরুণ এবং  
উদীয়মান জাকির হোসেন। ইনি সম্মুখ  
আলারামখার পুত্র। খাঁ সাহেব এঁকে প্রশস্ত  
অবকাশ দিয়েছেন সকল কলাকৌশল বিশদ-  
ভাবে প্রদর্শনের। জাকিরের ঠেকা সুস্পষ্ট  
সুন্দর, সাধসংগত ও আনন্দদায়ক। তবে  
সওয়াল জবাবে তাঁকে আরো তৈরী হতে  
হবে। আর একটি কথা—আমোদপ্রিয়  
অনিভক্ত শ্রোতাদের হাততালি মিললেও এ  
ধরনের বাজনা অন্তর্মুখী সংগীত-চিন্তার  
প্রতিকূল। আলি আকবরের মত সিদ্ধনাদী  
বাজের সঙ্গে এ ঠেকা চলতে পারে এবং  
তার মত উদার-হৃদয় সর্বস্বরূপ চাপল্য  
সম্মেহে মেনে নেবার মত শক্তি রাখে। কিন্তু  
অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করতে হলে  
তাঁকে আরো বিবেচক ও সংযত হতে হবে।

নৃত্যনাট্যে আশা পারেশ ও গোপীকিশণ:  
সম্প্রতি কলামাসির আয়োজিত এক নৃত্যনাট্য  
কোমকাতার কলারাসিক মহলে এক চাঞ্চল্যকর  
ঘটনা। নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু ছিল লক্ষণ  
ভারতের এক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বিত  
'চোলা দেবী'। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীকানাই-  
লাল মুন্সী ও 'ধর্মকেতু'—নৃত্যরচনাকারী  
সবশ্রী গোপীকিশণ, মালতী পাণ্ডে, কেদার  
বালু প্রমুখ ভারতের প্রায় ২২ জন উচ্চাঙ্গ  
নৃত্যশিল্পী।

নৃত্যনাট্যের নায়ক নটরাজ গোপীকিশণ,  
নারীকা শ্রীমতী আশা পারেশ। জনতার  
উল্লেখ বাহুল্য। মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্যকুশলা,  
রূপান্বিতা দেবদাসী চৌধুরী রূপলবণা ও  
লীলায়িত ছন্দে মৃদু রাজা ও তার পারি-  
বারিক স্বদেশের সুরভেই শব্দস্বাক্ষর  
নগররক্ষার্থে তার বৃন্দবাহা, বিজয়, প্রত্যা-  
বর্তন ও রাজ্যের কল্যাণার্থে দেবদাসীর  
আত্মত্যাগ। এই ত্যাগই তাকে দেবীয়ে  
পৌছে দেয়।

কাহিনী রূপায়ণে যেটুকু প্রতিবিয়্যিত  
ছিল তার ক্ষতিগ্রস্ত ঘটেছে শ্রীমতী আশা  
পারেশ, গোপীকিশণ ও অন্যান্য সকলের  
মৃত্যুভিনয়ে। এরা সবাই শব্দ নৃত্য-

শিল্পি নন, বৃত্তান্তে বৃত্তান্তে  
রীতিমত শিল্পী  
কারী।

উল্লেখযোগ্য কথা হল, এই  
কোর্সে মিলন নেই। শিল্পীদের  
সারাই ভারতনাট্য, কলকাতা  
নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।  
মৃত্যু তার স্বাধীনতা

মন্দিরের মৃত্যুশিল্পী আশা পারেশ  
বেশক করেছেন ভারতনাট্য  
সঙ্গে প্রায় বিকল্প কথকে, কলকাতা  
নৃত্যে লোকনৃত্যের স্থানে। বঙ্গ  
সঙ্গে তার সুস্পষ্টতার মত  
হিলোল অনিশ্চয়ী। কিন্তু ভারতনাট্য  
লগেই লাস্যবিশিষ্ট কথকে  
মধুরভাবের নারীকা আশা  
যার না শব্দ নৃত্যস্বরভার জমা নয়  
কুশলতার কারণেও। প্রেমিক  
উল্লেখ্যতা জীবিত হয়ে উঠে  
কিশণের উচ্চল নৃত্যে। হৃদয়ের  
বিষয়তার চিত্রসাহী রূপে  
ভাগিতে।

পরিচয়-লিপি না থাকার সর্বস্বর  
জানি না। কিন্তু কাপালিক, রাণী ও  
প্রণয়ীর ভূমিকাকারীদের নৃত্যমানে দেখে  
মতিভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নৃত্যের  
বাংগালী শিল্পীরা আঁকত কত  
শিল্পের।

সংগীতপরিচালক অধিনায় কোপী  
ভূমিকায় চম্পুধোর, নাট্যভরব ও অন্যান্য  
রাজসভার দরবারী মেজাজ ও মন্দিরের ভাব-  
ভাবকে উদ্ভাসিত করেছেন। সঙ্গী  
কল্পনা আরো উন্নতমানের হওয়া উচিত।  
এই উপভোগ্য সম্মার অন্য  
কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ।

সংস্কৃতিকী হাওয়া: গত ৩ ডিসেম্বর  
১৯৭২, সম্মার 'সংস্কৃতিকী হাওয়া'  
১৫তম মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়  
সংস্থার কার্যালয় ১১, চৌধুরীপাড়া  
লেনে। অনুষ্ঠানে 'পরাভনী গান' পরি-  
বেশন করেন শিল্পী চণ্ডীদাস মাল। শিল্পী  
শ্রীমালের গাওয়া 'সে কেনে করে অপ্রাণী',  
'ওম্মরাবে হানেওরালে (শোনি মিল)' এবং  
'কেন কর অভিমানে' গানগুলো সবাই  
প্রশংসনীয়। সংস্থা এই উল্লেখ্যক  
একটি ছোট পদস্থিকা প্রকাশ করেন।

—সিদ্ধান্ত

মেডিও, মেডিওস, মেডিওস, মেডিওস  
ইনকিয়ার মেডিও ও মেডিওস, মেডিওস  
মেডিওস, মেডিওস, মেডিওস, মেডিওস  
ইভাফি নন্দ ও মেডিওস মেডিওস  
মেডিওস ও মেডিওস মেডিওস  
মেডিওস ও মেডিওস মেডিওস  
৩৬, মেডিওস মেডিওস, মেডিওস  
ফোন : ২৪৭১০০

INDIA				ENGLAND			
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

রাজ্য কোর্টের মধ্যে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার শেষ স্কোর বোর্ডের অবস্থা

# খেলাধুলা

দলিক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ভারত ২৮ রানে জিতে ইংল্যান্ডের অগ্রগতি ধরে ফেলেছে। বর্তমানে দুই দেশেরই একটা করে খেলায় জয়।



এক চন্দ্রশেখর

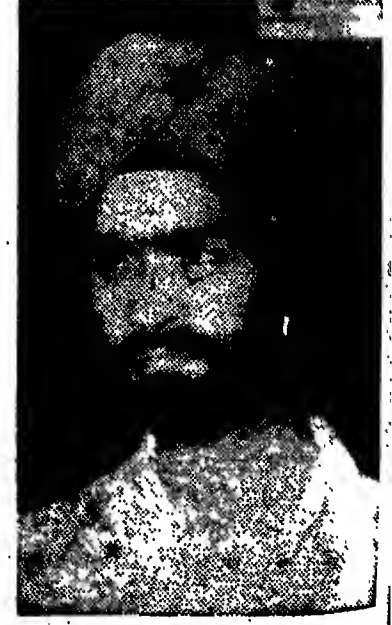
ইংল্যান্ড নয়াদিল্লীর প্রথম টেস্টে ৬ উইকেটে জিতে ১-০ খেলায় এগিয়েছিল। এই দুই দেশের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের এখনও তিনটে টেস্ট খেলা বাকি।

সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ডের এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি বেদী এবং চন্দ্রশেখরের ম্যাচ নামে ইংল্যান্ড-ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের জয়লাভের ব্যাপারে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বেদী এবং চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছিল সব থেকে বেশী। বেদী ৬৮ রানে ৫টি এবং চন্দ্রশেখর ৪২ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ৪র্থ দিনে লাগের ২৬ মিনিটে আগে ভারতের ২য় ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে যায়। এই অবস্থায় খেলার বাকি ৫৫৫ মিনিটে জয়লাভের জন্য যেখানে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসে ১৯২ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে ঐ সময়েরই মধ্যে ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ডের ১০ জন খেলোয়াড়কে আউট করা। অর্থাৎ খেলার এই শেষ পর্যায়ে জয়লাভের ব্যাপারে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান এবং ভারতের বোলারদের ভূমিকাই ছিল মূল্যবান। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা ভারতের বোলারদের তুলনায় তাঁদের সহজ দায়িত্ব স্বাভাবিক পালন করতে পারেননি। অপরদিকে ভারতের বোলাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের ১০টি উইকেট নিয়ে খেলার জয়লাভের ব্যাপারে বোলারদের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রশংসা করে দিয়েছেন। শেষ দুই দিনে নাটকীয়ভাবে খেলার গতি পরিবর্তনের দরুণ ক্রিকেট অনুসারীরা মহলে যে উত্তেজনা, উদ্বেগ এবং

আনন্দের ঝড় বয়ে গেছে তার তুলনা বিরল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ১৭ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেটের পতনের পর ৫ম উইকেটের ৩টিতে টিন গ্রীগ (৬০ রান) এবং মাইক ডেনেস (২৪ রান) ৮৮ রান তুলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার গতি ফিরিয়ে আনেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যান্ডের পূর্ব দিনের অপরাধিত ব্যাটসম্যান গ্রীস এবং ডেনেস যখন ২য় ইনিংসের খেলা পুনরায় আরম্ভ করেন, তখন ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্য আরও ৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে ভারতের জয়লাভের



বিক্রেত লি বেদী

জনো ইংল্যান্ডের বাকি ৬ জন খেলোয়াড়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আউট করুন। ফলাফল-কলমে খেলার হাওয়া ইংল্যান্ডেরই অনুকূলে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে বেদী এক চন্দ্র-শেখরের বোলিং-সাকসো ভারতের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে গিয়ে ভারতকে জয়বৃত্ত করে।

ভারতের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার টেস জিতে প্রথমেই কাট করার দান নিশ্চয়-ছিলেন। কিন্তু তার জন্য দলের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। ভারতীয় খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষামূলক খেলার ওপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। প্রথম উইকেট জুটি গাভাস্কার এবং পাকার ৮৮ মিনিট খেলে ১৫ ২৯ রান তুলেছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই অতি মন্থরগতিতে ব্যাট করার কোন সঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংল্যান্ডের বোলাররা কোন সময়েই জয়ফর মতি নিয়ে বল দেননি। তবে ইংল্যান্ডের ফিল্ডিং খুবই ভাল হয়েছিল, বিশেষ করে উডের। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লাইস বোলার পরিবর্তনের ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের লাগের সময় ভারতের রান ছিল ৫৩ (১ উইকেট) এবং চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ১১০ (৫ উইকেটে)। প্রথম দিনের ৩২০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৪৮ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সোল্কার (১৯ রান) এবং ইঞ্জলিয়াস (২৬ রান)। তাঁদের অসমাপ্ত ২২ উইকেটের জুটিতে এইদিন ৪৮ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে লাগের ১৫ মিনিট আগে ভারতের ১ম ইনিংসের খেলা ২১০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনে তারা ৩৪ ৫টা উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১৬৮ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ৬২ রান যোগ করেছিল। ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৫ রান করেছিলেন উইকেটরক্ষক ব্যাটস-ম্যান ফারুক ইঞ্জলিয়াস। তাঁর এই ৭৫ রান ছিল ১০টা বাউন্ডারী।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ডের ৬টা উইকেট পড়ে মাত্র ১২৬



রাজি স্টেডিয়ামে ভারতের জয় : মাঠে দশকদের বন্যা নামার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে খেলোয়াড়রা ছুটেছেন

রান উঠেছিল। অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার অসুস্থ থাকায় এই দিনে খেলতে নামেননি। তাঁর বদলে ফারুক ইঞ্জলিয়াস দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। ইঞ্জলিয়াস খুব তাড়াতাড়ি বোলার বদল করায় ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা হাত জমিয়ে খেলার সুযোগ পাননি। তাঁর এই বোলার বদলের কৌশলে ইংল্যান্ডের ৬ জন খেলোয়াড় খেলা থেকে ব্রিঙ্ক নিষেধিত।

তৃতীয় দিনে লাগের ২৫ মিনিট আগে

ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ১৭৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৩৬ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৩৬) করেন তাদের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান অ্যালান নট। দলের কনিষ্ঠ খেলোয়াড় রিচি ওল্ড ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ১২১ রান সংগ্রহ করেছিল। সের্বিন দ্বানানী ২০৪ মিনিট খেলে তাঁর অপরাজিত



পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে ভারত এবং ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়বৃন্দ



এই দুই দলের মধ্যে কলকাতার প্রায় ১০০ জনের মাধ্যমে শেষ হয়ে। এই দিন তারা ১৪ মিনিট খেলে ২য় ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে মাত্র ৩৪ রান যোগ করেছিল। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৩২৪ মিনিট স্থায়ী ছিল।

৩য় দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস মাত্র ১০৫ রানের মাধ্যমে শেষ হয়। এই দিন তারা ১৪ মিনিট খেলে ২য় ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে মাত্র ৩৪ রান যোগ করেছিল। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৩২৪ মিনিট স্থায়ী ছিল।

বাকি ৫৫৫ মিনিটের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১২ রান তুলতে ইংল্যান্ড ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪র্থ দিনেই ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৫ রান তুলে নেয়। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের খেলার ভিত্তি খুবই আলগা হয়েছিল। মাত্র ১৭ রানের মাধ্যমে তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। বেদী ৩৮ রানে ৩৫ এবং আবিদ আলি ১২ রানে ১টা উইকেট পান। খেলার এক সময় বেদীর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ওভার ৬-৪, মেডেন ৪, রান ৪ এবং উইকেট ৩। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের আর মাত্র ৮৭ রান দরকার। তাদের হাতে তখনও ৬টা উইকেট এবং একদিনের খেলার সময় জমা আছে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে লাগের ৬ মিনিট পর ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ১৬৩ রানের মাধ্যমে শেষ হলে ভারতবর্ষ ২৮ রানে জিতে যায়। ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১২ রানের থেকে ২১ রান কম সংগ্রহ করেছিল। পঞ্চম দিনে খেলা

ভারতবর্ষ ৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তারা বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

#### সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ২১০ রান (ওয়ারদেকার ৪৪ এবং ইজিনার ৭৫ রান। কোট্রাম ৪৫ রানে ৩, ওন্ড ৭২ রানে ২ এবং আন্ডারউড ৪৩ রানে ২ উইকেট) ও ১৫৫ রান (দুরানী ৫০ রান। ওন্ড ৪০ রানে ৪ এবং গ্লিগ ২৪ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ১৭৪ রান (নট ৩৫ এবং ওন্ড নট আউট ৩৩। চন্দ্রশেখর ৬৫ রানে ৫, প্রসন্ন ৩৩ রানে ৩ এবং বেদী ৫৯ রানে ২ উইকেট) ও ১৬৩ রান (গ্লিগ ৬৭ এবং ডেনেস ৩৩ রান। বেদী ৬০ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৪২ রানে ৪ উইকেট)

#### অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান

##### প্রথম টেস্ট খেলা

এডিলেডে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনে পাকিস্তান ১ম ইনিংসের ৭ উইকেট খুইয়ে ২৫৫ রান সংগ্রহ করেছিল। ৭ম উইকেটের জটিলে অধিনায়ক ইমতিয়াজ আলম এবং উইকেটকিপার ওয়াসিম বারি দলের ১০৪ রান তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ২৫৭ রানের মাধ্যমে শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ৩৬৩ রান সংগ্রহ করে ১০৬ রানে এগিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার আয়ান চাপেল যে ১১৬ রান করেন তা তার টেস্ট খেলায়াজ-জীকেনে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। এই

দিনে তিনি তার কোমর ভাঙে পড়েছিলেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৫৮৫ রানের মাধ্যমে শেষ হলে তারা পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের ২৫৭ রানের থেকে ৩২৮ রানে এগিয়ে যায়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের ১ম ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ২২২ রান যোগ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার রডনি মার্শ ১১৮ রান করেন। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপারের পক্ষে সেগুরী করার নজির এই প্রথম।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান ২য় ইনিংসের ৩৫ উইকেট খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২১৪ (৯ উইকেটে)। এইদিন তারা ৬ উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১১১ রানের (৩ উইকেটে) সাথে ১০৩ রান যোগ করেছিল।

পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২১৪ রানের মাধ্যমে অর্থাৎ পূর্ব দিনের রান-সংখ্যার মাধ্যমে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে জিতে যায়। শেষ দিনে মাত্র ১ মিনিট খেলা হয়েছিল।

#### সংক্ষিপ্ত স্কোর


পাকিস্তান : ২৫৫ রান (ইমতিয়াজ আলম নট আউট ৬৪ এবং ওয়াসিম বারী ৭২ রান। মাসী ৬৯ রানে ৪ উইকেট) ও ২১৪ রান (সাদিক মহম্মদ ৮১ রান। ন্যালাট ৫৯ রানে ৮ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৫৮৫ রান (আয়ান চাপেল ১১৬, রডনি মার্শ ১১৮ এবং এড-ওয়ার্ডস ৮৯ রান। মুস্তাক মহম্মদ ৬৭ রানে ৩ উইকেট)

#### দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৯২ রানে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এডিলেডের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১১৪ রানে জয়ী হয়েছিল। তাদের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের আর একটা খেলা বাকি।

খেলার পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪২৫ রানের মাধ্যমে শেষ হলে পাকিস্তান জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৩ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। তাদের হাতে খেলার সময় ছিল ৩২৫ মিনিট। পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২০০ রানের মাধ্যমে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৯২ রানে জিতে যায়।



## এস্ট্রোজেন

কার্যকর ভিটামিন (জিঃ)

কার্যকর, শোব, চর্চাভূত বা, পোড়া বা পোড়ার বা, প্রচুতি কটিন পিড়া কেমন লাগাইলেই সারিয়া যায়।

নিম্নে এই বিনা অস্ত্র বোজাতি

লিটম এক কোঃ কলিকাতা-১০

অস্ট্রেলিয়ার প্রাইভেট লিঃ-এস পক্ষে প্রিন্সিপাল সরকার কর্তৃক পাঠকা প্রেল, ২৪, আনল চ্যাটার্জ সেন, কলিকাতা-৩ এইভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত ১১১১, আনল চ্যাটার্জ সেন, কলিকাতা-৩ এইভাবে প্রকাশিত।



# নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

## লেখকদের প্রতি

- ১। অমৃত প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। অন্যান্য রচনার খবর দ্যমাসের মধ্যে জানান হইবে। অমৃতনীতি রচনা কোনক্রমেই কোন পঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।
- ২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যিক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।
- ৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে 'অমৃত' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টসী নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কাবালরে পর দ্বারা জ্ঞাতব্য।

## গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কাবালরে সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক।
- ২। তি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অভ্যর্থনায় 'অমৃত' কাবালরে পাঠানো আবশ্যিক।

## চাঁদার হার

	কলিকাতা	অন্যান্য
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শক্তির হার	
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)	
বার্ষিক	টাকা ১.০৫
ষাণ্মাসিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

## 'অমৃত' কাবালর

১১/১, আলফা টাউন সেন,

কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-৬২৩১ (১৪ লাইন)

১২নং

৩৭

অমৃত

৩৭ সংখ্যা

মূল্য—৫০ পয়সা

বকে—২ পয়সা

মোট—৫২ পয়সা

Friday, 19th January, 1973

শুক্রবার, ৫ জানু, ১৩৭১

.52 Paise

পৃষ্ঠা-বিষয়	লেখক
৮৬৮ একনজরে	—শ্রীপ্রভাতকান্দী
৮৬৯ সম্পাদকীয়	
৮৭০ দেশবিশেষে	—শ্রীপদ্মডরীক
৮৭০ রক্ত ও শব্দের মানদণ্ড	(গল্প) —শ্রীভুলসী সেনগুপ্ত
৮৭৬ ধ্বংস বেল গোলা	—শ্রীসাবিতা সেনগুপ্ত
৮৮০ কখনো দিন, কখনো রাত	(উপন্যাস) —শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৮৮৮ সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅভ্যর্থকর
৮৯০ পদ্য	—শ্রীকপক
৮৯৫ ইতিহাসের নাকী	—শ্রীশ্যামল পাঠক
৯০০ মধ্যপথে	(কবিতা) —শ্রীগোবিন্দ মৃধোপাধ্যায়
৯০০ রৌদ্রে অনাগের	(কবিতা) —শ্রীশুভ মৃধোপাধ্যায়
৯০০ নিষ্ঠুর রাবণ, তুমি	(কবিতা) —শ্রীরাজত সরকার
৯০১ কল কোটার আগে	(উপন্যাস) —শ্রীশৈলেন রায়
৯০৭ প্রদর্শনী	—শ্রীপ্রণবরজন রায়
৯০৯ চন্দ্রাবতীর প্রেম	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৃধোপাধ্যায়
৯১১ বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ
৯১৪ শীতের চিড়িয়াখানার	—শ্রীশুভকর পাঠক
৯১৯ এক জনমের নয়	(গল্প) —শ্রীগোষ্ঠ শেঠ
৯২০ অঙ্গনা	—শ্রীপ্রমীলা
৯২৫ বয়স	—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৯২৭ শিল্পকলায় খিরেট	—শ্রীদিলীপ মৌলিক
৯২৮ বাঙালী মনীষীর নাট্যাভিনয়	—শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত
৯৩০ চিঠিপত্র	
৯৩১ চাকর হাফাফি	
৯৩৪ প্রেকাগুরু	—শ্রীনান্দীকর
৯৩৯ জলসা	—শ্রীচিহ্নাঙ্গদা
৯৪১ শ্যামলী ভারতের খেলাধুলা	—শ্রীকমল গঙ্গোপাধ্যায়
৯৪৩ খেলাধুলা	—শ্রীদশক

## দশম সংস্করণ বাহির হইল !

জেনারেল প্রিন্টার্স গ্র্যান্ড পার্বলশাস প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

## COMMON WORDS

॥ অসংখ্য ভাবের সাধারণ শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাপনাই ছোটদের জন্য অভিভাব সচিত ইংরেজি-বাংলা অভিধান ॥

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

॥ জেনারেল বুকস ॥ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট হাউস, কলিকাতা-১৯

# এক নজর

প্রেমিক সৈনিক :

ভূবারাধন প্রান্তরের নীচে হিমশীতল পরিখার অভ্যন্তরে যে দুর্ধ্ব সৈনিক ক্রান্ত বিষম মৃদুতে প্রেমসী জীবনসংগীনের প্রেমসুন্দর মৃদুখানি কল্পনা করে উল্লসিত হতে পারে, সশ্রেণে প্রেমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই ব্যক্তি যে অসাধারণ ভাঙে সন্দেহ কি? আর অসাধারণ বলেই না স্যার উইনস্টন চার্চিল ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। সম্প্রতি লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক, বৃটেনের তিমির রাষ্ট্রের জতন প্রহরী উইনস্টন চার্চিলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ক্রান্তের রক্তচক্রের এক পরিখা থেকে পত্নী শ্রীমতী ক্রেমেন্টাইনকে লেখা যে পত্র ক'খানি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই যোদ্ধা রাষ্ট্রনায়কের চরিত্রের আর একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে।

বৃটেনের তখন এক ভীতির সময়। শীতাত 'ক্রান্তের এক অজ্ঞাত প্রান্তরে কদমাজ পরিখার অভ্যন্তরে শত্রুর প্রতীকার অপেক্ষা করছেন তরুণ সৈনিক উইনস্টন চার্চিল। নজর শত্রুর আশঙ্কিত আগমনের পথের দিকে নিবন্ধ থাকলেও মন পড়ে আছে প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী ক্রেমেন্টাইনের কাছে। তিনি লিখছেন : প্রিয়তমাসু, নারীর হৃদয় যে কত কোমল ও প্রেমময় হতে পারে তা তোমার সম্পর্কে এসেই জেনেছি। তুমি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ, তাই আজ এত সুখী আমি।

প্রেমিক সৈনিক অকপটে জানাচ্ছেন : প্রতি রাতে তোমার ছবি আমি চুম্বন করি, আর প্রাণাধিকাসু, তার পরেই ভাবি যদি তুমি কাছে থাকতে তবে চুমোর চুমোর তোমার মিলিত মৃদুখানি ভরিয়ে দিতাম।

অভিযোগও আছে অনেক চিঠিতে, সে অভিযোগ ভুলে থাকার, চিঠি না দেওয়ার। অভিমানকুণ্ড প্রেমিক সৈনিকের জিজ্ঞাসা—পরিখার বন্দী স্বামীকে রোজ গুট গুট চিঠি না লিখে তুমি কেমন করে থাকতে পারো? তারই মধ্যে, ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে ক্রেমেন্টাইন (দয়াকরী) যখন লিখলেন—সময় চলে যায় আর প্রেমের সবটুকু চুরি হয়ে যায় সেই সঙ্গে, পড়ে থাকে শত্রু বন্দু—তখন অভিমানহীন স্বামীর সে কী আত্ম প্রতিজ্ঞা : ওগো প্রিয়তমা, তুমি বন্দুকের কথা লিখোনা, আমি তোমার 'বন্দু' চাই না। তুমি সম্পূর্ণরূপে শত্রু আমার। তোমার আমার প্রেম সমস্ত চুরি করে নিস বেতে পারবে না। বর্তমানে যাবে সে প্রেম ততই হবে গভীর ও ফনীভূত।

পরিলভ বয়সে, পূর্ণ মর্যাদার স্যার উইনস্টন চার্চিল ১৯৬৫ সালে শের্মান্সবাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সেই ইতিহাস-পুরুষের স্মৃতিতে বিদ্যোতক হয়ে তাঁর প্রিয়তমা ক্রেমি—লর্ডি স্পেন্সার চার্চিল আজও জীবিত আছেন। তাঁরই অনুমোদনক্রমে 'টাইমস' পত্রিকার চার্চিলের পত্রগুলি প্রকাশিত হয়।

কল্পনাময়ী :

মৃত সন্তান বীশ্বর ক্রান্ত এলারিত দেহ কোলে নিয়ে সাগ্রহ নরসে, নতনয় মৃখে বসে আছেন কল্পনাময়ী জননী মেরী,—ভ্যাটিকান প্রাসাদে সংরক্ষিত মাইকেল এঞ্জেলোর সেই অবর সৃষ্টি 'পিয়েতা' কিছদিন আগে এক উদ্ভানের কঠিন আঘাতে কতবিকৃত হয়ে ভেঙে পড়েছিল। সে উদ্ভানের ধারণা ছিল সেই

বীশ্ব, স্মৃতরাং কল্পনাময়ী (পিয়েতা) জননীর কোলে স্মানলাভের অধিকার তারই। তাই সে অভিমানকুণ্ড হয়ে এমন আঘাত হেনেছিল যাকে যে বিশ্ববাসিত এই স্মৃতিটি হরত চিরকালের জন্য মানবজাতির স্মৃতিভাণ্ডার থেকে অপসৃত হল বলে আশঙ্কা হয়েছিল সৈনিক।

কিন্তু কদিন আগে ভ্যাটিকান প্রাসাদ থেকে এক সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে। সংবাদ শুনে মনে হচ্ছে, এই উদ্ভাদটি বোধহয় ভাল কাজই করেছিল সৈনিক। ভ্যাটিকান প্রাসাদের সংরক্ষক জানিয়েছেন, স্মৃতিটি শত্রু বৈদ্যুতিনভাবে সারাদো হয়েছে তাই নয়, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে স্মৃতিটির আরও যেসব দৃষ্টিবহুত প্রকট হয়ে উঠেছিল সেগুলিও এবার ভাল করে সংশোধিত করা হয়েছে। ফলে স্মৃতিটি যারা আগে দেখেছেন তাদের পরিমার্জিত স্মৃতিটি বোধহয় আরও ভাল লাগবে এবং যারা দেখেননি তাঁদের শাস্বত ভাস্করের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি প্রথম দর্শনের মৃদু চমক হরত আরও বেশি হবে। তবে ভবিষ্যতে আবার যাতে কোন অঘটন ঘটতে না পারে তার জন্য এবার উনিশ মিলিমিটার পুরু বুলেট-অভ্যন্তরীণ ক্রীড়ের আড়ালে স্মৃতিটিকে রাখা হবে।

আবার মৃদুদন্দ : জীবনের কালে জীবন—এই পদ্যদো তবু অত্যন্ত প্রতিশোধাত্মক ও অমানবিক বিবর্তিত হওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিছক হত্যাকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমার্জিত জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধেরও চরিত্র বদল হতে থাকায় মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ লোপ সম্ভব কিনা—এ নিয়ে মত বিরোধ ঘটে সমাজতাত্ত্বিক মহলে। এমন অনেক অপরাধ ইদানিং প্রায়ই ঘটেছে বা সাধারণ হত্যাকাণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ও গুরুত্বপূর্ণ, এক যাকে কোনমতেই ক্ষম করা যায় না। এইসব অপরাধের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল বিমান হিনতাই। মৃদুদন্ত রাজনৈতিক কারণে যারা বিমান হেনতাই-র মতো ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত হয় তারা অবশ্য প্রাপ্তের মারা না পেলেই সে কাজ করে। কিন্তু যদি মৃত্যুদণ্ড রদের ঢালাও বিধানের মধ্যে বিমান হিনতাইকারীদের অপরাধকেও গণনা করা হয় তাহলে বিমান-পথে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়বে, বা এখনই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্প্রতি বিমান হিনতাইকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করার কথা সরকারিভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

মৃত্যুদণ্ডের সুপ্রীম কোর্ট গত জুন মাসে মৃত্যুদণ্ডকে সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষণা করে। তারপর বিভিন্ন জেলে আটক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তিন, শতাধিক ব্যক্তির দণ্ডভান স্মরণিত রাখা হয়। কিন্তু গত নভেম্বর মাসে মৃত্যুদণ্ডে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের কোর্ট রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের বেশভাগই এখনও মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পক্ষে। মৃত্যুদণ্ডের এটর্নি জেনারেল কদিন আগে ঘোষণা করেছেন, মান্দ্র অপহরণ, সরকারি ভবনে বোমা নিক্ষেপ, বিমানহিনতাই ও কারারক্ষী হত্যাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে শীঘ্রই মৃত্যুদণ্ডে একটি আইন প্রণীত হবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

# সম্পাদকীয়

## বিজ্ঞান গবেষণার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি সমাজজীবনে বৈশ্বিক রূপান্তরের সূচনা করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ বহুদূর পশ্চাদগামীতা দূর করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এনে দিয়েছে। পশ্চিমী ভাগে বিজ্ঞানীরা নিতানতুন জিনিস আবিষ্কার করে জনকল্যাণের জন্য তার প্রয়োগ করছেন। তার যানিকটা সুফল অনুন্নত দেশগুলোতেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অপূরণের দুঃখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজস্ব পরিবেশে প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানীরা যদি তাঁদের গবেষণার ফল দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারেন তাহলে সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম হবে।

আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা নিতান্ত কম দিনের নয়। আমাদের বিজ্ঞানীরা পরাধীনতার যুগেও স্বাধীন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন নানাকক্ষে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ, ডাঃ হোমি ভাবা, বিক্রম সরাসাই, প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা দুনিয়ার বিজ্ঞানীসভার মহৎ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের দেশ দরিদ্র। তার প্রয়োজন বহুটা আর্থিক সাধ্য তার চেয়ে কম। তার ফলে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা ব্যয় করতে পারি না। জওহরলাল নেহরুর সময়ে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সরকার অগ্রণী হয়ে দেশের নানা জায়গায় বিজ্ঞান গবেষণাগার গড়ে তোলেন। সি এম আই আর এ-র মারফৎ তরুণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে নিতানতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের জন্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অর্থব্যয় করতে না পারায় বিজ্ঞান গবেষণার যথেষ্ট অগ্রগতি এখনও হয়নি। অনেক তরুণ বিজ্ঞানকর্মী স্বদেশে ভাল সুযোগ না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে হারা গবেষণারত তাঁদের আমরা স্বদেশে আনতে পারছি না। অবশ্য জল্পনাবিহীন নারলিকারের মতো খ্যাতিনামা তরুণ বিজ্ঞানী স্বদেশ সেবার জন্য ভারতে ফিরে এসেছেন, এটা খুবই আশার কথা। এদের মতো বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দেশ অনেক আশা করে। তাঁদের কাজের জন্য চাই অবাধ সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ।

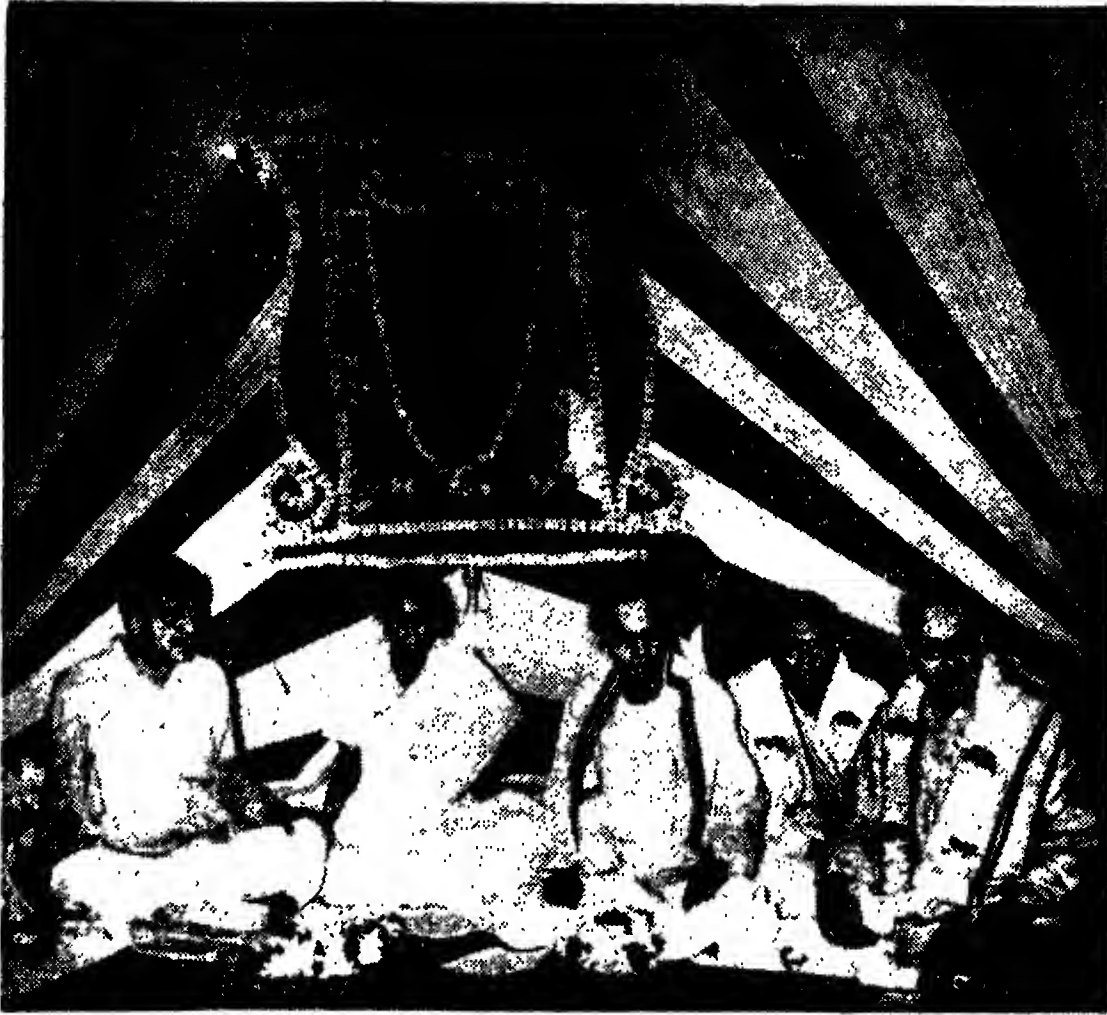
কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম বোজনার বিজ্ঞান গবেষণার জন্য জাতীয় আরের অন্তত এক-শতাংশ ব্যয়ের বে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা খুবই সমরোপযোগী এবং আশাবাজক। এতকাল সরকারী ভাণ্ডার থেকেই বিজ্ঞান গবেষণার জন্য কম করা হত। বেসরকারী সংস্থায় ব্যয় ছিল সামান্য। বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষত্রের মন্ত্রী প্রীতি সূত্রমাস্থ জানিয়েছেন, পঞ্চম বোজনার বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বড় বড় ব্যবসায় সংস্থাগুলো উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কর বসাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত বৃহৎ ব্যসায় সংস্থাগুলোকেই এই উন্নয়ন কর দিতে হবে। এতে সরকারী রাজস্ব বাড়বে আনুমানিক তিনশো কোটি টাকা। এই অর্থ একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা হবে। যে সমস্ত কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়নকর্ম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তারা এই অর্থের ভাগ পাবেন তাঁদের কাজ চালিয়ে বাবার জন্য। শিল্পোন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় আরের এই অর্থ ব্যয় করা হবে। সমাজের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগই হবে কাম্য। ভারতবর্ষের সমাজের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সুগোপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সচেতন থাকতে হবে।

কাস্তব অকথা থেকে বিজ্ঞান হলে গবেষণা হবে অর্থহীন। আমাদের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশ্বিক পরিপূর্তন ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে কথাব্যবহারে কাজে লাগানো হবে না। সম্প্রতি চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ এম ভগবন্তম দ্ব্যর্থ করে বলেছেন যে, উদ্ভোধনের দিনে চার হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও, পরে মাত্র ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সময়। বিজ্ঞান কংগ্রেসকে যদি নিছক মেলার মতো ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিনিধিরা একে বেড়াবার সুযোগ হিসাবে গণ্য করেন তাহলে দেশবাসী এ ধরনের সম্মেলন থেকে কী আশা করতে পারে। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্মেলনে বে-সমস্ত গবেষণাপত্র পড়া হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল নিচু মানের এবং দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। বিজ্ঞানীদের কাছে দেশের মানুষের প্রত্যাশার অস্ত নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মতো মৌলিক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের প্রত্যাশা আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছে নিশ্চরই দেশবাসী করতে পারে। তা ছাড়াও বিজ্ঞানের প্রয়োগ কীভাবে সমাজ উন্নয়নে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে করা যায় তার নির্দেশ দেশবাসী চায় বিজ্ঞানীদের কাছে। কেতাবী বিদ্যা বা গবেষণার চেয়ে ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাই আমাদের দেশে বেশি জরুরি। সর্বোচ্চ বৃহৎ শিল্পবৃক্ষে আমরা পা দিতে পারছি। কোথায় কোন শিল্পের সম্ভাবনা বেশি সে তথ্য আমরা চাই বিজ্ঞানীদের কাছে। বস্তুর পাশাপাশি জনবল কীভাবে ব্যবহার করা যায় তাও বিজ্ঞানীরা আমাদের বলে দিতে পারেন। কারণ পশ্চিমী দেশগুলোর মতো স্বয়ংক্রিয় বাস্তবিক উৎপাদনের চেয়ে আমাদের জনসংখ্যাকে কাজে লাগানো সামাজিক অবস্থা বিচারে খুবই প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আমাদের নিজস্বতা বিকাশের সময় এসেছে। পশ্চাভ্য দেশ থেকে ধারণ-করে-আনা বাস্তবিক কারিগরীজ্ঞান দিয়ে দীর্ঘদিন আমাদের কাজ চলতে পারে না। প্রযুক্তিবিদ্যার ভারতকে নিজের পারে দাঁড়াতে হবে যাতে আমাদের সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা আমরা প্রয়োগ করতে পারি সামাজিক কল্যাণে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ কাম্য।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে পট্টিকা ভবনে আয়োজিত বৈষ্ণব সম্মেলন ও স্মৃতিসভায় (ডান-দিক থেকে) উদ্বোধক প্রভুপাদ শ্রীধীরেশ্বরনাথ গোস্বামী, কবি পান্না মাইতি, সভাপতি ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী ও শ্রীতুষ্ণাকান্তি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে।

## ড্রাগ বিড্রাগ



মহারাষ্ট্রের মায়াঠাওয়াড়া অঞ্চলে ১৯৬৯ সালে খুব ভাল ফসল হয়েছিল। তবুও কুড় কর্পোরেশন আশা করেছিলেন, সে বছর ঐ অঞ্চল থেকে দু' লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেন তার পরিমাণ আট লাখ টন, অর্থাৎ প্রত্যাশার চারগুণ।

আশঙ্কিত কিছদ নেই যে, মনমাদ শহরে কুড় কর্পোরেশন তৈরি করেছিলেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তদৈব বৃহত্তম গদ্যদাম।

আজ যদি কেউ সেই মনমাদ শহরে যান তাহলে তিনি কি দেখতে পাবেন। সন্দেহ নেই, তিনি দেখতে পাবেন একটা ভয়ংকর আকালের ছায়া। মনমাদের সেই গদ্যদামে আজ কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের সঞ্চয় রয়েছে তা জানা নেই, তবে মাত্র তিন বছর আগে যেখানকার মানুষ মাঠভরা ফসলের হাসি দেখেছিলেন সেখানে আজ অমের জনা হাহাকার উঠেছে। কোথাও দু'বছর, কোথাও তিন বছর আকাশে কুণ্ডি নেই, মাটিতে রস নেই, গ্রামের মানুষের ঘরে

খাবার নেই, কাজ নেই, পানীর জল নেই। হাজার হাজার গরু, জল ও খাবারের সংস্থানে অসহায়ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। কাজের ও খাদ্যের সংস্থানে শহরে চলে আসছেন গ্রামের মানুষ।

শুধু মহারাষ্ট্রই নয়, গুজরাট, রাজস্থান, মহীশূরে প্রভৃতি রাজ্যেও অমের জন এই হাহাকার উঠেছে। সরকারিভাবে কোথাও 'দুর্ভিক্ষ' কথাটা কান ও উড়ান

করা হচ্ছে না তাহলেও অবস্থাটা যে খুবই কঠিন সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক পক্ষকালের মধ্যে সাতটি রাজ্যে ভ্রমণ করে এই ভরৎকর আকালের চির মধ্যে এসেছেন। সফর থেকে ফিরে এসে পোলিশ বেতারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে খরার প্রকোপ চলেছে। তিনি হৃদয়শূন্য করে দিয়েছেন যে, সামনে খুবই দুর্দিন আসছে। এবারকার খরার শিকার হয়েছে গোটা এশিয়া। তাই অন্য দেশ থেকে খাদ্যসম্পদ সংগ্রহ করা ভারতের পক্ষে কঠিন হচ্ছে—একথা শ্রীমতী গান্ধী মনে করিয়ে দিয়েছেন।

মহারാষ্ট্রের প্রায় দুই কোটি মানুষ এই খরার কবলে পড়েছেন বলে প্রকাশ। কমরও ব্যরও মতে স্মরণকালের মধ্যে মহারাষ্ট্রে এত ভরৎকর দর্শনিক ভয় দেখা যায় নি। সরকারি হিসাবে, রাজ্যের ২৬টি জেলার মধ্যে ২১টি অর্থাৎ ৩৫,৬০০ গ্রামের মধ্যে ২৭০০০ গ্রামে দারুণ অসুস্থতা দেখা দিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের বেসক জেলা আকালের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল আমেদনগর। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের রাজস্বমন্ত্রী আম্রাসাহেব সিংহ এই আমেদনগরের অধিবাসী। তিনি যখন সারা দেশের মানুষকে এই বলে অভয় দিচ্ছেন যে, যথেষ্ট খাদ্যসম্পদ আছে, বিদেশ থেকে আরও আমদানি হচ্ছে এবং কৃষি ফসলের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল তখন তাঁর নিজের জেলার সাতটি তালুকের মানুষ অসুস্থতায় পীড়িত হচ্ছেন—এটা ঘটনার পরিহাস।

ওসমানাবাদ জেলার ২৮ বছর বয়স্ক ভরৎকর কেশবরাও সিংহ এখন বোম্বাইয়ের এক বস্তির বাসিন্দা। শহরের নীরম্যান প্যারেন্ট তিনি ইমারতি মালমশলা নামান-কর্মের কাজ করছেন। অথচ, সম্পন্ন চাষী হিসেবে বা বোকার কেশবরাও ভাই। কেননা, আম্রাসাহেব তাঁর জমির পরিমাণ ১৫০ বিঘা।

৬০ একর জমির মালিক অমরচাঁদ আম্রাপের ভিনটে কয়েক (তার মধ্যে দুটিতে বৈদ্যুতিক মোটর লাগান আছে) কোনটিতেই এক ফোটা জল নেই। এখন তাঁর পরিবারের ১৯ জনের মধ্যে ছয়জন সরকারি গ্রান প্রকল্পে পাখর ভাঙার কাজ করছেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার বেসরকারি প্রকল্প চালু করেছেন। পানিলির মধ্যে প্রধান হল এই পাখর ভাঙার কাজ।

একজন সাংবাদিক মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে সফর করে এসে তাঁর রিপোর্টের এক জারগার লিখেছেন, 'পাখর ভাঙার কেন্দ্রগুলিতে আমরা যা দেখে এসেছি সেটাই এই সফরের সবচেয়ে বেশিমানমূল্যের দৃষ্টি। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কাজ পাওয়ার প্রধান সূত্র হল এই পাখর ভাঙার কেন্দ্রগুলি। জেলায় জেলায় জিপ গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা এই ধরনের অসংখ্য কেন্দ্র দেখেছি। .....মাদিতে ঢালু পাহাড়ের গায়ে দু'হাউল জুড়ে রয়েছে পাখরভাঙার চৌকসগুলি। ১০৫০ জন চাষী চার মাস ধরে পরিশ্রম করে এই চৌকসগুলি তৈরি করেছেন। হাড়ফির এসোপাখাড়

ঠুকঠাক আওয়াজে এখানকার স্থির বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠছে। ...বেসর বাড়ো মানুকের ছেলেরদের হাল ধরার আর তাদের নিজেদের গল্পগুজব করে সময় কাটাবার কথা তাঁরা পাখর ভাঙছেন, বাদিও কাঁধের উপর হাড়ফি তোলায় মত গতি তাদের নেই। ৭০ পার হয়ে বাঙরা এক হাড়ি নামকের মত ক'লতে ক'লতে হাড়ফি ঠুকছেন। আর একজনের কাছে গেলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন 'দিনে আমি এক টাকার বেশি কামায়ে পারছি না। সেই টাকাও আমি নিজে তিন সপ্তাহ ব্যবহার পাই নি। এই করতেই কি আমার জন্ম হয়েছিল?'

## উপন্যাসের স্বরূপ পাখির পরিচয়

দাম : ২.০০

৬৫ রকম পাখির সচিত্র পরিচয় ৮.৫০

বকর-এর

## চোরদী এপার বাংলা ওপার বাংলা

২০শ মূদ্রণ ১২.৫০

২৬শ মূদ্রণ ১০.০০

এক দুই তিন

সার্থক জনম

পাঠপাত্রী

১৫শ মূদ্রণ ৫.০০

৪র্থ মূদ্রণ ৫.৫০

১১শ মূদ্রণ ২.৫০

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মল্লোপাধ্যায়ের

ভারতীয় বঙ্গোপাধ্যায়ের

## মার্কসবাদ ও মতুমতি নিশিগম্ম

দাম : ৮.০০

১ম মূদ্রণ ৪.৫০

বনকলের

বিভূতিভূষণ মল্লোপাধ্যায়ের

## এক ব্যাক খণ্ডন অধকলাল জাঞ্জায়

দাম : ৬.৫০

২য় মূদ্রণ ৪.৫০

দাম : ৪.৫০

ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীজরবিন্দ ১২.০০ ॥ দিলীপকুমার রায়  
 যিজেসুলাল: কবি ও নাট্যকার ১৬.০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়  
 রোমান্টিক কবি ও কাব্য ৬.০০ ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়  
 সাহিত্য ও তত্ত্বের রূপরেখা ৩.০০ ॥ বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়  
 বতসুর মনে পড়ে ৩.৫০ ॥ নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিমাই ভট্টাচার্যের

দত্তীনাথ ভট্টাচার্যের

## উইং কমাণ্ডার গার্ল্যাংগেট স্ট্রীট জলদ্রায়

৩য় মূদ্রণ ৬.০০

৪র্থ মূদ্রণ ৬.০০

২য় মূদ্রণ ৬.০০

জ্যোতীর মিত্রের

আবুতোব মল্লোপাধ্যায়ের

## কদমাশা নতুন তালির টান প্রণয় পাশা

দাম : ৩.০০

৪র্থ মূদ্রণ ৭.০০

২য় মূদ্রণ ৬.০০

জ্যোতীর-এ

জ্যোতীর বন্দ্য

## মসিরেখা স্বীকৃতি আশ্রয় জগন্মদল

৫ম মূদ্রণ ১.০০

দাম : ৫.০০

৬ষ্ঠ মূদ্রণ ৩.৫০

২য় মূদ্রণ ১৫.০০

বাক-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, ৩০, কলেজ রো, কলিকাতা-৯





এ সাংবাদিক আরও লিখেছেন, 'সান-তানাতে... পাঁচশ মানুব কাজ করছেন। ...হলিউডে রোমান যুগের বেসব ছবি তোলা হয় সেগুলির দৃশ্য যেন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের সলো রোমান প্রভুদের জন্য কর্মরত দাসদের দৃশ্যের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে।'

পাথরভাঙার মত নিরর্থক কাজ না করিয়ে বেসব ছোটখাট ধরনের সেচের কাজ করালে স্মারী উপকার হতে পারে তা ক্রয়ান হচ্ছে না কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা কর্তৃপক্ষরা বলছেন, এ ধরনের কাজ করার জন্য বন্দুপাতি, ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে।

অবশ্য পাথরভাঙা ছাড়া অন্য ধরনের কাজও বে হচ্ছে না তা নয়। যেমন আওরঙ্গাবাদ জেলায় গ্রাণ প্রকল্পে ৩৬৫০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করান হয়েছে।

কিন্তু সত্যতঃ পর সত্যই কর্মহীন, জীবিকাহীন মানুষকে কাজ ও খাদ্য বোগাবার সমস্যা বেড়েই চলেছে। দুর্ভিক্ষ মানবের চাহিদা যে হারে বাড়ছে, সেই হারে কর্মসংস্থান করতে গিয়ে জ্বালাপোড়ার বিভিন্ন জেলার কর্তৃপক্ষ হিমসিম খেতে বাজেন। আওরঙ্গাবাদ জেলায় ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাস্তা তৈরির বে প্রয়োজন ছিল সেই প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ কাজের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গ্রাণ প্রকল্পসমূহে কাজ করছিলেন ১,৭৬,০০০ মানুষ। জানুয়ারি মাসের গোড়ায় সেই সংখ্যা কমেই গিয়ে গেছে। আর, ফের-রাতিতে পঁচ লাখ গ্রামবাসীর কাজ জেলতে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে অনেক কর্মসংস্থানের লোকান খোলা হয়েছে; কিন্তু সেসমূহে খাদ্যসেবার বোগান খুবই অসুবিধিত। কলে দুর্ভিক্ষ মানব বেসরকারি মাসিকদের খাদ্যসেবারাীদের শিক্ষার ক্ষতিসাধন

আর একটি বড় ভাবনা গরুর ভাবনা। গরু যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে এর পর যদি বৃষ্টি নামেও তাহলেও গরুর অভাবেই চাব মার খাবে।

বিলাতের টাইমস পত্রিকায় লুই হেরেন সম্প্রতি লিখেছেন, 'মঃ লে ডুক থো প্যারিসে যা করতে চাইছেন সেটা ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনার অতিরিক্ত একটা কিছু হতে পারে। মনে হচ্ছে, তিনি ও তার সরকার যেমন ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট জনসনকে পথে বসিয়েছিলেন সেভাবে তারা বেন প্রেসিডেন্ট নিকসনকেও খতম করতে চাইছেন।'

লুই হেরেন আরও লিখেছেন, 'ফরাসীরা প্যারিসেই পরাজিত হয়েছিল দিল্লেনবিয়েন ফুতে নয়। আর সেই ঘটনায় ফ্রান্সের ইতিহাসই বদলে গিয়েছিল।..... আর একদফা প্রচন্ড বোমাবর্ষণের বন্ধকি নিজেও উত্তর ভিয়েতনামীরা যেভাবে (প্রেসিডেন্ট নিকসনের সতর্গাতি নিয়ে) আলোচনা করতে অস্বীকার করছে তাতে মনে হয় যেন তারা আমেরিকার ইতিহাসও বদলাতে চাইছে।'

যে পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে সেটা হল এই যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অর্থাৎ আইনসভার সলো প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রচন্ড বিরোধ বাধছে। এই বিরোধের ফলাফল ভবিষ্যতে আমেরিকার বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বলে, সরকার যেমন রাষ্ট্রের একটি শাখা আইন-সভাও তেমনি একটি শাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ দুইই তুলনায়। কিন্তু কিছুকাল ধাব এই তর্কটা কার্যত কোনভাবেই বাতী হাছিল

না। প্রেসিডেন্টই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠছিলেন। এই নিয়ে মার্কিন সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্যদের ক্ষোভ চরমে ওঠে গত বছরের শেষের দিকে। প্রেসিডেন্ট কারও সলো কোনরকম পরামর্শ না করে, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ অধিকারে রেখে উত্তর ভিয়েতনামে প্রচন্ডতম বোমা বর্ষণের হুকুম দিয়েছেন সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে সরকার ও আইন-সভার সমমর্মাদার কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অসংগতির প্রতিকার করার জন্য এবার কংগ্রেস বন্ধপরিষদ হয়ে উঠেছেন। তাদের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তারা যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন অতীতে আর কখনও তেমন হয় নি।

ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এবার মার্কিন কংগ্রেসে প্রাধান্য রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক দলের। আর প্রেসিডেন্ট নিকসন হচ্ছেন রিপাবলিকান দলের নেতা। উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধলে কতদূর গড়াবে বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে দুটি ব্যাপারে এই বিরোধ বেশ জোর পাকিয়ে উঠেছে। সিনেটে বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রবার্টস ও প্রেসিডেন্টের বিশেষ পরামর্শদাতা ডঃ হেনরি কিসিজারকে তলব করা হয়েছিল। তারা দুজনেই সেই তলব মানতে অস্বীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট নিকসনের হুকুমে।

পালটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মার্কিন কংগ্রেস বলছেন, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চ পদে বীদের মনোনয়ন করা হয়েছে তাদের নিয়োগ তারা অনুমোদন করবেন না। মার্কিন সংবিধানের নিয়ম এই যে, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এইসব নিয়োগ কার্যকর হয় না।

# তুলসী সেনগুপ্ত

## রতন ও স্বপ্নের মানুষ



হৃদে চোখে একরাশ বিষময় নিয়ে রতন তারিফে দেখতে লাগল বংশীলালের খেলা। ভিড় ঠেলে যে কাছে এগাবে এমন কথতা রতনের নেই। ছেলের দল ওকে দেখলেই পেছনে লাগে; 'নল্লো রতন হ্যাংলা' বলে বিরক্ত করে মারে। কিন্তু আজ অনেকদিন পর মনে হ'ল রতনের, পাড়ার ছেলেরা নতুন হাস মজেছে। মোহনপুরা অনেকদিন পরে যেন নতুন কিছু পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেগুলো কেউ-ই ওর দিকে চেয়েও দেখছে না, এটা ভাবতেই রতনের বুকটা ভীষণ হালকা হয়ে যায়। আবার নজরে পড়লে গা-পিঁপ্টি জ্বলতে থাকে। 'শালা রতন এী কারো খার না পরে? যে নল্লো রতন হ্যাংলা বলে ওর পেছনে লাগবে।' মনে মনে ভাবে রতন, আসলে ছেলেগুলো এক-একটা শোর-এর বাচ্চা। নইলে কার পাকা ধানে গুই দিয়েছে রতন যে, ওকে অমন করে জ্বালাবে। এসব ভাবনা বংশীলালের খেলা দেখাব ফাঁকে কেন যে এল ভেবে পার না রতন। এসব ভাবনা, না ভেবে পিচুটি-ভরা হৃদে চোখজোড়ার বিষময় জাগিয়ে তুলে রতন ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকে বংশী-লালের খেলা। বংশীলালের খতনির কাছে নামে এসেছে জুলাপি, চামড়া-সার রোগ ডিগিডিগে চুহারা, লাল চোখ, দেখলে ভয় পায় এই মানবুটাই এতগুলো ছেলেকে, শূন্য হলে কেন, ছেলেদের বাপ-মায়েরও অভিভূত করে দিয়েছে খেলা দেখিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর একধরনের ঘৃণা পোঁচরে ধরতে লাগল রতনকে। মনে মনে নিজেকেই গাল পাড়ল সে। আর সে গালাগালটা নিজের কানেই কীরকম বেথান্গা ঠেকল। ভাল লাগল না রতনের নিজেরই।

অনেক কণ্টে একটা উঁচু মতন টিবির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বংশীলালের খেলা দেখার মন দিল রতন। হার, মাস্টার পাশ দিয়ে গলে যেতে বলল, 'রতন, তোর তো বেশ বখশি নে! সবাই কেমন ভিড়ে গুঁতো-

গুঁতি করছে, আর তুই... বেশ, বেশ রতনা, বখশিই হচ্ছে সব; বখশি নেই তো কিছু, নেই।' আপন মনেই যেন কথাগুলো বলে হার, মাস্টার পাশ কেটে চলে যায়। খেলা দেখা ভুলে গিয়ে হলদেটে দাঁত বের করে হাসে রতন। মনে পড়ে তার গোপালও ঠিক এই কথাই বলেছিল ওকে একদিন। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাক লাগল রতনের। মাটির ঢিবিটা থেকে অতি সন্তর্পণে নেমে রতন ধীর পায়ে এগুতে লাগল বাড়ির দিকে। মাথার ওপরের আকাশটা ঝকঝক করছে। ঘাড় কাত করে আকাশটাকে দেখবার চেষ্টা করল। বিরাটাকার একটা আগনা যেন কেউ বাসিয়ে রেখেছে আকাশটাব গায়। ফলে চোখদুটো কেমন যেন ঝলসে গেল। ভাল করে আকাশটা দেখতে পেল না। পেছন থেকে বংশীলালের দলের ঢোল বাজনার শব্দ কানে এল। ডুম-ডুম-ডুম... আর ভেসে আসছে বংশীলালের রক্ত ককশ কন্ঠ... 'কলকাতাকা বংশীলাল দেখার দুনিয়ার হালচাল, আও বাবু দেখো, ডানমতীকা খেলা। বংশীলালের খেলা দেখার মন দিলেও কেন যেন মনটা উড়ু-উড়ু করতে লাগল। মাথার ভেতরে হার, মাস্টারের কথাগুলো সড় বংশী ভোলপাড় শব্দ করে দিল। আবার মনে পড়ল গোপালকে। লেগে বসার কসতে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোপালের।

সমস্ত মূখ জুড়ে ঢাকা-ঢাকা দাগ। সেই গোপাল একদিন ওকে বর্সোঁচল, 'বংশীলাল রতনা, স্রেফ বখশি; বখশিই হচ্ছে সব। এই যে ভগবান আমার চোখ নিল, বখশিটা এমন খাবলে খুবলে ছেড়ে দিল, আঁমি কী শালা তোর মতন পরের পাত চাটি'।

নল্লো রতন রাগ করতে পারেনি, সে খথার। কেননা, গোপালের কথাটা শুনতে যেতই খরাপ হোক, 'শাসলে খথটা খুব খাটি।' এমন একটা দিন নেই, যেদিন কব খাড়ির লোক ওকে গালাগাল না দিয়ে জাত মুখে দেয়। গত রাতের কথাই মনে পড়ে গেল রতনের। কে বলবে বীরু আর সমুওর আপন মায়ের পেটের ভাই। রতনের সঙ্গে কোন মিলই নেই ওদের। লেখাপড়া শিখেছে, দামী জামা গায় দেয়, ফর্সা ধবধবে জামা প্যান্ট মরলা হতে না হতেই বগলদাবা করে নিয়ে চলে যায় লণ্ড্রীতে, সিগারেট ফোঁকে। পথ চলতি রতনের সামনে পড়ে গেলেও যেন দেখতে পায় না, কিংবা এমন চোখ কুঁচকে দেখে যার অর্থ, রতন বুকতে পারে। বকের ভেতরটা অসম্ভব গুমোট একটা অস্বস্তিতে ভরে যেতে থাকে। বীরু আর সমুওর সঙ্গে কথা না যেতে বলে না রতন। অথচ, ভীষণ ইচ্ছে করে ওদের পাশে গিয়ে গা লাগিয়ে বলে বলে যেতে, গল্প

করতে। অনেক বলে করে বামন-দিগিকে  
স্বাক্ষর করেছিল রতন একদিন। কিন্তু  
রতনকে আগে থাকতেই পিঁড়িতে বসে  
থাকতে দেখেই বীর, আর সম্রা কী-রকম  
য়েন মন্থতে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বামন-  
দিগিকে বলেছিল, 'রাজপুত্রের খাওয়া  
হোক, তারপর আমাদের ডেকে'। অন্যদিন  
রতন বা হোক কিছু খায় : কিন্তু সেদিন  
ওর গলা দিয়ে কোন কিছুই বেন নুঁমছিল  
না।—অনেক কষ্টে ভরে ভরে চোলের, মত  
নিশ্চয় খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছিল  
রতন। সকলের ওই ধরনের তুচ্ছ-ভাঙিলা  
অবস্থা রতন মন্থ বৃদ্ধে সহ্য করতো।  
দু-চোখ কেটে জল গড়িয়ে আসতো। অনেক  
কষ্টে সকলের থেকে দূরে সরে গিয়ে, নদীর  
পাড়ের ওই বড়ো বট-গাছটার নিচে নিজেকে  
আড়াল করে চোখের জল ফেলেছে। যখনই  
বৃদ্ধের ভেতরটার চাপ বাধা অনুভব করে  
তখনই দেখেছে রতন 'মা-মাগো' এই কটি  
কথা বেরিয়ে এসেছে মন্থ দিয়ে। প্রচণ্ড  
দুঃখের মন্থতেই ও দেখেছে, মা যেন ওর  
পাশে ছায়া-মূর্তি ধরে হাঁচির হয়ে যায়।  
ও বেশ পরিষ্কার অনুভব করে তখন, মা  
বেন ওর মাথায় শরীরে হাত বুলায়ে দেয়।  
আর বিড়-বিড় করে কী যে বলে মা, তা  
ঠিক ধরতে পারে না, বন্ধতে পারে না রতন।  
বাথায় টস্-টস্ করে তার গলা বৃদ্ধ। চোখ-  
দুটো জ্বালা করতে থাকে। সবকিছু তখন  
তার কাছে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

রতন খুব করুণ গলার জিজ্ঞাস  
করেছিল গোপালকে, 'তা আমি কী করবো  
বল গদুপীয়া? ভগবান তোমায় গলা দিয়েছে,  
সেই গলার তুমি গান গাও, লোকে শোনে,  
ভাল বলে, পরসা দেয়। আমার তো তেমন  
কোন গদুপীয়াই'।

ডাঃ মোহনলাল বসু এম.বি.ডি.সি.ও  
ডাঃ এন এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস  
**যৌবনের রহস্য**  
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য - মূল্য ৬/-  
যৌনবিজ্ঞানের রতন ও বঙ্গচিহ্নে  
চিহ্নিত অতি আধুনিক সংস্করণ।  
মোহনলাল বসুর ৩৪৪ স্মৃতিস্মরণ  
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে  
প্রথম ৬-টাকার পাইলে ডকুমেন্ট প্রিন্ট

সেকথা শ্রুত এক প্রবেশই বেন আপন  
জলে উঠেছিল গোপালের। রাগে পল্লভ  
শরীর খরখর করে কীপাছিল তার। বলেছিল,  
'যারা বলে জীব দিলেছেন বিনি, আমার  
দেবেন তিনি', তারা আমার মতে মেরে-  
মানুষেরও অধর। বলেই হকিতে থাকে  
গোপাল।

রতন শ্বিতীর কোন কথা না বলে চুপ  
করে বলেছিল।

ইহাং কী হ'ল, গোপাল ওর হাতটা লম্ব  
করে ধরে বলেছিল, 'খেঁটার দেখেছিল কখনও  
খেঁটার'?

বাড় কাত করে উত্তর দিরেছিল রতন,  
'হ্যাঁ'।

শ্রুত মন্থ হাসিতে তলে বাঁজিল যেন  
গোপাল। বলেছিল, 'খেঁটারের স্বাক্ষর'...  
কথাটা না শেষ করেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস  
ফেলে চুপ করে গিরেছিল মন্থের জন্য।  
তারপর এক সময় আপন মনেই বেন বলতে  
থাকে, 'জানিস রতনা এই কানা চোখ দিয়ে  
যখন জল গড়িয়ে পড়ে তা দেখে লোকে  
ভাবে, রাধা-কেষ্টের গান গাই, তাই ভাবের  
ঘোরে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আমার।  
কিন্তু কেউ-ই জানে না, আর জানেই বা  
কী করে, মনের ব্যথা চোখে উঠে আসে,  
জল কাটে। তাকে বললাম এসব, তাকে  
বড় ভালবাসিয়ে রতনা'।

শ্রুত রতন বলেছিল, 'তুমি আমাকে  
সঙ্গে নেবে গদুপীয়া?'

ওর দিকে কঠোর রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে  
বলেছিল গোপাল, 'বাও দুটো খেতে দিচ্ছে  
বীর, আর সম্রা, তাও বন্ধ হয়ে যাবে।  
এমন সম্বন্ধে কথা কখনো বলিসনি'।

বোকার মত অনেককণ চেয়েছিল  
গোপালের দিকে রতন। তারপর কী ভেবে  
বলেছিল, 'তাহলে সারাশ্রীবন আমি ওর  
পাত চেটেই বাসো বলছো?'

সেকথার কোন উত্তর দেয়নি গোপাল।

এর দিনকয়েক পর ফের একদিন রতন  
গোপালকে বলেছিল, 'কিছুই তো বললে  
না। আমি কী করবো বলো?'

ধীর শান্ত গলার গোপাল বলেছিল,  
'যেমনটা বলবো, তেমন তেমন পারি  
করতে?'

কী?

উত্তরে গোপাল হেসে বলেছিল, 'ওই  
বা বলেছিলাম, খেঁটার, খেঁটার করতে হবে।  
মেরেছেদের দেখেই কানো কানো গলার  
বলতে হবে, মা, মা জননী, তিনদিন খাইনি  
মা, বড় জ্বালা মা, করে ছোট ছোট ভাই-  
বোন...পারি বলতে?'

সব শ্রুত চুপে গিরেছিল রতন।  
করুণ গলার উত্তর দিরেছিল, 'তার চেয়ে  
তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল—কেন যে  
ওরকম কথা বলেছিল রতন, তা এখনও  
ঠিক বৃদ্ধে উঠতে পারে না। গোপালের  
সামনে এসেই কেমন যেন সম্মোহিত হবে  
বার। এক-সেখো গোপালের মন্থে যে কী  
আছে, তা সঠিক না জানলেও, গোপালকে  
তার বড় আপন বলে মনে হয়।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে বংশী-  
লালের গলা। অশ্রুত এক রহস্যময় জগতের  
দুরার খলে যায় রতনের কাছে। কী রকম  
সকলকে বেকুব বানিয়ে বংশীলাল রম্যালে  
বাধা আঁটি সকলের চোখের সামনে  
থেকে উধাও করে দেয়। বাচ্চা  
বাচ্চা ছেলেদের হাত ধরে নাড়া  
দেয় বংশীলাল আর অর্নি জিলিপী  
করে পড়তে থাকে। বাচ্চা রতনকে 'নুলো  
রতন হ্যাংলা' বলে জ্বালায় তারা সব  
চুপে যায়। মন্থ চোখ ক্যাকাশে হয়ে যায়,  
তা দেখে আর সকলে হো-হো করে হাসে।  
আর অর্নি মে-দোড়, মে-দোড়। পালিয়ে  
যায় সকলে। রতনের মনটা সে সব দেখে  
খুশীর প্রজাপতি হয়ে ওঠে। ভাবে, বংশী-  
লালের মত যদি কোন কৌশল সেও আরম্ভ  
করতে পারতো তবে সেও ওই খচ্চরদের  
চিট করতে পারতো। একটু এগুতেই লক্ষ্য  
করল রতন, দূরে দুটো নেড়ীকুত্তা কীসের  
ওপর বেন হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। আর ঠিক  
তারই ওপর বৃত্তাকারে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে  
ডানা কাপটোছে ফাক-শকুনের দল। রতন  
বৃদ্ধে পারে, পচা-গলা কিছু একটা রয়েছে  
সেখানে, নুলো হাতটাকে অনেক কষ্টে  
উপরে তুলে নাক চাপা দিল। রোদ্দুরের ঝাঁক  
আন্তে আন্তে কেড়েই চলেছে। অনেককণ  
আগে থেকেই সোখদুটো জ্বালা করছিল—  
এখন পচা গম্বের সঙ্গে কাক-শকুনের ওড়ার  
দৃশ্য চোখে পড়তে, আরও বেন জ্বালা করে  
উঠল। মনে হ'ল রতনের, ওর দু-চোখের  
শাদা জিমিতে কেউ বাকিবা শকুনো লক্ষ্যের  
পুঁজো ছাঁড়িয়ে দিয়েছে। বংশীলালের রক্তকণা চোখের  
হাড় জিরিয়ে চেহারাটা স্পষ্ট ভেসে উঠল  
আর একবার। বংশীলালের রক্তকণা চোখের  
দিকে চেয়ে কেন যেন মনে হয়েছিল রতনের,  
তবুও কী তেমনকি দেখে না রতন,



বেনারসী • সিন্ধু • তাঁত  
মিল বস্ত্র • গোস্বামক  
হোসিয়ারী

৪৫/৩, জি.টি.রোড (সিটিং) হাওড়া

কিন্তু বংশীলাল একদিন রতনের হস্ত-  
নন্দন, কিংবা ভাগ্যের গলিত কোন হস্ত-  
নেত্র, আর ওপর হৃদয় থেকে সরেছে ছেলে-  
বড়ো মেরেয়া, সুখ আর কাক-শকুনের  
দলের মত। মনে মনে একটা ব্যাপার কথা  
উদার করল। রতনের মাংস থেকে থেকে  
ওপরে অর্ধচন্দ্র ধরেছে, আজ তাই বংশীলালের  
শরীরটিকে ছুঁকরের দল চেটে-পুটে খাচ্ছে।

রোজকার মত ও একা একা নিরিবিলিতে  
নদীর পাড়ে বসে সময় কাটায়। দেখে, পাড়ে  
বংশীলালের দল খুঁটে খুঁটে খার কত কী।  
উপরের আকাশে বেগুনি শাদা মেঘ মণ্ডব  
গতিতে একপাশ থেকে আর এক পাশে সরে  
যায়। সময় বে কীভাবে কেটে যায় রতন  
জানে না, বুকের মাঝে একরাশ ব্যথার চাপ  
সে সময় টের পায় না রতন। এভাবে  
সারারাত্তি যদি এমন নদীর পাড়ে বসে থাকে,  
বাড়ি নাও ফেরে, তবে কেউ-ই তার খোঁজে  
আসবে না। 'মা-মাগো'—! একটা দীর্ঘশ্বাস  
ঠেলে বেরের মত্ব দিয়ে। চোখদুটো জল-  
খাপসা হয়ে আসে। ভাবনার অদৃশ্য ভেলায়  
চড়ে ভাসতে থাকে রতন। মনের মাঝে  
গোপালের কথাগুলো আবার যেন শুনতে  
পায় ও। 'গেটার করতে হবে, থেটার'।  
হাসি পায় রতনের। আবার কণ্ঠে হয়।  
ওখান থেকে উঠে পড়তে গিয়েই নজরে পড়ে

কাজে হঠাৎকিছু করে করই মত শিশুর  
বসে রয়েছে। দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে আর কাউকে  
এই নদীর পাড়ে বসে থাকতে দেখেনি। সন্ধ্যার  
অন্ধকার ভাবন বাঁধে হারান। হালকা এক  
ধরনের আলো ভাবনও ছাড়িয়ে রয়েছে  
চতুর্দিকে। একটু এগিয়ে গেল রতন। বুঝি  
বা অকারণেই মত্ব ছোঁয়াল লোকটো।  
অমনি রতনের বুকের মাঝে মাংসের দ্রিমি  
দ্রিমি উঠল। সকলের চোখের রহস্যময়মানুষ  
বংশীলাল বসে রয়েছে সেখানে। আঁত  
উৎসাহে দ্রুত পা বাড়াল রতন।

বংশীলাল ওকে দেখে মত্ব ঘরিরে  
নিল। ও বংশীলালের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ  
কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল।

বংশীলাল ধমক দেবার সুরে বলে উঠল,  
'বা ভাগ'।

রতন একটু সরে গিয়ে কের দাঁড়িয়ে  
রইল। কী মনে করে অক্ষুণ্ণ হয়ে প্রশ্ন  
করল, 'তুমি আমাকে ম্যাজিক দেখাবে'।

সেক্ষণে বংশীলাল হেসে ফেলল। বলে,  
'ম্যাজিক! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ'।

সেই শব্দে চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা চুর-  
মার হয়ে গেল। পরে হাতের ইশারার কাছে  
ডাকল রতনকে। কোন সংকোচ বা বিধা

কিছুই ছিল না রতনের। সে একসময় কখন  
লালের গা, ঘেঁষে বসে ওর গায়ের পপ  
গম্ব নেবার চেষ্টা করল।

জান হাতটা রতনের ঘাড় ভুলে নিয়ে  
ধীর গলার বংশীলাল বলে, 'তু লিখাপড়া  
করিস না'?

রতন স্নান হাসল সে কথার। বংশী-  
লালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ভানুমতী  
তোমাকে খেলা শিখিয়েছে?'

খুব যেন একটা হাসির কথা কল  
রতন। হাসতে হাসতে বলল 'হী হী ভানু-  
মতী! ভানুমতীর নামটা অশুভ ভাবে  
উচ্চারণ করল বংশীলাল।

রতন জিগোস করল, 'ভানুমতীকে তুমি  
চেত্রো? আমাকে চিনিরে দেবে?'

বংশীলাল গম্ভীর হয়ে গেল সে কথার।  
বলল, 'কো-ই চিনে না ভানুমতীকে। কুনে-  
দিন পারবে তি না'।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বংশীলাল।  
রতনের পিঠে সন্মোহে হাত রেখে ওর নাম  
জিগোস করে বলল, 'বা বাড়ি যা'। বসেই  
যজ্ঞ পায়ে এগিয়ে গেল বংশীলাল।

রতন বেশ স্পষ্ট দেখতে গেল, রহস্যময়  
এই মানবটা যাকে অধিকারের মধ্যে লক্ষ্য

## দেবতাত্ত্বা হিমালয়

(দুই খণ্ড একত্রে)

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২১ সংস্করণ)

মূল্য : দুই টাকা

এই গ্রন্থে প্রবোধকুমার সান্যাল হিমালয়ের বহু পথের তথ্য ও  
ইতিহাসের বর্ণনা করেছেন, যেগুলি সাধারণ পর্যটক ও তীর্থ-  
যাত্রীর পক্ষে সংগ্রহ করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। চিরনিরন্তর  
হিমালয়ের গভীর মর্মবাণী উপলব্ধি যাঁরা করতে চান—তাঁদের  
কাছে সান্যাল মহাশয়ের একটি বিস্ময়কর উপহার।

## মানব জীবনের দিকযন্ত্র

জ্যোতিষ

প্রীদাশরণি সোম

মূল্য : আট টাকা

গ্রহেরা মানবের ভাগ্য সৃষ্টি করে; না কি মানবের ভাগ্য তার  
অতীত কর্মের দ্বারা সৃষ্ট হয়? সূর্য্য-পট্টাশ্রম বছর ধরে  
জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন ও চর্চার ফলশ্রুতি এই পুস্তকে শাস্ত্রের  
সেই রহস্য উদ্ঘাটন করবার আন্তরিক চেষ্টাই শ্রদ্ধা করুননি  
এমন কি এই শাস্ত্রের মূল রহস্য বাতে সাধারণ লোকের অতি  
সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সরল ভাষায়  
এই পুস্তককে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন  
লেখক।

## জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পাঠ

(মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল)

সংকলক : ডলফগ্যাং ল্যাপোনেভার

উপসংহারিকা : জাংক আউয়েরবার্গ

সম্পাদকীয় টিকা : হ্যারো হিলফিংগার

অনুবাদক—সুশীল রায়

মূল্য : বারো টাকা

মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি জার্মান সাহিত্যের  
বিস্তৃত বিবরণ। মূল রচনার সুখোদয় হয়ে জার্মান সাহিত্যের  
সঙ্গে অন্তর্গতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাঠকেরা নিশ্চিত  
ভাবে পাবেন।

আগর কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য প্রকাশন :

ভারত ও জার্মানরা

অনুবাদক—ডুবানী সুখোপাধ্যায়

মূল্য : ছয় টাকা

## শেকস্পিয়ারের সমাজ চেতনা

উৎপল দত্ত

মূল্য : আঠারো টাকা

সবারে আনি ননি

(স্বাভা-চরণ)

কানন-দেবী

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট : কলিকাতা-১৬

হিসে বেতে মেতে একেবারেই হারিয়ে গেল।  
এক সময় নিম্নেও উঠে পড়ল রতন।

আজকে হাটবার। অনেক চেনা-অচেনা  
মানুষের ভিড়ে গমগম করছে মোহনপুরার  
হাট। হাটে বাবার জন্য অস্বস্তি অদ্ভুত একটা  
টান অনুভব করল রতন। বাঁদ পায়ে এগিয়ে  
থেকে লাগল হাটের দিকে। দূর থেকে  
পথের পাশে বংশীলালের ডাঁদ নজরে পড়ল।  
আর অমনি বকের ভেতরটা গড়গড় করে  
উঠল রতনের। মনে পড়ে গেল বংশীলালের  
খেলা দেখাবার সময়কার কথাগুলো, 'কল-  
কাডাকা বংশীলাল, দেখার দানিয়ার হাল-  
জাল'। আর মানবজন পরিবেষ্টিত বংশী-  
লালের খেলা দেখাবার সময়কার বিশেষ  
ভাবগীতি চোখের সামনে ভেসে উঠল। বেন  
এ-কপতের কেউ নয়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে  
একজন বিশেষ রহস্যময় মানুষ ও। বাজনার  
তালে তালে লাল চোখের মণিদুটো থেকে  
বেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। বিশেষ করে  
বছর আটকের ছেলেকে একটা চুবাড়ির মতো  
ঢাকিয়ে শানিত ছাঁরির ফলা বের করে  
উদ্ভাসের মত বখন বিড়-বিড় করে বংশী-  
লাল, তখন লোকটাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে  
হয়। কথা বলতে বলতে অস্বস্তি হলে  
বংশীলাল, আর সেই হাসি আরও রহস্যময়  
হয় চোলের ডুম ডুম ডুম বাজনার মধ্যে।  
এসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে পথচলে রতন—  
অকারণেই হঠাৎ বকের মাঝখানটা হিম হয়ে  
আলে। সমস্ত শরীর তখন থির-থির করে  
কঁপে। পাদুটোকে ভীষণ ভারী মনে হয়।  
পাদুটো অসম্ভব ভারী ঠেকলে কী ভেবে  
রতন বলে পড়ে কিছড়কণের জন্য সেখানে।  
আন্তে আন্তে ভয়ের মেঘ কেটে যায়। অল্প  
কিছড়কণের মধ্যে শরীর-মন শও হয়ে গেলে  
পর ভাবের দিকে এগোয় রতন। দেখে  
ভাবের চার পাশে ইতস্ততঃ ছাড়িয়ে রয়েছে  
পোড়া কাঠের টুকরো, কয়েকটা ভাঙা  
মাটির হাঁড়, শুকনো কলাপাতা, আরও কত

কী। করকটা রোঁর ওটা কুঁকর কুঁকলী  
পাকিরে খুঁজে আছে। হঠাৎ নজরে পড়ে  
রতনের, ভাবের একই ধরনের ভীষণ  
বলবে রতন-আমা-লাপড়, এমন কী করক-  
খানা শাড়ীও। ভাবের ভেতরে কী কেউ  
আছে? থাকলে নিশ্চয়ই ওদের কথাবার্তা  
কানে আসতো। শুধুও ভরসা শেষ না  
ভেতরে ঢুকতে। পদা সরিয়ে উঁকি খারতেই  
'কণ, কণ হায়'—খাল পড়ার মত গলার  
কে বেন বড়ে উঠল কথাগুলো। 'মুহুরে'  
শরীরের মত হিম হয়ে গেল রতনের। গলা  
শুকিয়ে গেল। ফ্যালফ্যেলে গলার উত্তর  
দেয়, 'আমি রতন দাস'।

—'আ, ভিতর আ'।

ভিতরে গিরে দেখল লোকটা বংশীলাল  
নর। অবরদন্ত এক বিশাল পদুম, আর তার  
গা ঘেঁবে বসে রয়েছে এক সুন্দরী মেয়ে।  
দু-চোখ ভরে দেখতে গিরে, সংকোচ হল  
ভীষণ, রতনের। ওকে অমন করে চেয়ে থাকতে  
দেখে, মেয়েটা হেসে উঠল। ফলে মেয়েটার  
মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছড়কণের  
জন্ম তাঁকির রইল সেই অবরদন্ত লোকটা।  
এমন মধুর সুরেলা হাসি কী মানুষ হাসতে  
পারে? রিণ-রিণ করে আওয়াছ উঠছে।  
মানুষটা ওর সামনেই মেয়েটাকে আদর  
করল। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট বোলাল। সেই  
লোকটা মেয়েটার দিকে একবার রতনের দিকে  
আর একবার চেয়ে নিরে বলল 'আঃ তু  
হামার সব দুখ দুঃ করিয়ে দিল, তু  
হাসলে হামার নেসা হোর', পরক্ষণেই  
রতনের দিকে চেয়ে বলল, 'তু রোজ আসিস  
ইখানে, আমার পাখিকে তু হাসালি, তু বড়  
ভাল ছেলে রে...'। বললই প্রচণ্ড লজ্জা করে  
সমস্ত নিস্তত্বটাকে চুরমার করে হাসতে  
লাগল সেই লোকটা।

ভরে বিস্ময়ে রতনের বকটা শুকিয়ে  
যেতে লাগল। অস্বস্তি কণে সে শূন্যের

বংশীলাল যে বকের দেবার, সেই ভাবগীতি  
কী ছবি?

মেয়েটা সে কথার হাসতে পারল না।  
রতন দেখলো, সেই আদো-আদো  
অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটা কেমন করে বের  
মুখটাকে লোকল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অবরদন্ত  
মানুষটা লজ্জা করে হেসে উঠল। বলল, 'হা-  
হা-ই হচ্ছে ভানুমতী, হামার পাখি'। কথা-  
কটি বললই উঠে বলল লোকটা। কতোর  
দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।  
তারপর হঠাৎ কী হলো, প্রাণখোলা হাসি  
হাসল লোকটা। মেয়েটার দিকে নজর মেতেই  
দেখতে গেল মেয়েটার মুখ অবরদন্ত রক্তহীন,  
সমস্ত কপাল জুড়ে বিজবিল করছে ঝাম।

ভীষণ রক্তময় এক ধরনের উত্তেজনা  
অনুভব করল রতন। শূন্যল, কিছড় বংশী-  
লাল যে বলে ভানুমতীকে কেউ-ই চিনতে  
পারে না?

'ঠিক, ঠিক বলেছে বংশীলাল'। কথা-  
কটি বললই কিছড়কণের জন্য চপ করে গেল  
লোকটা। পরে মেঘ ডেকে উঠল গলার তার,  
'এ শালা হারামখোর বংশী ইধার আ...'।

কথা শেষ হতে না হতেই বংশীলাল  
মাথা গোঁজ করে এসে হাজির হল।

'এই শালা গোরালাবা' লোকটা হুকুম  
জারী করল বংশীলালের দিকে চেয়ে।

আর অমনি দেখলো রতন সকালের  
ভেজলী বংশীলাল অনুগত ভৃত্যের মত  
লোকটার পারের কাছে বসে, পা টিপতে  
লগে গেল।

রতন উঠে দাঁড়াল। ওকে উঠতে দেখে,  
ওরা কেউ-ই কোন কথা বলল না। তাঁবু  
থেকে বেরিয়ে এল রতন। সম্ভ্য হয়ে  
আসছে। ভূবোকাটির মত চতুর্দিকটা আচ্ছন্ন  
হয়ে আছে। উপরের আকাশে দু'চারটে পাখি  
পূর্ব থেকে পশ্চিমে উড়ে বাছে;

বাইরে দাঁড়িয়ে একবারের জন্য চমকে  
পেছন ফিরে দেখল রতন। ভাবের  
ভেতর থেকে সেই আগেকার মত চুচু-  
ককা হাসির লজ্জা কানে এসে। গোপালের  
কথাটা মনে পড়ল ঠিক সেই সময় রতনের।  
'খেঁটার খেঁটার করতে হবে তোকে'। ভাবল,  
বংশীলাল পাকা খেঁটারের লোক। এখন কেমন  
গোপালনা সাপের মত অবরদন্ত লোকটার  
পা টিপে দিচ্ছে। চোখদুটো জ্বালা করে  
উঠল। নুনা হাতটাকে অনেক কণে, চোখের  
কাছে টেনে তুলে চোখের ওপর রাখল। কেন  
বেন অকারণেই চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে  
নাচ্ছে রতনের।

# জাট

শুঁড়া মশলাই

## কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত

### (কুকুম্বী)

প্রাঃ লিঃ এর

### একমাত্র ব্র্যাণ্ড

জাট—প্রধান হাইকোর্ট স্বীকৃত ও গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত  
২০৭, ব্রহ্মবৈ সেবপ্ত রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩০-১৩০৭





## শ্রবণ বেল গোলা

শ্রবণ বেলের মেঘে আকাশ লেবিল  
মেঘের। ধরাবধি হয়ে গেছে নুপুড়ে আর  
বিকেন্দ্র।

সন্ধ্যার পরও টুঙ্গ টুঙ্গ কবে  
জ্বলি করে পড়ছিল উঠানে পেরা পাতার  
ফাঁক দিয়ে, কাঁঠাল পাতার ফাঁক দিয়ে।

মোটঘাট বেঁধে রওনা হলুম স্টেশনে,  
রাত দশটার ট্রেন। মাইশোরের মানে মহী-  
শূরের কয়েকটা জারগা দেখবার ইচ্ছে।  
আয়সকণ্ঠের চওড়া রাস্তা বর্ষাশিশু, এলো-  
মেয়ো সজল হাওয়া ট্যাকসির কচের ফাঁক  
দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, সুন্দর কাচের অব-  
দর্শনে ঢাকা আলোগাঢ়ি ল্যান্সপোস্টের  
মাঝার স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, অপার মহাসমর  
লাগছে রাত্রির ব্যাপ্যলোরের পথ। পথের  
পাশের গাছিক ধাঁচের বাড়ীঘর, ফুলবাগান,  
মঠ-মন্দির আর নিবিড় গাছপালা ঢাকা  
গাছপালা।

স্টেশনে দাঁড়ানো গাড়ি মোটর ট্যাকসি-  
গল্লির গলে বসিতির কোঁটা কোঁটা জল  
লেগে রয়েছে, চক চক করছে বাতির  
আলোর। বসিতির মাথোও লোক চলাচলের  
বিহীন। অহলিখি মানুষের গাড়ি  
অব্যাহত।

ট্রেন আসতে তখনো কিছু সময় বাকি।  
ডাকিয়ে দেখাছিলুম স্টেশনের লোকজন।  
দাঁকপাদের সঙ্গে বাঙালীর চেহারা খুবই

সাদাশ্য। মরলা রঙ, শীর্ণ দেহ দাঁকিল  
ভারতীয় নয়নারীর দিকে তাকিয়ে মনে  
হাছিল দু'কি বাংলায়ই কোন স্টেশনে  
দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন আসতে আমরা ছোট  
একটি কুপেতে উঠলাম।

জন-কোলাহলমুখর স্টেশন পেছনে  
পড়ে রইল। গাড়ি সবচেয়ে ছোট চলল কোন  
অজানার দিকে।

হুম ভাঙল খুব ভোরে।

ট্রেন ছোট চলেছে নিবিড়  
পাহাড়ী বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে।  
দূরে সবুজ পাহাড় প্রাণী, নীচের  
উপত্যকার বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত, তার ওপারে  
দূরে দূরে ইলেকট্রিকের থাম দেখা যাচ্ছে,  
এই দিকেই আমাদের গন্তব্য যোগ-  
জলপ্রপাতের দিকে। ওখান থেকে বিদ্যুৎ  
উৎপন্ন করা হয়েছে। ভারতে এই একমাত্র  
প্রদেশ মহীশূর যেখানে স্বাধীনতার আগেই  
গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা  
হয়েছে।

দূরে সুন্দর বাড়ীঘর, অনেক ফ্যাক্টরি

দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য চিমনি দিয়ে ধোঁয়া  
ধেঁরছে। কোন বাঁধ? জনপদ নিশ্চয়।

স্টেশন এল। স্টেশনের পাশ দিয়ে চলে  
গেছে পাকা সড়ক, বসিতি, ঘরের পেয়াল,  
টালির ছাদ। অদূরে নদী, মেঘাচ্ছন্ন  
আকাশের নীচে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভরাবতী! মস্ত বড় স্টেশন। বিরাট  
কারখানা অদূরে। অনেক ট্রেন দাঁড়িয়ে  
আছে।

ভরাবতী একটি শিম্পনগরী। লোহা-  
স্টীল ওয়াক'স, সিমেন্টের ফ্যাক্টরি,  
পেপার মিল কত কিছু এখানে। মহীশূরের  
জামসেৎপুর।

আবার ধানক্ষেত। মেঘ-ভারে অবনত  
আকাশের নীচে অসংখ্য প্রসারিত ধান-  
ক্ষেতের শোভা দেখে পূর্ব বাংলার কথা মনে  
পড়ল।

বেলা এগারোটার সাগর স্টেশনে  
নামলাম। রিফ্রেসমেন্ট হুসে বসিতি নুতন  
থাকতে হবে।

মধ্যাহ্নভোজন হল ওখানকার কয়েকটি  
অফিসার মি: ওয়েলসলির গৃহে।

মস্তবড় কম্পাউন্ড, আর চারদিকে যে  
কি নিরাশা, নিজন! মিসেস ওয়েলসলি  
বললেন, অভ্যাস হতে গেছে নিরাশার  
জগলে একা থাকতে থাকতে। এখন জনজ-  
পূর্ণ বড় শহরই বরং ভাল লাগে না। বন-  
জঙ্গলের গাছপালা এখন কি পছন্দ

\*

সাবিতা সেনগুপ্ত

পড়ন্ত যে কি উৎসবের সঙ্গ দিতে পারে, আশ্বিনকে আর কি বলবে।

জন্ম প্রায় তিনটে নাগাদ দুখানা গাড়ি বোকাই হঠাৎ আমরা যোগ জলপ্রপাতের দিকে চললাম। মিঃ ওয়েলসন সপরিবারে এবং মিঃ ডাম্পন বসে আর একজন ভ্রমলোক এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী।

মিসেস ওয়েলসন বললেন, তাঁর বাড়ী থেকে যে কেউ যোগে যান তিনিও সপো জ্বলেন। যোগ জলপ্রপাত তাঁর কাছে কখনো পড়েনে হয় না।

পথ কখনে খানকেনের মধ্য দিয়ে। কখনো নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্রমে নীচের দিকে যান নিবিড় পাহাড়প্রাণীর মধ্যে এসে পড়ল। তারপর নীচের দিকে আরো নেমে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে হ্রদেতে হ্রদেতে এসে গন্তব্যস্থানে পৌঁছালাম।

দূর থেকে জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেঘমুখর্দান ভেসে আসছে বেন জেন দূরের আকাশ থেকে।

আরো এগিয়ে গেলাম।

একবারে কাছাকাছি এসে দেখি তত-কমে ছয় কুরাশার সামনে দিকদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দৃষ্টি চলে না সেই কুরাশা ভেদ করে, আর ভীমগর্জন শোনা যাচ্ছে সেই কুরাশার পরগার থেকে।

এই যোগ ফলস্।

কিন্তু হতবাক হয়ে গেলাম আমরা সবাই। কাছে এগিয়ে ডাকবাংলোর বারান্দার গাড়ালাম। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, বেশ শীত-শীত করছিল।

ডাকবাংলোর বারান্দাতে একবারে সমস্তই জলপ্রপাত। ভাবলাম মেঘাচ্ছন্ন দিন বলেই কি মেঘ ঢেকে গেল ধারাগুলি? শুধু লক্ষ শোনা যাচ্ছে দূরগত মেঘ পর্জলের মত।

আশ্বিনে বাঁদ ও দিন ছোট হয়ে আসছে, তবু মোটে ত বিকেল পাঁচটা, এখনি ত আবার নেমে আসার সময় হয় নি।

আচ্ছ! কিছুক্ষণ পরেই কুরাশা সরে গেল, স্পষ্ট দেখতে গেলাম জলপ্রপাতগুলি। শীতের কুরাশাও নয়, বর্ষার মেঘও নয়। ভীমবোনে যে জলধারা ওপর থেকে নীচে পড়ছে, চতুর্দিকে উৎকীর্ণ সেই জলকণাগুলি ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে বহুদূর ব্যাপ্ত করে নিবিড় কুরাশার সন্নিবিষ্ট করছে, আর বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ জলকণা বৃষ্টির গুঁড়োর মত চারদিকে করে করে পড়ছে।

আবার চতুর্দিকে উৎকীর্ণ জলকণার তৈরী কুরাশার দিক-দিগন্ত ছেঁয়ে গেল। আমরা তাকিয়ে রইলাম ঘন নিবিড় কুহেলির দিকে, আবার কিছুক্ষণ বাদে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল কুরাশার আবরণ। দৃষ্টিগোচর হল পরিষ্কারভাবে যোগ জলপ্রপাতের চারটি ধারা, রাজা, রোরা রকেট, রানী।

এই সময় আকাশও একটু পরিষ্কার হল কিছুক্ষণের জন্য।

কবিভার পড়ি যেন পড়ল।

কুহেলি গেল আকাশে আলো দিল

যে পরশনি

ধূম্রতির হৃদয়ের পার্শ্ব পর্বতের হাসি।

এমনিই হতে ব্যাপক সাক্ষ্য বিবেক।

ডাকবাংলোর বারান্দার সামনে বাঁদনে ১২য়। ওপরে ছাদ রয়েছে অশ্ব্য। এই ভয়ংকর জলপ্রপাতের একেবারে মতোমতী। সেই ১২য় সারি সারি চোখের পাতা।

যায় খালি সে বসে বসে দেখছে। বাতীর ভীড় বয়েছে ছিল।

আমরা এর মধ্যে কী পেরে গেছি। কফির পেরোলা হাতে নিয়ে বসে জেনার চেয়ারে।

ডাকবাংলোর সব করটি বর ভীত। আমাদের সঙ্গীরা চলে যাবেন, আমাদের থাকবার ইচ্ছে সে মাতটা।

অনেকক্ষণ পর ডাকবাংলোর প্রধান হিলিড-এর পাশের বিগিড-এ একটা বর খালি আছে জানা গেল। আমরা ওটাই দখল করলাম। বিকেল গাড়িরে সম্মার আঁধার ঘনিরে এল।

হ্রদের মধ্যেও সমস্ত রাত সেই জল-প্রপাতের বহুগর্জন সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ছিল। একটানা দুই হরিন, থেকে থেকে গাবের আচ্ছাদন ফলে উঠে বসেই আর অশ্বকারের মধ্যে জানালা দিয়ে জল-প্রপাত দেখার চেষ্টা করছি।

দেখতে বিশেষ পাইনি আঁধারে, কিন্তু প্রবণ ভরে গেছে প্রপাতধারার মেঘমুখর্দান ঘনিতে।

এই কি শব্দব্রহ্ম? বিপুল গভীর মধুর মন্ত্র কে বাজাবে সেই বাজনা? উঠিয়ে চিত্ত করিয় নৃত্যে বিপুল হরে আপনা! এই বিপুল জলমুখর্দান শব্দে সত্যিই চিত্ত আপন-বিস্ময়ে হরে বাব। পৃথিবীতে বেন আর কিছু নেই আছে এই নির্জন পার্বত্য পটভূমিকা আর অশ্বআবেগে জলমুখর্দানের বিপুল গর্জন।

শেষ রাতে আমরা বারান্দার বোঁরে দেখলাম ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে এখানে-সেখানে বাতি জ্বলছে। সামনের জটাজিট ঘনপন্ন প্রসাধা বহুদূর বৃক দৃষ্টি অপূর্ব রহস্যময় লাগছে। আদরের জলধারা কুরাশার দুর্নিরীক্ষা, প্রাণের সম্মুখ ভাগ চলিস্ত।

সামনে প্রপাতের নিকট থেকে কুরাশা এগিয়ে আসতে আসতে কাছে আমাদের একেবারে কাছে এল, সামনে বহু দূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল জলকণাসমূহ মেঘেব আবরণ।

আবার কিছুক্ষণ বাদেই কুরাশা সরে গিয়ে সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। রাতি শেষের পক্ষ আঁধারে জলপ্রপাতের ধারা-গুলি কিছুটা আবার দৃষ্টিগোচর হল।

সকালে আবার ওইরকম।

মুহূর্ত কুরাশা সন্নিবিষ্ট হচ্ছে, কুরাশা পক্ষ হয়ে আবার পর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

ওপরের সব পাহাড়ের পাশে কুরাশা-গুলি বাদা এসে সবথেকে নীচের গহ্বরে নিকশিত হচ্ছে।

কল নিকশে প্রধানত চারটে ধারা পারস্পাশি ঘেঁষেছিল। সকালে দেখলাম শীতকণা সমুদ্র কুরাশা যখন সরে গেল ওই চারটে ধারার পারস্পাশি আরো কতগুলি ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে এসে সম্মুখে নীচে পড়ছে।

একটি ধারা খুবই বড় আর কি কিয়ট উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়িরে পড়ছে। বোলের ধারা এখানে সবচেয়ে প্রশস্ত।

রাজা, রোরা, রকেট রানী।

চারটে বৃক ধারা।

নামগুলি যোগ হয় এদের খালি-গাশ্বিনী আর ঠাট-জ্বকের জন্যই রাখা হয়েছে। আটশ পঞ্চাশ বৃক ওপর থেকে ধারাগুলি নীচে গভীর কালো গহ্বরের মধ্যে নিকশিত হচ্ছে।

আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার নীল।

জলকণার তৈরী মেঘ যখন সরে যাচ্ছে, তখন দেখতে পাচ্ছি সূর্যের আলোর প্রপাতের ধারাগুলি রক্ততন্ত্র কেন্দ্রসহ তৈরব-রবে নেমে আসছে।

বিরাট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দিগন্ত বেষণে চলে গেছে দৃষ্টি-সীম পেরিয়ে। ওপারে পাহাড়ের কতদূর থেকে জলপ্রপাতের ধারাগুলি গাড়িরে আসছে কে জানে তার ঠিকানা।

প্রপাত থেকে বিদ্যুতের জেনারেটর তের মাইল দূরে, তিন মাইল দূরে হেড-ওয়ার্কস। এটির নাম হল মহাশা গাশ্বী হাইড্রো ইলেকট্রিকস ওয়ার্কস।

এখানে বাতীসমাগম প্রবু।

ডাকবাংলোতে 'চিভিটটারস বুক' আছে, তারি চিত্রকর্ক সেটি। দেশেব নানা প্রাপ্ত থেকে কত লোক প্রতিবছর আসে দাক-পাতের এই জলপ্রপাত দেখতে, আর কত রকমের মন্তব্য যে লিখে রেখেছে খাতাটার মধ্যে তার ঠিক নেই।

কেউ বা চাঁদের আলোর এই ধারা দেখে প্রিরা বলে একে সম্বোধন করে কবিতা লিখেছে, কেউবা এসেছে প্রথর গ্রীষ্মে যখন ধারার জল বিশুদ্ধপ্রায় হয়ে যায় তখন। সে আবার হতাল হয়ে বিরূপ মন্তব্যও করেছে। এমনি নানারকম মন্তব্যের মধ্যে একটি মন্তব্য হল what a waste, —মন্তব্যটি মহাশূরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীরার বিবেচনায়ইয়ার।

যোগ ফলস্ দেখতে এসে পরাবতী নদীর বেষণতী ধারা দেখে তিনি এই নদীর বিপুল সম্পদ-সম্ভাবনার কথা মনে পড়েন।

তাঁর মন্তব্য মহাশূরের মহারাজার কর্ণ-গোচর হল। মহারাজা তাঁকে ডেকে পাঠান এবং এ কথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করেন।

তখনো ব্যটিশ শাসন অগত্যা হরিন। দেশীয় রাজাগুলির মধ্যে মহাশূর এবং তিব্বতের এই দুইটি রাজাই সবচেয়ে অতুল ছিল। প্রজাতিব্রহ্ম কর্ণে মহাশূরের কখনো কখনো মিত্রান না। তিনি জলপ্রপাত

চাইলেন যোগ জলপ্রপাতের যে বারিধারা  
যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে আজ সহসা সন্মর  
এম বিশেষবরাইরা তাকে অপচর বস্তু মনে  
করলেন কেন, এবং এই অপচর নিবারণিত  
হতে পারে কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে।

জন্ম নিল হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পে  
স্মার এম বিশেষবরাইরারই তত্ত্বাবধানে।  
এরই জন্য মহাশূরের গ্রামে গ্রামে বৈদ্যু-  
তিক বাত জ্বলোছিল দেশ স্বাধীন হবার  
আগেই।

বস্তুতঃ স্মার এম বিশেষবরাইরা নিজেই  
একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে  
কিছু না বললে মহাশূরের যে কোন  
বর্ণনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উনশততম বৎসরেও এর দেহ ও মন  
ছিল আশ্চর্য সচল। আজ কজন ভারতীয়  
জানেন যে স্মার এম বিশেষবরাইয়ার কর্ম-  
জীবন শব্দ হঠাৎ বস্তুতঃ পূর্ত  
বিভাগের একজন এঞ্জিনীয়ার হিসাবে  
সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি হায়দ্রাবাদে  
নিজামের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং অব-  
শেষে তাঁর নিজেই প্রদেশ মহাশূরে দেওয়ান  
বা প্রধানমন্ত্রীর কর্মভার গ্রহণ করেন।  
মহাশূরের দেওয়ান তিনি বৈশিদিন  
ছিলেন না। মাত্র বছর ছয়েক। এরই মধ্যে  
এই পেশীয় বাজ্যে এমন দ্রুত শিল্পায়ন  
সাধন করেন যা প্রায় অসম্ভব।

এই ভাবতবস্তুতঃ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সর্ব-  
শ্রেষ্ঠ কীর্তি নাকি ছিল এই যে সমস্ত  
বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের বিরুদ্ধে  
তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভ্রা-  
বতীতে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন  
করেন এবং ইস্পাত আমেরিকার বস্তানি  
করে সেখানকার তৈরী ইস্পাতের চেয়ে কম  
দামে বিক্রী কবে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি  
করেন।

মহাশূরে শহর থেকে এগারো মাইল  
দূরে কুম্ভার সাগর বাধটি, যার নীচে  
বিখ্যাত বন্দাবন উদ্যান রয়েছে শ্রীবিশে-  
বরাইরাই কীর্তি। পোনে দু মাইল এই  
বাধটি দাঁড়ান ভাবতের বৃহত্তম বাধগুলির  
অন্যতম। বাধটির প্রবেশপথেই একটি  
বৃহৎ গেট দশকধের দাঁড় আকর্ষণ করে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই পাওয়া যায়  
নয়নাভিবাস বন্দাবন উদ্যান। এই উদ্যানের  
পূর্ণবিধানের বর্ণ ও সংখ্যা বৈচিত্র্য এবং  
ভাষের পরিকল্পনার দিল্লীর রাষ্ট্রপতি  
ভবনের মোগল উদ্যানের সঙ্গে বা কাশ্মীরের  
শালিমার উদ্যানের সঙ্গে তুলনা চলে।

দেশী ও বিদেশী দর্শনাথীকে যা  
বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হল সস্তা-  
হাস্য এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবের রীতিতে  
বৈদ্যুতিক আলোকমালা অসংখ্য  
ফোয়ারবাব উৎকৃষ্ট জলকণার যে ইন্দ্রধনু-  
ছটার সৃষ্টি করে সেই অসামান্য দৃশ্য।

উদ্যানে বসে সমস্ত পরিবেশটিকে উপ-  
ভোগ করতে বিশেষ সহায়তা করে ওখান-  
কার হোটেলটি। ওদিকে কেবল কফি খেয়ে  
খেয়ে মনে আছে ওখানে ভাল চা পেয়ে  
অবাক ও তৃপ্ত দুই-ই হয়েছিল।

যে নদী থেকে যোগ জলপ্রপাতের সৃষ্টি  
সেই নদীর নাম শরাবতী।

কিংবদন্তী এই যে হোতা যুগে শ্রীরাম-  
চন্দ্র একবার এসেছিলেন এখানে। তিনি  
তৎকর্ত হয়ে এখানে একটি জল সেলেন  
না। তখন তিনি পরীক্ষা করে ধার্মিক  
থেকে ধার্মিক বার করলেন, আর তাই  
থেকে বেরিয়ে এল তুম্বারা প্রাণদায়িনী  
ধারা নদী, নাম হল শরাবতী। শরাবতীর  
তীরের গ্রামের নাম তীর্থহরি।

সিমেগা জেলার এটি। সমুদ্রসমতল  
থেকে ১১৬০ ফিট উঁচু।

এই শরাবতী নদীতে বর্ষা দিয়ে বিদ্যুৎ-  
শক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে। তখন শূনে-  
ছিলাম নতুন শরাবতী জালি হাইডেল  
প্রজেক্টের উদ্বেখন করা হয়েছে কিছুদিন  
আগে। চার্লস কোটির মত টাকা খরচ হবে

এতে। মহাত্মা গান্ধী হাইডেল ওয়ার্কস-এ  
যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় তার আটগুণ  
বেশ শক্তি এই নতুন পরিকল্পনার উৎপন্ন  
হবে, আর এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ  
হলে মহাশূরে সর্বাগ্রগণ্য রাজ্য হয়ে  
দাঁড়াবে। এক ইউনিট বিদ্যুৎশক্তির দাম মাত্র  
তিন-চতুর্থাংশ পয়সা হবে। তখন শূনে  
মহাশূরে নয়, বোম্বে মাদ্রাজ অঞ্চল, কেরালার  
প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও বিদ্যুৎশক্তি  
সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এসব শূনে  
বেশ ভাল লেগেছিল।

বেলা একটা দেড়টার সময় ফিরে চললাম  
ঘাসে। শরাবতী ডাম পেরিয়ে।

পথ একই রকম। দু-পাশে পাহাড়, মাঝে  
লাল সড়কির পথ। পাহাড়ের ওপর এক-  
টানা ঘন নির্বিড় সবুজ সবুজ।

কাল যখন আসিছিলাম মিঃ ভাস্কর বল-

প্রকাশিত হল



বাংলা সাহিত্যের একটি স্বর্ণায় উৎসবাস

শংকর -এর

আশা আকাঙ্ক্ষা

“বৈজ্ঞানিক কমলেশ রায়চৌধুরী আর একবার পরম  
বিস্ময়ে মানবের সৃষ্টি এই আশ্চর্য জগতের দিকে  
তাকিয়ে রইল। এক বিচিত্র অনুভূতিতে তার মন  
ভরে উঠলো। অকস্মাৎ মনে হলো, অনাগত কালের  
মানুষ এই পৃথিবীতে বহুদিন বিচরণ করেও  
আজকের মানুষের সৃষ্টি হারিস-কামা-ভরা  
আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পারবে না।”...  
অশ্চর্য এক পটভূমিকায় এই ধরনের উপন্যাস বাংলা  
কেন, বিদেশী সাহিত্যেও আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি।

আশা আকাঙ্ক্ষা

দাম : ৬.০০

আকার অনুযায়ী এই সুদীর্ঘ উপন্যাসের দাম হওয়া উচিত  
আট টাকা, পাঠকদের সুবিধার জন্যে ছয় টাকায় দেওয়া হচ্ছে।

নতুন পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

কিংবদন্তী প্রকাশনী ৥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ৥ কলিকাতা-১



ছিলেন বাস্তাটা বড় খাবাপ বাঁধানো পীঠের রাস্তা ওরা উঁচুত। মাইশাব গভর্নমেন্টের দপ্তর দেওয়া উঁচুত একটু এলিফে। ব্যাঙ্গ্য লোবে বিধানসভার পেছনে অত টাকা বায় না করে কিছুটা এই রাস্তার পেছনে দিলেও পারতো।

ব্যাঙ্গ্যালোরের বিধানসভা দেখবার মত। কিন্তু এই তাক লাগানো গোছের বিবটি সৌখিনের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা নিয়ে তখনকার মুখামন্দী হনমন্তাইনাম বিরুদ্ধে সর্বত্র কঠোর সমালোচনা চলছিল।

কিছু প্রায় চারটে সময় এলাম সাগর শহরে। এ অঞ্চলটি চন্দনের বন ও চন্দন-কাঠের কামের জন্য বিখ্যাত।

আমরা বাজারে চন্দন কাঠের দোকান ও তাব লাগোয়া কারখানা দেখতে গেলাম। চন্দন কাঠের তৈরী ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি বাকস তাব ডালার ওপর হস্তীর প খোয়াই কবা নানাবকম কৌটো চন্দনকাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী মালা ও ছোট ছোট পাখী, জীবজন্তু অনেক দেখলাম।

ছোট ছোট কয়েকটি জিনিস কেনা হল। শুনলাম দোকানের জিনিসপত্র অধিকাংশই চলে গেছে মহাশবে সামনেই দশহরার উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হবে তাতে বিক্রীত জন্য। সেই জন্য বেশি জিনিস দেখতে পারছি না।

মহাশবের দশহরা গুরুদায়ের গণেশ

চতুর্থী বা মাহাশবের বিনায়ক উৎসবের সময় গোষ্ঠীর, কিন্তু এসে ঠিক সময়েগীর নয়। বস্তুত এর এক জীবজন্তু এবং আড়ম্বর দেখে বোঝা যায় না উৎসবটি জাতীয় না রাজকীয়। আর এ দুইয়ের একটিই যে আর একটিতে মিশে যায় মাঝে কোন সীমারেখা না রেখে সেইটেই লক্ষ্য করবার মত।

আমিতে বন্ধন বিজয়নগর রাজবংশ থেকে এই উৎসবটি প্রবর্তিত হয় তখন হয়ত যা ছিল রাজার বাসন, কিন্তু এখন এটি নিঃসন্দেহে জনতার আনন্দ প্রমোদে পরিণত হয়েছে। বহু পুরাতন এই উৎসবটিকে জনতা নিজের বসে ভাবতে শিখেছে। এখন ত সিংহগড়ের সিংহ গিরেছে পড়ে আছে শব্দ গড়। তবু সেই গড়কেই পুরো এক সপ্তাহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয় এবং উৎসবের সারা অনুষ্ঠানের সব খুঁটি-নাটি বজার বেধে সজ্জিত হাতীব ওপর স্বর্ণ সিংহাসনে বসে বর্তমান রাজ্যহীন রাজা শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন।

চন্দন কাঠের কারুশিল্প দেখা শেষ করে সম্মুখ সাগর ছাড়লাম।

রাত সাড়ে নটা। সিমোগা স্টেশনে গাড়ি থামলো। আমাদের নামিয়ে নিতে গাড়িসহ লোক ছিল স্টেশনে, রওনা হলো সার্বিট হাউসের দিকে।

ক্লিনিক জেলার সব শহর হল সিমোগা, বড় শহর প্রকাণ্ড প্রশস্ত পীঠের রাস্তা। বোধ হয় কিছুকাল আগে বর্ষি হ'ল গিরেছে জলসিক্ত রাস্তার ওপর আলোব ডোমগুলো ভিজছে জনশূন্য রাজপথ। মফস্বল শহরে যেমন হাটপথে বাত দশটা না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়েছে যেন সারা শহরটি।

শহরের বাস্তা শেষ হয়ে বাইরের সড়ক শুরু হল। সূর্য্যকির পথ দ. পাশ বড় বড় গাছ, রাতের অন্ধকারে কেমন বহুসময় লাগছে।

এক সময় গাড়ি এসে সার্বিট হাউসের বিবটি কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলো।

রাতটাই শব্দ থাকবে সেখানে। সার্বিট হাউসে খাওয়ারাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল।

খুব ভোরে উঠ দেখি চারদিকে অবা-বিত ঘাট দূরে পর্বতশ্রেণীর নীলাভ বেধা। মেঘমুক্ত আকাশে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের বঙ্গীয় বর্ণাভাস। শীত শীত হাওয়া। আটটার মধ্যেই কসে উঠলাম।

প্রথমে যাবো চিকমাগালু। তাবপর বেলুড় ও হালোবিত।

বাস এগিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের উপত্যকার মাঝে মাঝে কফি বাগান দেখা যাচ্ছে। অল্প কফির চাষ ও ফলন এ অঞ্চলে হয়।

কফিপ্রিয় দাক্ষিণাত্যবাসী।

এক এক জায়গায় কফিকেন বড় মনোরম লাগছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কফির চাষ করেছে, মাঝে মাঝেই আবার দীর্ঘশীর্ষ ইউক্যালিপটাস গাছের অরণ্য। তারই ফিকে ফিকে কফি বাগান। দূরে উপত্যকার ক্ষেত্র সবুজ ময়ূরল পেতে





নানা দিকেই বাঙালী বসবাসের অনুকূল পরিবেশ।

তাই মনে হয় পূর্ববাংলার দুখী উৎসাহুরা এখানেও কেউ কেউ ঠাই পেতে পারতেন।

স্বাধীন আগের বেরুলাম বেলুড়ের বিক্ৰম মন্দির দেখতে।

কাছেই বিক্ৰম মন্দির।

বাণী নিবাসের পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেলেই দূর থেকে দেখা যায় বিক্ৰম মন্দিরের প্রকাণ্ড গোপদম। একজন গাইডও মিলে গেল।

রমা রাও নাম। জাতিতে ব্রাহ্মণ। এর বিরাজী বছরের বৃন্দ পিতা মন্দিরের পুরোহিতদের অন্যতম।

এদের দেশ মহারাষ্ট্র, কিন্তু দীর্ঘকাল এদিকে থাকতে থাকতে মারাঠী ভাষাও প্রায় ভুলে গেছেন।

গোপদমের প্রবেশপথে প্রস্তুত সিঁড়িও এক পাশে জুড়ো খলে রাখলাম।

গোপদমের দুপাশে দুটি সিংহ মূর্তি।

ভিতরে ঢুকে মন্দিরের বিশাল পাথরে বাঁধানো চকরের মধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে মূল মন্দির, তার ওপাশেও দুটি ছোট মন্দির আছে।

মূল মন্দিরে ঢুকতে বাঁ পাশে প্রস্তম্ব-খোদিত সিংহ মূর্তি। তার গলদেশ বেঁটন করে আছে একটি বালক। কোন হুয়শালা রাজার কিশোর বয়সের বীর্য কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

ডান পাশেও তাই।

বেলুড় ও হালেবিড়ের মন্দির দুটি মহাদেবীর বিখ্যাত হুয়শালা রাজবংশের কীর্তি।

মন্দিরের ওপরে নীচে, পাশে, দরজার, প্রাচীরে, ঝিলানে, তোরণে সর্বদিকে প্রস্তম্ব-খোদিত দেবদেবীর মূর্তি, কিছু নানা অবতারের নানা লীলার।

ভেতরে মস্ত বড় মন্দির গৃহের মধ্যে বহু কক্ষবর্গের প্রস্তম্ব স্তম্ভ রয়েছে।

মোট আটচল্লিশটি স্তম্ভ এবং প্রতিটি স্তম্ভ আলাদা কারুকর্মশীল, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। অজানা শিল্পীরা কোন বিশৃঙ্খলিত মিলিয়ে গেছেন। কালের প্রহর এড়িয়ে সজীব রয়েছে প্রস্তম্বের মধ্যে তাদের অভ্যুত্থান সৃষ্টি।

চেনা কেশব অর্থাৎ কেশবসুন্দরের মতি উৎসর্গীকৃত এই মন্দির দর্শন করে ১৪০০ খৃঃ অব্দে ইরানী পরিব্রাজক আবদুল বেকাক বলেছেন যে তিনি এই অশ্রুত মন্দিরের কল্যাণ দিতে সাহসই কবেন না পাছে কেউ বলে যে লোকটা অত্যাচার করছে।

বিগ্রহের দিকে আরো সামনে এগিয়ে দেখলাম একটি গোল চব্ব।

রাজা বিক্ৰমবর্ধনের বাণী শান্তলা ন্যাক নাক করতেন এখানে দেববিগ্রহের সম্মুখে।

স্বাদশ শতকে (১১৭১ খৃঃাব্দে) হুয়শালা রাজবংশের রাজা বিক্ৰম বর্ধন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির ভবনের তিন দিকে তিন দরজা, পূর্বে উত্তরে আর দক্ষিণে। শিল্পীর চরম কল্পনা মূর্তি হয়ে আছে বিশাল বহুজা-গুলির গায়ের।

মন্দির অভ্যন্তরে প্রস্তম্ব স্তম্ভের গায়ে বেসব চিত্র আছে তার মধ্যে একটি দেখলাম শত্রুর সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধ। মেঘের আড়ালে পুষ্পক রথে মেঘনাদ যুদ্ধ করছে তাঁর ধনুক নিয়ে, সারথি রথ চালাচ্ছে, রথের আকৃতিটি অনেকটা রকেট বা বোমার মত দেখতে।

মন্দির গৃহের বাহিরেও কারুকর্ম অনেক আছে কিন্তু মন্দিরের একান্ত অভ্যন্তরে স্তম্ভে দেয়ালে সিলিঙে, স্নাকেট ফিগারে এমন অভুলনীয় কারুকর্ম ভারত-বর্ষের অপর কোন হিন্দু মন্দিরে নেই এই দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে ছাড়া।

গোল চকরের সামনেই বিক্ৰম মূর্তি। দু'বারে স্বাধীন জয়া বিজয়া, ভিতরে সিংহাসনে ছোট বিক্ৰম মূর্তি, একপাশে শ্রীদেবী, একপাশে ভূদেবী, তার পেছনে মস্ত বড় বিক্ৰম মূর্তি, পুরনে গঙ্গদেব মূর্তি, লাল পাড় বাসন্তী রঙ, নীল জামা গায়ে।

পীতবসন বনমালীর মাথার ওপরে রৌপ্যান্বিত চালসিঁদা।

শশচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি।

একটু পরে বিগ্রহের সামনে পূর্ণা টেনে ঢেকে দিলেন পুরোহিত।

সুন্দর হল কাড়া নাকাড়া নানা বাদ্যে গম্ভীর গম্ গম্ ধরনি।

বিশাল মন্দির গৃহের অভ্যন্তরে সেই মহানাদ ধ্বনিত হতে লাগল। হাত ঝোড় করে সবাই (স্থানীয় লোকও কিছু ছিল) দাঁড়ালেন দরজার দুপাশে।

একটু পরে পূর্ণা সরে গেল, কলমল করে শোভা পেতে লাগলেন চতুর্ভুজ দেবতা।

আবাব সুন্দর হল আরতির বাজনা। প্রদীপ হাতে পুরোহিত আরতি করলেন। তারপর মন্দির মধ্যে হুড়ারমান আব একজন পুরোহিতের হাতে প্রদীপ এগিয়ে দিলেন, তিনি সামনের দুপাশে শ্রীদেবী, ভূদেবীসহ নারায়ণ মূর্তির সামনে আরতি করে দুপাশে স্বাধীন জয়া বিজয়ার সামনে আরতি করে সামনে এগিয়ে এসে প্রদীপ ভুলে ধরলেন। সবাই ভক্তিভাবে স্পর্শ করল শিখর আগুন, ছোঁরাটো কপালে মাথায়। এবার পুরোহিত আরতি সুন্দর করলেন গম্ভপ্রদীপের ঝাড় দিয়ে, ভেমনি কবে ভূদেবী শ্রীদেবীসহ নারায়ণ মূর্তি-ব সামনে আরতি করলেন, তারপর আরতি করলেন স্বাধীন জয়া বিজয়ার মূর্তির সামনে।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রমা বাও-এর বৃন্দ পিতা। তাঁর অঙ্গাঙ্গী নির্দেশ এক সময় থেমে গেল আরতির বাজনা। তার বেশ রয়ে গেল বাজনা থামবার পরও

অনেকক্ষণ। সমবেত জনতা মূর্তি চক্রে হাতজোড় করে রয়েছে তখনো।

এক সময় বোঁরিয়ে এলাম।

ভেতরে স্তম্ভগায়ে, বাইরে প্রাচীরগায়ে খোদিত অসংখ্য মূর্তি, অসংখ্য চিত্র।

কোন স্তম্ভ বেঁটন করে আছে কারু-কারুকারী প্রস্তম্ববলয়। মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে ওপরে মাষিক ক্যাপ পরা মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তখনকার দিনে কেমন আধুনিক টুপি ছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগল।

বাইরে প্রস্তম্ব চক্রেও ওপরে একটা স্তম্ভ দেখলাম। স্তম্ভটির বিশেষ এই যে এটা বাইরে থেকে তৈরি করে এখানে এনে স্থাপন করা হয়েছে। এমন কি স্তম্ভের পাদমূলকে ভিতর সঙ্গে গেঁথেও দেওয়া হয়নি। এটা যে ভিত্তি সঙ্গে গাথা নেই সেইটে পবন করাব জন্য আমরা টেবের আলো ফেলে দেখলাম স্তম্ভটির পায়েব নীচের দিকে আলোব রেখা একদিক থেকে অন্যদিকে বেঁকিয়ে আসছে।

স্তম্ভটি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ থেকে নব, সেই সুন্দর স্বাদশ শতাব্দী থেকে।

বাতেশ কবস বাড়তে লাগল দাক্ষিণাত্যে সেই সুন্দর নির্জন গ্রামে।

মন্দির থেকে বোঁরিয়ে বিশাল গোপদম পেছনে রেখে বাস্তায় নামলাম আমরা।

ডাকবাংলোয় ফিরতে হবে।

অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছিল মনে আছে। বাকুচিটি অত্যন্ত কর্তব্য ও চটপটে ছিল।

পূর্ণা দিন সুপ্রভাত জানালো চারদিকের সবুজ মাঠ, দু'বের নীলাভ পাহাড়।

এবার যাবো হালেবিতে!

মাঠ দশ মাইলের পথ। দু'বদ্রান্ত পর্বতগাত দাক্ষিণাত্যের মালবাম মতদ্বন্দ্ব দৃষ্টি যায়, অপূর্ণ অপূর্ণ।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো হালেবিতে বিখ্যাত শিবমন্দিরের সামনে।

হালেবিতে হুয়শালা রাজবংশের রাজধানী ছিল। এর স্থাপত্যকলার অনেক কিছুই মুসলমান আমলে বিধ্বস্ত হয়েছে ১৩১০ খৃঃ অব্দে।

কিন্তু এই শিবমন্দিরটি আজও অক্ষত আছে।

বেলুড়ের বিক্ৰম মন্দির নির্মাণের দশ বছর পর রাজা বিক্ৰমবর্ধন এই মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। দীর্ঘ আশি বছর প্রায় দুই পুরুষের অনলস অনিরাম শিল্প-সাধনার পরও এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মন্দির অভ্যন্তরে বিবীট শিল্পীকণ দর্শন করলাম। ইনি বিক্ৰমবর্ধন হুয়শালাবর।

এই মন্দিরের দুটি গভ গৃহ, দুটিরই পৃথক দরজা আছে। একটি প্রস্তুত বারান্দা দ্বারা সংযুক্ত দুটি গভ গৃহ।

অপর গভ গৃহেও বিপুলকর শিব-লিঙ্গ রয়েছে, ইনি শান্তলেশ্বর।

(আগামীবারে সমাপ্ত)

# কথনো দিন

## উপন্যাস

# কথনো রাত

আশাচূর্ণা দেবী

(১)

বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে পর পর দুটো ঠ্যাগগাড়ি চলেছে কোনো একটা 'সংসার'কে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে। অবশ্য যদি ওই মালপত্রগুলোতে 'সংসার' বলতে হয়।

দেখতে অভূত লাগে। যে সব জিনিসপত্র একটা পুরনো বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলোকে একত্র ডাই করে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই ঠ্যাগা দুটোয়।

মালিন বিবর্ণ চোকণী আলমারি দেবাজ আয়না আলনা টেবিলের সঙ্গে ঠাশাঠাশি চলেছে অপেক্ষাকৃত শোখিন দ্বা একটা সোফা চেয়ে বসে বসে। আব ওদেরই খাজে খজ্ঞে কোশলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাড়ার ঘরের চাল গম ডাল মশলার শিশি কেতল, টিন জাপ ড্রাম।

সবই কেমন গ্রীহীন বিবর্ণ।

যার সংসার সে লোকটা যে বিশাল মেকদারের লোক নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। অর তা হলে তো তার সংসারটা লরী ব ওপর চড়ে বসতো। বোঝাই হতো চকচকে ঝকঝকে মালপত্রে। লোকটা এবারও নেহাৎ ওই ঠ্যাগাগাড়িটার মতই ঠেলে ঠেলে সংসার চালিয়ে এসেছে লড়বড় করতে করতে।

এটা মালম হুচ্ছে ওই জিনিসগুলোর চেহারা থেকে।

এগুলো এখন একটা বসবাসের মতো বাড়ির মধ্যে সাজানো থাকতো, তখন হুতো ওদের ওই জীবন বিবর্ণ পুরনো চেহারাগুলোর মধ্যেও একটা গ্রী ছিল, শোভা ছিল, কাছাকাছি গেলে হুতো দেখা যাবে, ওই টিন কৌটোর গায়ে গোছালো গহিনীর হাতের মাকড় টিকিট মারা—'বসন' 'কালোজিবে' 'হিং' 'মিষ্ণু গুড়ো'।

আজ হুতো ওই কুৎসিত রংটা ট্রাক বাক্সগুলোর ওয়ার আচ্ছাদনও খুঁজ পাওয়া যাবে এখানে ওখানে। বাড়ি ব পাদ ঝড়ে ঝড়ে অথবা সম্ভা হিট দিয়ে তৈরী বেলুতো।

হুতো পুরনো রঙিন শাড়ি থেকে বাননো পর্দার দরজা জানলা ঢেকে, আর তুলো বেরানো ছেঁড়া তোষকে নতুন সূজানি ঢেকে সোঁচব বজায় রেখে চলা হাছিল, সেই শোভা সোঁচব ধূলিমাং হয়ে গেল, সংসারকে টেনে হিঁচড়ে ঠাই-বদল করতে গিয়ে।

পিছনের ঠ্যাগাটা অরও কুদশা।

সংসারের অন্ত্যজ জিনিসগুলোর সদগতি করা হয়েছে তার ওপর দিয়ে। বালতি মগ তোলা উনুন, কাপড়কাটা গামলা, বড়ি হুপিডতে ভাঙা করলা, কাটা কাঠ করলা ভাঙা হাতুড়ি, মরচেপড়া শূন্য পাখি খাটা।

তাব মানে লোকটা সংসারই ওঠাচ্ছে নিজে উঁচুতে উঠছে না। উঠলে এই জ্বাল-গুলোও বয়ে নিয়ে যেত না, ফেলে দিয়ে যেত।

বলতো আ ছি ছি, এগুলো কখনো 'সে বাড়িতে' মানায়?

তা'গার ওঠাপড়াতেই 'সংসার ওঠানো'র দরকার পড়ে। ভাগ্যের প্রসন্ন প্রসারিত হাত এখন গলি থেকে কড় রাস্তায় বার করে নিয়ে যায়, একতলায় সাঁতসে'তে অর থেকে তিনতলার মোজাইক মাজায়, তখন ওই দরকারটা আসে, আবার যদি সেই ভাগ্যের বচ হাত তিনতলা থেকে ঠেলে ফেল দেয় নীচের তলায়, জীবনের সুবেলা ছন্দ থেকে ছন্দপতনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে তখনও আসে দরকার।

শব্দে শব্দেই সংসার ওঠানো এটা দেবাই ঘটে।

যেমন আমাদের ছেলেবেলার ওস ঘটনাটা ঘটতে দেখতাম।

কিন্তু ওইগুলোই কি 'সংসার'?

ওই শিশি কৌটো টিন ড্রাম বালতি মগ খাট আলমারি করলা ভাঙা হাতুড়ি মশলাবাটা শিল?

তাই হবে হুতো তা নইলে মা কেন বলতেন, 'সংসার ওঠাতে ওঠাতেই আবার জীবন গেল।'

ওইগুলোকেই তো 'সংসার' বলতেন মা।

বাবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জোরে জোরে বলতেন, 'জীবনে কখনো শ্রান্ত করে সংসার করতে দিলে না তুমি আমার। বেদের টোলার মত পাতিছি আর তুলছি।'

বাবা যে এতে খুব একটা বিচলিত হতেন তা নয়, তখনকার মতো সবে পড়তেন।

আমাদের কাছে কিন্তু ওই সংসার ওঠানোটা রীতিমত একটি আহমাদের ব্যাপার ছিল। এক বাসা থেকে অন্য বাসায়, এক পাড়া বদলে অন্য পাড়ায়, সে এক উত্তেজনাময় রোমাঞ্চ।

বাড়ি ওঠা মানেই তো সংসারের নিভা ছন্দ তখনও হয়ে গিয়ে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। আর ছেলেবেলার মনে তো বিশৃঙ্খলাতেই উল্লাস। বৈদ্য বাড়ি বদল হবে, তার দুচার দিন আগে থেকেই ওই ছন্দে হাত পড়তো, ভাবী জিনিসগুলো নড়িয়ে সরিয়ে একত্রে জমা করা হতো, কাঁচের বাসনপত্র, মায়া খেলনা পুড়ুলের আলমারির সব জিনিস সাবধানে সন্তপণে আলাদা আলাদাভাবে বেঁধে একধারে রাখা হতো, দেয়ালের ছবিটাই নাক্ষত্র ফেলা হতো, আমাদের ক'তাইবোনের বইখাতা শেলেট পেন্সিল দোয়াত কলম প্রার সবই প্যাক করে ফেলা হতো। অন্ততএব অবস্থাটা মনোরম তাতে আর সন্দেহ কী?

ওই প্যাক করার ব্যাপারে আমাদের মেজধাই ছিল সবচেয়ে উৎসাহী। কোথা থেকে যেন ভাল ভাল রাউন পেপার সংগ্রহ করে এন ফেলতো, আব পরিপাটি করে মূড়ে ফেলে দাঁড়িড বেঁধে রেডি করে রাখতো।

বাবার চোখে পড়লে বাবা হুতো বলতেন, 'তা' সবই বা বেঁধে ফেলাছস কেন? এই দুদিনও তো পড়বি?'

মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতেন, 'হ্যাঁ এই দুদিন বা পড়বে, তা' জানাই আছে, মিথ্যে ছড়িয়ে রেখে হারিয়ে টারিয়ে যাবে।'

ছেলেবেলায় মনে মনের কথাতো চুলোয় থাক ছেলেদের পড়া নিয়েও মা বড় মাথা আমাতেন না। হুতো তখনকার



কী বলবে' সে প্রশ্নের উত্তর চাইবার  
স্বপ্ন কাহল ছিল না আমাদের। আর  
থাকলেই বা, মারই কি জানা ছিল উত্তরটা?  
'তোকে কি বলবে?'  
এই প্রশ্নটাই ছিল একমাত্র সত্য।

বাড়ি দেখে কখনোই কিছু হতাশ  
হতাম না আমরা, দিদি আর আমি দুজনেই  
বোধকরি নতুনর ভব ছিলাম। তাই তখন  
চুপি চুপি ঠিক করে ফেলতাম কোনখানে

আমাদের জিনিসপত্র রাখবো, কোনখানে  
আমাদের 'খেলার' পাড়বো।

তাই খেলাঘর একটা থাকতো বৈকি।  
শুধু আমাদের নয়, আমাদের কালের সব  
মেয়েই। একটা খেলাঘর থাকবে না, এমন  
নিঃস্বপ্ন অবস্থা কেউ কল্পনাই করতে  
পারতো না।

আমরা বেশীর ভাগই হাতে ওঠার  
সিঁড়ির মধ্যবর্তী বড় সিঁড়ীটাকে নির্বাচন  
করতাম। ওই জায়গাটাই বাড়ির মধ্যে সব

থেকে নিরিবিলি, আর অনেক পল্লভের  
আশঙ্কা কম।

হাতে আর কে কত ওঠে?

দৈনিক কাপড়চোপড় শুকানো ভো  
যারাদাতেই হয়ে যায়, ছোটখাটো বিছানা  
পত্রও। বটা করে বিছানা মোশুরে  
সেওয়ার থাকলে আলাদা কথা। আর  
শীতকালে বা মাকে মাকে উঠতেন বাড়ি  
দিতে।

মার বাড়ি দেওয়ার দিন কি সজালবেলা

# আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো  
লালন-পালন করতে  
পারছেন কি না



আপনার মনের সাথ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনার ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ করে তাকে মানুষ  
করে তুলতে। কিন্তু এখনই শিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সাহলে ওঠা কঠিন হবে ঠিকাতো পারে। তেমন অবস্থা  
যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা জীবনের কোটি কোটি সম্পত্তি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা ওঁরা ভাবছেনই না।  
নিরোষের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোষ হ'ল, সারা বিয়ে পুরুষের সবচেয়ে প্রিয়, রবাতের ওষধিষোষক।  
নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় হ'লে জন্মনিরোষের জন্মে বহুকাল ধরে লোকে নিরোষ ব্যবহার করে আসছেন। আপনিও  
নিরোষ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র ১৫ পল্লার ৩ টি নিরোষ পাওয়া যায়

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন



## নিরোষ

লক্ষ লক্ষ লোকের অনেক মতামত, সকলে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবাতের ওষধিষোষক,  
মদ্যোহারী দোকাব, দূর্গার দোকাব, কেমিষ্টের দোকাব প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

গিয়ে হাতে কাটা বালির মার ভাবায়  
‘ক’টা ‘করে’ আসতো, তারপর মা গিয়ে  
ক্যানিকটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দু’ তিনটে  
কুস্মা কি ডালায় তেল মাখিয়ে রোপে রেখে  
আসতেন, অতঃপর ডাল কাটার গামলা  
মিয়ে উঠে যেতেন দীর্ঘসময়ের জন্য।

মা বখন নেমে আসতেন, তখন মার  
কুস্মা মুখটা লাল লাল হয়ে উঠতো, আর  
ওই শীতকালেও ঘাম গড়াতো কপালে  
গালে।

দাদা বলতো, ‘আজ্ঞা এই বাড়ি  
ব্যাপারটা কি অনিবার্য? না হলে চলে না?’

মা অবাক হয়ে বলতেন, ‘ওমা! ছেলের  
কথা শোনো! বাড়ি না হলে গেরস্তবাড়িতে  
চলে?’

‘কিনতে চিনতে পাওয়া যায় না?’

মা অবলীলায় বলে উঠতেন, ‘তা  
হয়তো যায়। কলকাতার শহরে বাড়ি  
কেলসে বাবুর দখল মেলে তো বাড়ি! কি-  
কেনা বাড়ি? গলায় দড়ি আমরা!’

গলার দড়ির পর তো আর কথা চলে  
না! অতএব দাদা বলতো, ‘মাও মুখটা  
টা-ড-জলে ধুয়ে একটু ছুয়াব বোসো গে।’

মার ওপর দাদার একটু বৈশী মায়।  
ছিল। যেন মা একটা বাচ্চা মেয়ে, আর  
দাদা তার অভিভাবক। এটা আমাদের কাছে  
বেশ মজার লগতো।

অথচ মেজদা ঠিক বিপরীত ছিল।  
মেজদাকে বরং মার শাসনকর্তা বলা  
চলতো।

মা কোনো কিছু নিয়ে আক্ষেপ  
জুড়ুলেই মেজদা কাছে গিয়ে বলতো,  
‘বকবক করলেই তোমার সব দুঃখ নিবারণ  
হয়ে থাকবে?’ বলতো, ‘ছোটখাটো সব  
ব্যাপার নিয়েই আক্ষেপ করলে, বড়  
ব্যাপারগুলোর আর গুরুত্ব থাকে না মা!  
কি আসতে দেবী করলে তুমি এমন করে  
যেন তোমার ব্যাক ফেল হয়ে গেছে!’

মা রেগে উঠে বলতেন, ‘দেবী করে  
এলে কতোটা অসুবিধে তোরা বুঝিস?’

মেজদা বলতো, ‘বুঝে না কেন?  
তবে এটাও বুঝি তোমার বাকবাকি তাকে  
তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে তোমার চরণে  
এনে ফেলতে পারবে না।’

মেজদা সব সময় একসঙ্গে অনেকটা  
কথা বলতো। দাদার কথার অভ্যাস ছিল  
ছোট ছোট টুকরো টুকরো। দুজনে  
দু’রকম।

জীবনের পথেও দু’জনে দু’পথে  
এগিয়েছে। দাদা বেছে নিয়েছিল অধ্যাপনার  
পথ, আর মেজদা ‘বাগিয়ে বসতি লক্ষ্মীর’  
নীতি অনুসরণ করে অনেক ওঠাপড়ার  
পর অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

‘কিন্তু সে তো মেজদা।’

বাবা চিরদিনই একাসনে অবিচল  
ছিলেন। কোনো এক সাহেব কোম্পানীর  
বড়বাবু।

আমাদের যে অনবরত সংসার ওঠানো  
হতো, সেটা ভাগ্যের উদ্যান পতনে নয়,  
শ্রেয় বাবার বাতিকে।

বাড়ি বদল, বাবার একটা কান্ড  
ছিল। সেকালে ‘হাব’ কথটা চালু ছিল না  
তাই বাতিকেই বলা হতো। এ যুগের চালু  
ভাষায় বলতে পারা যায় ওটাই বাবার ‘হাব’  
ছিল।

আর সেই স্বর্ণযুগে সে হাবিতে  
অসংখ্যও বিশেষ ছিল না। বাড়ি  
বদলাতে ইচ্ছে হলে, উপযুক্ত ভাড়া দিতে  
চাইলে বাড়ি পাওয়া যাবে না, এমন  
অজগৃহবি কথা কেউ ভাবতেই পারতো না।

তবে আর ‘ভাড়াটে বাড়ি’ বলেছে কেন?  
আমাদের জ্যাঠা কাকারা যে বাড়িতে  
থাকতেন, সেটা নালি আমাদের ঠাকন্দার  
তৈরী। অতএব বাবার পৈত্রিক বাড়ি। ভবু  
বাবা স্বেচ্ছায় তার সব দাবিদাওয়া ত্যাগ  
করে চলে এসেছিলেন। শব্দ ‘একঘেয়ে  
পচা পাড়ায় আর থকা যায় না বাবা’ বলে।  
এটা আমরা একটু বড় হয়ে শুনছি।

মার অসন্তোষ বাণীর মধ্যে থেকেই  
উদ্ধার করছিলাম আর কি।

মা বলতেন, ‘নিজের ডাল লাগেই  
লাগেই, বাহাদুরী করে দাবিদাওয়া ত্যাগ  
করলাম বলে লেখাপড়া করে দিয়ে আসার  
কী ছিল? আমরা ছেলে দুটোতো কণ্ঠিত  
হলো?’

বাবা হেসে উঠে বলতেন, ‘সিঁড়ি ভাঙা  
অক্ষর নিয়ে তোমার দুটো ছেলের  
ভাগে তো একটা ঘর জুটতো, কী করতে  
নিয়? মশায়ের পাঠশালা দিয়ে দুই ভাই  
বৌ নিয়ে শুলো?’

মা এরকম বাগবাগীতে দারণ চটে  
যেতেন, আর বাবর ছিল ওই রকমই কথার  
ধরন। মা চটেমটে বলতেন, ‘নাই শুলো,  
চাঁবি দিয়ে দলল বেখে আসতো।’

বাবা বলতেন, ‘চমৎকার! তুমি কেন  
উকিল হওনি তাই ভাবি।’

বেশ তা না হয় নাই হলো, ও’রা তো  
তোমার অংশের জন্যে কিছু টাকাকাড়িও  
ধরে দিতে পারতেন।’

বাবা একেয়ে গম্ভীর হয়ে যেতেন।

গম্ভীর হলেও হেসেই বলতেন, ‘ও  
বাবা, এ যে দোখ উকিল টুকিল নয়, ১৭  
একেকয়ে এ্যাটর্নি। তা টাকাকাড়িটা কে  
দেবে?’

‘কেন, বটাকুর ঠাকুরপয়া?’

‘কোন দারে? তাঁরা কি আমার  
তাড়িয়ে দিরেছেন? বলছেন, ‘তুই এ বাড়ি  
থেকে চলে যা?’ তাই খেসারত দেবেন?  
ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না  
বুঝলে?’ মা চুপ করে যেতেন। গম্ভীর  
কি রাগে কে জানে। আমরা অবশ্যই বাবার  
পক্ষে ছিলাম।

কারণ আমরা বাবার সেই পৈত্রিক  
বাড়িতে স্বর্গনি বেড়াতে বা কাজেকর্মে  
গেছি, আমাদের দম আটকে আসতো যেন।  
কেমন একটা বৃচ্ছাপা ভাব, সরো বাড়িটা  
কিনিসে বোকাই, কতো যে লোক হিসেবই  
করতে পারতাম না। মনে হতো কতোকণে  
পালাবো। অতএব বাবাকে মনে মনে  
দণ্ডবন্দ না দিয়ে পারতাম না।

মাও কি আর তা না দিতেন?

মারই কি আমাদের ওই কাকিমা  
জ্যাঠামাদের মতো কট করে থাকতে ইচ্ছে  
করতো? তবে—বাককে দেখে দেওয়ার  
একটা উপলক্ষ পাওয়া গেলে ছাড়বেন  
কেন? ও কিনিসটা আদৌ ছাড়তে রাজী  
হতেন না মা।

দ্বিদি আর আমি আড়ালে বলাবলি  
করতাম, ‘ইস! ভাগ্যস বাবা তখন মাব  
কথা শোনেন নি! শুনলে আমাদের কী  
দশাই হতো!’

আমরাও যেন ধরে নিসিঙিলম,  
একটান অনেকদিন একটা বাড়িতে থাকা  
খুব কষ্টকর।

এমনও হ’লছে কখনো কখনো একট  
পাড়ার মধ্যেই অন্য বাড়িতে উঠে বসে  
হতো। আসলে ‘ট-পেট’ দেখলেই বাবার  
মন নিসিঙিল করে উঠতো। আর সেটা তো  
সচরাচরই দেখা যেতো।

অনেক দেখে শুনে, অনেক বুঝে  
শুধে একটা বাড়িতে আসা হতো, বাবা  
বলতেন, ‘বাস! এইবার স্থিতি বুঝলে  
ন বৌ, এবার তোমার সংসারকে যতো  
পারো গুছিয়ে নিয়ে বোসো। এ বাড়ির  
তুলনা হয় না।’

কিন্তু কিছদিন যেতে না যেতেই  
বাবার চোখে বাড়ির নানান খুঁৎ ধরা  
পড়ত শূন্য করতো।

তখন মার সঙ্গে কথা কচাকাটি  
চলতো।

বাবা বলতেন, ‘এ বাড়ির বারান্দাটা বড়  
হলে কি হবে, দাঁকণে নয়।’

মা বাবার মন্তব্য বুঝে ফেলে রেগে  
গিয়ে বলতেন, ‘কেন পুঁই কি খারাপ?’

‘দাঁকণের মতন তো নয়।’





‘আসার সময় তো খুব পছন্দ করে ঢুকলে।’

‘তখন বর্ষাকাল, অতোটা বার্ষিকি।’

‘কতুতে কতুতে বাড়ি কদলাবে নাকি তুমি? নবাব না বাদশা?’

‘তা’ সামান্য চেণ্টায় যদি নবাব বাদশার সুখটা পাই মন কী?’

‘এ বাড়ির মতন ‘গাছানো’ রাসাঘব ভাড়ারখর আর জোটাতে পাববে তুমি?’

‘এর থেকে ভালও ‘জাটাতে’ পারি। এ বাড়িতে বাসাঘরে কল নেই, এবার সে রকম বাড়ি দেখাবো।’

‘এ বাড়ির ঘবগুলো কতো বড় বড়—

‘এর থেকে অনেক বড় ঘবগুলো বাড়ি কলকাতা শহরে আছে।’

‘থাকবে না কেন রাজপ্রাসাদও আছে। গুড় ঢাললেই মিস্টি।’

‘তবে সাধা মতন গুড়টা ঢালাই তো ভাল।’

‘কেবল ওই ভালোই দেখবে তুমি?’ মা বেশ জোরে জোরেই বলতেন, কেবল ভাল বাড়িতে আবাম ঘব থাকা এই সব লক্ষ্য হবে মানুষের। আখের ভাবনা না?’

বাবা হেসে উঠতেন ‘আখের? ওটা কেউ ভেবে কিছ’র কথা পাবে তোমাব বিশ্বাস? আখের নিজের নির্দিষ্ট পন্থা চলে।’

‘সংসারী মানুস মেয়েব নিয়ে, ছেলেব পড়া, এসব ভাব।’

‘আমি যে ভাবছি না তা কে বললে?’ মেয়ের বিবাহ সঙ্গ অসুখ দেখা—।’

মা একই ঘবেব মধ্যে থাকতাম না আমরা আমাদের আলাদা ঘব দাদাদের আলাদা ঘর মা বাকব আলাদা। এবং আব্বা বাড়তি পণ্য গচ্ছাতা করে ডুতে।

বাবা মনে মনে ‘আমি মনে মনে সবাই মিলে একই সঙ্গে ঠাসাঠাসি কবে থাকলে বৃন্দ সন্তুষ্টিও ভেড়ার মতন হয়ে যায়, মনেব বন্দবস্ত ‘য না।’

তা মনেব বাড়গড়ন্ত কি না খুবলেও নির্দিষ্ট আর আমার যে নিজস্ব একটা ঘর ছিল এতেই আমবা বর্ত’ যেতাম।

নিজস্ব ঘব মানেই তো নিজস্ব জগৎ।

যে জিনিসটাব স্বাদ আমাদের কোনো-দিকের কোনো তৃত্ত বেনেকই পেতে দেখানি। দেখবোই বা কী? সব বাড়িতেই তো দশ বাবোটা কল ইবোন। আমাদের মেজাপিসমার চন্দকন ছেলেমেয়ে।

ওদের আকার নিজস্ব জগৎ জুটেবে কোথা থেকে?

তবে মার কঠধনি দেয়াল ভেদ করে এ-ঘবে এসেও পৌছতো।

‘মারর বিয়ে’ শব্দটা শুনেই আমবা লজ্জার সরে গিয়ে দুজনে ঠেলাঠেলি করে হাসি চাপতে বসতাম। যেন তখনি কে আমাদের বিরুদ্ধে সম্বন্ধ করছে।

‘বিয়ে’ শব্দটার মধ্যেই লজ্জার ব্যাপার আছে এটা ছিল সংস্কারের একেবারে মর্ম-মূলে। অথচ তখনও রীতিমত উৎসাহ আর আশঙ্কির সঙ্গে সংসার ওঠানোর ছড়ানো-ছিটানো ফেলে দেওয়া জজাল থেকে দরকারী ‘জিনিস খুঁজে খুঁজে পুতুলের বাক্স বোকাই কবতাম।

এটাও তো বাড়ি বদলের একটা প্রধান আকর্ষণ।

কতো কতো জিনিসই কুড়িয়ে পাওয়া যেতো। ভাঙা হাত-আরনা বাহারী ‘শাল’ সিগারেটের রাংতা কালেন্ডরের মেমের ছবি, দু-চাবটে ডবল পরসা সমুদ্রের ঝিনুক মবচে-পড়া চাবির রিং বাতল তাসের কয়েকখানা পুরনো দাবাবোড়ের ‘সেট’-এব দু-চারটে দলচ্যুত বোকে, এমন কতো কিছু।

মনে হতো কী যেন নির্দিষ্ট ‘পলম।

কোনটা কোনটা আমাদের পুতুলেব সংসারের শোভা বর্ধন কবেব আর কোনটা কোনটা খেলাঘর’র কাজে লাগবে তখনই চিন্তা কবতে শুর’ করে দিতাম।

দিদি বলতো ‘এই এখন কিছু করিস না, নতুন বাড়ি’র গিয়ে সব সাজাবো।’

‘রাংতা দিয়ে মূড়ে ডবল পরসাগুলো টাকা কবে নিশ’ যই না দিদি?’

‘দিদি একটা চিন্তা করে পারমিশন দিতো ‘আচ্ছা তা না হয় কর। বাড়িব কতাব বাকসয় থাকবে।’

লাভস কতাব বলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই দিদিব পুতুল-বাক্সে কতাব গম্ভী ছিলে ‘কী ন্যাতন’তনী মেয়েজামাই ‘কানো কিছ’বই ঘাটতি ছিল না। এমনকি ঝি-ও ছিল একটা মাটির বেনে পুতুল।

এই সংসারেব আদর্শ ছিল আমাদের মামব বাড়ি। কাজে কাজেই দিদিব পুতুলের গম্ভী আমাদের দিদিমার ভাষায় কথা বলতো কতাব দাদামশাইয়ের গটইল এবং অধঃতনরা প্রায় ধ্বংসভাগীতে। পুতুলের খবের বোমাও ছেলেকে পড়া-পড়া করে উৎখাত কবতো।

আসল খেলাটা দিদিই খেলতো, আমি খিদমদগাব মাত্র। দিদিতে আমাতে মোটে দু’ বছরের ছোট-বড় বাড়ন্ত গড়নেব জনো আমাকেই ববং বড় দেখাতে, ‘কলু দিদিকে আমি বীতিমত গুব্জন বলেই মনে করতাম। দিদি মরতে বললে মরতে পারতাম।

পুতুল খেলাটা ছিল বাকসের মধ্যে, সবই কাল্পনিক প্রথার। শব্দ কথার মাধ্যমে দিদি ওই পুতুলবাঁহনীকে নিয়ে সংসারলীলা করতে। এবং সেই কথাবার্তার মধ্যে অপ’বপকৃত কিছু ছিল না।

দিদি গম্ভীব ভূমিকার বোকে বকে ছুত ছাড়িয়ে দিতো, বোয়ের ভূমিকার অ’ড়ালে গজ গজ কবতো কতাব ভূমিকার ‘কাজার খরচ’ বেশী হতো বলে র গারাগি কর’তা ছেলেব ভূমিকার তাল খেলতে, মাছ ধরতে চলে যেতো।

একা সকলের ভূমিকা অভিনয় করে যেতো দিদি, অসগল কথা করে করে।

খেলাঘরের ব্যাপারটা আলাদা।

সেখানে শব্দ কথার চাঝেই সব কল ফলতো না। হাতে-পায়ে কাজও করতে হতো।

বেদিন খেলাঘরে মন যেত, সেদিন ছোট ছোট করলার কুচি দিয়ে খুদে তোলা উলুনকে ধরানোর তান করতো পিঞ্জ-বোডে’ তৈরী এতটুকু পাখা দিয়ে জোর জোর বাতাস চালিয়ে উলুন ‘রানো’ হলে ভাত চড়িয়ে দিতো এতোটুকু হাঁড়িতে। আরপর বর্টি-কাটার ‘শল-নোড়া’ বাসনপত্র হাতা-খুঁতি নিয়ে লেগে যেত কোমর বেঁধে।

এসব সেট বেশীর ভাগই মাটির। ‘কউ কালীঘাটে’ পলেই এক সেট হাঁড়ি-কুড়ি খালা-গেলাশ ‘শল-নোড়া’ চাক-বেলুন এসে যেত। এমনকি কি কি তার মা গেলেও এনে দিত।

মাম কাঁচের অলমারির মধ্যে বহুবিধ লে’ভনীয় ‘খলনাব’ সেট ছিল কাপীর পেডলেব ‘খলনা, বদিনাখের লোহার খেলনা গহার পাখরের খেলনা।

এতোটুকু কুচি কুচি। সাঁড়ানী দেখলে হাসি পায় হাতা-খুঁতি দেখলে মন ‘মাহিত’ হয়ে যায়।

কাঁচের বইয়ের থেকে নির্নিমেষ দাঁড়িতে সেগুলোব ‘দক’ ডাকিয়ে থাকতাম আমরা, ‘মা একটা বার করে দাও’ এমন কথা বল’র কথা ভাব’তই পারতাম না।

মার আজস সগর ওই খেলনাগুলোর প্রতি মার যেন অপভ্রমেনই ছিল। বাঁহনীর যতো আগল রাখতেন।

বাবা মাঝে মাঝে হাসতেন। বলতেন, ‘বগু’লে’ তোদের মা অমন করে আগলার কেন জান’স? স্বর্গে গিয়ে সংসার পাতাবে বলে। হালকা তো? আচলে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে।’

মা চটে যেতেন তাই বলে মেয়েটেকে বার করে দিতেন না।

দিদি চুপি চুপি বলতো, ‘ওর অনেক খেলনাই আম’দেয়, জিনিস? লোকেরা যখন তীর্থ’টিথ’ করে এসে ওসব এনে দেয়, ছোটদেরই দেয়। ওই একদম ছোট লোহার খেলনাগুলো ছোট’পিস দেওয়ার থেকে এনে কাকে দিবেছিল? মাকে বুঝি?.. আর ওই কাশীর খুদে জাঁতি পানের ভাবর, মশলাব সাজ ওই সব? মেজমাসী দেননি কাশী থেকে এনে? এমন চটপট আলমারিতে ঢুকায় ফেলেন মা? দেখতেই দেন না?’

তা এসব তো চুপি চুপি।

জোরে জোরে বলবে এমন সাজি কার?



## সব আগুন নেভে, সব বাঁচিট থামে

‘কমল বৃগের’ যে সব অল্পাধিক লেখক আজো সক্রিয়ভাবে সাহিত্যসাধনা করে চলেছেন অচিত্তাকুমার সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও জীবনী সাহিত্যের এই চারটি শাখা তাঁর নিরলস সাহিত্য-সাধনায় পরিপূর্ণ। অচিত্তাকুমারের ছোটগল্প ও উপন্যাস বাঙালী সাহিত্যপাঠকদের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল আনন্দ ও প্রেরণা জর্গিয়েছে। সাহিত্যিক এবং সাময়িক বিষয়বস্তু তাঁর উপন্যাস ও গল্পের উপজীব্য তাই তাঁর কলমের মধ্যে সর্ব সময়েই একটা ‘টপিক্যাল ইনটারেস্ট’ থাকে—তাঁর অতি সাংপ্রতিক সুবৃহৎ উপন্যাস ‘বন্যা-কায়’ও সেই সাময়িক সমাজ চিত্র। এই বিশাল উপন্যাসের পরিচয় সূত্রে কাহিনী অংশ বিধিত করা প্রয়োজন তাই সংক্ষেপে কাহিনীটির কঠামো পরিবেশিত হল।

বনছায়া একালের মেয়ে। ধনীকন্যা। ভদ্র চাকরী করে, সাহিত্য-কর্ম করে। মনে মনে ভাবে একদিন সে সাহিত্যের জগতে অর্থাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। যা হয়ে থাকে এই সবকিছল বনছায়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম নেই। সে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক ইত্যাদি মহলে অতলবল্লভ চর্যাবল্লভ সদা সচেতন। এই সব সাহিত্যিক সংসর্গের ফলে প্রায় একই সঙ্গে দু’জন বান্ধবের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের একজন সুবীর আধুনিক কবি আরেকজন সন্দীপ একজন উপন্যাস-লেখক। এসে দু’জনেই দৃষ্টান্ত কিন্তু আদর্শে অসিদ্ধল, ধনীকন্যা চর্যেও বনছায়া এদের একজনকেই স্বামীপুত্র বরণ করতে চায়। ধনী পিতা সরসিজ মনে মনে এ’তে আছেন ধনী মার্জিনিয়ায় হিম্যাংশুকে সুপাত্র হিসাবে সন্মান করতে। বনছায়া যেখানে চাকরী করে তার

কর্তা দেবজ্যোতিও বনছায়ার প্রতি নজর রেখেছে। সরসিজ একদিন হিম্যাংশুকে আমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে সেখানে বনছায়া পছন্দ হল হিম্যাংশুর, বনছায়া একটা চাকরী প্রার্থনা করল সুবীরের জন্য এবং হিম্যাংশু রাজী হয়ে গেল। ছলনা করে বনছায়া সুবীরকে বিয়ে করল রেজিস্ট্রি করে। বিয়ে হয়ে গেল, পিতার প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার তিনি রোগে আগুন হলেন তাই একদিন সুবীরের কাছে গিয়ে উঠল বনছায়া পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে। বোদির সিঁদুর কোঁটো থেকে বেশ করে সিঁদুর নিয়ে পরল, সে আত্ম পরস্রী।

যেন বিশ্বজয় হয়েছে, সুবীরের কবি সত্যি-গণ একটা ছোট-খাটো পাটির ব্যবস্থা করল প্রবাহ সম্পাদক পীষ্ম দত্তের বাড়ির ছানে। হিম্যাংশু জ্বলে উঠল। তার তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কি ভাবে মেয়েটাকে জ্বল করা যায়। সে বনছায়ার “বস” দেবজ্যোতিকে চাপ দেয় বনছায়াকে তাড়াবার জন্য, দেবজ্যোতি বলে সুবীরকে তাড়াও। কিন্তু কারো চাকরী গেল না। হিম্যাংশু, কৌশলে জেনে নেয় ওদের জীবন কেমন চলছে।

জানাল ধরে তার অন্তরে—ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিম্যাংশু। শর্ততাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

হিম্যাংশু কৌশল করে সুবীরকে ওভারটাইম দিয়ে আটকায়। একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দেয়, বনছায়াও একটা কোয়ার্টার পেয়েছিল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সুবীরের কোয়ার্টারে এসে উঠল বনছায়া। কিন্তু নিঃসঙ্গ সম্প্রাণলি আর কাটে না। সন্দীপের কাছে গেল, সে তখন লিখছে, বনছায়াকে বেশী আমল দেয় না। বনছায়া কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় বোরের পড়ে।

সুবীরের এই সব ভালো লাগে না, বনছায়াকে হিম্যাংশুর বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বনছায়া রাজী নয়।

এদিকে সুবীর নানা প্রভাবে মদ ধরল, বনছায়াও সেখালো মদ খাওয়া, বনছায়া স্বামীর কথা বিশ্বাস করে রাজী হয়েছিল বটে, কিন্তু দু’জনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমে বেড়ে চলে। এদিকে একদিন বনছায়া আবিষ্কার করে সে সন্তানসম্ভবা। দৃঢ়চিত্ত বনছায়া এ সহ্য করতে পারে না, অনেক কৌশলে সে সন্তান নষ্ট করে এল ডাক্তারকে হাত করে। একদিন সুবীর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল, সঙ্গে তার এক চটল রমণী। নাম তার লাবণী। বনছায়া বোকে সুবীর কত নীচে নেমেছে। এটাও হিম্যাংশুর আর এক কৌশল। এদিকে সেই সময় সুদীপ্তকে বনছায়া তার উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছিল। দৃশ্য ভালো লাগে না সুদীপ্তের।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সাময়িক বিরতি ঘটল। কমা চাইল, সুদীপ্তকে আমন্ত্রণ করে আনতে বলল। এদিকে সুদীপ্তকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করল বনছায়া। ঘনিষ্ঠ হল দু’জনে। সুদীপ্ত ভাবে কি করবে, শিল্পীর দায়িত্ব অনেক, এমন কিছদ সে করবে না যাতে তার শিল্পীসত্তা ক্ষয় হয়। কিন্তু অকর্ষণ কি কাটে। একদিন এল বনছায়ার বাড়ি বাকী উপন্যাসের অংশ-টুকু শুনতে। স্বীর দৃষ্টি হয় সুবীর। সে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ বাড়লো। এক ঘরে সুবীর দলবল নিয়ে হে-হমা সরদ করে। অপর ঘরে বনছায়া সাহিত্য-সাধনা বিধিত হয়। সে সন্দীপের বাড়ি গিয়ে দেখে সন্দীপ অতি কষ্টে তার সেই ছিন্ন পাণ্ডুলিপিকে জড়ছে।

সেইখানে বসেই উপন্যাসটি নকল করল বনছায়া। তারপর ‘প্রবাহ’ সম্পাদক পীষ্ম দত্তকে একদিন মদের আসরে আমন্ত্রণ করে ‘আমন্ত্রণ’ উপন্যাসটি

## সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রকাশের ব্যয় পালন করল। প্রথম কিস্তিতেই বাজার মধ। সুবীর আবার চটল। সে ভয়ে ভয়ে তার কিতাবে উপন্যাস উদ্ধার হলো, আর কিতাবে পীত্ব দ্রব্যে হাত করলো বনহারী। হিমালয়ে চটল। সে সুবীরকে বলে এসব কতালি লেখা বন্ধ করুন, আপনায় নীকে আসন করুন। সুবীর চোটা করেছিল পীত্ব দ্রব্যে প্রসারিত তার উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ করতে কিছু পারে নি। কারণ পীত্ব দ্রব্য সাহিত্য থেকে তাই রাজী হয় না ‘অবধনা’ উপন্যাস প্রকাশ বন্ধ করতে। হাসপাতালে বন্দন ছিল বনহারী তখন সুবীর তাকে দেখতেও গেল না বলে বিচ্ছেদ পাকা হল। হাসপাতাল থেকে ফিরে সুবীরের বাড়ি গিয়ে উঠল বনহারী। হিমালয় আবার উত্তোজিত হয়ে সুবীরকে ওসকালি দেয় বিবাহ-বিচ্ছেদের, সুবীরও উকীল ঘর সন্ধান করে এবং বিচ্ছেদের মামলা রুজু করে। অভিরাণ্য অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। তাকে সাক্ষী দিতে নির্দেশ দেয় বনহারীর বিরুদ্ধে সে রাজী হয় না। অভিরাণ্যের ঢাকের গেল আবার চল বনহারীর আগ্রহে।

এদিকে মামলা এগোয় না, দুপক্ষেই কোনো আগ্রহ নেই। একদিকে যে অবধনার যিন্মরাইট কিনেছিল হিমালয়, সেই ‘অবধনা’কে ফিল্ম করা হবে এ সংবাদ নিয়ে এল লাভণী। এদিকে সম্পূর্ণ একদিন বনহারীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে গলল তুমি হাহাকাব মরুভূমি কি হবে তোমাকে নিয়ে। সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। এদিকে লাভণী জানায় সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ে হবে গেছে। এটাও আরেক চক্ৰান্ত। বনহারী আবার সম্পূর্ণ বাড়ি ছেড়ে অন্য উঠে এল, এবার সেই অভিরাণ্য তার বাড়ির কাজকর্ম করবে স্থির হল। লাভণী-সুবীরের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের শুনানি আট। বাড়িচারের সন্তোষগাণ। বিবাহের চলনা কবে বাড়িচার। কোকিলার আসামী করে পল্লি অফিসে এসে সুবীরকে ধরে নিয়ে গেল। বনহারী এ সংবাদে ক্ষেপে গেল। ‘সু সুবীরের’ মপক্ষে সাক্ষী দেবে স্থির করল। হিমালয় আবার কোশল খাটার, বলে পনের হাজার টাকা খেসার নাও লাভণী মামলা তুলে নেবে। সুবীর কোখার টাকা পাবে—‘হিমালয়’ পরামর্শ দেয় অফিসের ক্যাস থেকে নিতে, পরে না হয় পুরণ করা বাবে। পীত্ব সব শুনেন সুবীরকে বঙ্গল কাজটা চল হল, কারণ বনহারী সুবীরের নপক্ষে সাক্ষী দিত এবং মামলা ফেসে যেত। সুবীর জানল বনহারীর এই সম্পূর্ণ এবং একদিন তার বাড়ি গিয়ে উঠল। সুবীরকে বাচানোর জন্য বনহারী দুঃসম্পন্ন। সে বেশ বুকেছে এর পিছনেও সেই হিমালয়, সেই হিমালয় কোকিলারীতে জড়িয়েছে সুবীরকে। অনেকের কাছে বলল বনহারী, পিটার কাছে জেল কিছুর পেল না, সেখানে জাই একে বুকে দাঁড়ান, সম্পূর্ণের কাছে

হাত পড়ে—সেও বিয়ে করবে এবং পরিত্যক্ত পেল। সুবীর সেখানেও থিকল বনহারী।

কেউই বুকে পারছে না বনহারী এমন জীবনপন করে সুবীরকে বাচানোর চেষ্টা করছে কেন। হিমালয়ের সমস্ত চক্ৰান্ত ব্যর্থ। বনহারী বুকেছে সুবীরকে অস্বাভাব্যে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে এবং সেই লাঞ্ছনার হেতু সে নিজে। বনহারীকে লক্ষ করার জন্য, বনহারীকে পরতার জন্যই হিমালয়ের এই সব প্রচেষ্টা এই সব লক্ষ্যে কৌশল। শেষ পর্যন্ত একদিন হিমালয়ের কাছে করা দেয় বনহারী। কিন্তু এই আশ-সম্পন্ন সত্যই নয়।

হিমালয় অবশেষে পরাজিত। বনহারী বিবাহিত।

বঙ্গ বাহুল্য প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্তসার কোনো পরিচয় নয়। শুধুমাত্র গল্পাংশ দেওয়া হল। উপন্যাসের মধ্যে বনহারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মত্ততা বেডাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিজ্ঞ লেখক ডা প্রমথেনারী। সুবীর যেন এ হৃগের নিষ্কর নির্বীর্ণ পুরুষের প্রতীক। সে শূন্য ভগ্নার শিকার নয়, সে নিজেই নিজের অদৃষ্টের মাকড়সাব জালে জড়িয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ হিসাবী। তার প্রতিটি পদক্ষেপ পরিমিত এবং নিষ্কর ওজনে নির্ধারিত। পীত্ব দ্রব্য ঘ্যাটার অফ ফ্যাকট সম্পাদক। পিতা লরসিজ ব্রাজপ্রসার ও শ্রৌক ইত্যাদির লিচার এক জরগব ধনীবৃন্দ। প্রাতা খেতে নিবরী এবং বিষয়বদ্বিশসম্পন্ন। আর হিমালয়—একালেব সভ্যতা, তার চিহ্ন হল অর্থ আর সামর্থ্য তারই প্রতীক। হিমালয় সদৃশ অহংকার আর জেদ তাকে পরিত্যক্ত করেছে—কিন্তু তবু তার ওপর একটু সমবেদনা জাগে, হরত সে বনহারীকে সত্যি আপন করে পেতে চেষ্টাছিল। আর কল্প চরিত্র হলেও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী অভিরাণ্য তার চারিত্রিক মত্ততার পরিচয় দিয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে অধিকাংশ দৃশ্যগুলি লেখকের রচনা কৌশলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—একটু এদিক-ওদিক তাকালেই দেখা বাবে এই সব মানব আত্মার আঁত পেরিচিত। এবং আমাদের আশেপাশেই আছে। আর সবচেয়ে বা পরকবিতাকে আকুল করে ডা এই উপন্যাসের চমকপ্রদ মাটকীর সন্ধান।

এই নিবন্ধের শিরোনাম এই উপন্যাস থেকেই সংগৃহীত।

বঙ্গ কবিতা (উপন্যাস) অচিন্ত্যকুমার সেন-গদ্য প্রণীত। প্রকাশক—বঙ্গ প্রকাশন। ৭৯।১।বি. মহাজন গল্লী মোড়, কলিকাতা-৯। দাম—১১-০০ টাকা মাত্র।

## সাহিত্যের খবর

কলকাতার গ্রীষ্মকাল ভোররোজ

স্বাধীন ইউরেনীয় কবি গ্রীষ্মকাল ভোররোজকে গভ পড়ি আনরার, এখন সন্মার্বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-সময় নেতা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তিনি বহান সেনপ্রায়িক বুকে উল্লেখযোগ্য ঋণীকান নেতা ছিলেন। ইউরেনের একটি অংশ বঙ্গ নাগণীবাহিনী দখল করে, পদ-বাহিনীর সেনা থেকে তিনি তখন পাঠি-জানবাহিনী সংগঠন করেন এবং বিশিষ্ট নেতৃত্ব দেন। তিনি পাঠি-জান নেতা জেডাল-এর সহকারী ছিলেন। একাধিকবার তিনি গ্রেহৃত হন। বুদ্ধবুদ্ধে গেরিলবাহিনীর জন্য তিনি যে পানগলি রচনা করেন, রু-কেটেই সেনগলির সুর দেওয়া হয়, এবং পাঠি-জানদের কাছে সেনগলি আঁত প্রায় পান হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালকে জর্জোহসেন আঁত দায়িত্ব অর্কার পাবহারে। অংশ বঙ্গসেই তার পিতৃবিরোগ হয়। নিষ্কর জননী ইউরেনের জাতীয় কবি তাল্লস শেভেরেকোর কাব্যরসে ফিল্ম এসে, সাক্ষর গভর্ণমেন্টের কাছে কবিতা পাঠি পুস্তকেন। ভোররোজের কাছে শেভেরেকাই আঁত কবি-খনি তার উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। গ্রীষ্মকাল ভোররোজকে অংশ বঙ্গসেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু-সাহিত্যিক হিসাবেও তার প্রসিদ্ধি আছে। তার কাব্যরস ইত্যাদি একতর এক জোঁট কপি বিক্রি হয়েছে।

গভ ৮ই আনরার সন্ধ্যা হঠাৎ তারত-পনভাশিক জার্বনী মেরী সর্ভিতর মেরী হলে, তারত-সোভিতরে সংস্কৃতি সর্ভিত কবিতা জাহত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিবাহিনীর সর্ভিত গ্রীষ্মকালকে সংস্কৃতি জ্ঞান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন, ইউরেনীয় জাতীয় কবি শেভেরেকোর কবিতার অনুবাদক কবি গোলাপ কুমার। গ্রীষ্মকালকে স্বাধীন জ্ঞানির সর্ভিতর সাধারণ সম্পাদক তরুণ শাল্যাল বঙ্গস, ইউরেনীয় সোভিয়েত-জারত-মেরী সর্ভিতর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সর্ভিতর প্রত্যাক বোঙ্গাবোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শহরে কবি ভোররোজকে সংস্কৃতি জ্ঞান করতে দেয় তিনি গোরব বোহ করছেন। প্রত্যুত্তরে গ্রীষ্মকালকে বা পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি দ্রষ্টাজ্ঞান করে ঘটল, তিনি এ শহরে পদার্পণ করে থকা হয়েছেন। ১৯৬০ সালে একবার তিনি কলকাতা এসেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের

কবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়নি। সভার উপস্থিতিতে ভাষণ কবিদের সম্বোধন করে তিনি বলেন ইউরোপেও তরুণ কবির সংখ্যা বৃদ্ধি লাভকারী। তাঁদের অনেকে বাংলাও লিখছেন প্রত্যক্ষভাবে বাংলাভাষা থেকে কবিতা অনুবাদও তাঁরা করছেন। শীঘ্রই তাঁদের উদ্যোগে পাঠান বাংলা কবিতার একটি মোটা সংকলন প্রকাশিত হবে। দ. দেশব কবিতা পরম্পরার ভাষায় কবিতা অনুবাদের মধ্য দিয়ে দ. দেশব সাংস্কৃতিক মৈত্রী গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিতে পারেন। সভাপতি কবি শেষ অনুবাদের তিনি একাধিক কবিতা আনুষ্ঠানিক কবিতা শানান। সভাপতি কবি গোলাম কাদের শেখচন্দ্রের কবিতা কবিতা বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন এবং ভাবোৎসাহ কবিতাকর্মী ব্যাখ্যা করেন।

### অনুবাদের শীর্ষস্থান

ভাষার পাঁচল ভাঙতে হলে চাই অনুবাদকর্ম। আর তারই ভিতর দিয়ে পাঠকের হাতেব মতো চল আসে বিশ্বসাহিত্য। আসে প্রাচীনত্ব, রাজনৈতিক ও মানব জাতের সজনশীল রচনাও।

এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল অনুবাদকর্মের বিশ্বের সেরা। এ দেশের অস্তিত্ব নানান প্রজাতন্ত্রের ভাষায় অন্য দিক গ্রন্থের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বসাহিত্যের সমীক্ষা সংক্রান্ত ১৯৭০ সালের যে হিসাব বেরিয়েছে তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানধিকারীর মধ্যে হয়ে গিয়েছে জার্মানি বদল। জার্মানি ভাষাতে অনুবাদিত গ্রন্থের সংখ্যাই এখন সবচেয়ে বেশি। অবশ্য যেডারেল রিপাবলিক ও গণ প্রজাতন্ত্রী জার্মানি দুটো ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে প্রকাশিত জার্মান ভাষার অনুবাদ কর্মের মিলিত সংখ্যাই এই শীর্ষস্থান অধিকারের মতো। এই দুই দেশ যখন প্রকাশিত মোট অনুবাদিত গ্রন্থের সংখ্যা হল ৫,৯৩২। ঠিক পরের জায়গা হল সোভিয়েট ইউনিয়নের দখলে। এই দেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদিত বইয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৫৮০। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপান ফ্রান্স যথাক্রমে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এদের গ্রন্থসংখ্যা হল যথাক্রমে ২,৯৪৪; ২,৫৬৯, ২,০৬০ ১,৯১৮। এদের অনুসরণ করতে নেদারল্যান্ডস ১,৬৫১ ইতালি ১,৫৮৭ সুইডেন ১,৫৩৯ এবং চেকোস্লোভাকিয়া ১,৪৪০। আর ভানুয়ায়া অন্যান্য অল্পের নিচ।

এই আয়োজিত সমীক্ষা থেকেই জানা যায় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ২০০, সেখানে ১৯৭ এ সোভিয়েট ইউনিয়ন সংখ্যা ছিল ১০০ এর দশ গুণ। এবং ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৬১, ৩৭৯ ভান ১০৮, ৯৭

১১১, আফ্রিকা ৯৫, দক্ষিণাফ্রিকা ৫৮, বাস্কি ৭৬, মার্ক টোরেন ৭১, হেমিংওয়ে ৬৬, পাল এস বার্ক ৬৫, স্টাইনবেক ৬১।

### শ্রবণ হলো বাস্তব

ঠিক তারকা বললে ভুল হবে। এবং তার চেয়ে আরো কিছু বড়ো। আবে কয়েকটি বিশ্লেষণ এই তারকা'র আগে বসালেই ভালো হয়। মার্কিনী জনিয়ার এ-বকরই দশ গুণ সুপার স্টারকে নিয়ে একটি বই বেরিয়েছিল আমেরিকায় ১৯৭০ সালে। ঠিক দু বছরের মাঝে তাই ভাব তীব্র সংস্করণ বেরলো দিল থেকে। বইটির নাম দ্য পিসবল ড্রিম।

বিশ্বব্যাপ্তি নিয়ে টেনিস খেলাফাট আর্থার অ্যাস আটোমোবাইল সেফটি ল' বদলানোর জন্য আইনের লড়াই চালিয়ে যে তরুণ আইনজ্ঞ বেশ চামুলা সার্টি কাব-ডিক্সন একদা সেই ব্যালফ ন্যাডার সাজা

সার্টি, বোরারফোর্ট ইন দ্য পার্ক, দ্য কল কাপল, দ্য লাস্ট অব দ্য রেড হট ল্যান্ডার প্রভৃতি আলোড়নকারী গ্রন্থের লেখক মার্ক কায় নেইল সিমন্স, নিউইয়র্ক সিটি ব্যাংক ব্রডওয়ে এবং টেলিভিশনের জনচিত্তকারী নায়ক এডওয়ার্ড ভিলেয়া ক্রুভল্যাংডের কৃষ্ণাঙ্গ পৌরপ্রধান কাল স্টোবস অলিম্পিকের স্বর্ণপদকজয়ী আইস স্কেটার ককমকে উজ্জল উজ্জল তবুও পেগি হোমিং নামজাদা সাংবাদিক বিল ম্যানস যখন যুবতীর রক্ত চনমনকাবী নিয়ে গায়িকা শার্লি জেরেট, নোবেল পুরস্কারবিজয়ী কম্বস ওয়ার্টসন প্রমুখ সুপার স্টারদের জীবনের বিচিত্র কথা কেমন কবে তাঁরা অনেক বড় ব্যক্তি সহ্য করে শেষ পর্যন্ত খ্যাতি ও চর্চায় পৌঁছান যেন যাবি নিজের ক্ষেত্র সে কথাই ভুলে ধরেছেন লেখিকা মার্গ গ্রস তাঁর 'দ্য পিসবল ড্রিম' গ্রন্থে। লেখক জনি কখনো নাটকীয় ভাবেই মানব কথা না আলাপচালিতার চর্চা। ফলে সার্টি সংকলনে এসেছে বেশ ধারালো আন্তর্জাতিক সাংগঠনিক দৃষ্টি গুলি জন্ম-জন্মের মিসেসিস সার্টি ল' ইন এ।

## নতুন বই

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন—এরিক ফন দ্যান-কেন। অজব দত্ত অনুদিত। লোকায়ত্ত প্রকাশন। পিবিবিশক : দেবপ্রীতি সাহিত্য সমিতি ৫৭ সি কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ১২। দশ টাকা

এরিক ফন দ্যানকেন-এব এটি দ্বিতীয় বই প্রথমটি—দেবতা কি গ্রহান্তরায় মানব—আগেই বাংলার প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বইতেই দ্যানকেন উপস্থিত করেছেন মানব ক কবে মানব হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত তথ্য ও প্রমাণ সহ যোগ। সিদ্ধান্তটি এই বকম : আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে একদল বুদ্ধিমান জীব আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং পাখিবীর মানুষের কয়েকটিতে মাজ ঢেঁকিতে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই মানুষ বুদ্ধিমান জীব এবং তার এত দ্রুত উন্নতি। গ্রহান্তরায় এই বুদ্ধিমান জীবেরা পৃথিবীর মানুষের কাছে দেবতা। তাঁদের দানই মানুষ মানুষ। সিদ্ধান্তটি চাপানো নয়। এ জন্যে তিনি জীববিদ্যা প্রত্যাভাষা মণি মণিবিদ্যা পুস্তক ইত্যাদি প্রাচীন যাবতীয় জ্ঞানের ভান্ডার খনন করে অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, গোটা দুনিয়া ঘুরে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছে, পৃথিবীর পর সমস্ত শাস্ত্র ও পুস্তকের হিম্মত খাড়া করেছেন। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত, এবং জীবগণের এই মোষণা যে একমাত্র এই সিদ্ধান্তের আলোকেই মানুষের মানুষ হা

নয় বাখা পুণ্য সন্ত পূজ্যনীয় এতাই এত খড় বন্দু না কেন। তাঁর মতে, মানুষ ও সব জীব এ চমকো মগজযান হচ্ছে জীবনের নিবন্ধনে এ ধরনের ঘটনারি অনধ্যায়। ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক কালের সহ পুত্র খুব নিদর্শন তাঁর মতে, গ্রহান্তরায় পোক দেবতা ব আগমনেরই সাক্ষ্য। শব্দ ও পদার্থ এই দেবতাদেরই বস্তু স্মৃতি। এমনকি, দ্যানকেন বলেছেন, দেবতাদের দানে মগজসম্পদ হবার পথেও মানুষ যাত্রা, জ্ঞান অর্জন করেছে তাও দেবতাদের কলাগেই। তিনি এলাছেন এটা খুবই সুন্দর যে যে জ্ঞান আজ আমরা অর্জন করতে চাচ্ছি সেই জ্ঞান সেই ওজান নক্ষত্রের সাহায্যে বলাগেই। এমনিভাবে এবং আমাদের সামগ্রিক বিশ্বান কবে তাঁদের প্রদত্ত কবে তলাচ্চেন। এজন্যইদেব সহ, আবিষ্কারের মতো যে আবিষ্কৃত্য বলাও তাই মনেও রয়েছে এত দেবতাদেরই আখ্যান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন কেন? জীবিকা দ্যানকেন বলেছেন, প্রত্যাবর্তন কেন? আমরা ক নক্ষত্র বাজা থেকেই এসে-ছিলুম? চিরাগতব আকাঙ্ক্ষা অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা অমরত্ব কামনা - এসবই মানুষ চতনর গভীরে শেকড় ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে কামনা সে আকাঙ্ক্ষা বহুতর পুণ্যায় চতন চলেছে কোন সেই নিম্নতপুর্ন কাল থেকে। মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে

विष्णुसूक्तम् ॥ २१०, तैत्तिरीय ब्राह्मणम् ॥ कलकत्ता-२



ভাষ্য ও কাব্যবিচার প্রসঙ্গে আলোচনা-  
লক্ষণের পক্ষে নিরপেক্ষ মতামত দেওয়া  
সম্ভব হয় না। কারণ ইতিপূর্বে  
এঁরা ছাত্রপাঠ্য হওয়ার ও নানা-  
ভাবে ব্যক্তিগত শিক্কাবিদ্দের কাছে  
আলোচিত হওয়ার এঁদের একটি প্রারম্ভিক  
আলোচিত রূপ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।  
সেখানে বারীন্দ্রবাবু, যে সভাই একটি  
নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে আলোচনা  
গুলিতে সংমালোচকের সংসারের  
পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রাণসংসার বোণ্য।  
‘পদোৎপাদনের কবিতেন্দ্র’, ‘কবি বিহারী  
জাল প্রসঙ্গে’, ‘অ-দ্বন্দ্ববাদী কবি যতীন্দ্র  
নাথ সেনগুপ্ত’ ও ‘বলাকাঃ কবি, কাব্য ও  
তত্ত্ব’—এই চারটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সংকলন হ’ল  
‘কবিমানস’ গ্রন্থটি। বারীন্দ্রবাবু আলো-  
চনা কোথাও আবেগে ব্যক্তিগত হ’ল,  
আবার ব্যক্তিগত পড়ে এতটুকুও সাহিত্যের  
বিস্তৃত হয়ে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি  
দিয়ে বারীন্দ্রবাবু সমালোচনা করে গেছেন।  
কোথাও কোথাও মতবিরোধ হতে পারে,  
কিন্তু বারীন্দ্রবাবু যা বলেছেন তাকে যত্ন  
দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্থায়ী  
লিখাভঙ্গিতে তাঁর দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম  
অনুভূতির পরিচয় মেলে। বারীন্দ্রবাবুর এ  
গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এর সহজ সবল ভাষা  
ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গি। স্বভাবী ছাত্র-  
পাঠক ও সর্বস্তরের ব্যক্তিগতবীর কাছে এ  
গ্রন্থ নিজস্বই অভিনন্দনযোগ্য।

**তারি মল্ল (কবিতা-পুস্তিকা) :** ডকটর  
ভবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী; অনুবাদ ডকটর  
সুকুমার বসু ও প্রিন্সেস্বেগোপাল দত্ত।  
সম্পাদনা ডকটর বসু। জ্ঞানসাধন  
পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, জলপাই-  
গড়ি। মূল্য এক টাকা।

ভারতভূবিদ হিসেবে দর্শন্যাস  
ডকটর ভবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী হলেন আন্ত-  
র্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। মাত্র কিছুকাল  
আগে তিনি লেখেন একটি কবিতা পুস্তিকা  
His Name! নব্য বেদান্তের আলোয় বাঁচবে  
এই মূল্যবান কাব্য-অর্ঘ্যে ‘চল ধরলেন  
ভারতীয় পুরাণের এক মূল্যবান দিক।  
লিখছেন ষাঁড় পুরাণের প্রহ্লাদ-হিনয়কণি-  
শূর কহিনুর সারসর্ম্ম। কীৰ্ত্তিত হল  
ভাস্কর্যের প্রতি অবিস্তার ব্যাখ্যার শূভ  
পরিণাম।

সম্প্রতি এই ইংরেজ কবিতা-পুস্তিকার  
অনুবাদ কথানুবাদ করেছেন ডকটর সুকুমার  
বসু ও প্রিন্সেস্বেগোপাল দত্ত। এবং এই  
অনুবাদ, এমনই করকর, ও প্রাণবন্ত যে  
ভাষান্তর বলেই মনে হয় না। ফলে শব্দ  
ভাষার কাছেই নব্য কাব্যানুবাদীকে  
কাছেও এই অনুদিত কবিতা-পুস্তিকাটি  
সম্মতি হবে।

**কালী :** জীবন সরকার। অনাদিন।  
৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস। কলকাতা-  
৫৫। দাম : চার টাকা।

লেখকের পঞ্চম গ্রন্থ এটি—নির্বাচিত  
ছোটগল্পের সংকলন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার

প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬-৩৭ লেখা এ  
গল্পগাথি।

জীবন সরকার খ্যাতনামা লেখক নন,  
কিন্তু সংলেখক এবং স্বতন্ত্র জাতের  
লেখক। আধুনিকতার ক্রিয়মত্তা নেই তাঁর  
রচনার; সেমন সরল বস্তুর তের্মিন সহজ  
অনুভূতির তাঁর ভাষা।

সহৃদয়তা জীবন সরকারের রচনার  
একটি মহৎ গুণ। এই গুণেই তাঁর প্রায়  
প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠেছে সজীব। ‘কালো  
হাঁস’এর ‘অভিলিখিত’ জীবন নদীর জলে  
উলিরে বাবার আগে পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে  
যায়। ‘কাছিমটাকে’ মারতে লেখকের সঙ্গে  
দরদী পাঠকেও যেতে হয় খলোখল  
নদীতে।

**সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—**সম্পাদক অশোক কুন্ডু।  
অশোক নিলর, বোড়হল, জাগিগাড়া,  
হুগলী। দশ টাকা।

শ্রীঅশোক কুন্ডু তের্মিন আঠার সাপ-  
থেকে এই ‘সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী’ প্রকাশের  
প্রারম্ভ কাল বলে ঊৎসর্গ অংশে উল্লেখ  
করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তের্মিন উনআগি  
সালে পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে  
প্রকাশিত। শ্রীকুন্ডুর এই প্রয়াস অভিনন্দন-  
যোগ্য। লেখকের উদ্দেশ্য—এমন একটি বই  
সংকলিত করা যা থেকে ‘বাংলা সাহিত্যের  
ন্যূনতম জ্ঞান’ বাবে। উদ্দেশ্য সাধ-  
নিসঙ্গেই কিন্তু সফল করা যে  
সহজসাধ্য নয়, বর্তমান গ্রন্থে তা  
প্রমাণ আছে। একটি বিশেষ বছরের  
বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে  
যদি বর্ষপঞ্জী হয়, তবে এ গ্রন্থ তা পূরণ  
করে না। সম্পাদক বহু বিষয় বাপ দিয়েছেন  
যা নিজের আয়ত্তে নেই বলে এভাবে  
গেছেন।

বহুত মাত্র একক সম্পাদনার ‘সাহিত্যিক  
বর্ষপঞ্জী’ প্রকাশ সম্ভব নয়। নতুন পরিচয়  
প্রকাশ তালিকা’ যিনি তৈরী করেছেন সেখানে  
যে পরিগ্রহ, নিষ্ঠা, সততা থাকবে, তাকে  
সমভাবে রেখে আবার তিনি সম্পাদনার  
খানানি কাঙ্ক্ষা করবেন সমান দক্ষতায়—  
তাঁর প্রমাণ এ গ্রন্থে নেই। এককভাবে হতে  
পারে, কিন্তু তার জন্য যে অভিনিবেশ অনু-  
সন্ধান প্রয়োজন, তা সম্পাদক দিতে  
পারেননি। ইতিপূর্বে ‘সাহিত্য সাধক চরিত-  
মালা’ লেখাই, ‘অনুনা’ ‘বাগধ’ প্রকাশন সংস্থা  
জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জীর গ্রন্থমালায় এক-এক-  
জন সাহিত্যিক ধরে গ্রন্থ প্রকাশ করতেন।  
সে সময়ও গ্রন্থে, পত্রিকার স্বাভাব্য  
সত্ত্বও যে পরিগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং অনুসন্ধান-  
সার পূরক রেখেছেন, বর্তমান সম্পাদক সে-  
ক্ষেত্রে হতভাল করেছেন। কতগুলি বিষয়  
প্রবন্ধকারে, লেখক কি, যত্ন, বোঝা গেল  
না—তাতে আকৃতি অকারণ ব্যক্তি পেয়েছে।  
হুম্মানের তালিকা, হুম্মান হুম্ম-  
নাম বাহু, হুম্মান, অনেক হুম্ম-  
নামের সঙ্গে আসল নাম ঠিক নয় বলে  
মনে হয়েছে। সম্পাদকের তরফ থেকে এ

বিষয়ে আরও তৎপর এবং সঠিক হওয়া  
উচিত ছিল। গ্রন্থটি আরও সুপরিপক্ক ও  
সমবেত প্রকাশের ভিত্তিতে রচিত হওয়া  
উচিত।

**নীল আলোর হরিণ (কাব্য সংকলন)—**  
বেণু দত্তরায়। এম সি সরকার এন্ড  
সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম  
চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন  
টাকা।

শ্রীবেণু দত্তরায় তরুণ কবি। সম্ভবত  
এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘নীল আলোর হরিণ’।  
মোট সাঁইটিটি গীতিকবিতার সংকলন  
হল আলোচ্য গ্রন্থটি। কবি সচেতনভাবেই  
ছন্দ সম্পর্কে পরীকার কাজে নেমেছেন  
কয়েকটি কবিতায়। চরণে আবেগ সঞ্-  
ছাভাবিক করে চরণভাঙা ও ভাবে ওঠা-  
নামায শব্দক গঠন করেছেন বিচিত্রভাবে।  
কবি রোমান্টিক। তাই গীতিকবিতা-  
গুলিতে মিরিক মূহুর্তা যেন-বা স্বতঃ-  
স্ফূর্ত। কয়েকটি কবিতায় কবি রোমান্টিক  
কল্পনার সুস্থ পবিচয় দিয়েছেন। তাঁর চি-  
রচনার মধ্যে অনুভূতির গভীর অভিজ্ঞতা  
বাজনা পেয়েছে।

**খনের আবেক নাম বাজনীতি (উপন্যাস)।**  
প্রশান্ত বাবচৌধুরী। বাটোয়া ৩ন  
পাবলিকেশন, ৭-এ, ফারদা, নিয়োগী  
লেন কলকাতা-৪। দশ টাকা।

যে নাজনৈতিক পটভূমিকা আলোচ্য  
উপন্যাসটি রচিত, সে পটভূমিকে লেখক  
নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন  
উপন্যাসের নাটক বিপ্লব বসু বাজনীতি  
কবে। এ উপন্যাসের আবস্ত উনিশ  
বিংশ শতাব্দী সালে, শেষ ১৯৫০-এ। বিপ্লব  
বসুর জন্ম ৯ আগস্ট, উনিশ শ বিংশ শতাব্দী।  
তাই তার পথপ্রদর্শক, তার বাজনীতির গুরু  
দাদা, যাব কাছে সে বাবা মায়া বাবার পথ  
মানবে হয়, নাম রাখেন বিপ্লব। বিপ্লবে  
কৈশাব-যৌবনের বামবাঁ দলী, ৫  
বিপ্লবে বাজনৈতিক জীবনের প্রবণাদাত্রী।  
বিবাহ করে ছাত্রী মনীষাকে, কিন্তু শ্যালিকা  
মণিকা তার বাজনৈতিক জীবনের সর্ব-  
ধনিস্ত হওয়া মনীষা প্রচণ্ড অভিমান মন-  
গণ কবে ও মণিকাকে বিবাহ করার জন্য  
সুপারিশ করে যায়। মণিকা-বিপ্লবে  
বিবাহিত জীবনে আসে ‘শান্তি’—একটি  
সন্তান। উপন্যাসের শেষে মণিকার স্বামী  
হত্যার মিথ্যা দায়ে বিপ্লব ধরু পড়ে জেলে  
যায়, আর ফেরেনি। বিপ্লবের জীবনে  
গতিতে বাজনীতি কবিতা খনেকেই সত্য  
কর, বাজনীতির অর্থ বলে দেব, এ উপন্যাস  
তাই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে  
প্রত্যেকটি চরিত্র স্বেচ্ছাকৃত। গ্রন্থটি রচ-  
নাসে পড়ার মত। লেখকের বিপ্লব-ভাব-  
নিরপেক্ষ কিন্তু রুঢ় বাস্তব সঞ্-  
ছন্দ।

# স্মৃতি

প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পুন্ড্রা-লোক বৈকুণ্ঠজিও মহাশয় শিশির-কুমারের মৃত্যুবার্ষিকী প্রতিপালিত হল গত ১০ই জানুয়ারী। স্বর্গীয় মহাশয় শিশিরকুমার যৌবন থেকেই কলকাতা মহা-পাণ্ডিত্যমণ্ডলী ছিলেন, তা তাঁর জীবনের অসামান্য কর্মদক্ষতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন স্বদেশপ্রেম, দেশহিতৈষী ও পরো-পকারী, তেমনই একনিষ্ঠ সাংবাদিক, বহু-বিধ গ্রন্থের প্রখ্যাত গবেষণা ও বদান্যশীল ব্যক্তি। বহু দুর্লভ গ্রন্থের সম্ভার ঘটেছিল তাঁর চিবুকে।

বিশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে তাঁর জন্মভূমি হয় ১৮৪২ সালে এবং আজ থেকে ৬২ বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালের ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্নে ২ ঘণ্টাকার তাঁর তিরোধান ঘটে। শিশিরকুমারের পরলোক-গমনের সংবাদ তৎকালীন ভাৰতবর্ষে ও বাংলদেশেই পৌঁছন। সাংবাদিক ও মাসিক সকল প্রকাশ্য পত্রিকাতেই বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইল এবং শোকসভাও আয়োজন ও হইল বহু স্থানে। বর্তমান তাঁর চিত্রসহ তিরোধান দিবসেও সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় ও সাধুসন্তদের সঙ্গ্রে বিশেষ সম্মানিত পঞ্জিকাতেও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মহাশয় শিশিরকুমার পুন্ড্র বৈকুণ্ঠ ওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে যে কি পার্শ্বাঙ্গ প্রাধিকার করতেন, তৎকালীন নবভাবে ভাবিত, সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনের মূখপত্র মাসিক 'দেবালয়' নামক পত্রিকায়, ১৩১৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শিশিরকুমারের তিরোধান সম্পর্কে যে বিশেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে সেটি আমরা সম্পূর্ণ তুলে দিলাম। এ থেকে তাঁর প্রতি এই পত্রিকাগোষ্ঠীর অনন্যসাধারণ ভক্তি ও মূল্যায়নের স্বাক্ষর সম্যকভাবে অনুভবিত হবে। রচয়িতার নাম কলদাপ্রসাদ মল্লিক।

স্বর্গীয় মহাশয় শিশিরকুমার যৌবন

"নব্যভারতের ইতিহাসে এমন একটা দিন আঁসিয়াছিল, যখন শিক্ষিত ভারত-বাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক-দের ন্যায় মনে করিত যে, আমরা আমাদের অতীতকে একেবারে উপেক্ষা ও অমান্য করিয়া, প্রতীতি সভ্যতা ও সাধনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক নিজেদের দেশ ও জাতিকে নোহোয়াইত ও মহানীল করিব।

সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ-জীবনে এ-প্রকারে একটা সপ্তাহ ও সমালোচনার যুগ আসিয়া থাকে—ইহা অভ্যন্তরীণ সনাতন ব্যবস্থা, সূত্রসংগেই অতীত যুগের নেতৃ-বৃন্দও আমাদের ভক্তি-পূজ্যপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন।

এই যুগের অবসানে যখন অন্য একটা যুগের,— একটা সমন্বয়ের যুগের আবির্ভাব হইল—যখন 'কুম্ভাভ' বাকিল চন্দ্র মূর্খ কেহ নয় মাটী তার খাঁটি—আমরা আমাদের অতীতকে ছাড়িয়া বড় হইব না, প্রাচীনকে তাহার বাহা প্রাপ্য তাহা স্বাধিকার দান করিয়া, নবীনের সহিত তাহার বর্ধিত সমন্বয় সাধনই আমাদের মঙ্গলোৎসব পথ— এই যে নবযুগ ইহার প্রভাতে আমরা যে সমস্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই শিশির-কুমার তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

জাতীয় ভাবই শিশিরকুমারের বর্ধিত ভাব—ইহাই তাহার স্বরূপ লক্ষণ, এই ভাবের মধ্য দিয়াই তাহাকে বাকিতে হইবে। তাহার স্বদেশপ্রেমের ভাষা বৈদেশিক স্বদেশপ্রেমের অনুরোধ নহে, তিনি বৈদেশিক প্রেমের বসিয়া স্বদেশপ্রেমের বাক্যগুলি আশ্রয় করেন না—ইহা তিনি তাহার পল্লীভবনে বসিয়া অতি শৈশবে সহস্র সহস্র উপনিষৎ কবকের কাতর আত্মনামে মধ্য হইতে পাইয়াছিলেন। এই স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা ও আদর্শের জন্যও তিনি পাশ্চাত্য জগতের মূখ্যপেশী হইলেন নাই—

যুগের প্রেত গৌরব ত্রীতীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের জীবনী ও শিক্ষা তাহাকে সে উদ্ভাদনা ও সে শক্তি দান করিয়াছিল।

স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন জাতীয় ভাবের আদি ও সম্বন্ধপ্রধান কবি—তিনি ভারতের জাতীয় একতাব মনোমুগ্ধকর ছবি একটা বর্ধিত ভিত্তির উপর রাখিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ পরিবাহিত। নবীনবাবুর আত্মজীবনীতে যখন পড়ি যে, তাহার স্বদেশ প্রেম যুগোহরে অবস্থিতকালে শিশিরবাবুর সম্পর্কে আসিয়া দিন দিন বাস্তব হইতে থাকে, তখন বাকিতে পাইব প্রত্যক্ষভাবে কার্য করা জাতীয় সাধারণের অগোচরে শিশিরবাবুর জীবনী ও শিক্ষা কত বড় কার্যসাধন করিয়াছে।

ভারত-বর্ষ কেইন সাহেব শিশির-কুমারের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই দেশের অধিবাসীগণের অবস্থা সম্বন্ধে শিশির-কুমারের যে জ্ঞান ছিল তা বড়ই দুর্লভ। এই কথাটি যে একটি কত বড় সত্য তাহা আমরা অনেক সময়েই ভাবিয়া দেখি না। তৎপ্রণীত Indian Sketches নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে বাঙালী মাত্রেই অমেক চিন্তিত অবসাদ ও নিরাশা বরীভূত হইবে। আমাদের অতীত ইতিহাস গৌরব, অজ্ঞানতা বা স্বার্থপরতার কাহিনী নহে, আমরা বৈদেশিকগণের কথাকেই বৈদেশিক্যের অজ্ঞানতা ধরিয়া তাহারই পুনরা-



**বেনারসী ও সিন্ধু**

**মোহিনী মোহন**

**চট্টোপাধ্যায়**

**কলকাতা প্রিন্ট ও পাবলিশার**

**বলিকান**

বাস্তি করিয়া চলিয়াছি—প্রধানত এই জন্যই আমাদের মধ্যে এত গৃহকলহ, এত খন্দতা। আমাদের অতীত একটি নিদার কথা নহে, ইহা শিশিরকুমার অতি কৃতকার্যতার সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন। বিহারী সম্প্রদায় একজন দস্যু হইলেও সে আমাদের বাঙালী নিষ্কলীর ও মনুষ্যহীন ছিল না, আমাদের প্রতিপত্ত্যবহন স্বার্থভাবেই স্বাধীন শালনেব শক্তির অধিকারী ছিলেন, আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী মাতামহীগণ জলন্ত চিতায় যখন স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সহিত সহমরণে বাইতেন, তখন আমরা কেবল বর্বরতা ও নৃসংস্কারই দেখিতে পাই—কিন্তু ইহার মধ্যে যে বিশ্বাস, যে ভক্তি, যে আধ্যাত্মিকতা নিহিত রহিয়াছে তাহা কেবল ভারতবাসী হিন্দুকে নহে জগতের সমস্ত জাতিকেই উন্নত ও মহীয়ান করিতে সক্ষম। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে আমরা কেবল ভারতবাসী দেখিয়াছি, কিন্তু সেই সময়ের সভ্যতা যে একটা উন্নততর ও মহত্তর পদার্থ তাহা আমরা বঝিতে পারি নাই সেই জন্যই আমাদের এই দুঃশ্রম।

জাতিকে স্বার্থভাবে জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে, অতীতের সমস্ত দার্শনিক সমালোচকের মত দাঁড়াইয়া হইবে না। জিজ্ঞাসা শিকার মত বিনীতভাবে জানু পাতিতা বসিতে হইবে, তবেই আমরা স্বদেশের প্রেমসাধনার শিক্ষালাভ করিতে পারিব—ইহাই শিশিরকুমারের জীবনের একটি প্রধান শিক্ষা।

ভারতবর্ষের বাহা অস্তুপ্রকৃতি। বাহা উপনিষদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দা, চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে পরিগণিত হন। সেই উচ্চ আধ্যাত্মিকতাই শিশিরকুমারের মাথার মুকুট এবং তাহাই স্বার্থভাবে শিশিব-কুমারকে তাহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীগণের মাথার মুকুট করিয়াছে। আজকাল সংশয়-লাভ বা অজ্ঞানতাবাদ একই হৃদয় হইয়া পাড়িয়াছে, এখন হরত সে কেউ একটা কমিতেছে, কিন্তু মাঝে ইহা একটা খুব গম্ব করিবার বস্তু হইয়াছিল। সেই যুগে শিশিরকুমারের উন্নত আধ্যাত্মিকতা নয় জাহতকে অনেক পরিমাণে যে প্রকৃতিস্ব করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

• ছাড়া •  
• জাতিগত •  
গুরুদেব পণ্ডিতেরা  
বাহ্য ক্রান্তি কোর

জেনারেলেরা

করেক বৎসর পূর্বে একজন বাঙালী দার্শনিক সভ্য জগতের মনীষীদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, বাংলাদেশে আবির্ভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কৃষ্ণ চৈতন্যের কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম কেবল বর্তমান ভারতকেই গৌরবময় করিবে না বর্তমান পশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনা একই স্থানে আসিয়া স্থগিত ও ক্রান্ত হইয়া পাড়িয়াছে যে, মহা-ধর্মের প্রেরণাই তাহাকে এখন আরও উন্নতস্থানে লইয়া বাইতে পারে। দরিদ্র বাঙালী ইহা অপেক্ষা যৌনবৈরাগ্য কথা আর কিছুই বলে নাই। এই যে উক্তি এ উক্তির মূলেও শিশিরকুমারের সাধনা ও শিক্ষা জিহমান।

শিশিরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শিক্তি ভাঙালী ও ভারতবাসীকে এবং সমস্ত সভ্য জগতকে তিনি চৈতন্য মহা-প্রভুর শিক্ষা, বাহা জীবনের উচ্চতর অধিকার, তাহা প্রদান করিবেন, সে কার্য তিনি অনেক করিয়া গিয়াছেন, পাখি ব সেহে বতব্র সমস্ত ভতদুরই তিনি করিয়া গিয়াছেন বাংলা মনে হয়। কারণ তিনি তাহার তিরোভাবের দিন প্রাতঃকালে তৎপ্রণীত সঙ্গীতসম্ম 'অমির নিমাই চরিত' গানের শেষ কবীর প্রকৃষ্ণ দেখিয়া গিয়াছেন। এখনও তিনি অপসারী বহিয়াছেন, উপস্থিত পাঠে শক্তি সত্তা করিতেছেন।

ধর্মশীলতা ও লোকহিতৈষণা পবনব বিরোধী নহে, গভীর ভগবৎ প্রেমের সাহিত, দেশের জন্য সাধারণেব জন্য অকাতর পরি-গ্রহই জীবনের আদর্শ। আর এই আদর্শের জন্য বৈদেশিক গুরুত্ব লক্ষ্যপন্ন হইতে হইবে না, দেশেই যে মহান আদর্শ রহিয়াছে ইহা শিশিরকুমারের জীবনের আর একটি খুব বড় শিক্ষা।

শিশিরকুমারের জীবনের একটি শিক্ষা এই দরিদ্র দেশের সমস্ত স্বদেশীকে জিজ্ঞাসা রাখা প্রয়োজন। যিনি খেলাইতে জানেন, তিনি কাণাকড়ি লইয়াও খেলিতে পারেন। দেশের সেবা করিবার, স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা সভ্যই বাহার মনে জাগিতেছে, তাহার নিরাশ হইবার কারণ নাই;—শিশিরকুমার কত বিঘ্ন কত বিপদ ও কত অজ্ঞাবহের মধ্যে দিগে জীবনের রত উদযাপন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে নিম্নস্ত শক্তিশালীর প্রত্যেক আশা ও আনন্দের উদয় হইবে।

এখন শিশিরকুমার নিত্য বৃন্দাবনের অনন্ত আনন্দময়ে বিলম্বিত হইলেও, দেশের সমস্ত তাহার চক্রে আবদ্ধরাক্ষস - দেশ ভাঙকে বরণ করিয়াছিল, তিনিও দেশকে ধন্য করিয়াছেন—তাঁহার পদাংক অঙ্গসংলগ্ন করিতে পারিলে জাতিও ধন্য হইবে।

প্রথমবার সান্যাল সম্পাদিত পরিচি-সংবাদ পত্রিকার ১৩১৯ সালের মার্চ সংখ্যায় শিশিরকুমারের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠানের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ৫৪ বৎসর পূর্বে এই স্মৃতিসভার সংবাদটি থেকে তাঁর প্রতি ভাবশালীন

সংবাদপত্র সমূহের প্রচার একটি প্রকৃষ্ট ছবি ফটে ওঠে। সংবাদটি হচ্ছে—

স্মৃতি-সভা

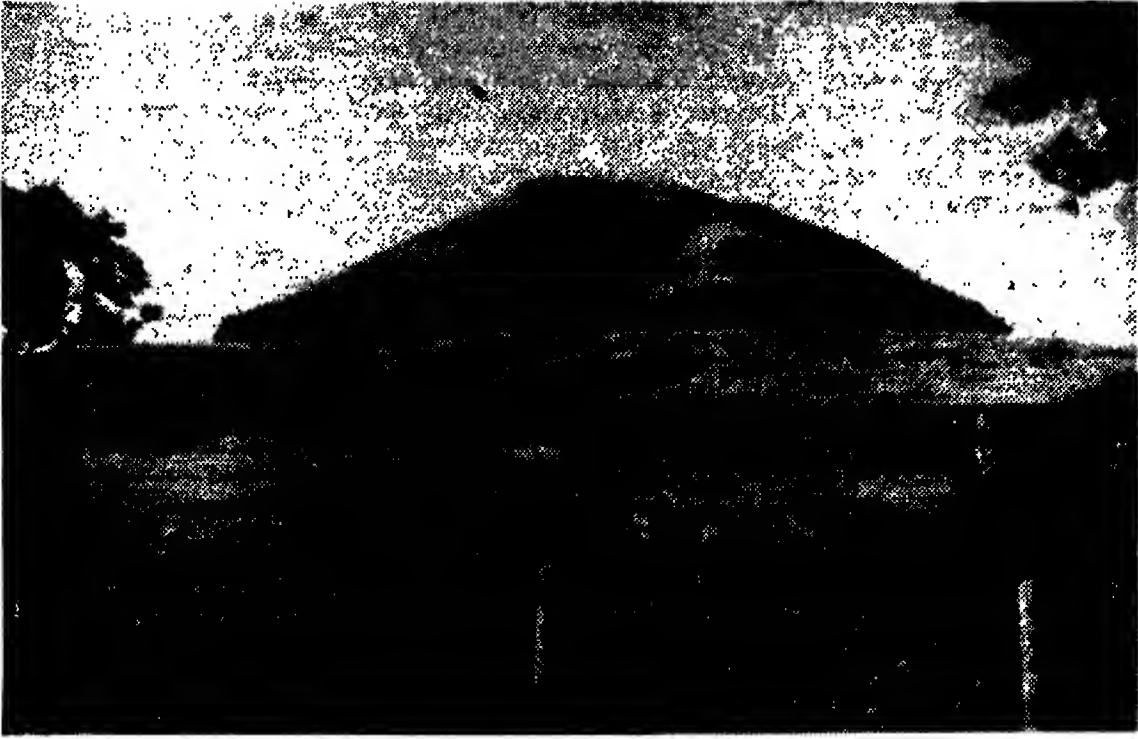
“বাংগালার সেই কপজন্মা পদব শিশিরকুমারের স্বগারোহণের দিন স্মরণ করিয়া বিগত ৪৪ মাঘ শকবাব তাহার পাখি ব কর্মক্ষেত্রে উৎসব-সমারোহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহার ভক্ত, অনুরক্ত, সন্তান, আত্মজন অনেকেই সে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার বাঙালীর কি ছিলেন, বাঙালীর তিনি কি উপকার করিয়া গিয়া-ছেন, বাঙালী হরতো এখনও তাহা বঝিতে পারিবে না। কিন্তু বতই দিন বাইবে, আমরা মৃত্যুকণ্ঠে বলিতে পারি, ততই তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

তিনি কর্মী ছিলেন, তিনি জ্ঞানী ছিলেন, তিনি ভক্ত ছিলেন। একাধারে তাহাতে তিন ভাবেরই বিকাশ পাইয়াছিল। তিনি যখন স্বদেশের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া রাজনীতির আলোচনে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কর্ম-জীবনের সেই মধ্যাহ্নালোকে দিক-দিগন্ত উজ্জ্বল হইয়া-ছিল। ‘অমৃতবাক্যার পাঠক’র অতীত ইতি-হাস বাঁহারা অবগত আছেন, এদেশে রাজ-নৈতিক আন্দোলনের মূলস্রোত বাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিবাছেন, শিশিবকুমারের কর্ম-জীবন তাঁহাদের স্মৃতিপটে চিরঅক্ষিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে এ-দেশে রাজ-নৈতিক আন্দোলনের একজন গুরু, বলিলেও বলা বাইতে পারে।

অন্যদিকে, তাঁহার ‘অমির-নিমাই চরিত’ তাহার জ্ঞানভক্তি মন্দাকিনী ধারা। তিনি কিরূপ জ্ঞানী, কিরূপ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, একমাত্র ‘অমির-নিমাই চরিতের’ উল্লেখ করিলেই সে দৃষ্টান্ত প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল; শিশিরকুমার তাহাতে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকিবে, বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রবর্তক সাধু মহাশয়গণের সঙ্গে সঙ্গে শিশিবকুমারের নামও কীর্তিত হইতে থাকিবে। তাঁহার ন্যায় ভাব-বিত্তের ভক্ত অধুনা বিরল বলিলেও সত্য্য হইবে না। তিনি যখন নামগানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইতেন, তাঁহাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইত বলিয়া ভক্তগণ বিশ্বাস করেন। তেমন সন্ন্যাস শাস্ত ভগবদ্ভক্ত আর কি আমরা দেখিতে পাইব।

বাহা বার তাহা আর ফিরিয়া আসে না। শিশিরকুমার গিয়াছেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তবে তাঁহার প্রভাব বাঙালী জাতির মধ্যে চিরজাগরু রহিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার বিবরণ কত আলোচনা হয়, তাঁহার ন্যায় মহাত্মার কর্মকাহিনী বতই স্মরণ করা যায়, ততই মঙ্গল। শিশিরকুমারের ন্যায় মহত্তর স্মৃতি-সভার, তাঁহাদের কর্মকাহিনীর আলোচনা, প্রাণ উজ্জ্বল ভাবের সঞ্চার করে। তাঁহার ন্যায় মহত্তর কথা স্মরণ, মন মহত্তর দিকেই প্রবাহিত হয়।”



## ইতিহাসের সাক্ষী ১১

শ্যামল পাঠক

কিছুই ঠিক ছিল না আগে হঠাতই এবার বোরসে পড়েছিলাম। প্রাতঃবেশী শংকর আমার ভাইয়ের মতো, মোগলসরাই-এ কাঙ্ক্ষ করে। ছুটিতে ও বাড়ী এসেছিল। শুনলাম প্যাটনাতে ওদের একটি শাখা অফিসে কাজ শেষ করে ও মোগলসরাই ফিরবে। শুনাই আমি সংগী হলাম। চলার পথে দেখে এলাম ইতিহাসের সাক্ষীদের। প্রাচীন ভারতের গৌরব ও ঐতিহ্যের চিহ্ন নিয়ে আজো তারা অনেকেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের সে প্রাণ-প্রাণু আর নেই। নেই অনেক কিছুই। মহাকাল তাদের গ্রাস করেছে। তবু যেটুকু ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, প্রতি মহাতেই বেন স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতের অতীতের সমৃদ্ধি ও আদর্শের কথা। তাই ইতিহাসের পট্টে বার বার মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা কর্তৃমানকে। বতাই দেখছি মৃগ্য হয়ে ছেঁবেছি। ফিরে এসেও তাদের কথা ভুলতে পারিনি। আমার সমস্ত মনকে জেঁতে রয়েছে ইতিহাসের সেই সকল কত-বিকৃত প্রহরী। সেই সলো ভালবেসেছি চলার পথে কণিকের কবচের। তাদের কথাই কি মজা বার?

পাঁচশে অক্টোবর বধনাব রাতে মাঠ দখলা কবলের বিছানা সঞ্চল করে আর

সামান্য শোষক সলো নিয়ে সাদা করলাম প্যাটনার পথে। হাওড়া স্টেশনে টিকিট কেটে জনতা একপ্রেসে উঠে আরগা করে বসলাম। আমাদের সামনের বেঞ্চে এক মহানরম্মা ডন-মহিলা। তাঁর সঙ্গে বাবচৌন্দ বহুরের একটি ছেলে ও সাত-আট বছরের মেয়ে। কিছুক্ষণ পরে ভ্রমমহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমরা কোথায় বাব। শুনে বললেন উনিও প্যাটনার থাকেন। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। এব আগে ওরা দিল্লী ছিলেন। বহু বছর পরে কলকাতার এসেছিলেন। অনেক কথা হল। কথাকর্তার মাধ্যমে অল্প সময়ের বৈশ্বানরিত হয়ে উঠলাম। কখন বেন মালিন্সা বলতে শুরু করেছিলেন। মনেই হিজল না কমেই ঘণ্টা আগে ওকে চিনতামই না। মাল্য গল্পে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল। এক সময় উনি আমাদের কিছু মিষ্টি খাওয়াতে চাইলেন। আমি অস্বীকার করার বোধহয় কর্তৃ হলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে আবার অনিষ্ট হবে বললেন জান। তোমার মতো বয়সেরই আমার একটা ছেলে ছিল। আমার স্বামীর কাছে অনেক ছেলেই চাকরীর খোঁজে আসত। একবার একটি ছেলে এল। সে আমার পৈতৃক ছেলেকে নিয়ে

বেড়াতে গেল বেনারস। সেখানে গঙ্গার ওরা স্নান করতে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার খোঁকা পা পিছলে পড়ে যায় ঘাটে। মাথার নাকে আঘাত লাগল। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে হাস-পাতালে পাঠান হল। খবর পেয়ে আমরাও ছুটে এলাম। কিন্তু খোঁকা আর জ্ঞান ফিরল না। কোনদিন সে আর আমাকে মা বলে ডাকবে না। মাসিয়ার চোখ সজল হয়ে উঠল। আঁচলে চোখ মছে দুপ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, অনেক রাত হল আজ থাক। উনি ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন। শংকর তখন ঘরে অচেতন। আমি দুপচাপ তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। চাঁদের অল্পাংশ আলোর সলো অন্ধকারের স্রোত তখন বাইরে মাতামাতি করছে।

তেনে আমার ঘুম হয় না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত বর্গ ঘরে ঢাল পড়েছে। ততক্ষণে বেশ শীত পড়েছে। শাণের ভিতর থেকে কবসটা বের করে গারে জড়িয়ে নিলাম। পাশের দিকে বেঞ্চে নজর পড়তে দেখলাম এক ভুল্লোল এক ভুলে। পাশে শ্রী ও শিশু পত্র ঘুমিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হানু হাসলেন। বললেন আমিও এভাবে ঘুমোতে পারি না।



উনি কল্যাণীও থেকে এসেছেন। কয়েক-দিনের জন্য রাজধানীকে বন্ধ করে দিলেন। ভ্রমোৎসবের সঙ্গে গল্প করতে-করতে আর টেনশন পেলেই চা খেয়ে রাজ্যী কাটিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে শব্দের আলো বড়ো উঠল। সৈয়দিক দ্বারের মধ্যে শব্দের আলো পড়ে এক অপূর্ণ স্বপ্নের সীমিত করল। পাহাড়ী মাটিতে শব্দের লাল আলো পড়ে মনে রক্তের খেঁচুর স্বেদ উঠেছে। শব্দের তখনও খুসোয়ে। ওকে টেনে তুলে সেই দৃশ্য দেখান।

গাড়ী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। একের পর এক টেশন পিলনে ফেলে সফল লাঞ্চে দপ্তার পাটনা টেশনে এসে থামল। লকলকে বিদায় জানিয়ে চেন থেকে চেনে টেশনের বাইরে এলাম। টেশনটি বেশ বড়। বাইরেও অনেকটা খোলা জায়গা। একটা ক্রীড়া মাঠ। দূরত্বের বাড়ী-ঘর দেখতে দেখতে গাঙ্গীময়নাল শৈলীর বেশ কিছুকণ পরে শব্দের অকস্মে এসে পৌঁছাল।

অকস্মে বলেছিলেন গঙ্গা-বঙ্গের কালী কান্যকী। শব্দের পরিচয় করিয়ে দিল। আমি মাকে মাকে কানকে লিখি শব্দে উনি ভো শব্দে শব্দী। ওখানেই পরিচয় হল প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও বালক বোমের সঙ্গে। দুজনেই ওখানে কাজ করেন। কিছু কনের মধ্যেই ওরা আমাকে আপন করে নিলেন। কালীবাবু চা রে আপ্যায়িত করলেন। অনেক সময় ধরে গল্প-মৃদু করে সময় কাটাল। তারপর একটি ছোট্টেলে খেয়ে ফিরে এসে প্রশান্তবাবু-বিশ্বনাথের শব্দে পড়লাম। সন্ধ্যাবেলার ধরে বেড়ালাম সকলে মিলে। তখন শহর আলোর সজ্জা করছে। শব্দের পাশ দিয়েই ধরে গিয়েছে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে গািব বসলাম। অনেককণ গল্প করে রাত্রে ছোট্টেলেই আহারশেষ শেষ করলাম।

পাটনার ছোট্টেলে থেকে বেশ বড় হর। সর্বাঙ্গী, এমন কি ডাল-ভরকাবাও আলো নামে কিনতে হয়। আর ভরকা নামে ডাল-সহস্র যে ভরকারী ভা আমাকে শব্দই নিরাশ করল। লামের ব্যাপারেও পাটনার আমি শব্দী হতে পরলাম না। হাই হোক রাত্রে ফিরে এলাম। অকস্মেই মেঝেতে খুসানোর আরোজন করা গেল। আরোজনই বটে। আগেই বলেছি দুটি মাত্র কবলই আমার ভরসা। একটি কবল বিছিরে অপরাট পরে দিলাম। আমার অবশিষ্ট জামা-প্যান্ট ভাঁজ করে তোমারো বড়োবাঁজ বালক। পরিচালিত দেখে বেশ সন্তুষ্ট হই মনে হল। কিন্তু ইতিমধ্যে অলপো মদ্য আমাদের আরম্ভ করে; বোমের ওমেব রাত্রে অস্বাভিক প্রবেশের অপরাধে। সঙ্গে মদ্যের সেই, অতএব শব্দ একতরফ। এদিকে শীতও পড়েছে বেশ। সেবে নিদ্রাপন্ন হয়ে শীতের মধ্যেই পরোদমে পাখা চালিয়ে শব্দে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। এই অকস্মেও বেশ কিছুটা শব্দীয়েছিলেন।

পরদিন জেগেব রাজধানীর বাবার কথা। মাত্র লাঞ্চে ভিটাইল সময়ই আমার শব্দ

ভেঙে গেছে, বোমের মদ্যই এগিয়ে। শব্দ থেকে উঠে আলো জেগে দেখলাম কবলের বাইরে থাক আমার হাত ও মৃদু কলমে গেছে—শব্দেরও। উঠেই বৈ-চৈ করে সজ্জা করে টেনে তুললাম। আমার সঙ্গে শব্দের বাবার কথা। কিন্তু একটু পরে প্রশান্তবাবু ও বালকবাবুকেও কল হরে ভেরী হতে দেখা গেল। ওরা কলেন, আমরাও কিছু বাছি। অচ্য অগ্রেদিন রাতেও থেকে চলান।

শব্দ ভেঙেই আমার রক্তা হল। বাল-শ্যাতাই চা-পর্ব শেষ করে ভোরের বাসে থাকা করলাম। বাসে দেখলাম অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম। ইতিমধ্যে বাস ছেড়ে দিল। শব্দে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল রাজধানীর দিকে। আলো দিয়ে দেখলাম শব্দে কল, গানের ছায়া ছোট ছোট গ্রাম, কখন বা আঁকা-বঁকা নদী। মনে হল শিল্পীর ক্যানভাসে ধরা পড়েছে কতগুলি নিখুঁত সীমিত ছবি। প্রকৃতি সেরা সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। পাটনা থেকে রাজধানীর চৌধুরী মাইল পথ। এতটা পথ, কিন্তু মনে হল বেশ জঙ্গলভাঙি পৌঁছে গেলাম।

অনেক দূর থেকেই রাজধানীর পাহাড় প্রাণী দেখা যাছিল। উদ্ভব হয়ে তাকিয়ে-ছিলাম। বাস থামতেই লেগে পড়লাম। দু-চোখ ভরে দেখলাম পাহাড় বৌদ্ধ মৃত প্রকৃতির লীলাঙ্কুর-প্রাচীন মগধের রাজধানী এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও মুসলমানদের তীর্থস্থান রাজধানীর বা রাজ-গৃহকে। রাজগৃহ ছিল প্রাচীন ভারতের এক সমৃদ্ধিশালী নগর। এই ঐতিহাসিক ভূমিতে ভারতের ঐতিহ্যের অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। এই ভূমিতেই শব্দের শব্দে বাভেব আগে একসময়ে পাঁচ বছর উপস্যা করেছিলেন এবং শব্দে লাভেব পরেও মগধ সম্রাট বিম্বিসারের সমরে এই স্থানটি ছিল ভগবান শব্দের অভ্যন্ত প্রিয়। বিম্বিসারের শাসনকালেই রাজগৃহ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। এই সময়েই অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাবীর ও রাজধানীর এবং নালন্দা কিত্তকাল অতিবাহিত করেছিলেন। শব্দের ও মহাবীর দুজনেই ছিলেন অজাতশত্রুর সম-সামরিক। অজাতশত্রুর পর উদারীভূত সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালেই পাটলিপুত্র নির্মিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-গৃহের গৌরবও হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য হিন্দু, বৌদ্ধ জৈন ও পরবর্তীকালের দৃষ্টিতে রাজধানীর মাধ্যম আজও অকুর রয়েছে। কিন্তু আজ আর সেই রাজগৃহ নেই, সেই তার রাজধানী। শব্দ দেখা দার চারদিকে ভাঁজের আছে বালকশব্দ। শব্দ হরে দেখাই আর ভাবাই।

একটু পরেই কিছুটা এগিয়ে ..... এতটা চারের মোকাবেলা শেট করে অজাতশত্রু ও চা পাল করলাম। তারপর একটা টাঙ্গা ভাঙা করে শব্দে আরম্ভ করলাম। চললাম বিদ্যুৎ-গিরি, কল্যাণী, উদারীভূত ও টাঙ্গার

গিরি। প্রতিটি পাহাড়েই হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের মন্দির আছে। পাহাড়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর। টাঙ্গা থেকে বৈভার গিরিতে উঠলাম। প্রথমে দেখলাম বালকশব্দ, সন্তোষা ও কালীমারা কুন্ড। পুরের উপর দিয়ে সরস্বতী নদী পার হয়ে এখানে আসতে হয়। সরস্বতী মন্দির এবং অন্যান্য মন্দিরও দেখা হল। বহু তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের কুন্ডে স্নান করতে দেখলাম। সন্তোষার গরম জল নাকি নানা রোগ নিরাময় করে।

বালকশব্দের পশ্চিম দিক দিয়ে পথ বৈভার গিরির উপরে উঠে গেছে। এই পথে উপরে উঠে পিপ্পল গুহা দেখলাম। এটিকে নিরীক্ষণ মিনার এবং জরাসন্ধের বৈঠকও বলা হয়। বৌদ্ধ-মহিহতোও এর উল্লেখ আছে। শব্দের নাকি এখানে প্রায়ই আসতেন। এটি বড় বড় পাথরে নির্মিত কৃত্রিম গুহা। এখান থেকে আরো উপরে আধুনিক জৈন মন্দির দেখে সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সন্তোষা গুহার পৌঁছালাম। এখানে পর পর কতগুলি কোদিত গুহার প্রাণী আছে। শব্দে শব্দের শব্দের নির্বাণলাভের পরে প্রথম বৌদ্ধ-সংগীতি ও ভিক্ষু সম্মেলন এখানেই হয়েছিল।

পাহাড়ে উঠে বেশ ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক জারগার আমরা বলে পড়লাম কিংও বিপ্রাসের জন্য। অদূরে দেখলাম একটি বাঙালী মেয়ে তাব ছোট ভাইয়েব সঙ্গে গল্প করছে। আমাদের দেখে হেসে বলল, শিবমন্দির না দেখে কিন্তু ফিবাবন না। তাহলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। তখনবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সেইজন্যই তো আসা। এতটুকু সংকোচ নষ্ট মেয়েটি। এর পরই সে ভাইয়ের সঙ্গে ছুটে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এবটু বৈভার হলেই গড়ির পড়ার সম্ভাবনা। বোধকরি প্রকৃতির রূপ দেখে ও বেড়াতে আসা জানলে ও নিজের তারল্য হাবিরে ফেলেছে। অশান্ত মেয়েটি।

তখন আমরা কল রয়েছি অনেক উঁচুতে। এখান থেকে উপত্যকা ও অন্যান্য পাহাড়গুলিকে দেখে তার অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হতে হয়। কয়েকটা ছবি তুললাম। তারপর এগোলাম শিবমন্দিরের রাস্তার দিকে। রাস্তার উপরেই দেখলাম প্রাচীন জৈন মন্দিরের অবশেষ। মধ্যে কবলদের, পূর্ণনাথ ও মহাবীরের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি সন্তোষ: শব্দে পূর্ণ পতম পতাকার। এখান থেকে কিছু দীর্ঘে এগিয়েই দেখা গেলাম সন্তোষ বা অজ্ঞ পতাকার একটি ভূমি শিবমন্দিরের। মন্দিরের বাইরের মজ্জার কেবল সন্তোষ-গুহাই বিদ্যমান করছে। মন্দিরগত-রূপে দিখালি ও শব্দী নদীর মূর্তি। এমার আমরা কল এলাম বৈভার দিককে বিদায় জানিয়ে। শব্দের মোহিত হইছিল এই ভাবে যে, একদিন শব্দের, মহাবীর এইসব পথে ভ্রমণ করতেন। প্রাচীন ভারতের কল ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে এই ভূমিতে।



পাহাড় থেকে নামতে কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল না। নামতে নামতে বাতাসের বালু ছিটকিয়ে এত কাছে আমরা আছি কিন্তু এতদিন আসা হয়নি। আপনি না এলে হয়তো এসব দেখাট হতো না। বললাম, সেইজন্যই তো কথা বলি, গায়ের যোগা ভিখ পার না। ওয়াও একমত।

বৈভারগিরি থেকে নেমে টাঙ্গার চড়ে উপত্যকা অঞ্চলে একে একে দেখলাম মনিয়ার মঠ, স্বর্ণভাঙ্গার, বিশ্বিসার বন্দীগহ প্রভৃতি। মনিয়ার মঠ থেকে পশ্চিম দিকে স্বর্ণভাঙ্গার অবস্থিত। জনপ্রতি যে এখানেই রাজা বিশ্বিসারের কোথাগার ছিল। আর মনিয়ার মঠের দক্ষিণে পাটনা গঙ্গা রাজপথে এগিয়ে এক আশ্চর্য চওড়া দেওয়ালে ঘেঁষা জায়গার নাম বিশ্বিসার বন্দীগহ। শুনলাম, এখানেই অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। টাঙ্গা এগিয়ে চলল বানগঙ্গার দিকে। উদয়গিরি ও সোনাগিরির মধ্যবর্তী উপত্যকায় বসে চলেছে বানগঙ্গার ধারা। এখানকার প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই মোহিত হয়ে গেলাম। কাছেই দক্ষিণ দিকে দেখলাম বিরাট বিরাট পাথরে নির্মিত প্রাকার। প্রাচীন নগরেন এটিই ছিল সুরক্ষাযুক্ত দেওয়াল। এটি প্রাকারটি নাকি পাহাড়গুলির শিখর অতিক্রম করে পশ্চিম থেকে গ্রিন মাইল ক্রান্ত। ভাঙলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এই প্রাকারটি কোন মাল মশলাব সাহায্য ছাড়াই তৈরী হয়েছিল সেই প্রাচীনকালে। অথচ আজও সে তার অস্তিত্ব অনেকাংশেই বক্ষ্য রেখেছে। এখান থেকে চললাম রত্নগিরির দিকে। এখানে টাঙ্গার চড়ে কিন্তু বেশ লাগছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরবীর অবশেষের মধ্যে ঘোড়ার খবের শব্দ আর টাঙ্গার দোলনাতনে মনে হচ্ছিল একদিন তো এখানে এইভাবেই পথেব ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটেতো রথ নিয়ে। অবশ্য সেই দিন এখন স্বপ্নমাত্র। শব্দ পড়ে আছে তার স্মৃতিগুলি।

এলাম রত্নগিরিতে। এখানেও অনেক মন্দির আছে। রত্নগিরির শিবতীর শিখরে জাপান বৌদ্ধ সংঘের অধ্যাপক উদয়মের ফর্মে ফুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্বশান্তি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। বিশ্বশান্তি স্তূপ দর্শনের জন্য রত্নগিরির উপর রত্নশ্রুপ আছে। বিশ্বশান্তি স্তূপ দর্শন করে গুরুকূটে বুদ্ধদেবের বহু স্মৃতি বিজড়িত গুহা দর্শন দেখলাম। এই শৃংগটি রত্নগিরিরই একটি অংশ। ফেরার পথে বেনবেন ও বাজগীর গ্রাম দেখে একটি বাঙালী হোটেলে এলাম। তখন ক্রিষ্টাব্দ আমরা সকলেই অস্থির। হোটেলে তাকাতাড়ি খেয়ে আবার রওনা হলাম। স্নান করা আর হল না। কুণ্ডে প্রচণ্ড ভীড় দেখে স্নান করতে ভরসা পাইনি।

বাস স্টপে এসে শুনলাম নালন্দার বাস আসতে দেখা হবে। কিন্তু সময় আমাদের সীমিত। তাই ওখানেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে ভাগে একটি ট্যাক্সি নিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট মেয়ে। মেয়ে দুটি খুবই চঞ্চল। স্কুলে

পড়ে। নালন্দা সম্পর্কে ওদের খুবই উৎসাহ। ট্যাক্সিতে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, ভাড়াই হল আপনারা সলো থেকে। অনেকেই এই সময় আসতে নিবেদন করেছিলেন। কলই বাড়ী করে যাযো। আজ না খেলে নালন্দা দেখা হবে না, তাই চলে এলাম। বললাম, ভাড়াই করেছেন। কিন্তু নালন্দা নির্জন স্থান। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আর বাস রাস্তাও অনেকটা দূরে। তাই অনেকেই বিকেলে যেতে চান না। ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে তাকাতাড়ি যাবে যাযো। রাজগীর থেকে নালন্দা সাত মাইল উত্তরে। কথার কথার আমরা এসে পড়লাম।

সেদিন শুরুর, তাই টিকিট কাটতে হল না। ভিতরে প্রবেশ করতেই সামনে নজর পড়ল মধ্য স্তূপটির দিকে। চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে আছে বন্য-বন্য। আশ্চর্য নীরবতা। বেন প্রাচীন কাল থেকে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে কোন জায়। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পটভূমি এই নালন্দাই একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। আজ

আমরা দেশ-বিদেশে যাচ্ছি উচ্চশিক্ষার জন্য। কিন্তু সেদিন দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত এখানে আসতেন অধ্যয়নের জন্য।

পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত শাসক কুমারগুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম থেকেই নালন্দা ছিল বৌদ্ধদেব প্রধান কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই বিখ্যাত হয়েছিল। গুপ্ত শৃংশের শাসন কালেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির চরম সীমার ওঠে। মুহারাজ হর্ষবর্ধন ও পাল বংশের বাজাবা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পুণ্ড্রপোষক ছিলেন। এছাড়া আরো অনেক রাজার দানে নালন্দা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়ান সাঙ যখন জ্ঞান-চর্চায় জন্য এখানে আসেন তখন মহাপণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। সেই সময়ে দশ চাক্ষু ছাত্র ও দেড় হাজার অধ্যাপক এখানে বাস করতেন। নালন্দা ছিল আকর্ষক বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখানে ছাত্রদের অধ্যয়ন ও খাওয়ার জন্য বোন খরচ লাগত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ যেমন জ্ঞানদানে

## ব্যথা-বেদনা কষিয়ে দ্রুত আরাম দেয় ইউথেরিয়া

নৈসর্গিক শক্তি



মাংসপেশীর ব্যথা, গাঁটের ব্যথা, মটকে বাঁওরা, প্রদাহ বা কোলা, বুকে পানি জমা, মাথা ধরা, নাক বুজে থাকে ইত্যাদি সবরকম অবস্থার এই শ্রী যালিন করলে শীঘ্র আরাম পাওয়া যায়।

নৈসর্গিক শক্তি

৩০ মার্চ ১৩৭১

## নালন্দার মধ্য ধ্বংসস্থল



আগ্রহী ছিলেন শিষ্যরাও তেমন। জ্ঞানার্জনের জন্য সবসময় সচেষ্ট হতেন। নালন্দার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে আচার্য নাগার্জুন আৰ্যসেব, জিনমিত্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল গুপ্তভট্ট শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের সূত্র থেকে নালন্দারও অবনতি আসন্ন হল: ১১৯৭-১২০০ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খিজাজী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেন। এই সময় ভিক্টোর ভায়া করে পশ্চিমকালারটিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অশোকেশ্বর ফলে চৈত্যা, বিহার, মন্দির সবই ধ্বংসস্থলে পরিণত হল।

ঘুরে ঘুরে বহু স্তূপ ও বিহার দেখলাম। মধ্য স্তূপের সিঁড়ি বেয়ে স্তূপের শীর্ষে উঠলাম। এখান থেকে সমস্ত ধ্বংস ক্ষেত্রটিই দেখা যাচ্ছিল। মাটি খনন করে এগর উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্য স্তূপটি কতগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ দ্বারা পরিবেষ্টিত চতুষ্কোণ বৌদ্ধ মন্দির। দেওয়ালের উপর বুদ্ধমূর্তি নির্মিত। বিভিন্ন বিহারের অঙ্গনে দেখলাম অষ্টকোণ কূপ, উন্নত স্তূপ।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে ফিরে এলাম বাইরে। একটা ছোট চানের দোকানে বসলাম সবাই। চাপান শেষ করে অদূরেই ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় গেলাম। এখানে নালন্দার ধ্বংসস্থলে উপহারপ্রাপ্ত প্রচুর মূর্তি শীলমোহর খেলনা, বাসন, শিলালেখ, দস্ত চাউল প্রভৃতি রাখা হয়েছে। এই মিউজিয়ামটি খুবই সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা নিয়ে বাস। রাস্তায় চললাম। আমাদের চাকরটি কিন্তু নিতান্তই কিশোর। চলাতে চলাতে ওর সঙ্গে আমরা বেন মিশে গেলাম। ছেলেরি ছোট হলেও বেশ আলাপী। ওর বাবা অসুস্থ, কাজ করতে পারে না। তাই

ওদের ছোট সংসারের হাল ওকে এই বরসেই ধরতে হবে। শনে খুবই কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। বাস স্টাণ্ডে এসে ওর ভাড়া মিটিয়ে বিদায় জানালাম। বিবর মূখে মিস্ট হাসি ফুটিয়ে গাড়ী নিয়ে ও খীয়ে চলে গেল।

ফেরার পথে যেতে হবে পাওয়াপুর্বা। বিহারশরীফ থেকে আট মাইল দক্ষিণে। শুনলাম বিহার-শরীফে বাস অনেক দেরীতে আসে। কাছেই একটা টাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করতেই অস্বাভাবিক ভাড়া চেষ্টা বসল। বিরক্ত হয়ে আমরা গিছিবে এলাম। এখানে টাক্সিতে মিটার নেই। যে যা নিতে পারে। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে তার স্ত্রী। বোধহয় বেশীদিন নিয়ে যান। ভদ্রলোক ঐ টাক্সিতে আমাদের শেয়ারে বাবার জন্য বললেন। কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। দেখলাম ভদ্রমহিলার মধ্য ভাব চোখে ফোলা। কারবার তিনি চাপা স্ববে বলছেন, এই তো সন্ধ্যা হয়ে এল। এখন বাস না পেলো? ভদ্র রাজগীর, নালন্দা একদিনে দেখতে হবে। ভদ্রলোককেও কিছুটা বিরক্ত মনে হল। এমন সময় একটা শেয়ারের টাক্সি এল, ভেতরে অনেক লোক। ভদ্রলোক কোনরকমে তার স্ত্রীকে নিয়ে উঠলেন। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার মধ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে হাসি দেখা দিল। আমাদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়তা হাসি হাসলেন। যেন আমাদের হাথিয়ে দিলেন। তারপর হাত মেড়ে বিদায় জানালেন। আমরাও হাত নাড়লাম।

তখন আমরা বেশ জমিয়ে গল্প করছিলাম কেয়েকজন স্থানীয় চাবীর সঙ্গে। মাঠ থেকে ওরা ঘরে ফিরেছিল। আমরাই ডেকে কথা বললাম। কী সরল ওরা। কলকাতা সম্পর্কে ওদের তো খুবই উৎসাহ। একজন বলল ফেলস যে, ভাগ্যে থাকলে একবার কলকাতা দেখে যাবে। দেখলাম ওরা বেশ গরীব, কিন্তু চারিদিক ওদের উদারবুদ্ধি প্রাণ ফুটিয়ে পাবেনি। একদ

পরেই আমরাও শেয়ারের টাক্সি পেলাম। ছোটলাস পাওয়াপুর্বাতে। ওখানে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল।

পাওয়াপুর্বাতে জৈনের চাম্পনভর তীর্থঙ্কর মহাবীর মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। এখানে দুটি মন্দির আছে। যেখানে মহাবীর দেহভাগ করেন একটি মন্দির সেখানে। এটি গ্রামে অবস্থিত। আর যেখানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে পঞ্চদশীর মাঝখানে সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। চমৎকার মন্দিরটি। রাস্তা জোখানার আলোকে বেন স্থানময় হয়ে উঠেছে। চেরে থাকলাম অনেকক্ষণ। শংকর বলল এবার ফেরা যাক। ফিরলাম বিহার শরীফ। ওখান থেকে পাটনার বাস ধরলাম।

শীতের ঠান্ডা হাওয়া বইছে, শীত লাগছে বেশ। ফাঁকা রাস্তায় বড়ের বেগে বাস ছুটল। বাসেব সমস্ত জানালা বন্ধ, তবুও ঠান্ডা লাগছে। রাত প্রায় এগারোটায় বাস পাটনা এসে থামল। বাস থেকে নেমে আমরা সোজা হোটেলের দিকে চললাম খাবার জন্য। শবীব তখন ক্রান্ত। অবসর দেহে হোটেল থেকে ফিরে এলাম আস্তানায। শূন্য পড়তেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

পঞ্চদিন ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হলাম পাটনা শহরটা ভাল করে দেখবার জন্য। তখন শংকর বলল, সকালে একটা কালীদার বাসায় যেতে হবে। বৌদি আপনাকেও যেতে বলেছেন। অফিসেব কাছেই কালীদার বাস। যেতেই বৌদি শংকরকে বলে উঠলেন, এতক্ষণে আসা হল। আমি তো জাবলাম জুড়েই গেছ আমাকে। বসতে বললেন আমাদের। অনেক গল্প করলেন। সন্ধ্যাবে চা-পর্বও এখানেই সমাধা হল। ফেরাব আগে বললেন ঘাটে কিন্তু এখানেই আপনাবা থাকেন। পাটনার হোটেল থেকে আমার উৎসাহ নেই। সুতরাং খুশীই হলাম।

রাস্তায় নেমে একটা রিক্সা ভাড়া করলাম। একে একে দেখলাম বিভিন্ন কলেজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্রেটারিয়েট ভবন, বিধানসভা ভবন, মিউজিয়াম ও গোলঘর। গোলঘরটি ইংরেজ আমলের গম্বুজাকৃতি বিবাত গুদামখানা। বাইরের দিকে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। উপরে উঠে দেখলাম, এখান থেকে গঙ্গা ও সমস্ত শহরটাই প্রায় দেখা যায়। শহরের প্রান্তে দেখলাম ছোট বিমানঘাটি। সবশেষে কুমরাহার গ্রামে অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। কালের ধ্বংসশীল প্রভাবে তার সমানাই অবশিষ্ট আছে। পাটনারই প্রাচীন নাম ছিল পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র ছিল অশোকের রাজধানী। অশোকের সময়েই এই রাজপ্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল।

জাই হোক পাটনা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হ'ল না। এখানকার বিধানসভা ভবন ও হাইকোর্টের বাড়ী-গুলিতে ছাদ নেই, উপরে টালি বা খোলা দিয়ে বাংলায় কালোয় ছাওয়া। কিছু জিয়ারতী অবশ্য খুবই সুন্দর। এখানে মাঝে মাঝেই পথে রিক্সা, সাইকেল ও অন্যান্য গাড়িতে জট বেঁধে বার। ট্রাফিক আইনেরও অনেকই ধার ধারে না। যে যেখানে দিয়ে পারে চালিয়ে দেয়। চলাব পথে এখানে বেশ কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হল। শুনলাম প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখানে অনেকেই সু-প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর সংখ্যাও অনেক। একটি বাঙালী সাংস্কৃতিক সংস্থার পাকা পূজা-মন্ডপ ও ব্যায়ামাগার দেখলাম। এখানে নানিক বাঙালীদের আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক সমিতি আছে। তরাণও প্রতি বছর দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। পাটনার এসে এখানকার একটি বাংলা সাময়িকপত্রও চোখে পড়ছিল। পথে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিছুদিন হল তিনি চাকরী নিয়ে এখানে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন যাই বলুন এখানকার প্রবাসী বাঙালীরা কিন্তু খুবই আত্মকেন্দ্রিক। আন্তরিকতা কড়ি একটা নেই। জানি না ভদ্রলোক কোথাও আঘাত পেয়েছেন কিনা।

ফিরতে অনেক দেবী হল। রোদ কাঁ কাঁ কবছে, আগের দিন স্নান করা হয়নি, বেশ অস্বস্তি লাগছে। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষীণও পেয়েছে। যেনবা পথে তাই আগেই থেয়ে নিলাম। ফিবে এসে একটু বিশ্রাম করে মাথায় কয়েক বালতি জল ঢালতেই শবীর ঠান্ডা।

দুপুরে ঘুম দিয়ে সন্ধ্যায় উঠলাম। শংকর ওব এক বন্ধুর বাড়ী গেল। আমি আর গেলাম না। সকালে অনেক ঘুরেছি, চুপচাপ বসে থাকতেই তখন ভাল লাগল।

সন্ধ্যাবে পাবে একটা চারের দোকানে গিয়ে চা পান করছি। দেখলাম কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। ওদের মধ্যে একজন প্রশান্তবাবু ও বাবলুবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিন আছেন? বললাম, আজ পর্যন্তই। ওখান থেকে ফিবে এসে চুপ-চাপ ও, হেনরীর গল্পের বইটা নিয়ে বসলাম। রাত নটার সময় কালীবাবু এলেন, বললেন মনে আছে তো? শংকরের খোঁজ কবলেন। বললাম বন্ধুর বাড়ী গিয়েছে এখনো ফেরেনি। উনি বললেন, ও এলেই কিন্তু আপনারা চলে যাবেন, ডাকতে হবে না বেন। রাত সাড়ে দশটারও শংকরের পাতা নেই। কালীবাবু, আবাব এলেন। শুনলেন, ও ঐ-রকমট পালল। কিছুই খোঁজা থাকে না। ওখান থেকেই হযতো খেয়ে ফিরবে। চলুন আপনি থেয়ে নেবেন। একটা আমি খেয়ে এলাম। বৌদি বললেন, শংকরের কাণ্ডটা দেখলেন?

খেয়ে না এলে বড রাতই হোক ওকে পাঠিয়ে দেবেন।

রাত বারোটার শংকর এলো। আসতেই আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, কী ব্যাপার, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ও বলল, বন্ধু না খেয়ে কিছুতেই আসতে দিল না। অনেক বার বলছিলাম, শুনলো না। আপনি খেয়েছেন তো? বললাম, আমার জন্য দেখছি তোমার খুবই চিন্তা। এরপর কঞ্চল বিছিরে শুরে পড়লাম। পরদিন মোগলসরাই বেড় হব। সেই কথা ভাবতে ভাবতে কখন বেন ঘুমিয়ে পড়ছি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল মিছিলের চিংকারে। পাটনার এসে এই ব্যাপারটা নতুন দেখলাম। যে কদিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিনই ভোরবেলা মিছিলের চিংকার শুনছি, অবশ্য বেশী লোকের নয়। প্রথম দিন তো বৃষ্টি না পেরে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সকাল-বেলার স্নান সেরে, জিনিস-পত্র গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। সাড়ে আটটা নাগার

আমরা রিক্সার উঠলাম স্টেশনে বাবার জন্য। কালীবাবু সন্ধ্যাই এসেছিলেন, প্রশান্তবাবু এবং বাবলুবাবুও রাত্তা পর্যন্ত এলেন। ওরা বললেন, আবাব আসবেন কিন্তু। বললাম, না এলেও আপনারা ফুলখো না। রিক্সা এগিয়ে চলল, হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালাম।

স্টেশনে পৌঁছে কিছু জলখাবার খেয়ে নিলাম। শংকর টিকিট কাটতে গেল। টিকিট কেটে আমরা ক্যান্টনমেন্ট এ এলাম। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেছে। ডাক্তারজি উঠে আমরা একটা জরুরি বেছে নিয়ে বললাম। জানালা দিয়ে ডাক্তার দেখলাম আকাশে মেঘ জমতে বরষ কবেছে। বোধ হয় বর্ষা হবে। একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের গতি দ্রুত হল। সেই সঙ্গে মন হল উন্নত। স্নান স্মৃতি মনে গেঁথে পাটনা থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু মনে হল, কারা যেন তখনও আমাকে পিছন থেকে হাতখানি দিতে ডাকছে।

(আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।)

## আশোক

নং ১  
যাহার বিশেষত্ব  
অনেক



- ১। তারতের সর্বপ্রথম স্টেইনলেস রেজ।
- ২। তারতের সর্বাধিক মিতব্যয়ী রেজ।
- ৩। তারতের সর্বাধিক দ্রবদ্রিয় রেজ।

ASHOK

আশোক স্টেইনলেস তারতের নং ১ রেজ।

## মধ্যপথে ॥ গোবিন্দ মদখোপাধ্যায়

ওদিকে পঙ্কজ বেলার রক্তিম আলপনা-আঁকা পথ,  
সেখানে নিজেকে মেড়ে দাও তুমি ধূসর খেলালে  
এদিকে ধূসর ধূসরতর অববাহিকা,  
তোমার প্রতিগণ্ডে সন্নিবিষ্ট।  
মধ্যপথে যেতে থাকা অসম্ভব,  
কল্যাণ নিবাস স্বেচ্ছীক! পর হাতে ওং পেতে আছে অদরে।  
পিছনের পথের তারা টানছে,  
সামনের আলোকিত পথ হাতছানি দিচ্ছে,  
নিরাশা কণীর মতো আপন মনে উজ্জ্বলিত তুমি,  
বুকের মধ্যে পাবির কাকলি:  
নিজেকে উন্মথিত করে, উন্মথিত করে,  
হাউই-এর মতো উর্ধ্ব আকাশে উঠে,  
সেখার ইচ্ছা হয়—  
নিখিল নীতিমার পটভূমিকার  
উজ্জ্বল উৎসের অনাবৃত বুকের মতো তোমার রূপ  
প্লেটে ইচ্ছা হয়—  
বসন্ত বনে কোকিলের স্বরের মতো তোমার আলাপ।

একবারের খেপো পেলাক, বুকের চুলচেরা ছিঁড়ে,  
কেনো নিজে, নিজেকে কতকিন্তু করে, ধন্য হতে চার দেহমন  
সামর্থ্য প্রেমের সমুদ্রে সাঁতার কেটে, নাকি বৃক্ষের স্থান  
দখল হতে।

ওদিকে পঙ্কজ বেলার রক্তিম আলপনা-আঁকা পথ,  
এদিকে ধূসর ধূসরতর অববাহিকা।

## রৌদ্রে অনালোয় ॥ শব্দ মদখোপাধ্যায়

ভুই যেন মা চৌপহরে পাগলপারা,  
চালতিতে তোমার ছাড়িয়ে যেন কপাল সিঁদুর  
তুমি তখন বিপুল হেঁকে কলছ শব্দ  
আমার প্রতিছায়,  
যেমন রেখে অবরোহী  
বৃক্ষ এখন বসন্ত জুড়ে প্রাকৃত ইচ্ছায়।

বিমি এখন পাগল ছেলের  
ভাজছে ধানের খই  
মাপো এমন উল্খলনে  
কপাল সিঁদুর কই।

## নিষ্ঠুর রাবণ, তুমি ॥

রঞ্জিতকুমার সরকার

তোমার নিরাভরণ ঘড়ি নেমে এসেছিলো  
আমার পল্লবহুল বিছানায়,  
উল্লেখ্য সূড়পের মধ্যে একটি সম্মানী মাছি  
নীলমুখ ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছে  
আমার দুঃস্বামী স্বপ্ন,  
জিহ্বাভঙ্গির মধ্যে সটান চলে যাচ্ছে  
আমার রক্ত দুহাত—  
এই দ্বিধাশীল ঋতু-আলোচ্য  
এবং তার আশ্রিত আবহসংগীত  
আমাকে নির্বাসিত চেয়ারে বসিয়ে দায়  
ঢেরে প্যাখো, হে কিম্বর—  
তোমার বীভৎস তালাচারি  
আমাকে কলী করে ভবিতবকাব্যীময় গাজ,  
নিষ্ঠুর রাবণ তুমি গম্ভীর ছিঁড়ে নিয়ে চলো  
উজ্জ্বল অশোককাননে।

[ উপন্যাস ]

# ফুল ফোটার আগে

শৈলেন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন অফিসে সোজা দেশপাণ্ডেড  
ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেশপাণ্ডেড একটা  
ফাইল গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন।  
আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম  
‘একটা ভরতী দরকার ছিল।’

দেশপাণ্ডেড মূখ না তুলেই হাতের  
ইসমার চেঁচাবে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ  
বসে থাকার পরেও যখন মূখ তুললেন না  
আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, ‘জামসেদ-  
পুয়ের ডিলার অ্যাপয়েন্ট করাপ ব্যাপার  
নিরে—’

আমার কথা শেষ হবার আগেই দেশ  
পাণ্ডেড বলে উঠলেন আমি একেবারে ভুলে  
গিয়েছিলাম। কাল হেড অফিস থেকে  
ডিলার অ্যাপয়েন্ট করে চিঠি দিয়েছে।’

‘হেড অফিস কেন? ইস্টার্ন জোন তো  
কোলাকাতার আডারে।’

দেশপাণ্ডেড খাড়া ভুলেই নামিয়ে  
নিলেন। বললেন, ‘হেড অফিস হয়ত মনে  
করেছে, ইন্ডারর সমস্ত জোনই তাদের  
আডাবে। থাকবে, যে-কথা বলাইলাম, ওরা  
দস্তুর আন্ড কোম্পানীকে ভাল কোর ভায়  
বিশ্বাসে।’

‘আমাকে জামসেদপুয়ে পাঠানো হল  
কেন?’ নিজের কানেই নিজের গলা কিম্বা  
ককশ শোনাল।

দেশপাণ্ডেড চমকা খুলে নিয়ে রুমাল  
দিয়ে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন,  
‘আপনাকে জামসেদপুয়ে পাঠিয়েছিলাম  
আমি। দস্তুর কোম্পানীকে অ্যাপয়েন্ট  
করেছে হেড অফিস, বুঝতেই পারছেন, এই  
অ্যাপয়েন্ট আমি সম্পূর্ণ অসহায়।’

উত্তর দেবার কস কথা খুঁজে  
বেড়াইছিলাম। দেশপাণ্ডেড বলে উঠলেন,  
‘কাল আমার মেয়ে এসেছে। ও একা একা  
এখানে বোর ফিল করে। সময় করে যদি  
ওকে সঙ্গে দিতে পারেন ও খুশী হবে।’

‘আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো’ বলে  
উঠে পড়লাম। একটা খানি জেন আমার

অন্তরে ছাড়িয়ে পড়তে লাগল। শশাঙ্ক  
মুখার্জিকে একরকম কথাই দিয়ে এসে-  
ছিলাম। লোকটা হয়ত আমার ওপর  
বিশ্বাস করে বসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে  
ভাবার চেষ্টা করলাম, ও একজন মাতাল।  
যা ভাল হলে মানুষ মনুষ্য হারিয়ে ফেলে।  
মনুষ্য না হাবালে নিজের স্ত্রী কিম্বা  
ছেলেকে মারে না মানুষ। শশাঙ্ক যে এক-  
জন দুষ্টুর মাতাল একথা ভাবতে  
‘পরে উপরে উপরে আমি আবার স্বাভাবিক  
হয়ে এলাম। মনে মনে এই বলে নিজেকে  
সাম্প্রদায় দিতে চাইলাম, জামসেদপুয়ে  
‘মস্তুরই দেশ কয়েকজন বাঙালী দরসাদার  
আছে। তাদের মধ্যে একজনের বেশী কেউ  
মুখ খায় নিশ্চয়। সুতরাং শশাঙ্ক  
মুখার্জিই যে করবার স্বামী তাব কোন  
মানে নেই। হলেও, করবার স্বামীকে  
সাহায্য করাও নৈতিক দায়িত্ব আমার  
থাকবার কথা না। কবরী ইচ্ছে করলে  
আমাকে ওদের জামসেদপুয়ের বাড়ির  
ঠিকানা দিতে পারত। কিন্তু দেয়নি। তার  
গানে, করবী আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে  
চায় না। যদি চাইত করবী অসুখ আচারে  
একটা চিঠি দিতে পারতো। এখন কবরী  
কোথায় আছে? ওং হোম দেখাশুনি কি  
কবরীকে আমার কথা বলেছিল? মনে  
করবী কি ভেবেছিল কে জানে। হয়ত  
ভেবেছিল, লোকটা অত্যন্ত লোভী।  
পূর্বনো সম্পর্ক ধরে আবার নতুন করে  
কাছে আসতে চায়। হয়ত করবী মনে মনে  
বিস্ময় হয়েছিল। কিম্বা কে জানে সুখী  
হয়েছিল বা। ভেবেছিল, আমি এখনও ওকে  
মনে করে রেখেছি।

অফিসে বসে এই সব আবোল-ভাবোল  
কথা ভাবা উচিত না। এতে কাজের  
বাঘাত ঘটে। কিন্তু কবরী আমার সঙ্গে  
লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। হাত  
মন থেকে ওকে তাড়াতে চাইছিলাম, ততই  
ও ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে  
লাগল। এক এক সময় করবীকে বেশ খুব  
স্পষ্টভাবে দেখতেও পাচ্ছিলাম। কথা বলার  
সঙ্গে সঙ্গে করবীর ওপরের চোঁট একটা  
ফুলে ওঠে। সেই ফোলা ফোলা ভাবটাও

তখন দেখতে পাচ্ছিলাম। করবীর গা দিয়ে  
একটা মৃদু সৌরভ আসতো সেই রূপ  
বেন আমাকে স্পর্শ করতে লাগল।  
কবরীকে নিয়ে যখন এভাবে খেলা করছি-  
লাম, ঘরে এসে ঢুকলেন ডেওয়ারীজী।  
একটা চিঠি আমার টেবিলে রেখে দিতে  
দিতে বললেন ‘চিঠিটা গোপনীর ভাই  
নিজে দিয়ে গেলাম। আপনার পক্ষ থেকে  
গোল রেখে দেবেন এসে নির দার।’ খসেই  
হেড অফিসের চিঠিটা, বার কথা কিছুক্ষণ  
আগেই দেশপাণ্ডেড বলেছেন।

চিঠি দিয়েই ডেওয়ারী বেরিয়ে গেলেন  
না। অন্যান্য দিন হলে ডেওয়ারীর সঙ্গে  
দুই-একটা কথা বলতাম। আজ পরাক্রমের  
গলান মন ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।  
মানুষ ভাল লাগল না। বললাম, ‘আমি  
একটা জবুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।  
আপনার কি কোন দরকার আছে?’

ডেওয়ারী দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন,  
‘তেমন বিশেষ কিছু না। অফিসের গাড়ি  
সব সময়ই থাকবে, আপনার যেখানে  
যাবার বেতে পারেন।’

‘মনাবাদ। দরকার হলে নিয়ে যাব।  
খোলা ফাইলের ওপর মাথা আনও ঝুঁকিয়ে  
দিলাম।

‘আর একটা কথা। মিস দেশপাণ্ডেড যদি  
আসেন আপনি কি ডিস্টার্ড ফিল  
করবেন?’

চোখ না তুলেই বললাম ‘সেরকম  
করাটাই তো স্বাভাবিক। অফিসে ঠাই  
অফিস সংক্রান্ত কাজ একই কথাবার্তাই  
হওয়া উচিত।’

ডেওয়ারী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে  
রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন ‘মিস  
দেশপাণ্ডেড এখন ‘কম্বাইন’ এখানে থাকবেন।  
অথচ সঙ্গী সখী ওং কেউ নেই।’

‘কেউ নেই বললে ভুল হবে। দ-  
একজন আছে নিশ্চয়।’ ইচ্ছে করছি  
অনির্বচন নাম উচ্চারণ করলাম না।



‘হারা আছে, তাদের সঙ্গে ও’র মেলা-মেশা করা উচিত হবে কি।’

হঠাৎ তেওয়ারীর ওপর বিবর আগ ধরে গেল। বলে কেললাম, ‘অফিসে বসে আমি অফিস সংক্রান্ত বিবর ছাড়া অন্য কথা বলতে ইচ্ছা না। সে অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। আর একটা কথা, মিস দেশপাণ্ডে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, লাগুটাইর কিংবা অফিসের পরে আসতে পারেন।’

‘কেন।’ বলে তেওয়ারী স্বর ছেড়ে বোঁরয়ে গেলেন। একটা আশ্চর্যতা ক্রমশই আমাকে ঘিরে ধরছিল। মনে হতে লাগল, এইভাবে চেরারে বসে থাকলে আমার সম্বন্ধ হয়ে বাবে, অনিমেষকে ফোন করলাম। অনিমেষ বোঁরয়ে গেছে। জরুরীকে ফোন করে জানলাম, জরুরী আজ অফিসে আসেনি। অথচ চাপ করে বসে থাকতে অসহ্য লাগছিল। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পালাচাঁদ করলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একখণ্ড আকাশ চোখের সামনে বেন স্থির হয়ে রয়েছে, না, স্থির হয়ে নেই। নীল আকাশের নীচ দিগে হালকা মেঘ দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। পরতের আকাশ দেখতে আমার ভাল লাগে। অথচ কতদিন আকাশ দেখি না। কতদিন হল কলকাতা ছেড়ে এসেছি। কতদিন মাকে দেখি না। বড়মামাকে দেখি না। মেজমামা, ছোটমামা, মামীদের, তাপস, মীরা, অজয় ওদের দেখি না। কতদিন সমুদ্রের ব্যাঙ্কে বাই না। প্যাডার ছেলে বিলাসকে দেখি না। আরও অনেকের কথা মনে পড়ল। ওদের কতদিন দেখি না। সবশেষে সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। সুপ্রিয়ার চেহারা একবারে ভুলে গেছি। কিছুক্ষণ আগে চেষ্টা না করেও করবার মত খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পেরেছিলাম, এমনকি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে ওর ওপরের ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে তা-ও দেখতে পেরেছিলাম, কিন্তু বারবার চেষ্টা করতে সুপ্রিয়ার মত মনে করতে পারলাম না। সুপ্রিয়ার চোখ চেরা-চেরা মতন ছিল, কিন্তু বারবার দুটো টানা টানা চোখ দেখতে পাচ্ছি কেন? অথচ এ-ধরনের চোখ আমার জানাপোনা কোন মানুষের নেই। চোখদুটো অসম্ভব বড়, আর কান পর্যন্ত টানা। কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, কান চোখ, কোথায় দেখছি।

আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা গুরু গুরু আওয়াজ কানে আসতে লাগল। বেন কত শত যোজন পেরিয়ে সেই শব্দ আমার হৃদয়ে এসে বাজছে। আমি কান পেতে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বড় চোখদুটো আমাকে এক অপূর্ব রোমাণ্টের জগতের মধ্যে নিয়ে গেল। বড় বড় চাক বাজছে, ধূপধনো জলছে, পারে হুঁতর বেঁধে কে কেন নাচছে। আমার চোখের খুব সামনে কান পর্যন্ত টানা সেই চোখ, মাথার চুড়া, হাতে খল, গ্রিশল, পায়ের নীচে অঙ্গুর, ওর হৃদয় দিয়ে রক্ত ঝরছে।

নিমেষের মধ্যে সমস্ত ছবিটা আমার চোখের খুব সামনে ভেসে উঠল। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর মাত্র সাতদিন পরে পূজো।

ছুটে ঘর থেকে বোঁরয়ে গেলাম। দেশপাণ্ডে তখনও বসে পড়ে একটা ফাইল দেখছিলেন। ঘরে ঢুকেই বললাম, ‘আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমার দিন কয়েকের ছুটি চাই। পূজোর কোলকাতার বাব।’ ছুটে আসার দরুন তখনও হাঁপাচ্ছিলাম।

দেশপাণ্ডে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বেশ জ্বরে আসুন।’

‘আমি কবে বাব?’

দেশপাণ্ডে হাসলেন। ‘যেদিন আপনার ইচ্ছে হবে। এখানকার অফিস নিজে ভাঙবেন না। আমরা চালিয়ে নেব। তাছাড়া আপনার ডিপার্টমেন্টে তো লোকও রয়েছে। কয়েকদিন তারাও চালিয়ে নিতে পারবে।’

মনে হল দেশপাণ্ডেকে শুকনো ধন্য-বাল দেওয়ার চেষ্টাও আমার বিশেষ কিছু বলা দরকার। অথচ কী বলবো ভেবে পেলাম না। উনি বেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, বললেন, ‘আমি এখন এখানে এসেছিলাম, একটুও ভাল লাগতো না, কিন্তু এখন ভালবাসা জন্মে গেছে। আপনিও হয়তো একদিন পাটনার প্রেমে পড়বেন।’

‘এ-জায়গা আমার একটুও ভাল লাগছে না।’ কথাটা নিজের কানেই বাজলো। একজন দুর্বল মানুষের কথা বলে মনে হল।

কোলকাতায় গিয়ে মিস্টার কাপুরকে এ-বিষয়ে বলতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, কিছুদিন থাকার পর আপনার আর খারাপ লাগবে না। আমার মেয়েরও এক অভিযোগ, জায়গাটা অসম্ভব এক-ধেরে। অথচ ছুটিতে না এসেও পারে না।’

‘আপনি আহেন বলেই মিস দেশপাণ্ডেকে এখানে আসতে হয়।’

‘অথচ কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে বসে যেতে হবে। সেখান থেকে দিল্লী হয়ে ফিরবো।’

‘আপনি কবে যাবেন?’

‘আপনি ফিরে এলে। দুজনে একসঙ্গে বাইরে থাকা চলে না।’ দেশপাণ্ডে এমনভাবে বললেন যেন উনি পদমর্যাদার আমার সমান কেউ। কথাটা শুনলে ভাল লাগল। মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল।

ছুটির পরও অফিসে বসে রইলাম। সেলস লেকচার খুলে মাল বিক্রির হিসাব দেখছিলাম। অথচ ডিপার্টমেন্টের কাজকে বললে তারা খুশী মনে একটা স্টেটমেন্ট তৈরী করে দিতে পারত। নিজেকে বতীন-বাব, বতীনবাব, মন হতে লাগল। আগে ভাবতাম, ভুললোক ছুটির পরে অহেতুক

অফিসে পড়ে থাকেন কেন। এখন মনে হতে লাগল বতীনবাব একজন মানুষ, দুঃখী মানুষ। দুঃখী না হলে কেউ অফিসের মত নীরস একটা জায়গায় ছুটির পরেও বসে থাকতে পারে না। একবার মনে হল অফিসের বাকি বাই। পরেরই মনে হল, অফিসের আদম একবারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। হঠাৎ কতটা দূর-দূরিক ব্যাপারে লাগলানো। নিজেকে দেখিনি অনিমেষ। অনিমেষ যদিও বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আদম-বাব-মানুষের মত কথা বলেছিল, আমার সঙ্গে হল, হয় অনিমেষ একজন স্বার্থপর মানুষ, না হয় হয় বল কোন পদার্থ ইশ্বর ওর মধ্যে পেরনি। হুদয়বান মানুষ লীলাবতীর মত সরল এবং গুল্লুরী মহিলার সঙ্গে এমন বিব্রী ব্যবহার করতে পারে না। যদিও অনিমেষ একটা বুদ্ধি দাঁড় করিয়েছিল, বিভা লীলাবতীকে দেখলেই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই অনিমেষ বুঝতে পারতো, কথাটার মধ্যে আর বাই থাক যুক্তি নেই। ইচ্ছে করলে অনিমেষ লীলাকে সব কথা খুলে বলতে পারত, লীলার তাহলে ওদের ব্যাঙ্কে বাওয়ার প্রশ্নই উঠতো না। পৃথিবীর অনেক মানুষই সরল হতে পারে না। সরল হতে পারে না বলেই এই মানুষগুলো পৃথিবীকে ক্রমশ জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

নিজেকে একজন সরল মানুষ বলে মনে হতে লাগল আমার। সরল না হলে আমার আগে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটো মন-রাখা কথা বলে ওকে সুখী করে আসা চলতো। আমার ভাগ্যের অনেকখানি নির্ভর করছে সুপ্রিয়ার ওপর। ও চাইলে আমার ভাল করতে পারে, ইচ্ছা করলে আমাকে অধিকারে তুলিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের ভাল চাই। আমি কেন, জগৎ-সুখ মানুষ তাই চায়। মনে পড়ল, এখানে এসে সুপ্রিয়াকে চিঠি দিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া সে-চিঠির উত্তর দেয়নি। যা, বড়মামা সবার চিঠি পেয়েছে। যা খুব সংকটভাবে চিঠি লিখেছে। যা যে খুব সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে, কোনদিন জানতাম না। দূরে সরে না গেলে মানুষের আসল হৃদয় দেখা যায় না। বড়মামা আমাকে ভালবাসেন সে-কথা আমার অজানা নয়। কিন্তু এত গভীরভাবে যে ভালবাসেন আগে কি বুঝতে পেরেছিলাম। বড়মামা লিখেছেন, যার জন্যে কোন চিন্তা নেই। হটগোলের সংসারে যা সুখেই আছে। আমার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করার সময়টুকুও নাকি যা হারিয়ে ফেলেছে। লেবু (বড়মামার ছোট ছেলে) মার খুব নেওটা হয়ে গেছে। সব সময়েই পিসী পিসী করে মার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব শেষে বড়মামা লিখেছেন, নিতু এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে বসে চলে গেল। ডোর বিনের সম্বন্ধে যদিও ‘কান’ কথা বলেছি, ওকে দেখে মামা লাগল। মনে হল সংসারের চাপে নিতু কেন ক্রমশই বৃদ্ধির বাড়ে। অথচ বলল তো

বললার, 'আপনার।' 'সেহেতু গাছেব  
সমস্ত মালিকানা আপনার। গাছটো যদি  
বাস্তব্য পড়ে, কিম্বা অপর কোন জগনে  
জন্মাত, কিম্বা ঈশ্বর না কবুন, বাগানটো  
যদি অপর কোন লোকের হাতে চলে যায়  
মৌলিন কিম্বা এই গাছেব সামনে দাঁড়িয়ে  
আপনি এত অনাযাচিত হবেন না।'

লীলাবতীও মৃত্যু ঠিক এ খবরের কথা।  
শোনার জন্যে টেবলী ছিলাম না। ওর  
সম্মুখে এটা বিবরণ ধারণা মনে পোষণ  
কর আসছিলাম। বাপের একদিন মৃত্যু  
অবস্থা। লীলাবতীও বাহুর মধ্যে আশ্রয়  
পেতেছেন। লীলাবতীও একে গাড়িতে  
এনে বসিয়েছিল। লীলাবতী আমার কাছে  
থান হতে এল। ওর শাড়ির স্পর্শ এসে  
আমার গয়ে লাগল। লীলাবতী বলল,  
“বাবা বাবু।”

আগি জানি আপনি কি ভাবছিলেন।  
লীলার চোখে মুখে কৌতুক। আপনি  
ভাবছিলেন অমল্য খুব বড়লাক। কড়লাক  
হল মানুষ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেল,  
ভাই না

লীলাবতী শব্দ কবে হেসে উঠল,  
আমরা একটা কোণে নীচ দিয়ে  
ঝাঁজলাম। ওখ হাসিন শব্দ ক'থকতা তার  
পাখি বিঁচবিঁচির কবে উড়ে গেল। লীলার  
হাসি আরও বেড়ে গেল। হাসতে হাসতে  
ওর চোখ জল এসে গাম্ভীর। এক সময়  
হাসি থামিয়ে লীলাবতী বলল, হাসতে  
আমরা খুব ভাণ লাগে। অতট ইচ্ছা করে  
না। মনে হয় কোথায় যেন একটা বাধা  
রায়ছে।

লীলাবতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।  
আমাব মূখের ল'ক স্থিতির দৃষ্টিতে ডাকিয়ে  
বইল কিছুক্ষণ। তাৎপৰ্য চাপা স্বরে বল  
উঠল 'কি কারণে আমাব অভিযোগ নেই,  
অজ্ঞান নই। আমাব তীব্র অভিযোগ আছে।  
প্রচণ্ড অশান্তি রয়েছে। কথা বলতে বলতে  
লীলাবতী যেন শব্দশিখর করে কাপতে  
লাগল। কে বলল এই লীলাবতীই  
কিছুক্ষণ আগে বাঁধভাঙা নদীর মত  
আনন্দে উড়ল মনে উঠাছিল ওর হাস্য  
মুখে গুটিকয়েক পাখি গাছ ছেড়ে আকাশে  
উড়তে শুরু করেছিল। এসময় মানস  
হঠাৎ অপর একজন মানসকে আকাংক্ষা  
অপমান করে তাকে অকহল করে তখন  
কী মনে হয় আপনবা মনে হয় না,  
আমনি+একজন খাতিয়ান অসহায় মানব।

আমি কিংবাস করি না। স্বাভাবিক-  
ভাবে মানুষ খুব সরল। এই যেমন ধরুন,  
আপ'ন আপনাব তো কোন অভাব  
আভ্যোগ নেই থাকার কথা না।' গীলাবতী  
এমনভাবে কথা বলল যেন সত্যি সত্যি।  
একজন পবিত্র সার্থক মানুষ বলে  
ও বোঝায় আমি তাই। সহস্র আমার মনে  
হও লাগল একজন পবিত্র মানুষ  
জীবনে যা চায় আমি তাই পেয়েছি। সুখ  
শান্তি ধনদৌলত ঐশ্বর্য এবং ভালবাসা।  
গীলাবতী আমাকে দেখে নিশা  
নকলত লাগল জানি না মানুষ মানুষকে  
এত কষ্ট দেয় কেন। কিসের আনন্দ একে  
প্রদেবে এমন ক'র হইবস্ত ক'র। গীলাবতী

এক সময় ধীরে ধীরে কল্যাণ  
অপন্য দৃষ্টি দেখে আমায় চোলেবেলায়  
একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা আমায়  
স্বাক্ষরিত 'সিদ্ধার্থ' গল্প বলছিলেন।  
'সিদ্ধার্থ' কী করে বুদ্ধদেব হলেন অসংসার  
শূন্যে শূন্যে একসময় আমি প্রশ্ন কর  
ছিলাম ঢাকা পয়সা থাকা সাড়ে ৬ মনুষ্য  
দৃষ্টিতে 'সিদ্ধার্থ' বাবা সান্নিধ্য কোন  
একটি নি। হয়ত ভোলাছাড়া সেই  
বয়সে এই প্রশ্নের উত্তর বুঝে পাবার  
না। আজও যে স্বপ্নের বুদ্ধি পাঁচ  
তা না উল্লেখ মহাত্মা আমায় মনে পড়ে  
আপনার দৃষ্টি আমি বুঝতে পারছি  
লীলাদেবী।

শীতাবতী আমাৰ মৃত্যুমুখ নিড়িয়ে  
প্রশ্ন করল 'আপনি কার কথা বলছেন'

অঃমবেব      অর্নিমে'ষব      দঃখ  
 'স্বাচ্ছন্দ্য' বেদনা ব্যথিছে 'আমাব মত্ত  
 বেদনা'

“অনিমেঘ বলোহে একথা” বলতে  
এলতে লীলাবতী যেন অনাবকম হলে  
“না। তখনও প্রচণ্ড পাণ্ডালো পাখনা  
মোলে যদ্রাণ ওপব ‘দেখে উড় উড়ে  
বেড়াচ্ছিল। স্নান তচ্ছিল লীলাবতী য়ে  
কন মুহূর্ত ওবে সঙ্গ মিলেমিশে  
যল ছুঁয়ায় জুড়ো উড়াত থাকবে।  
আপনাক যে কী নল দনাবাদ জানাবো  
এ শব্দ আপন। আমান সতিকাব  
একজন পদ লীলাবতী কীদ সঙ্গ  
সাম্য একটা হাত দুহাওব মধো চাপ  
এল।

[illegible]

অনিচ্ছিত হইয়া আসিয়া খুন্দ খাওয়া  
 লেগেছিল। অমতখন বাবাব আফসে  
 কস্মিক্ষমায়া। এতক্ষণ এসে দাঁড়াই  
 সাপ পায়ে কালুর দাশ। 'হা' এলা  
 নবাচ নকসা। ও সোটা বাবাব টেবিলের  
 ওপর বসিয়া যথার্থ অনেকক্ষণ ধর কী  
 সব বললো। আদ্য হা একটা মেজাজে  
 শূন্য না সন্দেহী মেয়ে ওয় সামান্য বসে  
 বায়ছি নীকহ, দেখলো না পর্যন্ত।  
 ওয়াব ভাণ নাপা হা হা হা হা হা  
 য় শূন্য দামতক এই না হা হা হা হা  
 ও বাবাব সপ্তেও কব্বাভাব কথা বলছিল।  
 সমস্ত সময় বাবাব শূন্য লাল হা হা উঠছিল।  
 'সইদন হা হা হা হা হা হা হা হা হা  
 ঐতজ্ঞা কব্বাভাব শূন্য হা হা হা হা  
 হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা  
 কব্বাভাব এই লোকটাকে এমন শিক্ষা দেব  
 যা ও হা হা হা হা হা হা হা হা হা  
 হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা

সুন্দরী স্ত্রী  
আর  
ফুটফুটে ছেলে  
নাম্ন রাখে কণ্ঠার  
কিন্তু  
মফতলালর কাপড়  
মান্ন রাখে  
সবার !



## মোফিন ঐশ্টারকট টেরোজেল

মোফিনা টেরোজেল পালিয়েটার শাড়ী  
কিছু পালিয়েটার মোশান স্ট্রিং  
শাড়ী হাওয়া পালিয়েটার অফ  
ফাটলে উচ্চ রঙে কিস, ডায়া  
কলকে পালিয়েটার পালিয়েটার  
মোশান ডায়া বালি ডায়া ফিন  
লিন, গারমেন্ট দিনে মোফিন ওর  
সুখাম সোণবর পালিয়েটার  
ঐশ্টারকট পালিয়েটার মোফিন

মোফিন টেরোজেল পালিয়েটার  
অফ টেরোজেল পালিয়েটার  
পালিয়েটার মোশান স্ট্রিং  
অফ টেরোজেল পালিয়েটার  
অফ টেরোজেল পালিয়েটার

**মফতলাল  
গ্রুপ**

প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

লীলা চোখ তুলে তাকাল। ওর চোখে ঘনিষে আসা সন্ধ্যার বিকরতা। 'তারপর আব কি। সবই তো বুকে ফেলছেন। চলুন, চা খাবেন।'

চায়ের টেবিলে এসে বসলাম। তখন চারিদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। লীলাবতীর মৃদু অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ও নীচু হায়ে চা ঢালতে লাগল। সেভাবেই কল, একটা অনুবোধ করবো আপনাকে। অনিমেষকে আজকের কথা বলবেন না।'

'কেন?'

মানুষ এক জারগার অন্তত মাথা উঠু কবে থাকতে চায়। ও বেন আমার লুপ্ত কথার জানতে না পারে। তা ছাড়া, আমার দৃষ্টি হরত তেমন কিছু না। আবেগের মূহুর্তে কী বলতে কী বলে কেলোঁহ।'

বুঝলাম লীলাবতী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। নিজের সৈন্য ঢাকতে চাইছে। বললাম, 'কথা দিচ্ছি, অনিমেষকে এ বিষয়ে কিছু বলবো না।'

দেশপাণ্ডে আমাকে দেখে খুশী হলেন। বললেন, 'আমার কিরতে একটা বেরী হয়ে গেল। গোটা কয়েক কাজ ছিল, সেসে আসতে হল।' কথাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হল লীলাবতীকে শুনিয়েই বললেন তিনি। লীলা ভাবল উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম। আমরা তখন ছাইরুমে বসে-ছিলাম। দেশপাণ্ডে একটা ব্যাগাজিনেব পাভা ওলটাইলেন। লক্ষ করে দেখলাম, দেশপাণ্ডে আসার পর থেকে লীলাবতীর কথা বেন বখ হয়ে গিয়েছে।

গেটের মূখে এসে বসলাম, 'কয়েকটা দিন আপনার হরত একটা একা একা লাগবে। আমি কোলকাতার বাছি। আজ আপনার বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিলাম।'

'তাই নাকি?' আমিও কোলকাতার বাব। আমার এক কাক আছে। অনেকদিন তাঁদের দেখি না। লীলাবতী কেন জানপে নেচে উঠল।

কিন্তু আপনার বাবর হরত এখন যাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা দুজনে একসঙ্গে বাইরে যেতে পারি না।'

'আমি তো আপনাব সঙ্গে বাব। ভব নেই, আমি একটা বোঝা না। দশরুহত লগাখড়ী জান আস-টু-ডেট মেয়ে। জানেন, আমি এখন সিক্স ইয়ারের ছাত্রী। এক একা গুডল কবার অভ্যাস আছে আমার। তবে আপনি থাকেন, সঙ্গে গল্প করতে কবতে বাব এই আর কি। আপনি বাবার দিন ঠিক জানবেন, আমিও টিকট কাটবো।'

উত্তর না দিয়ে বোঁঝে আসছিলাম। লীলাবতী আঁধার বলল, 'আমি কিছুদিন এখানে থাকবো। আপনাকে খুব জলাতন করবো।' বলে উল্ল হাসিতে ডেঙে পড়ল।

বললাম, 'আপনার পরীক্ষা?'

'পরীক্ষা দেব না।' ও এমনভাবে বলল, কেন সেটা কোন সমস্যাই না।

বললাম, 'আপনাকে দেখে একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি খুব সের্টিফিকেটাল।'

'মানুষ মাঠেই সের্টিফিকেটাল। বে বলে আমি সের্টিফিকেটাল না, সে ভেতরে ভেতরে কট পাখ। কেন, আপনার বখদ।'

কথা না বলে বোঁঝে এলাম। পরতের শিরশিবে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। বাঁঘার কাঁপুনি ধরাচ্ছে। মনে নেগা ছড়াচ্ছে। হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। আমাকে দেখে সুপ্রিয়া নিশ্চয় খুব অবাক হবে। এত তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে কলকাতার বাবার জন্যে বিরক্তও হবে বোধ হয়। নির্বাণ দু দশটা উপদেশও দিয়ে দেবে। উপদেশ দেওয়া বাব স্বভাব, সে কিছুতেই স্বভাব বলাটত পারবে না।

ট্রেন একশটা লেট ছিল। দেশপাণ্ডে আমাদের তুলে দিতে ট্রেনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার আগের মূহুর্তে আমাকে আবার মনে কবিয়ে দিলেন, 'আপনি কিবে এলেই আমি কিছু বেরোবো।' ভুললোক বেশ বুদ্ধিমান। কী রকম কারনা কবে আমাকে ঠিক সময় মত কিয়ে আসতে বললেন। দেশপাণ্ডে মতকল ছিলেন লীলাবতী একটাও কথা বলে ন, জানালা দিয়ে 'ল্যাটফর্ম' দেখাচ্ছিল। দেশপাণ্ডেও লীলাবতীকে উপেশ্য করে একটা কথা বলেন নি।

ট্রেন ছাড়তেই লীলাবতী আমার দিকে কিয়ে বসল। কাকবার আরও দুজন লোক ছিল। আগে থেকেই তারা আসাছিল। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার শুরে পড়ল। লীলাবতী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি বে কেন হঠাৎ চলে এলাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না।' আমি কথা বললাম না দেখে ও আবার বলল, 'আপনার এরকম হয় না কখনও। এই হঠাৎ কিছু করে বস।'

'সাধারণ মানুষের হঠাৎ কিছু করে বসা শোভা পায় না।'

আমার কথা শুনে লীলাবতী অমো-ল্যার বলল, 'সাধারণ অসাধারণের প্রশ্ন না। আপনার এরকম হয় কিনা?'

মনে মনে ওব কথার বিরক্ত হলাম। বুঝে সে ভাব না দেখিয়ে বললাম, 'এখন পর্যন্ত হয় নি। আমি না ভাবিতে কী হয়ে।'

লীলাবতী আঁধার বলল, 'আমি কিছুদিন এখানে থাকবো। আপনাকে খুব জলাতন করবো।' বলে উল্ল হাসিতে ডেঙে পড়ল।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। লীলাবতী বলল, 'কিছু বললেন না বে?'

'আপনি তো প্রশ্ন করেন নি। যা বললেন, শুনেন সেলাম।'

'আমার কী মনে হয় জানেন, এক এক অবস্থায় মানুষ এক এক রকম ব্যবহার করে। এই যেমন আমি। পাটিতে গেলে আমি অসম্ভব ত্রিক করি। ভীষণ নাচি। পিকনিকে গেলে বেজায় চেঁচাই লাকাই গান গাই। পাটনাব এলে বেশীভ ভা' সময় কিছুই করতে ভাল লাগে না। কিছু-দিন থাকার পরেই পাটনা থেকে পালিয়ে বাই। আবার কিছুদিন পরেই পাটনার আসার জন্য হটকট করি।'

হেসে বললাম, 'পাটনা আপনাকে পাগল কবে দেবে দেখছি।'

লীলাবতী মৃদু কট্টমাচ কাবে বলল 'সত্যি এক এক সময় মনে হয়, আমি বুদ্ধি পাগল হয়ে বাব। জাছা, এক একজন মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন বলতে পারেন?'

লীলাবতীর গলার একটা আকুলতা ফুটে উঠল। নরম ভাবে বললাম, 'আজ নিষ্ঠুরতা বলে ভাবছেন, আসলে হয়তো সেটা মোটেই নিষ্ঠুরতা না। এমনও তো হতে পারে, উপায় থাকে না বলেই মানুষকে নিষ্ঠুরতা ভান করতে হব।' বলি বলি করেও অনিমেষের আসল বাধা কথা লীলাবতীকে বলতে পারলাম না। লীলাবতী যদি একদিন অনিমেষের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, ওবা দুজনেই হকত শান্তি পাবে।

লীলাবতী খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'উপায় মানুষকে খুঁজে বাব করতে হয়। নিষ্ঠুরতার মধ্যে জাম বাই থাক; কোন বাহাদুরী নেই।'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বললাম, 'এত লোক থাকতে আপনিই বা অনিমেষকে ভালবাসতে গেলেন কেন? ওর মধ্যে কী এমন দেখলেন?' প্রশ্নটা নিজের কানেই কীরকম বিদ্রী শোনাগ। আবার বললাম, 'আপনার সামাজিক প্রতিভা, আর অনিমেষের প্রতিভা এক না। এবং মানসিক দিক দিয়েও দুজনে ঠিক কিসের ধরনের। আপনি চলল, অনিমেষ ধীরে ধীরে মানুষ। আপনি কথা বলতে ভালবাসেন, অনিমেষ কথা শোনে। আপনি হাসেন, অনিমেষ খুব কম হাসে। আপনি দেখতে এত সুন্দরী, আর অনিমেষ তো খুব সাধারণ একজন মানুষ। অনিমেষ সম্বন্ধে এভাবে কথা বলছি বলে মনে কিছু করবেন না। অনিমেষ আমার বখদ। বখদ বলেই ওর সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলতে পারলাম।'

(কল্যাণ)।



# প্রদর্শনী

চিত্রকর অলোক ভট্টাচার্যের ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট এন্ড কালচারের প্রদর্শনী কক্ষে। প্রদর্শনীতে এই তরুণ চিত্রকর তার গত দেড় বছরে আঁকা ২০টি ড্রইং দেখালেন। শিল্পী ড্রইং বলতে সত্যি সত্যিই রেখাঙ্কন বোঝেন। আজকাল যেমন অনেকে ড্রইং বলে কাগজে আঁকা তেল রঙ এবং জল রঙের ছবিও চাঙ্গির দেন, অলোক তা করেন না। চিত্রাচারিত ধারণানুযায়ী অলোক মনে করেন, চিত্রক্ষেত্রে বর্ণ প্রলেপিত হলেই তা খানিকটা ক্ষেত্রদখলকারী পুঞ্জের রূপ পায়, রেখা থাকে না। এবং রঙ তার নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে চিত্র-ভঙ্গে আবির্ভূত হয়। অলোক তাই তার রেখাঙ্কনগুলিতে রঙের ব্যবহার করেন নি। এ-গুদুলি শাদা কাগজের উপরে কালো অথবা নীল-কালো কালিতে আঁকা ড্রইং। টোন বা কালোর অথবা নীল-কালোর নানান বর্ণান্তর, যথা যেন কালো থেকে মাঝারি কালো আবার তার থেকে চাটকা কালো, অবশ্যই ঘটেছে এ-সব ড্রইংয়ে, কিন্তু ছবি মূলত একবর্ণা থেকে গেছে। বর্ণান্তরের কথা যখনই বলছি, তখন আশা করি বোঝা গেছে যে অলোকের ড্রইংয়ে রেখা প্রধান উপজীব্য হলেও, ন্যূনতমের একমাত্র হাতিয়ার নয়। কালো পুঞ্জও ছবির-জমির অনেকখানি জারগা জুড়ে বিরাজ করে। তা না করলে বর্ণান্তর খটবে ক্ষেত্রন করে?

মনুস্যাবরণই অলোকের প্রধান উপ-জীব্য। অলোকের ছবির বিষয়বস্তু মানুষের বর্তমান অবস্থা। মানুষের শ্রম, মানুষের কর্ম, মানুষের নিরঞ্জে মানুষের অভ্যাচার হিংসা, ঘেঁষ, রিরংগা ও তল্লানিত বশ্চনা, বশ্চনা, ভীতি, মৃত্যু, অপমৃত্যু ও মানসিকতা থেকে পতন ইত্যাদি অলোকের ড্রইং-এর বিবর বস্তু। এইসব বিষয় বস্তু রূপায়নের জন্য অলোক বশ্চনা কাতর, বস্চকন, নিপীড়িত অসম বলশালী সুদেহী কর্মী মানুষের ছবি এঁকেছেন। এঁকেছেন অভ্যাচারীর ছবি, বিচারালয়ের ছবি, মরলোকের নরকের ছবি, সেই সব সুদেহী বাজেন্দার-সঙ্গীতকারদের ছবি বাঁধা শব্দযাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিল্লিখন্দনের চিত্তবিনোদনের জন্য নৈবীড়িকভাবে নিলিপ্ত থেকে 'শিল্প' উপাধান করে বার।

অলোকের ড্রইং-এ নানান রীতির

রূপায়ণ দেখা যায়। মনে হয় তিনি এখনও প্রত্যয়ের শৈলীতে উপনীত হতে পারেন নি। প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'কনভিকট', এটি এবং 'ক্রেস্টফলেন' এক রীতির ছবি। সরু এবং ভাঙা সীমান্নে দ্বি-মনুস্যাকাল গঠন ক'ন টোন এবং শেডের সাহায্যে আলো-ছায়া সৃষ্টি কবে শরীরে ঘনত্ব এবং ভোল বোঝান হয়েছে। প্রতিমা-লক্ষণের দিক থেকে এই ড্রইং-এর মানুস্যের প্রকৃতিবাদী রীতিতে আশ্চিত। কিন্তু চিত্রতলে রূপবন্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী রীতি অনুসৃত হয়নি। 'কন-ভিকট' ছবিটিতে পক্ষী-চক্ৰ জাতীয় দৃষ্টি-কোণের ব্যবহারের ফলে একটি কোণিক প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে এবং ফলতঃ ছবিটি একটি আশ্চর্য নাটকীয়তা পেয়েছে। 'ক্রেস্টফলেন' ছবিটিতে কিন্তু শাদা এবং কালোর সমানুপাতিক বিতরণ ছবির রূপবন্ধগুলির গতিময়তা ক'ন করেছে। দ্বিতীয় জাতের শৈলীর সাক্ষাৎ মেলে 'মাইটি পুন্', 'ন্যান এন্ড নোচার' এবং 'গ্রেপিং' নামের ছবি-গুলিতে, 'রিপ্রেসড ভিসিবিলাটি' ছবিটি প্রথম এবং দ্বিতীয় জাতের শৈলীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি। দ্বিতীয় জাতের ছবির মাধ্যম সিলিচিউড' ছবিটি সম্বণীয়। মৃত্যুর অভিব্যক্তি এবং বর্ণান্তর ও বেখা যে ভাবে শূন্যক্ষেত্রে বাঙম্ব দেশের ব্যাতি দিমোহ তা সত্যিই বিস্ময়কর। বাজেন্দারদের ছবি-গুলিকে তৃতীয় জাতের বলে ধরা যেতে পারে। এদের বিন্যাসে সহজ-চক্ৰমাটিক দৃষ্টিকোণকেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং চিত্রতলে বাহিজাগতিক পারস্পরিকতাকেই মনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-ব মতোও দুটি পৃথক ভাগ করা যেতে পারে। 'টু মিউজিশিয়ানস' পুঞ্জপ্রধান ছবি কিন্তু এই সিবজের অন্যগুদিল রেখাপ্রধান। রেখা-প্রধানই হোক বা পুঞ্জপ্রধানই হোক, রেখার মলখগতিতে বা কালো রঙের পুঞ্জে শিল্পী যে সব বাজেন্দারদের চিত্রিত করেছেন তাদের অবয়বের ভাঙতে বেখা ও রঙের ঠগিরের গুণে এক অস্বভূত বিবাদ আবোপ করতে পেরেছেন। 'ফ্রাইম্যানস' ছবিটি চতুর্থ জাতের ছবির উদাহরণ। এই ছবিটিতে বর্ণান্তরের বদলে একই ভাবের কালোর পুঞ্জের অববাবিক চেহেরাকে অলঙ্করণেব বিভিন্নতার বদালান শিল্পী চিত্রক্ষেত্রে বিভাজিত করেছেন। অনেক-গুলি মনুস্যাবরণকে অনমন করে তাদের

শারীরিক ভাঙকে কাজে লাগিয়ে একটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মনুস্য-কারকে বহুজমর অবয়বের সমাহার রূপে রূপায়িত করেছেন। সমস্ত রূপকম্পটিতে মিকালান্সের থেকে রুবেনস পবন্ত বারোক শৈলীর প্রভাব। 'পাইনড' ছবিটি প্রথম এবং চতুর্থ রীতির সমাহারে রূপায়িত। রাস্তার ধারে মা ও ছেলের ছবিটি রেখার চরিত্র বৈগুণ্য এবং বিন্যাসে একটি দুর্বল গল্প-বল্লা ছবি এবং প্রতীকটিও অতি ব্যবহারে জীর্ণ। এ জাতের ছবি প্রদর্শনীতে এ একটিই ছিল। না থাকলেও কতি বসি হত না। 'টোগেট' ছবিটি বর্ত জাতের ছবির অন্যতম নিদর্শন ও অতিনাটকীয়তা যোবে দুর্ভ। এবং 'ড্রইং থ' ছবিটি সপ্তম জাতের ছবির নিদর্শন।

অলোক নানান জাতের রেখা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং তার রেখা ঝড় ও বলিষ্ঠ ছন্দোময়। পেলব ও সূক্ষ্মছন্দের রেখা তার হাতে তেমন খেলে না। অবশ্য তিনি যে সব বিষয় নিয়ে ম'ন তাতে ও-জাতের বেখাব প্রয়োজন কম। চিত্রক্ষেত্রে পুঞ্জের এবং পুঞ্জের ও বর্ণান্তরের সাহায্যে ঘনত্ব প্রদর্শনেও তিনি কম পায়দর্শী নন। কিন্তু অনেক সময়ে তার বর্ণান্তর ঘনত্ব জাপক হয় না চিত্রক্ষেত্রে দেশ করে তোলে না। শাদা কালোর বিতরণ সম্পর্কে তার আরও বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শাদা-কালোব সমানুপাতিক বিতরণ অনেক সময়ে তার ছবি রেখার গতিকে এবং মনুস্য-বয়বের গতিকে ব্যাহত করে। তার ছবির বিষয়বস্তু অনেক সময়ে বিপরীতমুখী ধ্যান্দিক গতি ও ছন্দ টান-সে সম্বন্ধেও অলোককে সচেতন হতে হবে। তাকে সচেতন হতে হবে হাত, ম'খ, চোখ ইত্যাদি অবয়বের কয়েকটি প্রতীকী ব্যবহারের সম্বন্ধে। এর অনেকগুলি অতি ব্যবহারে জীর্ণ। বারোক থেকে রোমান্টিক এবং পরবর্তীকালে জর্মন একসপ্রেসনিও লিল্পারী এই সব প্রতীককে এত বেশী ব্যবহার করেছেন যে এগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট অর্থে ম'ড়িত হবে গেছে। শঙ্কা-পূর্ণ দৃষ্টি নেতিবাচক হস্তমুদ্রা বা হাতের আঁকড়ানোর ভাঙ, বক্ষিম গ্রীবা, পলায়নপর পদমুদ্রা উব'রাকশ ম'শনমল'ক মস্তক ভাঙ, চিত্রক্ষেত্রে কালোব প্রধান্য, চিত্রক্ষেত্রে অবয়বংশের অনির্দিষ্ট সংস্থাপন ইত্যাদি বারোক, রোমান্টিক এবং জর্মন

—प्रधानमन्त्री

বাংলাদেশের মেয়ে

অমরেন্দ্রনাথ  
মুখোপাধ্যায়

# চন্দ্রাবতীর প্রেম

অদূরে ফুলেশ্বরী নদী। নদীর পারে  
পাভার গ্রাম। যেন একটি ছবি। চারিদিকে  
তার ফুলের বাগান। সেখানে হাজার  
রকমের ফুল।

রোজ ভোরবেলা একটি মেয়ে ও এক  
তরুণ বৃক একই বাগানে ফুল তুলতে  
আসে।

একদিন তরুণী ছেলোটিকে জিজ্ঞাসা  
করল, 'কে তুমি? তুমি তো আমাদের  
গাঁয়ের লোক নও।'

মেয়েটির নাম চন্দ্রাবতী। সেই গ্রামের  
শাস্ত্রজ্ঞ বংশীদাসের মা-বাবা একজায়  
সন্তান।

ছেলোটির নাম জরচন্দ্র। সে বলল,  
'আমি তোমাদের গাঁতে থাকি না। কিন্তু  
আমি দূরের মানুষ নই। তোমাদের গ্রাম আর  
আমার গ্রাম এই নদীর দুই পারে।'

দু'জনের আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল।  
দু'জনের মধ্যে যেন অসুখেই এক নিবিড়  
মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। একদিন  
চন্দ্রাবতী একটি মালতীর মালা জরচন্দ্রকে  
উপহার দিল। সেদিন দু'জনেরই মনে এক  
নতুন ভাবের স্ফূরণ।

কয়েকদিন পরে চন্দ্রাবতী জরচন্দ্রের  
কাছ থেকে এক পত্র পেলো। জরচন্দ্র  
লিখেছে, 'আমি তোমার মূপে মূপে মূগ্ধ।  
তোমার সঙ্গ পাখো বলেই রোজ ভোরবেলা  
ফুল তুলতে যাই। তোমার সেওয়া মালা  
নিরে আমি সারাদিন কেঁদে কাটিয়েছি।  
আমার মা-বাবা নেই, আমার বাড়িতে  
থাকি। কবি-ভোক্তার সঙ্গ উত্তর পাই কবেই  
এ অঞ্চলে থাকবে, নরতো চিরকালের মত  
তোমার কাছ থেকে কিনার নিরে দুই মেসে  
চলে যাব।'

চন্দ্রাবতীর বাবা বংশীদাস শিবের ভক্ত।  
প্রত্যহই চন্দ্রাবতীর আশ ফুল দিয়ে শিব-

পূজা করতেন। সেদিনও তিনি বহুদূরীত  
শিবের পূজা করলেন এবং পূজার শেষে  
প্রার্থনা জানালেন, 'হে দেবদেব! আমি  
সংগতিহীন হলাম, তুমি আমার কল্যায়  
বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। নির্দীনসই  
যেন ভাল বরের প্রস্তাব নিয়ে ঘটক আমার  
বাড়ি আসে।'

সেদিন পিতার পূজার আরোজক করে  
দিয়ে চন্দ্রাবতী নিজের ঘরে গিয়ে অজস্র  
জরচন্দ্রের পত্রটি পড়ল। তারপর মহাবেগে  
উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে অন্তরের আকর্ষিত  
জানালো, জরচন্দ্রকে সে যেন স্বাক্ষরিত  
পার। জরচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাউকে সে  
পত্রিবে বরণ করতে পারবে না।

জরচন্দ্রের তিষ্ঠি পাবার পরে কৈ  
চন্দ্রাবতীর মনে একটা দারুণ লজ্জার জ্বল  
এসেছে। সংক্ষেপে সে তার পত্রের জবাব  
দিয়েছে, লিখেছে, আমি কি হলব, হল!  
আমার বাবা আছেন। তাকে তো হল্য  
দরকার। আমি বড় লজ্জা বোধ করছি।  
কিন্তু তুমি দু' মেসে চলে গেলে আমার  
দুঃখ কষ্ট হবে।

কী এক মধুর লজ্জার চন্দ্রাবতী জর-  
চন্দ্রর সামনে আসতে পারে না। সে ভোর  
রাতে, জরচন্দ্র বাগানে আসবার আগেই,  
খল তুলে নিয়ে আসে, বাতে জরচন্দ্রের  
গলে তার দেখা না হয়। কিন্তু তার গন  
জরচন্দ্রের প্রতি প্রেমে স্খালিত হোমে  
রইল।

পরদিন বংশীদাসের কাছে এক ঘটক  
এসে একটি সুপাতের সংধান দিল। পাত্রের  
নাম জরচন্দ্র চন্দ্রাবতী; ফুলেশ্বরীর তপস  
পারে সুখ্য গায়ে তার বাস। নানা পাশে  
সে সুশীল ও এবং বিশেষ রূপবান।

বংশীদাস কোঠী বিচার করলেন।  
স্বাক্ষরিতক দিল। তিনি সানন্দে সম্মত  
হলেন। বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল।

এদিকে জরচন্দ্র সন্ধ্যা গ্রামের একটি  
মেয়েকে দেখে মগ্ন হয়ে তার প্রতি  
আকৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যহ ভোরবেলা সে  
নদীর ধারে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার  
জন্য বসে থাকে। চন্দ্রাবতীর কথা সে ভুলে  
নেই। নতুন প্রেম সে তখন আত্মহারা।

বিবাহের দিন সমাগত হল। বংশী-  
দাসের বাড়িতে বহু লোকজনের সমাবেশ।  
স্বজনবান, আত্মপ-কলরব।

এমন সময়ে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত।  
কবর এলো, জরচন্দ্র হঠাৎ এক মঙ্গলমান  
মেয়েকে বিবাহ করলে।

আনন্দ কোলাহল মহাহর্ষে স্তম্ভ হয়ে  
গেল, চারিদিকে হাহাকার উঠল। কিন্তু  
চন্দ্রাবতী নিশ্চল, নিশ্চল—যেন পাষাণ  
প্রতিমা। তার জন্য ধর ভরা লোক বিলাপ  
করে। কিন্তু সে নীরব। কোন কথা নেই  
তার মুখে।

দুই মাস, রমিৎ, আসে। এমনিভাবে  
দুই কেটে যাচ্ছে। চন্দ্রাবতীর আহার নেই,  
নিদ্রা নেই, সন্টারদের সঙ্গে আলাপ  
নেই। বংশীদাস সবই বুঝলেন। এ ব্যাপারে  
কন্য়ার কী যোগ? তিনি নিজে হিসেন  
অসমর্থ। পরামর্শ বিচার করে তিনি  
পুনরায় কন্য়ার বিবাহ দেবার জন্য  
উদ্যোগী হলেন। অশেষ রূপবতী কন্যাকে  
তিনি বহু গ্রন্থ পড়িয়েছিলেন। তাই এই  
রূপালী ও বিদ্যাবী কন্যাকে বিবাহ করতে  
অসমর্থই রাজী হল।

কিন্তু চন্দ্রাবতী বললে—

“পিতা মোর বাক্য ধর।

জন্মে না করিব কিংবা রইল আইবর।।

নিষ্পত্তা করি আমি, শিব পদে মতি।

বংশীদাস তার কন্য়ার মনের গতি  
বুঝলেন। তিনি মেয়ের কথা রাখলেন।

কলসেন, বেশ, তুমি আত্মবিন কুমারী-স্বত  
অকলসন করে থাকো এবং রামায়ণ লেখো।

চন্দ্রাবতী একান্তচিন্তে শিবের আরাধনার  
ব্যাপ্ত হল এবং পিতার নির্দেশে রামায়ণ  
লিখতে লাগল। সে রামায়ণ লেখা তার  
শেখ হয়নি।

কলসেশ্বরী নদীর তীরে চন্দ্রাবতীর  
শিবের মত বহুদিন বিদ্যমান ছিল। তার  
রামায়ণী গান মনমোহন—এর মেয়েরা বিবাহ  
উপলক্ষে গাইত।

শিবের আরাধনার চন্দ্রাবতী সব কিছু  
ভুলে আসে, এমন সময় তার কাছে জর-  
চন্দ্রের এক পত্র এলো। বৈরমণিকে বিবাহ  
করে জরচন্দ্র পঞ্চম ত্যাগ করেছে,  
চন্দ্রাবতীকে প্রজ্ঞাপন করেছে, সে বংশী  
দাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে  
মেরে চলে গেছে। জরচন্দ্র লিখেছে—

“পূজার প্রাণের চন্দ্র, তুমি কোথায় জানাই।

মনের আগুন দেখে পড়িয়া হইছে ছাই।।

অমৃত জাখিয়া আমি খেয়েছি গরল।

কর্তৃতে লাগিয়া রইছে কাল হল্যহল।।

তারপর জরচন্দ্র আরও লিখেছে—“আমার  
কম্মা ভিকার মূখ নেই। কিন্তু জরচন্দ্র শেখ  
একটি ইচ্ছা আছে, তুমি একবার  
দেখো।—

“না হুইব, না ধরিব, দুই থেকে রক্ষণ।

পূজা মূখ দেখি আমি অস্ত্র জড়ব।।

একবার দেখি তোমার ছাড়াই সমসার।

কপালে লিখেছে বিধি মরণ অমার।।”

জরচন্দ্রের চিঠি পড়ে চন্দ্রাবতীর মন  
বিপর্যস্ত হল। তার সংঘর্ষ ও ঘৈরীর বোধ  
পড়ল ভেঙে। কিন্তু পিতা বংশীদাস  
বিধর্মী বিশ্বাসহস্তা জরচন্দ্রের সঙ্গে  
মেয়েকে দেখা করবার অনুরোধ দিলেন  
না। পিতার আদেশ ও উপদেশের মর্ম  
চন্দ্রাবতী উপলব্ধি করল। সে অস্পৃহতার  
নিবেশ জনিয়ে জরচন্দ্রকে পত্র দিল। তারপর  
কল বেলাপাতা নিয়ে শিব মন্দিরে প্রবেশ  
করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যোগাসনে বসে  
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করল, তার অন্তরের সমস্ত  
তোলাপাড় খেঁচো গেল, এমন কি জরচন্দ্রকেও  
সে ভুলে গেল।

—“যোগাসনে বসে কন্যা নরন মন্দিরা।

একমনে করে পূজা কল বিল্ব দিয়া।

কিসের সংসার, কে বা জরচন্দ্র, কে বা

পিতা মাতা।

পূজিতে তুলিল কন্যা সংসারের কথা।।”

জরচন্দ্র অস্থির। কিসের তাকনার সে  
যেন দিশাহারা। চন্দ্রাবতীর দেখা সে কি  
আর পাবে না? শেষ পর্যন্ত সে আর খেঁচ

রাখতে পারলো না। ছুটে এলো এগিয়ে।  
কোথায় চন্দ্রা। কোথায় চন্দ্রাবতী। জানলো,  
সে শিব মন্দিরে পূজা করছে। জরচন্দ্র সেই  
মন্দিরে গিয়ে বন্ধ দরজার খা দিল। কোন  
সাড়া নেই। বারবার চন্দ্রাবতীর নাম ধরে  
ডাকল। কেউ উত্তর দিল না। জরচন্দ্র  
চিৎকার করে বলল—

“স্বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দাও মোরে।

পাগল হইয়া জরচন্দ্র ডাকে উচ্চস্বরে।।

কিন্তু চন্দ্রাবতী জরচন্দ্রের সেই কাভর  
ডাক শুনতে পেল না।

“যোগাসনে আছে কন্যা সমাধি শরানে।

বাইরের কথা কিছু নাহি পশে কানে।।

না খোলে মন্দির দ্বার, নাহি কর কথা।

মানতে লাগিল যেন শব্দশেলের বাধা।।”

হতাশ হয়ে জরচন্দ্র পাগলের মতো  
চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে  
দেখলো, অদূরে অজয় রত্নবর্ণ ফুল ফুটে  
রয়েছে। সে অনেক কল ভুলে নিরে এলো  
এবং সেগলি নিড়ে রস বার করে সেই  
রত্নরাঙা রসে মন্দির কপাটে লিখল—

“শেষের সঙ্গী তুমি, যৌবনের সাথী।

অপরাধ কম্ম কর তুমি চন্দ্রাবতী।।

পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হৈলা সম্মত।

বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত।।

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রাবতীর সমাধি ভগ্ন  
হল। তার মন যেন জানি হঠাৎ উত্তলা হয়ে  
উঠল। সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ল। ও কি লেখা  
ওখানে? কে লিখল? লেখা পড়ল  
চন্দ্রাবতী। মনের ভিতর হাহাকার করে  
উঠল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে  
সে নদীর ধারে জল আনতে গেল।

নদীর পাড়ে গিয়ে চন্দ্রাবতী দেখল,  
সেখানে জনমানব নেই। নদীতে উজান।

তারপর?

“একলা জলের ঘাটে সপোন নাই কেহ।

জলের উপরে ভাসে জরচন্দ্রের দেহ।।

দেখিতে সুন্দর যেন চাঁদের সমান।

চেউ-এর উপরে ভাসে পোঁপ মাসী চাঁদ।।

আঁখিতে পলক নাই, মুখে নাই বাণী।

পারেতে দাঁড়াইরা দেখে উদ্ভাস

কামিনী।।”



# বিজ্ঞানের কথা

## ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ১৯৫৬-৫৭ সালের এ-বছরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। চতুর্থাংশে চার হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্দেশ্যন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, গত ৩রা জানুয়ারী। কয়েক-জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী সমেত বিশেষের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও এই অধিবেশনে বোগ দিয়েছেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন শুরুর হবার আগে ভারতের আরো কয়েকটি বিজ্ঞানিক সংস্থার বাৎসরিক সম্মেলনও এই চতুর্থাংশেই অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এমন একটি সংস্থা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অকাদেমি, এ-বছরই যার রক্ত-জয়ন্তী বছর। অন্যান্য সংস্থার অধিবেশন বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল সভাপতি এ-বছরে ডঃ এস ভগবন্তর। পাজাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায় শ্রীসুখ ভান লভারনা সমিতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়েছেন। সন্তোষ-কালব্যাপী এই অধিবেশনে বহু গবেষণা-মূলক নিবন্ধ পঠ করা হচ্ছে এবং বিশেষের অধ্যয়িত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভাষণ দিয়েছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যনী ভাষণটি এখানে কিছুটা অন্য ধরনের। প্রশংসাসূচক কথার চেয়েও কড়া সমালোচনার সুর জতে বেশ, কখনো কখনো মনে হতে পারে এমনকি বিজ্ঞান-সূচক। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতিতে তিনি স্পষ্টই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, বিশেষ করে দাঁটি ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কার্যভার পরিচর দিয়েছে। একটি হচ্ছে মৌজিকেল সাহায্য অপরটি গৃহ-নির্মাণ। দাঁটি ক্ষেত্রে কার্যভার করণ, তাঁর মতে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পশ্চিমী ধ্যান-ধারণার স্ফূর্তি চালিয়ে হওয়া। আমাদের দেশের মৌজিকেল ক্ষমতাকরা বিশেষের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া হচ্ছে কিনা, মৌজিকেল শিক্ষার মানকাটি তা হওয়া উচিত নয়। এখন চাই জনগণের

ভাষার, যারা গ্রামে ও পাবনা জঙ্গলে যেতে রাজী থাকেন। আধুনিক জাহাজের মতো উচ্চনিয়ন্ত্রণে বড় তারা না হন, তাতে আগাতত কোনো কতি নেই। আজকের দিনে মৌজিকেল শিক্ষার বা বাধ্যতা, আর বিরাট খরচ, তা করার থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেও স্বাধীনতা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজন পূরণ করা যাবে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরো একটি দফার জনেও প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, মনে হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা তাদেরই আরো দিচ্ছে হাতের আছে, তাদের নেই তাদের বশিত করছে। এর ফলে থাকা ও না-থাকার দলের বিভেদ তীব্রতর হচ্ছে।

বিশেষী সহযোগিতার বাধ্যতা, জাই-সেলের নীতি ও গবেষণার জন্য পিচের হান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কঠোর মন্তব্য করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আরো একটি জিহ্বিত বিষয়—উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীব-কেট, যার ফলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিপন্ন। রক্তেও অতিরিক্ত মাত্রার কীটের। রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে ফসলের ব্যাধি দেখা য়েছে, শাক-সবজিতে বিষাক্ত অবশেষ থেকে আছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিজ্ঞানীদের খোঁজ দিক থেকে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার

পরিমাপের দিক থেকে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ।

কিন্তু গত ষাট বছরে এই বৃহত্তম দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি নিম্নগত করা চলে না, বিশেষ করে যদি মনে রাখা য়ার যে, এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কী বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অধিবেশনের সভাপতি ডঃ এস ভগবন্তরের ভাষণে, আমাদের জীবনধারণের মান উন্নতনে ভারতের বিজ্ঞানসাক্ষা অন্যান্য দেশের তুলনার খুব একটা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। পঞ্চাশ বছর আগে স্যেভিসেই ইউনিয়ন বিজ্ঞানের ও কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জনগ্রন্থ ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বছরে তাদের সাক্ষা চমকপ্রদ। আজ থেকে ষাট বছর আগে, যখন ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল, তখন মার্কিন বিজ্ঞান-লগতেরও শৈশব অবস্থা। কিন্তু তাঁরা জানার কানার পূর্ণ-অনিচ্ছা, স্বমহিম। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরেও ভারতের অগ্রগতি সে-তুলনার সামান্য।

ডঃ ভগবন্তর তাঁর ভাষণে আরো বেশব বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিবেশ দূষিত হওয়া এবং তার ফলে উদ্ভিদ ও জীব-জগতের সংকট সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা। তাঁর মতে, অন্তত ভারতে এই দলদা প্রকট নয় এবং বর্তব্যও নয়। বিশ্বের সুরে তিনি বলেছেন—মূল দূষিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তার আগে মূল যাতে সবাই পার সেই ব্যবস্থাটা করা



অধ্যাপক রমিত প্রাইভেট সিঃ

২০, কলি বীঠ, কলকাতা-৭



দরকার। 'জনগণের বিরাট একটি অংশ অপদ্রুতিতে ভুলে যারা বাসে। তাদের যথেষ্ট খাবার জোটে না, যাওয়া জোটে তার খাদ্য-মূল্য নামমাত্র।' পরিশেষে 'তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের ওপরে আত্মশাসনীয় খবরবারিতে এই অবস্থার প্রতিফলন হবে না।

জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রক্ত-জরুরী

জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রক্ত-জরুরী স্মারক পুরস্কারটি পেয়েছেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (আই সি এ আর) অধিকর্তা ডঃ এম এস স্বামীনাথন। তিনি সম্মানিত হলেন শস্যের প্রজনন-শক্তির উন্নয়নে এবং কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁর অবদানের জন্যে। ভারতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারে তাঁর সাহায্য অনেকখানি। মেক্সিকোর গম ভারতের মাটিতে ফিল্ডে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে তাঁরও হাত ছিল।

চণ্ডীগড়ে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রক্ত-জরুরী অনুষ্ঠানে তিনি যে রক্ত-জরুরী স্মারক ভাষণটি দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো। ১৯৮১ সালে ভারতে প্রয়োজন হবে, তাঁর হিসেব অনুযায়ী, ১৮৫ মিলিয়ন বা সাড়ে আঠারো কোটি টন গম। সঙ্গে সঙ্গে আরো বলেছেন, এই হিসেব শূন্যে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করলে ভারতের মাটিতেই এই বর্ধিত মাত্রার উৎপাদন সম্ভব।

তাই তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন, এখন চাই বর্ধিত মাত্রার ফলন, বিরাট আকারের ফলন। টিকে থাকবার জন্যে চাই আরো বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ, আরো বেশি সংখ্যক জীব। আগাছা আছে, মারী ও মড়ক আছে—উদ্ভিদ ও জীবের এখন এমন বিশেষ ক্ষমতা চাই যেন টিকে থাকতে পারে। জনসংখ্যার বর্ধিত্ব সঙ্গে খাদ্য-সরবরাহের সমতা থাকতে হলে অবশ্যই চাই উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তা অসাধ্য নয়। ভারতে কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় একটা অচল অবস্থায়, কাজেই আগামী দিনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে লড়াই রকমের কিছু করা দরকার।



### বিকীরণজনিত রোগে প্রতিরোধ-ক্ষমতা

ট্রেন্ডের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের জৈবরসায়ন ও খাদ্য টেকনোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ এ গ্রীনবাসন চণ্ডীগড়ে একটি আশার কথা শুনিয়েছেন। কখনো বিকীরণজনিত রোগে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি সম্পর্কিত।

সকলেই জানেন, আধুনিক জগতে যে-কেউ যে-কোনো সময়ে পারমানবিক বিকীরণের শিকার হতে পারেন। যুদ্ধেই হোক (যেমন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে হয়েছিল) বা কোনো দুর্ঘটনাত্মক হোক, পারমাণবিক বিকীরণের সংস্পর্শে এসে মানুষের আর রক্ষে নেই, এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যে মারাত্মক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

ডঃ গ্রীনবাসন বলেছেন, তাঁর সহকর্মীরা স্তন্যপায়ী জন্তুদের ওপরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, মারাত্মক মাত্রার কম পরিমাণ (অর্থাৎ খুবই অল্প পরিমাণ) বিকীরণ ঘটলে তার প্রভাব দূর করা সম্ভব।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার। বিকীরণ থেকে পরিগ্রহ পাওয়া মানবের পক্ষে কতোটা দুর্বল, কত-কোনোরাত্রে ততোটা নয়। গোটা পৃথিবী যদি পারমাণবিক বোমার ধবংস হয়ে যায় তখনো সম্ভবত আকস্মিকভাবে বেঁচে থাকবে—তার মানে তাঁর মাত্রার বিকীরণও আরম্ভোত্তম পক্ষে কতিপয় নয়। কিন্তু মানুষের বেলায় জাঁতি সামান্য মাত্রার বিকীরণও প্রাণনাশী।

ট্রেন্ডের বিজ্ঞানীদের গবেষণার আশার বাণী এই যে—মানুষ না হোক, স্তন্যপায়ী জন্তুরা অল্প মাত্রার বিকীরণ থেকে পরিগ্রহ পেতে পারে। এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব। আব স্তন্যপায়ী জন্তুর বেলায় বা সম্ভব, মানুষের বেলায় তা চিরকালই অসম্ভব থাকবে এমন কথা বিজ্ঞানীরা কখনো বলেন না।

### দূরারোগ্য টাইফয়েড

ডেব্রজ বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই যা আশঙ্কা করছিলেন, অবশেষে তাই ঘটেছে। টাইফয়েড বোগ এমন আকার ধারণ করেছে—যা, সঠিকভাবে বলতে হলে, টাইফয়েডের ব্যালিসাই এমন কারণে পিছুড়ে—যে অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধেও রোগ গিরে না বা ব্যালিসাই ধ্বংস হয় না। অর্থাৎ টাইফয়েড হবে উঠেছে দুরারোগ্য। অ্যান্টিবায়োটিকও এখন আর কাজ হচ্ছে না।

এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর দাঁড়ি জারকা থেকে এ-বরষের দুরারোগ্য টাইফয়েডের খবর পাওয়া গিয়েছে। মেক্সিকো ও চিলি। শেখোত স্থান থেকে এই রোগের বিবরণ দিয়েছেন কলিকট মেডিকেল কলেজের ডাঃ সৈকেল মোহন গুপ্ত ও ডাঃ কে এম বিজয়া। তাঁরা জানিয়েছেন, ১৯৭২ সালের মে মাসে

ভারতের হাতে এমন কয়েকটি টাইফয়েড রোগী এসেছিল, ফোরামফেনিকল প্রয়োগ করেও বাসের সারানো যায় নি। না ফোরামফেনিকলে, না টেট্রাসাইক্লিনে, না স্ট্রপ্টোগ্রাইনিসনে। টাইফয়েডের চিকিৎসার এতদূরীণ ফোরামফেনিকলই ছিল অবশেষে তরুণ। দেখা হয়েছে, এটি ভোজ্য, এ-জাতীয় অনুরণ ওষুধও ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মানে কী? টাইফয়েডের ব্যালিসাই—যা, বাকি বস্তু হলে স্যালমোনেলা টাইফি—এমন প্রতিরোধ-ক্ষমতা লাভ করেছে যার ফলে ফোরামফেনিকলকেও টেকাতে পারে ও ট্রিবিটিকে থাকে। মেক্সিকোতে যে দুরারোগ্য টাইফয়েড দেখা দিয়েছে তার ব্যালিসাই এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিশিষ্ট। কেবলেও তাই। অথচ এই দুটি স্থানেই টাইফয়েডের দাপট হয়েছে।

ব্যাপারটি ঘটেছে একারণ যে ফোরামফেনিকলের প্রয়োগ—যা, সাধারণভাবে বলতে গেলে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ—যতদূর হতে শূন্য করেছে, জাঁতি সামান্য সব কারণেও, এমন কি বিনা কারণেও। মোক্ষম জন্তু অবশেষে ব্যবহার করে চললে তার মোক্ষম আর থাকে না। বাকি বিনাশ করা হয় সেই মোক্ষম জন্তু প্রয়োগ করার কথা, আগে থেকেই অভ্যস্ত হতে হতে সে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে বসে। তারপরে তাকে বিনাশ করা সেই মোক্ষম জন্তুর পক্ষেও সম্পূর্ণ অসাধ্য হয়ে পড়ে।

ডেব্রজ বিজ্ঞানীরা তাই আবেদন জানিয়েছেন, ফোরামফেনিকল বা এ-জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে বোগ সারানো হবে, এই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে সেগুনোব প্রয়োগ একমাত্র এই রোগের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধ করা হোক।

কেবল এই ভারতেরই একটি রাজ্য। কেবল থেকে এই কলকাতার ও অন্যত্র অবশেষে লোক ব্যতীরাভ করে থাকে। কাজেই এই বিশেষ ধরনের টাইফয়েড রোগটি হাঁড়ুরে পড়া অসম্ভব নয়। তবে ডেব্রজ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মোটামুটি স্বাভাবিক-গলো মেনে চললে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সকলেই হরতো স্বীকার করবেন, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি বোটা অঘান্য করা হয় তা হচ্ছে স্বাস্থ্য-বিধি, সবচেয়ে বেশি বোটা অঘান্য করা হয় তা হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা। ফলে রোগ অনারাদেই হাঁড়ুরে পড়তে পারে। এ-অবস্থার সমাধানের অগ্রদূত ও শিক্ষিত অংশ চিকিৎসকদের কাছে এটুকু আশা করা যেতে পারে যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার তাঁরা যেন নিত্যন্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন, বহুতর প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন। রোগীরাও লক্ষ্য রাখতে পারেন। দু-একটা হ্যাঁচ-কাঁশি হলেই ডাক্তারের কাছে হুটে কলকার কোনো প্রয়োজন নেই, হ্যাঁচ-খটো স্নান সারিয়ে তেলার ব্যবস্থা পরীক্ষণ ভিতরেই আছে। আর যদি হুটুতেই চর পলা এমন ডাক্তারের কাছে কদাচ নম সিনে সচি-কাঁশির চিকিৎসাতেও অ্যান্টিবায়োটিক বরাদ্দ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
**श्री कृष्ण जी**  
 नमस्तुते ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



## শীতের চিড়িয়াখানায়

শ্রীমন্তকর পাঠক

এইখানে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার,  
উলসীনি ও রোম্যান্টিক মনে হয়। এর  
আকাশের আকাশ। আলোকিতকার  
বোম্বোমের এইখানে প্রায়শঃ আলবোর  
কামরা একটি প্রকৃতি-আটির বোধ ডাক  
শনেতে পড়েছে, ত্রিক সেইভাবে এখানে  
কেউ আসছে, হতে আসেন না। তবু সকালে,  
সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার হুপের গড়িরে বিকল  
হয়। বালুকের ফেলাবল আর মন্দের  
ভীড় বায়ক। প্যাখির শিশু, বাঘের ডাক,  
সিংহের গর্জন শোনা যায়।

সব মিলিয়ে শীতের চিড়িয়াখানার,  
একেকটি হুপের, একেকটি বিকল কেন  
অলৌকিকতার রহস্য মাথা।

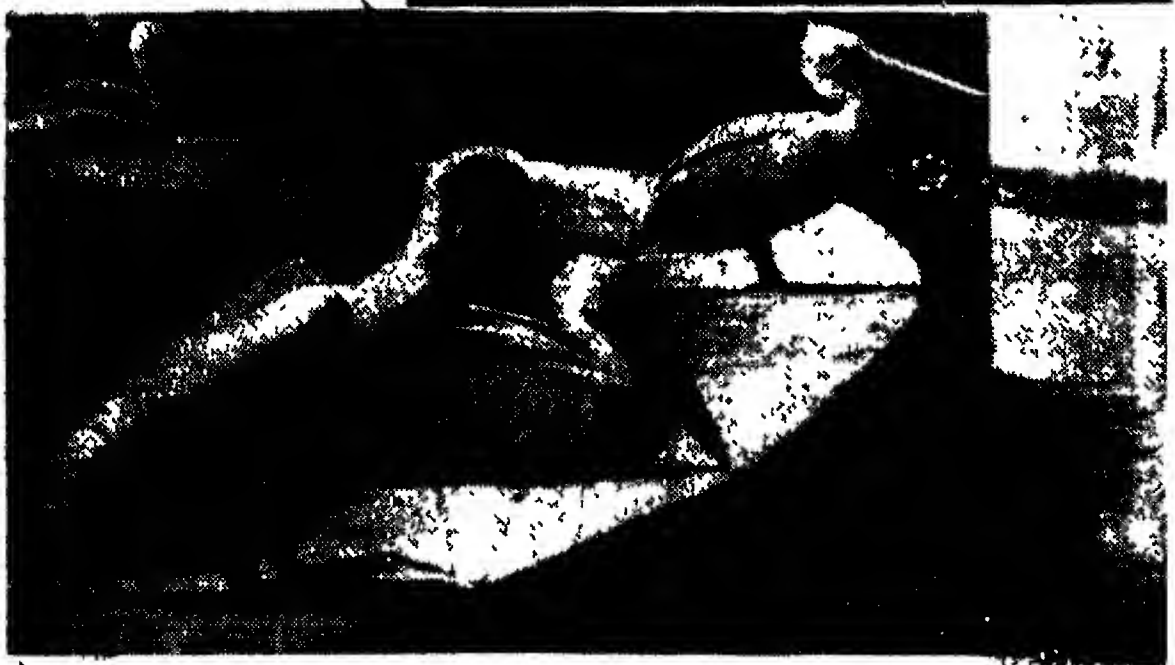
বে-কোনো ছাটির দিন, অফিসের  
সব জাইতে ব্যস্ত মানুষটিকে  
হদি হজকা মেলাজে দেখতে চান,  
তাহলে চিড়িয়াখানার আসুন। হস্তো  
দেখতে পাকেন, খবরের কাগজ বিছিয়ে  
তিনি শব্দে আরেন মিস্ট রোলারে।  
কিংবা সত্যজি বিছিরে ডাস-পাশা খেলছেন।  
ডাইনে বাঁয়ে হড়ানো কমলালেবুর খোসা।  
গোড়া ত্রিমেক টিকিন ক্যারিয়ার। এবং  
শ্রীর সঙ্গে রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি  
ক্রিকেটের ধারা বিবরণী কিংবা হিন্দী  
সিনেমার গান শুনছেন গ্রানজিস্টারে।

অর্থাৎ এখন তিনি খোলা-স্রো।  
একান্তভাবেই ঘরোয়া।

উত্তরায়ণের সূর্য হলে পড়েছে দক্ষিণে।  
দিনের আয়তন কমেছে। সৌরশী ছাওয়ার  
বিলাপ নেই। পাহাড়ের দীর্ঘশ্বাস ঘন হয়ে  
নমে এসেছে সম্রভলের মাঠে, জনপদে এবং  
চিড়িয়াখানার। ভ্রমলোকও নিশ্চয়ই তা  
জানেন। তার গারে এখন একটা কমলালেবুর  
সোরেটার। ছেলে-মেয়েরা কাছে নেই। ওরা  
ঘরে বেড়াচ্ছে জলের খারে।

কি বেশ দেখছে?

—কি? পলকোড়ি?







—না। কয়েকটা নীল রঙের ডানাওয়ালা পাখি। কীটনা। ওদের চেপে খাদ্য। ডানার সামান্য সবুজের ছোঁয়া মেশানো। আর বকের ফিকে খালিকটা শূন্য রঙের অভ্যাস। এই পাখিগুলি ফি-বছর সদুদর সাইবেরিয়া সীমান্ত থেকে আসে আলিপুর চিড়িয়াখানা।

এরা শীতের অতিথি। শীত ফুরোলেই চলে যাবে।

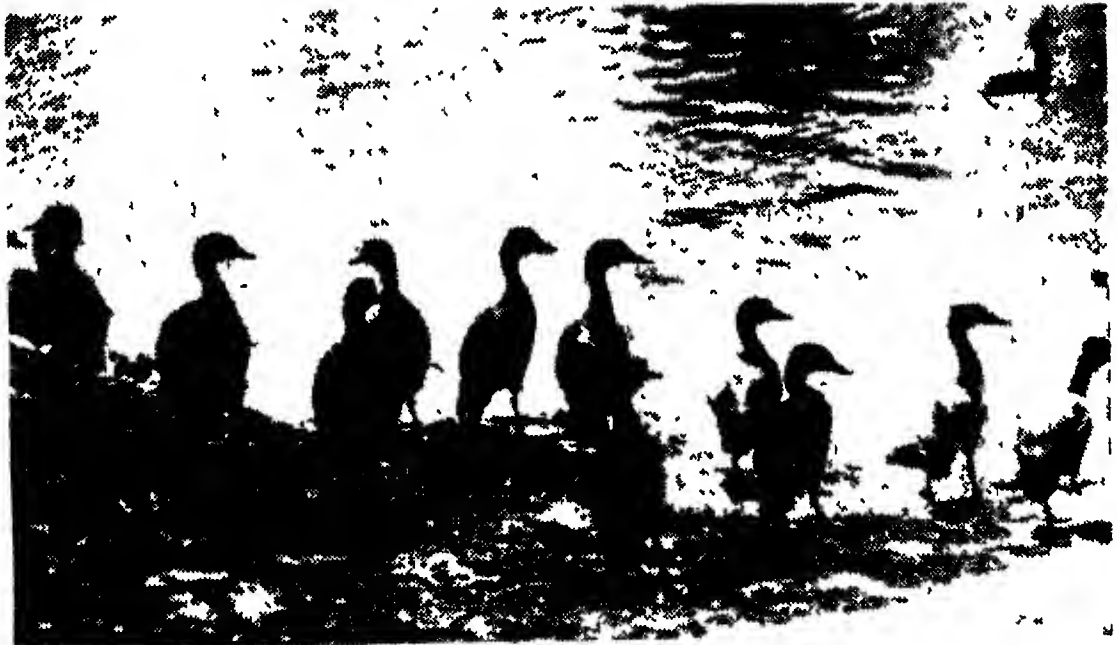
আমি পাখিবিদ্যায় নই। সব পাখির নাম জানি না। রেড ইন্ডিয়ানরা জানে, কোন পাখি কোন মাসে হুদের জলে সাঁতার কাটে। গাছের ডালে শিস দেয়। পাখিদের চলাচল আর পর্বত-রাঁতি অনুসারে ওরা দিনের হিসেব কবে। ক্যালেন্ডার মাসেব নাম রাখে।

আমরা নক্ষত্রে বিশ্বাস রেখেছি। তাই পাখিদের নামে সময়কে চিহ্নিত করি নি।

পাখিভবিদদের মধ্যে হলডেন, চাইল্ডস, জুলিয়ান হাক্সলে ও সেলিম আলির অনুসন্ধান থেকে ভ্রমেনিছি, হাওয়া বতলের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রঙ পাল্টায়। পাখিরাও তাদের বাসস্থান বদল কবে। শীতের শুরুতে উত্তরাংশের পাখিরা উড়ে আসে দক্ষিণেব উষ্ণ সমতলে।

কেননা, উত্তর মেঘ এখন অন্ধকার।

সেখানে দিনেব সূর্য প্রায় নিবাসিত। নক্ষত্রের আলোয় পাখিরা দেখতে পায ভূবারপাতের দৃশ্য। কোথাও ভূগর্ভস্থেব চিহ্ন নেই। গাছগাছালিও অদৃশ্য। এই দৃশ্যময় ওরা এগাবো শ মাইল প্যাড়ি জমায় আকাশ পথে। খাদ্য ও আগ্রহের সম্মানে। শীত শেষ হলোই ওরা আবার ফিরে যাবে নিজের রাজ্যে। অর্থাৎ ফিবাতি পথে আবার এগাবো শ মাইলের জানি। যাওরা-আসা, দুইয়ে মিলে বাইশ শ মাইলের পথ-পরিভ্রম।



আলিপুরের চিড়িয়াখানার যে-পাখিরা আসে, তারা মূলত লালক, তিম্বত ও সাইবেরিয়ার বাসিন্দা। এ খবর অনেকের জানা নেই। জানা থাকলে কুল রক্ষা পরিবেশন করতেন না।

একটা ঘটনার কথা বলছি।

সোদিন শুলের ইউনিফর্ম-পরা অনেকদূর থেকে দেখলাম, চিড়িয়াখানার হলের ধারে। কতলা রঙের এক কাক হাঁসের দিকে তাকিয়ে তারা ক্রোধ কেরাড়ে পারছিল না। হাসিগুলির ডানার শাদা, কানের, আর গাফ সবুজের সমারোহ। তাদের সঙ্গে ছিলেন জন দুই বয়স্ক ভ্রমরক। বোম্বাইর, শুলের মাস্টারমশাই যেন। তাঁরা ছেলের বোকাছিনে যে, এই পাখিগুলি বাংলাদেশের নলীনালাল, বিদেশ করে মুকুবন অঞ্চলে দেখা যায়। শীতের মরশুমে চিড়িয়াখানার এসে গেছে, অন্যদিকে পাখির সঙ্গে।

আসলে, এ ভ্রমরকেই পাখিগুলির নাম আসেন না।

ইংরেজীতে ওদের নাম স্নিড পেলেক্স। বাংলার চণ্ডাচি বলা যায়। দাঁকল মুকুবন লবণ, উত্তর আফ্রিকা, লালক ও তিম্বত অঞ্চলে ওদের দেখা যায়। পিনটেল বা সিন্ধুসজাতীর সরাল বাংলাদেশে কমই আসে। তবু চিড়িয়াখানার মহোৎসবে ওরা সর্বাঙ্গত অন্তর্গত থাকে না। ওদের মাথার চিহ্ন-চিহ্নের মতো বাসানী রঙের একটা চিহ্ন দেখা যায়।

তাহাড়া, এই শীতে চিড়িয়াখানার এসেছে আরো অনেক নতুন পাখি।

ফ্রেন্স ম্যাগার্ড, স্পটেভিল, গ্যাড-ওয়েল, কেকোয়ার, কমনটিল, গ্রেটব ও লেসার হুইসলিংটিল উইজেন, পচার্ড, কোম্বাক প্রভৃতি। লেসার হুইসলিংটিল আকারে পাখিহাসেব চেয়েও ছোট। ওড়াব সময়ে ওরা বিদ্যুৎগতিতে শব্দ কবে ওড়ে। প্রয়োজনে গাছে আশ্রয় নেয়। সেজন্যে অনেকে ওদের গোছো পাখি আখ্যা দিয়ে থাকে। শ্যাম, কোচিন মালা, পুমায়া, জাভা বোর্নিও, জরত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ওদের দেখা যায়।

তাই বলে, এই পাখিরা চিড়িয়াখানার প্রধান আকর্ষণ নয়। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে দর্শনীয়। চিড়িয়াখানার কতৃপক্ষ তাদের স্থায়ী আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন, গাছগাছালির আশ্রয় বানিয়ে, জলাশয় তৈরী করে ও নিরাপত্তার গারান্টি দিয়ে।

এখানে কেউ পাখি শিকার করতে পারেন না। কিন্তু হাতির পিঠে চড়তে পারেন।

এ যে ভ্রমরক এখন দাঁড়িয়ে জাঁজেন বাঘের খাঁসটার সামনে। তাঁকে আমি চিনি না। আপনিও চেনেন না। যে-কোনোদিন চিড়িয়াখানার গেলে, তাঁকে না হোক, তাঁর মতো কাউকে নিশ্চয়ই অনুরূপভাবে দেখা যাবে। চোখা থেকে অস্মান হয়, উনি কোন্সো বেসরকারী ফার্মের কনস্ট কেবানী।

অর্থাৎ সবচেয়ে কীর, নিরীহ এবং গোবেচারা মানুষ। বাঘের লাহেরের এক খেতে খেতে জীবনের তিম-তুম্বাংশ কেটে গেছে। অথচ, এখন তিনি মূলত চিড়িয়াখানার দিকে তাকিয়ে মশেট সাহস দেখাচ্ছেন। যেন ইচ্ছে করলে, ওর মতোমুখি বাড়ির পড়তে পারেন। তাঁর সঙ্গে করেকটি ছেলে-মেয়ে। তাদের তিনি বোকাছেন, ঘোবনে তাঁর স্কেন সাহস ছিল। চেন্টা কবলে, ভালো শিকারীও হতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হন নি। জীবনের কাজে এমন ব্যস্ত থাকেন যে, বন্দুক জালাবার কুরসব-ই হয় না।

চিটা বাঘটার খুঁম ভেঙেছে। হাই তুলছে। আড়মোড় ভাঙছে। ভ্রমরলোক মাড়ালের নিরে, প্রুভতার সঙ্গে, সামনেব খাঁচটার দিকে এগেছেন। বাজারা এই ধ্যস্ততার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্যদিকে করেকটি ভ্রমর-ভ্রমরী কি কেন কৌতুহলী হয়ে দেখছে, শীতের পোষাক পরে।

শুল-পড়রা ছেলে-মেয়েদের এখন ছুটি। তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বুকালিষ্ট বেরিয়েছে। কিন্তু পড়শোনার তাড়া নেই। শীতের চিড়িয়াখানার তাদেরই উপস্থিতি বেশী। গরমের ছুটিতেও তারা আসে বা আসতে পারে। তাদের বাদ দিলে চিড়িয়াখানার গোটা আনন্দটাই নিশ্চয় হয়ে যায়।

এখন অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত। ছেলেরাও মুক্ত। পরীক্ষার ফল যা হবার হবেছে। এখন তাদের বিশ্রামের কাল। ঘুরে বেড়া-নাব সময়। রেওবার জগাল থেকে যে-বাঘ-টিকে চিড়িয়াখানার আনা হয়েছে, তারে দেখার জন্য ছেলেরাওদের কী ভীড়! সুন্দরবনের অরণ্য থেকে বরেল বেগালোব যে-বাঘটিকে পাঠানো হয়েছিল বটেবেব রাজকীয় চিড়িয়াখানা, তারে দেখাব জন্য কী লম্বলোব ছেলে-মেয়েরা অনুরূপ ভীড় জমিয়েছিল।

১৯১১ সালে ছাপা একটি পাঠ্যবইতে পড়ছি, ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নাবিকেরা যখন সমুদ্রপথে লন্ডনে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বাঘের বাঘাটি ছিল নিরাশ্রয়। জাহাজের একজন মিস্টার সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। দশ বছর পরে যখন এ বাঘের বাঘাটির সঙ্গে মিস্টার দেখা হয়, তখনও সে পুরনো বন্ধুত্বের স্মৃতি ভোজেন।

আলিপুরের চিড়িয়াখানার যে-সব বাঘ, সিংহ, হাতি, গুড়ার, জলক, জেব্রা, হুন-মানুষ, গেরিলা প্রভৃতি আছে, তারাও সম্ভ-ভাবে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত। নানা রকম পরিবেশ ও আব-হাওয়ার বেড়ে উঠেছিল। সে খবর সাক্ষর্য দর্শকের জানা নেই। তবু আশ্চর্যজনক-ভাবে তারা বেড়ে আছে। দর্শনীর হয়ে উঠেছে। সৈন্যসামরিক রোজ অনেক-দূর জাটা মাছ খায়। বাজারের কানকানে পশু করলে পাড়ের কাছে ছুটে আসে।

জল-হাতিরা এই রকম পশু করলে প্রক্ষেপ করে না। ওরা কি খায়, কে খানে? রোজ পোহাতে পোহাতে সবাই খুঁজ থেকে দেখে পাহাড়ী মতো জায়গাটার পাং-শুটে রঙের একটা সিংহ। এই দৃষ্টিতে সিংহরাও রোজ পোহায়?

তাহলে সিংহটা নেই কেন?

নিশ্চয়ই মরে গেছে। সিংহটা এখন একা, নিঃসঙ্গ। সোদিন খবরের কাকছে বেরিয়েছিল, একটা সিংহের সঙ্গে কোথায় কেন একটা বাঘিনীর মিলন ঘটেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এ রকম অসম মিলন হয় না। চিড়িয়াখানার হয়। শীতের বিকেল গাফ হয়ে এলে, চিড়িয়াখানার সেকের ধারে, দু' একজন তরুণ বৃদ্ধ বাম্ববীসের সঙ্গে গল্প-গুজব করে খবরের কাগজ বিছিয়ে। দিনের সংবাদ তাদের পারের তলার পিষ্ট হতে হতে নতুন খবর তৈরী হয়।

চিড়িয়াখানার কতৃপক্ষ নিশ্চয়ই তার খোঁজ রাখেন না।

নানা ববনী মানুষের গারে এখন নানা বকমের সোবটার, কোট, আলোয়ন, শাল, কমকোর্টার। অধিকাংশই ঝুঞ্জল রঙের। লাল, নীল, আকাশী, ভাষোলেট, স্টাউন, কলা, গোলাপী। হুরোপের মানুষ গীম্বের শরুতে ছাড়া এত রঙের পোষাক সাধারণত পরে না। চিড়িয়াখানার আলো-জালার নানা কণ্ঠের সঙ্গে নানা বর্ণের এই তানাগোনা কেন রহস্যময় পরিবেশ তৈরী করে।

হে শীত! হে শীতের সূর্য! চিড়িয়াখানায় তুমি আরো দীর্ঘস্থায়ী হও।

কলকাতার অস্বাস্থ্যময় জায়গা আব বিশেষ নেই। গড়ের মাঠের ধাবো আনা-টলে গেছে খেলোয়াড়, ক্রীড়া-রাসিক আব প্রেমিক-প্রেমিকাসেব দখলে। কিন্তু এখানে নিজনতা আছে, ফিসফিস কবে কথা বলা যায়। স্বজনে এসেও কেউ জনতা তৈরী করেন না।

সব মিলিয়ে, সবাই এখানে স্বচ্ছন্দ। মাথার ওপরে ওড়ে, ইংরেজী ভি' অক্ষরের মতো, বাগিচাসের কাঁক। ভোর চারটে নাগাদ ওরা আলিপুরের চিড়িয়াখানার আসে। আবার, সম্ভ্রবকো আকাশের রঙ বদল হলে নোনা অঞ্চলে ফিরে বাব।

কিন্তু জ্যোৎস্না রাতে যায় না।

সেই রকম একেকটি রাতে চিড়িয়াখানার খালিলা জগত্ব অলৌকিকতার পূর্ণ হয়ে ওঠে। হাঁসের ডাক, ডানার কটপট শব্দ, ওপরের জ্যোৎস্না এবং প্রকৃতির নিজনতার প্রার লম্ব সহস্র পাখির উপস্থিতি কি চিড়িয়াখানার কোনো দর্শক কেহোদিন দেখতে পাবে?

সে বড় আশ্চর্য সুর। সে বড় আশ্চর্য রাত!

—আমি বাছি সুখ, স্কুলের সময় হয়ে এসেছে—বাল্যশ্রম দাঁড়িয়ে তাকে বললাম সুখকে।

—নাড়ো, আমি হাত ধরে এখনই আসছি—বনের ডেডর থেকে সুখা একটু অপেক্ষা করতে বলল আমাকে।

বাল্যশ্রম এসে আমার হাতে পান দিয়ে মাথায় আঁচল টেনে প্রণাম করে সুখা বলল ফিরতে দেরি করো না কিঞ্চিৎ। আজকে তোমার জন্মদিন।

—তোমার দিনকণ খুব মনে থাকে ত? হেসে বললাম আমি।

—তোমার জন্মদিনের কথা আমার মনে থাকবে না ত, কি মনে থাকবে শূন্য মা বৈফে থাকলে সকাল থেকেই ঘটা পড়ে যেত তোমার জন্মদিনের।

সুখার মতের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম। কি অপরূপ মানিয়েছে তাকে ছুরে শাড়ীতে। মণ্ডলবায়ের হাট থেকে একখানা শাড়ী কিনে এনেছিলাম তার জন্যে। স্নান করে ছুরে শাড়ী পরে, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে মণ্ডলময়ীর সঙ্গে সোজাছে সে। তার মতের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুখা হেসে বলল—অমন করে কি দেখছ?

—তোমাকে।

—আমাকে কি আজ নতুন দেখলে?

—কতই দিন রয়েছে ততই যেন তোমার নতুন করে দেখছি। তোমার ডেডর মিলে নতুন মানবের গোধা পাই আমি।

—আহা, তুমি কেন কি? দিনে দিনে তোমার নতুন ডাবের উদয় হয়।

—সত্যি তাই। বোবনকে আমি করে রাখতে চাই; বিদায় জানাতে চাই না।

—আমার বয়েস বাড়ছে না?

—বাড়ছে বইকি!

—তা হলে?

—তোমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তোমাকে আমি নতুন করে দেখছি।

—সত্যি?

—খুব সত্যি।

বোবনের উদ্দানায় যখন তাঁকির টান ধর তখনই স্বামীশ্রীর অঙ্কেলা বন্ধন নতুন করে ধরা পড়ে। ডাবের আবেশ বাটরে চোখে তাসে তাদের সত্যিকারের মূপ।

—চোখও বদলে যায় বল? তাই তুমি অমন করে আমাকে নতুন সাথে সাহায্যে আলবাস, নতুন করে দেখতে পাও।

—হয়ত তাই। তোমাকে অজানত আমার কি মনে হয় জান?

—কি গো?

—জন্ম জন্ম ধরে যেন তোমার পেয়েছি আমার কাছে—তুমি আমারই।

সত্যি তাই। তোমার কথা জাহলে আমারও মনে হয় যেন কত যগ যুগ ধরে তোমার আমার পরিচয়।

—পরিচয়ের সে সূত্র ধরেই নিত্য নতুন করে খুঁজে পাই তোমাকে। শুধু এক জন্মের নয় কত জন্মের পরিচয় এক সাথে ঝড় করে জন্মে ওঠে তোমাকে যিরে।



গোষ্ঠ শেঠ  
এক  
ডাবের  
নয়

—তুমি আমার বাড়িতে যেমন আমার নিজেকে মনে করা করেছ, তেমনি অন্যত্রও তুমি আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—আমার চাকরি কত। তুমি আমার চাকরি মনে কর মনেই আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—কত কত হল আমার মনে, মনেই আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—না, এক-একটা বছর পার হয়ে আমার মনেই আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—আমার মনেই আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—কি তুমি। তুমি আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

নরকের আকাশে জলহীন মেঘ বাতাসের জর করে দূর দেশ থেকে ভেসে আসছে। দিওলির গন্ধ প্রাণে জাগিয়েছে বোবনের কান্নাকাতি। চান্দ্রাণী রোদে সারা সংসার হুসুয়ে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

কেন মনেই আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

এক। কিসের মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

যাটের দ্বারা হাত জেগে মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

কতকাল পরে আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

দিল্লি দিল্লি আসে। নতুন নতুন হাজার হাজার সৈন্যসহিত। নতুন নতুন সৈন্যসহিত। নতুন নতুন সৈন্যসহিত।

বিহানার মনে কানে এক একটালা দিওলির জ্বল, নবীর কলধনি। নবীর জ্বল—চারিদিক জ্বল জ্বল করছে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

সত্যিই ত, আজ তেরো বছর আমার জন্মদিন। কেন কত সখা জানল সে কথা। আমার মনেই ছিল না, আজকে আমার জন্মদিন। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

স্কুল থেকে কিসের মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

গভীর রাতে সখা বললে, 'খাক, তোমার কথা, শোনার সময় নেই আমার। হাত-মুখ ধুয়ে এস শিপিয়ার। হা-পিউজস করে আমি বসে আছি কখন থেকে।'

শুশ্রূষা ছেলের মত ঘাটে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কিসের আসতে, ঠাই করে গালিচার পালনে বসতে বলল সে আমাকে। প্রদীপ জেলে জলজাত করে, খালা ভরে নানা রকমের খাবার বিল খেতে। মুখ গুঁজে এক-এক করে সব খেয়ে ফেললাম। সখার মুখে হাসির হাসি। ঘরের ভিতর গিয়ে সে আমাকে প্রদীপ পিঠে পুঁজি এসে বসল আমার সামনে।

বাক্য দিয়ে বললাম—আর খেতে পারব না। তুমি উপোস করে আর সারাদিন। কিসের মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—সে হবে এখন, আমার কাজ এখনও বাকী।

ঘরের ভিতর উঠে গিয়ে আলমারীর কাছে একখানা সূতার নতুন চাদর এনে আমার গায়ে জড়িয়ে কলস—কৌরুজরুর কাছ থেকে কিসেরই আমাকে, তোমার জন্মদিনে উপহার দেব বলে। তোমার পছন্দ হয়েছে?

—খুব পছন্দ, শীতের সময় গায়ে দিয়ে স্কুলে যাব রোজ।

গারে দিও লকসীটি। পোশাক জুটাকে তোমার আজকাল মোটেই খোলা

নেই। এক জামা-কাপড়ের মত পড়ি, জামা কাপড়ের মত।

—কি হবে আমার জামাকাপড়? তুমি? বস অন্য মাক করব সে ত আমারই মত। কিসের মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে। আমার কথা মনে রাখবে।

—বাসে। বাইরের লোকের কাছে যদি তোমার কোন সমস্যা নেই। তোমার সমস্যা পোশাক মেনে তারা কি জানে কত?

—জানই বা, কি যার-আমের কাছে। নিজের ভেতর নিজেই মনে হয়ে আসে। ঠাকুরের মত গান শোনান—আমের কাছে আপনি থেকে মন, সেও না কো মন পুঁজি করে।

—তুমি আজকাল ভারী দুঃস্থ হয়েছ। গতই তোমার সাহিত্য চর্চা বাড়ছে, তুমিই তুমি উপাসনা হয়ে বাছ। শেখটার এলিফ না আমাকেই জুলে হল।

সুখের কথা মনে ছেলে বললাম—শিক্ষণে বাব কিম্বা কি শিক্ষণে আসিত খাঙতে পারে? তুমি আমার শীতের উপস। তোমার জামাকাপড় আমি সাহিত্য চর্চা করি।

—নাথ, তোমার ওসব জামাকাপড় কথা। তুমি আজকাল এত বেশী ভাবছ হাছ যে আমার জর করে মাঝে মাঝে। হরত তুমি মন ছেড়ে দেবে একদিন।

—কি সেথো তুমি তা বুঝলে?

—তোমার চালচলন দেখে বেশ বোঝা যায়, সংসারের টান তোমার কমে এসেছে। নিজের শরীর উপর আস্থা তোমার অটুট।

—অন্যসব থেকে কতকটা করে বাতাসকে আমি সংসারধর্ম ভাবি বলে হরত, তোমার তা মনে হয়। আমার সব কিছুর উপরে তুমি।

—তা বাকি। তা কেনেই ত আমার মত ভাবনা। তুমি কখন কি করে বল। তোমার মত স্কুল মানবকে জুল বোঝা সহজ।

—তা বুঝুক, সংসারের উপর আমার খটখটা টান আছে, তার অধিক নেই ঢাকরীর উপর। মানবকে মানবিকতার শিক্ষা কি দিও পেরেছি কল? সে ভেবেই কলম ধরেছি মানবের কথা সবার কাছে বলতে।

—সাহিত্যের সেবা সহজ নয়। কলসার, কলসার, বিরুদ্ধ-সমালোচনা লেখকের ভাগে লেখাজোখা। তাকে এভাবে বাকর অন্য বরাতের জোর বরকার।

শ্রদ্ধা একদিনের চাকির আসো জড়িয়ে পড়েছে বাগানের গাছপারায়। চাকির দিকে আশ্রয় বাড়িয়ে সখা বলল—কল একটা, ঘুরে আসি বাগানে। সারাদিন খুব খালি লেগেছে তোমাকে কাছ নে পেরে।

সুখাকে সঙ্গে করে পারচার করতে লাগলাম বাগানে। কোন গাছে কেনন বল হয়, কখন কখন কোটে সে ঘুরে ঘুরে বলছিল, আমাকে। বাগানের গাছপালা সব বেন তার চোখাখানা—একান্ত পরিচিতের মত। বাকীর লোকেরা কে কবে কোন চাকি পুঁজিছিল তাও তার কণ্ঠে। সখার সাহিত্যপিলার খুঁটিমাটি খবর জাখিদি কোন দিন। তাই আমের হাছিনাম তর পিউজ পেরে।

একটা বোলান চাপার গাছে খেলার  
কৌশল কল কটে থাকতে দেখে, চৌধুরী  
হিলাস গাছের দিকে। বড়ের গল্পে খেলার  
মারা হয়ে সুধাকে কাছে টানতে গিয়ে  
দেখলাম সে নেই সেখানে। চৌধুরী পালকে  
কৌশল উঠাও হয়ে গেল সে? ভাবলাম  
কুকুমোহনর লুকোচুরি খেলায় সে আমার  
সঙ্গে। গাছতলার ঘরে ঘরে দেখলাম  
সুধা নেই। বাগানে কোথাও দেখলাম না  
তোকে। জলজন্তু মাদুবাটা কৌশল উঠে  
গেল ভেতরে ডাকলাম—সুধা, সুধা।

দীঘির জলে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার  
ডাক ভেসে গেল মাঠের বকে। আমার পা  
টল উঠল, পারের নীচের মাটি কেঁপে  
উঠল, ঘর দালান নড়তে লাগল, গাছপালা  
উগড়ে পড়ল, তার পেয়ে চীৎকার করে  
ডাকলাম—সুধা, কুকুমোহন হচ্ছে, কৌশল  
তুমি?

সুধার জবাব পেলাম না। চৌধুরী  
সামনে ঘরবাড়ী, ঠাকুরমন্দির, বাগান-বাগিচা  
ভেগে চরমার হয়ে গেল। কাউকে খুঁজে  
পেলাম না। ভগ্নশত্ৰুপের উপর বসে কাদতে  
গিয়েও কাদতে পারলাম না। আমার গলা  
থেকে স্বর ফুটে বেরুল না। সুধার শেষ  
কথা মনে হল—সাহিত্যিকের জীবন বেদনার  
ভরা অনাদর, অবহেলা তার সঙ্গের সাথী।  
খোলা জানালা দিয়ে এক ফলক রোল  
চোখে পড়তে ধড়কড় করে উঠে বসলাম।  
বিমানে ভরে গেল আমার মন। স্বপ্নের কথা  
মনে করে এক ঠাই চুপ করে বসে রইলাম।  
বুকতে পারলাম, কৌশল কি ভাবে সুধাকে  
হারিয়ে এসেছি আমি।

মনে করে, খাওয়া দাওয়া সেয়ে শুল  
ইস্পেকসনে বাওয়ার জন্য ঠেরী হলাম।  
শুলের সেক্রেটারী আমাকে অভ্যর্থনা  
জানিয়ে নিয়ে যেতে এলেন ইস্পেকসন  
বাংলোতে। বাংলা থেকে শুলের বুর  
দশ মিনিটের পথ। নদীর পাড় ধরে শুলে  
বাওয়ার রাস্তা। তার সঙ্গে হেঁটে যেতে  
যেতে রাস্তার ধারে চোখে পড়ল মজাদার  
ভাঁট লাল পদ্মফুল, পোড়ো বাগান,  
প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ।

দীঘির পাশ দিয়ে বাওয়ার সময় রাস্তার  
মধ্য স্বপ্ন আমার মনে উর্কি দিয়ে গেল।  
জোর করে মন থেকে স্বপ্নে দেখা ঘটনাকে  
দূরে সরিয়ে এগিয়ে চললাম শুলের দিকে।  
শুলের গেটে ঢুকতে গিয়ে আমার মনে হল  
এ জায়গা যেন আমার কত চেনা জানা।  
বিস্মৃত মরুদেশের বকে শুলের বাড়ী,  
ছাত্রদের ছেহেটল, খেলায় মাঠ, সুইমিং  
পুল, সবকিছু নতুন করে গড়া।

অফিস ঘরে বসে সেক্রেটারীর সঙ্গে  
শুলের প্রতিষ্ঠার কথা হাঁহিল। কথার  
কথায় তিনি জানালেন সবার বছর আগে  
কুকুমোহনর গ্রামের দানশীল জমিদার  
কুকুমোহন চৌধুরী এ শুলের প্রতিষ্ঠাতা।  
অধ্যক্ষের সব প্রথম শুল এটি। তার জেলে  
সাহিত্যিক পরিমল চৌধুরীর প্রাণপাত  
চেষ্টার ফলে শুলের সুনাম হেরিয়ে এক-  
কালে। কত ছাত্র বড়ি পেয়েছে এ শুল  
থেকে পরিমলবাবু, ছিলেন শুলের ছেড-  
মাস্টার।

উনিশ শ' চৌধুরীর জন্মকালে এ-  
গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ী ভেগেছে বার।  
শুলবাড়ীরও অস্তিত্ব লোপ পায়। চৌধুরী-  
বাড়ির দালান ভেগে পড়ে, পরিমলবাবু  
সপরিবারে মারা বান। তারপর শুলের  
দুর্দিন নেমে আসে। গিয়ে ভুলে চলেছে  
শুলে শুল বস্ত্রের দুখোমরাধ এসে  
থাকার। আশপাশের গিরের লোকের  
দাকিগো, সরকারী সাহায্যে এর বাড়-  
কাড়ন্ত। নতুন করে মাটিচাপারপাল শুল  
গড়ে উঠেছে—কুকুমোহন বাগী বিভান।

চৌধুরীবাড়ীর ইতিবৃত্ত খুঁটিয়ে  
খুঁটিয়ে জানলাম সেক্রেটারীবাবুর কাছ  
থেকে। পরিমলবাবু আর তার স্ত্রী সুধার  
নামে শুলের একটা নতুন ব্লক তৈরী  
হচ্ছে তিনি জানালেন আমাকে। অফিসের  
নিধিপত্র দেখে, শুলের ব্লকগুলি ঘরে ঘরে  
দেখতে লাগলাম। তিনতলার দক্ষিণ দিকের  
ব্লকে মার্বেল পাথরের একটি ফলকের  
উপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল—  
‘সাহিত্যিক পরিমল চৌধুরী, তার সহ-  
ধর্মপত্নী সুধারানী চৌধুরীর স্মৃতি-  
ব্রহ্মচর্য’।

মার্বেল ফলকে আমার চোখ আটকে  
রইল। রাতের দেখা সুধা জীবন্ত হয়ে যেন  
আমাকে বলতে চাইল—‘এই ত আমি,  
কৌশল তুমি খুঁজছিলে আমাকে?’

বুক গম্বরে উঠল। আগামীকাল ক্লাস  
পরিদর্শন করার আশ্বাস দিয়ে নেমে  
এলাম অফিস রুমে। হেডমাস্টারকে জিজ্ঞেস  
করলাম—পরিমলবাবুর লেখা কোন বই  
পাইবেরীতে আছে কিনা? বেছে বেছে  
দু’খানি বই তিনি দিলেন আমাকে। নতুন  
সংস্করণ—শিক্ষার পুঁথিতে সম্বন্ধে দেখা।  
বই দু’খানি হাতে নিয়ে ফিরে এলাম  
বাংলোতে। ফেরার পথে পোড়ো ভিটে, মজা  
দীঘি দেখিয়ে সেক্রেটারী বাবু জানালেন  
—এখানেই ছিল ‘পরিমলবাবুদের ভগ্নাসন।

জিজ্ঞেস করলাম—তাদের বংশের কেউ  
বাকি থাকে না এখানে?

—তারা কেউ বেঁচে নেই। দু’সপ্তকের  
এক ভাগনে থাকেন কলকাতার। দেশে তিনি  
জানেন না বড় একটা। জমি-জমা সব বিক্রী  
করে দিয়েছেন। পোড়ো ভিটে, মজা দীঘি  
চৌধুরী বংশের ইতিহাস বকে ধরে আজও  
দাঁড়িয়ে আছে।

দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখ-  
ছিলাম পদ্মের শোভা, শুনছিলাম ভ্রমরের  
গুঞ্জন। আমাকে এক দৃষ্টিতে কলের  
দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেক্রেটারীবাবু  
খালিকে বললেন—সাহেবের জন্য কিছু ফুল  
তুলে বাংলাতে নিয়ে এস।

আনমনা হয়ে পথ চলতে চলতে ভাবতে  
লাগলাম সুধার কথা। বাংলাতে ফিরে  
অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। বসার  
ঘরে ফুলদানিতে সাজানো পদ্মগুলি যেন  
আমার দিকে চোরে হাসছে। বিকেলে চা  
বাওয়ার পর সেক্রেটারী বিদায় নিলে,  
বাংলোর চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর  
নাম করে নদীর পাড় ধরে চলতে লাগলাম  
চৌধুরী বাড়ীর পোড়ো ভিটে লক্ষ্য করে।

সন্ধ্যার তখনও বাকী। চৌধুরীদের

বাগানে ঘরে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে  
চৌকিদার কথা দিয়ে বলল—ওখানে সাপ  
খোপের বাসা হুঁজুর। দিনেও গোলে  
সেকে না ও বাগানে। সাহস দিয়ে তাকে  
বললাম—তোমার হাতে বাগের লাঠি  
আছে, তর কি? জপলে লাঠির বা ঘের  
সাপ ভাড়িয়ে জামরা চুকি চল।

জলো আগাছার ভরা সারাটা বাগান।  
বড় বড় গাছপাশের জলপালা ছাড়া প্রাচীন  
দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে বসে চোখে পড়ল একটা  
প্রাচীন বোলান চাপার গাছ। পা-পা করে  
এগোতে লাগলাম গাছটার দিকে। তার  
গোড়ার দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম উঁচু জলে  
দুটো চাপাকল কটে আছে। চৌকিদারকে  
বললাম—ভাল সমেত ফুল দুটো পেয়ে  
আনতে পারবে?

—কেন পারব না হুঁজুর! গাছে চড়ে  
ফুল এনে আমার হাতে দিল সে। মনে  
পড়ল এই ফলেরই ছাপ আমি পেয়েছিলাম  
গত রাতে। মনে হল, সুধা হারিয়ে গেছে  
এই বোলান চাপার তলা থেকে। আবার  
নেমে আসছিলাম। রাত জপলের ভেতর  
পাকা নিরাপদ নর জানিয়ে চৌকিদার বার  
বার আমাকে হুঁসিয়ার করে দিল।  
অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ফিরে আসতে হল  
চৌধুরী বাড়ীর পোড়ো ভিটে ছেড়ে।

পরিমল বাবুর বই দু’খানি রাত জেগে  
পড়লাম। আমারই মনের কথা যেন লিখে  
গেছেন তিনি। শেষ রাতে তন্দ্রার শেষ  
চড়ে আসতে আলো নিভিয়ে শুলে পড়-  
লাম—সঙ্গে সঙ্গে হুম নেমে এল আমার  
দু’চোখ জুড়ে।

ডুরে লাড়ি পরা সুধা হাসতে হাসি  
বলল—কেনন মজা করেছিলাম বলত কাল  
রাত? আমি তোমার পেছনেই ছিলাম।  
তুমি দেখতে পাওনি আমাকে। তোমার  
শুলের মজার ব্যাপারের চরে ভাল মজা  
হয়নি? মনে পড়ল, সত্যি ত সামনে খুঁজে-  
ছিলাম সুধাকে, পেছন ফিরে তাকানি  
একবারও।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুধা  
বলল—কি ভাবছ এত?

—ভাবছি, গতকাল যে দেখলাম ছ-  
কপ্পন, ঘর দালান ভেগে পড়ছে, সে সব  
কি মিথ্যা?

—ও তোমার মনের ভ্রম। তুমি দেশের  
আল্লা গড়ার কথা, মোখুন শিফা পুঁথির  
কথা অনবরত ভাব কিনা, তাই বুদ্ধি ও  
বকম দেখছ। এই দেখ আমাদের দালান,  
বাগান বাগিচা সব ঠিক আছে।

চেরে দেখলাম, সুধার কথাই ঠিক, সব  
আগের মতই আছে। তাকে বললাম, হুঁজুর  
ঘরে ক্রান্তি লাগছে, দীঘির ঘাটে বাস  
চল। আমি এগিয়ে চললাম—সুধা আমার  
পিছ পিছ আসতে লাগল। আমাকে  
ঘরে ক্রান্তি লাগছে, দীঘির ঘাটে বাস  
এখনো, তোমার জন্য এক প্লাস দখ গরম  
করে আনি।

—অস্বস্তি লাগছিল আমার, ছেড়ে দিতে  
ইচ্ছে করছে না আর।



—না গো না, দেরি করব না মোটেও।  
তুমি দেরি করে কেনার জন্য আমার যে  
কণ্ট হাঁজল, সে কথা বলিবে সেবার জন্য  
তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম আমি।

সুধা তার কথা স্নেহেছিল—এক প্লাস  
পরম মৃদু হাতে নিয়ে কিসে এসে আমার  
পাশে বসে গলা জড়িয়ে আমার করে বলল—  
সবটাই খেয়ে ফেলতে হবে।

—তা হবে না, কিসে কিসে চুপচুপ দিয়ে  
হুকমেন ও প্লাসের মৃদু খাব।

—বেশ, তাই হবে, তবে তুমি প্রথমে  
চুপচুপ নিয়ে প্রসাদ করে নাও, আমি গড়ে  
খাব।

জোছনা ঢলে পড়েছিল, পশ্চিম  
আকাশের গার। রাত বেড়ে চলেছে জানিয়ে  
সুধা বলল—টুটু, গোপাকে খেতে দিয়ে  
আসি। বসে বসে গল্প করব তোমার  
সঙ্গে।

—বেশ তাই যাও, শীঘ্র এস, দেরি করো না।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে আর বলতে।

সুধা বাওয়ার সময় আমাকে আমার  
করে ঘেঁষে দৃ' হাতে গলা জড়িয়ে ধরে।  
তার পিঠে মাথার হাত বুলিয়ে তাকেও  
আদর জানালাম আমি। সুধা চলে গেল।

ঘাটে বসে বসে ফরফরে হাওয়ার  
কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেগে  
দেখি জোর হয়ে এসেছে। পূর্ব আকাশে  
অরুণোদয়ের গালিমা, গাছে গাছে পাখীর  
চাকলা। চোখ মর্মেই আবল্যাম সারা রাত  
কি ঘাটেই ঘুমিয়েছিলাম আমি? সুধা  
কিসে আসে নি আমার কাছে?

জেগে দেখি বাংলোর ঘরে ঘাটে শূরে  
আছি। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মৃদু ধরে  
একই বেরিয়ে পড়লাম চৌধুরীবাবুদের  
ডিঙে লম্বা করে। সুধা আমাকে টানছে  
সেখানে। বন্যামাড় ভেগে ঘাটে এসে  
বসলাম বেথানটিতে বসে সুধা আমাকে  
আদর জানিয়েছিল ভাল বাতে, সুধার  
কথা ভাবতে ভাবতে আমার বুক ভরে এল  
জ্ঞান বোধন। ভাবলাম ভালবাসার কি  
শেষ নেই। জন্ম হতে জন্মান্তরে সে পিছ,  
পিছ ফিরে?

চৌধুরীবাড়ী কি আমারই গড়জন্মের  
খেলাঘর? সুধা কি আমারই স্নেহের  
বন্দনে বাঁধা প্রিয়তমা? ভাপা ঘাটে বসে

ভালতে লাগলাম একা একা। প্রত্যবে সন্ধ্যা  
টার বাবুর নদীতীরে বেড়ানোর অভ্যাস।  
আমাকে দেখতে পেলে হস্ত-বস্ত হয়ে  
হুটে এসে বললেন—এখানে একা একা বসে  
কেন স্যার?

ইচ্ছে করল মৃদু ফুটে বলি—পরিমল  
চৌধুরী, প্রসন্ন রায়চৌধুরীর নতুন পরি-  
চরে খুঁজতে বেরিয়েছি তার জন্মান্তরের  
প্রিয়াকে দেখতে এসেছি তার, আবাল্যের  
খেলাঘর জন্মভিটকে।

মনের কথা ঢেপে গিয়ে বললাম—ভাব-  
ছিলাম, চৌধুরীবাবুরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।  
স্কুলের উন্নতিকল্পে পরিমলবাবুর অবদান  
কণ্ঠে। তাদের পোড়ো ডিঙে সরকারের  
পুঁক থেকে রিকুইজিসন করে সুধাসেবীর  
নামে একটি মেয়েদের স্কুল গড়ে তুললে  
তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের  
মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধে নেই। সে কথা  
জানিয়ে আমি সরকারের তরফ থেকে সকল  
প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা  
করব।

মনের আনন্দে সেক্রেটারীবাবু আমাকে  
ধন্যবাদ জানিয়ে সোঁদই ম্যানেজিং কমিটির  
করুরী মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করলেন।  
রিজোলিউশনের কাঁপ আমার সঙ্গে  
দিলেন। বিকেলের ট্রেনে উঠতে স্টেশনে  
ছাত্র, শিক্ষক, বর্ধিক, লোকেরা এলেন,  
স্বা-শিক্ষা প্রসারের জন্য আমার প্রচেষ্টাকে  
শতমুখে অভিনন্দিত করলেন তারা। মনে  
মনে বললাম, সুধার স্মৃতিকে অমর করে  
রাখার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা। তাকে  
সাক্ষ্যমাণিত করে তোলাই আমার  
জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে আজ থেকে।

ট্রেন ছেড়ে দিল—হু হু করে বাতাস  
বয়ে গেল, ট্রেনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। তার  
ভেতর আমি শূন্যতে পেলাম সুধার ডাক  
—ফিরতে দেবী কোর না কিপ্তু।

সদরে ফিরে প্রথমেই সুধারানী গার্লস  
স্কুলের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ল্যান্ড  
একুইজিশন করিয়ে, বিল্ডিং গ্রান্ট সাংগঠন  
করে তিন মাসের ভেতর সকল ব্যবস্থা  
সেরে ফিরে এলাম গড়কমলপুরে। বন-  
জগল সাফ করে, জ্ঞান তৈরী করে  
বিল্ডিংয়ের কাজ সুরু হয়ে গেল। আমার  
স্বপ্নে দেখা গাছপালা, ঘাট, নদী সব  
নতুন করে তৈরী হল। বছর না বছরতে  
সুধারানী গার্লস স্কুলের উন্মোচনী সভার  
সভাপতিত্ব করার ডাক পড়ল আমার।

বহুতা দিতে উঠে বারবার আমার কণ্ঠ  
রোধ হয়ে এল। শূন্য একটা কথাই বললাম  
—যে ঘিঁহরসী নারীর প্রেরণা পরিমল-  
বাবুর শিড়ির উৎস ছিল এককালে, তার  
বন্দোস্ত অনুসরণ করে আমার দেশের মা-  
বোনরা একদিন তাদের স্বামী-সন্তানকে  
জন্মপ্রাণিত করবে দেশের সেবার, এই  
আমার কামনা।

আমার অগ্রপ্ত চেষ্টিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠা  
সম্ভব হয়েছে জানিয়ে গণমাধ্যম ব্যাপ্তিরা  
আনন্দ ভরসী প্রকাশ্য করলেন। উত্তরে  
ভাদ্র কন্যাবান জানিয়ে বললাম, পরিমল-  
বাবু ও তাঁর স্ত্রীর অবদান স্মরণ করেই  
আমের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জানাতে

আমি সাহায্য করেছি সরকারের জীর্জীবি  
হিসেবে। সাহিত্যিকের বোধ্য রচনা দিতে  
এ লিপ্যন্তরিতান তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ  
করা হল—যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ সাংগিক,  
জাতির ভবিষ্যৎ কন্যাররা গড়ে উঠবে  
কালে কালে।

হু মাসের ভেতর আমার বদলীর  
আবেশ এল। গড়কমলপুর স্কুলের সঙ্গে  
সম্পর্ক কাটিয়ে বেতে হয়ে ভেবে ব্যাধা  
অনুভব করলাম। সুধাকে দেওয়া কথা  
হয়ত আর রাখতে পারব না। আমার  
বদলীর পথবা শূন্য হেডমাষ্টার, সেক্রে-  
টারী সবাই শহরে হুটে এলেন। মেয়েদের  
আয়োজিত বিদায় সম্মেলনের বোধ্য দিতে  
আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে।

শেষবারের মত গড়কমলপুরে এলাম  
সুধার কাছ থেকে বিদায় নিতে। ছাত্র,  
শিক্ষক, গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা  
ছাপিয়ে আমার কানে ভাসতে লাগল সুধার  
কথা—আমার ভয় হয়, একদিন হরত তুমি  
আমাকেও ফুলে বাবে।

মানপত্রের উত্তর দিতে উঠে বললাম—  
স্বগত পরিমল চৌধুরী ও সুধা সেবীর  
মহান উদ্দেশ্য যেন দেশবাসী চিরদিন মনে  
রাখেন, তাতেই আমার কাজের স্বীকৃতি  
দেওয়া হবে।

সুধারানী গার্লস স্কুলের নতুন  
বিল্ডিং বাগান বাগিচা সজ্জার করা দীঘি,  
দীঘির ঘাট, সব ঘরে ঘরে দেখতে  
লাগলাম। আমার স্বপ্নে দেখা দালান বাড়ী,  
বাগান, বাগিচা দীঘির ঘাটের সঙ্গে তাদের  
অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলাম। আমার মনেব  
ভাব বুঝে সেক্রেটারী বললেন চৌধুরী-  
বাবুদের গড়ের অনুকরণে আমরা তৈরী  
করেছি সবকিছু।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের  
শুভেচ্ছা নিয়ে বিদায় নিলাম। সঙ্গে নিয়ে  
এগলাম পরিমলবাবুর লেখা বই দুখানি।  
কথা দিবে এলাম নুতন সংস্করণ রতমান-  
কালের উপযোগী করে লিখে পাঠাব। বই-  
দুখানির শেষ সংরক্ষিত থাকবে স্কুলের—  
লেখকের নাম থাকবে পরিমল চৌধুরীর,  
পরিবর্ধক হিসেবে থাকবে আমার নাম।

মাঠ, ঘাট, পথ, প্রান্তর পার হয়ে ট্রেন  
হুটে চলল শহরের পানে। আমার চোখে  
ভাসতে লাগল স্বপ্নে দেখা সুধার হাসি  
হাসি মৃদু, তার কথা—ফিরতে দেবী করো  
না। তাকে বলে এলাম—তোমাকে ছেড়ে  
চলার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমার  
শিড়ির উৎস। যেখানেই থাকি না কেন,  
তোমার শত স্মৃতি নিয়ে ঘেরা গড়কমল-  
পুরে আমি ফিরে আসবোই।

বাতাসের শব্দ শব্দ শব্দ, ইঞ্জিনের  
গর্জন—দূরে মিলে আমার মনে হল, সুধা  
যেন আমাকে বলতে চাইছে—কথা নাও, কিসে  
আসবে তুমি?

বললাম, সুধা আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ  
করতে চাইছে। তাকে বললাম, কথা দিলে,  
নিশ্চয় ফিরে আসবো তোমার কাছে।  
পরিমল চৌধুরী আর প্রসন্ন রায়-  
চৌধুরী যে একই আমার ভিন্ন প্রকাশ।

## হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা  
ফলা, একজিমা সোর, ইলিস, দ্রুতি  
কতানি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাৎ অথবা  
পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা স্পীকিত  
রাজপ্রাণ শর্মা কবিবাক, ১৯৫১ সাল থেকে  
‘লন ৭৬ টি হাওড়া। শাখা : ০৬,  
মহাশা গম্বী রোড কলিকাতা-৯।  
ফোন : ৬৭-২০৩৯।



# অজানা

## সৌন্দর্য সাধনা



আর সবারই মতো সৌন্দর্য সাধনার বস্তু। পরীক্ষার পড়ার জন্য, কোন পড়তে হয়, তেমনই সূক্ষ্ম হবার জন্যই ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা প্রয়োজন। আমরা সবাই যে জন্মসূত্রেই সূক্ষ্ম এমন নয়। কেউ কেউ রূপের ভাজি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ কেউ চন্ডমসই আর বাসবায়িক সব সাধনাটা। যে রকমই হোক না কেন সকলেরই প্রয়োজন দেহচর্চা। অর্থাৎ সৌন্দর্য সাধনা—যার গোড়ার কথা হলো স্বক পরিচর্যা।

শিশুর স্বক নয়নলোভন। সূক্ষ্ম টানটান নিটোল। কিন্তু বয়স বাড়লে সেই স্বক হয়ে যায় শিথিল। তখন তা অজ্ঞানের আকর্ষণ করা তো দূরের কথা বয়স বিকর্ষণ করে। স্বকের উপর দেহ-সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে। লোকের মনে রেখে স্বকের পরিচর্যার আমাদের একান্ত



মনোযোগী হওয়া দরকার। স্বকের স্বেচ্ছা এবং সৌন্দর্য বন্ধার রক্তের জ্বলন্ত শব্দই গুরুত্বপূর্ণ। স্বকের শূন্যতায় স্বকের পরিপোষণ হয়। উপযুক্ত মাত্রায় এবং বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনে দেহবর্ণ উজ্জ্বল হয়। এজন্য ব্যায়াম করা দরকার। একবার অনেক মেরে ঘাবড়ে যায়। তারি এই ভেবে অধিকতর হন যে, ব্যায়াম কবলে তাঁদের শরীর পরিশুদ্ধ পেশীমণ্ডিত হবে এবং রক্তসঞ্চালন কম-নীরতা হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই আশংকা একেবারেই অমূলক। ব্যায়ামে পুরুষের মতো মেয়েদের পেশী পরিষ্কৃষ্ট হবে না।

বরং একটি বিরাট উপকার হবে এবং তা হলো স্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এই গুণ হারালে স্বক ভাজি পড়ে আর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তবে একটা ভাব ব্যায়াম এজন্য দরকার হয় না। নিয়-

মিত্র বোগাসন করলেই ফকের স্থিতি-  
স্থাপকতা বজায় রাখা সম্ভব। আর রত্ন  
সত্যসত্যি চোটেই। ব্যারামের সঙ্গে সঙ্গে  
নিম্নলিখিত ব্যারামের প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত ফক ভোগের ব্যাপার। সুন্দরী  
রমণীও ফকের রমণীরা হারিয়ে পাবেন  
যদি না গোড়া থেকে এ সম্বন্ধে সতর্ক হন।  
সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ফক সংক্রান্ত নানা  
জটিলতার উদ্ভব হয় কৈশোরাবস্থা থেকে।  
আমাদের ফকের নিচে অনেক ছোট ছোট  
গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে তেল  
উৎপন্ন হয়। ফকের স্বাভাবিকতা বজায়  
রাখার জন্য। কোন কারণবশতঃ এই গ্রন্থি-  
গুটি অনেক সময় বিগড়ে যায়। এ থেকে  
এতো বেশি পরিমাণে তেল উৎপন্ন হয়  
যে ফকের পাক তা খুবই প্রয়োজনীয়।  
এর ফলে ফকের তেল নির্গমনের পথও  
বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই  
ফকের উপর তার নানারকম প্রভাব পড়ে।  
এর আর ফলশ্রুতির উপপাত শূন্য হয়।  
চেহারাও খারাপ হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে  
ডাক্তারদের অভিমত হলো যে, রণ এবং  
ফলশ্রুতির অস্ত্রমণ নেহাতই সাময়িক এবং  
তা অপূর্ণা থেকেই সেরে যায়। কিন্তু  
ডাক্তারের কথা শুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে  
থাকা ঠিক হবে না। ফক সংক্রান্ত কোনকিছুর  
উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং বধ্যবোগ্য  
ব্যবস্থা অবলম্বনে বিপদমাত্র স্বেচ্ছা করা  
চলবে না।

ফকের বোগে খাওয়া-দাওয়ায় দিকে  
বিশেষ নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এসময়  
খাওয়া-দাওয়া বধ্যসম্ভব সামান্যই হবে।  
খাদ্যবস্তুতে চিনি এবং কার্বোহাইড্রেট-এর  
মাত্রা খুব কম হয়। শাকসবজি এবং ফল-  
শ্রুতির উপর মূলতঃ নির্ভর করতে হবে।  
যদি খুব তেল চকচকে ফকে রণ-  
ফলশ্রুতি হয় তবে একটি বধ্যবোগ্য চিকিৎসাও  
চলতে পারে। প্রথমে সাবান দিয়ে ভাল করে  
মুখ ধুয়ে নিতে হবে। তারপর এক বাটি  
গরম জলে পাকিস্তান লেকচার সামান্য চা  
সেঁধে ছেঁড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পাবে  
সেই জলে মূখ ধুয়ে ফেললে তেল চকচকে  
ভাবও কমবে আর রণ-ফলশ্রুতিও সাববে।  
তবে স্নায়ুজের মতো একদিনেই এতে ফল  
পাওয়া যাবে এমন নয়—কয়েক দিন  
লাগবে।

আমাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে  
ফকের সম্পর্ক খুব নিবিড়। মনের অবস্থা  
যদি ভাল না থাকে সঙ্গে সঙ্গে দেহবর্ণে  
তার প্রভাব পড়বে। এমনও দেখা যায় যে  
কেউ কেউ মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখেন।  
কাজকে কোনকিছুর ব্যস্ততায় দেন না। এমনি  
লোক দেখানো হাসিমুখ থাকেন। কিন্তু  
দেহবর্ণে তার প্রতিফলন ঘটে। ফকের কাছে  
কিন্তু কিছু লুকানো যায় না। এ মনে মনে  
দুঃখ। মানসিক অবস্থার ছায়াপাত এখানে  
ঘটবেই। ফক অত্যন্ত সংবেদনশীল।  
স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে তা ফকে ফুটে  
ওঠে। রক্ত ফিকে হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন  
দানব সংবাদ আসে আর মনে উদ্ভাসের

জোয়ার খেলে তার তবে ফকে সঙ্গে সঙ্গে  
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফকে কোন বিলম্ব  
থেকে।

ফক সুস্থ রাখতে হলে মনকে স্বাভা-  
বিক রাখতে হবে। সব সময় হাসিমুখ।  
তাই সারাদিনের কার্যক্রমকে এমনভাবে  
সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে যে, কোন কিছ-  
তেই মন কোন বিগড়ে না বসে। সারা দিন  
শান্ত থাকা যায়। প্রচুর জলে স্নান এজন্য  
খুব দরকার এবং অনেকক্ষণ ধরে। চান  
করতে করতে গুনগুন করে দু-এক কলি  
গান ভাললে মন আরো প্রসন্ন থাকে। চান  
করতে গিয়ে গান গাওয়া নিয়ে আমরা ঠাট্টা  
করি। মস্তুরা করে বলি, বাথরুম সঙ।  
কিন্তু স্বাস্থ্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ খুবই  
নিবিড়। আর সেই সঙ্গে যে ব্যারামের  
কথা প্রথমেই বলছি সেদিকেও নজর দিতে  
হবে। বোগাসনে মন প্রশান্ত থাকে।

অপূর্ণ ফকের আর একটি মারাত্মক  
ব্যাপি। আমাদের অনেকেই ফকের উপ-  
যোগী খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না।  
তাই শরীর ঠিক করতে গিয়ে আরো বেশিক  
হয়ে যায়। ইদানিং, একটা খেঁক দেখা  
দিয়েছে শরীর স্নায়ু রাখার ব্যাপার নিয়ে।  
এ সম্বন্ধেই সকলেই কমবেশি কৌতূহলী।  
শরীরের অবস্থা স্নেহ বাদ দিতে হবে। এতো  
অতি উত্তম প্রস্তাব। তাই সবাই ডায়েট  
করতে শুরু কবেছেন। নিয়ম কবে খাওয়া-  
দাওয়া করেন। তার লইয়ে কিছু নয়। চর্বি  
তো একদম নয়। কিন্তু আমাদের শরীরের  
পক্ষে চর্বিও প্রয়োজনীয়তা আছে।  
চর্বির অভাবে ফক অপূর্ণ হই। আবার  
স্নায়ুপোষক ভিটামিন বি-১র অভাবে ফকের  
স্বাস্থ্য গুরুতর অবনতি ঘটে। দেহফক  
বিবর্ণ হয় এবং ফাটতে শুরু করে। এতো  
খাদ্যবস্তুজনিত অপূর্ণতার কথা। আবার  
বাইরে থেকেও ফকের পরিচর্যা প্রয়োজন।  
নাহলে ফক শুষ্ক হবে এবং নানাবিধ  
প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এক্ষেত্রে ভাল ক্রীম  
ব্যবহার করলে অনেক উপকার পাওয়া  
যায়। তবে ক্রীম ব্যবহার করতে হবে নরম  
আর গরম হাতে। এজন্য কিছুক্ষণ হাত  
গরম জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর  
ক্রীম ব্যবহারে ফক গরম হবে। এলাজির  
ভাব থাকলে প্রসাধন ব্যবহারে সতর্কতা  
অবলম্বন করতে হবে।

সৌন্দর্য-সাধনার শুরু ফকের পরিচর্যা  
কবে নিবৃত্ত হলেই চলবে না। সমস্ত  
শরীরই হলো সৌন্দর্যের আধার। তাই  
সর্বদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে ফকের  
পরিচর্যা চুলের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নারীর  
কেশবাজি তার সৌন্দর্যের একটি প্রধান  
অঙ্গ। এক সময়ে সবাই পছন্দ করতেন  
আজানুল্লাহ কেশ। এখন আর সবাই  
একমত নয়। অনেকে সুন্দর ববড় হেলার  
পছন্দ করেন। আবার কেউ বা কাঁধ  
পরন্ত। ববড় অথবা কাঁধ পরন্ত  
গাঁবা চুল রাখেন তাঁদের খোঁপা  
বাঁধার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে যদি

আজো আজানুল্লাহ কেশের অনুসারী  
খোঁপা তাঁদের কাঁধে এবং পরিচর্যার  
পারিষদ পালন করতে হয়। খোঁপা হবে  
চেহারা অনুসারী। গলা বাঁধের কম লম্বা  
তাঁদের উঁচু খোঁপার সুন্দর দেখাবে। আর  
বাঁধের গলা লম্বা তাঁরা জিলেঢালা বড়  
খোঁপা বাঁধেন কাঁধ পরন্ত নাহিরে। অবশ্য  
খোঁপা বাঁধার মেহনত এখন আর অনেকে  
করেন না। ব্যাকার থেকে তাঁঁরা করা খোঁপা  
কিনে তাঁরা কাজ চালান।

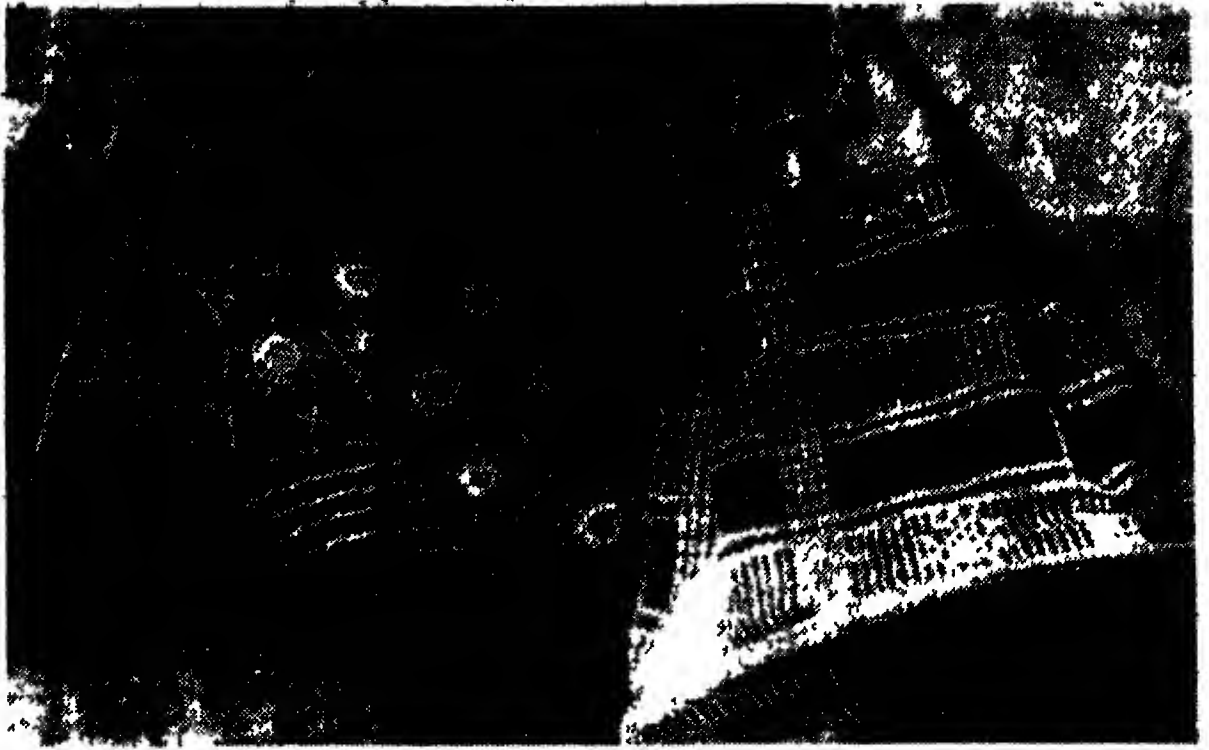
চুলের সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় চোখের  
কথা। মুনগুনরা রমণী কাঁধের বিষয়বস্তু।  
ডবে সজাই তো আর এ মনে ধনী নয়।  
কিন্তু তা বলে আপশোস করে কোন লাভ  
নেই। চোখ হলো ব্যক্তির মুখা অঙ্গ।  
তাই এদিকে সর্বশেষ নজর দিতে হবে।  
চোখের দৃষ্টিকে করে তুলতে হবে  
আকর্ষণীয়। এজন্য আই-ড্রো পেন্সিল আই  
লাইনার আর আই শেডের সাহায্য  
প্রয়োজন। চোখের উপরেব পালকে আই  
শেডের নিম্নে টান দিতে হবে। এব পর  
আই লাইনার প্রয়োগ করতে হবে। আর  
চোখ যদি খুব ছোট হয় তবে চোখের  
নিচেও আই লাইনার ব্যবহার করতে হবে।  
এতে যে শুরু চোখের সৌন্দর্য খুলবে তাই  
নর ব্যক্তির অনেকখানি বাড়বে। এ  
প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার আই  
শেড রাতের নিরস্ত্রাপ মুহূর্তে ব্যবহার  
করাই ভাল।

এমন অনেক আছেন যারা মূখগ্রীব যন্ত্র  
জেন কিন্তু সংলগ্ন গ্রীবাদেশক অবহেলা  
করেন। গ্রীবাব সম্বন্ধে পর্বচর্চ। সৌন্দর্য-  
বোধে উত্তম নিদর্শন। মূখের বড়ো সঙ্গে  
গ্রীবাব বড় অভেদ হওয়া চাই। দুইয় ফক  
প্রসাধন প্রায় একইরকম। সুন্দর গ্রীবা  
সকলের সঙ্গোঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।  
ব্রাউজ অথবা চোলাই বাই হোক না কেন  
গ্রীবা অনুসারী গলাব ডিজাইন হবে। যদি  
গ্রীবা ছোট হয় তবে জামাব গলা হবে বড়।  
আর গ্রীবা লম্বা হলে বধ্য গলা কামিজ  
খুব ভাল মানাবে। এরপর গলায় বুলিবে  
নিন একটি লকট।

কালিদাসের কাব্য অনুসারে পীন-  
পয়োদরা রমণী হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী।  
সুগঠিত বক নারীর সৌন্দর্যের পবন  
সম্পদ। উত্তম বন্ধেব জন্য উপযুক্ত বস্ত্র  
নেওবা প্রয়োজন। কাব্যো কাব্যো বন্ধ  
অপরিপূর্ণ থাকে। এজন্য প্রয়োজনীয়  
ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। বন্ধ  
সুগঠিত রাখার জন্য ব্যারাম আবশ্যক।

এমনিভাবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের  
বন্ধ নিতে হবে। শুরু ভাত বন্ধে  
পারলেই ফেরন রামা জানা হয় না তেমনি  
মূখের বন্ধ নিলেই সৌন্দর্যবোধ স্পষ্ট হয়  
না। ফক থেকে মূখ আর মূখ থেকে পায়ে  
নখ পরন্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তুলতে হবে।  
তবেই সৌন্দর্য-সাধনা হবে সফল।

—প্রবীণা।



## ব্যাগ !

আমার এক বাগ্‌মবী চ.ট তেরা  
একটা ব্যাগ ক'মে ঝুলিয়ে এক ছদ্ম  
করাব প্রয়াসে জনবহুল এক রাস্তা ধরে  
এগোচ্ছিল। মাঝে মাঝেই লক্ষ্য ক'রে  
জনবহুল রাস্তা হতে। সত্যি সত্যি  
স্বপ্নবীণ বাঁশ কোলালো ব্যাগটিও  
আটকে আছে। চড়ে তৈরী ব্যাগ হাচ  
আমাদের এক নতুন ফ্যাশন। অথচ এই  
ফ্যাশনকে নিয়ে বেশ ম.থবোচক আলো  
চনা শুনছিলাম। একটুবা থানিক বিস্ময়ে  
শাকিয়ে মন্তব্য করেছিল বেশ তো  
বাজাব, বেশি দেখে ক'রে লিপটিক  
চিরনেই। নতুন ফ্যাশন এই ব্যাগে।

একটু সনাতনপাখীরা ঠোঁট উল্টে  
বলে ছল, কি হয় হয়েছে কিছু একটা  
নিলেই হল। রাশন শ্যাক ক'রে  
একটু সাজিয়ে নওবা।

এটাই বড় কথা। কারাদার প্রয়াগেই  
তো নতুন নতুন ফ্যাশনের জন্ম। শৃঙ্গ.  
ফ্যাশন কেন! ব্যাগ যে কি—ওপের কথা  
শুনতে শুনতে ব্যাগকে নিয়ে একটু  
ভাবতে ভাল লাগল।

ব্যাগের প্রতি আমাদের একটা অকৃত্রিম  
ভালবাসা আছে। জীবনের প্রতিরোধেই  
ব্যাগের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব  
করি। শরনে স্বপনে এই ব্যাগকে নিয়ে  
আমাদের কত বোমাশ। প্রেমিক ভাব  
প্রেমিকাকে ব্যাগের খলকনানী শুনিয়ে কখন  
মুগ্ধ করতে চায়, কখনো বা সূখে-  
শান্তিতে ঘুম বিধিতে চায়। শূন্য ব্যাগে  
বিভিন্ন কত প্রেমিকাকে না কিরহ বাতনা  
ভেদ করতে হয়।





আজকাল জীবনটা এতবেশী বাস্তবের জুখোবদীর্ঘ এসে দাঁড়িয়েছে যে রাতে শুয়ে অনেকেই ঘড়া ঘড়া মোহরের টুং টুং আওয়াজ শোনার চেষ্টা করে খুঁজে ভর্তি টাকা বা ব্যাগপূর্ণ অর্থ কল্পনা করতে ভালবাসে।

শুধু কি ব্যাগই প্রাক-বিবাহে বিরাট সমস্যার কারণ। বিবাহোত্তর জীবনে সবার অলঙ্কার একে ঘিরে রয়েছে কত সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি তার কতটুকু খবর কে রাখে? কতটা বড় ব্যাগ ভর্তি বাজার এনে গিম্মীর সামনে একটু দরদা করে ঢালতে পাবেন—মুই—এর বড় মড়ো, গলার ইলিশ, টাটকা সবুজ—কোম্‌ গিম্মী না একটু মড়কে

হেসে গদগদ ভাবার কতটা সুসজ্জব প্রশংসা করবেন। বিবাহের সুখনিদ্রা বাদ দিয়ে পাতশব বাড়ীর পদটি মাকে পান চিবোতে চিবোতে কতটা গুণগন করবেন না এমন গিম্মীও কি আছে। অবশ্য এ ব্যাপারে কতটুকু একটু বাস্তববোধ-সম্পন্ন হতে হবে। সস্তাহের মাঝে ভবা ব্যাগ দেখালে চাকুরীজীবী গিম্মীর বড় চক্ষুর সামনে তাকে বোকা বোকা হেসে একটু হুলস্থলিত হয়ে বলতে হবে 'এটা সস্তা, ওটা টাটকা বাকীগুণে কালকের'।

এই ধরনের আবার বেদনা বোকা হয়ে বেড়াতে ইচ্ছা জুগিয়ে দেয়। কোনদিন গিম্মী হয়তো রসালো কোন খাবারের কথা ভাবা দিয়া হাত নেড়ে কতটুকু বুদ্ধি দিয়ে দিলেন। কতটা হয়তো সেদিন কৃষকের ব্যাগ খেঁড় মাঠে গিম্মীর ভরে খাড়া কাত করে বাজারে গেলেন, ফিরে এলেন প্রায় শূন্য ব্যাগেই। বুদ্ধিতেই তো পাবছেন স্বামী-ভ্রমলোকটির অবস্থা। গিম্মী বাজারের খিলিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়েও ফেলতে পাবেন। সস্তাহখানেক স্বামী ভ্রমলোকটি কি অসহ্য কষ্টে ভুগবেন। শাখের একটু জিনিস গিম্মীকে না দিতে পারার কষ্ট ও ভাবনা কি কম? শাখ কষ্ট আর ভাবনার কথাই বা বলি কি করে। ব্যাগ ছিনতাই—এখ ভয়ানকতা কথা কে না জানে।

নির্দিষ্ট দিনটিতে রেশন ব্যাগের দিকে ডাকার বক চিপচিপ দাঁত শিবিষ, চাখ টনটন কার না করে—করত বাধ্য। রেশনের একগুচ্ছ টাকা জোগানে কৃকেশকে শূন্য করার পথ সঙ্গম নহ্ন। তারপর টাকা জোগান হ'ল তো দাঁচিন্তা ভাত চিবোতে কাকের ঠোঁট দাঁতের কি হাল হ'ল। ফ'কর বাচ্চতে চলার পাওয়ারেরই বা কত হের-ফের হবে।

এক ভর-ভাবনা পড়ে নারীর সৌন্দর্য ব্যাঙে ব্যাগের অবদান অনেকখানি। এবার ব্যাগটা একটু বড় অর্থ ব্যয় করে করছি। লেডিস ব্যাগ বা জ্যানিটি ব্যাগ। সেবেক্রে ব্যাগকে আমরা বজারের বা রেশনের খেলে বা ব্যাগের সমগোত্র ভাবে পারি না। এর কত ডিগ্‌নিটি। পুরো সাজসজ্জার তেল পালটে দেয়, চেহারা খেঁজাই করে। শুনোই লেডিস ব্যাগকে নিয়ে অল্পবয়েসী ছেলের নানা জল্পনাকল্পনা। বরষ ভ্রমলোকেরা তো হামেসাই একটা প্রশ্ন তোলে, এতবড় ব্যাগগুলোতে থাকে কি?

বাই থাকুক সেটা তো আর বড় কথা নয়। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের বিবিধ সামগ্রীতে এই ব্যাগগুলো ভরপুর। দয়-কারী অদয়কারী হরেকরকমের জিনিস যেমন খাটে বিছানো তোষক তলা বোকাই—এও অনেকটা সেই ধরনের। জানি না অভ্যাধুনিকারা হয়তো চটে উঠবেন। তারা হয়তো অপ্রয়োজনীয় কিছু দিয় ব্যাগ বোকাই—এ নরাজ। আসলে মাথার ব্যাগটাই মড়কে—কারও মন রাখার কথা ভাবি না।

এই ব্যাগ ব্যবহারের কৌশল 'নিয়েও চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। নিতা ব্যবহার' ব্যাগ থেকে শুধু কবে জন্মদিন, অমপ্রাণন বি'য় প্রভৃতি জিন জিন উৎসবে ব্যাগের ধবন-ধারণও আলাদা। শাড়ী, চাদর চটি এসের সঙ্গে মিলিয়ে বড় ব্যাগ না নেওয়া গেল তবে সাজটাই অসম্পূর্ণ।

নতুন করে ব্যাগে ফ্যাশানের আমদানী এটা মেয়েদের এক বিশেষ উদ্ভাবন শক্তি। চামড়া, কোম এগুলো বাদ দিয়ে বড়ীতে হাতে তৈরী ব্যাগও এক বিশেষ কৃমিকা নিয়েছে ফ্যাশানের বাজারে।

একসময়ে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ব্যবহারে মেয়েরা উতলা হ'বে উঠেছিল। এ-ব্যাগ ব্যবহারে নাকি কেমন ইনটেলেকচুয়ালের ছাপ আছে। আসলে ব্যবহারকারিণীর গতি প্রকৃতি বোঝাতে ব্যাগের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

শান্তিনিকেতনী ব্যাগকে পিছনের সারিতে ফেলে কোম এসে দাঁড়ালো সামনে। স্নোভেব মতো প্রত্নগতিতে সকলের হাতে কোমের ব্যাগ শোভাবর্ধন করতে অগ্রণী হ'ল। হালে দেখছি হাত থেকে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে একদলের আগ্রহ বেশী। এতে ফ্যাশান কতটা হয় জানি না তবে স্বাধীনভাবে হাত দুটো নাড়াবার সুযোগে ভাঁড় রাস্তার একটা সুখ আছে মিস্টার।

কাপড়ে তৈরী ব্যাগের দিকে অসম্ভব ঝেঁক এখন দেখা যাচ্ছে। শুধু কাপড় নয় চটেও এ ব্যাগবে অনেকখানি অগ্রণী। রপ্তানী চটের ব্যাগের শোভা কোন অংশেই কম নয়।

আসলে ব্যাগ সে ব্যাগই। নারীপুরুষ উভয়ের জীবনের সঙ্গে এক গভীর যোগ। ফ্যাশান করতে যেমন ব্যাগের প্রয়োজন, জীবন বাঁচাতেও কি তার মূল্য কম?

—অঞ্জলি কৌশলী

কটো : চন্দ্রহাস চন্দ্র

বিতা অস্ত্রোপচারে  
**অর্শ** থেকে  
আত্মীয় পাতার  
জন্ম  
**হ্যাডেনস্যা**  
ফলস্ব  
চাষকার করুন!



# শিল্পী সম্মত থিয়েটার/দিল্লী নৌলিক

চোখের সামনে বিশ্বের কম্পন ও উপলব্ধির লগতে আলোড়ন যদি এক নতুন-দর ইতিহাসের দিগন্ত উন্মোচনের ইঙ্গিত হয়, অহলে হয়তো বিনা শিথার বলা যায় যে বিবর্তনের স্রোত বাংলা থিয়েটারকে আজ অনেক উল্লসিত প্রতিশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে স্ফূর্তিবদ্ধভাবে সুর মিলিয়ে এসেছে সাজকের নতুনতর চিন্তার আলোশ আলোকিত থিয়েটার। আজকের নাটক পুরনো ভাবনার জীবন্ততার ক্রান্ত নয়, আজকের প্রযোজনা গভানুগতিক অভিনয় বাঁতল মর্মগতিক পুনরাবর্তন নয়। যে থিয়েটার আগে ছিল, সে প্রযোজনার দ্বারা আগের শতকে চলতো তার প্রতি কোন অপ্রমাণ প্রকাশ করে নয়, বিবর্তনের ইতিহাসকে স্বীকৃতি জানিয়ে এটা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে গত পঁচিশ বছরের বাংলা থিয়েটার এক চিরন্তন শৈল্পিক মাহিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। জীবন থেকে দূরে যে থিয়েটারে অস্তিত্ব ছিল তাকে জীবনভিমুখী করে তারই মধ্যেই শিল্পের দীপ্তি আবিষ্কার, এ এক অসাধারণ ঘটনা। বাংলা বঙ্গমণ্ডল শতবর্ষ পূর্তি মনোবৃত্তি এই ঐতিহাসিক সত্যটুকুকে আরো প্রসারিত আলোয় তুলে ধরু উচিত নয় কি?

এই ধরনের থিয়েটারের স্বরূপ কি, তা বলতে পারবেন তাঁরাই যারা স্বীকৃতি জানিয়েছেন আজকের নাট্যপ্রযোজনায়। হয়তো প্রশ্ন থেকে যায় এ সব দর্শক কাব্য! কোন বিশেষ প্রণীত, না সাধারণ জন-মানসের অংশীদার। এই অন্য ধরনের থিয়েটারই কি এই বিশেষ ধরনের দর্শক তৈরি করেছে, না বিবর্তনের স্রোতে স্বাভাবিকভাবেই ভেসে এসে দর্শকদের চাহিদাতেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই থিয়েটার! এই মৌল প্রশ্নগুলোর মতোমুখি হয়ে একটি কথাই আমাদের আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে পর্ব বোধ হয় যে বাংলা থিয়েটার আজ নাট্যমোদীর মনে সিরিষাস চিন্তার আলোড়ন তুলেছে। আগে নাটকের অস্তিত্ব হয়তো নাট্যপ্রযোজনা কারকটি ঘটায় মতো সীমাবদ্ধ থাকতো, আর এখন আসল নাটকের প্রাণধর্ম আশেপাশে হয় নাটক শেষ হওয়ার পর। আজ মঞ্চ থেকে ঘটনা, সংলাপ

ও সংঘাত নেমে এসেছে জীবনের নানা উপলব্ধি ও মননের আবেগে।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক পরিবর্তনের বাংলা নাটক এনেছে আজ বিশ্ববর এক পরিবর্তন। যে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ক্রমের অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ নিয়ে বাংলা নাটক মূর্খ হতে উঠেছিল, তা থেকে সরে এসে আজ যুগ-প্রয়োজনেই জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনকে নাড়া দিচ্ছে, তাকে দৃষ্টিতে মচড়ে চলমান করেছে এক নতুন আবেগে আব প্পন্দনে। আজকের সমাজজীবন, আজকের যুগকল্যাণ-তার মশ থেকেই উঠে আসছে ঠিক, তাই কথাই তৈরি করেছে সংলাপ, তাই সমস্যাই ভাষা দিচ্ছে সংঘাতকে। প্রত্যাশিত, সাজগান, নাদিবা শাহ অর্জন প্রভৃতিব জীবন সংঘাত আজ পাব তার লাগতে না। ভালো না লাগাব কারণ এই সব চরিত্রের প্রতি অপ্রমাণ নয়, শুধু যে অসম্ভব বকমের চলমান জীবনের সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি তার গভীরতাই আজ স্পষ্টিত হতে চলেছে তার এম আত্মদানেই ধ্বংস নাট্যশিল্পের পূর্ণতম সীমার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আমরা অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই বলবো যে আমাদের আগেকার নাট্যপ্রযোজনা নিঃসন্দেহে একটা যুগের ইতিহাস বহন করেছে। আর তাই বঙ্গমণ্ড শতবর্ষপূর্তির উৎসবে আজ বহু পুরনো বাসিক নাটক সন্নিবিষ্ট হচ্ছে।

নতুনতর নাটক অর্থাত্ বা অন্য ধরনের থিয়েটার বলে খ্যাত, তা গত উল্লেখ্য ফর্ম বা কনটেন্টকে কেন্দ্র করে। আন-সার্ট নাটক, প্রতীকধর্মী নাটক—আজকের এই সব বলিষ্ঠ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক নাট্য ভাবনার, চিন্তার বিভিন্ন স্তর। যে সব বিষয়কে আমরা মণ্ডেব আলোর প্রকাশের অনপেক্ষ ভাবতাম, তাও বেশ দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতার সঙ্গে মণ্ডে তুলে ধরা হচ্ছে। যৌনজীবনের সংঘাত আব যন্ত্রণাও ভাষা পাচ্ছে নাটকের গতিবোধে আবাব তা শব্দ, বস্তু-এর প্রচাষ হিসেবেই চালিয়ে যায় ন বহুধর্ম নাট্যপ্রযোজনার প্রয়োজনে দৃষ্টান্ত হিসেবে চিত্র বাস। আবাসার্ট নাটকের মধ্যে যে ভাষাভাষিক অসম্ভাব্যতা তার মাপাও লুকিয়ে আছে নতুন এক জীবন রস-সিদ্ধ বিভোভেব সুব,

যে সুব জীবনের অতল পর্বন্ত তুলেছে তাঁরতম আন্দোলন। বিদেশী নাটকের ভাবনাসারে বিচিত্র নাটকও ওপারের নাট্য-নিবীক্ষার সঙ্গে আমাদের চিন্তার সেতুবন্ধন কবছে। কোন বিশেষ নাট্যপ্রযোজনার নাম উল্লেখ না করে একটা কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে বাংলা নাটকে এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত বাংলা নাট্যপ্রযোজনার দ্বারাকে বিবর্তন নাট্যপ্রযোজনের এক অনাতম শবিক করে তুলেছে নিঃসন্দেহে।

তবে একটা কথা। এই যে আলোড়ন, এই যে বিশ্ববর সুগভীর আন্দোলন, এর সবটাই কিন্তু অপেশাদারী সৌখীন নাট্য-গোষ্ঠীদের নিকট নিশ্চয়ই প্রায়শঃ বস্ত্র এক ফসল। এ'বাট বাংলা নাটকে শিল্পের মর্যাদা দিচ্ছে, এ'দেরই ভাবনার গড়ে উঠেছে ভাবীকালের বাংলা নাটকের এক বিশেষ গোবদীপ্ত চেহারা। কিন্তু দূরত্বের বিষয় ব্যবসায়িক থিয়েটারে আজো সেই পুরনো চিন্তাভাবনাত্মক ধারার মর্মগতিক পুনরাবর্তন সেখানে হচ্ছে। লাগানি কোন পরিবর্তনের দোলা। এই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কড়পাক্ষ কাছে প্রশ্ন বাথলে তাইবা বলেন—দর্শক যা চায় তাই তাঁদের দিতে হয়। এই কড়পাক্ষের কাছে একটি অনুরোধ—তাঁরা দয়া করে সৌখীন নাট্যগোষ্ঠী বিশেষ করে বহুধর্মী, নান্দীকার, থিয়েটার ওলাকসপ প্রভৃতি সংস্থার প্রযোজনা দেখুন, তা হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের নাটক সেখান উল্লাহ দর্শকদের উৎসাহ কম আছে কি না। সত্যিকারের নাটকের প্রাণধর্ম বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক গ্যাভিসমপন্য কয়বার নতুনকি উল্লেখ্য নতুনতরাম শৈলী যেখানে দর্শকদের মোহনিত করে প্রচল মনোবা অর্জন কবা হয় সেখানে ভালো নাটক খুঁজতে যাওয়া বাক্যমি ভাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ কথা খুব সত্য যে দর্শকদের এভাবে আকর্ষণ করার অর্থ ফল, মিলন-ভাবনার গভীরতম স্তর থেকে তাদের গিবিষে নিক আসা। বহুধর্ম নাট্যশিল্পের বিচারে এটা নিঃসন্দেহ একটি অপরাধ। অল্পত এ'দিক অ'দিক দাঁড়ই নিদানী। অল্প নাটক নিঃসন্দেহ নতুনতর পর্বীজ-নিপীজা চলছে ও'দান সবাবই টপ্পা সেই দ্বারাকে একটা সুচলুপে প্রবাহিত করে

দেওয়া। এ ব্যাপারে ব্যবসায়িক থিয়েটারের কতৃপক্ষ ও দর্শকদের কি কোন ভূমিকা থাকত বাবোধ নেই?

প্রশ্নটা ভাবতে হবে যেমন সেখানেকার নাট্যপ্রযোজককে, তেমনি ভেবে দেখতে হবে দর্শকদের। থিয়েটার নিয়ে সেখানে ব্যবসা সেখানে চলবে এক রকমের প্রযোজনা, আর থিয়েটারকে ভালোবেসে খাওয়া থিয়েটার করে তাঁদের প্রযোজিত নাটকের চেহারা হবে অন্য রকম—এই ব্যবধান চলতে দেওয়া কি ঠিক? আর যদি নাই ঠিক হয়, তবে কেন এই ব্যবধান, কেন সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড নাট্যআন্দোলনের ইতিহাস তৈরী হবে না, কেন সবার প্রচেষ্টা একটি আলোকিত ঐক্য এসে মিলবে না! ভালো থিয়েটার অর্থাৎ 'অন্য ধরনের' থিয়েটার কি দর্শক পয়সা দিয়ে দেখেন না? নিশ্চয়ই দেখেন। তার স্বল্প প্রমাণ আছে। হয়তো কিছুটা লাভের পরি-  
মান কম হবে প্রথমে, তবে শিল্পের খ্যাতিরে

কিছুটা ব্যবসায়িক দৃষ্টি প্রথমে ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

আজকের দর্শকই এর বিচারক। কি করে সবার সেখানে বাংলা নাটক অভিনীত হয় সেখানে শিল্পমূল্যের থিয়েটার যাতে হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাঁদেরই। আজ শহর থেকে মফঃস্বল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যে নাট্যআন্দোলনের ঢেউ তার স্বল্প বিশ্লেষণ করলেই তো চোখে পড়বে নিশ্চয়ই যে কি ধরনের নাটক দর্শক আজ চাইছেন, দর্শকের মনঃপ্রাণ আন্দোলিত হয়ে উঠছে কোন প্রযোজনার গভীরে ডুব দিয়ে। স্বীকার করি অন্য স্বাদের থিয়েটারের রস উপভোগ করতে হলে দর্শকের মানসিকতা ও উপলব্ধির ক্যানভাসটিকেও বড়ো করতে হয়। এই ব্যাপারটার যেখানে অভাব হয়, সেখানেই 'আমার কন্ঠলালী'তে সর্ষটা আটকে গেছে' উচ্চারণ করে যে মল্লশাপথ নায়ক, তাঁর চরিত্র বুঝতে

অসুবিধা হয়। কিন্তু তাই বলে অনুভবের এই কীকটক পূরণ করা হবে না কোনদিনও—এ ধারণাও ঠিক নয়। দর্শকদের তো তৈরী করতে হবে প্রযোজকদের। পথের পাঁচালীর পর বাংলা চলচ্চিত্রজগতে যেমন নতুন দর্শক তৈরী হয়েছে, তেমনি 'রক্তকরবী' নাটক প্রভৃতি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার নতুন নাট্যনায়গামী হয়েছে—এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই।

শিল্পসম্মত থিয়েটারের ওপরেই একটি দেশের চিরন্তন নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য নির্ভর করে। এ ব্যাপারে দর্শক ও প্রযোজকদের চিন্তার মেলবন্ধন প্রয়োজন। বাংলা রংগমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো বাংলা থিয়েটারের শৈল্পিক সম্ভার আরো অর্থমূল্য হবে, যাতে যাবে প্রযোজনার সব রকম বাবধান।

## বাঙালী মনীষীর নাট্যাভিনয় শৈলেনকুমার দত্ত

সংস্কৃতির একটি দিক যেমন অভিনয়, চিত্রাভিনাদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়ও তেমনি অভিনয়-দর্শন। তাই সাধারণ অসাধারণ সব ব্যক্তিই অভিনয় দেখে আনন্দ পান। বঙ্গ-কবিী অভিনয় দেখেন মার্মসিং চিত্তাচার্য্যও জনো, প্রমথীশী দেখেন দেহমানের শ্রীবাস্থ-  
লাভের জন্যে।

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগর-  
রামমোহন ঘোষ - প্যারীচাঁদ মিত্র - মধু-  
সুন্দর - রামকৃষ্ণদেব - বিবেকানন্দ - শ্রীধর-  
বন্দ্য - চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই অভিনয়  
দেখে প্রভূত আনন্দ পেতেন। 'নীলদর্পণ'  
নাটকের অভিনয় দেখে বিচলিত দর্শক বিদ্যা-  
সাগরের চাঁচুজোতা ছুঁতে মারার প্রচলিত  
রটনা অভিনয় জগতে আজও একটি স্মরণীয়  
দৃষ্টান্ত। হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্র - রমেশচন্দ্র  
এবং রজনীন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনও অভিনয়  
দেখতে ভালবাসতেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন  
সিংহের নামও এদিক থেকে বিশেষভাবে  
উল্লেখনীয়। তিনি যেমন নাট্যাভিনয়ে  
আগ্রহী ছিলেন তেমনি নিজের জীবনে এক-  
জন সুঅভিনেতা। বিদ্যোৎসাহিনী রংগমঞ্চে  
অভিনীত বেনীসংহার নাটকে অভিনয় করে  
তিনি যশোলাভ করেন। নিজে অভিনয় না  
করলেও রজনীন্দ্র কেশবচন্দ্র মধ্যস্থতাক্রমে  
দক্ষ ছিলেন। মেট্রোপলিটন থিয়েটারের  
বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নাটক প্রধানত তাঁরই  
তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয়। ব্রজ সমাজের আর  
এক কথিত প্রভাণচন্দ্র মঙ্গলদারও একজন  
সুঅভিনেতা ছিলেন।

এদের মধ্যে বিদ্যাসাগর - মধুসুন্দর এবং  
বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয়ে অত্যন্ত উৎসাহী

ছিলেন। পাথুরেঘাটার ঠাকুর বাড়িতে থিয়ে-  
টারের জন্যে যে-কমিটি গঠিত ছিল, বিদ্যা-  
সাগর এবং মধুসুন্দর তার কার্যকরী সদস্য  
ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যচার্য অক্ষয়-  
চন্দ্র সরকার শব্দে অভিনয় দেখেই আনন্দ  
লাভ করতেন না নাট্যাভিনয়ে ওদের  
উদ্যোগও কম ছিল না। ১৮৭২ সালের ৩০  
মার্চ হুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লালাবতী'  
নাটকের অভিনয় হয় প্রধানত এদেরই  
উদ্যোগে।

মনীষীদের মধ্যে ভোলানাথ চন্দ্র গৌর-  
দাস বসাক, রমানাথ লাহা প্রভৃতিরা সুঅভি-  
নয় করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন এক-  
জন কুশলী অভিনেতা। বিখ্যাত চিকিৎসক  
রাধাগোবিন্দ কর তাঁর ভ্রাতা রাধামাধব ঝের  
মত সুঅভিনয় করতেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা-  
পতি ডবলিউ সি বোনার্জনী ওরফে উমেশ-  
চন্দ্রের অভিনয় খুব আগ্রহ ছিল। মধু-  
সুন্দরের শর্মিষ্ঠা নাটকভিনয়ে তিনি  
শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন।  
দর্শকগুণে উপস্থিত মহারাজা শতীন্দ্রমোহন  
ঠাকুরও উমেশচন্দ্রের অভিনয়ের ভূয়সী  
প্রশংসা করেন। 'রেইস এন্ড রেইট' পত্রিকার  
সম্পাদক সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও  
সুঅভিনয় করতেন।

নাট্যকারদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভি-  
নয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে  
উল্লেখনীয় হলেন গিরিশচন্দ্র এবং বসরাজ  
অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়  
দেখে শ্বৈত্সন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন—  
'বিলেতে জন্মালে গিরিশবাবু, সার উপাধি  
পেতেন।' গিরিশচন্দ্র অভিনয় করে যে সব

চরিত্রগুলি অমর করে রেখেছেন সেগুলি হল—  
সম্ভার একাদশীতে নিমচাঁদ, লীলাবতীতে  
লালতমোহন, কৃষ্ণকুমারীতে ভীষ্ম সিংহ,  
পলাশীতে যশ্বে রায়চাঁদ, পাথুরে গৌরব  
কণ্ঠকী নীলদর্পণে উড সাহেব, প্রথম  
যোগেশ, মাকসুদে মাকসুদে, বিশ্বকর্মে  
নগেন্দ্র জমায় বিদ্যুৎ, সিংহজন্মেয় করিম-  
চাঁচা এবং বিনয়মংগলে পাথক। সম্ভার  
একাদশীতে নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশ-  
চন্দ্রের অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু  
মিত্রছিলেন 'মহোৎসব' নামে 'দর্শন' নামে  
তোমারই জন্যে লেখা। কৃষ্ণকুমারী নাটকে  
গিরিশচন্দ্রের অভিনয় মন্থ হয়ে নাটকের  
মহারাজা চন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে নিজের  
রাজবেশ ও তলোয়ার পরিহৃত দিয়েছিলেন।  
গিরিশ-শিষ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর  
অভিনয়ে অমরচরিত্র হল—'বিশ্বমংগলে'  
নামভূমিকা 'নীলদর্পণে' সৈনিক প্রভৃতি।

কলিকাতার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরি-  
বারবর্গের অনেকেই অভিনয়ে অসাধারণ  
পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের  
অভিনয় বাংলা সংস্কৃতির আর একটি  
গৌরবময় অধ্যায়। সীতা দেবীর ভাষায়  
বলতে গেলে—'রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের  
থার কি সর্না দিব! তাঁহার সবকিছুর  
তুলনা একমাত্র তঁহারই মিলিত। .....তিনি  
আঁট উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা  
ছিলেন।' নাট্যচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িও  
একস্থানে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথই দেশের  
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।'

বিশ্বজন সমাগমের প্রয়োজনায় অন্য-  
মুখিত বাঙ্গালীক প্রতিভার প্রথম অভিনয়  
রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীক ভূমিকায় অভিনয়  
করেন। এই অভিনয় দেখতে উপস্থিত  
ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সার গুরুদাস বন্দ্যো-  
পাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীরা।  
রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় দেখে সকলে  
আনন্দে অভিভূত হন! গুরুদাস বন্দ্যো-  
পাধ্যায় এক আনন্দিত হয়েছিলেন যে তার

জীবনের তিনি একটি কবি-প্রশান্তি রচনা করেছিলেন—

৩৮ বৎসর ভাষা আমারে থেকে না আর,  
অজ্ঞান ভিমেতে তব সুপ্রভাত হল ছেয়ে।  
উঠছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,  
বাল্মীকি প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বাস।

বিশ্বজন সমাগমের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালকাতার' নাটকেরও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এ নাটকের প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কনর ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নেমে-  
'চলন' দশবছরের ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকাতেও তাঁকুর পরিবারের অনেকে অভিনয় করেন।

রাজা ও রাণী' নাটকটি নতুন করে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'তপতী'। তপতী কালকাতার মহাসমারোহে তার সন্মানস্বরূপ ব্যবস্থা করেন। সমস্ত বছর সঙ্গীত ও কবি স্বয়ং রাজার ভূমিকায় অংশ নেন। সকলে কিম্বদন্তি প্রকাশ করেন কবি কখনও কবে ওই বছরে প্রেমের অভিনয় করেন এবং তাঁর প্রলম্বিত স্বেচ্ছাপ্রেরিত হতেই বা কী হতে! কিন্তু কাব্যে কি 'তপতী' সের্বিট একজন প্রত্যক্ষদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবনের লেখায় সুস্পষ্ট—  
'...যদিও সমস্ত দেখা গেল দাঁড়িত কালো  
'...খাইয়া মৃৎখণ্ড দুই পাশে গালপাটটা  
'...দিয়ে দিয়া কবি এক তবুও যুবকের বেশে  
'...আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপতী নাটকে  
'...বাহু' প্রথম সেই মর্মস্পর্ক হাহাকার  
'...কষ্টমধুর' এবং আন্তরিক অভিনয়-  
'...গাঢ় উপর জীবন্ত চটপট  
'...ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই যে একজন প্রথম  
'...অভিনেতা' ছিলেন সেকথা সর্বজন-  
'...। তাঁর অভিনয়ের অন্যান্য উল্লেখ-  
'...ভূমিকা' হল—রাজা নাটকের  
'...কব দাদা' নটীর পূজা নাটকের 'ভিক্ট-  
'...বিশজন' নাটকের জরিসিংহ  
'...নাটকের অর্থ বাউল অচলারতন  
'...বন আচাঙ্গ স্বদীনপণ্য শাবদোহন  
'...কব সম্যাসী প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তাঁকুরবাড়ির অনেক  
'...ই' অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন।  
'...জেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ  
'...রবীন্দ্রনাথ, গুরুপদ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ,  
'...জেন্দ্রনাথ, বখীন্দ্রনাথ এবং বর্ণকুমারী,  
'...বর্ণকুমারী, ইন্দ্রনাথ দেবী ও প্রতিভা দেবীও  
'...ভনয়ে পারদর্শী ছিলেন। শিল্পী  
'...জেন্দ্রনাথও অভিনয় শিল্পে পারদর্শী  
'...ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা সুস্পর্শনই ছিলেন  
'...সু-অভিনেতাও ছিলেন। তাঁকে শ্রী-  
'...মহার অনবদ্য মান্যতা। নটীর ভূমি-  
'...স তাঁর অভিনয় দেখে কেউ ধরতেই  
'...তো না যে, তিনি মাহিলা নন। কৃ-

কুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমি-  
কায়ও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত 'এমন কর্ম  
করব না' (অলীকবাবু নাটকের পূর্বনাম)  
নাটকে পতাসিংহর ভূমিকায় অভিনয়  
করেন স্বৈচ্ছেন্দ্রনাথ। অলীকবাবুর ভূমি-  
কায় রবীন্দ্রনাথ এবং 'হেমালিনী' ও  
পিসিনির ভূমিকায় অভিনয় করেন বখা-  
কমে শরৎকুমারী ও বর্ণকুমারী।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী  
এবং রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীও  
অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে  
কোলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে অনু-  
ষ্ঠিত 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে  
পারদর্শী ছিলেন—

বিক্রম—রবীন্দ্রনাথ, সুমিত্রা—জ্ঞানদা-  
নন্দিনী দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ, নারায়ণী—  
মৃণালিনী।

সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মৃণা-  
লিনী দেবীর একত্রে অভিনয় করা নিয়ে যে  
প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছিল সেকথা বলাই  
বাহুল্য। তবু তাঁরা অভিনয়কে এত ভাল-  
বাসতেন যে, এসব সমালোচনাকে কোন  
আমলই দেন নি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও একজন প্রথম  
প্রণয়ী অভিনেতা ছিলেন। প্রতিমা দেবী  
ওঁর স্মৃতিচিহ্ন একসঙ্গে অবনীন্দ্র-  
নাথের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—  
'কাত্যব নাট্যের পাটে অবনীন্দ্রনাথের  
কম্বোজ প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুরু,  
বৈকুণ্ঠের খাতার তিনকড়ি চিরচিহ্ন বিশেষ  
কবে তাঁর কথা মনে করে লিখেছিলেন। এই  
পাটে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অভুলনয়ী।

ফাল্গুনী এবং ডাকঘরের মোড়লের ভূমি-  
কায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন আজও  
ওঁদের স্মৃতিপটে সে ছবি উজ্জ্বল হয়ে  
আছে।' বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা  
গিরিশচন্দ্র একবার তাঁর তিনকড়ি পাটে  
দেখে বলেছিলেন—'এরকম সব আট্টব  
খদি আমার হাতে পেতুম, তবে আগুন  
হুটিয়ে দিতে পারতুম।'

ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এসে কবি  
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও অভিনয় অনুষ্ঠানে  
অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর অভিনয়ে একটা  
বিশেষ এই ছিল যে, তিনি অনেক কথা  
উপস্থিত হও বানিয়ে বলতে পারতেন।  
মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাঁর অভি-  
নয় অনেকের প্রশংসা অর্জন করে।

কবি ও নাট্যকার স্বৈচ্ছেন্দ্রনাথ রায় খুব  
বেশ অভিনয় না করলেও তিনি একজন  
সু-অভিনেতা ছিলেন কোলকাতার সঙ্গীত  
সমাজে একবার তাঁর 'সীতা' নাটকের অভি-  
নয় হয়। সেই অভিনয়ে স্বৈচ্ছেন্দ্রনাথ  
বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকলকে  
মুগ্ধ করেন। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে

সিংহের ভূমিকাতেও তিনি অনবদ্য অভিনয়  
করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনও অভিনয়ে  
খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'বিশ্ববঙ্গল'  
নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অনবদ্য অভি-  
নয় করেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে  
অভিনয় করেও তিনি প্রচুর সন্মান অর্জন  
করেন।

বাংলা শিল্প-সাহিত্যের অমর রত্না  
সুকুমার রায়ও একজন প্রথম প্রণয়ী অভি-  
নেতা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স  
ক্লাবে অভিনয় অনুষ্ঠান প্রায়ই হত এবং  
সেসব অভিনয়ে তিনিই হতেন মধ্য  
অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে  
অনুজ্ঞা পুণ্ডলিতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতি-  
কথায় লিখেছেন 'ননসেন্স ক্লাবের অভিনয়  
এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে  
দেখেছে তারাই জানে। মঞ্চে বর্ণনা করে  
তার বিশেষ ঠিক বোঝানো যায় না।  
বাঁধা টেনে নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও  
মেক আপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথার  
সুদূর ভাবে ভঙ্গীতে তাদেব অভিনয় বাহা-  
দুরি ফুটত। দাদা নাটক লিখত অভিনয়  
লেখাত আর প্রধান পাট্টা সাধারণত সে  
নিজেই নিত। প্রধান মানে সবচেয়ে বোকা  
আনার্জিব পাট্টা হাদারামের অভিনয় কবতে  
দাদার জুড়ি কেউ ছিল না।' স্বয়ং রবীন্দ্র-  
নাথও সুকুমার রায়ের অভিনয় প্রতিভার  
ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঔপন্যাসিক তাবাকস্বর বন্দ্যো-  
পাধ্যায়ও প্রথম জীবনে অভিনয় করতেন।  
পরবর্তীকালে কৈশোর স্মৃতিতে তিনি  
নিজেই লিখেছেন—'...অভিনয় করছি,  
অভিনয়ের জন্য সাধ্যাঙ্কিও পেরেছি।  
নিজের রোগা চেহাটার জন্য বঙ্গমঞ্চে  
নামতে আজ লজ্জা পাই নইলে হয়তো  
বঙ্গমঞ্চে অন্তত এখানকার সত্বে অভিনয়ে  
অভিনয় করতাম।'

শান্তি নিকেতনে অভিনয় পর্বের যে  
আয়োজন হত তাতে বাংলাদেশের বহু  
গুরু শিল্পী অভিনয় করতেন। এঁদের  
মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী,  
অসিতকুমার হালদার, ক্ষিত্যমোহন সেন,  
জগদানন্দ রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৩২১  
বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে অচলারতন  
নাটকের যে অভিনয় হয়, তাতে পিয়র্সন  
সাহেব পর্বন্ত অভিনয় করেছিলেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে সৌখিন  
নাট্যাভিনয় বেশ প্রসার এবং জনপ্রিয়তা  
লাভ করেছে। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে গবেষণা  
এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। সেই  
সঙ্গে বাড়াল রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়  
স্মরণ করলে তাঁদের বাধ্যচিত সন্মান  
জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কল্যাণ  
হবে।

# চিঠিপত্র

## ‘স্বদেশের ইতিহাস’: লেখকের উত্তর

‘অমৃত’ প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘স্বদেশের ইতিহাস’ নামে চিঠিটি পাড়ি কিছুদিন আগে। এই প্রসঙ্গে তাঁকে আমি স্বাধীন করিয়ে দিতে চাই যে এই পত্রিকার প্রকাশিত আমার বঙ্গ-বাবঃ রঙ নাট্যিক’ নামে ধারাবাহিক বচনাটির আসল বিষয়কত্ব হচ্ছে নবাবী শাসনের অন্তিমালে বাংলার বেগমদের সক্রিয় ভূমিকার কাহিনী। সেদিন পদার্থ পেছান দাঁড়িয়ে তাঁরা নবাবদের শাসনকাজে ওপরই শব্দ প্রভাব বিস্তার করেন নি বুদ্ধিবৃত্তি সন্ধিষ্ঠাপন ইত্যাদি ব্যাপারেও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়োজিত। আর তাঁদের এই কাহিনী আলোচনা করতে গিয়ে স্বাধীনতাভাবেরই নবাবদের জীবনের অনেক ঘটনা এসে পড়েছে। শব্দমাত্র কোনো নবাবের জীবন কাহিনী লেখা এই বচনার উদ্দেশ্য নয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমার ছোট্ট বেগম’ লেখাটির ভূমিকা থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে : তাৎ (ঘাসিউ বেগমের) জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কতকটি ঘটনা ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে নিচ্ছে ঘটা। এই বাক্য চ্যুত পার্শ্বগত লাভ করে পলাশীর যুদ্ধ। শ্রী সিরাজ আমার এই উক্তি থেকে ‘অনামনস্ক, অসতর্ক’ এবং ‘বাস্তবতা বিরোধী’ বলে উল্লেখ করেছেন। আমি তাঁকে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে ‘অমৃত’ চাবপাতাওয়াপি ছাপানা ‘ছোট্ট বেগম’ লেখাটিতে এই উক্তি সমর্থন অজস্র তথ্য পরিবেশন করেছে। তিনি লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখতে পেরেন যে সিরাজের সঙ্গে ‘বাস্তব-বাস্তবতা’ পাঃ ঘাসিউ বেগম স্বভাবের একই সব। হাবিলে কিভাবে চার্টার্ড থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করে ছিলেন। সিরাজের বিপক্ষ দল এই ধর্মিত বেগমকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছিলো। ওই দল ছিলেন জগৎ শেঠ, মীর জাফর বজবল বায় দুলওয়ান প্রমুখ নামেরা। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে সদস্যের বিরোধ করার মতো সাহস এঁদের ছিলো না। তাই তাঁরা গোপনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে হাও মেলালেন। এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের কাজের দখল করতে চাইছিলো অনেকদিন থেকেই। এবার তাবা পেয়ে গেলা সেই সুযোগ সুযোগ। এভাবে এক দল ঘাসিউ স্বাক্ষর ও তাঁর প্রধান অনুচরবর্গ এবং অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসককুল—এই দুই প্রধান

বিপক্ষ শক্তির মিলিত চক্রান্তে এলো সেই পলাশীর যুদ্ধ। পতন ঘটলো একটা স্বাধীন দেশের এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হোলো প্রতিষ্ঠা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন আজকাল এ ধরনের রচনা লিখতে গিয়ে আমরা অনেকেই নাকি সোজা তৎকালীন ইংরেজের কুটচালিত কলমের শব্দগোপন্য হই। অন্য কল্পে কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। শব্দ নিজে বক্তব্যটুকুই উল্লেখ করছি। কোনো অর্থ নীতি, কোনো জ্ঞান ধারণা কিংবা আমাদের দেশের ইতিহাস নিয়ে কোনো বিদেশীর একপেশে জ্ঞান—এগুলোর কোনোটিই আমার মনে ওপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করে নি। অবশ্য সব বিদেশী লেখককে বই-ই যে মন্দ তা কখনো বলব না। এঁদের মধ্যে দুই-একজন সেকালের ঘটনাবাজিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন যুদ্ধের দায়িত্ব কাব্যিক বর্ণনা করেছেন। এঁদের লেখক সঙ্গে নবাবী আমলের সমকালীন ঐতিহাসিকের বচনা। অনেক মানদণ্ড খুঁজ পাওয়া যায়। নবাবী আমলের সরকারী ভাষা ছিলো ফারসী। সে সময়কার সঙ্গীত ঘটনা ও ভাষা লিপিবদ্ধ। আমি বঙ্গ নবাব : বঙ্গনাট্যিক নামে এই ধারাবাহিক বচনাটি লিখতে গিয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকদের লেখা ফারসী গ্রন্থ দলিল ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছি। অবশ্য এগুলোর বেশিরভাগই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে গেছে। আর যেসব এখনো অনুবাদ হয়নি সেগুলোর ফারসী-জাঃ পণ্ডিতদের সাহায্যে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঐতিহাসিক কবির আশ্রয় মুজফফরনামা গোলাম হোসেন খ তবাতবাইয়ের ‘সির উল-মুতাখ-খানী’ সালিমউল্লাহ ‘তাবিখ-ই-দাগাল গোলাম হোসেন সালিমব ‘বিদ্যাত উস সালাতিন’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে অশেষ পরিশ্রমে এইসব গ্রন্থ এবং অন্যান্য দলিল থেকে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বার করে তা গ্রন্থে বচনায় পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। সুতরাং তৎকালীন ইংরেজের কুটচালিত কলমের শব্দগোপন্য হওয়াব কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার ক্ষেত্রে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয়কে আমি শেষে এটুকু বলতে চাই যে সম্পূর্ণ সংস্করণমূলক এবং সত্যনিষ্ঠ মন নিয়েই আমার ধারাবাহিক বচনাগুলি লিখেছি। এগুলোর কোনোটিও ঘটে নি সত্য কোনো অপশাপ ঘটে নি ঐতিহাসিক তথ্যের কোনোবাক্য বিকৃতি। গভীর বাস্তবতার পটে মেলে বিচার করছি এই আমলের

ইতিহাস। নবাবদের সমকালীন এদেশী লেখকদের পরিবেশিত তথ্যগুলির ওপর নির্ভর করে আমি কোনো কাল্পনিক উপাখ্যান লিখি নি, বরং ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি। আর সেই সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো সেন্সিটিভ বা ভাবপ্রবণতা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে নি। সেন্সিটিভ উপন্যাসে চলে, কিন্তু ইতিহাস বচনায় তা থেকে বাঁচা।

—অনুব্রজ সেন  
নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫০।

## উনিশ শতকের নবজাগরণ : একটি সমীক্ষা

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ‘৭২ সংঃ অমৃত’ে শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্তের উল্লিখিত নবজাগরণ : ১৭৭১, সমঃ নিকষটি পড়লাম। লেখক প্রথম তুলছেন গ্রীষ্ম বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে যে সমালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন তা সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। বচন থেকে বিশেষ ক্ষুদ্রাংশ উদ্ধৃত করে অনেক সময়েই তাতে উদ্ধৃত অংশের ভুল বোঝাব অবকাশ থেকে যায়। গ্রীষ্ম বিনয় ও ভগবান নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটির নবমখণ্ডে এই তখন হুঃ এমন একটি সময় যখন দ্বিভিন্ন প্রমত্ত অস্তাজ সাঁওতালরা তাদের অশিক্ষিত ইংরেজ ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে চিন্তিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা (প্রশ্রণীটিকে আইনস্টাইন প্রায় সম্যাক শিবোভূষণ বলতে চোয়েছেন) সে তুলনায় কত লঘু বিষয় নিয়েই না মেতে ছিলেন তখন। দুটি প্রশ্রণীক পাশাপাশি বসিয়ে কীভাবে কবলে ধরা পড়ে এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার গতি তুলনায় কত সৌখিন মলম। এবং কার্যক্রমে প্রয়াস কত অলস গ্রীষ্ম ঘোষ এ দুটি ভ্রমকে তফাতে কথায় উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই নবজাগরণকে অস্বীকার করার তরঙ্গ অনুপস্থিত বলে আমার ধারণা, কারণ তাঁর পলোক্ষভাব স্বীকার করেছেন শব্দ বলতে চোয়েছেন অশিক্ষিত সাঁওতালদের নবজাগরণের তুলনায় এ নবজাগরণ অনেকটা লঘু শর্তে।

বাঙালী বিব্রংসমাজের সমস্যা নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটুকুও উত্তরদূর বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই আমার মনে হ’ পারিপাকভাবে এগুলি দীর্ঘ আলোচনা অপেক্ষা রাখে।

—সুনীল কমানার  
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।



## ঢাকার ছায়াছবি



বাবুল ভাট্টারী পরিচালিত সত্য সাহা সুরারোপিত **কাল কল্যাণ** বঙ্গবন্ধু চিত্র  
সংস্থা

ভেজগাঁও ঢাকার এক ডি পি একটা জারগাই বটে। এমত থেকে সেমত পল্লিত বাস্তবতার ভরসে ছাড়িয়ে রয়েছে। জেববার শনিবার বলে কোন কথা নেই। এখন কল্যাণ এক ডি পি নাম—সংস্কৃত চলচ্চিত্র সংস্থা।

এখানে ছবির কথা উঠেই শেষ হয়েই মজির জন্যে হবে বেশি দিন লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় নর। ছবির মজির দিন ঠিক করেই সাধারণত ছবি তৈরি হয়ে থাকে। একটা জানালেন ওয়ার বাংলার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত পরিচালক সত্য সাহা। 'ঢাকা ছাড়া ঢাকার চলচ্চিত্র কর্মীদের পক্ষে নেই'—এমন কথা এখন আর বলা ঠিক নয়। তার উদাহরণ ত চরিত্র, কবরী, লুচল।

লুচলর কোন খবর না দিয়েই কলকাতার ঢলে কাওয়ার এখানকার পরিচালক-প্রযোজকরা সাধারণ হাত রেখেছেন। জীবন রানধানের লেখা উপন্যাস 'বলক গলা নদী'র চিত্ররূপ দেবার জন্যে লুচল না কি উঠে পড়ে লেগেছেন, এবথ ঢাকার চলচ্চিত্র মহলের গমগমে শতাসে ঘুরে বেড়িয়ে। লুচলর আগামী ছবি হচ্ছে—নদী অসেক নাম, জীবন তবু শতা হাশচন্দ্র, অক পিন্ন, গোপাল ভাড়া প্রভৃতি।



সুন্দর্যর ঘোমটায় বসে বসেই জীবন কাটা দিল যে কেউ বাবে, এবার জিহ্বাসিক  
মুঠাই খোঁজ রাখেন। ইদারী ভীষণ কান্ড।  
জান একটা উদাহরণ হচ্ছে, ইংরেজী পরলা  
জানকেই তিনি এক ডি সিন্ডে আনার  
পরিচালনা করতেন। শ্রুতি করতে হুটুয়েন।  
বসন্তের ছবি তালিকা এই রকম—জানও  
জানি, রক্তের পর দিন, জীবন কল, ইয়ে  
করে নিয়ে প্রকৃতি।

জীবন পরিচালনা করতেন জীবনী মালিকা  
করতেন প্রথম পর্বের শ্রুতি শেষ হয়ে  
করে ফল আসতেন।

সুন্দর্যর ইয়ে দিলে জীবন কল শ্রুতি  
করতেন। ছবিটি মাক সম্প্রদায় ভিন্ন ধরনের।  
পরিচালনা করেছেন এই অরবিন্দ, যাইটি  
কোন মিলে সম্প্রদায়। জীবন, হাজার কিট  
নৈশ। আকর্ষণ সাহেবের পুরন ছবি নাম  
জান্ডা তার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম রঙিন  
ছবি হবে। মালিক-মালিকের নাম এখনও  
জান্ডা করেননি তিনি।

জিভান কথাটির প্রথম নিবেদন  
মিরজান ধর্মী ছবি জোলালাব অঙ্গনা  
শ্রুতি। ছবির প্রথমিক কল শ্রুতি হয়ে  
করতেন। মালিকের নাম শাখালা সেনা করে।  
জান্ডা নতুন কলকে করা হতে পারে। ছবির  
কিন্তু নিবেদনা—সাহেবের শ্রুতির।  
করতেন রক্তের জীবিত। কাহিনী-চিত্রনাট্য  
পরিচালনা সাহায্য-রক্তের।

আলোচনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পট-  
ভূমিকার রঙিন শ্রুতি জীবিত পটভূমিকার শ্রুতি



জীবিত পরিচালিত রক্ত, নোমান পরিচালিত রক্ত পর্ব চিত্রে সাহায্য জীবনী



ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ছবি পালক অঙ্গনা হোসেন (বাংলাদেশ) এবং উৎপল দত্ত  
(কলকাতা)। ছবির নারিকা সম্প্রদায়

ছবি জীবিত সত্ত্ব শ্রুতি পালক। এ ছবিতে  
রোজী, রক্ত, মালিকা, কবিতা, আনোয়ার  
হোসেন প্রমুখরা অভিনয় করেছেন।

অভিনেতা উৎপল ডেট নিরে জীবন  
শ্রুতিকলে পড়েছেন সম্প্রতি। ওকে একই  
সঙ্গে আধারে জালো, বসন্তা কন্যা,  
ভাড়াটে বাড়ী, বলাকা মন প্রকৃতি ছবির  
শ্রুতি সমানতালে চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

গেরুয়া রক্তের পালকা আর কালো  
রক্তের ফল প্যাণ্ট পরে পরলা আনোয়ারী  
শ্রুতির রোমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিচালকদের

সঙ্গে ওকে জীবিতের হেরফের করতে  
দেখলাম কেবলই। উৎপল নারিক ওখানকার  
মেরুমহলে বেশ প্রিয়।

ঠিক এ শ্রুতি আমার মনে হল  
ওখানকার জাহাজিকত নতুন শ্রুতি আসা  
একান্ত দরকার। তাহলে ওখানকার শ্রুতিক  
টোয়ার্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পান। এ  
ব্যাপারে প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীর শ্রুতি  
বার করে শ্রুতিকদের সামনে দাঁড় করানার  
মত শ্রুতিসাহসিক কাজ কি বাংলাদেশের  
পরিচালকরা করতে পারেন না?

#### সাহায্যের সঙ্গে ক' মিলিট

জান অভিনয় করেছেন, এমন অনেক  
ছবির শ্রুতিকী সম্প্রদায় নারিকা হয়ে  
শাখালা। মেক-আপ রক্তের এক কালি করে  
আরনা হাতে সাহায্যের শ্রুতিকী করতে  
কেবলই বাস্তব থাকতে হয় ওকে। রোজ শ্রুতি  
শ্রুতিকী জাহাজিক শ্রুতিকী ত লেগেই রয়েছে।

কপালে কালো মুচুচে বড় করে টিপ  
জান। লাল টকটকে গাল দটো। গরুর শ্রুতি  
হাতা কালো রঙের। পরনে লাল জীবিতের  
শ্রুতিকী ওপর কালো। রক্তের জাপ। রক্তের  
শ্রুতি হার। অনেক শ্রুতিকী মত এক পালক।

এহেন নারিকা একই শ্রুতিকী হয়ে  
উৎপল শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী  
নিরে গিরে শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী  
শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী

—শ্রুতিকী শ্রুতিকী জীবিত। শ্রুতিকী শ্রুতিকী  
প্রায় দিন শ্রুতিকী বাই। শ্রুতিকী শ্রুতিকী শ্রুতিকী  
নিতে গিরি শ্রুতিকী।

চক্রী, হোটে সাব, চাঁদ আউর চাঁদী,  
পারেল, রক্তা আউর বিজলী প্রকৃতি শ্রুতিকী

জরুরী অভিজ্ঞত বহু উদ্‌ হাবির অভিনেত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখলাম।

—কলকাতার কোনও ছবি দেখেন নি?

—জী, দেখেছি। অনেক আগে। তখন আমি অনেক ছোট। কিন্তু লাইনে আসিনি। কিন্তু লাইন ত দূরের কথা, তখনকার কথা আমার কিছুই মনে নেই। তখন ত খুঁটন ছোট ছিলাম।

—আপনার মতে এগার বাংলার সবচেয়ে দ্বিতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী কে?

—আমার কাছে সবাই ভাল। সবাই ফেল-অপারেশন করে। আমিও করি। আসল কথা আমার ওরেল উরিশব অনেকটাই মনেছেন।

এবার ওঁকে একটা প্রশ্ন করলাম হাসতে হাসতে।

—আগে যখন ছবি করতেন তখন যতটা না খুঁশ হতেন, এখন স্বাধীন বাংলার ছবি করে তার চেয়ে বেশি খুঁশ নন?

—সেটা ত বটেই! এখন অভিনয় করে আনন্দ পাই বেশি। এ পর্যন্ত বলেই কথা সম্মুখে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলল :

—তবে যুগ বলে কোন কথা নেই। শিল্পী হিসাবে যখনই আমি অভিনয় করি, তখনই সেই মনোভাব নিয়ে স্যারিফাইন করার চেষ্টা করি।

শাবানার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৬৬ সালে নতুন সূর হারাছবির নামক রহমানের ছোট

বোনের ভূমিকায়। তখন ওঁর বয়স সবে মাত্র নয়।

কথার কথার এক সময় শাবান বললেন :

—মা আমি কোনদিন অভিনয় দেখার সুযোগ পাইনি। অভিনয় করতে করতে নিজেকে তৈরি করেছি মাত্র। আপনাদের পুত্র কিন্তু ইনস্টিটিউটের মত এখানেও সিনেমা শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা নিশ্চয়ই উচিত। তাতে অভিনয়ের মান আরো উন্নত হবে।

শাবানার অভিনীত ছবিগুলির নাম হল—দুটি মন দুটি আশা, কড়ের পাখি, দসু, রাণী, অবুধ মন, জনতার আদালত, আধারে আলো, বহুমাতা কন্যা এবং আরো অনেক।

সত্যি, গি ইজ ওনলি একসপেশ্যনাল! এটা আমার কথা নয়। ওপার বাংলার কাহিনী-গীত-রচয়িতা গাজী মাজাহারুল আনোয়ারেরই কথা।



জীবনসংগীত / পরিচালনা : মৃত্যুকা মেহমুদ। আনোয়ার হোসেন, রোজী, সূচনা ও রাজ্জাক।



বনানী কথাচন্দ্রে স্বীকৃতি দিয়ে নৃত্যিকা শমশা এবং হাসান ইমাম। পরিচালনা : আজিজুর রহমান। সংগীত : শ্যাম সাহা

# প্রেক্ষাগৃহ

## অজ্ঞানের নাট্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমল পর্যন্ত সাধারণ রংগালয়ের বাইরে নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে বা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও, তা করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। তিনি সাধারণ রংগালয়ের প্রতি দৃষ্টিতে না করেই নিজের অন্তরের ভাগিনে নাটকের পক্ষে নাটক লিখে গেছেন এবং মাঝে মাঝে তাদের অভিনয়ও করেছেন। প্রথমে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দোতলর ও বেঞ্চে বসে, পাক স্ট্রীটে সত্যেন চাকুরের বাড়ীতে, পরে নানা উৎসব উপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে এবং একে পরে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্তা), নিজের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর (ঘর্ষাভবনের) উঠানে, নিউ এম্পায়ার ছায়া সিনেমা ও কণ্ঠশ্রীস থিয়েটারে (বর্তমানে প্রীতিসিনেমা) তাঁর অভিনয়ের আসর বসতে দেখেছি। রংগালয়ের গঠনে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা গেছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর উঠানে: কখনও বাংলাব পল্লীগ্রামের চণ্ডী মন্ডপ আবার কখনও সচিত্র তোরণ ও প্রাচীর সম্বলিত চব্বই ঘরে উঠেছে তাঁর রংগালয়। একটি প্রতীকময় পটভূমিকার সামনে সমগ্র নাটক বা নৃত্যনাট্যটিকে মণ্ডন

করাই ছিল তাঁর রীতি। নাটক মণ্ডন করার ব্যাপারে যুগেরচিত্র প্রতি কবির তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল। তাই দেখি, প্রথমে যা ছিল 'রাজা রাণী', কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে তাই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল 'ভৈরবের বলি' এবং বোধ করি, ১৯২৮ সালে মায় মূল কাহিনী বজায় রেখে ওরই নতুন রূপ হল 'তপতী'। ভৈরবই দেখা যায়, 'রাজার পরিবর্তিত রূপ' 'ধর্মপ রতন' এবং সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য রূপ 'শাপমোচন'। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রংগালয়কে উপেক্ষা করলেও সাধারণ রংগালয় কবিকে তথা তাঁর রচনাকে দর্শকসম্মুখে পেশ করেছেন ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর 'দিদি' গল্পটিকে 'অকলংক শশী' নামে মণ্ডন করে। এর পরে ১৯২৫ থেকে পরপর চিরকুমার পদ্মা (প্রজাপতির নির্বন্ধ), গৃহপ্রবেশ, বিসর্জন, শোধবোধ, পরিণাম, শেষরক্ষা (গোড়ার গলদ), বোগাযোগ প্রভৃতি রবীন্দ্র-রচনাকে বাংলার সাধারণ রংগালয় থেকে দর্শক-সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়।

কিন্তু ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বরে বাংলা সাধারণ রংগালয়ের জন্মকাল থেকে শব্দ করে ১৯৪৪-এ ডাবতী গণনাট্য সম্বন্ধে যুগের শাখা কর্তৃক বিজয় ওট্টোচার্চ প্রণীত 'নবান' অভিনীত হবার আগে পর্যন্ত বাংলা

নাটক এবং তার অভিনয় নিয়ে আর বা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বা-কিছু অগ্রগতি সম্ভবই হয়েছে সাধারণ রংগালয়েই, তার বাইরে নয়। নাটক-গালয় বাঙালী শব্দ যে নাট্যাভিনয় দেখতেই ভালোবাসে, তাই নয়, তারা নিজেরাও সুযোগ-সুবিধা পেলেই অভিনয় করতে যেতে ওঠে। জন্মাবধি দেখে আসছি, কলকাতা শহরের পাড়ার পাড়ার অলি-গলিতে সৌখীন নাট্যসমাজ, প্রামাণিক ক্লাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখেছি, প্রতিটি ক্লাবই বিশেষ কোনো মণ্ডনফল নাটক নিয়ে অভিনয় করতে উদ্যোগী হ'লেন এবং তাঁরা অভিনয় করতেন হয় কোনও সাধারণ রংগালয় ভাড়া করে, আর নবত প্রশস্ত বাড়ীর উঠানে বা কোনও খোলা জায়গায় 'ভাড়া-করা স্টেজ' খাটিয়ে। ঘরের অভ্যন্তর, বাঃ দরবার, রাজ-পথ, নদীর ধার, গ্রাম্যপথ, জংগল প্রভৃতি সকল দৃশ্যই থাকত পর্দায় অঙ্কিত এবং সেই সব পর্দা প্রয়োজনানুসারে কপিকলের সাহায্যে ফেলা বা গোটানো হত। আমল সৌখীন সম্প্রদায় ম্বা কি শহর, কি পল্লী-গ্রামে অভিনীত হতে দেখতুম 'প্রফুল্ল', 'চন্দ্র-গুপ্ত', 'সবলা', 'কুন্তীকান্তের উইল', 'জনা', 'সাজাহান', আলিবাবা, জয়দেব বিবাহ-বিস্রাট, আব্দ হোসেন প্রভৃতি নাটক ও নাটিকা। এবং নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, সৌখীন অভিনয়ে স্ত্রী ভূমিকাগুলি অজস্রত করতেন পুরুষেরাই। আজ অবিসংসার বলে মনে হবে, নারীচরিত্রে আমরা এমন ব্যঙ্গজনক পুরুষকে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছি, যারা কি সৌন্দর্য, কি অভিনয়-



আমার পেরিয়ে/শব্দে, চট্টোপাধ্যায় এবং সুরতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : ভপন সিংহ।

কটো : অমৃত

কলকাতার সাধারণ মণ্ডের নামকরা অভিনেত্রী-  
দের অনায়াসেই পরাস্ত করতে পারতেন।

সাধারণ রঙ্গমণ্ডের বাইরে নতুন কোনো  
অভিনয়কার প্রবর্তন বা দৃশ্য-সংস্থাপনার  
লক্ষ্য করবার মতো কোনো নতুন পথনির্দেশ  
আমাদের নজরে না পড়লেও নতুন নাটক  
মণ্ডস্থ করবার ব্যাপারে কলকাতার দুটি  
নাট্যসংস্থাকে আমরা মাঝে মাঝে উদ্যোগী  
হতে দেখেছি। এক, বোম্বাইয়ের 'আনন্দ  
পরিষদ' এবং দুই, বাগবাজারের 'শিশির  
ইনস্টিটিউট'। মনে পড়ে, প্রথম সম্প্রদায়  
শরৎচন্দ্রের 'গাহদাহ'কে নাট্যরূপে মণ্ডস্থ  
করেছিলেন এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠী বিধায়ক  
ভট্টাচার্যকে নাট্যকার রূপে নাট্যমোদীদেব  
সামনে উপস্থাপিত করেন।

কিন্তু 'নবায়'-এর অভিনয়ই প্রথম  
দেখাল, নতুন নাটক নিয়ে নতুন অপরিচিত  
অভিনেতা-অভিনেত্রী নতুন আঙ্গিকে  
নাটকে মণ্ডস্থ করে অসামান্য জনপ্রিয়তা  
এবং আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারে।  
আমরা প্রথম দেখলুম, সাধারণ রঙ্গমণ্ডের  
বাইরেও অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করা  
সম্ভব। অবশ্য এরা আগে মধু বসু তাঁর  
'ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার'-এর বিভিন্ন  
ভািনয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি নাবীদের দ্বিগেই  
অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত  
'ইংগলগ সমাজের' নারীদের এম্পায়ার মণ্ডে  
অবতরণকে সাধারণ নাট্যমোদীরা ততটা  
গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ত্রুটি ভাদুড়ী যা  
শোভা সেনের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে  
যখন নাট্যনেপথ্য প্রদর্শন করে 'নবায়'-এর  
সামগ্রিক সাফল্যের অংশীদার হল, তখন  
আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের

সামনে উপার্জনের একটি নতুন পথ খুলে  
গেল।

কলকাতার তিনটি বা চারটি সাধারণ  
রঙ্গালয় যখন তাদের নাটক অভিনয়ের জন্যে  
মাত্র বারবিনতাকুল থেকেই অভিনেত্রী সংগ্রহ  
করার অভ্যাস, এক-দুই-তিন করে বহুরূপী,  
লিটল থিয়েটার, শৌভনিক প্রভৃতি নাট্য-  
সংস্থা জন্মগ্রহণ করল আমাদের মধ্যবিত্ত  
সম্প্রদায় থেকেই নতুনপন্থা অভিনেত্রী-এর  
দলস্থ করে। লিটল থিয়েটার উৎপল দত্ত  
নেতৃত্বে মিনার্ভা মণ্ড ভাড়া নিয়ে  
সৌখীনতা পরিহার করে পেশাদারী ব্যস্ত  
গ্রহণ করল। বহুরূপী মাঝে মাঝে নিউ  
এম্পায়ার মণ্ড ভাড়া করে সাধারণের কাছে  
টিকিট বিক্রি করতে লাগলেন তাঁদের নাট্য-  
ভিনয় দেখবার জন্যে। এবং শৌভনিক তাঁদের  
নির্মিত নাট্যপ্রদর্শনী শব্দ করলেন দক্ষিণ  
কলকাতার নবগঠিত 'মুখ অঙ্গন' মণ্ডে।  
উৎপল দত্ত তাব সম্প্রদায়ের জন্যে নিজেই  
নাটক বচনা করতে লাগলেন। নাট্যরসিক  
দর্শকরা দেখল 'অগ্নিব', 'ফেরারী কোক',  
'কল্লোল', 'ভাঁব' প্রভৃতি নাটকের সার্থক  
অভিনয় এবং এই অভিনয়গুলির মাধ্যমে  
'দখতে পেল, নতুন নতুন মণ্ডআঙ্গিক ও  
দলগত অভিনয়ের-গ্রুপ অ্যাকটিংয়ের  
অভ্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বহুরূপী মণ্ড  
করলেন ববীন্দ্রনাথের 'রক্তকবচী' ও 'রাজা',  
'নবায়'ের 'পুতুল খেলা', 'দশচক্র', গ্রীক নাটক  
'গাজা ইডিপাস', বাদল সবকারের 'বাকী  
'তংস' প্রভৃতি। এদের মণ্ডআঙ্গিক  
পরোক্ষ হলেও বিশেষ কোনো নবদিকপ্তের

ইঙ্গিত বহন করেনি। 'মুখ অঙ্গন'-এর  
অপারিসর মণ্ডে এক-একটি প্রতীকশীল  
দৃশ্যের পটভূমিকাকে আশ্রয় করে শৌভনিক  
সম্প্রদায় তাঁদের নাটকগুলিকে মণ্ডস্থ করতে  
থাকলেন।

এদের দেখাদেখি আরও দল গড়ে  
উঠতে লাগল। উদ্দেশ্য একই—রথ দেখা এবং  
কল্যাণে। মণ্ডেই দেখতে পাচ্ছি, নাটক  
করার সখ মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ  
উপার্জনের চেষ্টা রয়েছে প্রতিটি গোষ্ঠীরই।  
প্রত্যেকেরই কাছে নাট্যাভিনয় হচ্ছে পথ এবং  
পাথর। আগে বা ছিল ঘরের খেঁচের ঘরের  
মোব ভাড়ানোর সাক্ষর, আজ তাই হয়ে  
উঠেছে বেশীর ভাগ নাট্যআয়োজনকারীর  
কাছেই রুজ-রোজগারের একমাত্র পথ। রক্ত-  
নৈতিক চেতনা যে কারকে কারকে নাটক  
বচনা ও তাকে মণ্ডস্থ করার উদ্দেশ্য করে  
না, এমন কথা বলি না। কিন্তু 'ক্যালকাটা  
থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠান, 'নট-নাট্যকার-নাট্য'  
প্রযোজক বিজন ভট্টাচার্যের মতো আদর্শ-  
বাদীদেব এক আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু  
'বশীর্ভাগই তাঁদের দৃষ্টিকে নিবন্ধ  
করেছেন টিকিটঘরের দিকে; তাঁদের মূল  
উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থোপার্জন। এবং এর জন্যে  
তারা 'ছেড়ে দিলুম পথটা, বদলে ফেললুম  
নোটা' করতেও পিছসা নন। তাই দেখি,  
বহু একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে  
নাটকে মতো নাটক 'কোটিকে গোটি' এবং  
তাঁদের অভিনয়ে না দেখি কোনো নতুন  
শাবা না মেলে কোনো নতুন 'দিকপ্তের  
ইঙ্গিত।

১৩৭১



টিকিট/পত্রিকাভক ভরণ মজুদদার ও স

খ্যা যায়।

করে : অঙ্গু

## চিত্রসমালোচনা

## তথ্যচিত্র 'নেতাজী'

নেতাজীর জন্মদিন বাঙালীর কাছে একটি অত্যন্ত পুণ্যদিন। তাই তাঁর জন্ম-মস্তাহের আগেই ২০ জানুয়ারীতে ফিল্মস্ ডিভিসন (পূর্বাঞ্চল) তরুণ চৌধুরী পরিচালিত দুই বইয়ের তথ্যচিত্র 'নেতাজীর শ্রুত মন্দির' ব্যবস্থা করে একটি আনন্দ-হারক কাজ করেছেন। শ্রীচৌধুরী কৃত ছবিটি নেতাজীর জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনা

## রজনীন্দ্রনাথ নন্দীকার

২০শে মার্চ ২১শে মার্চ ৬৫টার

তিন পরসার পালা

২০শে মার্চবার ২৬শে মার্চবার

০ট ৩ ৬৫টার নতুন নাটক

নটী বিনোদিনী

সমালোচকের নামান্তর :

আনন্দবাজার :

বিভিন্ন দৃশ্যের যোগাযোগনাথ  
অন্যান্য উল্লিখিত সূত্র।

দেশ :

এই প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত  
এক নতুন মাধ্যম এনেছে।

হিন্দুস্থান স্টেশন

সমস্ত ব্যাপকটাই সারবস্ত্রহীন  
অবয়ব সর্বস্ব।

নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

**স্বতার থিয়েটার**  
শীতসাপিনিস্তিত  
৫৫-১১৬৯

আশাপূর্ণা দেবী বডি

**মঞ্জিরা**

পরিচালনা দেবনাথায়ণ শুভ

সংগীত কমলাকান্ত মিত্র

দৃশ্য ও শব্দে আনন্দ হাস

নিজ প্রত্যেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬৫টা  
প্রতি রবি ও ছুটির দিন ০ ৩ ৬৫টা

সম্পর্কিত শ্রিচরিত্র ও কলাকুশলীদের সম্মুখে গঠিত। তারই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে নতুন তোলা নেতাজীর কয়েকটি চ্যাপ্টার ১লাক্টর, আই-এন-এর পূর্বভারতীয় রণাঙ্গন কোহিমা অঞ্চলের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত। 'কংগ্রেস ছাড়বার পরে আমি কি করব', নেতাজীর এই স্মরণীয় উক্তি দিয়ে ছবিটির শুরু। পরে আসে টাইটেল এবং তার পরে নেতাজীর জন্ম থেকে আরম্ভ করে তাঁর আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া, দেশজন্যের ডাকে দেশবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতা স্ত্রে আত্মবিসর্জন করা, ১৯৪১-এর সেই স্মরণীয় রায়ে বাস্তবের ত্যাগ করে কাবুলের পথে পাড়ি দেওয়া, জার্মানী পৌঁছে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর্ব আই-এন-এ সৈন্য-দল গঠন, সাবমেরিনে করে জাপানে পাড়ি দেওয়া, রাসবিহারী বসু কতৃক সুভাষ-চন্দ্রকে হিঁড়ান্না ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সর্বময় কতৃক দান, তাঁর স্বাধীন ভারত-সরকার গঠন ও 'দিল্লী চলো' অভিযান, প্রকৃতির নিম্নম বিরুদ্ধতায় সংকল্প সাঁখির গথে বাধা ইত্যাদি বহু উত্তেজক প্রকৃত তথ্যসম্প্রদায় ছবিটি সমৃদ্ধ। প্রথমে ডঃ শিশির বসুর ও পরে বিখ্যাত ডাচকায় প্রতাপচন্দ্রের নেপথ্য ডাক্তার ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদাশীভূত করেছে। এই তথ্য-বহুল 'নেতাজী' ছবিটির প্রতি আমবা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

## বিবিধ সংবাদ

নকল সোনা : হিম্মত চক্রবর্তী প্রযোজিত নবজাত প্রোডাকশন্সের নতুন আঁপাঙ্গের ছবি 'নকল সোনা' খুব শীঘ্রই (এ মাসের মাঝামাঝি) বঙ্গশ্রী বাঁধা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করবে। বাংলার চলচ্চিত্রেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, গায়িকার, সুরকার সংগীত শিল্পী, প্রযোজক ও অন্যান্য কলা-কুশলীদের জীবনের প্রতিদিনের হাসিকান্না, বাধা বেদনাকে কেন্দ্র করে ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঘটনা করেছেন—বহু সকল ছবির পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জী। সুর সৃষ্টি করেছেন নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র ও স্বপ্না দাশগুপ্তা। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনায় আছেন বখারমে বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখার্জী। চরিত্র চিত্রণে আছেন—বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রায় সকলেই। ছবিটিতে কলাকুশলী, শিল্পী, প্রচারসচিব, সম্পাদক ইত্যাদি প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা স্বনামে এবং স্বাধীন চরিত্রে রূপদান করেছেন। বহু বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে এ-ছবিতে বীরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে—কল্যাণী, পিনাকী সেনগুপ্ত (অপূর্ব সংসার খ্যাত), নবাগতা রূপা চৌধুরী সাবিত্রী চ্যাটার্জী সবেশ্বর, জহর বাবু, এবীন মজুমদার চিত্রময় বাবু, কৃষ্ণ বসু, জগদীশ মণ্ডল, কাজল মজুমদার, শ্রীকান্ত

গুহঠাকুরতা, পারিজাত বসু, মল্লীশ দাস-গুপ্ত, শ্যামসুন্দর ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, শ্রীপত্নানন, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখার্জী, হিম্মত চক্রবর্তী, পরিচালক পিনাকী মুখার্জী, পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জী, চিত্রগ্রাহক বিজয় ঘোষ, সম্পাদক অমিয় মুখার্জী, তপতী দেবী, বাসন্তী চ্যাটার্জী, মৃণাল মুখার্জী, নবোদ্য চ্যাটার্জী, পাথর মুখার্জী ইত্যাদি সব মিলে প্রায় ১০৮ জনকে দেখা যাবে। মিলি পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান—পদাবলী সংস্থা আসচে ২৪ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার রবীন্দ্র সদনে প্রখ্যাত মুকামিনেতা বোগেশ দত্তের সফল ইউরোপ সফরের জন্য এক বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও পর্বে তারই মুকামিনের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে নেপথ্য অংশ গ্রহণ করবেন তাপস সেন (আলো), সুবল দত্ত (মঞ্চ), খালেদ চৌধুরী (শোশাক), দীপক চৌধুরী (সংগীত) এবং অনন্ত দাস (রূপসজ্জা)। শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মুকামিনের দেখাবেন।

মিলিকা : বীবেকব বসু পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শ্রীবসু তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য জরাসন্ধের মিলিকার চিত্রগ্রহণ কিয়েছেন। সবিভা চিত্রমেব পতাকাভূষণে ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে।

বিধানসভার ইন্ডুজাল : গত ২১ ডিসেম্বর ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ দিন। এই কিশর দিনটিব সাংস্কৃতিক মঞ্চে অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাদ্যকব মন্ডন কুন্ডুব ইন্ডুজাল। হাজার হাজার দর্শক ও প্রতিনিধিদের সামনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দল-বলসহ এক আকর্ষণীয় ইন্ডুজাল প্রদর্শন করেন। মন্ডন কুন্ডুব সর্বপ্রথমে যে খেলাটি দেখান সেটি হচ্ছে একটি লেখা থেকে। লেখাটি হঠাৎ একটি পতাকাব পবিগত হয়েই পর মুহূর্তে ইন্দ্রবা গান্ধীস সহাস্য মুখ দেখা যায়।

এই খেলাটি দেখে দর্শকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। এরপর মন্ডন কুন্ডুব যে সমস্ত খেলাগদল দেখান সেগুলিও ক্রমে বিস্ময়কর নয়, যেমন স্পর্টসনিক মাধ্যম-কর্ষণ শক্তিকে তুচ্ছ করে উড়ে যাচ্ছে জীবন্ত এ-বটি মেয়ে হাওয়াতে ভেসে দর্শকদের নমস্কার জানাচ্ছেন ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের শেষে ২২ বছরের বৃদ্ধ মন্ডন কুন্ডুব আশ্চর্যজনক ইন্ডুজালে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার দর্শক করতালি দিয়ে বাদ্যকবকে অভিনন্দন জানান।

ভাষাভাষা গত ২২ জানুয়ারী মন্ডন কুন্ডুব কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে ইন্ডুজাল প্রদর্শন করেন। এখানেও তিনি তাঁর অশ্রুত ধরনের বিস্ময়কর খেলাগদল দেখিয়ে সাংবাদিকদের বিস্মিত করে দেন।

বিদেশে বোগেশ দত্তের মুকামিনের : ভারতীয় মুকামিনের পথিকৃত শ্রীবেগেশ দত্ত সম্প্রতি বার্লিন, জাঙ্গ, লন্ডন ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে মুকামিনের পরিবেশন করে ভারতীয় মুকামিনের



ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। বিদেশী সংবাদপত্র ভারতীয় মুকাভিনয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদত্ত ভারতমুদ্রার নাট্যশাস্ত্রের অভিনয় অধ্যায় এবং কলাকর্মে ও ভারতনাট্যম নৃত্যকে ভারতীয় মুকাভিনয়ের ব্যাকরণ বলে আখ্যা দেন। পাশ্চাত্যের কোন প্রভাবই এর ওপর নাই।

শ্রীদত্তের মুকাভিনয়ের বেশীরভাগ বিষয়বস্তু ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাব-ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত ও পরিবেশিত। বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মতে শ্রীদত্তের মুকাভিনয়ের মান ফ্রান্সের তথ্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুকাভিনেতা মার্শেল মার্নে'র মুকাভিনয়ের সমতুল্য। একটি বিদেশী সংবাদপত্রের উক্তি : 'সমগ্র বিশ্বে মুকাভিনয় শিল্প হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তাই উৎকর্ষে শ্রীদত্তের অবদান অনস্বীকার্য।'

পরলোকে শিল্পনির্দেশক অনুরূপ কাক্কাড় থাণ্ডালাতে একটি ছবির কাজ করতে করতে শিল্পনির্দেশক অনুরূপ, আর, কাক্কাড় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ ডিসেম্বরে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫২ বছর।

## মুকাভিনয়

### দুটি স্মরণীয় একাংকিকা :

কিছুদিন আগে দুটি একাংকিকা বেশ সাফল্যে সঙ্গো অভিনীত হোল থিয়েটার সেন্টারে। একাংক নাটক দুটি হোল 'ওই ওরা আসে' ও 'পাতা কবে যায়'। প্রযোজনা করলেন 'বর্ণচোবা' গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

গতিবেগসম্পন্ন প্রথম নাটকটির সংঘাত দুর্বার হয়ে উঠেছে গ্রাম্য পটভূমিকায় এক চাষী, তার স্ত্রী, সুসুখোর মহাজন আর ফরেস্টারকে কেন্দ্র করে। ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট জীবন থাকায় নাটকীয় গতিও তীব্রতর হোতে পেরেছে প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই। নাটকটির সংলাপও গভীরবর্তম শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। অভিনয়েও শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখতে পেরেছেন। সুসুখোর মহাজন 'পণ্ডা গড়াই' চরিত্রে চুণীলাল দাশগুপ্ত সূক্ষ্ম সঙ্গতিভ অভিনয় করেছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রটি হল অমল দত্তের 'রাজু'। নাটকটির অন্য দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে ছিলেন চন্দী ভট্টাচার্য ও আরতি ঘোষ।

পরের নাটক 'পাতা কবে যায়' মনস্তত্ত্বের আলোকে লেখা। মূলত তিনটি চরিত্রশিল্পীই এই নাটকের গতিবেগে প্রাণ দিয়েছে। এই তিনটি চরিত্রে প্রাপকত অভিনয় করেন রাজিত মন্ডল, শম্ভুনাথ সাহা, উৎপল দত্ত। নাটকের অন্যান্য শিল্পীতালিকায় ছিলেন শ্রুত লাহিড়ী, অখীর ভট্টাচার্য, অরুণ বড়ুয়া, ভোলানাথ বিশ্বাস, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন মন্ডল, আশিস বসু, বুল্লা ভৌমিক।

**ভিক্টর :** নীতিহীনতা, প্রচণ্ড লোভ ও মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় আমাদের সমাজজীবনকে একদিকে যেমন আক্রমণ করে ফেলতে চাইছে, তেমনি অন্যদিকে আমরা চাইছি এই অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে উত্তরণ, যেখানে আমরা আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধে গড়ে উঠতে পারবো। রচিত রচিত 'ভিক্টর' নাটকটি বোধ হয় এই দিকেই ইংগিত দিয়েছে। নাটকটি সমস্যা তুলেই শেষ হয়ে যায়। সমাধানের বেশ কিছু আভাসও আছে এই নাটকে। জীবনরস সম্বন্ধে এই নাটকটি কিছুদিন আগে 'কালীগঞ্জ শিকাসদন' মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'সোউড অফ মিউজিক' গোষ্ঠীর শিল্পীরা। প্রয়োগপরিপক্কতার বেশ কিছু নৈপুণ্যের স্বাক্ষর লেখেছেন সত্যরঞ্জন বসু।

সুপ্রযোজিত এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন গোপাল রায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, শঙ্কর নাগ, দিলীপ সেনগুপ্ত, বৃন্দাবন গুহ কমল সান্ন বিজিত বোস, জ্যোতিষ ভৌমিক, কলাগাঁও দেব, অসীম চ্যাটার্জি, বিজয় মন্ডল।

**ফেরারী ফোজ :** গত ১১ ডিসেম্বর, '৭২ কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব (ইস্টার্ন রেলওয়ে, চিৎপদুর) তাদের দশম নাট্যাচার্য উপলক্ষে উৎপল দত্তের মঞ্চসফল 'ফেরারী ফোজ' নাটকটি সুহাস ভট্টাচার্যের দক্ষ পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গো অভিনয় করেন। এদের দলগত সংগতি প্রশংসনীয়। অভিনয়ের বিচারের দিক থেকে হিতেন দাশগুপ্তের চরিত্র-চরণে বলরাম রায় সর্বোত্তম। শ্রীমতের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চোখাবার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের অভিনয় মাধ্যমে চরিত্রটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তাকে মানিয়েছেও চরিত্রানুগ। এর পরই উচ্চমানের অভিনয় করেন নারায়ণ গাঙ্গুলী (জ্যোতির্ময়), শৈলেন মজুমদার (মোহন) ও হরিশঙ্কর চক্রবর্তী (অশোক)। বথায়মে বংগবাসী ও রাধা চরিত্রে চিত্র ও মঞ্চমুখ্যতা মলিনা দেবী ও নীলিমা দাস স্মরণীয় অভিনয়ে তাদের পূর্বে যশ অক্ষয় রাখেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসার দাবী রাখেন— সুহাস চক্রবর্তী, অশ্বিনী ঘোষ, হিরণ্য চ্যাটার্জি, মাখন দত্তচৌধুরী, সরোজ শোষার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সমাজপতি, নবী রায়, মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, দেবু সান্যাল, হরিপদ পাল ও অখীর কর। রত্ন বড়াল স্ত্রী-চরিত্রে লচী ভূমিকায় তার সম্ভাবনাময় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। শ্রীমতী বড়ালের স্কট লচী, বহুদিন মনে রাখার মত। গোপা চরিত্রে শিশু-শিল্পী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী স্মরণীয় করে। মৃকুল দাস এর চরিত্রে অলোক বাগচী তাই কণ্ঠসঙ্গীতে দর্শকচিহ্ন জর করতে সক্ষম হন। আলোর কাজ বথায়মে। স্বর্গ ও আবহসঙ্গীত সুপ্রস্তুত।

### দাহাজান অভিনয়

অ্যালায়েন্স অ্যান্ডরেন্স গ্রুপ এম'লয়জ ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি 'বম্বর' মঞ্চে অভিনয় করেন বিজয়লাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'দাহাজান'। স্বংগা

নাটকের ইতিহাসে 'দাহাজান'-এর অভিনয় প্রবাদ বাক্যের মতো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে। তাই এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার নিপ্রয়োজন। বা কলার দাবি রাখে তা হলো এদের অভিনয়। অফিস দলে এরকম শান্ত-শালী নাট্য-প্রযোজনা খুব একটা চোখে পড়ে না। সেদিনের অভিনয়ে নাটকের চরিত্রের অন্তর্লীন নির্ধারিত প্রতিটি দশকের অন্তর স্পষ্ট হবে। প্রথমেই উল্লেখ করতে

শ্রুতরম্ভ শ্রুতবার  
১৯শে জানুয়ারী!

দুই ছবি  
উপলব্ধ  
বিশেষ  
এ ছবি  
গল্প

অরবিন্দ মুখার্জীর  
বৈদ্যবিক্রম প্রেক্ষা

কল্যাণ

বাংলা চলচ্চিত্রের  
২০৮তম  
শিল্পী ও কলাকর্মী  
স্বনামে অভিনয়  
করেছেন

সংগীত  
বৈদ্যবিক্রম

সম্পাদনা : অরবিন্দ মুখার্জী  
চিত্রগ্রহণ : বিজয় বোস  
প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপতি  
গদে : হেমন্ত - কল্যাণ -  
অনুর - কল্যাণী - স্বংগা দাসগুপ্ত  
বসুধী - বাণী -  
এবং অন্যান্য ১৫টি চিত্রগ্রহণ  
০ পরিবেশনা : মিলি শিকল

হর সাজাহান চরিত্রাভিনেতা শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। পুত্র নেহাথু সজ্জার চরিত্রের এটি একটি সাব্বক রূপায়ণ। তাঁর ছাটী, চলা, কথা বলার ভাষা উক্ত প্রশংসার বর্ণ্য রয়েছে। তারপরেই যার কথা আসে তিনি হলেন শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঔরংজেব চরিত্রে তার অভিনয় সহজ সুন্দর এবং স্বাভাবিক। জরসিংহ চরিত্রে রাধাকান্ত ভট্টাচার্যকে ভাল লাগে। কিন্তু নাটকের অন্যতম মধ্য চরিত্র দিলদারের ভূমিকায় শ্রীসন্তোষকুমার দাস অত্যন্ত খেলো অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্র যখন অভিনয় কুশলতার সীমিত সাড়া জাগিয়েছে তখন এই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতান্ত নিশ্চয় মনে হয়েছে। এই চরিত্র যাদু দিলে সাজাহান নাট্য প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণে সাব্বক হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে সুনীতিকর উল্লেখের দাবি রাখেন সর্বশ্রী অলোক মিত্র, সখীরকুমার হালদার, শ্যামল ঘোষ প্রমুখ।

পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন চলচ্চিত্র-খ্যাত শ্রীহারদীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

#### অভিনয় :

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাব বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় শতবর্ষ পূর্তি ও কর্মীদের গ্রন্থাদান বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রূপনার প্রথম নাটক অভিনয় করেন ২৭ ডিসেম্বর। পরিচালনা করেন সিন্ধুপুত্র ভট্টাচার্য। যোগেশের ভূমিকায় অরুণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশের ভূমিকায় হীরেন্দ্রকুমার বসু, সুন্দর অভিনয় করেন। অজিত ঘোষ, দেবদীপ সেন, হর-

প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ দাস, সত্যেন চৌধুরী, জয়দেব সাহা, চিত্রিতা মন্ডল, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, মেনকা দাসের অভিনয়ও উল্লেখ্য করার যত।

২৯ ডিসেম্বর 'পথের দাবী' পরিচালনা করেন সিন্ধুপুত্র ভট্টাচার্য। হীরেন্দ্র-কুমার বসু, রবীন্দ্রনাথ রায়, অরুণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, জয়দেব সাহা, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত দাস, সত্যেন চৌধুরী, রাধাবল্লভ দাস, বিজয় চক্রবর্তী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, ইরা মিত্র, মেনকা দাসের অভিনয় বিশেষ ঝগ কেটে যায় দর্শকদের ওপর।

স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ : বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে চালিশহর স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেন দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ। পরদিন যুগপূর্তি উৎসবে এই সংস্থার শিল্পীরা আরও মঞ্চস্থ করেন সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নবাবন', অজিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রংয়ের দিন'। এদিন নৈহাটীর সন্তর্ষি নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করেন রতনকুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধান'। উভয় দিনের অনুষ্ঠান স্থানীয় দর্শকদের মনো-রঞ্জন সমর্থ হয়। স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপের তরফে নাটকগুলি পরিচালনা করেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। উক্ত সংস্থার আয়োজনা অষ্টম বার্ষিক একাংক নাট্য প্রতিযোগিতাও এবার যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য অনুষ্ঠিত হ'ল। স্থানীয় দর্শকরা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করলেন এ-ধরনের অনুষ্ঠান হালি পহরে কোনদিন হয়নি। প্রতিযোগিতার

ফলাফল নিম্নরূপ : সাধারণ প্রযোজনার (১ম) দীক্ষণেশ্বরের 'শৌভিক' এরা মঞ্চস্থ করেছিলেন অমল রায়ের 'কেন না মানব'। এছাড়া এই সংস্থা আরও বে বেসুন্দর পান তা হল : শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গৌতম মৃধোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা মনোরঞ্জন ঘড়া, শ্রীকান্ত শ্রেষ্ঠ পরিচালক গৌতম মৃধোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্যপরিচালনা মনোরঞ্জন রায়। এই প্রতিযোগিতার শ্রীকান্ত ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শিল্পীলোক (ভাটপাড়া) এবং যুগ্মভাবে আদি মৈত্রী সংঘ (নৈহাটী) ও শ্রীকান্ত (কালিকা)।

মহাবত : সত্য কানার্জীর প্রাচীন নাটক 'নববত' সম্প্রতি গ্রীভস কটন রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিবেশন করলেন 'শ্রীকান্ত' রূপায়ণে। হীরালাল ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সুনীতিকর এই নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন প্রকৃতি সাহা, অতীশ চক্রবর্তী, হীরালাল ভট্টাচার্য, সীতানাথ পাল, অরুণ চক্রবর্তী, সত্যেন দত্ত, দীপক বসু, দীপেন সরকার, প্রণব ঘোষ, রত্না ঘোষাল গীতা নাগ, অনল সরকার মানিক ভট্টাচার্য যুগল পাইন, পরেশ বানার্জি কানাই পায়, তীর্থ চ্যাটার্জি, সমর পাল, কবিতা সুর।

নীলদর্পণ : দীক্ষণ-পূর্ব রেলপথের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রামাটিক ক্লাব সম্প্রতি 'নীল-দর্পণ' নাটকটির অভিনয় করলেন 'রবীন্দ্রসদনে'। নাটকটির নির্দেশনায় বীরু মৃধাজি অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। প্রধান চরিত্রগুলোতে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন বিজুতি ঘোষ, গৌর শ্রীমান, সুকুমার মাইতি, পি কে মন্ডল, কল্যাণী অধিকারী, অনুরাধা গুপ্তা, প্রভাত ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্যামবতী রায়, গীতা কর্মকার।

অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন হরদেব মৃধাজি, নিরঞ্জন দত্ত, দিলীপ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, দেবু রায়-চৌধুরী, রমেশ বসুচৌধুরী, বিলু মৃধাজি, মঞ্জুশ্রী বসু, অমর ঘোষ, প্রবু বিশ্বাস।

পাথরের চোখ : শতীন ভট্টাচার্যের 'পাথরের চোখ' নাটকটি সম্প্রতি 'প্রতাপ' মঞ্চে অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন 'রঞ্জাশিল্পী নাট্যগোষ্ঠী'র শিল্পী সদস্যরা। নাটকটি যে পরিবেশনায় সুলভ হয়ে ওঠে, তার জন্য প্রশংসা যেমন নির্দেশক রবীন্দ্র কুমার দাবী করতে পারেন, তেমনই তার একই রকম কৃতিত্বের অধিকারী শিল্পীরা।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন বন্দনা বিশ্বাস, প্রভাত মৃধাজি, গণেশ ঘোষ, অমিতাক মৃধাজি, রবীন্দ্র কুমার, রাধাকান্ত করণ, দুলাল দে, প্রভাত সরকার, বীরেন দাস, লাহা দাস, অশোক মজুমদার, খোকন মৃধাজি।

## ১৯শে জানুয়ারী থেকে !

রাজকীয় বদান্যতার সর্বস্বান্ত পিতা—  
রাজকীয় পরাক্রমে পুনরুদ্ধারে পুত্র—  
রাজকুমারের এক অসামান্য বংশ-ভূমিকা !

রাজ কুমার • লীনা চন্দ্রসরবর ও ওয়াহিদা রহমান

# দিলে কারাডা



রচয়িতা এ.এ.নাসিরুদ্দীন ওয়াহিদা রহমান

ম্যাজেস্টিক - গ্রেস - মিত্রা - গণেশ - ছায়া - কালিকা

ভাবানী - পারাডাউস - ন্যাশন্যাল - পি.সন

স্ট্রীট - জমা - সম্মা - অতীন্দ্র - শ্রীলক্ষ্মী - শ্রীকৃষ্ণ - নবরূপম

কপদনা - পিকার্ডি - জয়ন্তী - দীপক - শ্রীকৃষ্ণ (চন্দ্রনগর)

নিউ লিনেয়া (আসানসোল)



# জলসা

## অবিস্মরণীয় বঙ্গলবঙ্গী

সিংহী পার্ক চলিতকা অসংজ্ঞিত আলি আকবর ও রবিশঙ্করের বঙ্গলবঙ্গী সঙ্গীতজগত এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ একাধিক।

প্রথমতঃ বহুদিন যাবৎ এদের বঙ্গলবঙ্গী। দ্বিতীয়ত বহুদিন যাবৎ সেই প্যাঞ্জেলে এই ধরনের অনুষ্ঠান শোনা গেল, যে প্যাঞ্জেলে অব্যবহৃত সঙ্গীত ও পর্ববেশ বিশৃঙ্খল কণ্ঠের পক্ষে যথেষ্ট। প্রবেশপত্র তৈরি শীতের সম্মুখ পটভূমিতে কোমোরকম ছাউনির অভাবে এবং নব্বই চীন সীটের অবদোষেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় চার হাজার দর্শকের প্রবেশের একটিই স্থান, যা আধহাত করে খুঁলে এক একজনকে প্রবেশ কবানো হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশে সঙ্গীতানুগামীদের পূজার মত নিষ্ঠাকে আর একবার বিস্মিত প্রাথমিক প্রত্যক্ষ কদল্যাম। আর দেখলাম কি অপরিমিত প্রাধা তাদের আলি আকবর ও রবিশঙ্করের ওপর। তাই এখনকার এই অস্থিরতাব যুগেই এই অস্থানসাধ্য পরিকল্পনাও এরা নীরবে, অবিচলিতচিত্তেও মানিয়ে নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন তাদের বড় আদরের শিল্পীবৃন্দের কাজনা শোনবার জন্য। শিল্পীরাও অগণিত ভক্ত-

বৃন্দকে যথোচিত মর্যাদা দেখেছেন। অনুপ্রোক্ত শিল্পীদের বাজনা মধুরাভেব সীমাক্রান্ত অতিক্রম করেছে অব শ্রোতা বা উপভোগ করেছে প্রতিটি মুহূর্তেও যে মগ্ন। কখনও সমুদ্রের ঢেউএব মত কত জগদেব লয়েও ওঠপড়-এই মহাশিল্পের নানাবহু বাগো ভাবায় ল'। বলাবলি। এতদবাব সঙ্গীতানুগামী শ্রোতাদের জীবন এমন মুহূর্ত বড় এতটা আসে না।

শুধু হোলা মাঝরা' বাগের আলপ দিল্লী। পূর্বমিত পবিসংগীত আধাবে এরা মেলে ধরলেন অসীম বাজনা। বিলম্বিত অগ্নের সুবিস্তার কখনও একটি কখনও দুটি স্বরবে রম-উন্মীলনে সুস্বাদু সঙ্গীত প্রদত্ত কখনও অক্ষুণ্ণ হ'দু অনঙ্গনে কখনও মধুর বাগবুপ আভাসিত হোলা ভাবতীয় ধূপদী ঐতিহ্যের শৃঙ্খল। জোড়ের অগ্নি হৃদ ও সুখের বিন্যাস উৎসব কল্পনাব বিপুল বিস্তারের ইন্দ্রধন, যেবা অপ্রমিত যেন মৃত হ'য় ওঠে। ক্লাসিকাল মর্যাদার সঙ্গে রংরাভাবের অভিনব সমাবেশ দুই সৃষ্টিধর্মী শিল্পী তাঁদের সঙ্গীতভাবনার মূঠো মূঠো ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিলেন।

ভাবল অবক হ'য় যেতে হয়। কহেরেব পব বহুব বৈদেশী পর্ববেশে বিদেশী শ্রোতাদের মধ্যে থেকেও ভাবতীয় সঙ্গীতের অন্তর্মুখীন ধ্যানলোকে এক লহমার পৌঁছে গেলেন কেমন ক'ব গুরুব অশীর্বা? দীর্ঘদিনের অনলস সামনা? না, বিধিদত্ত অলোকসম্ভব প্রতিভা? হয়ত এতগুলি সম্পদের এই

'বরল সম্মুখেই সঙ্গীতজগতে এরা এমন আশ্চর্য ঘটনাতে পানেন।

জোড়ের অগ্নি বিন্দুখেলের মত আলি আকবর সাপটের উত্তরে রবিশঙ্করের ডু'ডুর তবের গমক রবিশঙ্করের মূছোর মত নিটোল জমজমাব নৃত্যরেশের সঙ্গে সব মিলিয়ে আলি আকবরের আলো প্রকাশকুণ্ড লাজুক বেদন র রসসিঁদু ছাপা আবেগ যে বৈপবীতের কৈচিৎ সৃষ্টি করেছে তা যেন বিভিন্ন ধারনের আর একটি কবিতা। আর নানা পর্ব বাগের আখ্যানিক মর্যাদা যেন কেদ্রীভূত রসের মতই সকল সৌন্দর্যকে এক সংহত গান্ধীর্ষে ভূষিত করেছে। বিশেষ করে রেখার ধৈর্যের প্রাপ্য মিটিয়েও মাএব সাসংগত বজায় রাখা আর সকলকে চমকে দিয়ে আকর্ষণকর শ্রোতাদের চিত্তকে দলিয়ে দিয়ে আলোভা-ভাবে পা'ব ফেবার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের হাসি বিনম্রব মুহূর্তে ওগের মনে হয়েছে গম্ভীরলোকের বাসিন্দা, সঙ্গীত বিহাবই যারা বেঁচে থাকেন।

কিতীয় রাগ 'দেশ'। এ রাগে কিছ-বেদনা আছে কিন্তু সেটা যেন দলিতের জন্য দলিতার নয়, বরং যেন বঙ্গের। অবেগমধুর আকুলতার তীব্র দুই শিল্পী-বন্ধু যেন এসে পৌঁছলেন, বহু ব'গ বাধে। আর দীর্ঘদিনের অদর্শনের উন্মেষ আতি কখনও বেখাব গম্ভীর গমকে ধীরে সঙ্গীত কল্পনায় যে সমস্ত পৌছোঁল তা কি কল্পনাতে অন্তে পাবতাম যদি না সে কল্পনাকে সৃষ্টি করে মেলে ধরতেন স্বয়ং আলিরা? আলি আকবরের এক

একটি 'বাজ' যেন গৃহ্যর ভেতর থেকে লমগম করে উঠছিল, সেই নাদধ্বনিকে নানান অলংকারে সাজিয়ে দিলেন রাবলঙ্কর। চোখের সামনে যে রূপ ভেসে উঠল তা শব্দ 'দেশ' রাগেরই রূপ নয়,— এ হোলো আলি আকবর রাবলঙ্করের মিলিত শিল্পরূপ, যা সঙ্গীতভবনার মূর্তি। এর পরেই এলেন 'মামু' শিল্পী-তে ভালবাসার মধুরতম অধ্যায়ে। এখানে প্রেমিক-প্রমিলা নানা উচ্ছ্বাসের কত না রংবাহার। কখনও জাতিবাদের ধ্যানে বিভোর, কখনও ছাত্র-নটেব নৃত্য-উজ্জ্বল, কখনও শিবরঞ্জনের রোমান্স আবাস বাহারের নৃপুণধ্বনিতে দুই শিল্পী রং ও রসের অফুরণে উৎসাহের সীমায় উঠে বিশেষ অনুরোধে সমাপ্ত করলেন 'সিদ্ধ' ভৈরবী'র 'সিদ্ধ' পূর্ণনাথ।

আর আলা রাধা? দুই শিল্পীর বাঙা হৃদয়কে ছপের মেল-বাধন বোধে আনন্দবজ্রক পূর্ণ করলেন। তাই কসিলাস, এমন সার্থক মূহুর্ত প্রোভাদের জীবনে দুলভ।

গান্ধালি কলেজ অফ মিউজিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান: ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জমে উঠেছিল গান্ধালি কলেজ অফ মিউজিকের বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনের মধুর সুর ও ছন্দে। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই অনুষ্ঠান। রস উপভোগ ছাড়াও সঙ্গীতমত্ত কলকাতায় শিল্পীরা তাঁদের শিল্প ও সাধনায় কতটা এগিয়ে চলেছেন তারও একটা হিসেবনিকশ পাওয়া গেল।

প্রথম সন্ধ্যায় আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন মণিলাল নাগ। ইনি বাজালেন হেমস্ত। বর্তমান তবণেতর গোষ্ঠীর স্বপ্নবাদকদের মধ্যে মণিলাল এর মাথায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন— শব্দ প্রতিভার কাবলেই নয়—অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রসাদে ইনি এগিয়ে চলেছেন এক বিশেষ জরাজয় এসে স্থায়ী যান নি। এবং সম্বন্ধে এইটিই হল পরিবেশনযোগ্য সংবাদ।

দ্বিতীয় ইনি বাজান 'হেমস্ত'। শব্দ আল উদ্ভিদ সন্ট এই বাগ আলাউদ্দিন হাবানাথ সকল বৈশিষ্ট্যই পরিবেশিত করেছে। বাগের ভাবেব প্রতি সত্যক প্রহরা রেখেছেন। এই পরিমিতবোধেই যথার্থ শিল্পীমনের পবিত্র মন্ত্রিত্ব ছিল। আর এই শিল্পবোধকে যথার্থে পথে পরিচালিত করেছে ওস্তাদ কেবাম হাং বহল সংগত। আসর সুর হয তপন সন্ধ্যাপাধ্যায়ের গ্রুপ দিয়ে। রাগ 'শিবরঞ্জনী'।

তৃতীয় বাগ 'শিবরঞ্জনী'। পবিত্র কেনন ক'বন শ্রীশা সন্ধ্যাপাধ্যায়। এর বিস্তারিত আলোচনা এতদূর। তবে মনু ও মহাসম্পদে কঠোর বতটা ওজন আছে ওপবেব শিল্পের বর্ণনাবাহারে সে ভাব-সাহা ছিল না। এদিকে লক্ষ্য রাখলে যথার্থে যোগ্য মানে পৌঁছতে এবং দরদী হব না।

পূর্বসূরী সন্ধ্যাপাধ্যায় পরিবেশিত 'কদম্বা' বাগের 'খয়াল আমীর খান' গায়নশৈলীর বিশেষত নজীর বিদ্যমান

ছিল। তবে আর একটু যদি বিস্তারে অনুপ্রবেশ ঘটত এর সম্বন্ধে কিছুই কলার থাকত না।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ছিলেন এ রাগের প্রতীকিত শিল্পী। কোষী-কানাড়ার আলাপ জোড় বালা ও রাগের প্রতিটি পূর্বে গুরু আলাউদ্দিনের বাদনশৈলীর পূর্ণাঙ্গ এবং অনুশীলিত পরিচয় ছাড়াও যে কণ্ঠটি প্রোভাদের মন কেড়েছে তা হল শিল্পীর রঙিন মনের আবেগ। অমর দেব তবলাসংগতও সুন্দর।

শেষ দিনে কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন রুক্মিণী সেনগুপ্ত। রাগ 'নন্দ'। এর বাগ বিশ্লেষণ স্বচ্ছ। কণ্ঠও সুরেলা। শব্দ উচ্চারণে আর একটু যদি খালা আওয়াজ হত। এর সঙ্গে তবলাসংগতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন সার্থক, বর্মানন্দ।

শেষ অনুষ্ঠান মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক নৃত্য শিল্পীর উজ্জয়ন বজায় ছিল। অমর দেব তবলাসংগতে যতীন ভট্টাচার্যের সুবোধে 'কোষী-কানাড়া' বেশ জমে উঠেছিল। মৃণাল্যর খাঁ মালকোশ পরিবেশনে তাঁর স্ব-মানে পরিতৃপ্ত ছিলেন। বৈহালার রবীন বাঘেব 'নটভবন' আনন্দ দিয়েছে বাগ-জ্ঞান ও যান্ত্রিক মনসি রানাব বৃন্দ আকর্ষণে। রবীনবাবুর শাস্ত্র মজাটি সকল তরুণ শিল্পীর অনুকরণীয়।

শেষ রাতে প্রাক্ত শিল্পী এ কাননের 'ভাটিয়াল' বাগে সঙ্গীত চিন্তা ও পরিবেশনের এক সুদৃঢ়, বৃপ মোল।

আসবেব সর্বশেষ এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পী শ্রীশ্যাম গণ্ডোপাধ্যায়। তবলায় কেবামভুল্লা খাঁ বাগ বসন্ত মূখাবী। পবিত্রত মানের চিন্তা দৃশ্য গম্ভীর বোল কপনাসম্বন্ধ বিস্তার ও তানে শ্যামবাবু সঙ্গীত সাধনায় উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণিত হয়েছে।

কলেজের ছাত্রহাতীদের মধ্যে যারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁরা হলেন মনোজ পাল (সেবাদ) মীরা মেহতা (সেতাব) নিমলজম্মার গান্ধালি (বেলালহরা) প্রবীণ ভট্টাচার্য চঞ্চল ভট্টাচার্য, কিবনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কিলুং বন্দোপাধ্যায় (তবলা)।

#### সৌরভের জন্মদিন :

দক্ষিণ বলকাতার সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান সৌভৈর্য প্রাতিষ্ঠানবস পালনোৎসবের উন্মোচন করে শ্রীসুকুমলকান্তি মোহ বলেন 'মায় চাব বছরেই সৌভ' সঙ্গীতমহলে নিজেকে শব্দ সুপ্রতিষ্ঠিতই নয়, আদর্শগায় করে তুলতে পেরেছে। এর মূলে আছে প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তবয়স্ক শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের এবিধ পবিত্র অধ্যবসায ও অন্তর্ভবের বিরাট স্বপ্ন। এর সধনা সফলতব পবিত্রতব পণ এগিয়ে চলুক, এবং ধ্যান-ধারণার সম্পর্কতার পৌছাই —আজকাল দিনে এই সম্মান প্রার্থনা।

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল তাঁর আনন্দোজ্জল কাণে সজায় যেন প্রাণের জোয়ার প্রবাহিত করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠান সুর হয লগিতা ঘোষের গান দিয়ে। গানে কেন বিশেষ ব্যানারিজম ছিল না। ছিল না সাধের অতীত কোন অসম্ভব কঠন কারাগারী দেখানোর মূল ওস্তাদগানা। সহজ, সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাষাতে পরিবেশিত ভজন, গীত ও দাদরা সুরেলা কণ্ঠের অনুব্রণ এক মনোহর পরিবেশ রচনা করে। শ্রীজ্ঞান-প্রকাশ ঘোষের তবলাসংগত ছিল এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

পরের অনুষ্ঠান হস্তসঙ্গীতের। শিল্পী কল্যাণী রায়।

ঠিক এই সময়েই আসবে প্রবেশ করেন জাপানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা। টেপ-রেকর্ডের আধুনিকতম মডেল নিয়ে হেডফোন কানে দিয়ে একাধারে এদের অনুষ্ঠান রেকর্ড করা ও ত্রিবিধ করা দেখাব মত।

কল্যাণী রায় সুব্দ কবেন 'কার্ফি-কানাড়া' দিয়ে। বাগিন শ্রীজন মাধব কানাড়ার গম্ভীরব 'স্পর্শ' যে সংযত রূপলোকে পৌঁছেছিল তাব মধ্যে শব্দ শিল্পীর হৃদেব কারুকাঁতই নয় গভীর-বোধের জাপটিও ছিল বলেই সকলের উজ্জিসিত অভিনন্দন পাবেছে।

দ্বিতীয় রাগ 'পিলু'। এনায়েৎ খান হরানার সেই পবাতন বঙ্গজ অতীতব পদ টেনে মজলসী আসবের ছবিখানি যেন দর্শকের চোখের সামনে মলে ধবে।

কিভাবে অনুরোধ ইনি একটি লোক-সংগীতেব মিষ্ট শব্দ বাজিয়ে আসর সমাপ্ত করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জ্ঞানবাবু সুযোগ্য শিষ্য তরুণ তবলাবাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রথম নামী শিল্পীর সঙ্গে বাজাবার সুযোগ দেওয়া আব অনিন্দ্য এ সুযোগের অপব্যবহার করেন নি এইটেই পরিবেশনযোগ্য সংবাদ। আগব চেয়ে তাব বোল আরো সম্পট। কানীর কাজে সবেব ছেঁয়াও লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় দিনে ছিল প্রধানতঃ শিল্পী উৎসব। নমিতা চট্টোপাধ্যায় ও দীপালী বাঘেব নতাপরিচালনায় বিশ্বদেব নাচ-গুলি বড়দেব চিত্রও আনন্দে নটিয়ে দিয়েছে। নৃত্যের বিষয় ছিল স্ক্রুয়ার রাঘের আবোল-তাবোলের 'গাথবিচার', 'নেড়া বেলতলার যাব কবাব', 'ফেরী-ওয়াল'। শিল্পীরা প্রকৃতিব সবচেয়ে কাছের। তাই আনন্দ হাসি উল্লাসে তাদের সাড়া দেওয়ায় সহজ সুন্দর বৃপটি প্রকাশ পাবে। প্রায় প্রতিটি শিল্পীশিল্পীর গভীর সাবলীলতা আনন্দ ভাঁড়িয়েছে।

উপরি পাওনা হিসাবে শোনা গেছে, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কণ্ঠের ছড়াগান।

জ্ঞানবাবু গান্ধী সঙ্গীতব নানান লক্ষণ পবিত্র স্থানীয়। কিন্তু বড়গান ও কৌতুকগীতেও তাঁর শিল্পসুজাত অভিব্যক্তি এমন মনোবম এ খন্দ অভ্যাসে থাকে যেত যদি না সঙ্গিনব অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনার সুযোগ ঘটত। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এই দিকটির সাঙ্গো আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সৌরভের কণ্ঠপঙ্খ ধন্যবাদার্থ।

—চন্দ্রশেখর



# স্বাধীন ভারতের খেলাধুলা

কমল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাধীনতা অর্জনের পর পঁচিশ বছর পূর্তির লগ্নে ক্রীড়ামোদী জনগণের মনে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হলো, এই পঁচিশ বছরে খেলাধুলার আসরে ভারত কতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে? অস্বীকার করার উপায় নেই, খেলাধুলার জগতে এই পঁচিশ বছরে আমাদের অগ্রগতির ক্ষেত্র সীমিত; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা শিচ্ছ হটে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা উত্তর পঁচিশ বছরের খেলাধুলার ইতিহাসের অনেকখানিই নৈরাশ্যবাক্যক। উত্থানের ক্ষেত্র সীমিত, পতনের ক্ষেত্র সেই তুলনায় ব্যাপক। পঁচিশ বছর আগে বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে যে সব দেশ ছিল পিছনের সারিতে, হ্রত উন্নতির সোপান বেয়ে তারা আজ আমাদের নাগালের বাইরে এগিয়ে গিয়েছে। এই সব দেশের চোখ-খাঁধানো অগ্রগতিজ্ঞ আলোকে ভারতের কী অগ্রগতি চোখেই পড়ে না।

ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় দল সর্ব প্রথম অলিম্পিক আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হুঁ দ'টি পেনাল্টির সুযোগ অস্চল্লের ফলে ক্রসেসব কাছে ১-২ গোলে পরাজিত হলেও ভারতীয় ফুটবলের মান সম্বন্ধে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। ১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ভারত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে অস্পন্ন জন্য রোজ পদক আমাদের হাতছাড়া হয়। ভারত শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থান পায়। ১৯৬০ সালে ভারত প্রথম রাউন্ডেই পরাজিত হয়। এবং পরবর্তী তিনটি অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল পর্যায়েই উঠতে পারেনি।

এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত ১৯৫১ এবং ১৯৬২ সালে বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৬২ সালে প্রতিকূল পরিবেশে ভারতের জয় নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯৬৬ সালের পর থেকে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারত কোন ক্রমেই এগুতে উঠতে পারেনি। ব্রহ্মদেশ বিগত দুটি এশিয়ান গেমসের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন। এই ব্রহ্মদেশের কাছে ০-৯ গোলে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ফুটবলের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের মাথা কুটী গেছে।

পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ফুটবলে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, তাইল্যান্ড, ইন্দো-নেশিয়া, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া বোঝানে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, সেখানে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি পিছনের সারিতে। অথচ ফুটবল নিয়ে কী মাতামাতি এবং হে-হুয়োড়-ই না হয় আমাদের দেশে।

আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ৯০ মিনিটের খেলা, বৃট পরা আবশ্যিক করার ভুলে আমাদের নিজস্ব ক্রীড়ারীতি পাল্টাতে হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলাই প্রত্যাশিত। সেই সূত্রেই চার ব্যাক প্রথা এবং অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু টেকনিকই তো সব নব। দলগত সংহতি এবং গোলে শট নেওয়ার ব্যাপারে দুর্বলতার সংক্রামক ব্যাধি থেকে কি আমাদের পরিচালনা নেই?

বিশ্ব হকিতে ভারতের দীর্ঘ বচিশ বছরের একাধিপত্য খর্ব হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কেনিয়া, উগান্ডা, পোল্যান্ড—প্রতিটি দেশ অক্লান্ত অনুশীলন ও অধ্যবসারে মূলধন নিয়ে হকিতে প্রভূত উন্নতি করেছে। তাছাড়া ভারত-দেশের বিচ্ছিন্ন অংশ পাকিস্তান হকিতে ভারতের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে (০-১) ভারতের পরাজয়ে ফলে হকির স্বর্ণ পদক প্রথম হাত ছাড়া হয়। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে গ্রুপের খেলায় জার্মানী ও স্পেনের সঙ্গে ড্র করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ভারত হকির হ্রত সম্মান পুনরুদ্ধার কবোঁছিল। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে গ্রুপের খেলায় নিউজিল্যান্ডের কাছে পরাজিত এবং স্পেনের সঙ্গে খেলা অসমীয়াসিত রাখলেও ভারত সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। কিন্তু সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে (১-২) পরাজিত হওয়ার সোনা বা রূপো কোনোটাই ভারতের ভাগ্যে জোটে নি। তৃতীয় স্থান নির্ধারণ খেলার পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে রোজ পদক নিয়েই ভারতকে ফিরে আসতে হয়।

১৯৭১ সালে স্পেনে বার্সেলোনা শহরে প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় আসরেও সেমি-ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকে গ্রুপ খেলার হল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং কেনিয়ার সঙ্গে খেলা অসমীয়াসিত হলেও ভারত সেমিফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু একসঙ্গে পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে ভারতের স্বর্ণ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়। আর পাকিস্তানকে পরাজিত করে সর্ব প্রথম ইউরোপীয় দেশ পশ্চিম জার্মানী হকির স্বর্ণ পদক বিজয়ী হয়। হল্যান্ডকে পরাজিত করে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করে। অর্থাৎ, সোনা গেলো, রূপো গেলো, আমরা আজ রোজে এসে ঠেকছি। অদূর ভবিষ্যতে তা-ও বদলি যায়-যায়। আর আমাদের তুলনায় অন্যান্য দেশ কতখানি এগিয়ে এসেছে, একবার চিন্তা করুন।

খেলাধুলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের ফলাফল আশাপ্রদ নয়। হেলসিংকি অলিম্পিকে কুস্তির আসরে ভারতীয় মল্লবার কে ডি বাদব সর্বপ্রথম রোজ পদক বিজয়ী হন। অলিম্পিকে হকির বাইরে সেই আমাদের প্রথম পদক প্রাপ্তি।

১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে অ্যাথলেট মিলথা সিং, 'উড়ন্ত শিখ' নামে যার পরিচিতি, ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করলেও, তাঁর স্থান ছিলো চতুর্থ। টোকিও অলিম্পিকে গুরুবচন ১১০ মিটার হার্ডলস রেসে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। অ্যাথলেটিকসে ভারতের উন্নয়ন করার মত আর কোনো নজর নেই।

অলিম্পিক ম্যাটবন্ধে ১৯৪৮, ১৯৫২ এবং ১৯৭২ এই তিনবার ভারত অংশ গ্রহণ করে। মিউনিকে মনোম্বামী ডেন্ড, যিনি ১৯৭০ সালে এশিয়ান গেমসে রৌপ্য পদক জয় করেছিলেন, কোয়ার্টার ফাইনালে পরেই পরাজিত হন। ভারতীয় হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন। তেহরাণে অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশীয় ম্যাটবন্ধ প্রতিযোগিতায় (১৯৭১) স্বর্ণ পদকের অধিকারী নারায়ণান এবং মেহতাব সিং-ও পরেই পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন।

এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমস মিলিয়ে ভারত এপর্যন্ত ২২টি পদক (৩২টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ৩৩টি



জয়) বিলম্বী হয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মঙ্গলবারের আঁতড় পলকের সংখ্যা ৫৪ (১৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য এবং ২৫টি ব্রোঞ্জ) এবং মন্টিবোখোয়া এসেছেন ১১টি পদক (৫টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ২টি ব্রোঞ্জ)। যদিও এশিয়ান গেমসের আঞ্চলিকের আমাদেব স্থান জাপানের পরে, কিন্তু পদক বিজয়ের হিসেব খতিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, জাপানের থেকে আমাদেব পদক সংখ্যা অনেক কম।

যাতি বড়ই উর্বর হোক না কেন, শিক্ষিত চাব না করলে প্রত্যাশিত ফসলের আশা করা যায়। আমাদেব বিশাল মেনে ভরসা প্রতিভার অভাব নেই। অসম্মত পরিগ্রহ করে, ধৈর্য ও সহিত্বতা নিয়ে, কর্মতার জন্মলাভ না হলে, আগামী দিনের সারথীদের তৈরী করতে হবে। এতদিন কাগজে-কলমে গণিতগণনা হয়েছে বড়ি বড়ি; টাকাও খরচ হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ হয় নি কিছুই। স্কুল কলেজে আমাদেব মাঝে খেলাধুলোর আন্তর্জাতিক আদর্শ সঞ্চিত করতে হবে, অনধিক সন্তের বছরের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে দ্রষ্টা রেখে গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতা আরো বাড়তে হবে। জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ড প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্র যেখানে প্রতি বছর একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে, সেখানে আমাদেব দেশে ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমস এবং ১৯৬৭ বিশ্ব মন্টিবোখো প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কোম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। বিষয়টি শূন্য নুখেরই নয়, লক্ষ্যমণ্ডল। টোকাও-তে জাপানিদের মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমাদেব পক্ষে যা স্বপ্নেরও অতীত। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার সূত্রে তাদের দেশে সের্ভিয়ার, সুইস প্রভৃতি, জিমন্যাসিয়াম গড়ে উঠেছে এবং খেলাধুলোর মানও উন্নত হয়েছে।

এই পঁচিশ বছরে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় টেনিস স্বীকৃতি লাভ

করেছে। ব্রিটিশ পুষ্টিক ভান্ডার কোম খেলোয়াড় উইলিয়ামসের সেমি ফাইনালে উত্তে পাবেন নি। একবার মাত্র কোর্টের ফাইনালে উত্তেছিলেন পটুস ইন্ডিয়ান। ১৯৫০ সালে উইলিয়ামস প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়দের রুম-ডালিকার পদমণ স্থানে ছিলেন নিলাপ বসু। কিন্তু স্বাধীনতার পর রমানাথন কৃপাল পরপর দুবার উইলিয়ামসের সেমি ফাইনালে খেলেছেন। কৃপাল ভারতীয়-টেনিসের দৈর্ঘ্যবাক্সল বঙ্গের স্রষ্টা। তিনিই আন্তর্জাতিক টেনিস কাপের আসরে ভারতীয় টেনিস দলের বার্তাবাহ। ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে ডেভিস কাপের সেমিফাইনালে পরাজিত হলেও ১৯৬৬ সালে ব্রাজিলকে পরাজিত করে মেলবোর্নে সর্বপ্রথম ডেভিস কাপের চ্যাম্পিয়ন রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারত রানার্স আপ হয়েছিল। টেনিসে জরদীপ মুখার্জী, প্রেমজি লাল, আখতার আলিও যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। কৃপাল-জরদীপের বঙ্গ শেষ হয়েছে; এখন নবীনদের পালা। এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সাক্ষ্য অর্জন না করলেও এঁদের ঘিরে আমাদেব প্রত্যাশা অলঙ্কৃত নয়।

ব্যাডমিন্টনে টিলোকনাথ শেঠ, নন্দ নাটেকার, সুরেশ গোরেল, পদ্মাস দমকের শেষ দিকে খ্যাতি অর্জন করেছেন, টনাস কাপে সংগ্রাহী মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্যাডমিন্টনে অবদার গিহিরে পড়েছি। জাপান অনেক দেরীতে ব্যাডমিন্টনের আসরে অনুপ্রবেশ করে আমাদেব পেছনে কেড়ে এগিরে গিয়েছে।

বিলিয়ার্ডের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন উইলসন জেনস। ১৯৫৮ এবং ১৯৬৪ সালে তিনি বিলিয়ার্ডের বিশ্ব খেতাব বিজয়ী। সাম্প্রতিককালে মাইকেল ফেরেরা, শ্যাম সরোফ এবং সত্যীশ মোহন বিলিয়ার্ডে বিশ্ব মানে পৌঁছতে পেরেছেন।

ভারতের গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছেন ডা করণ সিং।

ব্যাটেলকন, আইসক্র, ডালবল, জিম-ন্যাসটিকস, সীডার, টেবিল টেনিসে আমরা এখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তির অধিকারী হতে পারিনি।

স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে ক্রিকেটে ভারতের অগ্রগতি বিবেচনাতবে সন্দেহীয়। ১৯৭১ সালে ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

স্বাধীনতা লাভের আগে (১৯৪৭-৪৮) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষ তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিৎ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চারটি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলে প্রতিটি সিরিকেট হেরেছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই চারটি টেস্ট সিরিজের দশটি খেলার ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ৪ জয় ০, হার ৬ এবং ৩ ড্র।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ বিগত পঁচিশ বছরে (১৯৪৭-৭১) ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড-এই পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ষোলোটি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় সাত, হার তের এবং ৩ ড্র। এই ২৬টি সরকারী টেস্ট সিরিজের ১১৪টি টেস্ট খেলার ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল : জয় ১৭, হার ৪০ এবং ৩ ড্র।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সাতটি 'রাবার' জয় : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এক এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে এক। অপরদিকে ভারতবর্ষের সত্তেরটি টেস্ট খেলার জয় : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এক, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাত এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই।



সির্জামতে স্ট্রোলিয়া নাম পাঁক-  
তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলার  
অস্ট্রেলিয়া দল রানে জিতে ১৯৭০ সালের  
টেস্ট সির্জামতে ০-০ খেলার 'রাবার' জয়ী

কৃত্তীর দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংসে ৩০৮ রানের মাঝার শেখ হয়। এই দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের ১ম ইনিংসের বাকি পাঁচটা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৩০৬ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ২৮ রান বোপ করেছিল। কৃত্তীর দিনের খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান তাদের ১ম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২৫০ রান সংগ্রহ করে—অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩০৪ রানের থেকে ৮৪ রান কম। লাগের পরই পাকিস্তানের খেলার জাঙ্কন করে—৭৫ রানের মধ্যে মট্টে উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দলের এই জাঙ্কন ঠেকিয়ে রাখেন ৫ম উইকেট জুটি মস্তাক মহম্মদ এবং আসিফ ইকবাল। এই ৫ম উইকেট জুটি এই দিন দলের জিৎ হেলাকান ১১৮ রান তুলে অপরাজিত থাকেন—মস্তাক

নট-আউট ৩১ রান এবং ইকবাল নট-আউট ৪৭ রান।

কৃত্তীর দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংসে ৩০৮ রানের মাঝার শেখ হয় তারা ২৫ রানে এগিয়ে যায়। এই দিনে খেলার পাকিস্তান তাদের শেষ ৬টা উইকেটের বিনিময়ে পূর্বদিনের ২৫০ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান বোপ করেছিল। হারিতে প্রবল ব্যক্তিগতের ফলে কৃত্তীর দিনে লাগের আগে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। মস্তাক মহম্মদ ১২১ রান করেন—টেন্ট ক্রিকেট খেলার তার এটি চতুর্থ সেন্টুরি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম। এখানে উদ্বোধন, তরি চার ভাই মিলে টেন্ট ক্রিকেট খেলার এইভাবে ১১টি সেন্টুরি করেছেন : হানিক ১২টি মস্তাক ৪টি, উজীর ২টি এবং সাদিক ১টি। সরকারী টেন্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই পরিবারের চার ভাই একত্রে ১১টি সেন্টুরি করেছে এমন দ্বিতীয় দলির নেই।

কৃত্তীর দিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের খেলার চরম অর্থতার পরিচর দেখে—তাদের ৭টা উইকেট পড়ে যায় ১৪ রান উঠেছিল। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তানের জয়লাভের সম্ভাবনাই খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কৃত্তীর দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেলে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের তিনটে উইকেট হাতে জমা রেখে মাত্র ৬৮ রানে এগিয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের হাতে আছে ২য় ইনিংসের পুরো খেলা এবং খেলার দুদিন সময়। সুতরাং খেলার গতি তখন পাকিস্তানেরই অনুকূলে।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ১৮৪ রানের মাঝার শেখ হয়। চতুর্থ দিনে মাত্র ৭ রান বোপ হলে অর্থার দলের ১০১ রানের মাঝার ৮ম উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার এই অন্তিমকালে ১ম উইকেট

জুটি দুই বোম্বার খব মাসী ৪২ রান ওয়াকিং খেলতে গলে মাসী ৪২ রান করে। তার ১৫০ রান ১২০ রান উইকেট জুটিতে হেলাকান ১২০ রান বোপ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১৮৪ রানের মাঝার শেষ মট্টে উইকেট (১৪ ও ১০৪) পড়ে যায়। মাসী ৪২ রান করে আউট হন। এর আগে টেন্ট খেলার এক ইনিংস তার সর্বোচ্চ রান ছিল ১৮।

পাকিস্তান খেলার জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫৯ রান তুলতে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ২টো উইকেট খুইয়ে ৪৮ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম অর্থার শেষ দিনে পাকিস্তান যখন জয়মাপ্ত ২য় ইনিংস খেলতে নামে তখন তাদের জয়লাভের জন্য আর ১১ রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ৮টি উইকেট। পাকিস্তান কিন্তু জয়লাভে এরকম একটা সুন্দর সুযোগ হাতছাড় করে। অস্ট্রেলিয়ার কড়া বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের দৃষ্টি ভেদ করে পাকিস্তান বিজয়-মঞ্চে পৌঁছতে পারেনি। পারিস্তানের ২য় ইনিংস ১০৬ রানের মাঝার শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫ রানে হেরে যায়। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে এই ১০৬ রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এ ইনিংসের খেলার সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়ার এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব তাদের দুই শেখ বোলার ওয়াকার এবং লিলির। ওয়াকার ১৫ রানে ৬টা এবং লিলি ৬৮ রানে ৩ উইকেট পান। ওয়াকার তার শেষ ৫ উইকেট পান ৩০টা বল দিয়ে মাত্র রানের বিনিময়ে।

#### সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩০৪ রান (রেডপাথ ৭১ ও এডওয়ার্ডস ৬৯ রান। সেলিম আলতাক ৭১ রানে ৩ এবং সরফর নওয়াজ ৫০ রানে ৪ উইকেট)

৩ ১৮৪ রান (বব মাসী ৪২ রান সেলিম আলতাক ৬০ রানে ৪ ও সরফরাজ নওয়াজ ৫৬ রানে ৪ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩০৮ রান (মস্তাক মহম্মদ ১২১, নাসিরুল গানি ৬৪ এবং আসিফ ইকবাল ৬৫ রান। মাসী ১২০ রান ৩ এবং মোহাম্মদ জায়েদ ৬১ রানে উইকেট)

৩ ১০৬ রান (জাহির আব্বাস ৪৭ রান ওয়াকার ১৫ রানে ৬ এবং লিলি ১০ রানে ৩ উইকেট)

**এস্ট্রোজেন**  
জার্মান ডিঃ (রেজিঃ)

কার্যকর, শোষ, দ্রুতগতিশীল বা, পোড়া বা পোড়ার মা, প্রচুতি কঠিন পিঁড়া কেবল লাগাইলেই সাফল্য বার।

বিনা কাঁচি বিনা মাস্ত্র বোজাও

অন্য পাবলিশার লিঃ-এর পক্ষে প্রিন্সিপাল সরকার কৃত্ত পট্টক স্টেন, ১৪, আমল গার্টার্স লেন, কলিকাতা-৩ হইতে ৩৬৫৫/১১, অনন্য গার্টার্স লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

# নিরুমাবলী

বিদেশ বিক্রীত

## লেখকদের প্রতি

১। অমৃত প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার মূল্য রেখে পাঠ্যকেন্দ্র। অন্তর্গত রচনার খবর প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানান হয়। অমৃত-নীতি রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ভাটকাটিকি পাঠ্যকেন্দ্র না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠার স্পষ্টাকারে লিখিত হওয়া আবশ্যিক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধি হস্তাকারে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃত' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টসীর নিরুমাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কাগজে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

## গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কাগজে সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক।

২। ডি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চিঠি নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কাগজে পাঠানো আবশ্যিক।

## চাঁদার হার

	কলিকাতা	প্রকল্প
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
সাপ্তাহিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ প্র-উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০৫
সাপ্তাহিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

## 'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আমল চ্যাটার্জি স্ট্রীট,  
কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

# অমৃত

Friday 26th January, 1973

শুক্রবার, ১৫ জানু, ১৩৭৩

১৫ পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১৪৮	চিঠিপত্র	
১৪৯	সম্পাদকীয়	
১৫০	সেতাজী ভবন	—শ্রীগোরালা ভৌমিক
১৫১	পূর্বাক্ষরের জন্য পারম্পর্যবিক বিদ্যুৎ	—শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত
১৫৬	পশ্চিমবঙ্গ : রাজনৈতিক দল	—শ্রীমল্লীপা মাল্যাকার
১৫৯	সম্প্রদায় ও সামাজিক পরিবর্তন	
	—কর ভাষ্য কত	—শ্রীশান্তিনাথ মুনোপাধ্যায়
১৬০	মুম্বারী কান	(গল্প) —শ্রীঅনিলা ভৌমিক
১৬৬	জবন বেলনোলা	—শ্রীবিজয়া সেনগুপ্ত
১৭১	পুলক	—শ্রীকপলক
১৭০	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস) —শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১৭৮	হুজুরকে কলকাতার আজগুবি কান্ড	—শ্রীবেদান্য মুনোপাধ্যায়
১৮০	অবিদ্যে পড়িয়ে	(কবিতা) —শ্রীবটক দে
১৮০	হাতবাঁধ	(কবিতা) —শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রিক্ত
১৮০	এই তো সময়	(কবিতা) —শ্রীবিপ্লব সেন
১৮১	একটু উকতার জন্যে	(উপন্যাস) —শ্রীবিশ্বদেব গুহ
১৮২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅতরঙ্কর
১৯৪	ইতিহাসের নাকী	—শ্রীশ্যামল পাঠক
১৯৯	ক'ল কোটার আগে	(উপন্যাস) —শ্রীশৈলেন রায়
১০০৬	প্রদর্শনী	—শ্রীপ্রবীরজ্ঞান রায়
১০০৭	ডেকার নাম পক্ষীরাজ	(গল্প) —শ্রীমুণ্ড ঘোষ
১০১১	অপন্য	—শ্রীপ্রমীলা
১০১০	স্বপ্নের কাছে স্বেপাংক	—শ্রীঅজিত চৌধুরী
১০১৪	প্রেক্ষাপট	—শ্রীনাগীকর
১০২৬	বেলাহুলা	—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুনোপাধ্যায়

## দশম সংস্করণ বাহির হইল !

কমন্স উইকশনারি প্রকল্পের অধীনস্থ 'COMMON WORDS' গ্রন্থটির প্রকাশিত

## COMMON WORDS

এ অমূল্য হিব্রি ভাষায় শব্দভান্ডারের সঙ্গে কলকাতার লোকসভার  
ফৌজদার অফিসের সহিত ইংরেজি-বাংলা অভিধান : ১

মূল : দুই টাকা পঞ্চদশ আন

১। কমন্স উইকশনারি প্রকল্প : ৫-৫৫, কলিকাতা-১২

# চিঠিপত্র

## পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল

কুশল পৌর সংস্থা অধীনে 'পশ্চিম-বঙ্গের জঙ্গল' পত্রিকার নিবন্ধটি পড়াছলাম। নিবন্ধটি অত্যন্ত মজার এবং প্রমোদনের কারণে সাহায্য করবে। এই লেখাটির কাছে এই ভাষা রয়েছে বলেই এর সামান্যতম খারাপও আমাকে খেদনা দিচ্ছে।

সরকারী চাকরী নিয়ে আমি প্রায় তিন বছর মজিলাতে কাটিয়েছি। তাই এর মধ্যে সরকারি পরিচিত হবার সুযোগ আমার হওয়ায়। লেখক বহুব্যবহারে মজিলাতে, কালিগঞ্জ, কাসিরাং প্রভৃতি মৈলভাঙ্গার পরিচিত স্থানে বাওয়া এবং থাকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা সবলে জুড়ে ধরেছেন। এটা বসতে অসুবিধা হয় না যে প্রমোদকবীরদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধটি লেখা হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় এই নিবন্ধে টঙ্কল, সখকক, ও ফালুট-এর নাম একবারও উল্লেখিত হয়নি।

অথচ এই তিনটে জায়গা সাধারণ প্রমোদকবীরদের কাছে নিঃসন্দেহে নতুন। এবং টুরিস্টদের কাছে এর গুরুত্বও অপরিসীম। মজিলাতে থেকে রওনা হয়ে সুখিরাপোখরি পেরিয়ে মানে-জঙ্গল, চেকাপাস্টে দাঁড়িয়ে টঙ্কল, বিক তাকালে অপনার বকেটা হস্ত কাঁপবে মাথাটা কিম্বিহ্ন করবে (যদি আপনি নতুন পাহাড় কেঁদাতে গিয়ে থাকেন) খাড়া পাহাড়ের গায়ে সপের মত অকাঁচকা সরু রাস্তার উপর চলমান পিপড়ের মত ছোট ল্যান্ড-রোভারগুলো দেখে আপনমনেই হস্ত বলে উঠবেন, গাড়ীগুলো একটু পড়ে হবে না ভা' পরিবেশে হবেন রোমাঞ্চিত। 'কিন্তু সমস্ত, অসংখ্যককে নিজেই উপেক্ষা করে আপনি এখন স্বচ্ছন্দে টঙ্কল, গিয়ে উপস্থিত হবেন তখন আপনার আনন্দ দেখে কে। পি-ডব্লিউ-ডি ইন্সপেকশন বাংলা বা ইন্ডিয়ান হোষ্টেলের আগ্রহ নিতে পারেন। অথবা ইন্ডিয়ান হোষ্টেলকে আরো আনন্দকর করণ প্রয়োজন রয়েছে। বংলোর বাইরে এসে প্রকৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে অসংখ্যককে নীচু পাহাড়ের অঞ্চলগুলো। এক নির্মোহ ভূমি হতে অথবা জলরাশির দ্বারা স্রবস্ত্র কাঁপে এই অঞ্চলে মজিলাতে পড়ার একটি স্বীকৃতি মত ভাষা রয়েছে। এদিকে ডাকান পাশের, কালিগঞ্জের, সি-সিটিংস, একাধিক রেল রপ্তানি কারখানা মত জলজল করছে। এ কি বিস্ময়!

আবার চড়াই-উৎরাই রাস্তা। যুহুতে যুহুতে মনে হবে কোনো দুর্ঘটনা হবে না ভো। অথচ বিশ্বাস করুন দুর্ঘটনার কোনো নজির আমার জানা নেই। বরঞ্চ প্রতি পদের সেই ভয়কে ভয় করার পর প্রতি যুহুতে সে কি দুর্ঘটনা জ্ঞানল। পথেই পাবেন কালপুখুরি। এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারুন। কোন খুঁড়েই ভুবে থাকে না। আসলে জলের উপরিভাগ বরফ হয়ে গেছে; নীচে বরফ জল। তাবপরও বেশ খানিকটা বোমাশকর অভিযানের পর সখকক, বাংলো ইন্ডিয়ান হোষ্টেল-সবই রয়েছে।

সেবার সখকক, গিয়ে পৌঁছলে সেই ঠান্ডাতেও ভীষণ জলের তেতী পেরেছিল। বাংলার বেরারার কাছে জল চাইলে সে কুড়ি করে এক টুকরো বরফ নিয়ে এলো। তারপর রসিকতা করে বললো বাবা, অপনারা জল আনতে যান কলসী করে; আর আমরা জল আনি কুড়ি করে। এ এক আশ্চর্য জায়গা। সত্যি গিয়ে দেখি, পাহাড়ের বরফা পুরুত্বের জলপ্রপাতেও ভীষণে নীচে নামতে গিয়ে একটুকরো বিবাত বরফের খামের মত ঠান দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলের ঢেউয়ের প্রতিটি ভাঁজ বরফের টুকরোর গায়ে গায়ে আঁকা। এ যেন কোনো মহৎ লিপিকীর সৃষ্টি। এ কি রোমাঞ্চ! এ কি কখনো ভোলা যায়!

বাইরের দিক একটবার তাকিয়ে দেখুন দিগন্ত অবধি বিস্তীর্ণ সমস্ত জয়গাটে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রঙাভেঙনের আমন্ত্রণ সমস্ত পর্বতমালা জুড়ে। যি কলবেলা তাই দেখে দেখে আমি মগ্ন হয়ে পানচুরী করছিলাম। পেছন থেকে শব্দ শুনতে পেলাম ডকটর, ওভাবে ফুলগুলোকে মাড়িয়ে বাবেন না। থমক গিয়ে পাবে দিকে তাকাতেই দেখি, অসংখ্য নাম-না-জানা ফুল পায়ের নীচে লুটে পুটি খাচ্ছে। আমি অসহ্যভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু এক পা রাখতে কেঁদে। চারিদিকে যে ফুলের চাদর পাতা। অনেকদিন আগে পড়া ওরডস-ওরডের একটি লাইন মনে পড়লো। পেছন দিকের তাকিয়ে দেখি বড়ার পুদিনের সেই লোকটো আমার অবস্থা দেখে হাসছে।

সনরাইক! সখকক থেকে সুবোধের দেখা। তার বর্ণনা দেবো, এমন খুঁটতাম আমার নেই। সে শুধু দেখা যায়, বোকা যায়, আনন্দরসে ডুবিয়ে স্মৃতির খাঁচা খুলে

রাখা যায়—জীবনের এক অবর্ণনীয় স্মৃতিসুধা হিনেবে। শুধু এটুকু বলতে পারি—যারা সখকক থেকে সুবোধের দেখেছে তারা টাইগার হিল বা ইন্ডিয়ান হোষ্টেল নিয়ে লাকাল্যিক করবে না।

আর ফালুট! তখনো আমি ফালুট বাইনি। আমার এক কথু জিজ্ঞেস করলো, ডক্টর, তুমি কখনো বোড়শী তল্লীকে চুমু খেয়েছ? বললাম না। কিন্তু কেন? সে বললো, তাহলে তোমাকে কি হবে বোকাই বলতো? শুরুপক্ষেব রাতের ফালুট জীবনের সেই প্রথম চুমু খাওয়ার অনুভূতি—যা মানুষ জীবনে শুধু একবারই পায়। সম্পাদক মহাশয়, একে অস্বীকার বলে বাতিল করে দেখেন কিনা জানি না। কিন্তু আমি আমার অ-কবি বন্ধুর উক্তিটি হৃদয়ে তুলে দিলাম ফালুট প্রমোদের সেই অনির্বচনীয় বোমাশকর অনুভূতিকে বোঝাবার জন্যে।

এরও পরে আমি ফালুট গেছি। কি এ কি বিস্ময় একি রোমাঞ্চ! যেন কাম্বন-জম্বা থেকে এভারেস্ট—চিরতুষারাবৃত সমস্ত শৈলশিখরগুলো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত বাড়ালেই বুদ্ধি হাতে লাগবে। কিন্তু হায়.....!

ম্যানেভরং চেকাপাস্টে বসে বসে অকিসার-ইন-চার্জ বাধুটির সাথে গল্প করছিলাম। জার্মান টুরিস্ট ভরলোক নিজের ছাড়পত্র মেলে ধরে কলিঙ্কলেন, জানেন, সমস্ত ইউরোপ আমি যুঁবে বেড়িয়েছি। কিন্তু এত সুন্দর পর্বতশ্রেণী জীবনে দেখিনি। এ যে অবিস্মরণীয়! ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আগত অসংখ্য টুরিস্টদের সখকক, ফালুট খেতে দেখছি, তাদের উচ্চসিত প্রশংসা করতে শুনছি। অথচ কোলকাতার বসে আমরা এদের খবর বাখি না। যারা টুর এবং টুরিস্টদের উৎসাহিত করতে চান তাঁরাও যেন এ ব্যাপারে গুরুত্ববাহাল নন।

সম্পাদক মহাশয়, আমাদের দেশের এসব অনন্যসাধারণ অথচ অস্বাভাবিক জায়গাগুলোকে প্রমোদসাধীদের কাছে তুলে ধরবার জন্যে আপনার বহুল প্রচারিত সাময়িকীর কলমে একটু জায়গা ছেঁকে দেকেন না?

ডাঃ নীলকমল পাল,  
পাঁড়ুরা, ২৪ পুরনন্দা।



# সম্পাদকীয়

## নেতাজী সূভাষচন্দ্র, স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র

নেতাজী সূভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী এবং ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা একই সপ্তাহে উদ্‌যাপন করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জন্য সূভাষচন্দ্রের ইতিহাসের সঙ্গে নেতাজী সূভাষচন্দ্রের দীর্ঘ জীবনীত্বের ওপরোক্তভাবে মিশে আছে। সূভাষচন্দ্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক সৈন্যসেনা। জাতীয় কংগ্রেসের একজন সম্মান কবীরূপে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বাগিয়ে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন দ্বারা। তাঁর সময়েই জাতীয় কংগ্রেস তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে চরম স্বেচ্ছাসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হতে থাকে যা পরবর্তীকালে গান্ধীজীর নির্দেশ, ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে।

সূভাষচন্দ্রের আমলেই ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপরেখা প্রসঙ্গের জন্য গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিটি। জওহরলাল নেহরুকে তার সভাপতি মনোনয়ন করেন তিনি। ডাঃ ফেল্ডম্যান সাহায্যে সত্তা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জিএম সেন গঠনের এই বৃন্দারূপী কর্মসূচীর সঙ্গে সংকলিত করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক হ'তে গড়ে তোলার স্বপ্ন জিএম সেনেরই ছিল। জওহরলাল নেহরু সেই স্বপ্নকে স্নেহ বস্ত্র রূপে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সুনিশ্চিত কর্মসূচী এখনও চলেছে। জওহরলালের উত্তরাধিকার বহন করে নিজে চলেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সূভাষচন্দ্রের অন্যতম, তাঁর জীবনের মহত্তম কীর্তি, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দান। স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তিনি। সামরিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে এবং স্বাধীনতালাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রায়ে, নিষ্ঠুর এবং অক্লান্ত কর্মশীলনে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। এ এক ইতিহাসের পরম বিস্ময়। আজাদ হিন্দ সেকার এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সার্বভৌমতা হল তাঁর বিশালী চরিত্র। সাম্প্রদায়িক ভেদবৈধি চিরকালের বিনশন দিয়ে এই মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী প্রকৃত অর্থে একটি জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সূভাষচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং অপ্রান্ত নেতৃত্বই তা সম্ভব করেছিল। সূভাষচন্দ্রই এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের আঘাতেই ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি যার ধসে। তারা ভীষণতরঙ্গা দুটিতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অত্র ওই মহান মুক্তিযোদ্ধা, জননায়ক এবং ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবীর প্রতি আমরা আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধা প্রণাম।

২৬ জনস্বায়ী সাধারণতন্ত্রী ভারতের প্রত্নোৎখাতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতার রক্ত-অঙ্গুষ্ঠী বৎসর এটা। স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতবর্ষ নিজস্ব সংবিধান প্রবর্তন করে স্বাধীনস্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রবর্তন করা ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক বিবাস ও সংকল্পেরই উজ্জ্বল স্মৃতি। এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগৃত দেশগুলোতে এর তুলনা মেলা ভার। সংবিধানই জনগণের অধিকার এবং ভারত সামাজিক আশা-অকাঙ্ক্ষার রক্ষক। গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার জন্যগণ বে সংকল্প ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় তা প্রতিফলিত। একটা কথা ঠিক সংবিধানে ঘোষিত বহু লক্ষ্য এখন অগুরু। শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমাদের দেশে নিরক্ষরতা ব্যাপক। তাহলে গণতান্ত্রিক সংবিধান চলছে কিসের জোরে? জনগণই বা তাদের প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশিত করেছেন কিভাবে? এর উত্তর হল, অক্ষরজ্ঞান সীমাবদ্ধ হলেও ভারতের সাধারণ মানুষ, গ্রামবাসী, শ্রমিক ও কৃষক তাঁদের পারিপার্শ্বিকতার এবং সহজ বুদ্ধিতে গণতন্ত্রের আদর্শ ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন শিক্ষা লাভ করেছে নিজস্বের জীবন থেকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই গণসংগঠন ও সামাজিক কর্মসূচীগুলোর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব-বুদ্ধি হয়েছে প্রসার, বস্তুতন্ত্রের কল্যাণকর সম্পর্কে তারা অবহিত। দেশেরমানুষের বিভিন্ন পরিচয়গুলোর মত কর্মসূচী বা দুর্নীতি থাক না কেন, কিনতন পুঙ্খ পাণ্ডিত্য করে তাই ফল গিয়ে পৌঁছেতে গন্ত পশ্চিম করে। ইচ্ছা তা আশা করলে হয় নি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার সম্পদবুদ্ধিতে এ সূত্র হারিয়েছে বলে, হিংসার পথে নয়, সংঘর্ষের পথে নয়, ক্রান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই আমাদের দেশের পশ্চিমপ্রদেশ সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে হবে। সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা যেন এ সত্য মা ফুল। শ্রীমতী গান্ধীজীর মূল্যবোধ যে বিস্তারিত করে হাত বেঁধেছে—স্বাধীনতা থেকে দারিদ্র্য জাতি—তা যেন সার্থক হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে এটাই হল সংঘর্ষের বড়, সংকল্প। এর জন্য চাই অভ্যন্তরীণ নির্ভর, কঠোর প্রয় এবং আত্মত্যাগ। জনগণের স্বার্থই সামরিক, উন্নয়নমূলক, ঐতিহ্য রক্ষণ, স্বাধীনতার জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এই সংকল্প ও আদর্শ জরুরী হোক। যাক দেশবাসী এই স্মরণেই উদ্বোধন করছে।

(কার্যবরী পরিচালক নেতাজী রিসার্চ  
ব্রাহ্ম ডাঃ শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে  
সাক্ষাৎকার।)

## নেতাজী ভবন



আমার মা, বিভাবতী বসু, ছিলেন নেতাজীর মেজবোদি। তাঁর সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক এ ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অন্তরঙ্গ। তিনি তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতেন। এবং মা যেমন করে ছেলের মেজাজমন্ডির খবরাখবর রাখেন, অনেকটা তেমনিভাবেই, তিনিও নেতাজীব মানসিক পরিবর্তনের অভ্যাস পূর্বাহেই টের পেয়ে যেতেন। নেতাজীও অকারণে কোনো কথা তাঁর মেজবোদির কাছে গোপন করতেন না।

১৯৪১ সালের কথা বলছি।

সেদিন মধ্যরাত। ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৭ই জানুয়ারী। ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ী থেকে নেতাজী এখন হুগলিতে ইতিহাসের পথে পাড়ি জমালেন, তখন অনেকের কাছেই ব্যাপাবটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের কাছে তা মনে হয়নি। দেখা গেল, সেই মূহুর্তে তিনি মনো অনেকের মতো কিস্তি না হয়ে, নেতাজীর স্মৃতি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বোধহয়, বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষ একদিন তাঁর ফেলে-মাওয়া স্মৃতিকে পরম শ্রদ্ধা সহ গ্রহণ করবে, স্বেচ্ছায় মনে কববে।

ঘটনাটা উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, ১৯৪৬ সালে যখন আমার বাবা পরবর্ত্ত বসু আমার ঠাকুরদার তৈরী এলগিন রোডের বাড়ীটিকে নেতাজী ভবনে রূপান্তরিত করেন, তখন মায়ের উৎসাহ কম ছিল না। ১৯৪৭ সালের ২৩ জানুয়ারী, পরবর্ত্ত এই বাড়ীটিকে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে। এবং নেতাজী-চর্চা জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতাযুদ্ধের উৎসাহসে গড়ে তোলার সংকল্প নেন।

এই প্রসঙ্গে কিছুটা পেছনের ইতিহাসও বলা দরকার।

নেতাজী বিসর্জ ব্রাহ্ম তখনো তৈরী হয়নি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্মী ও নেতাজীর অনুবাহিনীরা প্রথম এই বাড়ীটিতে ১৯৪৬ সালে মিলিত হইয়াছিলেন, স্বদেশের কাজে আত্মনিরোগের সংকল্প নিয়ে। তখন তাঁরা জনস্বাক্ষরকাজ করতেন। আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা ছিলেন নানারকম পাবলিক অ্যাক্টিভিটিস্টের সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু আমার বাবা এবং আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা কেউই এত অল্প সমৃদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের সামনে কত কাজ! নেতাজীর জীবন ও দর্শনিক সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৯৪৭ সালে পরবর্ত্ত বসুর উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা গঠন করেন, বর্তমান সংস্থাঃ নেতাজী রিসার্চ ব্রাহ্ম।

সম্মেল সামান্য। হাত তখন নেই। তখন বোধহয় আমার মা এগির এলেন, আলোক-বিত্তিকার মতো। নেতাজীর পোশাক-আশাক,

চিঠিপত্র, সবই তিনি স্মৃতি হিসেবে রাখা করতেন। নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম সংগ্রহ ছিল, তাঁর দেওয়া ঐ স্মৃতিচিহ্নগুলি। কিন্তু ভারতবর্ষের বড়ো ইতিহাস-বিষয়ক জাতি। ইতিহাসের নির্দেশ সম্পর্কে ইদারান।

তথা সংগ্রহ করতে গিয়ে, এ সত্য পেলান্নি করেছি, বারবার। নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউট কালো হাত দিয়ে স্বদেশী ইতিহাসিকের প্রত্যেক সাহায্য পেয়েই ঠিকই,

কবি-সাহিত্যিক রাজনীতিকদের সহ-যোগিতাও কম পাইনি, কিন্তু তথ্যের জন্য-ভাষের নিভাঁজ করতে হয়েছে বিদেশী সাহায্যের ওপরেই বোধী করে।

উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়, প্রিট ফেডারেল নাম।

ভিয়েনাবাসিনী ঐ ভদ্রমহিলা, স্বেচ্ছা-প্রাণোদিত হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নেতাজীর চিঠিপত্র, এমন কি অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে

কাটিং পর্যন্ত পেয়েছিলেন, তাঁরই মারকতে।

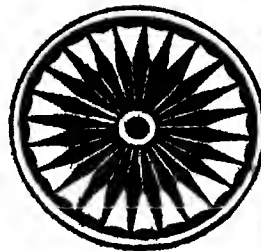
এইসব কথা ভাবতে গেলে বিশ্বেরে জন্ত থাকে না। এইভাবে আমরা সাহায্য পেয়েছি জাপান থেকে; জার্মানি থেকে। এমন কি আমেরিকা থেকে।

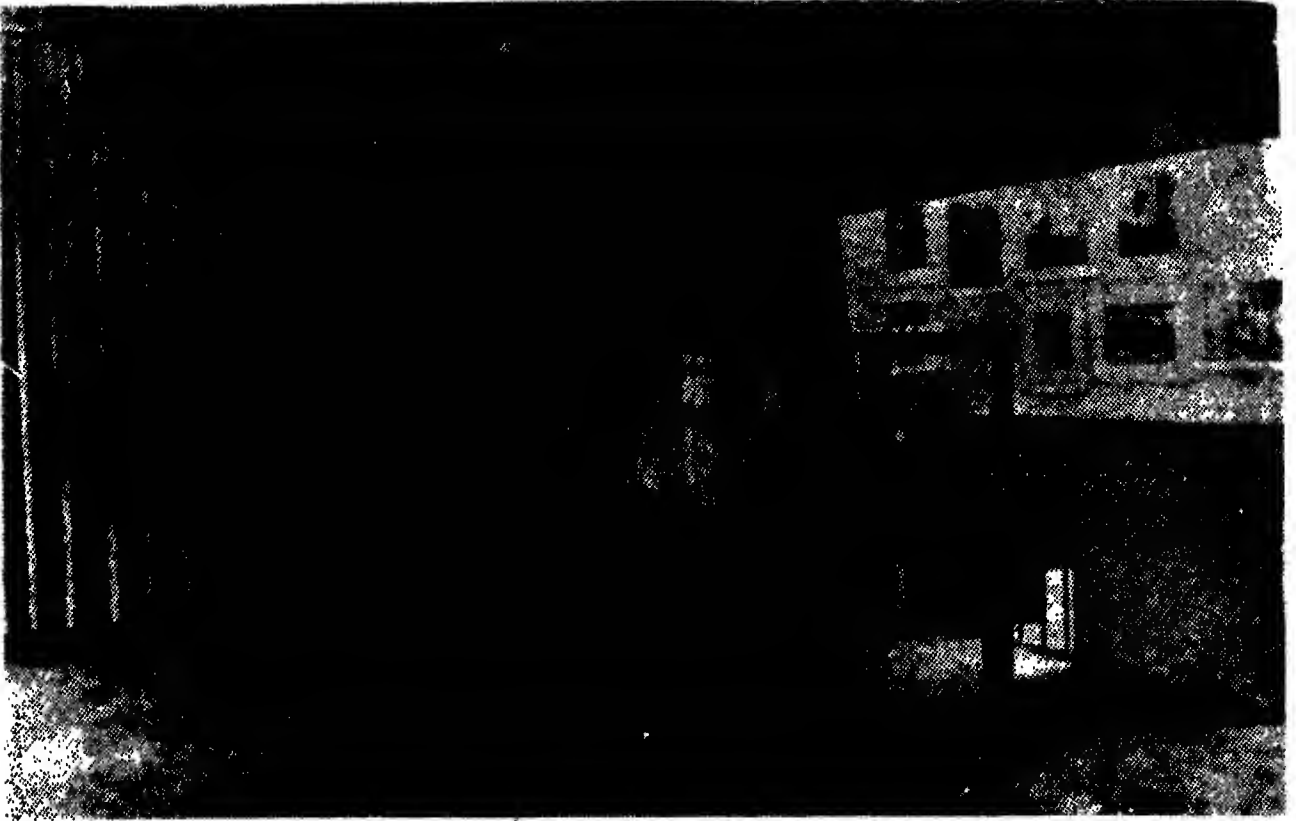
এই তো সেদিনের কথা।

১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী, জটিল আলেকজান্ডার ওয়ার্থ এসেছিলেন নেতাজী ভবনে, নেতাজী সম্পর্কে ভাব্য দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, তিনি



**ঐরা বিজয়ী হয়েছিলেন স্বাধীনতা  
সংগ্রামে  
আমাদের বিশ্বের সার্থক ইক আর গড়  
উঠুক এক নতুন  
ভারত**





ছিলেন জার্মান ফরেন অফিসের বিশেষ ভারতীয় বিভাগের অফিসার। হিটলারের বিরুদ্ধে বড়বন্দী করার অভিযোগে অভিযুক্ত আডাম ভন ট্রট জস লজের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

কিছুকাল আগে, তিনি জার্মান ভাষায় নেতাজী সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন।

তার কাছ থেকে আমরা পেরোছি, বহু অন্যান্য তথ্য। বহু ডিস্লাম্যাটিক ডকুমেন্ট এবং দৃশ্যপ্রাপ্য দলিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছু ছবি এবং ফিল্ম পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

এইভাবেই আমরা এগিয়েছি, দিনের পর দিন। তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করছি। কখনো নিজেদের চেষ্টায়, কখনো-বা বৈদেশিক সাহায্যের সূত্র থেকে। তাঁদের মধ্যে কেউ বা ছিলেন, নেতাজীর সঙ্গে পরিচিত কিংবা অনুগামী। আবার এমন মানব আছেন, যারা নেতাজীকে দেখেননি কখনো, কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণারত।

যেমন, ইয়োচি ইয়োকোবাবি।

জাপানের এই তরুণ গবেষক নেতাজীকে কখনো দেখেননি। কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে তার প্রাণী অপারিসমী। ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট ডিউটিং দি ওয়ার—এই বিষয়ে তিনি গবেষণা করে যাচ্ছেন গত দশ বছর ধরে। তবু তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই।

নেতাজীর অনেক ছবি, নেতাজী সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, কাগজপত্র প্রকাশিত সংবাদপত্র কাটিং, ফিল্ম তিনি আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন একে একে। এখনো পাঠানোর

বিষয় নেই। এবং এইসব নথিপত্রের ভিতরত তৈরী একটা অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবার দেখানো হবে, সারা ভারতবর্ষে।

ইতিহাসের পথ এমনি নির্মম। এবং সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো এই ঐতিহাসিক সভ্যকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়োজনে এবং নেতাজী সম্পর্কিত গবেষণায় আলোকপতন স্বরূপ। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেতাজী মিউজিয়াম। নেতাজী এবং জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে যারা গবেষণা করতে চান, তাঁদের সাহায্য করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো বেশ করেছেন, নেতাজীর লেখা ও নেতাজী-সম্পর্কিত কুড়িটিরও বেশী বই।

ইচ্ছে আছে, আমরা গোটা নেতাজী ভবনটাকেই নেতাজী মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তুলব। সেজন্যে বাড়ীটির আধুনিকীকরণের প্রয়োজন হবে। ঐতিহাসিক দলিল-পত্র ও নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য এয়ার কন্ডিশনিং যন্ত্রেরও দরকার। একটা আধুনিক অডিটোরিয়ামসহ নেতাজী সম্পর্কিত চলচ্চিত্র তৈরী, প্রামাণ্য প্রদর্শনী ও রিসার্চ স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার জন্য পনের লক্ষ টাকার একটা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, আমরা নিরোছি, আরেকটি আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা। তাতে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের (১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত) ওপর-যাতে গবেষণা করা যার, তার উপস্থাপনা একটি

লাইব্রেরী থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে, আলোচনা কক্ষ, এককিভিশন হল, ল্যাবরেটরী, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক অতিথিশালা।

এই বছর ইন্টার ন্যাশনাল নেতাজী সেমিনার হচ্ছে নেতাজী ভবনে। দেশী, বিদেশী বহু গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু নেতাজী সম্পর্কে ভাষণ দেবেন।

তবু চিত্তাসার শেষ নেই। কেউবা বলেন, নেতাজীকে চীনে, না, রাশিয়ার নাকি দেখা গেছে। কেউবা প্রশ্ন করেন, শৌল-নারীর সমাধী কি নেতাজী নয়?

আমি জানি না, নেতাজী কোথায় আছেন। আমার মনে হয়, ঐগুণি সমুদ্র গুজব। এবং গুজবের মধ্যেও একটা সত্য আছে। সেই সত্যটা হলো, নেতাজীর দেশ-বাসী বিশ্বাস করতে চায় না যে, তিনি নেই।

আমার ধারণা, নেতাজী একটা ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। অল্প সময়ের তার সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। এ সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে, বছরের পর বছর। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে, সেইজনেই গড়ে তোলা হচ্ছে লাইট হাউসের মতো, আমাদের জাতীয় সংগ্রাম, নেতাজীর জীবন ও দর্শন আলোচনার প্রাককেন্দ্র রূপে।

এ ব্যাপারে ভারত সরকার খুব সাহায্য করছেন। \*

\* সাক্ষাৎকার: গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

উন্নতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

## পূর্বাঞ্চলের জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ

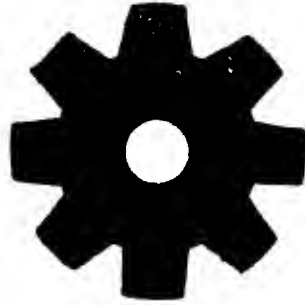


কথটা প্রথম উল্লেখিত গত বছর নভেম্বর মাসে। পাটনাতে পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী একটা বৈঠকে বসেছিলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল :—বিদ্যুতের ঘাটতি। সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভাবপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।



ঐ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সন্দ্বর্ধাংশু রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র পাণ্ডে এক জোট হয়ে দাবী করেন যে, পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাবার জন্য এখানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ দিতে হবে।

ত্রীসংসদাংশু রায় ঐ সম্মেলনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, বিদ্যুৎ পরি-কল্পনার ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ভাবতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা মোট বে চারশ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে তার মাত্র দশ শতাংশ লগ্নী করা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্য-



গুলিতে। অথচ এই রাজ্যগুলিতে ভারতের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বাস করেন এবং এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জনই দরিদ্র।

মন্ত্রী ডঃ রাও নাকি নভেম্বর মাসের ঐ সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীদের যুক্তিগুলি মনোযোগসহকারে শুনেননি এবং বিষয়টি

সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ডঃ রাও যে আশ্বাসই দিল না কেন, প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির একটা বড় রকমের বদল না হওয়া পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখতে পাওয়ার কোন আশা নেই। এবিষয়ে দিল্লী এখন পর্যন্ত যে নীতি নিয়ে চলছে তা হল এই যে, যেসব রাজ্যের হাতের কাছে করলা সেই শব্দ সেই সব রাজ্যেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেহেতু কয়েকটি করলা রয়েছে সেহেতু সেখানে করলার জগলিতিকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হবে—এটাই হচ্ছে সরকারী নীতি। আর এই কারণেই ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত যে চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে তাদের একটিই ঠিকানা মহারাষ্ট্র, একটিই বাল্লম্পানে একটিই তামিলনাড়ুতে এবং চতুর্থটির উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ দেশের উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছড়ান আছে, শব্দ পূর্ব ভারতের কোঠাতেই শব্দ।

পূর্ব ভারতকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মানচিত্রের কাইরে রাখার এই নীতি কি কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন? এই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যাবে তারই উপর নির্ভর করছে পাটনা বৈঠকে উত্থাপিত দাবীর ভবিষ্যৎ।

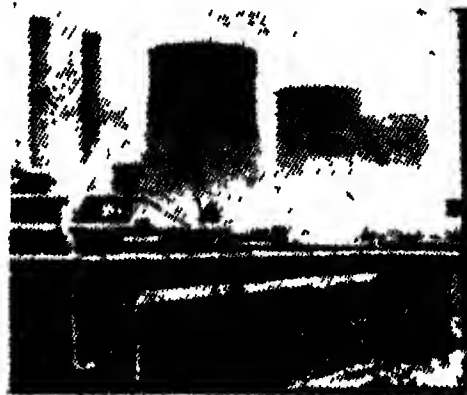
এ বিষয়ে এখন কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য-গুলির আলাপ-আলোচনা চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে একথা মনে করা যাচ্ছে না যে, দিল্লীকে তার নীতি বদল করতে রাজি করান খুব সহজ হবে। পাটনা বৈঠকের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় এক ক্রান্তি দিবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি সুরেন্দ্রনাথ মুখ্য-মন্ত্রীদের দাবী নাকচ করে দিয়েছেন।

এই বিষয়ে নয়াদিল্লীর মনোভাবের আর একটি ইঙ্গিত সম্প্রতি পাওয়া গেল। উত্তর বিহারে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য বিহার সরকার একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের পরামর্শদাতা কমিটি এই প্রস্তাব নামজুর করে দিয়েছেন।

অথচ, নয়াদিল্লীকে একথা বোঝান হয়েছে, সারা ভারতে করলার দাম এক করে দেওয়ার পর এখন পূর্ব ভারতের রাজ্য-গুলি করলার সহজলভ্যতার দরুন বিশেষ কোন সুবিধা পাচ্ছে না। তাছাড়া, তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলিকে যে নিরেন্স জাতের করলা ব্যবহার করতে হচ্ছে তাতে বাল্লম্পানের ক্ষতি হচ্ছে ও সেগুলির আয়ুষ্কাল হচ্ছে। বিহারে ন্যাচারাল ইউ-

নিরঞ্জন

সেনগুপ্ত







রেনিয়ামের যে সওয়া আছে সেটা এই অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, এই যুক্তি মেনে নেওয়ার জন্যও নয়াদিল্লী এখন পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।

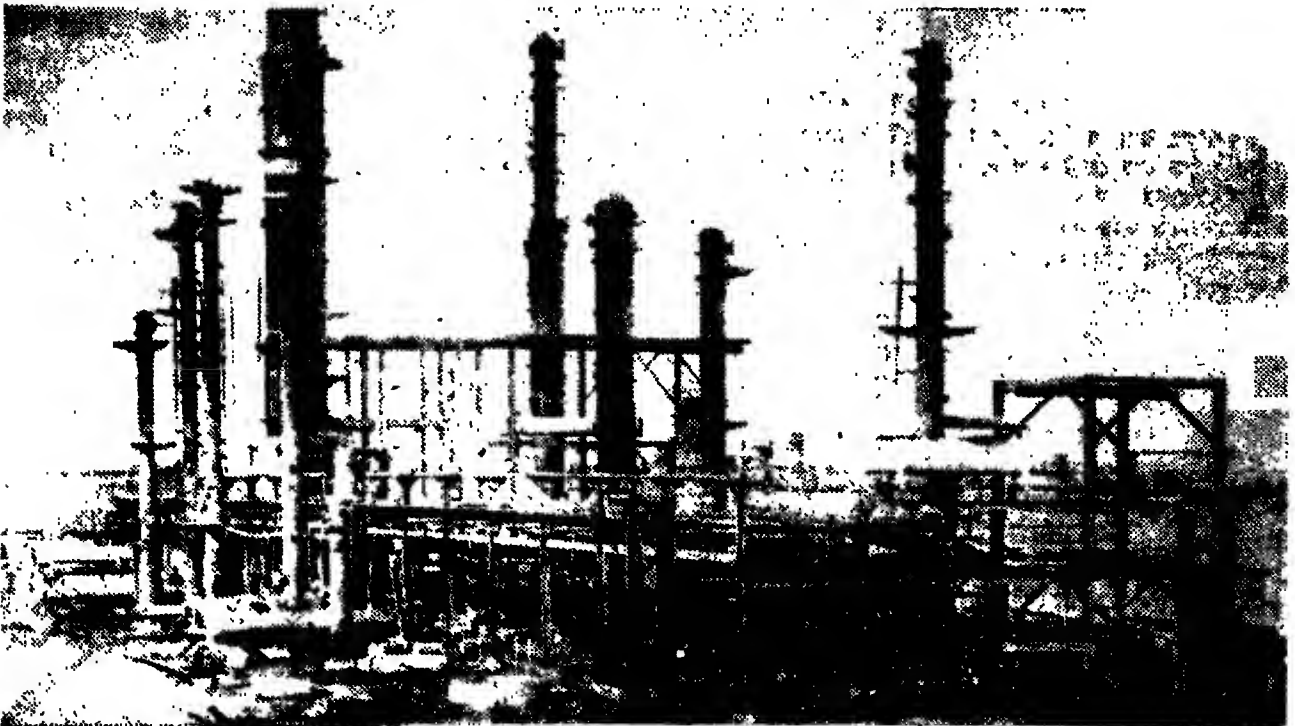
ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও মৌদীনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের কাছে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা নয়াদিল্লীতে পাঠিয়েছেন। ১২০ কোটি টাকার এই পরিকল্পনায় ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য যোজনা পর্ষদ এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা সংক্রান্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ কয়েক দিন আগে কলকাতায় এক আলোচনা-সভায় বলেছেন, 'পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া আমাদের গতানুগতিক নেই।' রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ সত্যোজিত বসুও এই আলোচনা-সভায় বলেছেন, সমুদ্রের কাছে সুবর্ণরেখার উপত্যকায় কে-থাও এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করলে ভাল হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা যারা করছেন তাদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পারমাণবিক

বিদ্যুৎ উৎপাদনের এককালীন খরচ খুব বেশী বলে আপত্তি উঠতে পারে। এই আপত্তি কাটাবার জন্য পরিকল্পনাকারীরা যে প্রস্তাব বিবেচনা করছেন সেটা হল এই যে, হলদিয়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় যদি এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তাহলে ঐ অঞ্চলে শিল্প ও কৃষির একটা বহু আয়োজন গড়ে তুলে তার প্রয়োজনে ঐ বিদ্যুৎকে কাজে লাগান যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এই ধরনের একটি বহু শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে যদি ৬০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তাহলে সেখানে উৎপন্ন বিদ্যুতের খরচ পড়বে ইউনিট প্রতি ২.৮ থেকে ৩ পরসী। হলদিয়া বিদ্যুতের যে খরচ এখন ধরা হয়েছে তার তুলনায় এই অঙ্কটা অনেক কম। এখন যে হিসাব আছে তা হল, হলদিয়ায় বিদ্যুতের খরচ পড়বে ইউনিট প্রতি ৯ পরসী।

একজন বিশেষজ্ঞ হিসাব করে দেখিয়েছেন, এই ধরনের একটি শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা যায় ও সেখানে যদি ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যায় তাহলে দিনে ৬ লাখ টন সার ও ৫ লাখ টন অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা যেতে পারে। যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে ১২ হাজার অগভীর নলকূপ ও ৯ হাজার গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সঞ্চার করা যাবে।



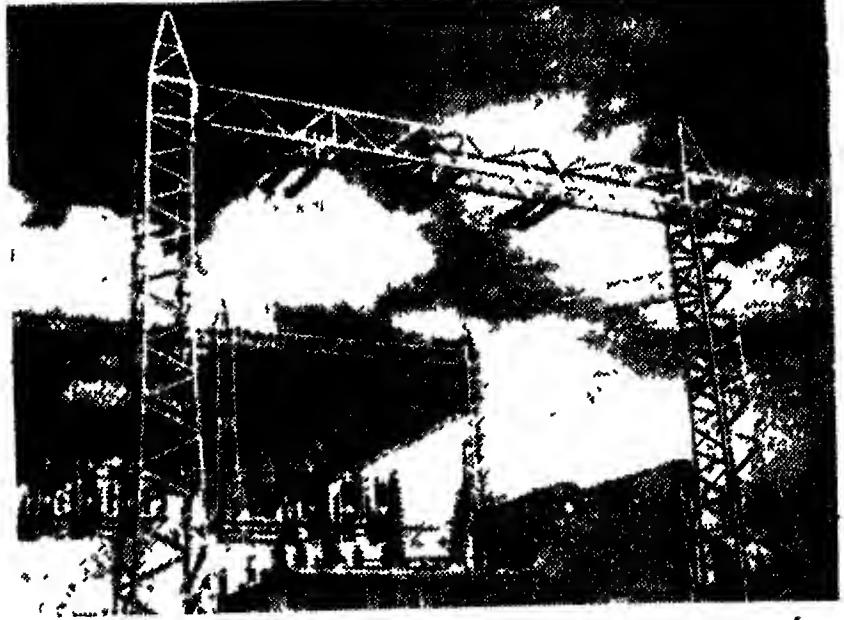
পরিবহনমন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রী সিন্ধু-  
নগর রেলের সঙ্গে ডবল লাইন-এর  
এক দফা আলোচনা হয়েছে বলে প্রকাশ।

তবে এখন পর্বন্ত দিল্লীর যে মানো-  
ভাব দেখা যাচ্ছে তাতে না আঁচলে বিকাশ  
নেই।

#### কলকাতার জন্য পাতাল রেল

কিলাস করা যাচ্ছে এখন কলকাতার  
পাতাল রেল সম্পর্কে। গত ২৯ ডিসেম্বর  
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই  
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন  
এবং এর মধ্যে প্রকল্পের জন্য মাটি খোঁড়া-  
খুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে। যানবাহন  
সমস্যার বিভূষিত কলকাতার মানুষ এখন  
আশা করতে পারেন যে মাটির তলার রেল  
অদ্বৈত ভবিষ্যতে তাঁদের সমস্যা-  
কতকটা সুবাহা করবে।

এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায় দমদম থেকে  
টালিগঞ্জ পর্বন্ত রেল চালু করা হবে।  
এতে খরচ পড়বে ১৪০ কোটি টাকা। রেল-  
লাইনটির দৈর্ঘ্য হবে ১৬.৪০ কিলোমিটার।  
দমদম জংশন স্টেশনের কাছেই এ স্টেশনের  
পশ্চিমে পাতাল রেলের স্টেশন তৈরী হবে।  
সেখান থেকে বেলগাছিয়া বোডের মূখ  
পর্বন্ত পাতাল রেলের লাইন সুবাহন বেল  
লাইনের সমান্তরালে মাটির উপর দিয়ে  
যাবে। বেলগাছিয়া বোডের মূখ থেকে  
বাকী সবটুকু বাস্তব এই পাতাল রেললাইন  
মাটির তলা দিয়ে যাবে। পাতাল রেলের  
মোট ১৭টি স্টেশন থাকবে। তার মধ্যে  
দমদম স্টেশন ছাড়া অন্য সব স্টেশনই থাকবে  
মাটির তলায়। দুই স্টেশনের মধ্যে গড়  
দূরত্ব হবে ১০০ কিলোমিটার।



২৯ ডিসেম্বর এ অনুষ্ঠানে ঘোষণা  
করা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের শেষে যাত  
পাতাল রেললাইনে পবনকালবতা  
গাড়ী চালান যার সেভাবে কাজ এগিয়ে  
নিজে যাওয়া হচ্ছে।

এই পাতাল বেল তৈরী করতে গিয়ে  
দেখব অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা নিয়ে  
ইতিমধ্যে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেছে।  
মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করার আগে  
মাটির তলায় বেলের পাইপ, পয়ঃপ্রণালী,  
গ্যাসের মেইন, ইলেকট্রিক ও টেলিফোন  
তার প্রভৃতি সবাত্তে হবে। জায়গায় জায়গায়  
যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করতে  
হতে পারে। কেথ ও কোথাও বাস্তব  
চণ্ডা করার দরকার হতে পারে। এই সব

অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেমন কল-  
কাতর নগর কর্তৃক সহযোগিতার দরকার  
হবে তেমনি বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ,  
পৌর প্রশাসন ইলেকট্রিক গ্যাস ইত্যাদি  
সংস্থা প্রভৃতির সহায়তা ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রাখতে  
হবে। এর জন্য বিলাত প্রভৃতির দরকার।

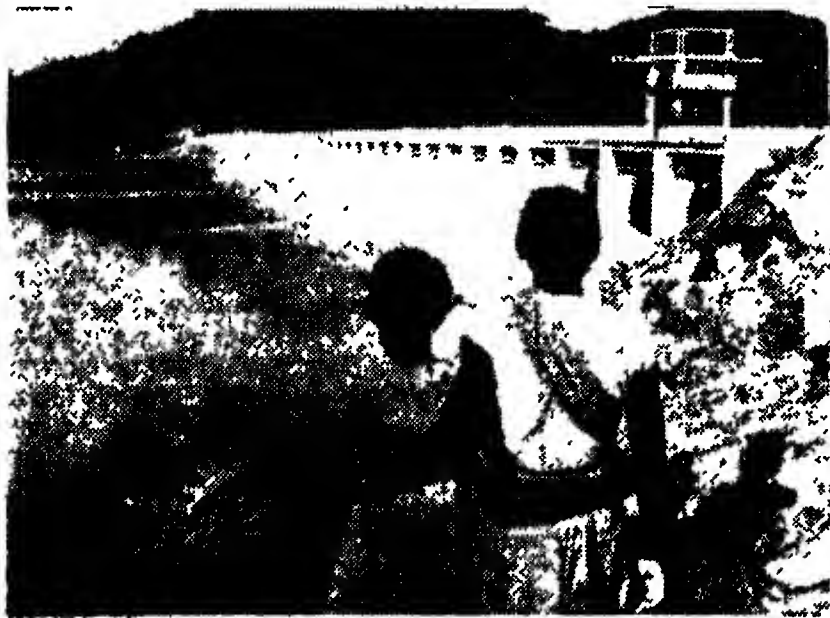
#### দ্বিতীয় হাওড়া সেতু

কলকাতার উত্তর দিক লক্ষ্য রেখে  
আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনমন্ত্রীর  
কাজও ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। সেটি  
হচ্ছে দ্বিতীয় হাওড়া সেতু যেটা সম্পূর্ণ  
হল নতুন নতুন নির্মিত করা হবে বলে  
ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত  
লেন।

গত বছর ২০ মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী  
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সেতুর ভিত্তি-  
প্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছেন।

কলকাতার পূর্ব প্রাঙ্গণ ঘাট আর  
হাওড়া দিকে দীনদাদা বসন্তজর উত্তরে  
মিউনিসিপাল পার্ক — এট দুই বিন্দুকে  
যুক্ত করার এই সেতু। সেতুটির দৈর্ঘ্য  
হবে ২৭০০ ফুট এবং জোয়ারের সময়  
নদীর জলাবহা থেকে সেতুটির মধ্যবর্তী  
অংশের উচ্চতা হবে ১১০ ফুট। এই  
যানবাহন সম্প্রদায় তার দিয়ে কোলান  
বিভক্ত-করা সেতু আমায়েশ দেশে এই প্রথম  
তৈরী হচ্ছে। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে  
সময় লাগবে আনুমানিক পাঁচ বছর এবং  
ব্যয় হবে জমি সংক্রান্ত ও আনুমানিক  
খরচসহ মোট ৩০ কোটি টাকা।

এই সেতু তৈরী হলে বর্তমান হাওড়া  
ব্রিজের উপর যানবাহনের চাপ অনেকটা  
কমে যাবে। সেতুটি হাওড়া শহরের উন্নতির  
সহায়ক হবে।





পশ্চিমবঙ্গ

## রাজনৈতিক দল

ব্রিটিশ আমলে পরাধীনতার বৃগে বহু আদর্শবান উন্নয়ন ও বৃদ্ধি এগিয়ে এসে-  
ছিলেন ছোট-বড় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে  
পরাধীনতার নাগশাস কাটতে। স্বদেশী  
করাই ছিল তাঁদের জীবন-মুঠ। ব্রিটিশ  
আমলেই বড় পার্টির কার্যকলাপে আস্থা  
হারিয়ে তাঁদের অনেকে ছোটখাটো রাজ-  
নৈতিক দল ও বিশ্লবী গোষ্ঠী গড়ে  
ডেলেন। তখন কিন্তু সবারই উদ্দেশ্য  
ছিল একটিই—দেশকে স্বাধীন করা।

দেশ স্বাধীন হবার পর সেনাদের বহু  
ছোট দল, কমিশন দল বিলুপ্তির পথে

এগিয়ে গেল। তাদের দু-একটা দল এখনও  
কোনো রকমে টিমাটিম কবে টিকে আছে।

দেশ স্বাধীন হল, কংগ্রেস সরকার  
গঠিত হল। রাজনৈতিক মতবাদে বিরোধ  
দেখা দিল নেতাদের মধ্যে। তাঁদের কেউ  
কেউ বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়লেন।  
এবার উদ্দেশ্য এক রইল না। শাসনব্যবস্থা  
দখল করে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ  
অনুযায়ী জনগণের সেবা করাই হল তাঁদের  
উদ্দেশ্য। বহু আদর্শবান উন্নয়ন ও বৃদ্ধি  
বড় দল ভেঙ্গে ছোটখাটো দল গড়লেন।  
এঁদের অনেকেই বিশ্লবী। কিন্তু কেউই  
গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রচার বিরুদ্ধে গেলেন

না। নির্বাচনের সময় এসে লবাই তোড়-  
জোড়ে বাস্তব হলেন। সবার আশা ভাঙা  
নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করলেন।  
দেশকে নতুনভাবে শাসন করলেন। কিন্তু প্রথম  
বিশ বছর ছোটখাটো দলগুলো শূন্য  
বিধানসভার বিরোধী আসনে গরম বসুতাই  
করে গেলেন। শাসন কমতাল্ল এসে নতুন  
কিছু করার সুযোগও পেলেন না।

আদর্শবান রাজনৈতিক নেতারা যে-  
যাই বলুন না কেন, ছোট-বড় সব রাজ-  
নৈতিক দলের লক্ষ্য একটিই এবং সেটি হল  
নির্বাচনে জিতে শাসন কমতা দখল করা।  
সব দলের ভাগ্যে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।  
বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সোজা কথা  
নয়। পাঁচ-দশ কিস্বা পনেরটি আসন নিয়ে  
সরকার গঠন করা যায় না। তাই ছোট-  
খাটো দলগুলো কোনো একটি বৃহৎ দলের  
সঙ্গে ভিড়ে যায় মন্ত্রিসভা গঠন করতে।  
যে ছোটে তাবা যোগদান ক'বে সেই ছোটের  
পরামর্শে তাদের চলতে হয়। ছোটের  
উত্থান-পতনের সঙ্গে তাদের ভাগা জড়িত।  
তাই ছোটের পতন হলে তাদেরও পতন  
ঘটে। এই ধাবাই আমরা দেখে আসছি  
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসে কয়েক  
বৃগ ধবে। ও-দৃশ্য শূন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ-  
নৈতিক পর্যায়ে দেখা যায় না, বিবেক প্রায়  
সব দেশেই এক চিত্র। একটি ছোট দল  
হঠাৎ বড়তে পরিণত হয়েছে তেমন দৃষ্টান্ত  
কোথাও দেখা যায় না। বড় কোনো দলের  
বিপর্যয় হলে সর্বত্রই ছোট-মাঝারির দল  
নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে  
কলেই আমরা জানি।

নির্বাচনে কোন ছোটখাটো দল  
স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে সুবিধে  
করতে পেয়েছে বলেও আমরা দেখতে পাই  
না—পশ্চিমবঙ্গ তাব দৃষ্টান্ত। কয়েকটি  
ছোটখাটো দল স্বাধীনভাবে নির্বাচনে  
প্রতিযোগিতা চালিয়ে একবারে বিলুপ্ত  
হয়ে গেছে। তেমন নজীর আমরা দেখছি  
১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের কয়েকটি  
নির্বাচনে, এই পশ্চিমবঙ্গে। রে-প্রসঙ্গে  
কিছুত আলোচনা আমরা পরে করছি।

১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর দক্ষিণ  
ও আধা দক্ষিণপন্থী দলগুলো প্রায়  
বিলুপ্ত হয়েছে। মধ্যপন্থীদের জক্কাও  
তখৈবচ। কেবলমাত্র বামপন্থী ছোটখাটো  
দলগুলো এখনও টিকে আছে। কিন্তু  
তাঁদের কার্যকলাপ এখন খুবই সীমিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে গত দশ বছর  
থরে সি পি এম দল একটি বৃহৎ রাজনৈতিক  
দল হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। বিধানসভায়  
এদের আসন সংখ্যা ছিল প্রচুর। ১৯৭১  
সালের নির্বাচনে সি, পি, এম দল আসন  
লাভ করেছিল ১১১টি। ১৯৭২ সালে  
পেলা মাত্র ১৪টি। আসন সংখ্যা হিসেবে  
একটি বিরাট দল হয়ে পেল ছোটখাটো  
দল।

সি, পি, আই দল হিসেবে কু কিছু  
আসন সংখ্যা মাঝারি। ১৯৭১ সালের  
নির্বাচনে এরা পেয়েছিল ১০টি আসন।

দিলীপ মাল্যকার

১৯৭২ সালে গেল ৩৫টি। কিন্তু তার নিজে একবার কখনো নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে ছোট বাঁধার জন্যেই এতগুলো আসন লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণ্ডী খ্রীস্টিয়ানদের রায় কটাক করে বলছিলেন, সি, পি, এম এখন ছোট দল-গুলোর মধ্যে একটি।

দল হিসেবে এখনও সি, পি, এম বড় দল। যে দল এককালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল, সে দল গত এক বছর ধরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর একেবারেই নীরব। তাদের অ্যাক্টিভিটিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সি, পি, এম জোটে ছোটখাটো দল আর, এস, পি; এস, ইউ, সি; ওয়ার্কস' পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, মাক'সিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, সি, পি, আই ইত্যাদিরা ১৯৭২ সালের ৪টা অক্টোবর একবার জনসভা ডেকে সামান্য হৈঠে করেছিলেন। তারপর দেখা গেল ১৯৭৩ সালের ৯ই জানুয়ারী আরেকটি জনসভা। যাস এই পর্যন্তই তাদের গতিবিধি। এই জোটের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর, সি, পি, আই ১৯৭২ সালের নির্বাচনে একটিও আসন লাভ করতে পারেনি। এদের বাদ দিয়ে সি, পি, এম এবং তার জোটের কয়েকটি দল গত এক বছর ধরে বিধানসভা বয়কট করে চলেছে। কিছুকাল যাবৎ আর, এস, পি দল আবার নতুন কথা বলছে। তাঁরা ভাবছেন বিধানসভায় যোগদান করবেন। সম্প্রতি তাদের দলের সম্মেলনে পৃথক আন্দোলনের কথাও বলা হয়েছে। তাঁরা গণবিক্ষোভ আন্দোলন শুরুর করবেন বলেও ঘোষণা করেছেন।

মূল বাঙলা কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য এখন কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। মূল বাঙলা কংগ্রেস থেকে সরে এসে সশীল ধাড়া এবং তাঁর অনুরাগীরা যে বাংলা কংগ্রেস গঠন করেছেন তাঁরা ১৯৭২ সালের নির্বাচনে একটিও আসন লাভ করতে পারেননি। দল হিসেবে এখনও টিকে আছে কটে। কিন্তু গত এক বছরে তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় নি। কেবলমাত্র '৭৩ এর জানুয়ারীতে তাঁদের সাধারণ সম্মেলন বসল। এই পর্যন্ত। বিপ্লবী বাঙলা কংগ্রেস তার অফিসেই সীমাবদ্ধ। তার বেশী কিছু নয়। এই দলটিও সি, পি, এম ছায়ায় রয়েছে।

পি, এস, পি; এস, পি ইত্যাদি মিলে সোস্যালিস্ট দল। সেই সোস্যালিস্ট দল পশ্চিমবঙ্গে নীরব। সর্বভারতীয় রাজ-নীতিতে তাদের মধ্যে চলেছে অমনেক। তার জের দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে।

দল হিসেবে সি, পি, আই বড় সে বিক্রেত সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত তার কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তার গতিবিধি

সমর্থক হিসেবে সি, পি, আই কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন এবং তাঁরা ভবিষ্যতেও করবেন বলে জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি সি পি আইএর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকেও ছোট দলের মধ্যে নাম লেখাতে হবে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বহুবার কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ছোটখাটো দল গড়েছিলেন। তাঁদের কোনো কোনো দল এখন বিলুপ্ত। কোনো কোনো দল এখনও কোনো রকমে টিকে রয়েছে শব্দ নামে। কাজে নয়। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে যে বিভেদ শুরুর হল তার পরিণতি দেখা গেল ১৯৭০ সালে। আদি ও নব কংগ্রেস হিসেবে বিভক্ত হল। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নবকংগ্রেস বিধান-সভার ২৮০টি আসনের ২১৬টি আসন লাভ করল। আর আদি কংগ্রেস কেবলমাত্র ২টো আসন। এই হিসেবে আদি কংগ্রেস এখন ছোটখাটো দল। তার অ্যাক্টিভিটিও ছোটখাটো দলের মতন। চার বছর পরে যখন আবার নির্বাচন হবে তখন তাঁরা কোথায় গিয়ে ঠেকবেন তা কে জানে?

বর্তমান শাসক দল এখন কংগ্রেস এবং তার দলেও চলছে দলদলি। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের বিধানসভা সদস্যদের নিয়ে ইয়ং লেজিসলেটিভ ফোরাম গঠিত হয়েছে। ওদিকে দিল্লীতে গঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরাম-এর কতারাও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের উপদল গড়বেন। শাসক কংগ্রেসের দলদলির ফলে উপদল অথবা ছোট দল হলে ভবিষ্যতে আবার একটি ছোট দলের আবির্ভাব হবে কিনা কে বলতে পারে।

এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে ছোট দলের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল নয়। কারণ বড় দলই শাসন ক্ষমতা হাতে পায়। তারাই রাজ্য চালায়। ছোটখাটো দল আবার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কারণ ছোট দলগুলো গণতন্ত্রের ছোট ছোট স্তম্ভ। ছোটখাটো স্তম্ভ ভেঙে গেলে গণতন্ত্র জন্ম হতে বাধ্য। কিন্তু ছোটখাটো দলগুলোর বাঁচা-মরার ভার তো সেই সব দলের নেতা ও জন-সাধারণের হাতে। সেখানে বড় দলের কোনো হাত আছে বলে মনে হয় না। বিগত চারটি নির্বাচনে ছোটখাটো দল কেমন করে জয়বিজয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে চারটি নির্বাচনে পনরটি মরসুমী দল পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক পট থেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রায় সব দেশেই কিছু মরসুমী দল গজিয়ে ওঠে এবং নির্বাচনের হারাজিদের ওপর তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেসব দলের কোনো ঐক্য রাজনৈতিক মতবাদ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনের কোনো ভূমিকা থাকে না, তাদের অবলুপ্তি কটে সবার আগে।

১৯৬৭ সালের পদ থেকে আমরা এই

অপমৃত্যু ঘটতে দেখছি। তারা শব্দ নির্বাচনে জিতে পক্ষ-মন্ত্রীর চেয়ারে বসে। তাদের কোনো সাংগঠনিক সংস্থা ছিল না। এই দলগুলোর অধিকাংশই কংগ্রেস দলজাগীদের দ্বারা গঠিত।

১৯৬৬ সালে বাংলা কংগ্রেস গড়লেন অজয় মুখার্জি ও সশীল ধাড়া। সেই বাংলা কংগ্রেস ভেঙে হুমায়ুন কবীর গড়লেন ১৯৬৯ সালে লোক দল। জাহাঙ্গীর কবীর গড়লেন এই বছরে জাতীয় দল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে আশু ঘোষ গড়লেন ১৯৬৯ সালে আই, এন, ডি, এক দল।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন ধরল, জন্ম হল নব ও আদি কংগ্রেসের। নব এখন আসল কংগ্রেসেরপেই পরিণতি। আদি কংগ্রেস মরসুমী দলে পৌঁছেছে।

১৯৭০ সালে বাংলা কংগ্রেস থেকে গড়ে উঠল বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। ১৯৭১ সালে আবার বাংলা কংগ্রেসে ভাঙন ধরল। সশীল ধাড়ার নেতৃত্বে গঠিত হল আর একটি বাংলা কংগ্রেস। গত পাঁচ বছরে চারটি নির্বাচনে উপরোক্ত প্রায় সব কটি দলই অবলুপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র আদি কংগ্রেস দুটি আসন নিয়ে কোনো রকমে টিকে আছে। আগামী নির্বাচনে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও আশংকা করছে।

বাংলা কংগ্রেস ১৯৬৭ সালে প্রাথমী দেব ৩৫ জন এবং আসন লাভ করে ৩৪টি, ১৯৬৯ সালে প্রাথমী দেব ৪৯ জন আসন লাভ করে ৩৩টি। ১৯৭১ সালে প্রাথমী দেব ১৩৭ জন কিন্তু আসন পায় ৭টি। ১৯৭২ সালে সশীল ধাড়া পঞ্চী বাংলা কংগ্রেস প্রাথমী দেব ১৯ জন, আসন পায় শূন্য।

১৯৬৯ সালে লোকদল প্রাথমী দেব ৭১ জন, জাতীয় দল দেব ১৯ জন প্রাথমী, আই, এন, ডি, এক দেব ৯৮ জন প্রাথমী। তার মধ্যে কেবলমাত্র আই এন, ডি এক পায় একটি আসন, বাকী দুটো দল একটিও আসন পায়নি।

১৯৭১ সালে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস তিনজন প্রাথমী দিয়ে ২টি আসন পায়, ১৯৭২ সালে ২ জন প্রাথমী দিয়ে একটিও আসন পায়নি।

আদি কংগ্রেস ১৯৭১ সালে ১৫৪ জন প্রাথমী দিয়ে পেরোঁছিল ২টি আসন ১৯৭২ সালে ৬৪ জন প্রাথমী দিয়ে ২টি আসন পায়। প্রাথমী সংখ্যানুসারে তাদের আসন লাভ বাধ্যতারই পরিচয় দেয় এবং এইভাবেই মরসুমী দলগুলোর অপমৃত্যু ঘটছে।

বিশ বছরে কংগ্রেস ভেঙে বহু উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণ কয়েকটি মধ্য-বামপন্থী দল গড়ে ওঠে ও ভেঙে যায়। যেমন কে, এম, পি; পি, এস, পি; এস, এস, পি ইত্যাদি। এইসব ছোট দলগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরে আরও কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়। সেই সব মরসুমী দলগুলো



না পেয়ে এখন তারা বিলম্বিত অথবা তাদের কর্মীরা অন্য দলে যোগদান করেছে।

পূর্নুলিঙ্গ লোকসেবক সংঘও কংগ্রেসের কিছদ দলভাঙ্গা লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে লোকসেবক সংঘ ৫ জন প্রার্থী দিয়ে ৫টি আসন লাভ করে ১৯৬৯ সালে ৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৭১ সালে ৯ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন আর ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ।

এককালে লোকসেবক সংঘের প্রতিপত্তি ছিল পূর্নুলিঙ্গ জেলায়। এখন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব নেই বললেই চলে। সেখানে কংগ্রেস জাঁকিয়ে বসেছে। কংগ্রেস থেকে ভেগে এসে যে সব ছোট দল গঠিত হয়েছিল, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তাদের যথেষ্ট বহু আসন কংগ্রেস আবার ফিরে পেয়েছে।

ময়সূরী দল ছাড়া অনেক ছোট দল গত পাঁচ বছরের নির্বাচন লড়াইয়ে যখন তারা কোনো বহু জোটের সঙ্গে থেকেছে তখন সেই জোটের কমতা ও জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করেছে তাদের আসন লাভ। যখন ইউ, এল, এফ জোট কমতামালী ছিল তখন তাদের জোরে বহু দল নির্বাচনে উত্তরে গেছে, আবার ইউ এল, এফেব বিপরীতে তাদেরও বিপর্যয় ঘটেছে।

এককালের কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা পি, এস, পি এক এস, এস, পি যখন বহু জোটে ছিল তখন তারা মল আসন পাননি। কিন্তু তাদের দলে ভাঙন ও এবাবকার সোস্যালিস্ট দলের একা নির্বাচনী লড়াই-এ তাদের যথেষ্টই ঘোষণা করে। ১৯৬৭ সালে পি, এস, পি ২৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৭টি আসন পেয়েছিল এস এস পি দিয়েছিল ২৬ জন প্রার্থী এবং পেয়েছিল ৭টি আসন। ১৯৬৯ সালে পি এস পি ২৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৫টি আসন পায়, এস এস, পি দল ১৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৯টি আসন পায়। ১৯৭১ সালে পি এস পি দল ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন ও এস, এস, পি দল ২৫ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন লাভ করে। এবাব তাদের দই দলে ভাঙনে ও মিলনে সোস্যালিস্ট দলের আবির্ভাব। ১৯৭২ সালে সোস্যালিস্ট দল কোনো জোটে যোগদান না করে ২৬ জন প্রার্থী দিয়ে একটিও আসন পাননি।

গোষ্ঠী লীগ ও ষাড়খন্ড দল ধর্মীয় নয় কিন্তু বিশেষ জাঁকসত্তার দল। এই দুই দলের মধ্যে গোষ্ঠী লীগ একইভাবে বয়েছে কয়েক বছর ধরে। তবে ষাড়খন্ড দলের জেলায় তা ঘটনি। গোষ্ঠী লীগ ১৯৬৭ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পেয়েছিল, ১৯৬৯ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৭১ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ও ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন লাভ করে। ষাড়খন্ড দল ১৯৬৯ সালে ৫ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, ১৯৭১ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে

২টি আসন, ১৯৭২ সালে ২০ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িক, আধা-সাম্প্রদায়িক ও চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলো পশ্চিমবঙ্গে গত চারটি নির্বাচনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এই দলগুলো সর্বভারতীয় দল বল টিকে আছে কিন্তু বিধানসভায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই। এইসব দল-গুলোর প্রমিক, কৃষক, ছাত্র ইত্যাদি কোনো সংগঠনে প্রভাব নেই বলে তারা বেশী ভোটও তুলতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জামানত জম্ব হয়েছে।

১৯৬৭ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ৫১ জন আর আসন পায় মাত্র একটি, স্বতন্ত্র দল প্রার্থী দেয় ২০ জন আসন পায় একটি। ১৯৬৯ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ৪৭ জন আসন পায় শূন্য, স্বতন্ত্র দেয় ৪ জন প্রার্থী আসন পায় শূন্য। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ দেয় ৪০ জন প্রার্থী আসন লাভ করে ৩টি। প্রাইমিট দল প্রার্থী দেয় ৪ জন আসন পায় শূন্য। হিন্দু মহাসভা প্রার্থী দেয় ৪ জন আসন পায় শূন্য। রিপাবলিকান পার্টি দেয় ৪ জন প্রার্থী আসন পায় শূন্য। ১৯৭১ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ২৫ জন আসন পায় একটি। হিন্দু মহাসভা দুজন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ ৫৫ জন প্রার্থী দিয়ে পায় ৭টি আসন। ১৯৭২ সালে জনসংঘ ১৬ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পায়। প্রাইমিট দল ৬ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। হিন্দু মহাসভা ২ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, মুসলিম লীগ ২৯ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ ১ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। এই হিসেব থেকে সাম্প্রদায়িক ও দক্ষিণপন্থী দল-গুলোর ভূমিকা পবিত্র করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এদের অস্তিত্ব মোটেই পবিত্র নয়। তাদের বিলম্বিত না ঘটলেও দল হিসেবে গুরুত্ব খুবই কম।

ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলোর অবস্থা নির্ভর করেছে ইউ এল, এফ জোটের শক্তির ওপর। যখন ইউ, এল, এফ জোট শক্তিশালী ছিল তখন তারা আশানুরূপ আসন লাভ করত। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে বামপন্থী মোর্চার শক্তি কমত থাকলে তারা অধিকসংখ্যক প্রার্থী দিয়ে কম আসন লাভ করেছে। তবে এইসব ছোট-খাটো বামপন্থী দলগুলো একেবারে বিলম্বিত হবে না এইজন্যে যে, এদের প্রত্যেকেরই প্রমিক, কৃষক, ছাত্র মহলে নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নে এদের এখনও ব্যক্তিগত প্রভাব রয়েছে। সেই জোরেই এরা টিকে থাকবেন। বিধান-সভায় যদিও এদের প্রতিপত্তি থাকছে না।

এককালের শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ব্লক ১৯৬৭ সালে ৪২ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল ১৩টি আসন ১৯৬৯ সালে ১৮ জন প্রার্থী দিয়ে ২১টি আসন, ১৯৭১ সালে ৫০ জন প্রার্থী দিয়ে আসন পায়

মাত্র ৩টি আর ১৯৭২ সালে ১৮ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে শূন্য আসন। বিধান-সভায় নিশ্চিহ্ন হবার পর দল হিসেবে কোনো বকয়ে টিকে আছে। ইতিমধ্যে এই দল থেকে কিছদ সদস্য পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে।

আর এস পি দল কখনই খুব বেশী প্রার্থী দেয়নি। অল্পসংখ্যক প্রার্থী দিয়ে যথার্থ সংখ্যক আসন লাভ করেছে। যেমন ১৯৬৭ সালে ৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৬টি আসন, ১৯৬৯ সালে ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ১২টি আসন ১৯৭১ সালে ৪১ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন ও ১৯৭২ সালে ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন লাভ করে সমতা বজায় রেখেছে।

বামপন্থী জোটের মধ্যে আর সি, পি, আই ১৯৬৭ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন ১৯৬৯ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ১৯৭১ সালে ৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন এবং ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পেয়েছে।

এস ইউ সি দল কবাবই খুব বেশী প্রার্থী দেয়নি। বজাই কবা কয়েকটি কেন্দ্র তাবা যথার্থভাবে লাড় আসন লাভ করেছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে ১৯৭২ সালে নির্বাচন। ১৯৬৭ সালে ৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৬৯ সালে ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি আসন লাভ ১৯৭১ সালে ২০ জন প্রার্থী দিয়ে ৭টি আসন আর ১৯৭২ সালে ১০ জন প্রার্থী দিয়ে মাত্র ১টি আসন লাভ করে।

দুটো বামপন্থী দল ওয়ার্কার্স পার্টি ও বঙ্গশোভক দল অবলুপ্তির পথে এগিয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টি ১৯৬৭ সালে প্রার্থী দেয় ২ জন আসন পায় ২টি, ১৯৬৯ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ১৯৭১ সালে ২ জন প্রার্থীর ২টি আসন লাভ ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন লাভ করে। বঙ্গশোভক দল ১৯৬৭ সালে ১ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে একজন করে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনও লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

বরাবর দেখা যাচ্ছে যে জোট শক্তিশালী সেই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছোট-বড় দলকে ভোটদাতা বা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করে। যখন জোট দুর্বল হয় বা জনপ্রিয়তা হারায় তখন তার ছাউনির ছোট দলগুলো সবসঙ্গে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাজনীরিত সনাতন নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাব ব্যতিক্রম নেই। পাঁচ বছর আগে যে ধরনের বাজনীরিত আবির্ভাব ছিল এখন তা নেই। নেই বলেই ছোটখাটো দলগুলো বদলাচ্ছে। তাই কিছদ, কিছদ দল এগিয়ে চলেছে অবলুপ্তির পথে। কিছদ দল বাবে। ভয়ত ভবিষ্যতে আরও নতুন ছোটখাটো দলের আবির্ভাব হবে। গণতান্ত্রিক দেশে তার সম্ভাবনাই বেশী।



## কায় ভোগে কত

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

**અપ્રસારણ સંજ્ઞાન્ત અર્થનીતિ :**

প্রাথ্য বা সম্প্রসারণের ফলে—অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকের গড় বা মাথাপিছু আয়ও বাড়ে। যদি না অবশ্য জনসংখ্যা আনুপাতিকের চেষ্টা বেশী হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন আমাদেব দেশে অনেক বছরই এমন হয়েছে যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বাড়েনি, কারণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্ধিত জাতীয় আয়কে গড় বা মাথাপিছু আয়ে প্রতিফলিত হতে দেখনি। দারুণ পন্থায়ে সামান্য আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি নতুন অর্থাতির আগমন ঘটে তাহলে ব্যাপারটা যেকোন দাঁড়ায় স্পষ্টতরূপে আব 'ক'। কিন্তু মাথাপিছ আয়বৃদ্ধি হল শোথ ইকনমিকসের লক্ষ্য, (এবং বলা যায় প্রাথমিক লক্ষ্য) দোত জাতীয় আয়বৃদ্ধি নয়। অবশ্য, মাথাপিছু আয় বাড়লে তবৈত বেশী অভাব মোচন সম্ভব হবে—সুখস্বচ্ছন্দে দার পূর্ণিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সংপ্রসাধনের ফলে নানারকম অর্থ-  
নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে  
কাধ্য। এই পরিবর্তন যদি কাম্য গ ত-  
প্রকৃতিব হয়, তবে তাকে ডেভেলপমেন্ট  
বা উন্নয়ন আখ্যা দেওয়া হয় তাপ পরিবর্তন  
একক্য হলে তা হল পঞ্চাঙ্গগতিবই স চাঙ।  
যখন অর্থনৈতিক সংপ্রসাধন অথবা জাতি  
বা মাথাপিছ আয়বর্ধিব ফলে দেশেব  
গবাপুলেব উন্নতি ঘটতে বিস্তৃত গ্রামাপুল  
সংপূর্ণ অবস্থলিত হাত পাব ধ্যৈষ্য  
বর্ধিব ফলে বিলাস দবোব উৎপাদন বাড়তে  
এবং জীবনধাবগোপয়োণী অপাবহার্য  
প্রবাদিব উৎপাদন হ্রাস পেতে পাবে ইত্যাদি।  
এইরকম ক্ষত্র গাত উৎপাদনল পরিমাণ—  
অর্থাক কি পরিমাণ বাস্তব্যাট বাড়ী ঘা  
নির্মিত এবং জিনিসপত্র উপলব্ধ হল—দিগ  
নিষ্যাটিব বিচাব ববাল ভুল হাব দেখাত  
হব এই উৎপাদন বর্ধিব কদেব জানা—  
প্রচলিত অর্থ অর্থনৈতিক উন্নয়নেব ফল  
ক কতটা পাচ্চ?

সুতরাং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং  
তথাকথিত উন্নয়নই ১৭শত নম্ব এদেশ  
মধ্যে জড়িত আছে আরও একটি  
বিশেষ প্রশ্ন-সামাজিক ন্যায়বিচারের

২৫. এবং এই বিশ শতকের  
বিত্যাস্য এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও তাৎপৰ্য্যের  
ব্যাপ্য বিশেষ প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপ  
বলা যায় সার্বিক প্রান্তরায়কের ভৌতাবি-  
বরণ যখন দুই গোষ্ঠার মধ্যে বহুস্তর অংশে  
ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বাজেনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে  
সম্প্রদায়িক পার্থক্যের একক বিশ্লেষণের পদ্ধতি-  
পাত্রে যখন গ্রহণযোগ্য নন তখন সামাজিক  
এবং ন্যায়ের প্রত্যেক পার্থক্যের জন্য একটি  
স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি সার্বিক শ্রেণীর উপেক্ষা  
এবং মতের সব ন্যায়ের ভেদে আলাদা। এই  
উপেক্ষা স্বাভাবিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি বহুস্তর  
চিত্রিত আলাদা সংস্থানব নীতি  
হিসেবে স্বাভাবিক ২৫.৬ যেমন আমাদের  
সংবিধানের বলা হয়েছে : ভারতের  
সম্পদ নাগরিকই থাকে অন্যায়ের  
এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও  
গণতান্ত্রিক ন্যায়বিচার পদ্ধতি পরে তার  
ন্যায় এই সংবিধান প্রণয়ন করা হল।  
(পরিচালনা প্রস্তাবনা)।

সংবিধানের ঘোষিত ন্যায়বিচার-ব্যবস্থা  
ব্যর্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ দূর্ব্যবস্থাপন, কার্য  
এবং ভুলের প্রাশস্তিক ব্যবস্থায় চলি আর্থিক  
সমস্যা বা জনস্বার্থের ব্যয়বহন দায়,  
এতদ্বারা যে আদর্শ শ্রীমতী গান্ধী 'গরীবী  
হতাঁও' স্বেচ্ছায় বঞ্চিত নহে। ভারতের  
এই অসংখ্য দেশ-যেখানে গ্রামাঞ্চল  
এই অসংখ্য দেশ-যেখানে গরীবী হতাঁও  
এই গ্রামাঞ্চল আর্থিক বা সম্প্রসারণকেই  
এই গ্রামাঞ্চল 'সংসার' গ্রহণ করিতে হয় নাচ  
দাঁড়িয়ে আছে। সবই টেনে এক  
গরীবী নামের আনা ছাড় আর কিছু  
করাই থাকে না। অথচ আমাদের দেশের মত  
এই দেশের দৈনন্দিন জীবন সম্প্রসারণের ফলে  
জনস্বার্থের ব্যয়বহন এতদ্বারা বঞ্চিত হইয়া  
পড়ে বা বঞ্চিত পড়ে সামাজিক ন্যায়-  
বিচারের আদর্শ ব্যর্থ হইয়াছিল। ঠিক সম্প্রসারণ  
হইছে না। এই উভয় সংকট থেকে পরিত্রাণের  
পথ কি তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।  
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে আর্থিক বৈষম্য  
এই বঞ্চিত পড়ে পাবে, না আমাদের  
সম্প্রসারণ পদ্ধতিতেই বড় কোন গরীব  
আছে?—এই হল আমাদের দিনের বিশেষ  
প্রশ্ন।

গুন্যার 'মিরডালের' (এবং আরো অনেকের) মতে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও বৈষম্যের গতি একই দিকে—অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেশ যত অনগ্রসর সেই দেশে বৈষম্য তত প্রকট। কারণ খুবই সহজবোধ্য।

এই সব অনগ্রসর দেশকে বর্তমানে মোলারের মতে বলা হয় স্বশাসিত দেশ বা আ-ভারডেভেলপড কান্ট্রি। লক্ষণ-বিচারে স্বশাসিত দেশ হল সেই দেশ যার বর্তমান মাথাপিছু আয় অতি সামান্য, কিন্তু যার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বশাসিত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জনবহুলতা ও জনবিস্তারণ। এন সুবোণ নিরে বৃদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থার কতিপয় ব্যক্তি ও শ্রেণী সহজেই সমাজের অপরাংশকে শোষণ করে বিস্তালাী হয়ে ওঠে। যেমন, শস্য জমির মালিক তারা জমির বর্তমান চাহিদার দরুন সহজেই বেশী খাজনা, ফসলের ভাগ ইত্যাদি আদায় করতে সমর্থ হয়। (অর্থনীতিশাস্ত্রের শৈশব অবস্থাতেই ডেভিড রিকার্ডো এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।) অনুরূপভাবে যাদের নগদ টাকা আছে তাদের পক্ষে বিত্তহীন খাতকদের কাছ থেকে বেশী সুদ আদায় করা সম্ভব হয়। এই অবস্থার সামান্য যে কটি শিল্প গড়ে ওঠে তাদের মালিকরা শ্রমের প্রয়োজনীয়তার বোঝানোর ফলে মজুরির স্বল্পতা এবং মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাবের দরুন মূল্যবাহী অর্থকরী বাড়িতে তুলতে পারে। এইভাবে বস্তুবোধ্য জাতীয় আয়ে খাজনা, সুদ ও মূল্যবাহী অর্থ বাড়তে থাকলে মজুরির অংশ কমতে বাধ্য। ফলে খাজনা সুদ ও মূল্যবাহী ভোগকরী এবং মজুরিভরী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন সম্প্রসারিত হতে থাকে—অর্থাৎ বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভাই বলা হয়, আর্থিক বৈষম্যহ্রাসের জন্য প্রথম কসণীর হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করা।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন সত্ত্বেও বৈষম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, অথবা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তবে কি করা যেতে পারে? এই প্রশ্নটাই আজকের দিনে বড় হবে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নিজস্বের অবস্থা থেকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

#### ভারতে বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ:

আর্থিক বৈষম্যের মোটামুটি তিনটি দিক আছে: ধনবৈষম্য, আয়বৈষম্য এবং আর্থিক মর্যাদার বৈষম্য এবং যেহেতু আর্থিক মর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত সেই হেতু আর্থিক মর্যাদার বৈষম্যের ফলে সামাজিক মর্যাদাতেও বৈষম্য দেখা দিতে বাধ্য। যেমন, গ্রামীণ পরিবেশে সামান্য জমি মালিকের মর্যাদা ও কৃষক ভূমিহীন

কৃষি-শ্রমিক তা কল্পনাও করতে পারে না। ঐ জমি থেকে আর বাই হোক না কেন, জমির মালিক গ্রামীণ সমাজের ওপরের তলার লোক। এই দিক দিয়ে আরবৈষম্য অনেকটা তাৎপর্যহীন। তবে আরবৈষম্যের ফলে যে ভোগবৈষম্য দেখা যায় তা আমাদের মত জনবহুল দেশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে আলোচনা পরে করব। এখন সংক্ষেপে আর-বৈষম্যের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিশেষ কম নয়—প্রাথমিক হিসেব অনুসারে ১৯৭০-৭১ সালে তা ছিল ৩৪,০০০ কোটি টাকা কাছাকাছি। মোটের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের বিচারে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দেশের মধ্যে। আবার মোট প্রবাদি উৎপাদনের পরিমাণ ধরলে—অর্থাৎ বেলব জিনিসপত্র হাটে-বাজারে বিক্রির জন্য আসে না এবং জাতীয় আয় গণনার যার হিসেব পাওয়া যায় না তাদের ধবে বিচার করলে ভারতের স্থান বা র‍্যাংকিং হল চতুর্থ বা পঞ্চম। ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন পর্ভুগাল ও সুইজারল্যান্ডের জাতীয় আয়ের সমষ্টির চেয়ে বেশী দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় আয়ের পাঁচগুণ অস্ট্রেলিয়ার তিনগুণ এবং ইংল্যান্ডের জাতীয় আয়ের অর্ধেক। মোট পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের স্থান জাপান ও কানাডার সঙ্গে একই পর্যায়ে। অথচ এইসব দেশ হল অত্যন্ত বা উন্নত আর ভারত হল অনগ্রসর দেশ—যদিও খ্যাতির করে বলা হয় স্বশাসিত।

জাতীয় আয়ের পরিমাণ যেমন বিশেষ কম নয়, অপরদিকে জনসংখ্যাও তেমন। বিপুল—১৯৭১ সালের জনগণনার হিসেব অনুসারে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। ফলে গড় বা মাথাপিছু আয় মাত্র ছশ টাকা—অর্থাৎ মাসিক ৫০ টাকা। এই হিসেব আবার বর্তমান বা ১৯৭০-৭১ সালের দামের ভিত্তিতে—যে সালে কুড়ি বছর আগের ডলনায় টাকার দাম অর্ধেকেরও বেশী কমে গেছে। সুতরাং আজকের মাসিক ৫০ টাকা হল ১৯৫০-৫১ সালে ২৫ টাকারও কম। ১৯৫০-৫১ সালে মাসিক ২৫ টাকার বা তারও কম, অথবা আজকে মাসিক ৫০ টাকার খেয়ালে বেঁচে থাকা খাব কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কি?

তবে যদি জাতীয় আয় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষম্যহীন হত, তাহলে এই বিপুল জনসংখ্যার দরুন সামান্য মাথাপিছু আয়েও দারিদ্র্য বা গরীবীর প্রশ্ন আমাদের ততটা প্রসিদ্ধিত করতে না। কিন্তু তা হয়নি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছিল যে (জানুয়ারী, ১৯৬৩) ওপরের দিকে ১০ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং নীচের দিকে ১০ শতাংশ জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৫-৩ শতাংশ পেয়ে থাকে। এবং নীচের

এই ১০ শতাংশের মাসিক আয় ৭ টাকারও কম। এর 'কিছুদিন' পরে (১৯৬৪) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের নেতৃত্বে 'জাতীয় আয় ও সম্পদ বন্টনের ওপর কমিটি' পরিচালনা কমিশনের উক্ত অভিমতকেই সমর্থন করে। কমিটি ঘোষণা করে: পরিকল্পনাধীন প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) জাতীয় আয়ের বন্টনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি।

আজকেও—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশ বছর পরেও যে এই বন্টন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং দেখা যায়, বৈষম্য বৃদ্ধিই পেয়েছে। মোটামুটি হিসেব অনুসারে বর্তমানে ওপরের দিকে ৫ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ পেয়ে থাকে, আর নীচের দিকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোকের ভাগ্যে মোট জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশেরও কম। এই হিসেব মেনে নিলে ওপরের পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাবে যে বিগত দশকের শুরুর দিকে আর-বৈষম্য এত প্রকট ছিল না।

জাতীয় সম্পদের বন্টনে কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটেছে তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভূমিহীন কৃষিকারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এই বৃদ্ধির হার বিগত ২০ বছরে ছিল ৮-১০ শতাংশ। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কৃষি-বহিঃহৃত ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটছে—সমাজের নীচের স্তরের সম্পদ ক্রমাগতই হস্তান্তরিত হচ্ছে ওপরের স্তরে। এমতাবস্থায় আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

#### বৈষম্যের আরও দুটি দিক:

ভারতে আর্থিক বৈষম্যের আরও দুটি দিক নির্দেশ করা যায়: নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য। নগরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে যে গরীবীর পরিমাণ বেশী তা সকলেরই অনুভূত গতা।

প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর হয়ে থাকে, কিন্তু সকল সভ্য দেশেই গ্রামাঞ্চলে একটা ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান—থাকে 'ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শাশীমতার মান' বলে অভিহিত করা হয়—লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে এই মান প্রবর্তন করা এখনও যে সম্ভব হয়নি তা শিক্ষা স্বাস্থ্য বাস্তবায়িত পরিবহন-ব্যবস্থা বিদ্যুৎসরবরাহ, এমনকি পানীয় জল সরবরাহের দিক দিয়ে বিচার করলে সহজে বোঝা যায়।

অনুরূপভাবে আঞ্চলিক বৈষম্য আমাদের দেশে বিশেষ প্রকট। ধরা হয় যে ভারতের জনসংখ্যার মোট অর্ধেক দারিদ্র্য-রেখার নীচে বা কাছাকাছি বাস করে কিন্তু উড়িষ্যা এই পরিমাণ হল ৭০ শতাংশের মত।

ভূভিয়ার, চেন্নেও দারিদ্র এবং হৃদয়শূন্যতা  
অশূল আছে।

### বৈষম্যজনীন গতি:

এইভাবে আর্থিক বৈষম্যের অস্তিত্ব এবং  
কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সকল সম্প্রসারণশীল  
দেশের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। বেকারি  
হিগিনস দেখিয়েছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্ব-  
যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক  
প্রভাবাধীন ফিলিপাইনেও (যে দেশের ৫১  
তম অংগরাজ্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের  
অন্তর্ভুক্ত হবার কথা শোনা যাচ্ছে) আপাত-  
দৃষ্টিতে মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য  
বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে  
কোন পরিবর্তনই ঘটেনি, কারণ যুদ্ধোত্তর  
যুগের সম্পদ ও আর বৃদ্ধি ওপরের  
তলাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই ব্যাপারে  
নোথহর শ্রীলঙ্কাই (সিংহল) একমাত্র  
গতিভ্রম—একমাত্র যে দেশেই জাতীয় মাথা-  
পিছু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য হ্রাস  
পেয়েছে এবং পাচ্ছে। সুতরাং সমাজকল্যাণ  
ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি রাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কা  
সকল স্বল্পোন্নত দেশের উদ্বোধন। অতএব  
কল্পে যাহা কল্পে তাহা নয়...।

### বৈষম্যের প্রতিফলিত রূপ:

আর্থিক বৈষম্য যে সরাসরি ভোগ-  
বৈষম্যে প্রতিফলিত হয় তার উল্লেখ শরুতেই  
করা হয়েছে। নমনীকারণ বা স্যাম্পেল  
সার্ভিসের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ওপরের  
দিকে ১০ শতাংশ লোকের ভোগের পরিমাণ  
মোট জাতীয় ভোগের ৩০ শতাংশ, অপর-  
দিকে নীচের দিকে ৪০ শতাংশ মোটের ২০  
শতাংশ ভোগ করতে সমর্থ হয় না। খাদ্য-  
পণ্যের দিক দিয়ে দেশের মোট জনসংখ্যার  
১০ শতাংশকে অতি চরিত্র বলেই ধরতে  
হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থাও শোচনীয়।  
সমস্যা বিভাগের হিসেবে এই শিল্পসমৃদ্ধ  
পশ্চিমবঙ্গেও ৬৫ শতাংশ পরিবার মাত্র  
একটি করে ঘরে বাস করে এবং অপরদিকে  
৬ শতাংশ পরিবারের ঘরের সংখ্যা ৩ বা  
ততোধিক। পূর্বেই উল্লেখ করছি যে, মোট  
জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্র-রেখার নীচে  
বা কাছাকাছি থেকে কোনরকমে দিন গুজরান  
করে।

### বৈষম্যের মৌল কারণ:

সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে পশ্চিম  
ইয়োরোপে শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে  
আয়-বণ্টন উত্তরোত্তর বৈষম্যমূলকই হচ্ছিল,  
এবং মাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ে 'স্প্রেড এফেক্ট'  
বা বিস্তারিত প্রচেষ্টার (প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কিত  
জ্ঞান ছাড়িয়ে পড়া) কার্যকারিতা এবং  
উৎপাদন বৃদ্ধির পর সমাজকল্যাণমূলক  
আইন প্রণয়নের ফলে আর বণ্টনের গতি  
বিপরীতমুখী হতে থাকে। একটা উদাহরণ  
নিম্নে বিশ্বব্রতীর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার  
প্রথম পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কলাকৌশল  
ও শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা  
চাহিদার তুলনায় কম ছিল বলে জাতীয়  
আয়ে এই সব ব্যক্তির ভাগও ছিল বেশী।

তারপর, যন্ত্রা যাক, এই কারণের লোকের  
সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাদের প্রাপ্যও কমে গেল  
এবং ন্যূনতম মজুরি আইন ইত্যাদির ফলে  
মজুরি বৃদ্ধি পেলে বৈষম্যও হ্রাস গেল।  
(আমাদের দেশে অবশ্য তা ঘটেনি)।

এইদিক দিয়ে দেখলে আর্থিক বৈষম্য-  
বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও গতি-  
শীলতারই দোষক। ভারতে কিন্তু সম্প্রসারণ  
বা উন্নয়ন কোনটাই চমকপ্রদ নয়। অতএব  
ভারতে বর্তমান আর্থিক বৈষম্যের বৃদ্ধি-  
বিচারে পশ্চিম ইউরোপের মত অতীত  
উদাহরণের সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ  
অর্থহীন। বলা যায় নগরীকরণের  
ক্ষেত্রে মতই বর্তমান আর্থিক বৈষম্য  
সম্প্রসারণের হাত ধরাধারি করে চলেছে—  
নগরীকরণের মতই আর্থিক বৈষম্যের  
বৃদ্ধির কারণ হল পর্বাণ্ড উন্নয়নের  
অভাব।

ভারতের উন্নয়নপন্থাটিও পশ্চিম  
ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনীয় নয়। গোড়া  
থেকেই ভারত উন্নয়নের জন্যে অর্থনৈতিক  
পরিকল্পনা গ্রহণ করে, এবং অতীত দ্বিতীয়  
পরিকল্পনা (১৯৫৬—৬১) থেকে সুদৃষ্ট-  
ভাবে ঘোষণা করতে থাকে যে বৈষম্য অ-  
সারণ উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্যতম মূল  
লক্ষ্য। ঘোষণাটির অনুমান ছিল মোটামুটি  
এইরকম অনুমানভিত্তিক: বর্তই আমরা  
বৈষম্য হ্রাস করতে সমর্থ হব, অর্থনৈতিক  
সম্প্রসারণও তত দ্রুততর হবে।...

এখানেই রয়েছে আমাদের উন্নয়ন-  
পন্থাটিতে লক্ষ্যের সংঘর্ষ: আগে সম্প্র-  
সারণ, না আগে বৈষম্য অসারণের  
ব্যবস্থা। অনেকের মতে, আগে সম্প্রসারণের  
পথে অগ্রসর হলেই 'যোধ হই' পন্থাটিতে  
বৌদ্ধিকতা থাকত, কারণ অনগ্রসর অর্থ-  
ব্যবস্থাই বৈষম্যপ্রসূত দারিদ্রের জন্মভূমি।  
অপরদিকে অবশ্য বলা যায় যে বৈষম্য-  
হ্রাস ছাড়া সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি  
সম্ভব নয়, এবং আমাদের দেশের মত গণ-  
তান্ত্রিক পরিকল্পনার সফলতা এই সামা-  
জিক উৎসাহের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর-  
শীল। কিন্তু দেখা যায় যে, বৈষম্যহ্রাসের  
জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ বিশেষ কার্য-  
কর হয়নি, তাই সামাজিক উৎসাহসৃষ্টির  
অপারগতা পরোক্ষভাবে বৈষম্যবৃদ্ধিতে  
সহায়তা করে এই বৃদ্ধির অন্যতম গোপ  
কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

### গোপ কারণ:

বৈষম্যহ্রাসের জন্যে প্রস্তাবিত ও অব-  
লম্বিত ব্যবস্থাসমূহের পর্বাণ্ডোচনা  
করলেই বৈষম্যবৃদ্ধির অন্যান্য গোপ কারণের  
সংধান পাওয়া যায়।

১৯৩১ সালের করাচী অধিবেশন  
থেকেই কংগ্রেস ঘোষণা করে আসছে যে  
আয়ের উন্নয়ন দ্বারা নির্ধারণ করতে  
হবে। মোটামুটি এর সপক্ষে পরিকল্পনা  
কমিশন, কম্প্রদ অনুসন্ধান কমিশন অভিন্নত  
প্রকাশ করলেও এ বিষয়ে কোন কিছুই  
করা সম্ভব হয়নি, কারণ কম ছিল যে, এর  
ফলে উদ্যোগ ব্যাহত হবে। এইদিক

অনেক ক্ষেত্রে জমির উন্নয়ন দ্বারা নির্ধা-  
রণেরও বিরোধিতা করে আসা হয়েছে।  
এই ব্যক্তিতে যে বন্ধন অন্যান্য ক্ষেত্রেও  
সম্পত্তির উন্নয়ন দ্বারা নির্ধারণ করা  
হয়নি তখন শব্দ জমির ক্ষেত্রে এই বন্ধন  
কি ন্যায়বিচারের দোষক হবে?  
করব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে বৈষম্য  
অসারণের বেশ কিছুটা প্রচেষ্টা করা  
হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশাসনিক  
প্রাট্টির জন্যে এই প্রচেষ্টা বিশেষ কলঙ্ক  
হয় নি-কর প্রবর্তনের আর্থিক ক্ষয়, ধরনে  
বরং ফল বিপরীতই হয়েছে।

অপরদিকে কিন্তু অকল্পিত মূল-  
স্বার্থ অনেককে দারিদ্ররেখার নীচে টেনে  
নিরে গিয়েছে এবং পরিকল্পনার বিপুল  
ব্যয় ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পদ ও  
আয়কে কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে করক ধরনের আশু  
উপস্ফকারী ব্যবস্থার সাহায্যে অবস্থার  
কিছুটা পরিবর্তন ঘটানর যে চেষ্টা করা  
হয়েছে তার সফল ভোগ জনসাধারণ  
করেনি, কয়েক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী।  
বরেন জমি-সংস্কার ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র  
কৃষিকারীর পরিকতে উপকৃত হয়েছে  
মধ্যবিত্ত কৃষক। আবার সমষ্টি-উন্নয়ন  
প্রচেষ্টা, কৃষিসম্প্রসারণব্যবস্থা প্রভৃতি  
প্রশাসনিক প্রাট্টির জন্যে দারিদ্র কৃষিকারীর  
তত্তীর্ণ করানি বর্তী লাভবান করেছে  
সংগতিপন্ন কৃষককে।

মান্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রভৃতির  
প্রেরণায় ভারতে বিভিন্ন শ্রমকল্যাণ ও  
মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইন পাশ করা  
হয়েছে সত্যি এবং এর ফলে সংগঠিত  
বহুদায়তন শিল্প-ব্যবস্থার শ্রমিকদের  
অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতিও হয়েছে।  
কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে এই শ্রমিকরা  
একরকম বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী—এ  
প্রিভিলেজড ক্লাস। সংখ্যাগ্রে তারা বিশাল-  
সংখ্যক গ্রামবাসীর কাছে কিছু নয়। এই  
শ্রমিকরা ৬০ ডাগ গ্রামবাসীর জন্যে এইরকম  
কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতই  
ভারতে সেই সেই ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ প্রবণতা  
দেখা যায় যা ওপরের দিকের জনসংখ্যাকেই  
সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকারী কর্ম-  
চারীদের জন্যে গৃহনির্মাণের উল্লেখ করা  
যেতে পারে। এই কাজ আপাত চমকপ্রদ  
হলেও সত্যিই কি অধিক প্রয়োজনীয়? অন্য-  
ভাবে বলতে গেলে, গৃহহীনদের জন্যে গৃহের  
ব্যবস্থা করার চেয়ে সরকারী কর্মচারীদের  
জন্যে বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা বেশী  
স্বকার? এই ধরনের চমকপ্রদ নির্ধারণকে  
সাধারণের বাহ্যিকভাবে পূর্ণ ভোগ বলে  
অভিহিত করা হয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে স্বাধীনতা ও শ্রমিকার  
সাম উন্নয়নের প্রচেষ্টা বৈষম্য দূরীকরণে  
সহায়তা করে। এক্ষেত্রেও সরকারী খরচের  
অতি সামান্য অংশ জনসংখ্যার নীচের দিকের  
ফাগে এসেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক  
শিক্ষালব্ধদের অবশ্য পর্বাণ্ডোচনা করলেই

ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି-ବ୍ୟବସ୍ଥା :

গণসিদ্ধি বটিক-এর কার্যকারিতা

(২) উৎপাদন-পরিকল্পনার চেয়ে ভোগ-পরিকল্পনার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বস্তুত, উৎপাদন-পরিকল্পনা হবে ভোগ-পরিকল্পনার সহায়ক।

(৪) অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনব্যয়  
প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে, কারণ উৎপাদন-  
ব্যয় বাড়িলেই আমাদের মত দেশে দারিদ্র  
দূরীকরণ কোন মতেই সম্ভব নয়।

(৬) যারই আয়ের ২৬% কর্তব্য।  
জানতামের নীচে তারই ৩-৫% রাষ্ট্র খেতে  
প্রত্যেক ও পদোচ্চ সহায়ত। পরিপূর্ণ  
বাবস্থা করা হবে।

বজা যার গরীবের হাট। কার্যকর  
শ্রোগান সম্প্রদায়ের কার্যনিতিতে জন্ম  
ভেদে দিক দিয়ে যত্ন সহকারে বজা করবে।  
কিন্তু কার্যকর হবে কার্যকর কতটা লক্ষ্য  
করবে তা নির্ভর করে শ্রমায়। যত্নসহ  
সম্প্রদায়।

অর্থনৈতিক-সেবিত-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের

এর জন্যে প্রয়োজন কর-ব্যবস্থার  
সংস্কারের। কাপো টাকার উৎসর ও  
অপসারণ, আয়কর ব্যবস্থায় রদ-বদল  
জালায় অর্থাৎ মনোমুখ্য করে'র কথা জালা

এই উপাদানবিকৃত সত্যকে ভারতীয়  
শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে একচেটিয়া কার্যবাহার  
উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে আছে দুটি  
কারণঃ- অস্বাভাবিক নস্কর্ণীতা এবং শিক্ষা-  
উদ্যোগের সঙ্কটাপাত। এর দরমাইঃ- যতটুকু  
আর্থিক ক্ষমতার উপস্থিতিতে- এবং অধিকতর  
আর্থিক শিল্পেরঃ- সাহায্যে- এর বিরুদ্ধে  
ক্ষমতা- অধিকতর কর্তৃত্ব হল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে  
মনে রাখতে হবে। আমাদের সমাজ বিশেষ-  
ভাবে বধ্যাঙ্ক বরণের ভোগের দিকে  
বাক্যে স্বকায়ের ক্ষেত্রে বাহ্যাদ্ভব

সবক্ষেত্রে অনুভূত না হলেও পরিবর্তন ঘটেছে শূন্য করেছে, এবং দাওয়া দাওয়া আশঙ্কিতা, অপরাধ-প্রবণতার বৃদ্ধি ইত্যাদি হল এই পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষারই

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

# কুমারী কাল

অনিলা ভৌমিক



স্টেশনে ঢাকার মুখেই দেখা যায় ট্রেন থেকে। হলুদ বস্তুর দেখাল ঘরা বাড়ি। উমা সেই কুমারী কালকে অভ্যস্ত মতই কান্না দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকায়। কলকাতা পড়ার সময় ও ডেইলী প্যাসেঞ্জারী কবিত। কতদিন মনে মনে গুলেছে এক দুই তিন করে। ওদের বাড়ির সীমানা থেকে স্টেশনে এসে ট্রেন থামতে বন্ধক ওর চাকল থেকে বিখ্যাত গান শেষ হত। অজ্ঞকে আর গুলল না। ট্রেন যাত্রার ধকলে গবীর ক্রান্ত। দেখতে দেখতে গাড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। পটখর হাতের কাছে নিয়ে সুরত তৈরীই ছিল। কেতের খোড়া, পাখা, চাক এসব টুকটাকি জিনিসগুলো উমাই নিল। কলীর পেছনে যেতে যেতে সুরত হাত বাড়িয়ে বলল কয়েকটা জিনিস আমাকে দাও না?

—জানি নিতে পারবো। সুরত এবার চাপাচ্ছো বলল—

—তাহলে আমাকেও নাও না।

—এ্যাট! উমা সলজ হাসল।

রিক্সার বেতে যেতে সুরত বলল—ট্রেন থেকে কী দেখলে? অল কোয়ারেট—

তাই তো মনে হল। ফুটককে দেখলাম অকড়া চুল দু'লম্বা বাগান দৌড়। তাই নতুন বং কবিরেছেন বাড়িটা। বাইরেব গেটের অপবর্জিত গাছটায় ফুল ফুটেছে। দবকা জানালার নতুন পর্দা লাগানো হয়েছে।

তাহলে এখনে আসার জন্যে এত মরিয়া হয়ে—

—আঃ বিপদ আপদ না ফলল যদি আসতে নেই।

—তা কেন বললে—

—এক বছরও বেশী তোমার এই হিংস্রগঞ্জের জগলে পাড়িছিলাম—আনুষের মুখ তো দেখতে ইচ্ছা করে

—অ।

রিক্সাটা বাড়ির গেটের কাছে এসে ছাড়াতেই ফুটক, অল, ছোট এল। বাও দাবগাড য এসে দাঁড়াল। বাণা বোম্বের বাড়ি নেই। মলপত্র নামানো হল। ঘবে আসতেই সুরত এক দার কিছু অনুরোধ শুনতে হল। সেই যে স্বিকাগমনে এসেছিল উমা তাপস আর ওক এখনে আনাই হল না। সুরত সুরত বালকর মত মাথা নীচ করে বার বার ঘুরে ফিরে একটা কথাই বলতে লাগল—ছটিছটি নেই মানে।

সুরতের অসহায় চহাবটা দেখে উমা হ'সি চাপতে পারল না। মাও ইচ্ছা কিছ একটা মন্দাজ করে থাকত। তাই মনে পড়ে চটা খাও—বলে বাধিন্তক বং বহুয় ও ড নিস্ত গেল। বাক বাড়ি ফিরেই অবার ছুটলেন বাজায়। কড়িতে রেশ একটা লোকগেল পড়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর উমা পান চিবুত চিবুতে ঘবে ঢুক দেখল সুরত চাখ বসুকে সিগারেট টানছে। পোড়া ছাইটা নখাৎ বিছানায় পড়ল। উমা তড়ু তড়ি ছাটানিটা এগিয়ে ফিল কোনদিন বিছানাটা পোড়াবে।

ও সবত সূচ্য খুলে ছাটানিটা বুলেব ওপব বেখে ছাই ঝাড়ল। বলল পান পমড

হু, মা বলল—তই। উমা ঘবটব চাবদিকে তাকিয়ে এঁকায় দেখা ছব। ড্রসিং টোঁকল খাট ছোট আলনা প'ন কিছই সবানো হয় নি। সেই ও'ল কামগাড়েই অচ্ছ সন।

—জানো—এই ঘরটা আমাব ছিল।



পদ্মকুরের চাতালটায়—উমা যখন এসে  
দাঁড়াল তখন ফট্টুমুটে চাঁদের আলোয় সব  
কিছুই ভগ্নত দেখা যাচ্ছে—পদ্মকুরের জন্ম,  
সিঁড়ি, পদ্মের নকসা। উমা চুপ করে বাসে  
রইল। চঠাৎ যেন মনে হল বরুণ ওর  
পাশেই বসে আছে যেমন স্রাবের বসন্ত।  
একদিন ইলুতো—কুঠে গিয়ে চাতালটায়  
দাঁড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে ঔরংজেবের  
পাট বলতে শুরু করবে নয়তো গান  
গেয়ে উঠবে—আমায় কী দিয়ে সাজাব  
না আমি ছা-না লগা গৃহকাসিনী। কিছু  
বরুণ ভাঙে দেখতে নেই। উমা লুপ্ত ভীত  
হল। চারদিক জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে

বাঁকে কখনও কখনও সেরা সেরা  
 গায়ে দাঁ। কখনও কখনও সেরা সেরা  
 আছে। ইতিমধ্যে একদিন ডাকিলে—কী হু  
 বাউলার মত দেখবে না? অথবা আসামের  
 বিহু শাস্ত্র মনে? উমার সমস্ত শরীর  
 যেন কম্পন হয়ে এল। ও নড়তে পারবে  
 না। বরষা হরতো হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর  
 হাত ধরবে—সেদিন যেমন ধরেছিল। হঠাৎ  
 উমার মনে হল—কে যেন ওকে পেছন

থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। কখনও কখনও  
 বড়ো পদেব হাত কাঁধের দিকে উঠে  
 আসছে। বরষা? বাউল টক নিম্বাস। এ  
 কী করে সম্ভব? উমার সমস্ত শরীর  
 থর থর করে কেঁপে উঠল। একটা অবা  
 চাইকার করে ও উঠে দাঁড়াল—কে?  
 —কী হল? সুরতর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়  
 —ভূত জখলে নাকি?  
 উমা দৃষ্টি হাতে সুরতকে জড়িয়ে

ধরল। সুরতর বড়ো হুস জ্বলল। ওর  
 চোখ দুটো জলে ভিজে উঠল। তখনও ওর  
 শরীরটা কাঁপছে। এবার ওর নয়—  
 স্মৃতিতে, স্মৃতিতে।  
 সোনার থালার মত চাঁপটা তখন মাক-  
 আকাশের দিকে উঠে এসেছে। বরষা  
 হাওয়ার পক্ষুরের জলে শির শির ঢেউ  
 উঠছে। পক্ষের নকসা-জিকা চাতালটা  
 আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

## বাউলার একমাত্র মোলতানা খাঁটি:



# সিংহমার্ক নারকেল তেল

চুল থাকতে চুলের যত্ন নিন। অল্পবয়স থেকে চুলের  
 সর্বাঙ্গীন যত্ন নিতে সিংহমার্ক নারকেল তেলের জুড়ি নেই।  
 বাছাই করা নারকেলের শাঁস ভেজে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বরংগিত  
 যন্ত্রের সাহায্যে এই তেল তৈরী হয়। কলে সিংহমার্ক  
 নারকেল তেল হয়ে ওঠে খাঁটি, গাঢ় এবং বিশিষ্ট গন্ধে  
 ভরপুর।  
 চুলের গোড়া নষ্ট করতে, চুলকে ঘন এবং চিকন কালো  
 করে তুলতে সিংহমার্ক নারকেল তেল অমিতীয়।  
**হিন্দুস্তান কোকেনাট অয়েল মিলস**

# শ্রবণ বেলগোলা

১ (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাণী শাস্ত্রাচার নাম অনুসারে এই নাম হয়েছে। শাস্ত্রলেখককে প্রণয় করে নাড়া দিলাম বিশাল ঘণ্টা, গম্ভীর ধ্বনিতে মুখ্যরিত হয়ে উঠল মন্দিরের স্তম্ভ বিশাল অস্তিত্বের ভাগ।

মন্দির মধ্যে ঢুকতে দুই পাশে দুই বিরাট কুম্ভার্তি। পূর্বে সুবর্ণ নারায়ণের মন্দির।

মস্ত অশ্বের ওপর সারথি অরুণ।

মূল মন্দিরের পাশে চাঁদোয়া তলে মস্ত বড় নন্দী মূর্তি রয়েছে, আশ রবেছে অনেক স্তম্ভ। ভাবও অদূরে অনতিপ্রাপ্ত স্রোতস্বিনী প্রবহমান। দূর-সমুদ্র নাম।

কবে কৃষি বাস্তুকটবংশীযবা কোন সুদূর নবম শতাব্দীতে হুদ তাঁর করেছিল। দূর-সমুদ্র নাম। মন্দিরের উত্তর দিকে প্রান্তরে কিছু ঘর বাড়ি, লাল টালির ছাদ, সাদা দেয়াল, সব মিলিয়ে অপূর্ব চিত্র।

এই মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য হল এর বাইরের প্রাচীর বার প্রতিটি অংশ সীমাহীন বৈচিত্র্যময় মূর্তিতে পূর্ণ।

হস্তাযুধ, সৈন্যদল, নানা জন্তু-ঘোঁসার, নানারকম পাখি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি নানা উপাখ্যান, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি অতুলনীয় সম্মা নিয়ে প্রস্তরগাত্রে শিল্পীর নিপুণ হাতে সব সূক্ষ্ম কারুকার্যে ফুটে উঠেছে। চতুর্দশ ক্রুকের সর্ব চিত্র একেও শিল্পীর তুষ্টি হযনি, রামায়ণ মহাভারতের সর্ব উপাখ্যান খোদিত করে বেছেছেন।

প্রবেশ দ্বারের ওপরে প্রভাবলীতে নটরাজের মূর্তিটি বড় চমৎকার।

এর সিলিংয়ের স্তম্ভের ওপর যে অপূর্ব জাকেট মূর্তি ছিল সে সব ইয়েরেজরা এদেশের অন্য অনেক বস্তুর মত নিখে গেছে নিজেরদের দেশে। এখন দুটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

আমরা ধরে ধরে দেখতে লাগলাম।

বেলুড় মন্দিরের মতই প্রাচীর চিত্র অর্ধ সারিতে গ্রীষ্মত।

সমস্ত দক্ষিণভারতীয় মন্দিরের এই এক বিশেষত্ব।

প্রাচীর চিত্র আটটি সারিতে গ্রীষ্মত থাকে।

এখানকার ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রশিল্পী উল্লেখযোগ্য। কোথাও হংসামিশ্র, কোথাও গাঙ্গুলি, অশ্বারোহী মূর্তি কোথাও। মা শিশুকে স্তন্যপান করছে, একজন একজনকে জল ঢেলে দিচ্ছে, সে জল খাচ্ছে। শৃঙ্গাররত নরনারীও রয়েছে।

বিদ্যর নারীর বস্ত্রাঙ্গল আকর্ষণ করছে, নারী বসি উল্লসিত করছে বাদরের প্রতি, এই দৃশ্য দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলাম। পুরাণের অসংখ্য কাহিনী।

দশ অবতার, প্রহ্লাদ চরিত্র। ধর্ম-পার্বতীর বিবাহ। স্বামী স্বাধেয় বৃন্দ। অশোকবনে বিষময়না লীলা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা।

কর্ণাভূমির বৃন্দ।

অজুনের হংসমূর্তি, কর্ণের কাক মূর্তি, এত স্পষ্ট যে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।

হস্তভাগ্য কর্ণের মথের চাকা কানায় কস গেছে, পর্বদন্ত অশ্বের হাটু তেজে পড়েছে, বৃন্দকেয়ের এই মহা করুণ দৃশ্য কি যে চমৎকার ফুটে উঠেছে পাথরের গায়ে। দেখে চোখ ফেরান যায় না, এত জীবন্ত, মন বেহালায় ভরে ওঠে।

কানাড়া ভাষায় শিল্পীর নাম লেখা রয়েছে 'মাতা'। কে এই শিল্পী এই দুটি মাত্র অক্ষরে নিজের পরিচয় লিখে রেখে গেছেন?

এই শিল্পী হয়ত তৎকালীন পরিচিত্র ওপর নির্ভর করেই এই দুটি অক্ষর লিখে বেছেছেন, ভবিষ্যতের অস্তহীন কালের কথা চিন্তা করেন নি।

## সবিভা সেনগুপ্ত

অপেক্ষাকৃত বড় বড় মূর্তির মধ্যে বাঁপা হাতে সবস্বতী মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

মদানিকা মূর্তি নয়নমনোহর।

দেশ হাতে স্নায়ু প্রভাগ মূর্তিতে কদম্ব গাছের মতই দৃঢ়ায়মান। গোপ ও গোপনীয় উদ্বেগ দৃষ্টিতে তাঁর মোহন মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গরুগালি এমনভাবে মাথা তুলে গলা উচু করে তাকিয়ে আছে, মনে হল যেন জীবন্ত। সেই দৃশ্য বন্দাবনের এই মধুর দৃশ্য প্রস্তর স্ফোরিত শিল্পী শাস্বতকালের জনর বিধৃত করে রেখেছে। আমবা বিভোর হয়ে দেখতে লাগলাম, শিশু দুটি পশুস্ত চঞ্চলতা জুড়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চোখ সত্যিই ফেবান বাব. না। সেই বৈক্য কবির পদ, জন্ম অবধি কাম রূপ নেহাবিন্দু, নয়ন না তিরণিত ভেল। সত্যিই দেখে দেখে নয়নেব আশ ঘটে না। দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত জনশ্রুতি প্রান্তরে কি অপূর্ণ মন্দির কত কাল ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় ওখানে পুরাতন সেই স্নায়ু-বংশ, কোথায় হারিয়ে গেছে সৈনিকার জম-জমট রাজ্যপট অঙ্গ জনপদ। কিন্তু কালজয়ী

হয়ে রয়েছে অপূর্ব সেই ভাস্কর্য। বর তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন।

হালেকিভের মন্দির দেখে শিল্প-সমালোচক ফাগুদসন বলেছেন হালেকিভের মূর্তিগুণের গড়নে ও বিন্যাসে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবের প্রতিকলন রয়েছে যা কেবল ফোটোচিত্রেই দেখা যায়। প্রস্তব রেখার খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তোলার অসীম কৈব ও অধ্যবসায় প্রাচীর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও আবার হালেকিভের শিল্পীরা বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন।

ফাগুদসনের মতে জ্যামিতিক জ্ঞানবও চরম পরিচয় হালেকিভের শিল্পীরা দেখিয়েছেন। পাস্কাভো মধ্যযুগীয় গাথিক-শিল্পে যেখানে পদম নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে সেখানেও তারা হালেকিভের শিল্পীদের মত এমন সৌন্দর্য ও জ্যামিতিক পবি মূর্তিবোধের পরিচয় দিতে পারেননি।

মূর্তিগুণের কাছের কাছ ও আলোছায়ায় পরিচয়পনাতো গাথিক শিল্পীদের চেয়ে হালেকিভের শিল্পীরা উচ্চতরের জ্ঞানব পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীর চিত্রে বেলুড়ের মন্দিরের মতই ছুমির সমান্তরালবতী পর পর আট সাব খোদাই মূর্তি।

ওপরের চার সারিতে মনুষ্য মূর্তি, নীচের চার সারিতে পশু মূর্তি ও গতা-পতা। নিম্নতম সারিতে রয়েছে ছশো হুমারিগতি হাড়া। কোন দুটিই বার এক রকম নয়।

তার ওপরের সারিতে কীটমুখ বা সিংহমুখ। তৃতীয় সারিতে মন্ডনশিল্পেব একটি সুন্দর উদাহরণ। মাঝে মাঝে ছড়ান রয়েছে মন্দিরবিহীন সমাজ-জীবনের চিত্র। মন মিশ্রনও বাদ যায়নি।

তার ওপরের সারিতে ফুলের মালা। বস্তু সারিতে সমস্ত নৃত্যরতা নাবী। আলারিপদ, জাতিস্মরণ, বর্ণম-ভিন্নাথ, ভারতনাট্যের এই চারটি মুখ্য নৃত্যাংগের বিভিন্ন মূর্তি তথা হস্ত-লক্ষণ ও অঙ্গভঙ্গী প্রস্তর-রেখায় অপূর্ণ লীলাময় হয়ে উঠেছে।

অষ্টম সারিতে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী কার্ণিত হয়েছে।

এই সারিগুলির ব্যাখ্যাটা বোধহয় এইরকম—

গোড়াতে পশুজীবন নিয়ে শুরু। প্রথম শ্রেণিতে পশু হস্তাযুধ।

তৃতীয় সারিতে ভোগী রাজস্বয় জীবনোৎসব। বৌদ্ধধর্মে বলে কল্লোলক বেখানে শ্রেয় হয়, সেখানে রূপলোকের আদর্শ।

এখানেও তাই।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে বঙ্গের মাঝা এবং নৃত্যরসে রূপসৌন্দর্য আভাস। রূপ-লোকের পর দেখালাক। সর্বসময় রূপের সারিতে দেখাওঁর 'বঙ্গের কীছিনী'।

এবার কুমার পালা। এক স্বল্প সময়ে সেখা আপ সেটে না। কিন্তু হাতে সময় বেশি নেই। গাড়ি আমাদের নিয়ে এসে প্রত্যেকের ঘাসে।

হাস্যেবিত থেকে বিদে আসা আর একবার মেলায় মেলায়ের মিলিয়ে।

-কুমারের প্রাচীর-চিত্র নিয়ে আসার ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম।

পাথর খোদাই করা কুমারীলা দেখতে দেখতে তখনই হয়ে গেছে। আরো কত বিচিত্র রকমের ছবি প্রস্তর-রথার ছন্দময় করে কাঁটের ফুলেরে শিল্পী। শুধু দেখার লীলামেলা নয়, সমগ্র মানব-মানবীর জীবনচিত্রও রয়েছে।

প্রাকট-চিত্র অনুবাস।

কোথাও রূপবীণাধারী নারী। কোথাও পশ্চিমের দর্পণবিধতা নারী দর্পণে আপন মূখ্যমের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করছে, কোথাও তীরধনু হাতে নারী পলায়মান শিকারের পশ্চাতে ধাব-মানা। কোথাও শিকার করে নারী হরিণ নিয়ে ফিরছে। কোন প্রমদায় পারে বিধেছে কাঁটা, অপরা ভা অতি সন্তপণে বের করে দিচ্ছে। এখনি কত সুখচিত্র।

নারী যাচ্ছে মৃগয়াতে। এই চিত্র দেখে মনে হয় ওই সময়ে দক্ষিণাংশে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না।

কতটু খুঁজলেই পব প্রথম সহস্র বছরের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় মধ্যে মেয়ে-দেখ মূখ্যে ওপব কোন আবরণ দেখা যায় না।

সাঁচীর ভাস্কর্যে দেখা যায় অলিন্দ থেকে কামিনীবা শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করছে।

মুখ তাদব অনুবগুণিতাই।

পাচীর ভাস্কর্য ও খুঁটপূর্ব ২য় পতকেব।

অজন্তার কয়েকটি চিত্র থেকেও বোঝা যায় খুঁটীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে দক্ষিণাভ্যে মেয়েরা অবগুণেনব আড়ালে থাকত না।

কিন্তু তবু মনে হল শিকাররতা নাবীর সাক্ষ্য কি কেবল নগ্নাধারক, গুধুই কি বলে যে পর্দা প্রথা তখন অজানা ছিল?

আব যা ছিল—নাবীর নিবোধ বাস্তব স্বাধীনতাব নিঃসংশয় প্রমাণও কি বহন করছে না? আধুনিক পাশ্চাত্য নাবীর মত শিকারে পূর্বের সঙ্গে ষাওরা নব। সহচরী সঙ্গে নিজের হাতে শিকার করতে যেতেন প্রাক-মুসলমান যুগের হিন্দুনারী।

মূল মন্দিরের অদূরে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। তার নিকটেই চাক্ষুস তীর্থঙ্করের ছোট ছোট মূর্তি দৃষ্টিগোচর হল।

হিন্দু মন্দির প্রাঙ্গণে জৈন তীর্থ-ঙ্করের মূর্তি লক্ষ্য করবার মত। বস্তুত

এই দুই মন্দিরেই পরস্পরবিপরীত কেল নয়, পরস্পরের প্রতি কার্যকর গ্রন্থা গ্রন্থারের আগে বৃত্তান্ত লক্ষ্য করে চমকিত হয়েছি।

এখানে বিদ্যু-মন্দিরে গভীরের প্রবেশদ্বারের পাশেই ছয়পদতীরস্থ।

হাস্যেবিত শিবমন্দিরের দুই পাশে দুইটি বিরাট কুমারী।

জৈনধর্ম এক সময়ে দক্ষিণাভ্যে প্রকৃত পরিমাণে বিস্তারলাভ করেছিল।

জৈনধর্মের প্রাতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহা-বীর যুদ্ধদেবের সমসাময়িক হয়েও তার পূর্বজ। তিনি বিদেহর কোন এক রাজ-কংশের মেলে ছিলেন।

জৈনমতে মহাবীরের কাল খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক। তিনিও ভগবান যুদ্ধদেব মত সম্যাস গ্রহণ করেন। যিশ বছর বয়সে সম্যাস গ্রহণ করে দীর্ঘ বয়স বহন সাধনার পর তিনি কৈবল্য লাভ করেন। তারপর দিশ বৎসর ধর্ম প্রচারের পর বাহাবুর বয়স বয়সে পাটনায় জন্মগত পাতাতে দেহরক্ষা করেন।

জৈনরা মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করে না। জৈন প্রবাসমতে মহাবীরের আগে এই ধর্মের আরো তেইশ জন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর।

বোধ নিবোধ আর জৈন কৈবল্য একই বস্তু। জৈনদের মতে বোধই হচ্ছে কৈবল্যলাভের একমাত্র পথ।

জৈনধর্মের অনুশাসনগুলির মধ্যে অহিংসা প্রধান কথা।

কঠোরভাবে অহিংসা পালন এবং কুম্ভ-সাধন এই দুইটি বোধধর্মের সঙ্গে জৈন-ধর্মের প্রধান তফাৎ। কৃষি কাজে জীবেত্যা করতে হয় বলে জৈনরা এই কাজটি কখনো কবে না।

তবে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ব্যবসা-বাণিজ্যে কাজে এঁরা অত্যন্ত আগ্রহ।

মহাবীর যুদ্ধদেবের মত গৃহত্যাগে জোর দেন এবং সম্যাসী সংঘ গড়ে তোলেন।

মনে হয়, ভগবান তথাগতের মত মহাবীর তার ধর্মমত আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেননি।

কিন্তু এই ধর্ম প্রেমের ধর্ম, তবু বৃহত্তর জনতার কাছে তার ধর্মের অনু-শাসন পৌছাননি।

রাজা-রাজড়া এবং কতক বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এই ধর্মের আবেদন পৌছিয়েছিল এবং প্রত্যাগজিতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। অবশ্য ষোড়শ বাংলার উপরও জৈনধর্মের ষোড়শ প্রচার পড়েছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য শেষ করলে জৈনধর্ম গ্রহণ কবেন এবং মহী-শরের প্রবলবেলগোলার তাব গুরু ভদ্র-বাহুর সঙ্গে আসেন এবং সেখানেই প্রাণ-ত্যাগ করেন।

এবার আমাদের যাত্রা জৈনদের পুরন-তীর্থ প্রবলবেলগোলাতেই।

জৈন ধর্ম-পুস্তককে সিংহাস্ত বা আগম বলা হয়। মূল জৈনমত চৌদ্দ পুস্তকে (পুস্তক-প্রাচীন গ্রন্থে) সমিবেশিত ছিল। মহাবীরের প্রধান শিষ্যদেব নাকি এই সব পুস্তকের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ছিল।

মহাবীরের মৃত্যুব পব দুশ বছর কেটে গেছে। যুগে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। এই সময়ে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হল। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল এই দুর্ভিক্ষ দেশের বুক জুড়ে ছিল।

দুর্ভিক্ষের সূচনাতে জৈন সংঘের প্রধান অধ্যক্ষ ভদ্রবাহু দেশত্যাগ করতে সংকল্প করলেন। বিপুল সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণাভ্যে কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা কবেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও গুরুব অনুগমন কবেন।





আচার্য ক্রিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মৃত এই ভদ্রবাহু বাঙালী ছিলেন আর তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। প্রবেশবলী।

বহুদূর পথ। যেন অতীতহীন। পথে যেতে যেতে প্রত্যেকবর্গী ভদ্রবাহু, বুদ্ধগণ তাঁর অন্তকাল আসন্ন। তিনি প্রবণবল-গোলায় থেকে গেলেন। বিশাখাচার্যকে সংঘে ভাব দিয়ে এগিয়ে যেতে নিদর্শ দিলেন।

বিশাখাচার্য ভিক্টর নিষে অগ্রসর হলেন। আর যে সম্রাট সাম্রাজ্য পবিত্রাগ কবে গুরু পদানুসরণ কবে এসেছেন, দুই দুর্গম পথে তিনি কি কবলেন? তিনি যে সাব জেনেডেন গুবোবাস্ত্র পক্ষে মনোনিবেশ লনঃ ততঃ কিম ততঃ কিম।

তিনি প্রবণবলগোলাতেই থেকে গেলেন গুবুর সেবার জন্য।

প্রবণবলগোলায় ভদ্রবাহুর সমাধি আজও বর্তমান।

মহাজ্ঞানী ভদ্রবাহু ত দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে জৈনশাস্ত্রের জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল।

জৈনসংস্কার অধ্যক্ষ স্বলভ্য ভাষন পাটলিপুত্রে জৈনদেব সভা আহ্বান করলেন এবং জৈনসংস্কার চতুর্দশ পুস্তক প্রকাশ অঙ্গো লিপিবদ্ধ হল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যেসব ভিক্টর গিয়েছিলেন, তাঁরা যখন ফিরে এলেন স্বলভ্য-ভদ্রব অনুরক্ত শিষ্যদেব সংগে তাঁদের বনল না।

কাবণ এঁরা বস্ত্র পরিধান কবতে শব্দ কবেছেন আর ভদ্রবাহুর শিষ্যাবা উল্লাখাকাই জৈনধর্মের প্রধান অঙ্গ মনে কবে নগ্ন থাকতেন। যেত বস্ত্র পরিধান করতেন বলে একদল অবতাম্ভব আর বিবস্ত্র থাকতেন বলে অপর দল দিগম্বর নামে পরিচিত হলেন।

এট বিচ্ছিন্নটি শব্দ, হয় খঃ পূর্বে তৃতীয়-চতুর্থ শতকে আর খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জৈনরা একেবারে ভালমত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান।

এঁদের মতবাদেও প্রভেদ প্রচুর ছিল।

আমরা যখন হালেবিতে গিয়েছিলাম, আমাদের সংগে ছিলেন কাণ্ণালোর আকাশবাণীর কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার। স্থানীয় লোকসংগীত থেকে করে আনতে ওঁরা গিয়েছিলেন।

শিল্পীদের গানের ভাষা কিছু বুদ্ধজ্ঞান না, কিন্তু তাঁদের হস্তশ্রী রূপন প্রাচীনতম চেহারা ও দিককার গ্রামীণ অর্থনীতির সোচনীর অবস্থা ই প্রত্যক্ষ হল যেন।

লোকসংগীতের সাদৃশ্য-উচ্চমাস কিন্তু মাত্রও মেনে ছিল না তাঁদের কণ্ঠে।

শিল্পীদের বেশির ভাগই নারী।

দু-তিনখানা গানের পাশে কয়েকটি মেয়ে সমবেত কর্তে একটি গান গাইল। বেশ সরুলা গলা এবাব মনে হল।

আবার লোকসংগীত শুনছিলাম বেলুড়ে গিয়ে। সেখানেও ইঞ্জিনিয়াররা কিছু লোকসংগীত রেকর্ড করে নিয়েছিলেন।

বেলুড়ের শিল্পীরা বেশির ভাগই হালা ছেলে। মেয়ে শব্দ অপব্যয়ক কয়েকজন। তাঁদের চেহারা হালেবিতে মেয়েদের মত অল্প তারুণ্যবর্জিত নয়। গাইলও ভাল। যদিও ভাষার জন্য আমরা তেমন উপভোগ করতে পারলাম না।

বিকেল চাটের সময় প্রবণবলগোলায় বাসে উঠলাম। আবার মালভূমির উঁচু-নীচ পথ পাব হতে হতে বাস থামল এসে এক সময় হাসান শহরে। জেলা শহর।

ফুলেতে গাছেতে মঙ্গল সুন্দর রাজপথ দেখতে বড় সুন্দর।

কলাগাছের ঝাড়। নাবকেলবাঁধ।  
—কি সুন্দর দেখতে শহরটা।  
আকাশবাণীর মিঃ ভাস্কর কলকেন, হ্যাঁ, সূত্রাই সুন্দর। এটাকে বলে পুণ্ড-ম্যানস উটি। অর্থাৎ দাঁড়ের উটকাশত।  
এখানকার আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য ভাল, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।



এই জেলার দক্ষিণদিকেই উত্তর-পশ্চিম  
কর্ণ। পশ্চিম ভাগের পর্বতশ্রেণী উত্তর-  
পশ্চিম দিকেই যায়। তবে এই পর্বতশ্রেণী  
জল, বায়ু, আলো, শব্দ, এই পঞ্চাশকে  
উভয় দিকের দিকেই ছেঁদে। পাহাড়-  
প্রান্তরে অসংখ্যমতে নদনালিকার স্রো-  
তের স্রুতি করেই এ-সময়।

কাজেই তারা উত্তরমুখেই পৌঁছিবাসে  
যেতে পারে না, তারা এই সুন্দর হাসান  
শহরে এসে থামে। হঠাৎ কলহ নেই।  
বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে পৌঁছান। কটন।  
এই উদ্যোগিক-একোলায় মেঘা-লিকচার  
পাশের বৈদ্যুতিক সিনেমাগৃহ।

ড্রাইভার যখন স্ট্যাণ্ডে এসে বাস  
দামাস, একজেন করলাম, কোন খাবার  
জানেন? সত্যি বলে। ছোকরা হেসে  
বলল, লব্ধ। এ তো আর ময়দানো  
বা মাদ্রাস নয়। এ হল হাসান। বাস-  
স্ট্যাণ্ডের প্রান্তরেই মোকান রয়েছে। খোজ  
নিয়ে জানা গেল রেল দাঙ-কলমলো  
সবাকছরই।

এদিকে মিঃ জাকর এসে বললেন, তাঁর  
আখীর একজন জুটে গেছেন। রাতের মত  
এই হাসানে থেকে যাবেন। কাল ভোরে  
আমাদের সঙ্গে এসে প্রবলবেলগোলায়  
যোগ দেবেন।

এই সদাহাসাময়, মানবীটি সঙ্গে  
থাকবেন না কেনে মিনটা ভাল লাগল না।

তা খাওয়া হল। কফি ক্রীমে নেওয়া  
হল। হাসান পেরিয়ে আবার নিজের স্তব্ধ  
প্রান্তরের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলল।

আরাম এখন মেঘমেঘের। মেঘাচ্ছন্ন  
আকাশের নীচে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে  
দক্ষিণাত্যের মালভূমি সামনে ডাইনে বায়ে  
সবই প্রসারিত বতবুর দৃষ্টি যায়।

কোথাও ঘান ক্ষেত, কোথাও জলাশয়।  
মত থাকে গ্রাম আসছে।

নাম কি? শান্তিনগর।

দু'একজন খাটী উঠল, দু'একজন নেমে  
মেঠো পথ ধরে কোথায় চলে গেল।

বাস এগিয়ে চলছে।

বেলা শেষে বিঘর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের  
এক আলো নিভেই আসছিল, এবার মেঘ-  
বরণ আকাশ সেই মর্দিত আলোর কোমল  
কালটিকে নিজের আধার পল্লবপুটে একোয়ে  
ঢেকে ফেলল।

বন্টি নামল। আধার নিবিড় হয়ে  
রতও নামল। অসমতল সঙ্কীর্ণ আধার  
পথে হেডলাইট জ্বললে গাড়ি সামনে  
এগিয়ে যেতে লাগল।

কয়েকটা স্টেশন এল গেল।

ড্রাইভার এক সময় দেখাল ওই দু'বে  
আলো দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে, ওই  
পাহাড়েরই সমীকটে আমাদের গন্তব্য-  
স্থল।

বন্টির সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জলো  
হওয়া হু হু করে বইছে, বন্টির ছিটি  
মসছে। গাড়ির ছাদ চুইয়ে দু'এক ফোটা  
পড়ছে। থোকাকে চাদর জড়িয়ে নেওয়া  
গেল।

গাড়ি এল চিকমগপেটে।  
আকাশবাণীর সংযাত্রীরা লোক-

সংযাত্রীদের শিল্পীদের চপালে কান্ড।  
গাড়ির মোটাইটার মাজাপার জড়াবধানে  
লোক-বাল শিল্পীদের হুইল।

গাড়ি গাড়িয়ে গেল।  
বল্লভবদ্যুত রাইফলে পাহারা জল না-  
কাউকে। আধার গাড়ি জড়ল।  
এক সময়ে মাজাপার মোটাইটার  
এল।

নিবিড় অন্ধকারে জ্বলন্ত বন্টির মধ্যে  
গাড়ি থেকে নেমে হাতের জড়ি খলে  
মাজাপা। যে কোথায় ছিলি, গেলেন  
জাবলে আজও আমার বিপর্য বোধ হয়।

সংকীর্ণ বন্দুর পথ। বকর-বকর  
শব্দ করতে করতে বন্টার প্রান্তরে জমা জল  
ছিটিয়ে ছিটিয়ে গাড়ি চলতে লাগল।

প্রায় এসে গেল প্রবলবেলগোলায়।

চুই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওপরে  
ওঠার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেখা  
যাচ্ছে, চুড়ায় আলোকিত গোমতেবরের  
বিশাল মূর্তি।

প্রবলবেলগোলা।

যেখানে শুরুর প্রতীকবলী উদ্বাহার  
সঙ্গে গহীত তিষ্ঠিত চন্দ্রগুপ্ত  
এসেছিলেন। তাঁর নাম তখন প্রচাচন্দ্র।

এক সময় পাহাড়ের পাদদেশে এসে  
গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, মাদেলার্স  
খালো।

রাতি তখন সাড়ে ত্রিশটা।

এই বাজারের ছোট ছোট খান কয়েক  
ঘরের ব্যবস্থা ভালই। বিচিত্র আহারের  
ব্যবস্থা ভালো বলা চলে। এই মিলান  
প্রদেশে আবহমানকাল থেকেই বোধহয়  
খাদ্যপ্রব্য বিরল।

উদ্বাহার যখন এদেশে এলেন, আপন  
আন্তমকাল আসন্ন ছেনে রয়ে গেলেন  
এখানেই, চন্দ্রগুপ্ত রইলেন গরুতে  
সেবা করার জন্য।

নিষাখাচার্য গুরুর আদেশে গমন  
করলেন মহীশূরে। দেশে প্রত্যাগমন করার  
কালে পুনরায় এলেন প্রবলবেলগোলায়।

চন্দ্রগুপ্ত সাধামত আতিথ্য সেবা  
করলেন। কিন্তু নিষাখাচার্যের মনে সন্দেহ  
হয়েছিল এই নিজের প্রদেশে গৃহস্থ ত  
একজনও নেই। তবে এখন আতিথ্য সম্ভব  
হল কি ভাবে?

তিনি নাকি প্রথমে চন্দ্রগুপ্তকে  
বন্দনাও করেন নি। পরে অনশ্য তাঁর ক্রুদ্ধ  
ভেঙেছিল। চন্দ্রগুপ্ত তত পবিত্রচিত্ত তা  
বুঝতে পেরেছিলেন।

আমাদের অক্ষয় সৈন্যদল ট্রাকেলার  
বাংলোতে আতি কক্ষণ থেকেই থাকতে  
হয়েছিল। ঘরজামাই পশ্চিমবঙ্গকে কদর  
খাইয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল,  
আমরা পালানাম না। পাহাড়ের ওপর  
আলোকিত গোমতেবরের পাদদেশে  
পৌঁছনের জন্য স্রিস্রাস করতই হল।

রাতি তিনটের সময় আমরা-জেনে  
গেলার। পাহাড়ে এখনই যাব, হাত ত সময়  
বেশি নেই। আমরা যে ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে তত  
যে সে-সহজে লাগবে এবং আমাদের সহ-  
যাত্রীরা হবে তা মনে হল না।

শিশুরাও যুদ্ধক্ষেত্রে।  
ও থাক তাহলে ওদের নিয়ে।

বারাণসীর বৈদ্যের সোধ নিশান্তের  
আধারে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে ওঠার আলো-  
গুলো। চুড়ায় আলোকিত গোমতেবরের  
মূর্তি সারাটি রাত অতদূর প্রবর্তী রয়েছে  
উদ্বাহারিত বিশাল আকাশের নীচে।

পমিত্র প্রকৃতির বিরাট আয়তাক পট-  
ভূমিকায় এক অপূর্ব মহান দৃশ্য।

আমরা রওনা দিলাম, যাতে প্রত্যুষের  
আগেই গোমতেবরের পায়ের নীচে গিয়ে  
পৌঁছাতে পারি।

আধার জনহীন পথ তারার আলোয়  
স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, আমরা পাহাড়ের দিকে  
এগিয়ে যাচ্ছি। চন্দ্রগিরি আর ইন্দ্রগিরি।

দুই পাহাড়ের মধ্যে প্রবলবেলগোলায়  
তীর্থ। পাহাড়ের পাদদেশে এসে প্রশান্ত  
সিঁড়ি ভেঙে আমরা ওপরে উঠতে  
আরম্ভ করলাম।

পাটলো পদ্মশতা সিঁড়ি ডিঙিয়ে প্রথম  
চক্রে আসা গেল। প্রথম দরজা পেরিয়ে।

চারদিক ঘেরা পাথরের খাড়া দেয়াল,  
দুর্গ প্রাকারের মত।

বিরাট প্রাঙ্গণ পাথরে বাঁধানো, মাঝ-  
খানে প্রধান মন্দির।

ভেতরে তিনটি প্রধান তীর্থঙ্কর  
রয়েছেন উত্তর-পশ্চিম আর পূর্বমুখী  
তিনটি পৃথক মন্দিরাংশে।

প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ, চতুর্দশ  
তীর্থঙ্কর কালিনাথ আর স্বাধীনতাভঙ্গ  
তীর্থঙ্কর নৈমিনাথ। কিস্বদন্তী এই যে  
আদিনাথের ছিল একগত তিনজন সন্তান।

এদের ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা  
রয়েছে। বাইরের প্রাঙ্গণে উঠে এলাম আরো  
কটা সিঁড়ি বেয়ে।

এই বাঁধপ্রাঙ্গণের প্রাচীর প্রকাণ্ড  
প্রকাণ্ড পাথর তৈরী।

প্রাঙ্গণ প্রাচীরে নানা চিত্র খোদিত  
রয়েছে। তার মধ্যে রামলীলায় সীতা ও  
হনুমানের চিত্র, বালগোপাল কালীয় দমন  
ইত্যাদির চিত্র দেখে বিমমত হলাম।

সম্পদ নেই এগুলি ঐজনতার্থ সনাতন  
হিন্দু-ধর্মের প্রতি সাহিত্য, গ্রন্থাদরই পরিচয়  
দেছে।

গল্প শুনলাম সুপ্রাচীন যুগে রাম-  
দক্ষিণ এসেছিলেন লক্ষা যাবার পথে।

এখন যেখানে গোমতেবরের মূর্তি  
দৃশ্যমান রয়েছেন, তখন সেখানে ছিল  
অখণ্ড পাহাড়। শ্রীরামচন্দ্র এই ইন্দ্রগিরি  
পাহাড়ের গায়ে গোমতেবরের মূর্তির  
একটি স্কেচ তীরফলাশ দিয়ে একে রেক্ষে  
ধান।

তারপর নিরবধি কাল বইতেই লাগল।  
একলা মহীশূরের চামুণ্ডরাজের হাউস-  
গোড়র হল সেই ঈশিক-ফলাশকে অক্ষিত  
রেক্ষেচিহ্নি।

চামুণ্ডরাজ মহীশূরের বিখ্যাত গংগা  
বংশের রাজা-রাজমালার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।  
এক-বাক্যে শ্রুতগো এই শাস্তা বংশের  
আনন্দুলো মহীশূরের জৈন ধর্ম বিশেষ  
প্রসার লাভ করেছিল। চামুণ্ডরাজ পাশের

পাহাড় চতুর্দিকের শিবির সংস্থাপন করেছিলেন।

রাত্রি নরপতি স্বপ্নে আদেশ পেলেন, পশ্চিম দিক মূখ্য করে তীর নিষ্কোপ করো। সেই তীর যেখানে পড়বে সেখানে গিয়ে দেখো ব্রীলামচন্দ্র এক মূর্তির বহিরেখা একে গেছেন। এই মূর্তিকে তুমি রূপ দাও। ইনিই গোমতেশ্বর।

চামুন্ডরাজ তীর ছুঁড়লেন।

পবনবেগে তীর আদ্য হুয়ে গেল পলকে হাওয়ার খলক তুলে।

তারপর বোঁরিয়ে পড়লেন তিনি নিজেরই নিষ্কোপ শরীর সম্মানে।

রাত্রি পর্বতে জাঁকিল অরণ্যের দিগম্ব পাথ পিপথ প্রমোদ পুরলেন, অনেক অজ্ঞান। যে শর তিনি নিজেই নিষ্কোপ কবিত্বন যে শর কোথায় আত্মগোপন করল।

শেষে খুঁজে খুঁজে এসে দেখেন ইস্ট-গিরি পাহাড়ের চড়ায় সেই শারক ব্রীলামচন্দ্রের অঙ্কিত বহিরেখার কাছে নিশ্চিন্তে শয়ে রয়েছে।

চামুন্ডরাজ তখন পাথর কেটে কেটে এই বিশাল মূর্তি গড়লেন।

মনে হয় সারা বিশ্বের এর চেয়ে বৃহৎ মূর্তি আর নেই।

এই বিপুল মূর্তি পাথরকে মাথা পর্যন্ত ৫৬ই ফিট উঁচু।

১৮৩ খ্রিস্টাব্দে এই নিয়টি নান মূর্তির নির্মাণকাব্য সমাপ্ত হয়।

আসলে এ হল বাহুবলী মূর্তি।

বাহুবলী আর গোমতেশ্বর এক।

বাহুবলী প্রথম তীর্থঙ্কর আশিনাথের পুত্র। আশিনাথের দুই পুত্র। যশস্বতী ও সুনন্দা। যশস্বতী একশত এক পুত্র, সুনন্দার একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

পুত্রের নাম বাহুবলী।

যশস্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত দ্বিবিজয় করে ফিরে আসছিলেন। আগে আগে আসছিল তার চক্রে যেন আসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। হঠাৎ সেটা চক্রে গতি হত্যা হল। কেন? কার এমন দুঃসাহস হল যে দ্বিবিজয়ীর চক্রে গতি রোধ করতে চাষ?

ভরত এগিয়ে এলেন।

ভাই বাহুবলী তার অধীনতা মানতে রাজি নয়।

ভাইয়ে ভাইয়ে ঘোর যুদ্ধ সুরু হল। কিন্তু সে যুদ্ধ অহিংসার।

সে আবার কেমন?

দাঁটি বৃদ্ধ, জলযুদ্ধ ও গর্জযুদ্ধ।

জলযুদ্ধ হল পরস্পরের গায়ে পান্য দিয়ে জল ছোটানো।

তিনটিতেই বাহুবলী জয়ী হলেন।

অপমানিত বড় ভাই অহিংসা তুলে চক্রে ছুঁড়ে মারলেন ছোট ভাইয়ের দিকে।

চক্রে কিছুই করতে পারল না বাহুবলী।

বাহুবলী চক্রে লুকে নিয়ে ভরতের দিকে ছুঁড়ে মারতে পারলেন না।

কিন্তু তাঁর তখন বৈরাগ্য এসেছে।

করণ উদাস বৈরাগ্য। এসেছে সমদলিত অন্তর্দৃষ্টি।

মহর্ষির মধ্যে তাঁর কাছে মিথ্যে মনে হল সব কিছু।

তিনি অরণ্যে প্রবেশ করলেন তপস্যার জন্য।

অনেক অনেক বছর তপস্যা করলেন। দেহের চারদিকে জমল বস্মীক, দেহ ঘিরে দেহের চারদিকে গজালো নানা লতাপাতা। সেই লতা খোদিত রয়েছে গোমতেশ্বরের বিশাল উন্নত দণ্ডায়মান মূর্তিকে ঘিরে।

হাটের নীচে থেকে দাঁড়িয়ে বেয়ে দুটি লতা বাহুবলী পর্যন্ত উঠে গেছে।

উদাস করণ ভাব ফটে উঠছে মনে চোখে সর্ব অবরনে।

অবিস্মরণীয় এই মূর্তি।

দূরকম আসন তপস্যার।

এক, পরিমলকণ আসন, ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে; দুই কারোৎসর্গ আসন, উন্নতদেহে দণ্ডায়মান হয়ে। নাসাগ্রে দাঁটি নিবন্ধ। দেহের প্রতি পরিপূর্ণ বীতরাগ পরিষ্কৃতি।

কারোৎসর্গ আসনেই বাহুবলী তপস্যা করছিলেন।

গোমতেশ্বরের মূর্তির পাদদেশে লেখা আছে, চামুন্ডরাজকৃত ইত্যাদি।

মিঃ ভাস্কর বললেন, ভাষাট মালয়ালম ভাষার সঙ্গে মারাত্মক ভাষার সংমিশ্রণ।

নীচে ছোট একটি ভোজ মূর্তি আছে। মূল বিম্বের প্রতিবিম্ব পূজার্তার জন্য।

তৈরি হবার পর সুরু হল মূর্তির অভিষেক।

কলীস কলীস মৃদু, ঘুত, থরে থরে আরো নানা পূজা উপচার নিয়ে এসেছেন ভক্তজন। কিন্তু সবই সামান্য হল। মূর্তির বিধৌত করা গেল না।

স্কান মূখে বসে রইলেন সবাই মূর্তির পারের কাছে—কি করা যায়, কি করা যায়? একি হল?

এমনি সময়ে এলেন এক বৃদ্ধা। নাম পদ্মাবতী। নম্র দেহ, কিন্তু তপস্যায় বরং তাঁর প্রশান্ত গুণগ্রন্থী।

পদ্মাবতী এনেছিলেন বিলিগুলা অর্থাৎ শাদা গোল বেগুনের মত দেখতে ছোট একটি বাটিতে করে পশুগব্য।

কানাকা ভাষায় বিলি মানে শাদা, গুল্লা মানে বেগুন, একরকম শাদা গোল বেগুন ওদিকে হয়। সবাই ভাবল, এত দুখে-যিতে কিছাই হল না, হবে পদ্মাবতীও এই তুচ্ছ উপচারে?

কিন্তু ভাই হল।

এ যেন অনেকটা সেই বৌদ্ধ সম্যাসী পুণ্ড্রের জন্য ভিক্ষা আহরণের কাহিনীর মতই।

নগরীর শ্রেষ্ঠী বণিক সব ধার মোট গেল, ধনরত্ন। মণিমানিক্য মহাঘণ্টা বস্ত্রভূষণ কত কিছু পথের ধুলির উপর জমা হতে গেল, কিন্তু সম্যাসীর বদলি শব্দেই রইল, ভিক্ষু শ্রেষ্ঠের ভোগ্য ভিক্ষা মিললই না।

রাজা আর শ্রেষ্ঠী ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে গেলেন সব। বিশাল নগরী লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল, সম্যাসী নগর সীমিত জাড়িয়ে প্রবেশ করলেন কাননে।

সেখানে এক দীনা নারী অরণ্য আড়ালে কোনমতে আত্মগোপন করে নিজের একটি মাঠ ছিন্ন বসন শরীর থেকে টেনে নিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে ফেলে দিল আর তাতেই খাশি হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠলেন সম্যাসী।

সামান্য অথচ সাম্প্রতিক এই ত্যাগে মহর্ষি পূর্ণ হল মহাভিক্ষুকের সাধ।

এখানেও দরিদ্রা, নগণ্য, কিন্তু ভক্তি-মতী নারী পদ্মাবতীর এই অতি সামান্য নৈবেদ্য অসামান্য হল গোমতেশ্বরের অর্পণ করায়।

সবাই দেখল ভক্তির কাছে সব তুচ্ছ।

পদ্মাবতীর এই একটুখানি পরিমাণ পশুগব্য অশেষ হয়ে লাগল মূর্তির মাথায়, গায়ে, সারা শরীরে। তিনি স্খলিত হয়ে গেলেন ভক্তির অর্ঘ্য স্বাদায়।

বিলিগুলা থেকে কলগাটার নাম বেলগোলা।

ফেরার পথে আবার আমরা এখানে একটি করে সিঁড়ি জেতে নামতে লাগলাম।

# জাট

গুডা মশলাই

## কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত

### (কুকুমী)

প্রাঃ লিঃ এর

### একমাত্র ব্র্যাণ্ড



পদ্মবুদ্বিদগের ধৃত্ততা যেমন সর্দা হর  
না। স্ত্রীদিগের একাত পৌরষভাবে কোন  
পদ্মবুদ্বাব আসিয়া ধৃত্তিত কৰে। এইটি  
প্রচলন হইবার সম্বন্ধে আর একটি কারণ  
আছে। ব্রাহ্মণধর্ম জাতির স্ত্রীপৌরষের  
উপাধি ছিল 'দাসী'। এই উদ্দেশ্যের  
উপাধি ধারণে ভগিনীদিগের একাত  
আপুতি; কিন্তু উৎকল ব্রাহ্মণদিগের  
ভিত্তরে অনেকের 'দাস' উপাধি আছে,  
তাহারা আভিজাত্য ও স্বশ্রেণীর মধ্যে  
জ্যেষ্ঠ। কোন কোন সম্যাসীর 'দাস'—কোন  
কোন প্রমথের 'দাসী' উপাধি ছিল। বৈকুণ্ঠ  
সম্প্রদায়ের ভিতরে অধিকাংশ পদ্মবুদ্বের দাস,  
অধিকাংশ মহিলার দাসী উপাধি প্রাপ্ত  
কল হইতে রহিয়াছে। যখন কোন নির্দিষ্ট

\* রূপশব্দবোঝের 'অন্তর্গত' একটি বিখ্যাত পদগণা।

সে সময়ের বিলাত-ফেরতরা যেমন  
বাংলা ভাষা, দেশীয় আচার ও দেশীয়  
পরিচ্ছেদের উপর যুগ্ম প্রকাশ করিতেন,  
সেইরূপ 'বাবু' উপাধির উপরেও তাহা-  
দিগের বিশিষ্টতা যুগ্ম ছিল। তাহারা  
ছিলেন 'মিস্টার', আর পর্যায়ে গাউন  
পরায় 'মেম সাহেব' না বলাইয়া ছাড়িতেন  
না। এক্ষণে সে হাওয়া বর্ণালিয়াছে। এক্ষণে  
বিলাত-প্রত্যাগতদের ভিতরে আর সে  
প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই  
হিজিক না পড়িত তবে এভািনে বিলাত-  
প্রত্যাগতদিগের ভিতরে আর সে প্রবৃত্তি  
দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই হিজিক  
না পড়িত তবে বিলাত-প্রত্যাগতবাও 'বাবু'  
উপাধি গ্রহণ করিতেন। বর্তমানে কিসের জন্য  
যে 'বাবু' উপাধিটি উবিয়া গেল, ভাল  
করিয়া বঝিতে পারা যায় না। বাংলায়  
বাবুরা ফস্ করিয়া বোচারা 'বাবু'টিকে  
বলকট করিলেন। আসামের সহিত পূর্-  
বঙ্গকে গড়গংমেণ্ট এক করিয়াছেন  
(স্বাধীনতা পূর্বের কথা) বলিয়া বাংলায়  
ত' যোগ্য নরাজ; অথচ তাহারা আসামীয়  
উপাধি 'শ্রীযুত', 'শ্রীমান' সাদরে গ্রহণ  
করিয়া নামের সঙ্গে যে 'বাবু'র একটুকু  
সম্বন্ধ ছিল তাহাও ঘুচাইয়া দিতেছেন।  
'বাবু' বোচারা এমন কি দোষ করিয়াছেন  
যে, তাহাকে এমনভাবে একঘর  
করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, 'বাবু'  
শব্দের কোন মূল পাওয়া যায় না; ও  
শব্দটি সাহেবাদিগের সৃষ্টি, তাহারা  
আমাদিগকে ভ্রান্তিয়ার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার  
করেন। আমার বিশ্বাস ইউরোপীয়ান  
দিগের ভিত্তে তাহারা প্রথমে ভারতে  
আসিয়াছিলেন, তাহারা এদেশবাসী ব্রাহ্মণ,  
কায়র, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি 'আর্য'  
নামে পরিচিত জানিয়া ভাবতবাসী  
সকলকেই 'আর্য' বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন।  
সাহেবেরা এ দেশী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা  
করিয়া জানিয়াছিলেন, স্থানীয়েরা 'আর্য্য'  
সুতরাং 'আবর্য্য'; ঐ 'আবর্য্য' হইতে  
তাহারা তাহাদিগের নিকট জাতীয়তা  
পরিচায়ক 'আর্য্য' বলিতে আবশ্য  
করেন। সাহেবেরা সেইরূপ নিকট অর্থে  
ব্যবহার করেন বলিয়া কি আমরা আর্ষ  
জাতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব  
না? না, 'আর্য্য' 'আর্য্য' হইবে না? সাহেবেরা  
আজও সেইরূপ নিকট অর্থে 'বাবু' শব্দের  
ব্যবহার করে না।  
'বাবু' শব্দটি আজগবি সৃষ্টি হয়  
নাই। সংস্কৃতে 'ভাব' শব্দের অর্থ পণ্ডিত;  
ভাবুক শব্দের অর্থ কল্যাণ। ইহার কোন  
একটি শব্দ হইতে 'বাবু' শব্দের উৎপত্তি  
অসম্ভব নয়। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য  
উপনিষদে মাননীয় ব্যক্তি সম্বোধনে অনেক  
স্থলেই 'বাবু' শব্দের \* ব্যবহার আছে।  
এই 'বাবু' শব্দের সহিত 'বাবু' শব্দের  
বান্ধি সম্বন্ধ।

• ବହୁମାତ୍ରାଙ୍କ, ୬ ଅଧ୍ୟାୟ

## উপন্যাস

কুণ্ডলিনী-অবিশিষ্ট অবিশিষ্ট ডাক্তার রোডের  
 সেই বাড়িতে আমরা দেখিনি। এখানে আর  
 বাড়ি দেখতে নিজে বানানি কথা। হস্ত  
 ভেদেছিলেন ও বাড়ির আর পছন্দ  
 অশ্রুদের প্রথম কী।





এমন, যেন ছোট ছোট মেখেতে লাগতে।  
একটা দূরে একটা ইটে গাথা বিরাত  
এমন তা থেকে গলগল করে খোঁয়া  
গাথা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে যেন মেঘের  
কবচে। চিমনিটার নীচের দিকটা বেশ  
ললল ইটের, ওপর দিকটা ওই ধোঁয়া  
এমন কালো ঝল।

দিদির যদিও বাবো বছর বয়েস হ'ল  
ছ এবং ফক ছেড়ে লাড়ি ধাবছে তবু  
দ বিহীন গলার বললো, দাখ ঠিক যেন  
স্মলট।

নারা আমাদেব ওই উদার উন্মুক্ত  
গণি উপহাস দিবেছেন, উপহাস দিবেছেন  
এটা মনুষ্যে, এতেও বাবাব ওপর কৃতজ্ঞ  
না না ছাড়াই এক কোণে কল্লা ঢালা  
দেখলাম তা সেটা এটা ওঁদিকে।  
সমস্ত ব্যাহত হচ্ছে না।

এবারের সিঁড়ি চওড় তাই চিলাকায়া  
ও বেশ বড়সড় দিদি বললো এইখানে  
বাসের খেলাঘর পাতঘো।

এই সময় মেজদা ছাত্র উঠে এলো।  
দাদাব সঙ্গে মেজদাব সঙ্গে বলা  
এটা ফাৎ আর মেজদাব কবই আমা  
এ আর একটি ভাই ছিল যে ন্যাক  
এল মতাব শিকার না তাম আমাদেব  
এই - হাত পাবতো তাম দিদির সঙ্গে।  
মেজদাব বাবাসেব ফাৎ। মেজদা সে অনেক  
খাওয়া উল্লগ্য এটা প ছাড়া  
এটা পোছা। এটা ও ইচ্ছা এটা  
দেব সঙ্গে ভাত ঘাষ দিচ্ছি এটা আমাদেব  
এটা কবই আমাদেব এটা ভিড়  
সে।

মেজদা এসেই তাম স'চি হ'ল  
এমন গাণ্ড ঘকোটা। এ। এতাকল  
এ।

মেজদা আসব কুতাপমা। আমা মনে  
এলাম আর ওই দানবের দিকটা দেখাচ্ছিল।  
একদা

দাদা'চি শুশুই দাদা'চি। দাদা'চি  
এমন এটা দাদা'চি কবই দাদা'চি।  
দিদি বললে 'ওসু দাদা মেজদা এ  
এটা কবই দাদা'চি।

মেজদা বললে ও কথ ছাড়া মা ম'চি  
এমন বাণ দিগান।

এটা আমাব বাকব মাদা একট রক্ত  
এ কব উল্লা দিদির দ'ব তাকালো।  
দেখলাম দিদি ঠিক স'ব সমস্ত আমা  
এ ক কবই দাদা'চি।

অর্থাৎ স'ব স'ব স'ব স'ব স'ব  
এ।

দিদিও ইসায জানালো আচ্ছ।

দিদি মেজদাব কাছ ইচ্ছা বাক করলো,  
এঘরে আমরা খেলাঘর পাঠালো।

মেজদা ম'চিক হেসে বললে। আর  
ব'চন দ' ই'গ হাড়িকাড়ি নায খেলাঘর  
পাঠালো নানিক ব'চন এটা ইলো ব'চ  
এক এটা স'চি ও'চল হাড়ি নাযাত হ'ল  
গিলা।

ওই গিবেটার এমন একটা কোর দিল  
মজদা যে ব'চতে অসুবিধে হল না কোথাক  
গিয়ে।

আমাব হঠাৎ মনে হলো, মেজদাটা ব'চ  
নিশ্চয়ই মতো কথা বলে। এই ক'দি  
আগে মা খখন বাবাকে বলছিলেন, আর কি  
এবার স'বীষ জন্মো পান্ডব চাক্তর দেখো?  
সে'খ মেঘে তো বেলা হলো।' তখন দাদা  
বলছিলেন, 'আঃ মা ছাড়োতো ওসব কথা।  
একদিন বেচাবীক হ'ল পা ব'চ বাবাব  
খাচাব প'বে দেবাব চিন্তা কো'বা না।'

খব'বাবাভিটা বাবাব খাচা।  
মা হেসে ফেলে বললেন।  
দাদা বললো তা' ছাড়া আর কী  
আমি তা হলে বাবাব খাচায় আ'ধ  
এল।

তুমি স'ব খব'বাবাভিটা নেই নিশ্চয়  
বাড়াই পাঠা।

তা মেঘ ব'চ হ'ল স'ব দিও  
ত'ব না।

ব'চ হ'ল হ'ল। স'ব এখন মোট  
ব'চ হ'ল।

দাদা মা'বাবী দাদা'চি খব'বাব দ'ব আ  
আব মেজদা ঠিক উল্লা।

দিদির দিকে তাকিয়ে লোখ দিদি অন্য  
দিকে ম'ব ক'ব রয়েছে, আব দিদির চাব  
দেয় উপ উপ ক'বে জল পড়ছে।

তা মেজদা বোধহয় একট, অপ্রতিভ  
হ'লো, তবু প'চাব দেবাব ও'চলিত হ'ল  
উল্লা বাস। চমৎকার। খব'বাবাভি  
ও'চাব নামেই মেঘের চোখেব জ'লেব নদী  
এলো। স'চি যাবাব সমস্ত কী হ'বে  
সমস্ত ব'চাব তখন আব তাহলে প'খিবীর  
ও'চলিত জল আব একটা প'লত খাচাব  
না চাবভাগই জল হ'ল বাবাব। খানু'বাব  
নৌকায় প'বাব ক'বাব।

দিদি স'ব ফাল বললো ধাৎ।

মেজদা স'ব দ'ব গলাস 'ল লো আচ্ছ।  
ঠিক ও'চল বাবা এটা আমা দ'ব ব'চাব খেলা-  
ঘর পাঠা আনি এবং পাক'গারি ব'দো'বলত  
ক'ব দিচ্ছি।

একাধা স'ব স'ব একটা খালি প্যাকিং  
এটা স'ব মেজদা চমৎকার এক। আচ্ছ।  
বানায় দল আমাদেব ভাষ ক'ব ক'ব।

# আশোক স্টেইনলেস নং ১ যাহার বিশেষত্ব অনেক



- ১। অস্বাভাবিক সর্বোচ্চ স্টেইনলেস গ্রেড।
- ২। অস্বাভাবিক সর্বোচ্চ মিতব্যয়ী গ্রেড।
- ৩। অস্বাভাবিক সর্বোচ্চ মিতব্যয়ী গ্রেড।



বাবা 'ভাঙার আমতল, আমরাও কিনল করে ফেলতাম। অবশ্য প্রধান বোঝা হচ্ছেন বাবা। ভাতটা বেশী খেতে পারতেন না বাবা, কিন্তু খাবার? তা বেশ চালাতেন।

পেট রেকাবির প্রশ্ন নেই, কেউতো, আর কুটুম নয়?

মা সেই ঠোঙার শালপাতাগুলোই ছিঁড়ি মেনে ধরে, ছটা ভাগ করে ফেলে (খাওয়া মাংসে অবশ্য) এগিরে এগিরে দিলেন, আর নিজেরটা নিয়ে একটু সব পিছন ফিরে বসলেন।

স্বামীর সামনে খাওয়া নাকি অসভ্যতা।

বাবা হাসতেন।

বলতেন, 'তা নয়, স্বামীকে বোঝানো যে আমি শব্দ বাতাস খেয়ে তোমার সংসার ঠেলাছি।'

'নিয়মটা বাকি আমি করছি?'

'তুমি করবে কেন? যাঁরা করেছেন, তাঁদের উল্লেখের কথাই বলছি। এ নিয়ম পালনের কোনো মানে হয় না।'

বললে কি হবে?

মা সেই হাসাকর ভাবেই ওই অর্থহীন নিয়মটা পালন করে চলতেন।

ঠিক হয়েছিল, পরদিন সকাল থেকে বাড়িওয়াদের কি আমাদেরও কাজ করবে। কিন্তু সে তো কাল সকালে।

মা বললেন, 'আজ কে করলো ভেঙে উনুন খরিয়ে দেবে তাই ভাবছি।'

বাবা উদার গলায় বললেন, 'আজকে আর তোমার রাখতে হবে না। আমি খাবার-ওলাকে বলে এসেছি কিছু পুরী ভেজে দেবে, আর সেরটাক রাবাড়ি দিয়ে যাবে। পুরীর সঙ্গে ভাজি আর চাটনী দিয়ে দেবে।...এই তো রাস্তায় নেমেই দোকান। লোকটা খুব ভাল। আগে কোথায় ছিলাম, এবাড়িতেই এখন পাকাপাকি থাকবো কিনা, এই সব জিজ্ঞেসা করলো। বললো, আমার দোকানের ছোকরাটা দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।'

'তা আর দেবে না কেন।'

মা নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন, 'বুঝেছে এক ভালোবাসার বাবু এসেন পাড়ার। এতো বড়ো ঠোঙার খাবার আর কটা বাবু কেনে বল? এতো কিনলে, আবার রাভিরের ব্যালনা—'

উনুন খরিয়ে রাখতে হবে না ভেবে হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন, তবু বলটি চাই।

এখন বর্ষাকাল ফেলা উনুন রাখতে হবে।  
শ্রীমতী পাতভার : এখন নাকি দিনকল সেখতে  
শ্রীমতী : শ্রীমতী পাতভার : তো আজ, আবার

মোমের জলঝরনা? নাকি উনুন পাতা লিখে।

এক যদি কি পেতে দের।

'এবারের অমন খালা উনুন দটো ভেঙে দিয়ে আসতে হলো।'

মা আবেগ করে বললেন, 'এখন কি কেমন করে দেবে কে জানে।'

বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় নাকি উনুন ভেঙে দিয়ে আসতে হয়। কেনই যে এমন অশুভ নিয়ম। নিজের হাতে গড়া জিনিস নিজে হাতে ভাঙতে ভাল লাগে?

তা ভাল না লাগলেই বা কী?

নিয়ম যখন।

মা বলতেন, 'ভগবানও নিজের হাতে গড়া জিনিস নিজে ভাঙেন। এখন আমি ভগবান হলাম।'

তবে বস্তু করে মা উনুনের ভিতরের লোহার শিকগুলো নিয়ে আসেন বাড়ি বদলের সময়।

না আনলেই তো আবার তিন চার পরনা খরচ করে নতুন শিক কিনতে হবে।

এবেলা কি না আসার আমরা খুব আহুত অন্তর্ভব করলাম। এলেই তো উনুন ধসাতো, আর এই সব অবিলম্বে মধ্যে মাকে রাখতে হতো।

অতএব কোন না একশোবার শুনতে হতো আমাদের, 'আমার খেমন কপাল। বাড়ি বাড়ি মেয়েরা একটাবেলা চালিয়ে দিতে পারে না। বাপ অমনি হাঁক করে পড়বেন,

'আমাদের ধারে ভোরা কেন?' 'সামি কেন? আর বায়ো বছরে হেঁকেলে ঢাকনি।'

আমাদের তখন ভয়ে আড়ষ্ট অবস্থা হতো।

তবে বাবা শুনতে শেলেই বলে উঠতেন, 'তা তোমার বাবা যদি তেমন হন, আমি নাচার।'

'আমার বাবা?'

মা অবশ্যই ছিটকে উঠতেন, 'বাপের বাড়িতে আমার কখনো এক গোলাশ জল গাড়িয়ে খেতে হয়েছে?'

বাবা এমনিতে জোরে হাসতেন না, কিন্তু এরকম কথায় ঠিক হাহা করে হেসে উঠতেন, 'তবেই দেখো! ওদেরও এটা বাপের বাড়ি! তবু তো কত কী করছে।'

কতো কী মানে বাবার অফিস বাবার আগে একডিবে পান সঙ্গে দেওয়া, আর বাড়ির যতো কাপড়চোপড় শব্দে, সেগুণে তুলে গুছিয়ে রাখা।

এই আমাদের দুই বোনের কাজ!

অবশ্য দাদাদের ফাই-ফরমাশ খাটাই ছিল।

পরদিন সেই মত কত বাগলো সমাধা করে, যাকে বলে দুঃস্বপ্নের স্বপ্নে দুঃস্বপ্নের অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর দাদারা যখন স্কুলে কলেজে, মা দিবা-নিদ্রায়, তখন সেই জিনিসটা নিয়ে দাঁদি আর আমি ছাতের ঘরে উঠলাম।

এখানে আমাদের খেলাঘর, অতএব সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না।

(জমখা)



শ্রীর বাঁধনে বন্যা ছিল, কি বাঁধা?

সত্যিই রমণীয় কেশ হবে রমণীয় শোভা

বেঙ্গল কেমিক্যালের

"ক্যাথারাইডিন"

ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কেশ তৈরি

চুলের খালা হুমিয়ে

কেশরানিকে এক অনুদায়

রূপলাবণ্যে ভরিয়ে তোলে।



কস্মেটিক ডিস্ট্রিবিউশন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ০ বোম্বাই ০ কামরূপ

দিল্লী ০ আগ্রা ০ পাটনা ০ জয়পুর

# হৃদয়কে কলকাতার আজগুবি কাণ্ড

বৈদ্যনাথ মৃধোপাধ্যায়

কলকাতা মানেই হৃদয়ক। আর হৃদয়ক মানেই আজগুবি ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ।

কলকাতার ধুলোভরা রাস্তার তখন পালাকি চলে। বেহারার দল রাস্তা কাঁপিয়ে সুর করে বয়ে নিয়ে চলে পালাকি। এদিকে ঘোড়ার গাড়িও এসে গেছে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটছে নানা ধরনের গাড়ি নিয়ে। আঁপিসে কাছারিতে তখন টানাপাখা।

মাঝে মাঝে পেয়ারার পোয়ার খাড়ি। সেখান থেকে মাঝে মাঝে পোয়ার মত কলকাতার বড়-লোকেরা থাকেন। তাঁদের কাছাকাছি ঘোরেন মো-নাহেব, উমোদার আর তোহামোদকারী প্রার্থীর দল। এঁদের ঘোড়ালার ঘোড়া, দেউড়ীতে দারোয়ান। নারোব গোমস্তারা কাছারী সরগবম করে রেখেছেন।

হাটখোলা, শোভাবাজার, ঠনঠনিয়া, চিংগু, কুমারটুলি থেকে শ্যামবাজার, পাইকপাড়া সবই লমজমাট। তবে মাঝে মাঝে কোনো জমিও পড়ে আছে। আছে এঁদো-পুরুষ ও খোপাঙ্গল। সখ্যা হলোই সেখানে শিরাল ডাকে। তেলপুলেবা বিছানার শূরে শূরে শিরালের ডাক শোনে। দেওয়ানগিরিও আলো-ছায়ার কিসেব যেন ছবি ফুটে ওঠে। কলকাতার ছেলেকমেবো বিছানার শূরে শূরে নানারকম রহস্যময় গল্প শোনে। ম্যানে অলৌকিক কাহিনী।

দেওয়ালে যখন কে'পে কে'পে বেড়াচ্ছে কালো ছাখা, শেরাল ডাকে থেকে থেকে, দমকা বাতাসে দেওয়ালের বাঁতি যখন নিব্দ নিব্দ হয়ে আসছে, এইরকম এক সন্ধ্যায় ঠাকুরমার আঁচলের তলায় শূর্য শূরে সিঁগি-বাঁড়ির ছেলে একটি অলৌকিক মহাপুরুষের গল্প শুনোঁছিল। মহাপুরুষ মানে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন এক আশ্চর্য মানুস। তাকে মনি-খাঁও বলা বাব, আবার এক গ্যাঙ্গানবানও বলা চলে। এই অভিনব আত্মাশ্চর্য মানুসটিকে যিনি স্বচক্ষে চাক্ষুষ কবেছিলেন, তিনি সিঁগিবাঁড়িরই আশ্রয় এবং পুরুষো কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তি বাবগণী ঘোষ।

সেবাব কাশী বাঁচ্ছলেন বাবগণী ঘোষ। তখন বেলগাটন হয়নি। আর হাটপথে পালাকি করে বা হাট ঘোড়ার বাবার তেমন লে ছিল না। তাই বাবগণী তাঁর অভিস্রুত তীর্থ বাবগণীতে চলেছিলেন নৌকো করে। অর্থাৎ জলপথে। নৌকো কবে পথ চলেতে চলেতে হঠাৎ এক জঙ্গলের ভেতর এসে শক্তির হলেন তীর্থবাণীর দল। আর সেই জঙ্গলের ভেতরেই ঐ আত্মাশ্চর্য মানুসটির দেখা মিলল। মহাপুরুষ তখন যান মন্দ। ইম্মা বড়ো বড়ো দাড়ি গোফ। গায়ে যেন শেওলা জমে গেছে। কত দিন ধরে তিনি যে তপস্যা কবেছেন, তা কে জানে—বাবগণী তাঁর ধ্যান ভাঙানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধ্যান ভাঙল না। শেষপর্যন্ত মাঝেমেঘ সাহায্য নিয়ে ঐ অচৈতন্য মহাপুরুষকে নৌকোয় তুলে নিলেন যোবনশাট।

তারপর? তারপর আব কী! দিনের পথ দিন কেটে যায়, রাতের পথ রাত। নৌকো

পেরিয়ে চলে গ্রামের পর গ্রাম। জনপদের পর জনপদ। ছাপখাটীর মোহনার জল ছিল না বলে বাবগণীকে ঢুকতে হল সেবার বাদ্য-বনের ভেতর। তখন ভাটা। জোয়ার আসতে দেবী। ঠিক হল গুব টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নৌকোকে। কেননা, জোয়ারের আশায় নৌকো দাড়ি করিয়ে রাখা এই জঙ্গলের ভেতর ঠিক নয়। নৌকোর গল্লরের কাছে বসে আছেন মহাপুরুষ। গভীর ধ্যান-নিমগ্ন। আর সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। অন্যান্যনক। এ সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। জলের ধারে নদীর পাড়ে হঠাৎ এক-মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। ঠিক একরকম দেখতে। অবিকল এক। এদিকে ডাঙ্গার ঐ মহাপুরুষ এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন নৌকোর দিকে জলেব ওপর দিবে হেঁটে। এসে তিনি নৌকোর মহাপুরুষকে হাত ধরে তুললেন এবং তাবপব দৃষ্টিতেই জলের ওপর দিয়ে হাটতে হাটতে সোজা ঢুকে গেলেন জঙ্গলের ভেতর।

এতদ্রুত ব্যাপারটি ঘটে গেল যে কেউ কিছদ কলবারই ফরসৎ পেলেন না। কী ব্যাপারটি যে ঘটে গেল তাও অনেক ঠাহর করতে পারলেন না। পরে একসঙ্গে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল। মাঝি মাঝিরা সকলে হৈ-হৈ কাব খুঁজতে বেরোলেন। কিন্তু কোথায় কী। ওনারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তা কেউই ঠাহর করতে পারলেন না।

বাবগণী ঘোষ হাব হাস করে উঠলেন। বার বার তিনি কপাল চাপড়ালেন। অমন মহাপুরুষকে হাতে পায়ও তিনি ধূস লাগতে পারলেন না। সাব জীবন তিনি এই আক্ষেপই কাব গেলেন।

ঠিক এইরকম এবং অনুরূপ এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিলিপরের দত্তরা। সৌদরবনে জমিদারী ছিল ঐ দত্তদের। অনেক চাষের জমিও ছিল। একবার কুরো খুঁজতে খুঁজতে তিরিশ হাত গড় করতে হয়েছিল তাঁদের। সেই হাত তিরিশেক গড়ের নীচে কিলিপরের দত্তবাব। এক ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেলেন। এনার শরীর শূকনো চ্যালাকটির মতন। গায়ে বড়ো বড়ো অশ্বখ গাছের শেকড় গেছে জমে।

দত্তবাব, মহাপুরুষকে জাড়লেন না। বাবগণী ঘোষ মহাপুরুষকে বাড়ি আনতে পারেন নি, ইনি কিন্তু আনলেন কিলিপরে হৈ-হৈ পড়ে গেল চারিদিকে। পরে এক মাস পরে রাখলেন। তারপর? তারপর হঠাৎ এক-দিন অঘটন ঘটে গেল। এক অশ্বকার রাস্তিবে সবাই যখন অন্যান্যনক, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমার আঁচলের তলায় শূরে শূরে মানারকম অলৌকিক গল্প শুনাক দেওয়ালে দ্বারা কাঁপছে খিরখির করে, হ্যাঁ ঠিক সেই সময় মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সারা কিলিপরে আর তাঁকে কখনো দেখা যায় নি। কখনো না।

শহর কলকাতায় এইরকম মহাপুরুষদের নানান আখ্যান শুনতে শুনতে এককালের ছোট ছোট ছেলেরা যমের ছেলেরা চলে পড়ত। যমের ঘোরে তারা এই মহাপুরুষেরই স্বপ্ন দেখত। আর মত কড়ো হত, ততই তাদের মনে এ ধারণা দৃঢ় হত যে তারা নিখাত একদিন ঐরকম এক অলৌকিক মহাপুরুষের দেখা পাবে। আর নিশ্চয় সেদিন মহাপুরুষকে তারা বাড়িতে ধরে নিয়ে আসবে। বাবগণী ঘোষের মত জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে না বা কিলিপরের দত্তদের মত আলগা করে ধাবে রাখবে না।

ঠাকুরমার কোল ছেড়ে ছেলেরা যখন স্কুল যারায়ত আরম্ভ করল, তখন রহস্যময় আরো বিচিত্র মানুসদের সঙ্গ দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকল। কলকাতার তখন পাড়ায় পাড়ায় আজব লোকের দেখা পাওয়া যেত। এই আজব লোকগুলির কথাবাতা যেমন অদ্ভুত, আচার-আচরণ ছিল তার থেকেও বহুসাম্য। হবিভদ্রর খুঁড়ো সেই-রকম এক আশ্চর্য মানুস। জাতিতে ইনি ছিলেন কায়স্থ, তাতে মুখুখী কুলীন। বেজায় গাঁজাখোর। দেড়শ ছিলিম গাঁজা খেয়ে ইনি প্রতাহ জলযোগ করতেন। মাথা গোজকার কোনো নির্দিষ্ট ঠাই ছিল না। আর ভোজন?—বহুতর। এই হরিভদ্রর খুঁড়োর অগম্য জায়গা কোথাও ছিল না। ইনি নানান জায়গা ঘুরে নানারকম আজগুবি খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। ঠাকুরমার মুখে শোনা অলৌকিক গল্পের থেকেও তা রহস্যময় এবং জীবন্ত। যে মন্তগুণে সোনা তৈরী করতে পারেন, লোকের মনের কথা গুণে বলবার আশা, কাঁচী কে এং পাবাভক্ষ্য খাইবে গঙ্গাতীরে পচা মরা বাঁচিয়ে দেবার আজগুবি কাহিনী বলে হবিভদ্রর খুঁড়ো অনায়াসেই আসর জমিয়ে দিতে পারতেন। তবে শেষকালে মাথা ঝাড়া দিয়ে কলতেন, 'সব বৃজর্দক—সব মিথ্যা—'

কিন্তু ছেলেদের কাছে সব বৃজর্দক হয় কী কবে। সবকিছু অবিশ্বাস্য বলে ছোট ছেলেরা কী উড়িয়ে দিতে পাবে? কেননা, চোখের সামনেই একদিন শহর কলকাতাকে উত্তেজনার উন্মোচিত করে হাজির হয় সাতপেয়ে গোরু এবং দিরগাই ঘোড়া। একটি গোরুর চারটি পা, না হয় বাড়িয়ে পঁচ কবা গেল, কিন্তু সাত পা দিয়ে গোরু দেখা দেবে, সেও কী সম্ভব? আর পক্ষীবাজ ঘোড়ার গল্প না হয় শোনা গেছে—আকাশ দিয়ে উড়ে চলে, কিন্তু সে যে আবার নদীর বুকে টগবগিয়ে সাঁতার কাটে, তাকে দেখার দৃষ্টান্ত সোভায়া কলকাতার লোক ছাড়া আর কার হবে?

এই কলকাতায় বকেই একদিন রটনা শোনা গেল যে দল বৃজ্বের ভেতর খাঁদা মারা গেছেন, সেই মরাতা পরে কলকাতায়



করবার সকলো কিসে আসবেন। উঃ সে কী হুজুগ! নিম্নতলা আর কাশী মিত্রের ঘাটে সে কী ভিড়! লোক উপাচারে পড়ছে মশাদে। মৃত আত্মীয়স্বজনকে শ্মশানও জানায়ে ফলে রাত দশটা পর্যন্ত সকলে বসে বইলো অধীর প্রতীকার। কিন্তু না, কিছুই হল না। মরার ফিল্মলেন না।

তবু লোকে দমে না। নতুন হুজুগে মেতে উঠতে দেবী হয় না। একটা ব্যাপারে না হয় ঠকা গেল, আরেকটা ব্যাপারে যে সত্যি সত্যিই সফলতা পাওয়া যাবে না, একথা হলক করে কে বলতে পারে?

আরো অন্যবারের মত এবারেও হরি-ভদ্রর খুঁজে এক জমকালো ঘর নিয়ে এলেন। কিলিপুরের দস্তবাড়ি নর, হাট-খালী-ঠনঠনিয়াও নর, অতি কাছে সিমলোতে নাক-কাটা বন্ধুর বাড়িতে নাক সত্যি সত্যি এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

‘নাক-কাটা বন্ধু’ নামটি শুনলে অনেকে হয়ত একটু চমকে উঠবেন। না, ওটা চমকবার মতন কিছু নর। বন্ধুবহাদরি-বাবু এমনিতে নিখুঁত লোক। ছেলোবেলায় একবার মামার বাড়িতে পাডকোর ভেতর পড়ে গিয়ে নাক কেটে ফেলোছিলেন, এই মার। বন্ধু-বান্ধবেরা আদর করে সেই থেকে ‘নাক-কাটা বন্ধু’ বলে ডাকত। আর এখু-বান্ধবদের নামেই বেচারি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বন্ধুবাবু খুব ধুবধুর লোক ছিলেন। বেশ চোঞ্চ। উকিলবাবুর হেড কেরানী হয়েছিলেন। তাই মতন তুখোড় আইনবাজ লোক খুব কমই ছিল। জাল-জালিয়াতির তালিম, ইকুটির খোঁচ, সমন লায়ের প্যাঁচে বন্ধু ছিলেন দ্বিতীয় শূভক্ষর। যারা ভাগ্যমানুষ ভরলোক, তাঁরা এই নাম শুনলে আঁতকে উঠতেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, ইনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পারেন। সকলে আড়ালে বলাবলি করত, বন্ধু কী আমাদের যে সে লোক।

সেই বন্ধুর বাড়িতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

বাই হোক, চারদিকে হৈ-ঠে করে খুব খবর রটে গেল। ছাড়িয়ে পড়ল নানা বকম অলৌকিক ঘটনার বিবরণ। কেউ বলল, উনি মন্ত্রবলে লোহাকে সোনা বানাত পারেন। সবতে পারেন অসাধাসাধন। আবার কেউ বলল, উনি মদকে দুধেব মতন সাদা কবে দেন। মোট কথা, চারদিকে খুব সোবগোল পড়ে গেল। দলে দলে লোক চলল বন্ধুর বাড়ি।

ধারণাসী ঘোষ বা কিলিপুরের দস্ত-দের দেখা অলৌকিক মহাপুরুষের কাহিনী শোনা ছিল যে সিগিবাড়ির ছেলোটর, সে ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মনে-আঁকা মহা-পুরুষের সঙ্গে এই সিম্পুরুষের ছবিটি মিলিয়ে নিতে। সতরাং সেও চলল।

নাক-কাটা বন্ধুর বাড়িতে সেদিন বেজায় ভিড়। কেউ এসেছেন পালাকিতে, কেউবা ঘোড়ার গাড়ি করে। মহাপ্রভুর করুণার হাঁস এক ফোঁটা পাওয়া যায়, এই ব্যাপ্তির জুত মজলাবাজ আর মজলাব-

বাজেরা জুত সেজেছেন। বন্ধুর বৈঠকখানা ঘরের লাগাও একটি বড়ো জুত মহাপুরুষের কসে ছিলেন। চোকোনা ঘর। ঘরের মাঝে বাথহাল বিছিয়ে মহাপুরুষ সমালীন। সামনে একটি বিশাল পোতা। বিশালের কোলে পেতলের একটি শিবমূর্তি। বাথের ওপর চড়ে আছেন মহাদেব। আর তারই পাশে পাথরের বাগলিলা শিব।

এদিকে মহাপুরুষের পাশে বাঁজার হুকো, সিম্পির ঝুলি এবং আগুনের মালসা। পিছনে মহাপুরুষের দুই চালা বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। আর তাদের পাশে একটি হাসর, জাঁতা, হাতুড়ি এক হামাখ-দিস্তে। কে যেন ফিস ফিস করে বলল, ‘এখানে সোনা তৈরী হয়।’

মহাপ্রভুর করুণায় যারা আগ্রহী ছিলেন, লোভে তাদের চোখ চক্চক করে উঠল। প্রস্থা ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন কেউ কেউ প্রভুর পায়ের তলার।

নাক-কাটা বন্ধুবাবুর এদিকে বেজায় সাজের ঘটা। কাটা নাকের জন্য তখন আর তাঁকে ভুজ্জ-তাজ্জিয়া করা যায় না। মাথায় তাঁর একটি জরীর কাবুলী তাজ। গায়ে লাল গাজের পিবাণ, চওড়া কালো পাড়ের শান্তিপন্থী ধুতি। ডুরে উড়নি। হাতে লাল বঙের রুমাল। রুমালের ডগায় চাবির বিং বাঁধা। বন্ধুবাবু বাড়িতে যেন উৎসব চলছে, অতিথি-অভ্যাগতরা আসছেন তাই তাঁর মুখে একটি মিষ্টি হাসি-হাসি ভাব। সকলের সঙ্গে বন্ধুবাবুও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন মহাপ্রভুকে।

অতিথিদের ভেতর কেউ কেউ বন্ধুবাবুর কানে ফিস ফিস করে কী যেন বললেন। বন্ধুবাবু সে-কথা শুনে প্রভুকে কিছু অলৌকিক খেলা দেখাতে অনুরোধ করলেন।

মহাপ্রভু কিছুতেই রাজি হলেন না। তবে—

শেষকালে অনেক ক্রান্তি-মিনতিতে রাজি না হয়েও পারলেন না।

বন্ধুবাবুই এগিয়ে এসে ঠিক করে দিলেন কী অলৌকিক বিভূতি প্রভু দেখাবেন। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কবতে থাকলেন। সকলের মনেব ভেতরেই থির থির করে কাঁপতে থাকল কোড়হুল। কী হয়-কী হয় ভাব।

এদিকে অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

প্রভুর হাত-পায়ে দুই হাত পড়েছে। সেই হাতের ওপর ছিল একটি পদ্ম-মুখী জবা। লাল টকটকে তার রং। তাজা জবা।

সেই জবা ফুলটি হঠাৎ ব্যাঙের মত খপ করে লাফিয়ে উঠে সামনে খপ কবে পড়ল। ঘরসম্ম লোক থ। প্রভুর মুখে রাজজয়ের গৌরব।

এর পরে প্রভুর এক চালা এক ব্যোতল মদ এনে হাজির করল। পাছে সেটি অন্য কোনো জিনিস বলে প্রম হয় বন্ধু প্রভুর সেই মদ সামত ব্যোতলটি একটি সরার ওপর উত্থর করে দিলেন। সঙ্গে

সঙ্গে মদের গন্ধে ঘর ধ ধ করে উঠল। নাঃ, আর কারো সঙ্গেই থাকল না যে সেটি মদ। সরা বড়ো সেটি টলটল করতে থাকল।

প্রভু এবার একটি হুজুকার ছাড়লেন। আকস্মিক এ-হুজুকারে সকলে চমকে উঠল। ছোটছেলেরা প্রার কাকিরে ওঠার দাখিল। একজন চালা ভরে ভরে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : ‘পুরু, এ কটোরেনে ক্যা হয়?’

প্রভু হা-হা করে অটুহাসি হেসে বললেন : ‘এ কটোরেনে দুধ হো বোটা।’

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মদের সরার এক কুশি জল ঢেলে দিলেন। বাস, সঙ্গে সঙ্গে সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল।

সকলে আবার থ। এইভাবে রাত এগারোটা পর্যন্ত নানা অলৌকিক জিন্মা-কর্ম চলল। এই জাগল কেটে ফেললেন, আবার সেই জাগলই ডাকামার পানের ঘর থেকে ভ্যা ভ্যা করে বেরিয়ে এলো।

মোট কথা, প্রভু মহাপুরুষ না রাজি-সিরান ঠিক চেনা গেল না। মহাপুরুষের আদলে যে জ্যোতির্মর ছবিটি মনের ভেতর আঁকা ছিল, তাব সঙ্গে একদমই মিলল না। তাই কুন্ধ্য মনেই সিগিবাড়ির ছেলোটি বা ড ফিরে এলো।

কিন্তু কে জানত আরো বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল মহাপুরুষকে ঘিরে। কে জানত স্বপ্ন আর সস্তব এক মর। কিলিপুরের দস্তবাড়ির থেকে মাসখানেক বাসে মহাপুরুষ যেমন অলশা হয়েছিলেন, ইনিও প্রার সেরকম হলেন। পাজাবার পথ খুঁজে পেলেন না। কখনো, কোনও বিভূতির খেলা তিনি দেখাছিলেন, কয়েকটি নাস্তিক অবাচীন ছোকরা তার রহস্য উন্মোচন করে দিল। প্রভু যখন জবা ফুল নিয়ে লাফানোর খেলা দেখাছিলেন, মোড়কেল কালজের বাংলা ক্লাসেব এক বালাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে প্রভুর হাত চপে ধবল। এবং দেখা গেল জবা ফুলটি কাল্পিত দিবে প্রভুর নখের সঙ্গে বঁধা। প্রভু হাত নাড়লেই জবা ফুল লাফার।

মদ কী করে দুধ হয়, সে রহস্যও উন্মোচন করে দিলেন এক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। তিনি দেখালেন শামীরকান রুম (মার্কিন আনীল) নামে যে মদ রুজেছে, তাতে জল দিলে সঙ্গে সঙ্গে সাদা হয়ে যায়।

প্রভুকে ঘিরে জোর খানাতলাসি চলল। ঘাবর কোনের থেকে কাটা জাগল বের হল। চালান করতে না পেরে ঘরের মেঝেতেই পোতা হয়েছিল সেটি। অবশ্য মঝেটি মাটির ছিল বলেই তা সম্ভব হয়ে-ছিল। এবং দেখতে দেখতে বেরোল আরো কত কী। সতরাং চারদিকে হৈ-ঠে পড়ে গেল। সেই গজগোলেব ভেতর হরিভদ্রর খুঁজে গিয়ে প্রভুর ব্যানবাহন পেতলের শিবটি কেড়ে নিয়ে এলেন।

## অন্ধারে, গভীরে ॥ বটকর দে

সেখানেই যেন সন্ধ্যা নেমে এসে স্ব একাকার...  
চিন্তার নীরব, চৈতন্য, অসুস্থতা, শাস্তি ও সন্তোষ,  
নিত্যের নিষ্ঠুর স্বপ্ন, দশদিকের অন্ধকার,—  
সব এক হয়ে গিয়ে জন্ম নেন সহজিল্লী নাম :  
‘ভূমি’।

ভূমি ছিলে মন বস্তুর বেতে প্যারে তার  
সীমানার, দিগন্তের স্মৃতি-চার সৌর-তারকার  
স্মৃতি নিয়ে।

ভূমি আছ এই আমি জীবনের বাকি  
বেধনে পা কেলি। স্মৃতি বেধার উত্তল সংসারের  
একাকীয়ে নির্জন নিবিড়ে, যমে। মন অস্তিত্বের  
স্তরে স্তরে।

সন্ধ্যা এলে দেবদার, বনে অন্ধকার  
দূরের পাহাড়, আর অরণ্য-আদিম কাছে ডাকে :  
স্মৃতির বিচিত্রে ভূমি উন্মারিত, খোলা বধ স্বপ্ন।

## হাতখানি ॥ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ঠান্ডা ও কঠিন এক অচেনা শহর ভিড়েব কুয়াশা  
এসে গেলো; এইবার তোমার টমটমে ভূমি কোঁচে নিশ্চয়  
জেগে উঠে, হঠাৎ শুনছো, আজ অগোপনগরে এক চাষা  
ভূবে গেছে, সবেক ভুবেতে দেখে সেও ভূবে গেলো অসময়  
এবং দেখছো কি ঠিক নজর চলে না তবু হঠাৎ ঘেবে  
ঘোলাটে আলোর ডুম, ধূসর লোকজন আব তানই মাথা ভূমি  
বাড়িয়ে দিচ্ছে হাত নামবে যদি নামো ঐ হাতখানি ধরে।  
ভূমি নাও তোমার সন্মুখ হাত, হাতগুলি বন্ধ নেবে—  
কেমন কুমকুমি।

নেমে এসে হয়তো ডাকছো ডেকে পালটে নিষেছো ফের নাম।  
কেমনা ভূমিই বহু প্রতিষ্ঠাপ করছো উন্মার, আর স্মৃতি—  
খইয়ের মতন স্মৃতি ন্যাসপাতির কল্লব মতন কবে ওড়াউড়ি।  
উজ্জতে শিখবে কি? তবে এসো ভূমি জেনে বাথো কেমন বিশ্রাম  
কোঁচে বয়েছে যদি ডালা খলে নিরন্তর গতেব প্রকৃতি  
কুটে ওঠে, তবেই না জীবন। —আজ তোমারই হাতখানি কমো চুরি।

## এই তো সময় ॥ বৃন্দাল সেন

এখন হাত বাড়িয়ে  
হাতে হাতে  
উৎসব বাধবার সময়  
প্রত্যেক ঘর  
ঘর সাজাবার এই তো সময়!

ডালবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কোন  
ঈশ্বর থাকতে পারে?

দেবালে কার ছায়া? হাতকের নয়,  
আমাদের ঈশ্বর।  
এখন সকল কলঙ্কিত পাপ, অন্ধকার ধূয়ে  
ঈশ্বরের কাছে নতজানু হওয়ার লগ্ন।

এবং

জননী যেমন সন্তান কোলে তুলে নেন  
ঠিক তেমনি  
সমস্ত হাত হাতে নিয়ে  
সকল হৃদয় হাতে নিয়ে  
স্বপ্ন পূরণ এই তো সময়।

# একটু বুদ্ধিমান

উপন্যাস

১১১

দিনের শেষ গাড়ি মরা বিকেলের হলুদ অন্ধকারে একটু আগে চলে গেছে।  
একটি স্মার্টফর্মটা ফাঁকা।

এখানে ওখানে দাঁড় একজন ও'রাও মেয়ে-পুরুষ ছড়িয়ে আছে। বার্নার নেমস হলে চায়ের দোকানের কাঁপ বন্ধ করে দেছে। আসন্ন সংস্কারের অস্তিত্ব আলোয় স্পষ্ট হবে ওপারের শালবর্মক এক অসুস্থ রহস্যময় নগে বাড়িয়ে দিয়েছে। চারিদিক থেকে লেগাশেবের গান শোনা যাচ্ছে।

স্টেশনের মাস্টারমশায় বললেন, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিবে আমি।  
আমি বললাম, কি দরকার?

সাবে তাতে কি? আপনাকে এখানেই বাসিন্দা ত'নন, এখানে নতুন এসেছেন—জগলের পথঘাট ভাল জানা নেই। চলুন, চলুন, আমার কোনো কষ্ট হবে না, তাছাড়া আমি ত'হাটতে বেরোচ্ছাই—এ বসে একটু হাঁটা দরকার।

বললাম, বেশ, চলুন তাহলে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে, স্টেট ম্যাগ-রামের দোকান পেরিয়ে হাল্কাইকবের দোকানের সামনে দিবে এসে পোস্টঅফিসের গা ঘেঁষে পেছনের হাটটার এসে পড়লাম আমরা।

হাটের ওপারে দীপচাঁদের দোকানের আলো জ্বলে উঠেছে—।

বেশ অনেকখানি হাটতে হবে।

মাস্টারমশাই বললেন, শরীর কেমন দেখাচ্ছেন আজকাল? এটিসব পাকদণ্ডী, পথ দিয়ে যাওয়া আসা করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

আমি হাসলাম, বললাম, মাস্টারের ভাসপাতালের সাহেব ডাক্তার ত'বললেন, যতখানি পারি হেঁটে বেড়াতে, শরীর সে খারাপ হয়নি। কখনো বড় অসুখে পড়েছিলাম, এসব কথা একেবারে ভুলে গেছি।

—ওঃ— তাই বুঝি। তাহলে ভাল।

ডাক্তার আমার বললেন, এখানে সব কিছু নীচ পাহাড়ি রাস্তা ত, তাই-ই বলছিলেন।

দেখতে দেখতে আমরা দীপচাঁদের দোকানের সামনে এসে পড়লাম, তারপর একটা ছোট বস্তী পেরিয়ে মোড়ের পোড়ো বাড়ির পাশ কাটিয়ে গ্রামের পাকদণ্ডীতে এলাম।

সামান একটা বড় কাঁববা মধ্য গাছ। মাঝে মাঝে পিচিস এবং কাঁচি জগল। পশ্চিমের পাহাড়ের কাঁধ বরাবর সংস্কার ভারাটা উঠেছে। সমস্ত আকাশ সেই একটা এবার আলোয় উজ্জ্বল।

হাটের লাঠি ঠকঠক করতে করতে আগে আগে চলতে চলতে মাস্টারমশাই বললেন, আপনি তখন মিস্টারই কিছু মনে করলেন? না? কি বলেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কই? কখন? এই যখন ঘোষকে ধমক লাগাইলাম আমি।

আমি বললাম, ঘোষ মাতো? শৈলেন খোষ?

উঁহ বললেন, হাঁ, হাঁ।

আমি বললাম, না, না ম'ন ক'ব কেন? তাছাড়া আপনার নিজেই মধোর কথায় আমার মনে করার কি আছে?

মাস্টারমশাই উদ্ভূত গলায় বললেন, না! এ ছাওয়াল পাওয়াগলোকে শোধবানো যাইব না—বা মাইনা পাইতাহে তা এই জাগার খাইয়া পইড়া থাকার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ এই চেঞ্জারদের সেইখা সেইখা ওদেরও কমপিশিশনে নামন লাগব। জখর, জখর জামা-কাপড়, লটব-পটব লুতা, কাম খালাপালা ট্রানজিশন, সবই ওদেরও চাই। কিছুই না জইলে নয়। নাই, নাই কইরাই পরানজা গেল।

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলাম। মাস্টারমশাই ফরিদপুরের লোক। কালীভক্ত, হোমিওপ্যাথী কবেন, ব্যাডেলার, চেঞ্জারদের উপর ও'র খুব রাগ। এখানের এই নিলি'ন্ত খেলী জীবনে, চেঞ্জাররা এসে চাহিদার জলালা জুগিয়ে যায়। এক্ষা তিনি প্রায়ই বলেন।

এবার সমস্ত সেট মালাটা এসে গেল। মালাটা, পেরিয়ে অশকপাশি বাড়ি উঠতে

হয়। ও জায়গাটাতে এসে এখনও বৃষ্টি বেশ হাঁপ ধরে। এখানে এলে পুথিতে পাই যে, এখানে পুরোপুরি ভাল হইনি আমি, এখনও বাজরোগের রেশ ছাড়িনি আমাকে।

চড়াইটা উঠে এসেই সেই সাদা পোড়ো বাড়িটা। সংস্কার অন্ধকারে দারুণ দেখায়। এখানেই অনেক লালন যে, এটা জুতের লাড়। মাস্টারমশায় হা'ওব লাঠিটা উঠু করে এদিকে দৌঁখিয়ে বললেন, এই যে সেই বাড়ি।

মাস্টারমশাইকে শংখালাম, এখান দিয়ে যাতে একা যেতে আপনার ভয় করে না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই সারম্বকারে কাঁচা-পাকা চুলেভরা প্রকাণ্ড মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, বললেন কিনা ভাই, আমি হইলাম গিয়া কালীভক্ত লোক—মায়েব পজা করি—জুর্ড-পেতাই লইয়াই আমাগো কাববার।

সাদা পোড়োবাড়ি পেরুমোর পর পথটা সোজা চলে গেছে খোলাই-ভরা টাঁড়ের মধ্যে দিবে। বাঁদিকে অনেকগুলো বড় বড় মইয়া গাছ। সামান্যতে এখন লব্ধ ব'লেছে ও'বাওরা। এখন অন্ধকারে সব সমান মাঠ বলে মনে হচ্ছে।

পথের ডানদিকে চার-পাঁচ ঘর লোকের বাস। ও'বাও সবল ও'রাও। ওদের শোখা শংখার বাড়ির সমস্তের গোবর-লোপা উঠোনে ঘোঁষ ঘোঁষ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফানিরা ককরের বাচ্চা হয়েছে, বারান্দার খড়ের মধ্যে শূঁরে বাচ্চাগলো কুই কুই করে ডাকছে। অন্ধকারে শব্দে ক্ষেতের গাছ আর এই টুকরো টুকরো লক্ষ্মীমণি বৈশ লাগছে।

শব্দে ক্ষত পেরিয়ে, অশক জারু ও'রাও—এর ঘরের পাশ দিয়ে আবার কাঁচি জগল ভেদ করে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে এসে উঠলাম। মাস্টারমশাই চা না খেয়েই কি করে যাচ্ছিলেন, আমি জোর করে বয়ে আসলাম, বললাম, চা না খেয়ে যাওয়া চলবে না। তারপর কিছুক্ষণ গল্পগুচ্ছ করে মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন।

লাঠি ঠকঠকিয়ে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে  
গেলেন। চলতে চলতে, মাঝে মাঝে বলতে  
লাগলেন, জয় মা, তোর জয়।

এখানে সম্ভব হলে গেলে আর কিছুই  
করার নেই। আমার প্রতিবেশী খারি তাঁরা  
সকলেই বেশী বয়সী। মানে নিকট প্রতি-  
বেশীরা। তাঁরা প্রায় সকলেই হয় আংলো-  
ইন্ডিয়ান, নয় বিদেশী। সম্ভার সঙ্গে  
সঙ্গে সাপার খেয়ে শূয়ে পড়েন তাঁরা।

লাল রেগেমেতে দেয়। আমিও সকাল  
সকাল খেয়েদেয়ে নিরে শূয়ে পড়ি। পট-  
পট এখানে পাওয়ার উপায় নেই। কপেল  
মাক্কারসনের লাইব্রেরী আছে। খুবই  
ভাল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ এমন  
হানিস্ত যখনি যে বই চেয়ে পড়ি।  
কলকাতা থেকে যোগলো এনোঙ্জিলাম সে-  
গলো বহুবীর পড়া হয়ে গেছে। এখন  
সম্ভা হলেই নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে  
হয়। যার শরীর অসুস্থ, অসুস্থ মানে  
বহু দিন ধরে অসুস্থ, যার মনে কোনো  
আনন্দের আভাস মাত্র অবশিষ্ট নেই, তার  
পক্ষে এরকম নিষ্ঠুর ভাগ্যব্যবস্থা একা একা সম্ভা  
কাটানো শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, ভাল হয়ে গিয়েই  
বা কি করব। ভাল হয়ে কলকাতায় ফিরে  
আবার তু সেই জীবনেই প্রবেশ করব।  
যাদের সঙ্গে আমার কোনো আর্থিক যোগ  
নেই, কোনো সাংসারিকের সম্বন্ধ নেই  
তাদের মধ্যে থেকে তাদের জন্যে আমার  
সেই চাকরী করব, করব রোজগার। রোজ-  
গার লজ্জার দাগ বুলোবে। সেও ত আরেক  
মৃত্যু। আমার সামনে বোধ হয় শূন্য, বহু  
মৃত্যুর দ্বারট খোলা আছে। আমার শব্দ  
এখন বেছে নাও তবে কোন মৃত্যু আমার  
পক্ষে সহনীয় এবং বরণীয়।

।। ২।।

এ জায়গাটার সকাল হয় না, সকাল  
আসে। অনেক শিশির-ঝরনা ঘাসে ভেঙে  
পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে অনেক শাখানী নদী  
পেরিয়ে সোনা-গলানো পোশাক পরে  
সকাল আসে এখানে।

কম্বলের নীচে শূয়ে আমার ঘরের  
টালির ছাদের ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভাস  
দেখা যায়। চতুর্দিক থেকে পাখি ডেকে  
ওঠে। বাড়ির পেছনের পিটিস্‌ খোপে ভরা  
টপে ভীতের আড়। বগড়াটি ভীতের-  
গলোর গলা সবচেয়ে আগে শোনা যায়।  
তারপর টিঙ্গা, ছুঁচ, বুলবুলি, টুন-  
টনি, মোটসী, আরো কত প্রকার পাখি  
এসে পেরাগাছে, আড়াগাছে, ফলসা  
গাছে, চেরী গাছে এমন কি বাবুচিখানার  
পাশের কাঁপাখানায় বসেও কাঁপাকাঁপ করে।

সেই প্রচণ্ড সম্ভা ও আনন্দিত প্রাণ-  
ভরনের মধ্যে, শিশিরবিন্দু, শিশিরতপ্ত ও  
আলোকিত শঙ্করহরীর মধ্যে এই অসুস্থ  
আমি চোখ মেলি। শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে  
এসে রোলে পড়ি।

মাক্কারস্কগঞ্জের প্রতিটি সকাল  
আমার জন্যে যেন কি এক আনন্দের পসরা

সাজিয়ে আনে। প্রতিদিন এই ভোরের  
আলোর দাঁড়িয়ে পূর্বের ও পশ্চিমের  
পাহাড়ের রোমা-রোমা সবুজের দিকে  
ভাকিয়ে আমি বারে বারে নিজেকে ভুলে  
যাই।

রোজ প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে পেরা-  
তলায় বেতের চেয়ারে বসি। মাল  
এখানেই চা এনে দেয়। রোদে পিঠ দিয়ে  
বসে থাকি। রোদটা একটু চড়লে, গ্রীষ্ম  
রোদ পড়লে আরামে চোখ বুজে আসে  
—তখন ইচ্ছে করে আরেকবার ঘুমাই।

মাল, মালির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছ-  
গাছালির তদারকি করি। বাড়ির সবুজ  
হাতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে  
হয় পৃথিবীতে এই একমাত্র জায়গা—। এই  
গাছগলি এই পর্বানো, ঘস-পড়া  
টালির ছাদের ভাঙা বাড়ি, এই পাখিদের  
জমিদারী এইটুকুই একান্ত করে আমার।  
আমার কণকালের একার। এছাড়া আমার  
জীবনে নিজের বলতে কিছুই নেই; না  
কেমনে জিনিস, না কোনো জন।

আমগাছগলোর তলায় একটা দোলনা  
টানানো আছে। কখনো সখনো সেখানে  
গিয়ে বসি একা একা। এই দোলনায় যে  
যারা এসে বসলে আমি ভীষণ খুশি হতাম  
তারা কেউ আসে নি এখানে। হয়ত  
আসবেও না। তাদের ভাল লাগে না,  
জঙ্গল। ভালো লাগে না এই জলী পরি-  
বেশ, আরো বেশী করে ভালো লাগে না  
হয়ত আমার সংগ।

দোলনায় বসে হল্যান্ড সাপেবের কাছ  
থেকে চেয়ে-আনা বাসি পর্বের কাগজ  
পড়ি। এমন সময় কুরো-তলার দিক থেকে  
আমের যেন একটা গরু ঢুকলো হাতার  
মধ্যে।

ওদিকে মাল বেগুন আর তেঁমাদাটো  
লাগিয়েছিল। মালকে ডাকতেই, মাল  
দোড়ে গিয়ে ভাঁড়িয়ে দিল গরুটিকে।

গরুটা কাঁটাভারের বেড়া পেরুনোর  
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারের পাশে একটি ছোট  
ছেলে এসে দাঁড়াল।

মাথার কাঁকড়া কাঁকড়া চলে, চিরদিন  
ও তেলে পড়নি বহু বড়র প্রায় -  
পরনে ছেঁড়া জামা—কোনো প্রমাণ সাইজের  
ফলপাণ্ট গুটিয়ে, পরেছে। সমস্ত  
চহরার মধ্যে এমন একটা রক্তভা যে কি  
কলব।

মালকে শমোলাম এ ছেলেটি কে?  
মাল বলল, লাবু বাবু।  
— লাবু বাবু কে?  
লাবু বাবু ডাবু বাবুর ভাই।

মালুর উত্তরে কিছুই পরিষ্কার হলো  
না, বলাবলি, অকস্মিক, লোকবান্দে।

প্রথমে লাবু বাবু আসতে চাইল না,  
শেষকালে যখন এসে আমার সামনে দাঁড়াল  
তখন শমোলাম তার পদ চোখে ভরের ছায়া।  
বলল দশ-এগারো হবে, হাতে গরু  
ভাড়াবার ছোট একটি লাঠি। নীচের চাঁটটি

খেটে কুকাক হয়ে গেছে। রক্ত দেখাচ্ছে  
চোঁটটা। চোখ দুটো কটা কটা। সমস্ত  
শরীর এখানের প্রচণ্ড শীতে শীতাত।  
শমোলাম, তোমার নাম কি?  
লাবু।

কোথায় থাক?  
এখানে। কপেল সাহেবের বাড়ির  
পাশে।

বাড়িতে কে কে আছে?  
মা, আর দাদা।  
বাবা নেই?

না। বাবা অনেক দিন আগে মারা  
গেছেন।

লাবু ভাঙা ভাঙা বাংলা বলছিল।  
বাংলা শূনে মনে হয় না যে বাঙালি।  
লাবু বলল, ওর ভার গরু চরানো, গরুর  
সময় মংসেও হুড়োয়। ওদের অনেক জমি  
আছে। নিজেরা লাঙল দেখে, নিজেরাই গরু  
দেয়াল, চাষ করে। লাবুর দাদা ডাবু  
খিলারির স্কুলে পড়ে। লাবু চুরি করে  
একদিন আচার খেয়েছিল তাই তার দাদা  
তাকে শানবাধানো বারান্দায় আছড়  
দেওয়াতে তার চোঁট বেটে যায়। ঠান্ডায়  
এই চোঁটখানির অমন বীভৎস অবস্থা।

লাবুকে শমোলাম, তুমি আসছিলে না  
কেন? তোমাকে যখন ডাকছিলাম?

লাবু স্বীকারবাচি করল, গরু ঢুকলে  
বলে আমি যদি মারধোর করি সেই ভয়ে  
ও আসতে চাইছিল না। গরুগুলো ধরে  
খোঁয়াড়ে দিলেও বিপদ হত।

লাবুকে শিস্কিট খাওয়ালাম। বললাম,  
তুমি কি কি খেতে ভালবাস?

ও বলল কিছু না। তারপর অনেক  
পীড়াপীড়ি করাতে বলল, ছোলার ডাল  
আর রসগোলা।

আমি তেঁমে বললাম, আচ্ছা তোমাকে  
আমি ছোলার ডাল আর রসগোলা  
খাওয়াব। লাবুকে বললাম, আমি তোমার  
পাদার মত। যখনি ইচ্ছে করে চলে এসে,  
তোমার সঙ্গে গল্প করব, আমাকে ভর  
পেও না বুলে?

লাবুর কথাটা বিশ্বাস হলো না। দুই  
ছেঁড়া পকেটে দু' হাত গিলিয়ে দাঁড়িয়ে  
রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, আসি,  
কেমন?

লাবু চলে যাওয়ার পর দু'খন মাথাতো  
কককা বস্তী থেকে মাটির হাঁড়িতে দখ  
নিয়ে এল। কান মেসসাহেবের লোক  
কালো চিনের বাক্স মাথার করে পাঁজরুট  
আর খান্ডা বিস্কুট দিয়ে গেল। কসাই  
হানিক; সবুজীওয়াল রহমান এল।  
রহমান পাকদড়ী পথে এগারো মাইল  
পায়ে হেঁটে প্রতি সোমবার সন্দের হাটে  
যায়, সেখান থেকে সাক্ষি কিনে বাকি করে  
ম্যাক্কারস্কগঞ্জের বাড়ি বাড়ি সম্ভা বিক্ৰী  
করে। ম্যাক্কারস্কগঞ্জে হাট বসে—শুক-  
বারে, হেসালগে।

হেসালঙ, লাপরা এবং কুকা এই তিনটি বস্তুর নিয়ে ম্যাকলান্ডগঞ্জ। আমি যে অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিরেছি, সে অঞ্চলের নাম কুকা।

স্টেশান, বেশীর ভাগ দোকানপাট এখানে সৈদিকটার নাম লাপরা। আর খিলাড়ির দিকের রাস্তার গায়ের নাম হেসালঙ।

হেসালঙের দিকটা ফাকা ফাকা—জংগল ওদিকে গভীর নয়। লাপরার দিকে ত জংগল নেই বললেই চলে।

জংগলের মধ্যে দিয়ে লালমাটি ও পাথর ভরা খেঁ অসমান পথটা চারার দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু'পাশে লাল টালিব হাদওয়লা সব বাঙালো এ বাড়িতে আসতে সেই কাঁচা রাস্তা ছেড়ে আরো ভিতরে ঢুকতে হয়।

চতুর্দিকে শাল সেগনের জংগল। আর পিটিস এবং নানারকম জংলী ফুল। এখানে এখন একরকম জংলী হলুদ ফুল হয়, সানফাওয়ারের মত। বাড়ির পেছন-দিকটা সেই ফুলে ছেয়ে গেছে এখন। সাজার হাজার ফুল পাকদন্ডী পথটার দু'পাশে ভরে আছে। চোখ চাইলে চোখে হলুদ দেখা ধরে।

পৃথিবীতে এখনো যে এমন জায়গা আছে, যেখানে স্টেশানে নেমে, নিজের মাল হাতে করে যার যার বাড়ি হেঁটে আসতে হয়—সে ছ' গাইলই হোক কি চার গাইলই হোক, তা ভাবা যায় না। এখানে ডাঁড়ার জন্যে কোনো ট্যাক্সি, রিক্সা, গরুগাড়ি অথবা ঘোড়া গাড়িও নেই।

লার্লি পেয়ারাতলায় ঝেতের চেয়ার-টেবল পেতে নাস্তা লাগিয়ে দিয়েছিল। নাস্তা শেষ করে বাড়ির পিছনটা ঘুরে দেখছি—খনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা লাগানো হয়েছে এদিকে—আদাও আছে—কুয়োতলার পাশে পাশে শূদিয়ার কাড় লেগেছে। ধান লাগাতে দেবী হয়ে গেছিল নীচু জমিতে—তাই ধান ভাল হয়নি এবার। বর্ষাও এবারে খুব কম হয়েছে। ধান কাটার স্মরণও হয়নি এল।

কুয়োতলার পাশ দিয়ে পাহাড়ি নালাটা গেছে একেবেঁকে। বাড়ির এই-ই সীমানা। বাড়ির তিন পাশ দিয়ে নালাটা ঘুরে গেছে।

আজ থেকে দশ বছর আগে এ নালা দিয়ে প্রভিরতে বড় বাঘ বাওয়া-আসা করত।

এখনো হারনা যায়, গরমের দিনে মছুরা-লোভী একলা ভালুক। আর চুপি চুপি আসে লামরীরা। পা টিপে টিপে আসে, পা টিপে টিপে শুকনো পাতা মচমচিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তা শূন্যে শূন্যে তাদের আসা-যাওয়ার শব্দ শুন। কখনো কখনো নেকড়ে বাঘ আসে ময়গা ও ছাগল ধরতে। দেহাতীরা বলে রাস্তার বেলা এই নাক দিয়ে ভুতুরাও বাওয়া-আসা করে। নাকরকম-কৃত।

আজকে জালির অসুখ করছিলাম; একটি ছেলেকে পেরেছিলাম রায়্য করায় জন্যে।

শীতের রাতে উদ্দেশের গরমে আরামে শোবে বসে।

প্রথম দিন কাজ করল, তারপর প্রথম রাত পোরালে দেখি সে আর ওঠে না। সকাল আটটা বাজল, চা দেওয়ার নাম নেই। দরজা খািলে তাকে জাগাতেই সে কাঁদতে আরম্ভ করল, বলল, আমাকে একটুনি ছুঁটি দিন বাবু, আমি এখানে এই জংগলে কাজ করতে পারব না।

কি হয়েছে শূদোতে, সে বলল, সারা রাত জুতোরা এই নালায় ধমর-ধমর করে শুকনো পাতার নেকেছে, নানা রকম আওয়াজ করেছে, একশ টাকা মাইনে দিলেও সে এখানে চাকরী করবে না।

অতএব তাকে তকুনি ছুঁটি দিতে হয়েছিল।

কুয়োর পাশে পাশে অনেকগুলো জংলী জাম এবং আমলকি গাছ গজিয়েছে। এক দল টিয়া এসে তাতে কাঁপাঝাঁপ করছে। আমলকির ডালে-বসা টিয়ার কাকের দিকে তাকিবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মালু বলল, বাবু, খবর আয়া।

মালু পোস্টাফিসে গেলিছিল খত আনতে। এখানে ডাক পিওন নেই। সকাল এগারোটায় যখন গাড়ি আসে আপ ডাউনের, তখন প্রত্যেককে যেতে হয় পোস্টাফিসে।

পোস্টমাস্টার এক একে নাম পড়ে যান—যে যার চিঠি নিয়ে বাড়ি ফেলে। এখানের হাট এবং পোস্টাফিস হচ্ছে ক্রাবের মত—সকালের দেখা-হওয়ার জায়গা।

খামের চিঠি, হাতের লেখাটা দেখেই অবাক হলাম। অবাক নয়, বলা উচিত উত্তেজিত হলাম। এ চিঠি এমন একজন লিখেছে যার কাছ থেকে চিঠি এলে আমার স্বাভাবিক কারণই উত্তেজিত হবার কথা।

চেয়ারে বস চিঠিটা খুললাম। ছুঁটি লিখেছে। রচী থেকে।

কাকি প্রোড, রচী ১০/১২/৭২

সুকুদা,

আপনি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে থাকেন, কিন্তু অবাক হওয়ার মত কিছু আছে বলে আমি ত জানি না।

বহু দিন হল আপনার কোনো চিঠি পাই না।

কিছু দিন আগে কোলকাতায় গেছিলাম।

অনেকদিন আপনাকে দেখিনি—তাই খুব দেখতে ইচ্ছা হওয়ার সমস্ত কৃপিক নিয়েই আপনাদের কেহাডলার বাড়িতে গেছিলাম। বোধি ভিগেন না।

অবশ্য না-দেখা হয় ভালই হয়েছে, দেখা হলে আমি খুবই এম্বারাসড ফিল করতাম। যে দেখে আমি শেষী নই, দোষী ছিলাম না কোনো দিনও সেই দোষের জন্যে মনে মনে উনি আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য একথাও জানি, যে সেই শাস্তির বোকা বইতে হ'য়ছে আপনাকে, কখনো প্রতিবাদের সঙ্গো, কখনো বিনা প্রতিবাদে।

এমন অসুখ কি করে বাধিয়েছিলেন জানি না।

ভগবানের দয়ায় আপনার কোনো কিছুই অভাব ছিলো না, নিজেকে সুখী করার সমস্ত রকম উপাদান আপনার মধ্যে ছিল। একজন পুরুষ মানুষ জীবনে যা চাইতে পারে তার সব কিছুই আপনি পেয়ে-ছিলেন, অথচ তবু সব জেনে-শুনে আপনি এমন নিজেকে নিদর্শনভাবে নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন।

কার উপর অভিমানে আপনি এমন করে নিজের প্রতি অবয়ব করে এই অসুখ বাধালেন?

আপনার সংগে দেখা হলে খুব ঝগড়া করব বলে দিলাম।

আপনাদের বাড়িতে শুনলাম আপনি আরো হাস ছয়ক ওখানে থাকবেন।

আপনার উপর কতখানি রাগ করে আছি তা আমার সংগে দেখা হলে বুঝবেন।

প্রীধুত এখন হইতে ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।



অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লি:

২৬, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭



আপনি রাঁচী হয়ে গেলেন, রাঁচী আমাকে একটা খবর পৌঁছান দিলেন না। ওখানে প্রায় দু'টি দিন হল যাচ্ছে, রাঁচী থেকে মাত্র পঁচাত্তর মাইল পথ, অথচ আমাকে ওখান থেকে-আমালেন না যাতে একদিন আপনার সন্ধান দেখা করে আসতে পারি।

আপনি নিজেকে কি ভাবেন জানি না। আপনি আমাকে কি ভাবেন তাও জানি না। আপনাকে কি আজ মনে করিয়ে দিতে হবে যে আপনার অশান্তি যাতে না বাড়বে, আপনি যাতে বেশী করে দুঃখ না পান শুধু সেই জন্যেই কোলকাতার বৃন্দ-বাগিচা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে একজন সীমা এম-এ পাশ-করা অপরূপতী, অক্লান্তিতা মেয়ে একা এখানের কলেজের চাকরী নিয়ে চলে এসেছিলেন?

এক সময় আপনি আমাকে একদিন না দেখতে পেলে পূর্ণালের মত করতেন, অথচ আমাকে শুধু একবার চোখের-দেখা দেখার জন্যে আপনাকে যে কষ্ট ও অনেক সময় অপমানও সহ্য করতে হত তা আর কেউই না জানুক, আমি জানতাম। সে কষ্ট আমার পক্ষে অসহ্য ছিল।

আমার প্রতি আপনার এক অন্তত, আমার আবেগের এক রাখে থাকে এখন মনে হয় হয়ত অন্তঃসারশূন্য ভালোবাসার দাবি দিতে গিয়ে আমার সমস্ত স্বেচ্ছা জীবনটাই প্রায় দিতে বসিছি—অথচ আপনি এমন নিষ্ঠুর যে আমায় এত কাঁদ থেকেও আজ আমাকে একবার দেখতেও ইচ্ছা করল না আপনার। একবার দেখা দিতেও না।

আপনি বলতেন মেয়েরা ভালোবাসার কিছু বোঝে না এমন ভাব করতেন, যেন পৃথিবীতে কাউকে ভালোবাসার মানে কি তা একমাত্র আপনিই বুঝতেন।

অন্য ছেলের কথা জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখে যদি ছেলের ভালোবাসার সংজ্ঞা স্থির করতে হয় তাহ তা সমস্ত পুরুষ জাতির পক্ষে কত কল্যাণকর হবে।

রাঁচীতে রাত বাস স্টেশনে আমি খোঁজ নিজেছি—কিন্তু ম্যাককাসিকগঞ্জের বাস ছাড়ে এখান থেকে। সাধারণ পরিস্থিতিতে পৌঁছায়। আপনাকে যদি আমি চিনি না, শুধুনাছি, খবরই জংলী জাঙ্গলা—।

এ পর্বত অনেক কিছই একা একা খুঁজে নিজেছি, চিনে নিজেছি তাই চিনে নিতে পারব না এমন জ্ঞান নেই। একদিন জঙ্গল থেকেব রাখ থেকে আপনাকে চিনতে যখন ভাল ভাস নি আজ অজ্ঞানতার ভগ্নাঙ্গল আপনার বাড়ি চিনতেও কষ্ট হবে না আশা করি।

আপনি কেমন আছেন? এখনো কত-খারাপ অসুস্থ আছেন জানতে ভীষণ ইচ্ছা করে। এখনি কি সত্যিকার অসুস্থ আছেন? আমি আগামী বর্ষিকার আপনার ওপর সব মনোযোগ রাখব ও বর্ষিকার আপনার কল্যাণ-থেকে সর্বোচ্চর ভাবে রক্ষা রাখব।

আমাকে আটকে রাখার চেষ্টা করবেন না, সব্ব্বের আগে কেন ডাকিয়েও দেখেন না। আপনাকে বহু দিন বলেছি, যা দিতে পারি, সেটুকু দেওয়ার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে, যা দিতে পারি না তা না দেওয়ার বেবনাকে আরো ভীষণ করবেন না। আশা করি, আপনি আমাকে বুঝবেন।

আপনার চোখে আমি কি এবং কতখানি শূন্য এ কথাই আপনি বারবার জানিয়েছেন, আপনি কোনোদিন সত্যিকারের আমার চোখে আপনি কি এবং কতখানি তা বোঝেন নি এবং বুঝতে চানও নি।

আপনার হয়ত অনেক আছে, অনেক আছে, কিন্তু আমার আপনি ছাড়া আর কেউ নেই এত বড় পৃথিবীতে। আপনার মত করে এই অল্পবয়সের জীবনে আমাকে কেউ ভালবাসেনি, এমন করে কেউ ভাল-বাসতে জানে না।

আমার জীবন থেকে আপনি কিছু দিনের জন্যে হারিয়ে গেছিলেন, স্বল্প-দিনের জন্যে। বার সামান্যই থাকে, সেই অসামান্য সামান্যটুকু হারানোর দুঃখ যে কি তা আমার মত করে আর কেউই জানে নি।

কালগদের বলে আমার সোমবারের ক্লাস আফটারনুনে করে নিয়েছি। রাঁচী ফিরে, চান-খাওয়া করে ক্লাস নেব। সোমবারে।

আমি আসছি এ খবর শুনে আপনার শরীর নিশ্চয়ই বেশী অসুস্থ হবে না। অসুস্থ হলেও আমার কিছু করার নেই। আপনি বরাবরই স্বার্থপর। নিজের সুখের জন্যে চিরদিন আপনি অন্যকে দুঃখী করেছেন অথচ কোনোদিন অন্য কারো দুঃখের খেঁজ রাখেন নি।

আমি জানি, আপনি নিশ্চয়ই এখন ভাল আছেন। আপনাকে ভাল থাকতেই চাই। আমি যতদিন বেঁচে থাকব যতদিন আমার নিঃশ্বাস পড়বে, ততদিন আপনার কোনো রকম ক্ষতি হবে দেব না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আপনার ক্ষতি করবে।

শ্রুতি—আপনার অনাদরের জ্বলে-বাওয়া ছুটি।

চিঠিটা পড়া শেষ করে ভাঁজ করে রাখলাম। পরকালেই চিঠিটা খুলে আবার পড়লাম, বার বার পড়লাম। চোখের কোণ দুটি কেন যেন ভিজে এল। যৌধর অসুস্থ শরীরের জন্যে। এ শরীর, এই আবেগ সহ্য করার শক্তি রাখে না।

এ রকমই কি হয়? বোধি আমি এক-জনকে ভীষণভাবে চেনেছিলাম, তার শরীর তার মন, তার সব্ব্বকিছু, তার সমস্ত সঙ্গিন সে সম্প্রদায়ের নইল ছিল, ভালো-লাগায় লক্ষ্যবর্তী লতার মত তেঁপালি শূন্য, আমার বৈহসবী পৌরুষের কোনো দানই গ্রহণ করার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না।

সব সময় সে ভয়ে ভরত, এই দুঃখ অনায়াস করে কেলল নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে নিজের পরিবারের মর্মান্ব কাহে, বতার কাহে।

পাছে সে কাউকে ঠকার, অনুগ্রহ সেই আশঙ্কায় সে চুপ করে থাকত। মুখে বলত, 'না, না, না', চোখে বলত 'না, না, না', আমার সমস্ত উদ্দাম অবস্থা আবেগের উত্তরে তখন সব সময় সে নিজেই, নিজের সংস্কারের মধ্যে লুকিয়ে রাখত। সামাজিক অনুশাসনের কোরথা পরে দূর থেকে সে চোখেব ঘলঘলি দিয়ে আমাকে দেখত, আমার সত্যিকারের রূপ জানতে চাইত। আমার সমস্ত চাওয়া শূন্য, তার শরীরকে পাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত না তার চেষ্টেও বড় কোনো চাওয়া এ পৃথিবীতে আছে, যে চাওয়ার শূন্য-বাওয়া মনও পূর্ণিত হবে ওঠে তা ও সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে চাইত।

এতদিন পরে, এত বছর পরে আজ বুঝি আমার ছুটি, আমার অনেক দিনের ছুটি আমার মত করেই বুঝেছে সে, জীবনে কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। যা পাবার, যা দেবার তা একমাত্র নিজেকেই পেয়ে ও দিয়ে থনা বা অথনা হতে হয়। সে আনন্দ বা দুঃখ শূন্য তারই। তার একার। সেই ন্যায় বা অন্যায়ের পাওনা এবং প্রায়শ্চিত্ত আব নিজেকেই একার। তা যদি নাই-ই হবে তবে আজ ছুটি কেন এমন করে চিঠি লেখে?

যে মুহূর্তে আমায় সমস্ত মন নিজেকে নিঃশেষে এ পৃথিবী থেকে ছুটি দিতে চায় সে মুহূর্তে বেঁচে থাকার মত কোনো বকম অনুপ্রেরণাই আর আমার অর্বাশংক নেই ঠিক সেই মুহূর্তে কেন সে এমন করে আগল খুলে চিঠি লেখে?

কোনো আশ্চর্য শক্তিতে ও কি বুঝতে পেরেছে এখন আমার মনে কি হয়? আমার মন যে চিরদিনের মত আজ ছুটি চায় সকলের কাছ থেকে, এমন কি ছুটির কাছ থেকেও তা কি ও বুঝতে পেরেছে?

১১৩।

কাল রাতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল।

রাত কত তা মনে পড়ে না, বোধহয় বারোটা-চৌরোটা হবে—শীতের রাতে এই জগলে তা অনেক রাত—হঠাৎ আমার ঘরের পাশে কান পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া করে শুনলাম—শিশিরের-ভেজা পাতার উপরে কোনো লোকের অসাবধানী পায়ের শব্দ।

বিজ্ঞানা ছেড়ে উঠে যথাসম্ভব কম শব্দ করে দরজা খুলে কাইরে বেরিয়ে টেবিলে লক্ষ্য লক্ষ্য করে—দেখলাম একজন অসম্ভব লম্বা কাণো কচকচে লোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের বুট জুতো, খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট গায়ে গরম কালো জোটা।

লোকটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু'হাত বুকের উপর আত্মজাতি স্তব্ধ রাখল।

লোকটার কাছে গিয়ে মূখ্যে টক ফেলে  
শুধোলাম, তু কণ্ডম হো?

সে বলল, ফরেষ্টের লোক।

—এত রাতে এখানে কি করছ?

—মালকে ডাকতে এসেছিলাম।

—এত রাতে?

—দরকার ছিল।

লোকটার কাছে যেতেই বুকতে পেলাম  
লোকটা নেশা করেছে। মূখ্য গিয়ে মহুরার  
উৎকট গন্ধ বেসেছে।

আমার রাগ হয়ে গেল, বললাম, এ  
বাড়ির হাতার মধ্যে রাতে আর কোনদিন  
তোমাকে ঢুকতে দেখলে গুলী করে মাথার  
খুপারি উড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন।

লোকটি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, জী  
হুজের। বলে পেছনের গেটের দিকে যেতে  
লাগল।

একটু পরই, আমি গিয়ে শুরে পড়ার  
পাঠ মিনিটের মধ্যে চুড়ি কমঝামিয়ে কে  
যেন আমার জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল  
বাইরে। তাড়াতাড়িতে জানালা খুলে টর্চ  
জ্বাল বুধাই-এব গাল ফুল ফুল শাড়ির  
পছনটা দেখতে পেলাম। বুধাই মালদের  
ঘরব দিক থেকে সোড়ে যাচ্ছিল, বাইরের  
দিকে।

দেখাশ পাঁচু এতদিন অনেকের কানা-  
ধার যা শুনোছি তা সত্য। লালির এ  
ময়ে বুধাইকে তাব বর নেয় না। ও  
এখানেই থাকে।

ময়েটার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। সারা  
গায়ে শবন উপাচ্ছ পড়াচ্ছে—তবে চোখ  
মূখ্যে খাবড়া খাবড়া।—খুব ভাল স্বাস্থ্য।  
ময়েটা এমনিতে খুব হাসিমুখী—যখন  
‘রজার কাজ করে অথবা যখন হাটের দিনে  
হাটে যায়—দেখি রঙিন চুড়ি পরে, রূপোর  
গয়না সাজে, মুখে চলে তেল চুইয়ে পড়ে।

ময়েটা ধীয়ে ধীরে কিছুর করতে  
পারে না—হাটতে বললে দৌড়ে যায়, দৌড়তে  
বললে ওড়ে। প্রাণ উপছে পড়ে সব সময়  
ওর শরীর থেকে।

সেই ময়েটার নাকি স্বভাব ভাল নয়।  
এখানের সাথে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে  
কেউ কেউ আমাকে আগে থাকতে সাবধান  
কর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, চোখ রাখতে।

আমার নিজের চোখ নিজের যা একান্ত  
সব জিনিস বা জন ছিল তাদেরই পাখল  
না চোখে চোখে রাখতে তাই এত দূরের  
ও পরের জিনিসে চোখ রাখার প্রয়োজন  
মনে করি নি। এখন দেখছি, নিজের বাড়ির  
হাতার আসব বসিয়েছে এরা।

খুম চটে গেল। ভাবতে লাগলাম মা  
বাবাই বা কেমন? চোখের সামনে ময়েটাকে  
বা খুশী ভাই করতে দিচ্ছে? মা-বাবার মত  
ছাড়া এমন হয়?

মালটো বোকা—ওকে লালিই চালায়।  
লালির বরস পঁয়তাল্লিশ মত—মূখ্য মিশি—  
খুঁত ময়ে। বোকাই নিজেকে কি করেছে

দোষের মধ্যে হাটের দিনে একটু নেশা করে  
ফেলে। এ ছাড়া মালদের কোনো দোষ নেই।  
মাল একজন খাটি, সব ও সরল ওরাও।  
সংসারের মাথাটি খোঁজাও ও বোকা না।  
ওর মূখ্য দেখলেই বোকা বায় ও অনেক মার  
খেলেছে এভাবে সংসারের কাছে।

আজ এত রাতে আর কিছুর করার  
নেই। কাল এসকালে এ ব্যাপারের একটা  
ফয়সালা করতে হবে।

কোনো আদমতম জানোয়ারের কামড়  
থেকে এই শীতের রাতে ফরেষ্ট অফিসের  
বেয়াবা মোসুমী কুকুরের মত পাকদন্ডী  
বোয়ে মহুরা থেকে অন্ধকার সাতারে চলে  
আসে কেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু এ  
অপ্সে শুনতে পাই অনেক চেঁজার বাবু-  
রাও নাকি এমনিভাবে মোসুমী কুকুরের মত  
ঘোরেন-ফরেন।

জানি না তারা কী পান? একটা অচেনা,  
অজানা মনহীন শরীর ঘেঁটে ঘেঁটে ওরা কি  
খোঁজেন?

এপাশ-ওপাশ করি, কিছুরেই আর  
ঘুম আসতে চায় না।

কল্কা বস্ত্রীতে কারা যেন মাদল  
বাজিয়ে একটানা দোলানী সুরের ঘুম-  
পাড়ানী গান গেয়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে অনেক দূরে রেললাইন  
থেকে ঘন জগলেন মধ্যে দিয়ে শীতের  
রাতের ডিজেল ইঞ্জিন একটানা ভারী  
আওয়াজ ভুলে সে আওয়াজ অন্ধকার  
পাহাড়ে-বনে প্রতিধ্বনিত করে চলে যাচ্ছে।

আমার সব আওয়াজ থেকে গেলে চারি  
দিক থেকে শব্দ ঝর্ণান। কান্না, বি  
বিং এবং পাতা থেকে শিশির পড়ার ফিস-  
ফসানিতে সমস্ত রাত ভরে যাচ্ছে।

ফাদাব মাটিনের বাড়ির জোড়া-গ্যাল  
সেসিয়ান ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। দূর থেকে  
সে ডাক ভেসে আসে।

লালার দিক থেকে একটা খাপু পাখি  
হঠাৎ ডাকতে শুরুর করল, খাপু-খাপু-  
খাপু-খাপু। খাপু পাখির ডাক শেষ হলে  
মিসেস ডাগনের বাড়ির দিক থেকে  
(যেখানে প্যাট স্পাসিকিন থাকে) একটা  
টিটি পাখি, টিটির টি-টিটি-টি টি কবতে  
এবতে এ বাড়ির দিকে উড়ে আসতে  
লাগল।

টিটি পাখিটা কি কিছুর দেখেছে?  
কোনো জানোয়ার? কোনো লোককে এই  
রাতের পথে চলা-ফেরা করতে? নাকি সেই  
লোকটিকে দেখেছে, যাকে এখানের অনেক  
লোকই দেখেছেন। লোকটির পরগে কালো  
ট্রাউজার এবং কালো শার্ট—দূর থেকে  
কাঁচা রাস্তা ধরে লোকটিকে আসতে দেখা  
যায় তারপর কাছে এলেই সে মহুরের  
মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। মিস্টার পটার  
দেখেছেন তাকে, একদিন মিস্টার এন্ড  
মিসেস এ্যালেনও দেখেছেন।

এই পরিবেশ, এই নিজনভার, এখানে  
কোন দিকেরই আসা ও পলা সম্ভব।

চামার মোড়ে কিছুদিন আগে কাবা  
যেন অত্যাচারী সুন্দরের বাবামারীকে খুন  
করে তার মৃতদেহ গাছ থেকে ঝুলিয়ে  
রেখেছিল—সেই বীভৎস মৃতদেহের কথা  
মনে পড়ে। মনে পড়ে, গভীর রাতে একজন-  
চলা ডুলি রেঞ্জের বড় বানের কথা। সে  
পথে এখন গেলে তাকে দেখা যেতে পারে।  
শিশিরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে হরত  
পথের উপর নরম ধুলোয় লম্বা হয়ে শুরে  
আছে। অথবা সেই হাতীর দলের কথা—  
ধারা পালামোর সাংসারী থেকে মাঝে  
মাঝে চলে এসে এই জামার রাস্তায় শব্দ  
উঠিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়ায়।

মনে পড়ে যায় টি-বি হাসপাতালে  
আমার পাশের কেডের সন্তেরা বছরের  
ছোটটির পানামা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে  
আত্মহত্যা করার কথা। পুরো হাসপাতালের  
কেউ জানলো না কেন এমন ফুটেফুটে  
ছোটো আত্মহত্যা কবলো। অথচ ‘স  
নিজেকে এমন হঠাৎ করে নিঃস্বরে দিল  
অসময়ে ফু’ দিয়ে তার কারণ একটা  
নিশ্চয়ই ছিল। অথচ কারণটা কেউই  
জানলো না। জানতে চাইলো ও না পর্যন্ত।

এমন এমন সব হঠাৎ ঘুম-ভাঙা রাতে  
‘পস্টলের নলটা কপালের কাছে লাগিয়ে  
আমিও ভাবি—যখন অর্মান কবে হঠাৎ  
হাওয়ার মত কোনো সুন্দর চাঁদনী রাতে,  
ফুকে গন্ধের মধ্যে রাতচবা পাখির ডাকের  
মাঝে রূপালী রাতের কমঝামিয়ে বেধে-  
ওটা সমস্ত শব্দ তরলোব মাঝা এখানে  
একদিন নিজেকে নিবিশ দের—সদিন এবং  
তাবপ একজনও কি জানবে জানতে চাইবে,  
‘কেন হঠাৎ নিঃস্ব গেল ম আমি?

আসলে কেউই জানবে না কেউই  
কাঁদবে না কেউই ভাববে না—।

হাসপাতালের সেই অখ্যাত তরুণের  
জনে বোজ সকাফে গেলাপব পপিডি  
থেকে মার পড়া শান্ত শীতল শব্দময়  
জেনো কেহ বা কোনদিন কেমন?

তবুও রাতে হাব চলে যাক হবে,  
আজ কিবা কাল নিজের হাতে নিজেকে  
খেয়া-পাব করাও হবে।

যে-হাত পিস্তল ধরা থাকবে সেই  
হাতই একজনের নরম হৃৎ সুরার স্বপ্ন  
নিজে দুটি চাখ বুক্রে আসবে।

এই মায়কলসিকগঞ্জ পাখি ডাকল,  
ফল ফল পড়ল মকানা পাতা উড়ল  
চিহ্নী ভাবসায় মহুরা আর কবানপরে  
গল্প ভাবী হয়ে থাকবে সমস্ত পকতি—  
আর এই মন, ও নিঃস্বাস ক্রিষ্ট নরিত ও  
বাণিত হৃদয়ের একজন চিন্তিনিদ্রায় ঘুমিয়ে  
থাকবে।

ঘুমিয়েছে কি থাকবে? না আমাকেও  
সেই কালো ট্রাউজার ও কালো শার্ট পবা  
অশরীরী লোকটির মত দেখা যাবে এই  
জগলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে?

।। ৩ ।।

কাল এক পল্লী ঘৃষ্টি হয়েছিল  
দাপনের দিকে। কালকাল সন্তেরা ঘুমিয়ে

পড়েছে। আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবার পরই ঠান্ডার প্রক্ষেপ বেড়েছে। কনকনে একটা হাওয়া বইছে উত্তর থেকে।

মান্দারের সাহেব ডাক্তার সকাঙ্গ-বিকেল দুপুরে নিয়ম করে হাটতে বসেছেন। এখানে ওষুধ খাওয়ার বিরাম নেই। ঘড়ি ধরে এখানে নানা রকম ক্যাপসুল খেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে একাধিক টানক।

লোকে বলে, আজকাল শক্মা হলে কেউ মরে না। কথাটা হয়ত সত্যি, সময় মত ধরা পড়লে কেউ মরে না। কিন্তু প্রাণে না মরলেও যে প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে রোগীতে পড়তে হয় তা এ রোগের রোগী মাত্রই জানেন।

একটা লাংস আমার চিরদিনের মত অকোজে হয়ে গেছে। অন্যটা নিয়ে যতদিন বাঁচি ততদিন সাবধানে বাঁচতে হবে। এ ভাবে কাঁচার কোনো মানে নেই। আমি এমন কোনো লোক নই যে আমার বেঁচে থাকার জন্যে যে কোনো মূল্য দিয়ে বাঁচতে হবে। এমন কিছু, মহৎ কর্ম আমার করণীয় নেই, আমি মরলে কোলকাতার ময়দানে আমার পচাচু হবে না, কেউই আমাকে মিস করবে না—তাঁই যেমনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন তেমনভাবে বাঁচতে না পারলে আমার কাছে বেঁচে থাকাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বিকলে ফুল স্লিভস সোফটার চাপাণ মাথায় গরম টুপি দিয়ে হাটতে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি দূর থেকে প্যাট আসছে।

প্যাটের একটা পা নেই। থাইয়ের কাছ থেকে কাটা ডান পাটা। ও যখন স্বিকৃতিয় মহাযুদ্ধে সিংগাপুরে ছিল তখন বোমার টুকরোয় ওর পা জখম হয়েছিল।

প্যাটের বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দেখলে পঁয়তাল্লিশ বলে মনে হয়। কাচ ভব করে ও সাবা ম্যাকলার্ক ঘুরে বেড়ায়। সগস্ত সময় মুখে হাসি লেগে আছে। প্যাট গিয়ে-থা করেনি। মিসেস ডাগানের বাড়ি ও দেখা-শোনা করে মাসে একশ টাকার বিনিময়ে।

ছোট শোবার ঘরটার দেওয়ালদয় পিন-আপ ছবিতে খুঁড়ে গেছে। ও ক্রসে বলে, 'ইউ সী আই ফিল ভেরী লোনলি ইন উইনটার নাইটস, দ্যাটস হোয়াট দে কীপ মি কোম্পানী' সে গিভ মি আ লিটল ওয়ামথ।'

প্যাট দূর থেকে পলল, গুড আফটার-নুন মিঃ কোস।

আমি হেসে বললাম, গুড আফটার-নুন।

ও আবার আস'হ আসতে বলল, গোলিং ফর আ স্ট্রীট

আমি বললাম, ইয়া।

ও বলল, 'ক্যা, আই উইল একসপ্যানি

জালি এসে শূন্যলো এখন দুধ খাব কিনা, না ল্যাংড়া লাসিকনের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে খাব।

আমি বললাম, বেড়িয়ে এসে খাব।

এখানের দেহাতীরা লোকের নজরকরণে বড় পটু কিন্তু বড় ভুড়। প্যাট 'লাসিকনের' বেহেতু একটি পা নেই ওকে এখানের সকলে বলে ল্যাংড়া লাসিকন। হল্যান্ড সাহেব এদের উদ্ধারণে হল্যান্ডিয়া।

এখানে যে সব বাঙালী আছেন স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁদের মধ্যে একজন এক সময় মুরগী পোষার ব্যথা চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর নাম মুরগী চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি এখানে অনেক। তাই কোথ হর চ্যাটার্জিদের সনাক্তকরণের সুবিধার জন্যে এরা মুরগী চ্যাটার্জি, আন্ডা চ্যাটার্জি (অপরূহ উনি ও'র পোলট্রির ডিম বিক্রী করেন), শূয়ার চ্যাটার্জি (এ'র অপরূহ এ'র পিগারি ছিল) এবং ছাগল চ্যাটার্জি (এককালে নারীকে দুধ খাওয়াবার জন্যে এক জোড়া ছাগল পুর্বেছিলেন তিনি) নামে এদের অভিহিত করে।

মুরগীর খাঁচা বহু দিন শূন্য হয়ে গেছে, ছাগল নিয়ে গেছে হাস্যনাভে, শূয়ারের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল, তবু ওদের এই বিকৃত নামগুলো থেকেই গেছে।

পথে কোনো দেহাতীকে শূন্যলো কারো পুরো নাম বললে তার বাড়ি কেউ খুঁজে পাবেন না। যে নামে ওরা এদের প্রত্যেককে ডাকে সেই নামে না বললে ওরা বুঝতেই পারবে না কাকে আপনি খুঁজছেন।

জানি না, বেশী দিন থাকলে আমাকে ওরা কি করবে।

এখানের লোকজন, অমৃত প্রাগৈতি-হাসিক সব প্রথা, মধ্যযুগীয় আবহাওয়া এবং নীরব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সব মিলিয়ে বড় ভালোবেসে ফেলেছি এ ঝগগাটা। এখানের সব কিছু আমার মনোমত। এই শান্ত ঢিলে-ঢালা জীবন, যেখানে একশ টাকা মাইনে-পাওয়া লোককে সবাই মিলিয়নায়র ভাবে, যেখানে জীবন ধারণের জন্যে প্রতি মূহূর্তে দৌঁড়াপৌঁড়ি নেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, কনফারেন্স নেই, যেখানে পথ চলতে ভিজেলের ধোঁয়া বুকক মতো অবধি নিষ্পাপ শিশুদের বিষাক্ত করে না, সেখানে চাওয়া অল্প, প্রাপ্তির আনন্দ অনেক এমনি জায়গায় কার না ভালো লাগে?

দুঃখের বিষয় এই যে এখানে চিরদিন থাকা যায় না। যে পরিবেশে, যেভাবে আমরা মানব, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, প্রতিপত্তির মায়াক্ষর দৌড়ে বাদে ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাদের উচ্চগ্রামে কাঁধ মন ও শরীর সব তার এখানে একে ঢিলে হ্রাস পড়। ভয় হয়, মরত ধরে যাবে।

কোলকাতার ফিরে প্রাতিশ্রুতীদের আর জয় করতে পারব না। তাঁরা শিরশাণ ছাড়াই তাদের ভরোয়ালের এক এক কোপে আমাকে কত-বিকৃত করে শেষ করে দেবে। তাই সুপ্রাচীন সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত আমি আবার এক সময় ফিরে যাব সেই ধূলিমলিন নোংরা আবহাওয়ায়, চোগা-চাপকান পরে কোঁটে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সওয়াল করব, মোটা অঙ্কের চেক পুরবো পকেটে এবং সিনিসটার এবং মক্কেলদের সঙ্গে কাধ বেড়ালেন মত হেসে হেসে কথা বলব।

ইচ্ছে করুক কি না করুক।

আমার বাড়ির গেট ছাড়িয়ে পান্নী মথার্জির বাড়ি ছাড়িয়ে হল্যান্ড সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে এসে নালা পেরোলাম—তারপর মিস্টার রোজারিওর বাড়ি। সে বাড়ি পেরুতেই চামার দিকের লাল মাটির অসমান, পাথর-ছড়ানো ধূলি-ধূসরিত রাস্তা।

একটু এগিয়ে যেতেই বাড়ি-ঘর সব পেছনে পড়ে রইল। বদিকে শেষ বাড়ি মিঃ এ্যালেনের। ডানদিকে শেষ বাড়ি মিস্টার কিং-এর। তারপর কোনো বাড়ি-ঘর নেই। সোজা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঁচু-নীচু পথটা চলে গেছে ডুলির দিকে। সেখানে একটি ফরেস্ট বাংলো আছে। ডুলির পরে আরো সাইল দু'খণ্ড গিয়ে রামদাগা গ্রাম। এই কাঁচা রাস্তাটা চামা অবধি প্রায় আট মাইল মত—রাস্তা খুবই খারাপ—পায়ে হেঁটে যেতেও কষ্ট—এত পাথর ছড়ানো ও অসমান।

দু'দিক থেকে ভিত্তির ডাকছিলো রমাগত চি'হা চি'হা চি'হা করে। নাকটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। লাল বিধুর আভা ছাড়িয়ে ছিল আকাশময়, একটা শূন্যলো ঠান্ডা ভাব উঠছিল চারু-দিক থেকে। পিটিস কোপ থেকে ভেজা উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মাঝে মাঝে চমক জমি। কিতারি লাগিয়েছে, মকাই লাগিয়েছে, কোথাও বা মিচিট আলু। ঢালে ঢালে শর্বে লেগেছে। হলুদ আঁচলে শেষ বেলার লাল লেগেছে।

তিত্বিরের চিংকার ও দূরের কনচিং ঘবে-ফেরা পাখির ক্ষীণ স্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। প্যাটের জ্বাচেব শব্দ হচ্ছে শূন্য পাথরের পাটিতে। দূরের কোপে একদল ছাত্তরে ভীষণ চেঁচামেচি শুরুর করেছে। একটু এগিয়ে যেতেই সে আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে ঘাড়ের কাছে কার দুখানি ঠান্ডা হাত এসে চেপে বসেছে। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাটা বদল করে নেমে আসে, যেন মল্লকলে। একটা প'হাড়ি রাজ উঁচু শিশুগাছের মগডলে বসে ডান্না ঝাপটুরে

উনি কথ্য না বলে আর ঢুক হ'ল  
বিলম্বের নিষ গস আমায়ের দেখিলেন।  
একদিন জামস মডি একর কথা বলত  
জামস মডি কখনো এমন বাক্য কথা বল,  
যেমন "এই হল সাংগীট মেহাজকে থেকে  
হবে। এই বলে সাংগীট মেহাজকে থেকে

বললেন আমার ত্রিষ্টক করোঁছ কিনা পরীক্ষা করে দেখতে।

মেজর সাহেব হাঁটুই বললেন, আমরা সমস্ত ড্রাইভার ও গুডার্স মিলে সৈনিক এক ঘরে শুলাম।

তারপর তিন-চার দিন কোনো ঘটনা ঘটল না।

একদিন রাত্রে সার্জেন্ট মেজর এক বিশিষ্ট থেকে অন্য বিশিষ্ট-এ যাচ্ছেন, উনি হঠাৎ সেই সাদা পোশাকেই নানকে দেখতে পেলেন। বাকী পথটা দৌড়ে এসে উনি আমার ঘরে ঢুকতে পারেন না নানকে দেখতে, কি পোশাকে আমি দেখে-ছিলাম জিজ্ঞাসে করলেন। জিজ্ঞাসে করলেন আমি স্নান দেখেছি সে লম্বা না ছোট। আমি বললাম খুব লম্বা, আমি তাকে খুব কাঁচ থেকে দেখেছি, তার মুখ চোখ সব স্পষ্ট দেখেছি—চমৎকার চোখ মূখ।

সার্জেন্ট মেজর অনেকক্ষণ আমা- বিজ্ঞানায় সঙ্গে বইলেন। তার পর বললেন, তোমার বর্ণনা সব সঙ্গ হ'ব, মিলে যাচ্ছে।

এ ঘটনার কিছু দিন পর, এক শনিবার সিংগাপুরের কয়েকজন চাইনীজ মেয়েকে অফিসারবা নাচে লম্বা করলেন। অনেক রাত অর্থাৎ নাচ, গান, টুইস্টিক খাওয়া হল। তারপর মেয়েরা ঠিক কয়েক ডান্ডা ডান্ডাভাগি করে অফিসারদের সঙ্গে রাত কাটাতে। অর্থাৎ রাতে আন যাঁবে না।

আমার মেজর সাহেবের ভাগে দুজন মেয়ে পড়লো।

থেকে-দেখে আমরা সবাই সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার উপর তার পড়লো শেষ রাত্রে ঐ দুজন মেয়েকে নিয়ে জীপ কলে সিংগাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

চারটের সময় উঠে আমি মেজর সাহেবের ঘরে গিয়ে দিলাম। ঐ ঘরে যারা ছিল তারা এবং অন্যান্য সকলে বেরিয়ে এল। আমি সকলকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে সিংগাপুরের দিকে গেলো হঠাৎ গেলো। তৎক্ষণাৎ প্রায় এক ঘণ্টা রাত ছিল।

আমি যাওয়ার পর মেজর সাহেব আমার লম্বা হ'ব এমন সময় তলি হ'ব হল। তলি হ'ব খেলে কে খেতে লাগল। তলি ঘর ঘর যাব। খেলে সব জা ব'ল দিল। উনি মড়-মড়িয়ে উঠে দেখেন ত'ব বিজ্ঞানার পাশে একজন নান দাঁড়িয়ে।

মেজর সাহেব তাড়াতাড়ি তা'ব বিজ্ঞান-ভবন এবং টেক্সন দিকে হাত বাড়ালেন। নিউজপারের টিগারে হাত দেখে উনি শূন্যলেন, তুমি কে, তুমি কি চাও?

নান কোনো কথা না বলে সব জা দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

মেজর সাহেব সব জা দিটকিন

ঘরের বাইরে এসে নান ইস্তারা মেজর সাহেবকে তার পেছনে আসতে বললেন। মেজর সাহেব টা জুলাইয়ে তার পেছনে শেখন বারান্দা পেরিয়ে দাঁড়িয়ে বারান্দা নামলেন। বারান্দার এক কোণায় এসে নান দাঁড়িয়ে পড়লেন, পড়ে একটা কাঁচা কোপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

মেজর সাহেব শূন্যলেন কি আছে? ওখানে কি আছে?

নান উত্তর না দিয়ে আবার ঐ দিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হঠাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আমি সিংগাপুর থেকে ফিরে এসে দেখি ক্যাম্পে হ'লম্বা বাপার। চার টাক ক'বই ক'বে সোলজার নিসে মেজর সাহেব সিংগাপুর শহরের অন্য সামান্য চলেছেন মিশনের মতন বাড়িতে, সেখানে এই বিকুইজশান করা বাড়ির সব নানরা এখন থাকেন।

মেজর সাহেবের গার্ড চালাই মাজিলাম আমি। নানের চেহারা বর্ণনা আমায় ওং মেজর সাহেবের দেখা নানের সঙ্গে হ'ব মিলে গেল। সেই নানের সী গালে একটা বড় নিউট স্পট ছিল।

ঐ বাড়িতে পেপেছে সমস্ত বাড়ি সোলজারবা ঘিরে চলেল।

মেজর সাহেব মাদার সুপারিশের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসে করলেন ঐ মিশনের কোনো নান কাল রাতে বাইরে গেছিলেন কিনা?

মাদার সুপারিশের ভুবু বুটকে বললেন, হাউ ডু উ নান?

তারপর মেজর সাহেব বললেন, এখানে সমস্ত নানকে ডেকে লাইন করে দাঁড় করান, আমরা সকলকে দেখতে চাই, কেউ সেন বাকী না থাকে।

সমস্ত নান জড়ো হ'তে প্রায় আশ ঘণ্টা লাগল, কেউ বাথরুমে ছিলেন, কেউ অন্য কাজ করছিলেন।

সকলে জড়ো হ'লে মেজর সাহেব, সার্জেন্ট মেজর, ক'ল সাহেবের গুডার্স এবং আমি প্রত্যেককে কাছ থেকে ভাল করে দেখলাম। ক'ল সাহেবের সঙ্গেই আমায় স্নান দেখেছি, তার চেহারা মিলে যা না।

তারপর মেজর সাহেব বললেন, আমরা বড়ি সার্চ করব।

মাদার বিবক হ'ব সার্চ করলেন।

সাবান্দা পেরিয়ে আমরা যেই বড় হলঘরে ঢুকছি অর্থাৎ আমরা সকলে একসঙ্গে খম্বক দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেওয়ালের মাথায়ান টাওয়ানো ছিল একজন নানের বড় কোটা—একটি আমায় সকলে

মেজর সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে মাদার সুপারিশের কাছে গিয়ে, ইনি কোথায় একেত দেখলাম না।

মাদার সুপারিশের ক'ল সাহেব, সে মিলনের বাড়িতে, আমরা এক আঁচি সেই বাড়ির মাদার সুপারিশের বাড়িতে উঠি। অর্থাৎ উনি বড় বড় মাদার সাহেব।

আমরা সকলে মুখ চাওয়া চায়া করবার পর মেজর সাহেব মাদার সুপারিশেরকে সব কথা খুশে বললেন। সব শুনে উনি বললেন, যে-কাঁচা কোপের দিকে উনি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন সেখানে আমাকে আপনার সঙ্গে মিলে চলুন। ওখানে মাটি খুঁড়লে মিশ্রই কিছু পাওয়া যাবে।

ওংক নিয়ে মেজর সাহেব এবং অন্যান্য সকলে তখনই ফিরে গেলো আমাদের ক্যাম্প। পৌঁছন মাত্রই জায়গাটা সাবধানে খোঁড়া আরম্ভ হল। অনেকখানি খোঁড়ার পর দেখা গেল মাদার মেরীষ একটি পাথরের মূর্তি উল্টো করে মাটিতে পোতা আছে। মূর্তি নীচের দিকে, পা উপরে।

মেজর সাহেব তখনই সেই মূর্তিটি মাদারের হাত দিয়ে দিলেন।

সৈনিক থেকে আমাদের ঐ বাড়িতে আর কখনো সেই নানকে দেখা যায়নি যতদিন আমরা সিংগাপুরে ছিলাম।

এই অর্থাৎ বলে, একটি সিংগারেট ধিয়ে পাট বলল, আপনি কি এর পরেও বসবন যে আমি ডে দেখিনি।

আমি কিছু বললাম না।

প্যাটকে অধিবাস করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

একদিন পরে উনি বললাম, চাঁল প্যাট, আমরা অনেক ওয়ামপুথ থেকে হবে।

প্যাটের বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাইরে কতখানি অন্ধকার তা ঠাঙ্ক হল।

পঞ্চমীর বেঁকা চাঁদ উঠেছে। চাঁদটির অন্ধকার বন-পালাতে ঝাঁঝী বাতাস ক'বে বাজছে।

প্যাট বলল, তোমাকে কি টা দিলে এগিয়ে দেব মিস্টার বোস?

আমি বললাম, না। ঠিক আছে। তোমাকে আবার একা ফিরে আসতে হবে। প্যাটের বাড়ি থেকে রাস্তার নামলাম। অন্ধকার হলেও কাঁচা মাটির পথটা দেখা যায়।

ঠাঙ্ক হ'ব হাত দেখিয়ে বাজছে। প্যাটের দ'ব পকেটে দ'ব হাত ঢুকিয়ে আসতে আসতে আমরা বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম অন্ধকারে। কাছেই কোনো-পিপুজ গাছের মগডাল থেকে এমটা হুতুম শোঁতা ডেকে উঠল দ'বগুম, দ'বগুম, দ'বগুম—।

বুকের মাথটা কেমন কিংবা কান্ডে হুতুম করে উঠল।



[illegible]

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে ৭০০ থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের জার্মান সাহিত্যের বিবরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সংস্কৃতভাষী বিবরণ সাহিত্যের আলোচনা আছে। এই জাতীয় সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তৃতীয় অংশ গার্টের বঙ্গ, এইভাবে ক্যান্টনিসিসের ও স্যেমার্টনিসের প্রভৃতি বিবরণে আলোচনা আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে আছে উনিশ ও বিংশ শতকের সাহিত্যআলোচনা। এই উদ্দেশ্যে কালের গতিপ্রকৃতির পার্থক্য ও ক্রমানুসার পরিবর্তন বিবরণে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক বঙ্গের কবি পদ্য করার পূর্বে সেই বিশেষ বঙ্গটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। সেইজন্যে অনেক উপস্থাপিকা সমগ্র কবিতাটি ক্রমবর্তিত করে ধরা হয়েছে। লেখক এবং তাঁদের রচনা বিবরণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটিতে ক্যান্টন সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায়।

৭০০—১৭০০ খৃষ্টাব্দের অধ্যায়টিতে মার্কিন প্রচার হানস বেক্স ক্রিষ্টোফেল ফন প্রজেন্সটসেন বিবরণে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ১৭০০—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গটফ্রাড ইজাইর সেলিং, জর্জ ট্রিসটফ লিসটেনবেগ, দ্বিতীয় ক্রিষ্টোফ, এ্যাডলফ স্ট্রাইসের হন ক্রিগ, জোহান গটফ্রাড হার্ডার ও ইমা-নুয়েল কাণ্ট বিবরণে আলোচনা আছে। ১৭৭০—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টোফ ম্যাক-হিমিলিয়ার ক্রিগার, হাইনরিখ লিওপোল্ড ডালমার, জোহান ভলফগ্যাং ফন গার্টে, শীলার, জর্জ করস্টাব, জোহান পাউল, মোটালিগ, হাইনরিখ ফল ক্লাইস্ট, মার্টিন লোৎসে, ফন আইকেন ওয়ফ ও লুডভিগ উল্ফহাইট বিবরণে আলোচনা আছে। উনিবিংশ শতক ও বিংশ শতক দুটি জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি গৌরবময় অধ্যায়। এই কালে জার্মান সাহিত্যের বহু মনোবী লেখকের উদ্ভব হয়েছে এবং জার্মান সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেই পর্বের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনার নমুনা দেওয়া হয়েছে। এই নমুনা অংশ বাংলায় অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়, মূল্যের ভাব অক্ষম রচনা অনুবাদক ভাষা সূচীল রাখ সে দায়িত্ব ক্রিষ্টোফের সঙ্গে পালন করেছেন। কবিতাংশ গদ্যে বর্ণনামূলক রসোত্তীর্ণ। পাঠ্যতাত্ত্বিক পর্বের এই সূচ্যেই গ্রন্থটি সমৃদ্ধিত এবং চিত্রশোভিত।

—অনুদ

(১) জার্মান জার্মান (জীবনী) রচনা : হাইন-রিখ সেলকোভ। অনুবাদ : অমল দাসগুপ্ত। প্রকাশক : লেখাপড়া। কল-কাতা-১২। দাম : বারো টাকা মাত্র।

(২) জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পঠ—রচনা : ভলফগ্যাং ফন প্রজেন্সটসেন। অনুবাদ : অমল দাসগুপ্ত। প্রকাশক : এম লি সন্থার অ্যান্ড সন্স প্রাই লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম : বারো টাকা মাত্র।

## সাহিত্যের

### এবার সাংবাদিকের ভূমিকা

মাত্র একটি নাম। আর তা উদারপন্থে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে প্রচার আকাশ ভাবের গভীরতা। নামা চিন্তাভাবনার সোনালি ফসল। হ্যাঁ, মাত্র একটি নাম। বিতর্কিত, অশুচি এড়িয়ে যাবার নয়। এ নাম এক দার্শনিকের, সাহিত্যিকের। এক নিঃসঙ্গ বিবেকের, রাজনীতিকের। আর সে নাম হল জাঁ পল সার্ত্রে।

এবার তাঁকে দেখা যাবে এক নতুন ভূমিকার। পাদপ্রদীপের আলোয় আসছেন এবার সাংবাদিক হিসেবে। বেশ করছেন একটি দৈনিক পত্রিকা। বাংলার ভাষায় করলে নাম দাঁড়াবে 'স্বাধীনতা'। প্রথম সংখ্যাটি বেরুচ্ছে ৫ ফেব্রুয়ারি।

এবার এ উপলক্ষ প্যানিসে বসেছিল সাংবাদিক সম্মেলন। সেখানে-ই জানালেন কেমন হবে তাঁর পত্রিকার চরিত্র। বসলেন, পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকছেন শব্দ, বাস্তববাদীরাই। তবে সামগ্রিক কোন গোষ্ঠী-চক্রের মনোপত্র হচ্ছে না 'স্বাধীনতা'। বললেন তিনি 'আমি থাকবো একজন সাধারণ কর্মী' হিসেবেই। 'সং' সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুনভাবে কিছু দেওয়া জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা। তাঁর মতে সাংবাদিকতা ও প্রকাশনীকে ক্ষেত্রে চলছে এখন দ্রোণ সংকট। নিঃসন্দেহেই দুর্দিন।

এক প্রশ্নের উত্তরে এই বিতর্কিত সাহিত্যিক - দার্শনিক জানান, স্বাধীনতা? হ্যাঁ এ শব্দটির মানে বলতে শব্দ সাংবাদিক-দের অধিকারই বোঝায় না, পাঠকদের স্বাধীনতাই হলো প্রচাব-মাধ্যমে আসল স্বাধীনতা। জনগণের সাহায্যেই সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। অন্য এক জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন সে জনগণের সাহায্যেই পরিচালিত হবে তাঁর পত্রিকা। তাঁর মতে জনগণ তাদের টাকা-পয়সা দেখেন, খবর সরবরাহ করবেন, এবং তদারক করবেন তাঁদের কাজকর্মও।

### নিঃসঙ্গ বিদায়

মানুষটি মারা গেলেন। ভোরবেলার নিঃসঙ্গ শিশুর করার মতোই চলে গেলেন তিনি। নব্যই বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক এক মাস আগেই নিলেন বিদায়। পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানালেন সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের এক স্মরণীয় কণ্ঠস্বর। সার্ত্রে কম্পটন ম্যাককিজের মৃত্যু ঘটেছে সম্প্রতি।

না, শব্দও উপস্থাপিকা যেনোই তাঁর খ্যাতি বিশ্বকোষ ছিল না। এবার প্রকাশিত যার প্রার একশো বছরের মধ্যে বরেন্দ্রে উপন্যাস ছাড়াও কবিতা নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, প্রবন্ধকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, ইতিহাসবিবরণক আলোচনা, ক্রোড় ও টোল-ভিশন থেকে প্রচারিত কবিতা। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের একজন দক্ষ সমালোচক।

সাহিত্যেই কেনে ম্যাককিজের আবির্ভাব প্রথম নাট্যকবিতা হিসাবে। সেটা ১৯০৬ সাল। বেরুলো 'দ্য জেন্টলম্যান ইন স্ট্রো'। এর ঠিক এক বছরের মাথার বেরুলো একটি কাব্য-গ্রন্থ। কিন্তু কারো নজরে পড়লেন না তিনি। কোন সমালোচকই তাঁকে তেমনভাবে ছলে ধরলেন না লোকচক্ষুর সামনে। শেষপর্যন্ত কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা বেগনার ভাবলেন তিনি পথ বদলাবেন। পরিবর্তনও করলেন। করল বছরের মধ্যেই বেরুলো 'দ্য প্যাশোনেট ইলোপমেন্ট'। এবার নজর কড়লেন বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্য-সমালোচকদের। কিন্তু এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটিও চোখটি প্রকাশকের টেবিল থেকে এসেছিল খুঁজে। তবে ব্রিটেনের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি পান দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। বেরুলো 'ক্যানিভ্যাল'। সাধ, সাধ রব পড়ে গেল। বিক্রি হল লক্ষ লক্ষ কপি। এরপরই বেরুলো 'সিনিস্টার স্ট্রিট'। অনেকটা আশ্চর্যজনক উপন্যাস। চেনবী জেমস ই হলেন সেই খ্যাতিমান পুরুষ যার সাহায্যে এই উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরের মধ্যে দেখে। বলাই বাহুল্য, এই রচনাটি সেকালে পাঠকমহলে তোলে দারুণ কড়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই যুদ্ধের হাওয়া লাগল ইউরোপে। সার্ত্রে কম্পটন ম্যাককিজ রাজকীয় নোবিলজনে ভোগ দিলেন। ১৯১৫-তে পেলেন কমিশন। এই সমবকার অভিজ্ঞতার ফসল 'গ্যালি পোলি মেমোরিয়'। তাঁর 'দ্য ফোর উইন্ডস অব লাভ' হলো উদ্ভবের আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যসৃষ্টি। অবশ্য সার্ত্রে কম্পটন ম্যাককিজ সত্যিকারের আশ্চর্যজনক 'মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস'-এর প্রথম খণ্ড যেরোব এই তো সেদিন, ১৯৬০-তে। আর সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এ। ম্যাককিজের অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে 'রকেটস গ্যালোর', 'অন মর্যাল কারেক', 'হুইস্কি গ্যালোর' উল্লেখযোগ্য। শেষ রচনাটি বঙ্গালি পদ্যের একসময় চিরায়ত হয়। খ্যাতিসম্পন্ন এই মানবদেহের মৃত্যুসংবাদ ছাপতে গিয়ে শ্যেইলি টোলগাক লেখেন, আমাদের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল, বহুমানবী ও স্মরণীয় চিত্রসম্পন্ন লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

# নতুনবই

দিনেশ দাসের প্রেষ্ঠ কবিতা। ভারি।  
হটকা।

১৯৬৭-৬৮ সালে প্রীকৃত দিনেশ দাস বাংলা কবিতার আসরে কখনো প্রকৃতির সৌন্দর্যভেদনা, কখনো বা নিগীড়িত মানুষের স্বভাববোধ পরিবেশন শুরুর করেন। 'সবুজ স্বপ্ন', 'প্রথম চুম্বন', 'মৌমাছি', 'কপোতাক' প্রভৃতি সেই পর্বের রচনা। বিভিন্ন ইন্ডিয়ান-সংকলনের ভাবারূপ সৃষ্টিতে তাঁর কবিত্বের উৎসাহ ছিল সেই সূচনাগবেই—সে উৎসাহ তাঁর কবি-জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে আরো বিচিত্র বিষয়কভূতে স্পন্দিত হয়েছে। পরিণত জীবনের আভ্যন্তরীণে তিনি কবিমনের অন্তর্দৃষ্টির প্রসঙ্গ তাঁর 'কবি-মনীষী', 'অদৃশ্য কবিতার পাখি' ইত্যাদি কবিতায় ভেদাবে দেখাতে চেয়েছেন তাতে প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা এবং জীবনের অমের যন্ত্রণা সম্বন্ধে বিষয়তা দুইই বিদ্যমান। একটি 'ভূমিকার' তিনি এই সংকলনে তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী দিয়েছেন এবং তারই মধ্যে তাঁর উপলব্ধির একটি সূত্র স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে—'পৃথিবীর অর্থ নেই, মূল্য নেই, আশা নেই। সমাজের শরীর অভ্যন্তর, হৃদয় অশান্ত, বিবেক সিসিম্ব মনে হয় এই বেদনা ও ক্লান্ত আকাশে-কাতাসে সর্বত্র ছড়ানো।'

এই অশান্তি সত্ত্বেও—জীবনের বহু-বিচিত্র-অসুখের ভুগতে-ভুগতেও, তাঁর কবি-মন জীবনানন্দের মতন ভাষার এক জায়গায় ('অসুখে') বসেছে—

তবু একদিন শুনি ডোরের পাখির ডাক :  
সবুজ তারার গুঁড়ো ঝুরঝুর করে পড়ে  
বিস্ময়ে অবাক,  
দেখি দূরে, উষার পারের গোছ টকটকে  
লাল—  
জীবন্ত হৃদের মত টলটলে আশ্চর্য  
সকল।

অদৃশ্য জলের পাখা হতে জল করে  
জীবনের সোনার নিখরুে,  
মানুষ জীকর্মত বিবর্ণ ময়ূর :  
আকাশের উপরে আকাশ, সময়ের উপরে  
সময়।

'কাস্টে' কবিতাটি যখন প্রথম বেরিয়ে, তিনিদের লক্ষ্যের সেই শেষ প্রহর থেকেই দিনেশ দাসের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব বোধ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা আলোচনার উত্তরনার সঙ্গে আবদ্ধভাবে জড়িত নয়। তিনি জীবন-

বুদ্ধিহীন—না হৃদয়ে আছে স্নান শব্দ, স্নান ঘটনার, জীবনব্যাপী অনুভূতির স্তরে স্তরে। 'কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত জীবনের মানে নাহে চার হ্রদের একটি উজ্জ্বলতাই তিনি জানিয়েছেন—

জীবনের নীতি খোঁজে শিল্পকেরা ঠিক,  
তবু খুঁজে বের করে প্রোট দার্শনিক।  
জীবনের মানে কিছ আছে কি না আছে  
কবি, শিল্পী খোঁজ করে দিশা  
পায় না বে।

তিনি মূলতঃ বিবাদের পথিক, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং মাঝে মাঝে কবি দিনেশ দাসের এই আত্মকথা বেশ আবেগনময় হয়ে ওঠে, যেমন 'কাঁচের মানুষ', 'মেরুটি' ইত্যাদিতে, আরো নিঃসন্দেহ আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় কোথাও কোথাও যেমন 'স্বপ্ন ডাকে' কবিতায়,—আবার উপমা রূপক ইত্যাদি অলঙ্কারের অভিনব বহুভাষ্য সম্প্রদায় দৃষ্টান্তও তিনি দেখিয়েছেন যেমন 'নব-বর্ষ' কবিতায়—ঐশ্বর্য চিনি-বৃষ্টিতে বাতাস মধুর—'চিনিবৃষ্টি কথটা তাঁর নিজের ভাল লেগেছে ভাবতে অবাক লাগে 'তবু' কবিতায় মিলের বোঁক কেমন যেন তরল মনে হয়, বিশেষতঃ এইসব ছন্দ—

শেষ করে মিছে ছন্দমিলের গরমিল  
চলো হাই চলো সাগর বেখানে উর্মিল,  
গুঁড়োনে গিনির মতই বেখানে গুঁড়ো  
গুঁড়ো কালি উড়ছে  
সোনা বালুচর পড়ে আছে কাঁচা রোদের  
হলধে মছে'..

'মছে' কথটা দুর্বল নয় কি?—  
নিতান্তই মিলের খাতিরে এটিকে আনতে  
হয়েছে বলে মনে হয় না কি? অর্থাৎ এই  
প্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে এমন অনেক লক্ষণ  
থেকে গেছে যেগুলিতে তাঁর কবিতার  
প্রেষ্ঠ অংশের মধ্যে গোণ অংশের অনু-  
প্রবেশ ঘটেছে—এবং বোধহয় বাংলা কবিতার  
বিভিন্ন প্রেষ্ঠ সংগ্রহেরই এ এক সাধারণ  
অপ্রতিরোধ্য নিয়তি। তবে তিনি কবি  
হিসেবে স্বতন্ত্রকর্ম মানসিকতার মানুষ,  
এ-সংগ্রহে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ই স্বীকৃত।  
'বোম্বাই', 'কলকাতা', 'পনেরই আগস্ট ১৯৪৭

ফোরি ১৯৫০', 'পরেরই আগস্ট ১৯৫০', 'নদী', 'শিল্পক আন্দোলন ১৯৫০', 'স্বপ্ন', 'রক্ত আগুন (১৯৬৪)' ইত্যাদিও তাঁর সেই সামগ্রিক মনোভূমির অন্তর্ভুক্ত। আরো নিগূঢ় ব্যক্তি অনুভূতির ইশারা ধর্মিত হয় 'সেই ছায়াটা', 'চোর কাটা' প্রভৃতি প্রেষ্ঠক কবিতায়। প্রেষ্ঠতারও 'তর-তর' আছে—এই তারতম্যবোধ অনুপনন্দ। এই বিজ্ঞানবাহী কবিমন—দিনেশ দাস আশ্বাসের প্রতিমত প্রিয় কবিতার অন্যতম।

হরপ্রসাদ দত্ত

কবিতা কল্পনাজাত (প্রবন্ধ) : সরোজ বসাকের-  
পাঠ্য। এসেম পাবলিকেশন্স, ৬৬ ১২,  
মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-১। পৃ.  
৮০।

শ্রীসরোজ বসাকের পাঠ্য বাংলা উপন্যাসে কালাস্তর-এর মত একটি স্বাভাবিক-  
চিহ্নিত গ্রন্থ রচনা করে সত্যের  
বিশ্বজনীন পাঠকমহলে নিজস্ব স্থান করে  
নিরেছেন। বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব  
ও নিরপেক্ষ মৌলিক দর্শনভঙ্গির আকর্ষণ  
সরোজবাসুর সদ্য প্রকাশিত 'কবিতা কল্পনা-  
লতা' হাতে পেয়ে আমরা স্বাধাৎ অর্ধে  
উপকৃত বোধ করছি, 'উপকৃত' কারণ, বাংলা  
কবিতার 'আভিগকেয় ওপর স্বাভাবিক, বিস্মৃত  
বাংলা আলোচনা-গ্রন্থ খুবই কম। সরোজ-  
বাসুর গ্রন্থ সেই অভাব পূরণের পথে অন্যতম  
এক সংযোজন।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট বারোটি ছোট-বড়  
প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সরোজবাসুর বিগত  
বারো বছর ধরে বাংলা কবিতা বিষয়ে যে  
সম্পদ ভাবনার দীপ্তি হয়ে নিজস্ব  
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বর্তমান প্রবন্ধ-  
গুলি তারই লেখ্যরূপ। প্রবন্ধগুলি আমরা  
কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার পত্র হতে দেখেছি  
ইতিপূর্বে এবং তখনই এগুলি স্বর্ধেই  
নিঃশেষে আলোড়ন তুলেছিল পাঠকমহলে।  
গ্রন্থভূত হওয়ার কবিতার পাঠক ও সমা-  
লোচক সরোজবাসুরক সামগ্রিকভাবে দেখার  
সুযোগ পাওয়া গেল।

প্রবন্ধগুলির বর্ণিত ভাগ আলোচনা  
আধুনিক কবিতার চিত্রকল্প বিষয়ক। স্বাভাবিক-  
কবিতার 'ফর্ম' ও বিষয় নিয়ে দৃষ্টি দীর্ঘ

সরোজ বসাকের — সদ্য প্রকাশিত অভিনব উপন্যাস

## কি ফল লাভিন্দু! ৭-০০

দামায় দ্রাক, ১-১এ, কলেজ স্টোর, কলি-১২

সরোজ বসাকের — সদ্য প্রকাশিত সত্য জীবনো উপন্যাস

## বীতংস ৭-০০

অগ্রান্ত প্রকাশন ২এ, নবীন কল্ল লেন, কলি-১

II, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পটিল কবিতাবাদ, কীবানন্দ, অমির  
I, বিক, সে এবং সম্প্রতি গঠিত  
কবিতাবাদ কবি আল মাহমুদ ও শামসের  
কবিতাবাদ—এদের সম্পর্ক সরোজবাবুর  
গ্রন্থ-ভাষ্য প্রকাশনালিকে উজ্জ্বল করেছে।

পটিল ভে লাই ওমেদের কবিতার চিত্র  
ও চিত্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা  
করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন একাধারে কবি  
অন্যদিকে সমালোচক। মার্জারি বলাইন  
জন্মেছেন, কবির হাতে একটি 'ইমেজ' জন্মায়ে  
হলেও কবির একান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনার  
অঙ্গুরন ছিলেই। এই ইমেজ-এর সংগে  
কবির যোগ, পাঠকের সম্পর্ক, কাব্যের  
পরিণামী লক্ষ্য কি—এসব বিষয় নিয়ে  
বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, সরোজবাবুর  
গ্রন্থে সাহিত্যে সে সবার বিস্তৃত আলোচনা  
করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের কর্মসূচি প্রবণে।

কিন্তু আলোচনাগুলি একান্তভাবে  
সম্পন্ন। কবিতার বিষয় আর বিষয়ী—এই  
দুইয়ের খুব ঘনিষ্ঠ না হতে পারলে, আমরা  
মনে হয়, কাব্যসমালোচকের সার্বজনিকটিভিটি  
পরিপূর্ণ সত্যের ভিত্তি পায় না, আর সেটি  
সঙ্গে কবিতার ডিকশন, চিত্রকল্পের সূক্ষ্মা,  
হস্তমত মনোরম হৃদয়ানন্দ প্রবাহ প্রভৃতি দিক  
কবিরসিপাসদের বোঝানো সহজসাধ্য হয়  
না। সরোজবাবুর আলোচনা নিশ্চয়ই  
আন্তরিক এবং মনোরম হলেও পাঠকের সংগে  
কবিতার, তাঁর আলোচনার রক্তসংস্পর্শ নির্ণয়ে  
অসমর্থ।

এক কথায়, সরোজবাবু সঙ্গ্রহ গ্রন্থে তাঁর  
কাব্য-ভাষ্যের মৌলিকতার আশ্রয় দিকগুণ  
সম্পূর্ণ করেছে। 'কবিতার ভাষা', 'কবিতার  
প্রাথমিক ও তার অনুবর্তন', 'দীর্ঘ কবিতা'  
'চিত্রকল্পের সংলগ্নতা' ইত্যাদি আলোচিত  
অংশগুলি কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা বা  
সমালোচনা নয়, এক ধরনের সৃষ্টি হয়ে  
উঠেছে। কবিতার শব্দ, ভাষা, প্রতীক, চিত্র-  
কল্প ইত্যাদির আলোচনা এমন উপলব্ধি ও  
নিষ্ঠার সঙ্গে ও মৌলিক সিদ্ধান্ত যোগ্য  
ইতিহাসকে কেউ করেছেন বলে মনে পড়ে  
না।

যদ্যপি বঙ্গ একবার কোথায় যেন  
কলেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন কবিতার  
চিত্রকল্প সম্প্রতি দিয়ে তাঁর সেই বিশেষ  
কবিতার বিচার বা আলোচনার স্থির  
সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অর্থাৎ কথাটা হল  
এই—কবিতা ও সব সময়ে তাঁদের কবিতার  
বর্ণনা সমালোচক হতে পারেন না। অন্যদিকে  
বিশেষী একটা প্যাটার্নের কথা মনে পড়ে,  
কেন পড়ে আমাদের দেশের কবি জীবনানন্দ  
দাসের কথা—যিনি প্রকাশ্যেই অভিমত  
দিয়েছেন—কবিই কবিতার যোগ্য সমালোচক।  
কিন্তু কবি বা অ-কবি, সহস্র পাঠক খেঁচ  
হোক না কেন, যদি তিনি কবিতার আলো-  
চনা বা সমালোচনার সূক্ষ্ম হৃদয়ের স্পর্শ

সমালোচকের কাজে পারদর্শী। আলোচ্য  
গ্রন্থের সমালোচক নিজেকে একই সঙ্গে কবি  
ও কবিতা-সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে  
পেরেছেন, কারণ তাঁর সমালোচনার দৃষ্টি  
সমালোচনার শাসনদণ্ডে শানিত নয়, রসগ্রাহী  
ও বোম্বা অনুভূতিপ্রবণ পাঠক-হৃদয়  
সংবাদে প্রাণিত।

এই সব কারণেই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র-  
নাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক এবং প্রেমভাবনা  
নিয়ে বড় আলোচনা হয়েছে, সরোজবাবুর  
আলোচনা নিশ্চয়ই নতুন যে ও নিষ্ঠার আন্ত-  
রিকতার বিশিষ্টতা দাবী রাখে।  
জীবনানন্দ, অমির চরিত্র ও বিক, সে  
সম্পর্কিত আলোচনাগুলি সমালোচকের  
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আল  
মাহমুদ ও শামসের আনন্দের সংক্রান্ত  
আলোচনা সমর্থনযোগ্য।

সরোজবাবু নিজস্ব যুক্তি থেকে কখনো  
সরে যাননি, বা উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও তথ্য  
দিয়ে বিশ্লেষণ করার কথাও বিস্মৃত হননি।  
তবে যেহেতু প্রবন্ধকাব্যের ভাষায় 'গবেষণা-  
গ্রন্থ' নয়, বসন্তোত্তরাই আমার লক্ষ্য' তাই  
গভীরতম উপলব্ধির কথা প্রবন্ধগুলি  
অন্ততঃ ভাল থাকায় এ গ্রন্থের পাঠকল সম-  
কালের সহৃদয়।

কি ফল লিভন (উপন্যাস)। সর্বোচ্চ বসাক।  
সামান্য এন্ড কোং, ১-১এ, কলেজ  
স্কোয়ার, কলকাতা-১২, সাত টাকা।

শ্রীসরোজ বসাক বিচিত্র 'কি ফল লিভন'  
উপন্যাসটি বিষাদান্তক। দুই ভাই প্রভাকর  
ও দিবাকর। দিবাকরকে মানব করে নিয়ে  
দেয় বড় ভাই প্রভাকর, সর্বমু নামে একটি  
স্বভাব-সবল মেয়ের সঙ্গে। সর্বমু সংসারে  
সকলকে মানিয়ে নিতে পেরেছে, পাবেনি  
স্বামী দিবাকরকে। দিবাকর পদ্য লেখে, অল্প  
মাইনের চাকরী করে। এই অবস্থায় দিবাকর  
করের স্বপ্নদূর-শাস্ত্রীর চক্রান্তে ওদের  
সংসারে ভাঙন ধরে, দুই ভাই আলাদা হয়ে  
যায়। সর্বমুর অভিমানে অকাল মৃত্যু ঘটে।  
পত্র-কন্যা আমার বাড়ি মানব হতে থাকলে  
দিবাকর পথে পথে ঘোরে, ছদ্মনামে পদ্য  
লেখে। শেষে সেও পিতার কর্তব্য পালন  
করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। সর্বমু-  
দিবাকরের মৃত্যু চরিত্র-ন্যায়ের ওপর  
প্রতিষ্ঠিত। প্রভাকর, দিবাকর, সর্বমু, সর্বমু  
মা-বাবা—প্রতিটি চরিত্র সংজ্ঞাকৃত। বাবা  
গল্প পড়তে ভালবাসেন, দুঃখময় জীবনের  
কথা পড়ে দমে যে অশ্রুসিক্ত হন, তাঁদের  
কাছে এ গ্রন্থ ভাল লাগবে। ভাষা সুশীল।

জ্যোৎস্নার ভিতরে গর্জন (কাব্যসংকলন)—  
গৌতম গুহ। অনির্বাক প্রকাশনী, ৩এ  
গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা-১২।  
দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবি গৌতম গুহের জীবন সম্পর্কে  
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল—'হাত ভরে কল  
দেবে যারা/তারা এই এনেছে দোঁধি করাতে

কাব্যগ্রন্থের অন্য একটি কবিতার কবির  
অভিজ্ঞতার আর এক রূপ—এই কথা পকে  
থেকে, নিশাঙ্কে/বাড়ি কেরানী পরমা পড়ে  
যায়।' 'জ্যোৎস্না' সম্পর্কে কবির বক্তব্য  
প্রচলিত অনুভূতি থেকে ভিন্ন। কবির  
'জ্যোৎস্নার ভিতরে যেতে গুহ' এক এই ভয়  
অমূলক নয়। নাম কবিতার কবির স্পষ্ট  
ঘোষণা—'শান্ত বাধ্য পেটের 'ছেলেকে/  
উঠানের মিটিং ছড়া ছুলিয়ে রেখেছে/  
জ্যোৎস্নার ভিতরে তাই উজ্জ্বল গর্জন,  
রাবণের দাঁড়ি দাঁড়ি চিতা।' হস্তমত ভয়  
আধুনিক কবি গৌতম গুহ জীবন, জগত  
ও অভিজ্ঞতাকে এনেছেন প্রত্যক্ষ সত্যের  
আলোয় যাচাই করতে। তাই কবিকণ্ঠ  
কোথাও শেল-বাগে-তীক্ষ্ণ, কোথাও বা  
অসহায়তা, হতাশায় দুঃখিত, বিষম। কিন্তু  
কবি আশা, বিচার বাণীকে অস্বীকার না  
করে বরং সাধারণ লোককণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ  
মিলিয়ে বলেছেন, 'সুরেলা গান শুন  
জীবনের মধ্যে নিশাঙ্কে/আজ ন-বহর  
ধব।' কবির ছন্দ শব্দ, অভিজ্ঞতা—  
চিত্রকল্প যথেষ্ট কাব্যিক, আন্তরিক।

সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ : নগেন দত্ত।  
পরিবেশক : শিক্ষাবারতা। ৯।৩  
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—  
৯। আট টাকা।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—বিশ  
তিরিশ দশকেই সাহিত্য-আন্দোলনের মাঝে  
সমাজবাস্তবতা ইন্দ্রন বোঝানে ধুঁজে  
পোয়ছি তারই খানিকটা অংশমাত্র আলো-  
চনা করছি। বিদ্রুতিভূমির 'পথের  
পাচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
'পশ্চানদীর মাঝি' এই দুটি ধারার এখানে  
আলোচনা করা সম্ভব হল না।' পূর্বাঙ্গ  
না হলেও এ আলোচনার একরকম বিশেষ  
আবেদন আছে। তিনি লিখেছেন—সাহিত্য  
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে নানা মত থাকতে  
পারে। কিন্তু আমরা মনে করি সমাজ-  
বিস্তার বর্তমানে সাহিত্যের মধ্য উদ্দেশ্য।

এই চিন্তা ধরে 'চতুষ্কোণ' মাসিকপত্র  
তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ধান্দা-  
বাহিকভাবে,—সেই সঙ্গে আরো কিছু  
সংযোজিত হলে বর্তমান কথানি দাঁড়-  
যেছে। 'কল্লোল', 'কালিকাল', 'প্রগতি'  
পত্রিকাগুলির লেখকরা সেকালের সামাজিক  
রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফসল—সে পর্বের  
বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু  
কেরানী' গল্পের মূলে দেশের সেই বিশেষ  
সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরি-  
স্থিতির বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য। তাঁর আগে প্রথম  
চৌধুরীর 'রায়তের কথা' জমিদারদের  
প্রতি মমতা বর্জন না করে প্রজার প্রতি  
কিঞ্চিৎ ওদার্য প্রদানের মজীর পাওয়া  
গেছে। শিক্ত সমাজে, কল্লোলের উগ্র  
চিন্তার প্রতি অনীহা ছিল। অসহায় জীব  
অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন  
ঘটেছে,—এবং তাতেই আত্মীয় অর্থনৈতিক



তারপর তাঁর নিজের কথায়—‘যা যা দাঁড়ে জমিদারীর এক রোখা ব্যতিক্রমত্বের পর যে এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের সমাজে ফুটে ওঠে তার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যাঁর কল্পবায়ের মধ্য দিয়ে।’ স্বল্পবিস্তৃত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কল্পনা ফুটে উঠেছে ‘প্রবেশের ক্ষিতি, শৈলজামল মন্থোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প। গ্রাম থেকে শহরে সরে এসেছে আমাদেব কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা। দেশী বণিকদের স্বাদেশিকতার আন্দোলনের ফলে সমাজ-বিকল্পিতাবাদেব সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সমাজ-বিকল্পিতাবাদ থেকেই সাহিত্যে ‘আমি’ ভাবের উদ্ভব হয়েছে।—এইভাবে গ্রীষ্মক পুষ্ট অনেক ভাববার কথা লিখেছেন, যা আর একটু গৃহীয়ে লিখলে পাঠকের সুবিধা হতো। অনেক গল্প-উপন্যাসের ও সমালোচনার প্রসঙ্গ এই আলোচনায় জায়গা পেয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণে ও বিন্যাসে,—সেই সঙ্গে ভাষাগত বন্ধুরতার ফলে বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের আন্তরিক প্রবৃত্তি। অন্তর্ভুক্ত করা গেলেও কেমন যেন অগোছালা মনে হয়। এই অগোছালো ভাবটি এই চিন্তাভাবিত বচনের সর্বাধিক বাধা। ‘উন্নত’ শব্দটি তিনি অনেকবার ব্যবহার করেছেন,—যেহেতু উন্নয়ন-অর্থ। অনেক ছাপায ফল আছে। সাহিত্যের আলোচনায় সমাজবাস্তববাদ নামক তত্ত্বচিন্তার গুরুত্ব ঘটেছে বলে মনে হয়। বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় তাঁর মূল সূত্রটি পুনরায় দেখানো হয়েছে—‘বার মূল-কথা হলো—সমাজের একটি বিশেষ নিকাশশীল উন্নত প্ৰত্যেক—বন্ধু উপাদানের অন্তর্নিহিত যে সৃষ্টিশীলতা রয়েছে সেটা আত্মনির্ভর হয়ে এক সময়ে বিবোধের ভূমিকা গ্রহণ করে। দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে এক-একটি নোতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।’

—সংগ্রহ। মিত্র

এরিস্টটলের পোরটিকস : অনুবাদ। শীতল ঘোষ। মূল্য চার টাকা। ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক : শীতল ঘোষ। জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২।

স্ব-শাস্ত্র মহাপণ্ডিত এরিস্টটল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর পোরেটিকস গ্রন্থে ট্রাজেডী ও মহাকাব্যে যে বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করেছেন নাট্যশাস্ত্রের বিচারে আজও তা সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সমালোচনার আদর্শমানরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরে নাট্যশাস্ত্রের অগণিত পণ্ডিত তার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা দৃষ্টির অবতারণা করেছেন, কিন্তু এরিস্টটলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই কাব্যশাস্ত্রের পাঠকদের কাছে এরিস্টটলের পোরটিকস অপরিসংখ্য এবং গ্রীষ্মক ঘোষ যথেষ্ট দক্ষতা ও নির্ভর্য সঙ্গে ঐ গ্রন্থটির মধ্যস্থ অন্তর্ভুক্ত করে কালের হাদ্যভাষ্য ও অপ্রত্যাশিত একটি বড় অভাব পূরণ

করা। ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম ও অধ্যাপক হবার পর একটি ওয়াশিংটন সন্মেলন স্থাপন গ্রন্থটির মূল্য ও মর্যাদা বর্ধিত করেছে।

ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক প্রকৃতপক্ষে প্রথম গ্রন্থটিরই পরিপূরক। কারণ এই গ্রন্থটিতে পোরটিকস-এর ভিত্তিতে গ্রন্থকার নাট্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তবে পোরটিকস গ্রন্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা থাকলেও উল্লিখিত গ্রন্থে লেখক বৃহৎ ট্রাজেডীতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন।

দানবৈজ্ঞানিক কাব্য ও সাহিত্যিক সন্দেহ : বন্দু চিত্তরঞ্জন। শিল্প দাস। প্রকাশক—সমীর ভট্টাচার্য, ৩৫, আশুতোষ মথুরাজি রোড, কলকাতা-২৫। পাঁচ টাকা।

শ্রীশিখর দাস ইতিপূর্বে ‘মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র’ গ্রন্থ রচনা করে বহুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এর দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটি তাঁর প্রবন্ধকার হিসেবে আর একদিকের ক্ষমতার পরিচয় ফুটিয়ে দেয়। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন মূলত দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা-বিশ্ব, দাতা হিসেবেই সর্বসাধারণের পরিচিত। কিন্তু তিনি যে এই সমস্ত বৃহৎ বর্মপ্রদানের মধ্যে নিবলন সূক্ষ্ম সাহিত্যচর্চাও করে গেছেন এবং সেক্ষেত্রে যে বহুখ্যাতি মৌলিক কবিত্বের পবিত্র রেখেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তার পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। শ্রীদাস কাব্য ও সনেট কবিতা চিত্তরঞ্জনের কাব্য-বিচারক সম্পাদক ও দেশদরপী চিত্তরঞ্জনের স্মারক পরিচয় পুষ্ট করার জন্য ‘মাল্য’, ‘মালা’, ‘সাগর-সংগীত’, ‘অন্তর্বাণী’, ‘কিশোর-কিশোরী’—এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলির বিস্তৃত ও সুচর্চিত আলোচনা বেশী হয়নি। বর্তমান গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে।

### সংকলন ও পত্রপত্রিকা

নবম—সংবাদকর্ম-ভাষা সম্পাদিত। অরুণ ইন্দ্র। ২২৫ হাবহারপুর। বারাসাত। ২৪ পরগণা। দাম দুটাকা।

সমকালীন বঙ্গভাবনার স্বাক্ষরবৎ সাহিত্য পত্রিকা নবম। বচনা নির্বাচন সংবাদকর্ম-ভাষা প্রগতিশীল মানসিকতা এবং সচেতন জীবনধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প লিখেছেন কালীকান্ত চক্রবর্তী। সূত্রিত মন্থোপাধ্যায়, কালপ আড়া, সুবোধ ভট্টাচার্য, সমীরকান্তি কবিরাজ, কুমারকান্ত রায়

কবানী মন্থোপাধ্যায় এবং অরুণ-ইন্দ্র। কলকাতা ঘোষ এবং বীরেন্দ্র-শিল্পকর্ম প্রবন্ধ দুটি বৃত্তান্তিক। কাব্য-‘মহাকাব্য’—ভাষাশাস্ত্র, পবিত্র মন্থোপাধ্যায়, ‘কবিতা’—হাজরা, নবীন সুর, ভুলসী মন্থোপাধ্যায়, ‘হাট’—মন্থোপাধ্যায়, ‘গোবিন্দ’—দে, ‘তপস’—মন্থোপাধ্যায়, ‘মিষ্টান্ন’—মন্থোপাধ্যায়, ‘অবিশ্বাস’—দে, ‘দীপেন’—দে, ‘ভট্টাচার্য’, ‘সত্য গুরু’ এবং ‘আরো কবিতা’—দে।

পাণ্ডা (আবিস-কাব্যিক)—প্রকাশক—সমকালীন বিবল সেন। ৩ বিজয়পুর-কলকাতা। দ্ব্যধিকারকর্ম। ২৪ পরগণা-কলকাতা—এক টাকা পঞ্চাশ পরগণা।

পটিকাটি পরিচয়। প্রাচীনতম বিদ্যালয়। বেরুয়ে পটিকাটি সাহিত্য সংস্থার নবীন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রবীণের সংযোগ-সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ সংখ্যায় লিখেছেন ‘কবানী’ মন্থোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, ‘কানাই-লাল দত্ত, বিজয়চন্দ্র ঘোষ শামসুর রহমান এবং আবো আনকে। পটিকাটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগবে।

সংলাপ : সম্পাদক অরুণ বার সম্পাদিত। ৭১ সীতারাম ঘোষ পটিকা-কলকাতা—৯। দাম পঞ্চাশ পরগণা।

গাবাহিকভাব পূর্ণাঙ্গিত ‘চন্দ্রাব জন্মজীবন ও লোকসংস্কৃতি’ শীর্ষক বচমাটি আকর্ষণীয়। ভাষাভাষী, উন্নয়নযোগ্য করেকটি লেখা লিখেছেন দ্বিগুণবর্জিত বন্দু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক ফণিভূষণ আচার্য, ‘পাণ্ডা’ চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ ধর্ম। ‘পটিকাটি সমকালীন সমাজে-উদ্ভাপ-উদ্ভাবন সম্পর্কে’ উদাসীন নয়। অনেকের কাছে সংগ্রহযোগ্য মনে হবে।

বাংলা ভাষার একমাত্র ‘ইস্টার্ন-ব্রিক’

## বর্ষপঞ্জী

১৩৭১ (২৬শ বর্ষ)

চলিত দিনরায় সঙ্গে ধর্মিক সম্পর্ক রাখতে হলে যে গ্রন্থ চাই-ই। ৬৫টি বিভাগে বিশেষ লক্ষ্য ওয়া পরিচয় লাভ করেছে। বাংলাদেশ-এ ব্যক্তি পরিচয় দুটি বিশেষ বিভাগ।

৪০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪ টাকা। ডি পি বার সম্পাদিত।

এস. আর. সেনগুপ্ত-আশুতোষ-কোয় ৩৫। ১৫ গাবাহাণ্য ‘মিষ্টান্ন’ কলি-৬





# ইতিহাসের সাক্ষী ১২

আনন্দভবন ।। এলাহাবাদ

শ্যামল পাঠক

(২)

ট্রেন ছেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে আমবাও  
এঁগিয়ে চললাম মোগলসরাইএর পথে।  
আমাদের কামরার অধিকাংশ যাত্রী  
অবাঙালী। শব্দসমূহ তাদের সঙ্গে গল্প  
সম্বন্ধ করল। ইতিমধ্যে পার্টনা ছাড়িয়ে  
অনেক দূর এঁগিয়ে ট্রেন একটি স্টেশনে  
এসে দাঁড়াল। জানালার পাশ দিয়ে একজন  
চা-ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল, আম ডেকে চা  
নিলাম। সেই সময় কামরার মধ্যে এক  
ফেনিওয়ালার উঠল। তার হাতে ও ঝোলান  
কঙগুনি কলম, ছোট চুচি, ছবি ও চিবুনি।  
অবশ্য একটু পরেই বয়স্ক সে ফেনি-  
ওয়ালার নয়, নিলামওয়ালার। লোকটিকে  
কলমগুনি খুব দামী। নিলামের ডাকে  
যিনি প্রথম হলেন তাঁকে সেই দামে কলমটি  
ও সঙ্গে একটি ছোট চুচি উপহার দেওয়া  
হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হলেন যারা  
তাদের বিনামূল্যে একটি করে ছবি ও  
চিবুনি দেওয়া হবে। তখন বেশ কয়েকজন  
মহাউৎসাহে নিলাম ডাকতে সুরু  
করলেন। দুটাকা থেকে ছটাকা পর্যন্ত  
দাম উঠল। যিনি প্রথম হলেন তিনি সেই  
দামে কলমটি কিনে নিয়ে সঙ্গে একটি  
চুচি পেলেন। অন্য দুজন একটা করে  
ছবি ও চিবুনি পেলেন। এইভাবে কয়েক  
দফা ডাক হয়ে নিলাম শেষ হল। তখন  
নিলামওয়ালার ট্রেন গেল নেমে গেল।  
সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন নামলেন  
যারা নিলামে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন  
এক ড্রলোক বললেন এরা সকলেই  
নিলামওয়ালার লোক। যাত্রী সেক্রেট  
উঠে নিলামে ডাক দিয়ে সাধারণ যাত্রীদের  
কাছে বেশী দামে ও উপহারের নামে সমস্ত  
দামের কলম ও চুচি বিক্রি করে। জিনিস  
বিক্রির এই নতুন কৌশল দেখে অবাং  
হলাম।

ট্রেন সাধারণ এঁগিয়ে চলল। অচিরে  
এঁগিয়ে আসলাম মোগলসরাই।

এবার সন্ধ্যা হল বৃষ্টি। প্রথমে দূরে ঘব ও  
জোয়ার ক্ষেতের ভিতর কুম্মার ব্যাপসা  
আবরণের মতো মনে হচ্ছিল, এবার কাছে  
এল বৃষ্টির ধারা হয়ে। জানালা বন্ধ করে  
দিলাম। কাঁচের গা বেয়ে বৃষ্টির জল তখন  
গাড়িতে পড়তে লাগল।

সেদিন বিবাব। দুপুর পৌনে দুটায়  
আমবা মোগলসরাই স্টেশনের প্লাটফর্মে  
পা রাখলাম। তখনো বৃষ্টি ধামে নি,  
হুমবার সম্ভাবনাও নেই। সমস্ত আকাশ-  
টাই মেঘে ঢেকে আছে। সুতরাং স্টেশনে  
অপেক্ষা করা অর্থহীন। শব্দ ও আম  
আমাদের ব্যাগগুলি কাছে নিয়ে বসি-  
ভিজতে ভিজতে স্টেশনের বাইরে এলাম।  
পার্টনা থেকে এখানে শীত অনেক বেশী।  
তার উপর বৃষ্টি হওয়ায় ঠান্ডা যেন কাটা  
মত বোধ হচ্ছে। এখান থেকে একটা বিকসা  
নিয়ে শব্দরদের অফিসের দিকে চললাম।  
স্টেশন থেকে কিছুদূরে গোলামুজিত  
ওঁদের অফিস। একটু পরেই বড় একটা  
দাওলা বাড়ীর সামনে শব্দর বিকসা  
খামাতে বলল। বিকসা থেকে নেমে আমবা  
দোতলায় উঠে গেলাম। শব্দর এখানেই  
থাকে। পাশাপাশি দুটি ঘরই ওর  
স্বহাবের জন্য। ওপাশের ঘর দুটিতে  
আমের ওখানকার গ্রাণ্ড ম্যানেজার প্রফুল্ল  
চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী ও তিন শব্দরদের  
অফিস। আমবা যেতেই হারিসমুখে প্রফুল্ল-  
বাবু বেরিয়ে এলেন। ওঁর সঙ্গে পরিচয়  
হল। বেশ সাদাসিধে মানুষ। বাড়ী  
বর্মান এখানে অনেকদিন হল চাকরী  
করছেন।

পারের দিন সকালে কাছাকাছি  
কিছুটা জামগা ধরে এলাম। চারের  
দোকানে আলোপ হল মহম্মদ সেইম ও  
মহম্মদ হুজবাইলের সঙ্গে। সেইম এলাহা-  
বাদের লোক এখানে চাকরী করেন  
ইকনাইলের বাড়ী নিখাবে। ওঁর বাবা কয়েক  
চাকরী করতেন। তাই ছোটবেলা থেকেই

এখানে বসবাস। ইজবাইল চাকরী করেন  
না ব্যবসার দিকেই ওঁর ঝোঁক। দু'জনেই  
বেশ খোশমেজাজী। সকালে আমবা এক-  
সঙ্গেই গল্প করতে করতে চা ও জলখাবার  
খেলাম। ওঁদের মধ্যে এতটুকু গোঁড়ামী  
দেখলাম না। খুব কাছে মানুষের মতোই  
এ বা আমবা সঙ্গে কথা বলছিলেন। এতদূর  
দেখা হল সন্তোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে, চমৎ-  
কার হিন্দীও কথা বলেন। প্রথমে আম  
দু'জনেই পারি নি উনি ব্যাঙালী। বহু বহু  
ধরে ওঁরা উত্তরপ্রদেশে বসবাস করতেন।  
সন্তোষবাবু একটি প্রেক্ষাগৃহে অপারেটর  
কাজ করতেন বর্তমানে বেকার। ভদ্রলোক  
এখানকার বহু লোকের সঙ্গেই পরিচিত।

সেদিন আমাদের বেনাবস ও সাবনাথ  
খাওয়ার কথা। শব্দর সন্তোষবাবুকে  
বলল তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তোমার  
ওঁ ওখানে বেশ জানা শোনা আছে। উনি  
আপাতি কবলেন না। ক্যামরা সঙ্গেই ছিল,  
তিনজনে উঠে বসলাম বেনাবসের বাসে।  
মোগলসরাই থেকে বেনাবস বেশী দূরের  
পথ নয়। বোধহয় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই  
এসে গেলাম।

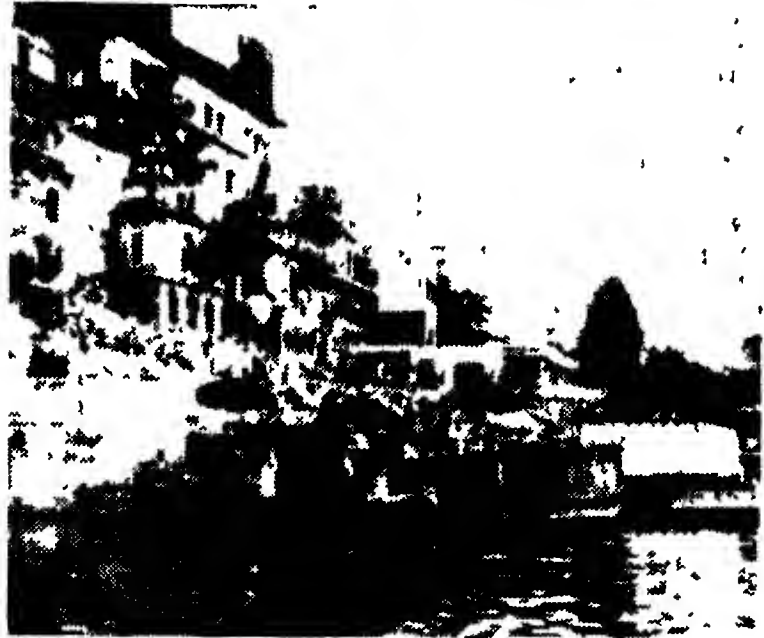
খুবই প্রাচীন এই বেনাবস। খুঁট  
পরে বর্তমানের প্রথমার্ধে ভাবতবর্ষে  
খালিটি রাজ্য ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে  
বোধহয় কাশী ছিল সবাপেক্ষা শক্তিশালী।  
কাশীর রাজধানী ছিল বাবানগরীতে। সে  
বুগে বাবানগরী এমন সমৃদ্ধ ছিল যে তাতে  
হাতিবেশী রাজন্যবর্গের দৈর্ঘ্য কারণ হতে  
হচ্ছিল। সেই সঙ্গে বাবানগরীর উপর  
তাদের লোলপ দৃষ্টিও পড়ছিল। কাশীর  
সেই সমৃদ্ধ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।  
কুম্মার কোশলবাজ প্রাধান্য বিস্তার করতে  
শুরু করে। পর্বতীকালে মগধবাজ অজ্ঞাতশত্রু  
কোশলবাজ প্রসেনজিতের বন্যাকে বিবাহ  
করে উপঢৌকন স্বরূপ কাশী গ্রাম লাভ  
করেন। প্রাচীনকাল থেকে বহু পৌরাণিক  
নাহিনীও সৃষ্টি হয়েছে এই বাবানগরীকে  
কেন্দ্র করে।

বাজঘাটের আশেপাশে দেখলাম ছড়িয়ে  
যেছে প্রাচীনকালের অনেক চিহ্ন। এখানে  
এক টাঙ্গার ক্ষুদ্র শহর দেখতে পাই  
যেলাম। রেশ বড় শহর, বহু লোকজনপাট  
তার দু'পাশে। দোকানগুলিতে নানা  
স্নাতক আনাগোনা। ঘুরতে ঘুরতে এক  
নিয়ে গেলাম মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে।  
যে ঘাটে সরু গলি দিয়ে এগিয়ে  
যেলাম। বড় বড় পাথর বিছানো বাস্তা  
পাশ নানা দেবতার মূর্তি। গলিগুলি  
প্রান্ত সব। পথ জানা না থাকলে বাস্তা  
বিয়ে ফেলাব খুবই সম্ভাবনা। ধীরে  
এব বাস্তা নীচের দিকে নেমে গেল  
মনেই গঙ্গা। গঙ্গার তীরে মণিকর্ণিকার  
ঘাট এলাম। এখানেই শ্মশান। জনপ্রতি  
এই শ্মশানের আগুন কখনো নেভে না।  
এই শ্মশানকে কেন্দ্র করে লোকমুখে বত  
এই নীচ শ্মশান মাথা দেখলাম গঙ্গার  
এব অনেকগুলি শব দাহ  
গা হচ্ছিল। সন্ধ্যার জন  
গাওয়া দাঁড় মতদেহ নিয়ে আসা হল।  
যেলাম বন এখানে আগুন নেভে না।  
বাতব পিষ্ট প্রাণ থেকে বহু মানুষ  
শব বসে বৈতরণী পাব হবার আশা  
থান শেষ জীবন বাটিয়ে যান।

এখন থেকে দক্ষিণ দিক ঘাটে গেলাম।  
এখানে পুণ্ড্রোত্ত ও পাণ্ডারের বেশ  
নাগোনা। ঘাটের বড় বড় চতালগুলিতে  
লাপাতার ট্রেবী নিয়ে বিগটি ছাড়া।  
এব ওলাস ঠাকুরশাইবা শাস্ত্র পাঠ ও  
লাচনা বত। সামান্য বসে -তুন্দ পাঠ  
মনেছেন। ঘাটে স্নানার্থীদেরও বেশ ভীড়।  
কট নৌকা ভাড়া করে তাম্বা বাজা  
বিশ্বদ্রব্য খাচ্ গেলাম। এখানেও শ্মশান।  
মনেই নাকি বাজা ভাগ ক'ব হবিচ্ছন্দ  
আ চাডালের জীবিকা গ্রহণ করছিলেন।  
ঘাটেই পুরে মৃত পুত্র ও স্ত্রী শৈব্যাব  
সঙ্গ বাজ ব মিলন হয়েছিল। ধর্মের  
দীক্ষায় ওলাস হ'য পুত্রের জীবন ও  
জা আবার তিনি ফিরে গেলেন।

কাশী ওপায়ে নাম বাসকাশী।  
সেদের নাকি এখানে দ্বিতীয় কাশী  
তত্তা বয়েছিলেন কিন্তু অল্পপূর্ণ দেবীর  
ভিষাপে তাঁর আশা তার পূর্ণ হল না।  
সেবের বিশ্বাস এখানে মবলে পবজন্মে  
ধা হয়ে ওঠতে হবে। এই ওখান কোন  
সতি গড় ওঠে নি। কাশী বিশ্বনাথ  
মন্দির অল্পপূর্ণ মন্দির ও কাশীক  
কেন্দ্র করে বিচিত্র হাফেজ বত পৌরাণিক  
কাহিনী। সেকথা থাক। দেব কামনগার  
শায়সের বাজার কেমন দেখা যাচ্ছে। বেশ  
বড় দুর্গ। দুর্গ থেকেও বেশ সূর্য দেখায।  
গঙ্গা থেকে কাশীর ঘাটগুলি দেখাও খুব  
মজার। যেকোন মানবকেই মুগ্ধ করে।  
একা বিহাব শেষ করে তাম্বা সিঁড়ি দিয়ে  
পরে উঠে এলাম।

কাশীতে এসে মনেই হচ্ছিল না যে  
এদেশের বাইরে আছি। অসংখ্য  
গুলাবী ভীড়। অনেকই বেড়াতে  
এসেছেন আমার সেই সাংগে পশ্চাত্যদের



আশা নিয়েও এসেছেন অনেকে। বহু সাধু  
সন্ন্যাসীদের দেখা পেলাম এখানে এসে।  
পথ বিদেশী হিপ্পিদের আনাগোনাও কম  
নয়।

গঙ্গা থেকে ফিরে এসে বিশ্বনাথ  
মন্দির ও অল্পপূর্ণ মন্দির দর্শন করলাম।  
মন্দিরের পথ সব হলেও ভেতর ভীড়  
কিন্তু অসংখ্য। সেই সঙ্গে দু'পাশের  
দোকানগুলিও বচাকেনা বাস্ততা। কোন  
প্রকার মন্দিরে প্রবেশ করলাম, প্রণাম করে  
যেবে এলাম একাট হোটেলে। খাওয়া শেষ  
হ'ল টাঙ্গার চাও গেলাম বেনাবস হিন্দু  
সম্মেলন। বিরাট এলাকা নিয়ে এই  
বসাবিদ্যালয় বিভাগ বাড়ীগুলি সুন্দর-  
বাসে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব-  
বিদ্যালয় পরিবেশাটও বেশ মনোবহ।  
বহুক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এখান থেকে  
উপস্থিত হলাম সাবনাথে।

সাবনাথ বৌদ্ধদের পবন তীর্থস্থান।  
বসাবসের কাছেই এই পরিষ্কার ভূমি। সাব-  
নাথের প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন। বুদ্ধদের  
সমাক বোধিলাভ করার পরে এখানেই প্রথম  
খম প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধদের প্রথম  
উপদেশবাণী প্রচারের এই ঘটনাকে 'খমচক্র  
প্রবর্তন' বলা হয়। সাবনাথের বৌদ্ধ স্তূপ  
বা মন্দিরটি বেশ সুন্দর। এখানে একটি  
মিউজিয়ামও দেখলাম। মিউজিয়ামের মধ্যে  
এখানে উদ্ভাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিস ও  
একটি অশোক স্তম্ভ বাগা হয়েছে। সাবনাথে  
অনেকটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ  
এখানে অবশিষ্ট আছে।

এখান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ  
হল। মোগলসবাইগামী একটা বাসে আমবা  
উঠলাম। সন্ধ্যারবাসে বললেন, আপনারা  
চলে যান। আমার ফিরতে দেখা হবে।  
এখানে একটা কাজ সেরে পরে ফিরব।  
তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার জিনিস টাইম

দশমবর্ষে ঘাট : কাশী

আমাদের জন্য ব্যস্ত কবালন এমন মানুষ  
বড় একটা দেখা যায় না।

বাসে প্রচণ্ড ভীড়। দেখলাম বেশ কিছু  
সংখ্যক বাড়ালীও বাসে উঠেছেন। আমবা  
দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের সামনের আসনে  
এক বাড়ালী ভদ্রমহিলা। সংগে দু'টি মেয়ে।  
আমি আর শঙ্কর গল্প করছিলাম।  
আমাদের কথা শুনে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা  
করলেন আমবা কলকাতা থেকে এসেছি  
কিনা? বললাম আমি কলকাতা থেকে  
ঘুরে বেরিয়েছি আর শঙ্করের দোকান  
বললাম ও মোগলসবাইতে থাকে ওর  
ওখানেই উঠেছি। উনি বললেন, আমবাও  
মোগলসবাই বেল কামানীতে থাকি। এদিক  
বদলে এসেছিলাম। ওর পাশে বসা সড়  
মেয়েটি শীঘ্র পীয়ে বেশ কতদিন আমবা  
কলকাতা যাউ না। আমি হেসে বললাম,  
গলেই তো পাবেন ওখান ওর মা উয়ার  
দিলেন মাঝে মাঝে টাঙ্ক হয় খুবই কষ্ট  
হ'য ওঠে না। ভদ্রমহিলা বড় মরেটি বেশ  
চাণ্ডা আব শীঘ্রস্থব গুরু ছোট বোনটি  
ঠিক উল্টো সাবাক্ষণ ছবিট করাছ।

বাজঘাটের কাছে দাঁড়িক জাম হল।  
এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শুনলাম গঙ্গার  
ওপার থেকেই জাম শব্দ হয়েছে।  
বাস আর এগোয় না, মাঝে মাঝে একটু  
হাট হাট পা পা করেই থেমে যাচ্ছে। যে  
যেখান দিলে পারছে বাস, লরী ঢুকিয়ে  
দেওয়ায় পুরো বাস্ততাটাই বন্ধ হল। কল-  
কাতার ট্রাফিক জাম হয় কিন্তু এমন  
অবস্থা কোনদিন পড়তে হয় নি। প্রায়  
আড়াই ঘণ্টার মাত্রা দাঁড়িয়ে থেকে বাস  
আব চলল। তৎক্ষণ আমাদের পা টন টন  
শব্দে দেখলাম হুটমতিনাব চলল মেয়েটির  
চোখে প্রায় জল এসে গেছে ওর দাঁড়িক

দুর্ভাগ্য! ওর মায়ের মৃত্যুও উদ্বেগের দ্বারা। বিরক্তি সবারই।

মোগলসরাইএ ফিরতে অহেতুক রাও হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে ভদ্রমহিলা সন্ধ্যার সন্ধ্যা বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব? শব্দ বলল, বেশতো বলুন না। উনি অতি বিনীতভাবে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেল। আমাদের রান্নাটাও বড় ভাল। আপনারা একটু এগিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আমরা বললাম, চলুন এগিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে বাসের সামনের দিক থেকে আরো কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নামলেন। ওরাও ঐসিক্তই যাবেন। তখন ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, স্বাক্ষর আপনাদের আর কষ্ট দিতে হল না। মেয়ে দুটিও হাসল।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই অমলবাবু এসে হাজির হন। বললেন, আজ যদি চান তবে একসঙ্গে যেতে পারেন। এখানে একটা কাজে আমাকে যেতে হবে। বললাম, তবে তো খুবই ভাল হল। শব্দরও আমাদের সঙ্গে যাবে বলল। দুপুরবেলা আহাব পর্ব শেষ করে মেনে চেপে বসলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরেই ট্রেন চান্নারে এসে থামল। ট্রেন থেকেই পাহাড়ের উপর চান্নার দু'টি দেখা যাচ্ছিল। ট্রেনের বাইরে এসে একটা টাঙ্গা ফাড়া করলাম। টাঙ্গাওয়ালা প্রথমে বেশী ভাড়া চেয়েছিল, অমলবাবুর ধমকে চুপ করল। আমাদের টাঙ্গায় এন ভদ্রশব্দ ও তাঁর স্ত্রী উঠলেন। ওরা কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে হাওয়া পরিবর্তন করতে এখানে এসেছেন। একটু পবেই আর একজন ভদ্রমহিলাও এলেন। টাঙ্গায় বসে নিশ্চই আমাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। ওর স্বামী বেলে চাকরী করেন, এখানেই বাড়ী করেছেন। উনি বললেন, কুড়ি বাইশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এখন তো প্রায় এখানকারই লোক হয়ে গিয়েছি। অপর ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা কিছু এখানে এসে জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেন। বাজারে আপনাদের কাজ থেকে যা বেশী দাম নয় শেষে ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া করতে হয়। কথা বলতে বলতে আমরা এসে গেলাম। লিঙ্গা নৈশে যে যার পথে পা বাড়ালাম।

সামনেই পাহাড়ের উপর বিরাট প্রাকারে খেরা চান্নার দুর্গ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটা ঘুরে দেখলাম। সেখানে বহু পুরানো বাড়ী ঘর দেখলাম। একজন স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক অমলবাবুর পরিচিত। ওর সঙ্গেই অমলবাবুর কাজ ছিল; অনেকক্ষণ গল্প করলাম, উনি আমাদের চা ও জলখাবার খাওয়ালেন। ডাক্তারবাবুর কাজ থেকে লিঙ্গা নিয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে চললাম। প্রথমে দুর্গটী ছবি জুললাম। তারপর দুর্গের কটকের কাছে এলাম। এখানে খাতার নাম, ঠিকানা ও সময় লিখতে হল। প্রহরী কামেরা নিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে

তোরগটি খুবই সুন্দর। উপরে উঠে গেছে। চমৎকার স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন এই দুর্গটি।

খঃ পূঃ স্থাপত্য বহুর পূর্বে চান্নার দুর্গটি উল্লেখ্যনীর রাজ্য বিজয়াদিত্যের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর অন্যান্য সম্রাট এবং বৃটিশ শক্তি দুর্গটির অধিপতি ছিলেন। শেরশাহের জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে এই চান্নার দুর্গে। ইতিপূর্বে চান্নার দুর্গের অধিপতি ছিলেন তাজ খাঁ। তাজ খাঁর মৃত্যুর পরে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করে শের খাঁ চান্নার দুর্গটি অধিকার করে নেন। পরের বছর সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে এই দুর্গটি অবরোধ করেন। সুচতুর শের খাঁ ঐচ্ছিকভাবে হুমায়ুনের প্রকৃত স্বীকার করে সেবার আশ্রয় চান্নার দুর্গে।

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শের খাঁ যখন গৌড় অবরোধে বাস্তু সেই সময় হুমায়ুন শের খাঁর কর্মকেন্দ্র চান্নার আক্রমণ করলেন। তবুও দীর্ঘ ছয় মাসের আগে হুমায়ুনের পক্ষে চান্নার দুর্গ জয় করা সম্ভব হয় নি। এরপর হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হলে শের খাঁ তাঁর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হন নি। বর্ষা নামার ফলে হুমায়ুনকে বাধ্য হয়ে ছয় মাস বাংলাদেশে অবস্থান করতে হয়। এই সময়ে শের খাঁ চান্নার দুর্গটি পুনরায় অধিকার করেন। এরপরে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসারের কাছে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন শের খাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর শের খাঁ শের শাহ উপাধি ধারণ করলেন। কত কথাই মনে এল, দুর্গের প্রতিকৃতি পাথরে সেই সব প্রাচীন ইতিহাস গাঁথা আছে।

দুর্গের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বিশাল প্রাকারের গায়ে বয়েছে অসংখ্য বাকানো ভিত্র। দুর্গ রক্ষার জন্য এখান থেকে গুলি চালানো হত। অন্যদিকে আর একটি তোরগ আছে গঙ্গার ধারে। গঙ্গার দিকে দুর্গের ভিতর একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখলাম, নীচের দিকে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গ পথে কিছুটা নোমোঁছলাম, কিন্তু ভিতরে জমাট অন্ধকার আর দুর্গন্ধ। ক্রমাগত চামচিকের চিংকার শোনা যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। আশান্ত হলে আশ্রয়স্থান জন্য প্রয়োজনে এই দুর্গ পথটি ব্যবহৃত হত। দুর্গের পাশ দিয়েই গঙ্গা বয়ে গেছে। উপর থেকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম গঙ্গার দিকে। এখান থেকে গঙ্গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মতো।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। কামেরা ফিরিয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে গাছের তলায় ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে বসলাম। গঙ্গা তীরে গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গটি। কতগুলি গাছপালা জল নদীর দিকে ঝুঁক পড়েছে। গঙ্গার সঙ্গে ওদের পরিচয়ের পালা যেন এখানে শেষ

দূরে গাছের মাথার উপর আকাশ নেমে এসেছে, সবুজ কসলে ক্ষেত ভরে গেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি কুড়ে ঘর, আর ওদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। গঙ্গার মাঝখানে দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে চলেছে। হাওয়ার নদীর বুকে ফেটেবে দোলা লাগছে, সেই সঙ্গে নৌকাও দুলছে। ওপারের আকাশে তখন সূর্যদেব চলে পড়ছেন স্নানান্তে। চোখে তপি ঘুমের ছায়া নেমে এসেছে। বিদায় নেবার আগে তাঁর রক্তিম চোখের আলো যেন আকাশে আবার ছড়িয়ে দিল। সেই আলোর ছোঁয়ায় গঙ্গার জলও স্পন্দায় রাত্তা হয়ে

গঙ্গার তীরে বেগে ও ঘাসের উপরে অনেক বাঙালীকে হাওয়া খেতে দেখলাম। মনে হল চান্নারে বাঙালীরা একটা সাময়িক উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। বেশীর ভাগ লোকই সপরিবারে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় এসেছেন। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। ওদের দুর্গ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম, দেখলাম কেউই কোন খবর রাখেন না।

চা পান করে আমরা ফিরে এলাম বাজারের দিকে। ওখান থেকে একটা টাঙ্গায় উঠলাম। ঠিক হল বাসেই ফিরব। এবার মাঝে একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও টাঙ্গায় উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথায় যাব? মনে হল মোগলসরাই ফিরব শুনে আশ্চর্য হলে। কথায় কথায় বললেন, হুজুগে বাঙালী বাবুদের কথা আব বলবেন না। ওদের জন্য এই সময়ে আমাদের মাছ মাংস খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিতে হয়। দোকানদার যা চাইবে সেই দামেই জিনিস কিনবেন, আর পরসে ফুঝোলেই বাড়ী চললেন। শেষে ছুগ মরি আমবা। আমি বললাম, দেখুন, এরা এখানে বেড়াতে আসেন, নিশ্চই এখানকার জিনিসের দাম জানেন না। তাই হয়তো দোকানদার ঠিকিৎ দেয়। উত্তরে বললেন, দর দাম করে কিনলে কিন্তু এমন হয় না। বাসস্ট্যান্ডে নেমে ভদ্রলোক চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন, কাজেই আমার বাসা। বহু বছর ধরে এখানেই আছি। আপনাদের সঙ্গে অনেক অবান্তর কথা বললাম, কিছু মনে করবেন না।

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অমলবাবু ও শব্দকের সঙ্গে গল্প করছিলাম। অমলবাবু বললেন, জানেন চান্নারে আমাকে প্রায়ই কাজে আসতে হয়, কিন্তু এই প্রথম দুর্গের ভিতরটা ভাল করে দেখলাম। এতদিন কোন উৎসাহই বোধ করিনি। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, শেষে একটা বাস এল। তাড়াতাড়ি উঠে একটা জায়গায় বসলাম ভিনজনে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে কড়ের বেগে বাস ছুটল। পাড়াও থেকে আবার বাস পাওয়াতে হল। শেষে রাত দশটার আমরা ফিরে এলাম।

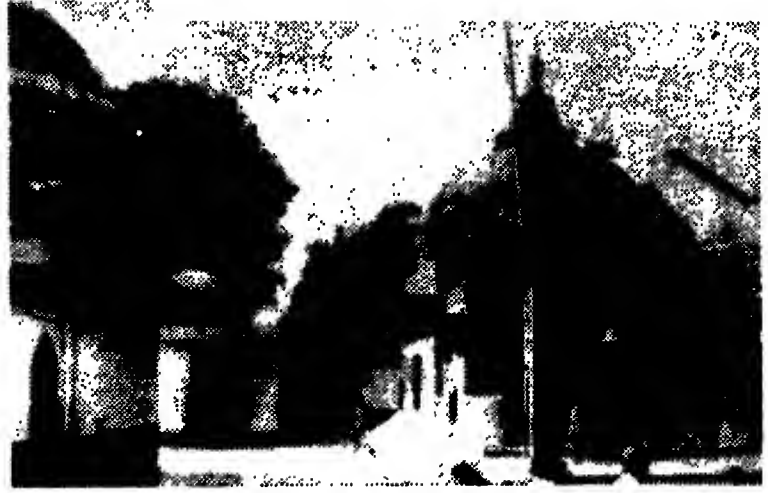
পরের দিন পরলা নভেম্বর বেণ সকালেই ঘুম ভাঙল। সেদিন আমার রাম-

ইজরাইলকে যাওয়ার জন্য বলছিলাম।  
শব্দের কাজ ছিল, ও যেতে পারবে না।  
ইজরাইল এককথাতেই রাজি হয়েছেন। সকাল  
আটটার মধ্যেই উনি চলে এলেন। আমি  
তৈরী হয়েই বসে ছিলাম। উনি আসতেই  
বেরিয়ে পড়লাম। মোগলসরাই থেকে পাড়াও  
বসে গেলাম। পথের দুপাশে গম, ধান ও  
জোয়ারের ক্ষেত। ফসলে ভরে গেছে।  
হাওয়ার দোলায় তাদের বৃকে জেগে  
উঠছে শিহরণ। নতুন নতুন অনেক কার-  
খানাও গড়ে উঠছে দেখলাম। পাড়াও থেকে  
অন্য একটি বাসে উঠতে হল। রামনগরে  
বাস আসতেই আমরা নেমে পড়লাম।

সামনেই রামনগর কেল্লার বাইরের  
তোরণটি দেখা যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে  
গেলাম, একটু পরেই দুর্গের ফটকে প্রবেশ  
করলাম। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য  
এক টাকা করে টিকিট কাটতে হল। ভিতরে  
রাজার কয়েকজন শিপাইকে কুচকাওয়াজ  
করতে দেখলাম। দুর্গের প্রহরীদের ব্যব-  
হারে মৃদু হলাম, খুবই অমায়িক ওরা।  
কেল্লার ভিতরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে  
দেখালাম। গঙ্গার তীরে বেশ বড় গড়টি।  
ভিতরে রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের বিভিন্ন মহল-  
গুলি দেখলাম। বড় বড় হল ঘরে পূর্ব-  
বর্তী রাজাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলি  
সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

এই কেল্লাটির অধীশ্বর বেনারসের  
রাজা। বেনারসের রাজারা রামনগরেই  
দুর্গের অভ্যন্তরে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে-  
ছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের রাজা মানসিংহ  
সিং প্রথম সনদ লাভ করেন। তারপর উত্তর-  
সুখী বাজারা সিংহাসনে আরোহণ করেন  
বিভিন্ন সময়ে। বর্তমানে রাজারাজী রাজার  
নাম ভবতী নারায়ণ সিং। প্রথমেই একটি  
হল ঘরে প্রবেশ করলাম। এখানে রাজাদের  
ব্যবহৃত নানা রকমের পোষাক, বাণিজ্য  
জিনিসপত্র, রূপোর পালঙ্ক প্রভৃতি দেখলাম।  
পাশের ঘরে বিভিন্ন উৎসবের সময় রাজারা  
হাতীর পিঠে যে সমস্ত হাওদায় বসতেন,  
সেইগুলি রাখা হয়েছে। হাওদাগুলিতে  
সোনা ও রূপোর পাতের উপর সুন্দর  
কারুকার্য দেখলাম। পাশেই রয়েছে বৌদ্ধ-  
মন্দির একটি পালকি। কাশীরাজ উদিত  
নারায়ণ সিংকে বাদশা আকবর এই পালকিটি  
উপহার দিয়েছিলেন। এখান থেকে অস্ত্রা-  
গারটি দেখতে গেলাম। প্রাচীন কালের  
গদাযুদ্ধ থেকে আধুনিক বিভিন্ন অস্ত্র-  
পাতিতে কাশীরাজের অস্ত্রাগার সুসজ্জিত।  
নানা প্রকার ঢাল, তলোয়ার, বর্শা বন্দুক  
রাইফেল পিস্তল চারিদিকে সাজান রয়েছে।  
এইগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাজার কাছ থেকে  
উপহার হিসেবে পাওয়া অস্ত্রও আছে।  
দোতলায় একটি ঘরে হাতীর দাঁতে তৈরী  
সিংহাসন, বিভিন্ন মূর্তি ও শিল্প নিদর্শন-  
গুলি রক্ষিত আছে। নিপুণ শিল্পীর হাতে  
তৈরী শিল্প নিদর্শনগুলি যেন প্রাণময় হয়ে  
উঠছে। এইগুলি সমস্তই রামনগরের  
শিল্পীদের সৃষ্টি।

এলাহাবাদে উদ্ভাসিত মন্দির মন্দির



একটু এগিয়েই আলিঙ্গের সামনে  
একটি বিশাল ঘড়ি দেখলাম। ঘড়িটির নাম  
ধর্ম ঘড়ি। বি. মূলচাঁদ নামে রামনগরেরই  
একজন নাগরিক এই ঘড়িটি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে  
তৈরী করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে  
১৯২০ খৃষ্টাব্দে মাত্র একবার বি. মণিলাল  
এই ঘড়িটি মেরামত করেন। ঘড়িটির  
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ঘণ্টা, মিনিট,  
সেকেন্ডের সঙ্গে বার, তারিখ সূর্যোদয় ও  
সূর্যাস্ত, চন্দ্রের অবস্থান, গ্রহণ, প্রতিদিনের  
রাশি পরিবর্তন সমস্ত কিছুই জানা যায়।  
অর্থাৎ ঘড়ির সঙ্গে এটিকে একটি চলন্ত  
পঞ্জিকাও বলা যেতে পারে।

এর পর রাজদরবারে প্রবেশ করলাম।  
কার্পেট বিছানো বিরাট হল ঘর। মাঝখানে  
সিংহাসন। উপরে দেওয়ালে সাজানো বিভিন্ন  
রাজার তৈলচিত্র। সমস্ত ঘরটিতে অদ্ভুত  
প্ৰত্যক্ষতা। বাইরের ঘরে টেবিল চেয়ার  
সাজানো। সেখানে এক ভদ্রমহিলাকে বসা  
দেখলাম। শুনলাম উনি রাজপুত্রের  
শিক্ষয়িত্রী। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের  
জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই কর্ম-  
চারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। রাজা  
ভবতী নারায়ণ সিং প্রবেশ করলেন। কিন্তু  
রাজবেশে নয়, শ্রুতি ও পাঞ্জাবি পরে।  
রাজার মূখে গাম্ভীর্য আর ব্যক্তির ছাপ  
সুস্পষ্ট। রাজদর্শন লাভ করে ফিরে এলাম  
বাইরে। এখান থেকে গঙ্গার দিকে গেলাম।  
গঙ্গার তীর থেকে দুর্গটি খুব সুন্দর  
দেখাচ্ছিল।

তারপর একটা চারের দোকানে এসে  
বসলাম। দীর্ঘ কয়েকজন মহিলা ও ভদ্র-  
লোক দোকানে বসে আছেন। ওদের সঙ্গে  
আলাপ করলাম। শুনলাম ওরা নৈনিতাল  
বেড়াতে গিয়েছিলেন, পথে কাশী ও রাম-  
নগর দেখে আজই কলকাতায় যাত্রা করবেন।  
একটু পরেই ওরা চলে গেলেন, আমরাও  
বাস রাস্তার দিকে হাটতে সুরু করলাম।  
ইজরাইল বললেন, নারায়ণপুরে এক ভদ্র-  
লোকের সঙ্গে আমার একটু দেখা করার  
দরকার ছিল। কিন্তু অনেক বোঝা হয়ে  
গেল, অন্যদিন যাওয়া বাবে। আমি বললাম,  
তা কেন? বেশীদূর যখন নয়, চলুন ধুরেই

আসি। আমারও জায়গাটা দেখা হয়ে বাবে।  
দেখলাম ওর মৃদু খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে  
উঠল। বললেন, আপনার অসুবিধা না হলে  
যাওয়া যায়।

রামনগর থেকে বাসে চড়ে নারায়ণপুর  
চললাম, আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে গেলাম।  
বাস রাস্তা থেকে নেমে কতগুলি পোড়ো  
বাড়ী ও পুকুর ঘাট ছাড়িয়ে একটা বাড়ীতে  
এলাম। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে  
কিছুক্ষণ প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর  
ইজরাইল বললেন চলুন যাওয়া বাক।  
ওখান থেকে বাসটাতে ফিরে এলাম, কিন্তু  
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও বাস গেলাম না।  
এদিকে পেটের মধ্যে জ্বালা ধরেছে। শেষে  
ইজরাইলের জানাশোনা একটা লরী পাওয়া  
গেল, সেই লরীতেই মোগলসরাই ফিরলাম।  
তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। অবসর  
শরীরে, ক্ষিধের অস্থির হয়ে একটা  
হোটলে ঢুকলাম। ইজরাইলকেও অনুরোধ  
করলাম। উনি বললেন, এখানে খেলে  
বাড়ীর খাবার নষ্ট হবে। তারপর চলে  
গেলেন। এত বেলায় ভাত খাওয়া ঠিক  
হবে না, রুটি ও মাংস নিলাম। খাওয়া শেষ  
হলে সোজা আম্তানার এসে জুতোটা  
খুঁলেই শুরুর পড়লাম খাটিয়াম।

পরদিন যথাসময়ে এলাহাবাদের শব্দে খবর  
ভাঙল। উঠেই আমি তৈরী হতে থাকলাম।  
পাঁচটার মধ্যেই অমলবাঈ এসে বাইরে  
থেকেই ডাকতে সুরু করেছেন। বাইরের  
দরজা খুলে দিয়ে বললাম, চিন্তার কারণ  
নেই, আমি প্রস্তুত। একটু পরেই আমরা  
দুজনে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম।  
স্টেশনে এসে এলাহাবাদের টিকিট ফেটে  
ভিতরে গেলাম। খুব ঠান্ডা পড়েছে। প্ল্যাট-  
ফর্ম-এ একটা স্টলে বসে আমরা কফি পান  
করলাম। একটু পরেই ট্রেন এল, দুজনে উঠে  
পড়লাম। যেতে যেতে চুনার দুর্গটি পাহাড়ের  
উপর দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে বিধ্যা-  
চলের পাহাড়শ্রেণী দেখা গেল। কাছে  
আসতেই চগৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে  
পেলাম। জগলে পরিবর্তিত পাহাড় শ্রেণীর  
মধ্যে প্রকৃতিদেবী যেন ধ্যানে মগ্ন। চারিদিকে

(आलोचकचिन्तन लेखक कटक गृहीत)

**বেনারসী**  
জিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের  
**ঐচ্ছিক**  
**ব্যাবিজি ব্যাস**



# ফুল ফোটার আগে

## শৈলেন রায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

গাড়ি তখন খুব জোরে ছুটে চলছিল। দুবন্ত হাওয়া লীলাবতীর চুল, বগল এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কামরায় নীল নীতি জড়লছে। সেই নীল আলোয় লীলাবতীকে তোমো গড়া পুতুল বলে মনে হচ্ছিল। লীলাবতী আর আমি একই বাথে বসেছিলাম। রাত গভীর। সহযাত্রী দুজন প্রচণ্ডভাবে ঘুমোচ্ছে। শুধু ওঁ বাই লম্বাচ্ছে তাই না। মনে হচ্ছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু আমি আর লীলাবতী জেগে বয়োঁচি। জেগে পাশাপাশি বসে আছি।

হঠাৎ লীলাবতী কথা বলে উঠল। ওর কথা আমার কানে আসতে লাগল। মনে হল কেউ যেন ডেনম সাংগ পাল। দিবা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছে, আব মদুমবে কথা বলছে, 'জ্ঞান হওয়ার পথ থেকে শুধু ভাল কথা শুনে এসেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাল কথা মিস্ট কথা হয়ে কানে আসতে লাগল। সবাই বলতো, খুব সুন্দরী আমি। আরও বয়স বাড়ল। নিজও বখত শিখলাম আমি সত্যিকারের বপসী। পুরুষেরা আমার দিকে যে দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করল সেই দৃষ্টিই ভাষা আমি বুঝতে শিখলাম। প্রথম প্রথম অস্বস্তি হতো। বিরত বোধ কবতাম। নিজেকে লুকোতে চাইতাম। তারপর একদিন সে ভাবটা কেটে গেল। খুব স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। আমি যে সবাব কামরায় বসে, সেই কথাটা বুঝতে শিখলাম। আমার গর্ব হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন হল, বাস্তব যদি কেউ আমার দিকে না তাকাতো, সেই লোকটার ওপর বিবর্ত হতাম। মনে মনে আসল বর্বর বল তাক গালাগাল দিতাম।' মনে হল লীলাবতী হাসল। 'তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেবারেই প্রথম পাটনায় এলাম। মা মারা যাবার পর বশেতে মাসী ব কাছে মানুষ হয়েছি আমি। মাসীরা

আমাকে খুব ভালবাসে। অর্থাৎ ওদের খুব ভালবাসে। পাটনায় এসেছিলাম বেড়াতে। অনিমেষের সঙ্গে দেখা বাবাব অফিসে। সে কথা আপনাকে বলছি। অনিমেষ আমাকে অপমান করলো। সেদিন সে কথাই মনে হয়েছিলো আমার। ও যে আমাব দিকে তাকালো না, আমাকে বিশেষ করে সম্মান দেখালো না, তাকেই আমার অপমান বলে মনে হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা কবলাম, অনিমেষকে শিক্ষা দেব। কেন যে অনিমেষের ওপর এত রেগে গেলাম জানি না।

ও কিন্তু আমাকে কোন অপমান করতে চায় নি। আমিই একদিন গায়ে পড়ে ওকে অপমান করলাম। অফিসের করিডর দিয়ে অনিমেষ আসছিল। আমি ইচ্ছে করে ওকে থাকা মেয়ে ওকেই ধমকে উঠলাম, 'দেখে পথ চলতে শেখেন নি।' অনিমেষ কী বললো জানেন। বললো, 'দেখে পথ চলি বলেই পা পিছলে যাব না। গান মনে কী যে বেগেছিলাম। মনে হয়েছিল, ওকে মারি, কিম্বা এমন অপমান করি যা ও জীবনে ভুলতে না পারে। শেষ পর্যন্ত এমন হল অনিমেষের কথা ছাড়া ও কিছুই মনে হতো না, ওয়ে আমাক দেখেও দেখল না, আমাকে অগ্রাহ্য করলো, হয়ত সেই কারণেই আমি ওর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলাম। আমি যত ওর দিকে বাবাব জন্যে হাত বাড়ানি অনিমেষ তত দূরে সরে যাচ্ছে। ঈশ্বর জানেন, অনিমেষ আর কতদূরে সরে যেতে পারে।'

গাড়ি তখন একটা পোলো ওপর দিয়ে যাচ্ছে। গমগম শব্দ লীলাবতীর কানে ভবিষ্যে দিল। কিছুক্ষণ আগেও মনে হয়েছিল, নিস্তব্ধ জগতের মাঝে আমি আব লীলাবতী শুধু জেগে রয়েছে। এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল লীলাবতীও ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র আমিই জেগে রয়েছি। কিন্তু আমাবও মনো দরবান। ঘুম না হোক, এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, আমি একজন পিছপ্রান্ত মানুষ,

আমাব বিগ্রাম প্রয়োজন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন, রাত শেষ হতে বেশী দেবী নেই। সমস্ত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।' লীলাবতী উত্তর দিল না। আমি ওপরব বার্থে উঠে গেলাম।

ভেবেছিলাম, মা খুব অবাক হবে। মা একটুও অবাক হল না। শুধু বলল, 'মায়।' বাইবের ঘরে বসে মা মালা জপছিল। বললাম, 'এত বেলায় পূজো করছো।'

মা নীলব কঁচি বকল, 'পূজো হয়ে গেছে, মালা জপাছি।'

মাগ তো পূজোর আসনে বসেই মালা জপ কবতে মা।'

'এখানে জায়গা বাসা ছোট। ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে। ওরা পড়তে বসেছে।'

বললাম, 'তোমার অসুবিধা হচ্ছে, না?'

মা বলল 'অসুবিধা কি। সুখেই তো আছি।' যদিও মা মুখে বলল, মুখে আছি, মাঝে মধ্যে মনে হল মা একটুও সুখে নেই। নিজেকে কীবকম অপবাহী মনে হতে লাগল। মনে হল মার অসুখী হবার কারণ শুধুমাত্র আমিই। মালা কপালে ছাইসে খলিতে ভবে বাথতে রাখতে মা বলল, 'হাব চা জলখাবার দিতে বলি।'

বললাম 'এখন থাক। তোমাদের খবর তোলা সবাই কেন আসছে। বড়মাস মাসীরা ছালামযবা কে যেমন আসে।'

মা বলল, 'সবাই ভাল আছে। ওষুধ খেয়ে দাদার শরীরটা একটু ভাল হয়েছে। তোমক ওষুধ পঠাতে লিখেছিলাম। চিঠি পয়েছি।'

না 'তা, কবে চিঠি লিখেছিলে?'

'পবশ,।'

'চিঠি পয়ে গায়ে মাঝে মেসী হল।'

সব দিকেই তো বিশৃঙ্খলা।'

'আমরা তো শুনিন, এখানেই শুধু গড়েগোল। কোলকাতার বাইরে নাকি আবহাওয়া খুব শান্ত।'

ধোঁড়ান হো হো করে হেসে উঠল,  
যে লোক মা মনে কবার সময় কাছে থাকল।

বৈধ জমিদার থেকে জমিদারি বাতিল  
 নল না, বরার পরে এক বছর ধরে একটা  
 থাকে-চিহ্ন করে নিয়ে বেড়ায়ে। জমিদার  
 সাক্ষর, বেজার পরমিস ব্যাখ্যার।  
 যোতনক-ভীষণ অস্বাভাবিক বলে  
 নে হতে লাগল। মললাম, 'যিহেটা সেই  
 দেশে সেরে ফেলালেই পারতিল।'  
 যোতন-থবে বৃষ্টিমানের মত মদ-  
 গণী করে বললে, 'সেটি হচ্ছে না বাবা।  
 নশটা ভালো হলে কী হবে, মান-বদলো,

ফানেস। দাউ দাউ করে জলছে। বা পড়ে  
 জলন্ত জঠরে নিয়ে পড়ছে। বউ হিসেবে  
 বাঙালী মেয়েরাই আইডিয়াল। ধর সংসারও  
 সামলাবে, খরচাও কম। ওসব দেশে বি  
 চাকর রাখা অসম্ভব। অথচ কার্য করতেও  
 আমার ভীষণ আলস্য। ডাকছি লেখাপড়া  
 জানা কোন মেয়ে বিয়ে করে নিলে বাব।  
 একটা জুসই চাকরি জুটিয়ে নিতে

পারবে, তার হাজার হাজার টাকা  
 হাজার জুটি করে।  
 আমার চোখ কপালে ওঠে তোকা  
 বললাম, 'পাঁচ লাখ হাজার টাকা?'  
 ইয়েস রাই বর, ইয়েস। পাঁচ লাখ  
 হাজার টাকা ওখানে কিস'দ না। চলে জাম  
 না। তোকা থাকবি।  
 'ধর।'  
 'ধর কি, আর না। আমি সব ব্যাকসা  
 করে দেবো। তুই শুধু গোটা করেক করবি।'

## মহিলাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ

মহিলাদের জন্য মহিলা নেতৃত্বে আঞ্চলিক সঞ্চয় প্রকল্প  
 নামে একটি নতুন কার্যসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে।  
 প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পরমা এপ্রিল এটির উদ্বোধন করেছেন।  
 এই প্রকল্পে আঞ্চলিক সমস্ত কাজ করে আর করার যে সুযোগ  
 রয়েছে তাতে—

- আপনার সংসারের আয় বাড়বে
- অবসর সময় বেশ কাজে লাগানো যাবে
- পাড়াপড়শীর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে
- দেশের সেবা হবে

সঞ্চয় নেত্রী হিসেবে আপনার কাজ হবে  
 আপনার এলাকার গৃহিণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা,  
 নিরমিত কিছু কিছু করে টাকা জমানো  
 জন্য তাঁদের সম্মত করানো এবং প্রতি মাসে তাঁদের  
 সঞ্চয় একত্রিত করে নির্দিষ্ট  
 ডাকঘরে জমা দেওয়া।



মোট যত অর্থ সংগৃহীত হবে তার ওপর  
 আপনি শতকরা সওয়া হ'টাকা হারে  
 কমিশান পাবেন।  
 দেশের সমস্ত ছোট বড় শহরে সঞ্চয় নেত্রী  
 চাই।  
 বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানার চিঠি  
 লিখুন—  
 জাতীয় সঞ্চয় কমিশনার  
 পোস্ট বক্স নং ৭৬, নাগপুর



গুই করে বিন। একদিন কথা দিতে হবে না। জেবে রাখ। আমি আরও কিছুদিন আছি।

‘তুই কি কোথাও বেরোব যোতন?’

‘ইচ্ছে ছিল, রিকার্ভ ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা আসার কথা আছে। মার নামে কোন আশ্রম ট্রাস্টে দান করে দিবে বাব।’ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যোতন আমার বলল, ‘পাপেব প্রায়শ্চিত্ত আর কী?’

বললাম, ‘বিকেলের দিকে বাস না আমাদের বাড়ি। চাট খাবি। তারপর নটার শোতে সিনেমার নিবে বাব। বাংলা বই তে; পৌঁছিস না অনেকদিন। কতদিন ওখানে আছিস রে?’

যোতন হিসেব করে বলল, ‘বছর ১’

‘কোথায় থাকিস?’

‘গুটেনবার্গ।’ ভাবছি নিউজকে চলে আসবো। তুই এলে কিছু ভারী মজা হবে। আমার সংসারে পেরিয়ে গেন্ট হয়ে থাকবি। তারপর কোপ শুকে কোপ মেয়ে তুইও একদিন বাঙালী একটা মেয়েকে মট করে নিলে বাবি। দীক্ষা আদ্যে পাত্রে ওপরে পা দিয়ে থাকি। এখানকার মত কুটুম্বমেলা শোয়াতে হবে না।’ বলল যোতন বিকট শব্দ করে হাসতে লাগল।

ওকে খামিয়ে দেখার জন্যে বললাম, ‘এখানে আমারও কোন কুটুম্বমেলা নেই। হাত পা ছাঁড়িয়ে দিবা আরো থাকি। হুকুম করবার আগেই কাজ হয়ে যায়।’

যোতন আমার কথাব শব্দ দিয়ে বলল, ‘আ বসেছিস। দেশটা কিছু ছিল মন্দ না। মত সব হুকুমকে দলগলো সব নষ্ট করে দিলে মাইরি?’

গম্ভীরভাবে বললাম, ‘এই একসপ্লান্টেশন তো আর চিরদিন চলাতে পারে না। ধীরে ধীরে লোকের চোখ খুলছে।’

যোতন খুব হাস্যভাষে বলল, ‘তোমরা লোকের চোখ ফোটা বসে বসে। আমার ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আমি এখন আর এখানকার নেটিভ না। দস্তুরমত একজন ইয়াংকি। তোদের প্রবলেমকে আর নিজের প্রবলেম বলে ভাবি না।’ খুব কাষদা করে যোতন কথাগুলো বলল।

বললাম, ‘তুই অনেক পাগেট গৌছিস।’

‘দশটাক ভগবান ভুত ২০ মাই ডিমান কর, যোতন কোন ছাড়। একদিন বেকার ছিলাম, পবে সমোসী ছিলাম, এখন সাহেব বনেছি, একদিন হয়তো দেখবি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পনে মর্ষিক ভব। হয় বেকার, না হয় ভববধুরে সমোসী। আসল কথাটা কি জানিস ভোল পাগেট গোল্ট মাসে মাঝে নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। শব্দ বে নিজেকে তা না সপে সপে আশে-পাশের সবাইকে। এই দ্যাখ না, এ বাড়িটা আমার এক জ্যাততুতো বোনের স্বশর-বাড়ি। আমার যে কোন বোন ছিল, আগে জানতামই না। হঠাৎ মাট ফুড়ে কোন গাছের উঠল। কী তোমার মাইরি। যেন রাজা জাই এসেছে। ফাঁকতালে থাকা-

অকারণে অকারণে ‘সেই ফেল’। কল যোতন আমার সেই কিকট হাসি শব্দ করতে বাজিল।

ওকে থমক দিয়ে বললাম, ‘তুই এখনও আউট অ্যান্ড আউট কুটে বাঙালী হয়ে গেছিস যোতন, বেখানে হাত পাড়াছিল, সেখানেই থুখ ফেলেছিস।’

যোতন একটুও দমল না। গলা ছেড়ে সমানে চেঁচাতে লাগল, ‘বাঙালী বলে না, সব জাতের দস্তুরই জাই। ওখানে আমার বাড়ির ঠিক পাশেই একটা মাতাল থাকে। লোকটা রোজ আমার কাছ থেকে মদ চেয়ে নেবে, আর নেশা চড়লে আমাকেই ডার্ট নিগার বলে গালাগাল দেবে। একদিন ব্যাটাকে অ্যাইস খোলাই দিলাম, যে নাক ফেটে গল গল করে সে কী রক্ত! ওদেশের লোকদের রক্ত কী লাল মাইবি! আমাদের মত ফিকে ফিকে রং না।’

খাঁড় দিকে নজর বেতেই লাফিয়ে উঠলাম। বারোটা বাজতে চলল, অখচ নাওয়া খাওয়া হয় নি। যোতন বলল, ‘কী হলো, চিড়িং বিড়িং করে লাফাছিস কেন?’ বললাম, ‘নাওয়া খাওয়া হয় নি এখনও।’

‘খাই খাই করেই মরলি তোরা।’

বললাম, ‘বিকলে কিছু ঠিক বাস। তোর জন্যে অপেক্ষা করবো।’

‘আব।’ বলে যোতন আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্যাক্সি বাজিল, চিংকার করে ডাকল, ট্যাক্সিতে উঠে বসে যোতন আমাকেও ডেকে তুলল, তারপর ড্রাইভারকে বলল, ‘ডালহাউসী। জলদি।’

আমি আশীর্ষ জানাতে বাজিলাম, হাতের ইসারায় আমাকে খামিয়ে দিয়ে যোতন বলল, ‘চেঁচাস নি গাঁক গাঁক করে, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা।’

যোতনের কথা শুনে আমি থ। বললাম, ‘বাড়ি মান?’

যোতন গম্ভীর মুখে বলল, ‘মানটা খবে সহজ ভায়া। আমাকে রিকার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ছেড়ে দিয়ে তুই সোজা বাড়ি চলে যা। তোদের ঠিকানাটা দিলে বা, বিকেলে যাব। নে, ভাড়াভাড়ি কর। এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস, যেন শিশু, এইমাত্র ছিম্ভট হল বে।’ বলে যোতন আমাব চিবকে নেড়ে দিতে দিতে হঠাৎ অট-হাসিতে নুয়ে পড়ল।

আমাব বিয়ম লাগ হয়ে গেল, ‘তুই আগের মতই ফাজিল আছিস।’

হাসতে হাসতে যোতনের দর বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনমতে এক ফাকে বলল, ‘আর তুই ঠিক আগের মত, গাধা—’ যোতনের হাসি আরও জোরে শব্দ হল। ড্রাইভার পরম্ভ একবার পেছন ফিরে তাকাল। যোতন কোনদিকে লুক্কপ নেই, সমানেই হাসতে লাগল। যোতনকে দেখতে দেখতে এক সময় আমারও দারুন হাসি পেয়ে গেল। আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগলাম। রাজত্ববনের পাশ দিয়ে গাড়ি তখন ডাল-হৌসীর দিকে চলেছে। আর একটু পরেই রিকার্ভ ব্যাঙ্ক পেঁছে যাব। আমার মনে

হতে লাগল, এই মূহুর্তে খুব-খাফি টারার কেটে যাব, কিংবা হঠাৎ কোন কারণে গাড়িটা বন্ধ হয়ে যাব, আমাদের শিশিহেত অনেক সেরী হয়ে যাবে। আর এই অবসরে আমিও যোতনের সঙ্গে প্রায়ক্ষরে হেসে নিতে পারবো। আমার মনে ছাঁকিল, আমি যেন কত বছর হাসতে পারি নি। না হেসে হেসে আমার বুকে কী অসম্ভব ভারী হয়ে গিয়েছিল।

রিকার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে যোতন নেমে পড়ল। যোতন তখনও একটু একটু হাসছিল। যোতন বেশ ফর্সা। হাসতে হাসতে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। যোতন আমাকে হাত নেড়ে বলল, ‘এখন যাও, গুলে গুলে ফুলেব মাশুল লাও গে। আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওঠাই তোমর ভুল হয়েছিল।’ বলে যোতন আমার নতুন করে হাসতে লাগল।

বাড়ি ফিরেও হাসির রেশটা রয়ে গেল। মা বলল, ‘কী রে, কোথায় গিয়েছিল? তোদের ম্যানেজারের মেয়েটি বসে থেকে থেকে চলে গেল। কী চমৎকার দেখতে বে মেয়েটি। সুপ্রিয়ার চেয়েও সুন্দরী। তবে সুপ্রিয়ার মত অত অমায়িক না, একটু দেমাকী বলে মনে হল।’

কী রকম সন্তোহ হল, জিজ্ঞেস করলাম, ‘সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া করছো কেন? ও কি ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করে নাকি?’

মা যেন আকাশ থেকে পড়ল, ‘আসবে না। মানুষের বাড়ি মানুষ আসে না। মাঝে মাঝে দাপব ছোট ছেলেটার জন্যে এটা-ওটা নিরেও আসে।’

মার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, ‘তোমরা তা-ই হাত পেতে নাও?’

মা ভীষণ অবাক হয়ে বলল, ‘নেবো না? কেউ ভালবেসে কিছু দিলে ফিরিয়ে দেব। তুই কী হবে যাচ্ছিস বে দিনকে-দিন।’ মা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন সত্যি সত্যি আমি কী হয়ে গেছি।

আব কথা না বাড়িয়ে বললাম, ‘ম্যানেজারের মেয়ে কী বলে গেল।’

মা বিরস মুখে বলল, ‘বলল বিকেলে নাকি আবার আসবে, এত করে বসতে বললাম, কিছুতেই বসলো না। অখচ সুপ্রিয়া যেখানে-সেখানে বসে পড়ে। রান্না-খন্ডে বউদি রাধছে কি তরকারি কুটেছে, গিয়ে বসে পড়ল। সেদিন তো জোর করে পাঁচ তরকারি দিয়ে একটা ঘণ্টা রাধিলো, খেয়ে দাদা কী মুখ! দাদাও মেয়েটিকে খুব ভালবাসে কিনা।’

বিস্মিত হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সুপ্রিয়া যে এত ধরুধর জানা ছিল না। ও বে এই পরিবারের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে বিস্তার করে নিচ্ছে, এর মধ্যে একটা চাপা স্বার্থের গন্ধ ছাড়া আমি অন্য কোন গন্ধই পেলাম না। আমি যাতে ওর কথার অকাষ হতে না পারি, জুতোয় মত আকীবন ওর সাথে সাথে চলি, সুপ্রিয়া সেটা পাকাপাকি করে নিতে চায়। আমি হুপ করে আছি দেখে মা মূর্তাক হেসে বলল, ‘বরস কম হয় নি আমার। হুলও অমনি অমনি পাকে নি। মানুষ

১৪. বালিকা চার্টার্ড স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২



আমার দিকে পাশ ফিরে শুন। মার একটা হাত এসে আমার বুক পড়ছে। মার হাতটা অসম্ভব ভারী বলে মনে হতে লাগল। মনে হল, মাকে জাগিয়ে তুলি। খাঁল, তোমার হাতটা সবও মা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু সেকথা বলা খুব অন্যায় হবে। মা ভয় পাবে। ভয় পেয়ে নানা কথা ভাববে। ভাববে, বাইরে থেকে থেকে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। না হলে আমার বুক হাত বেখে শোয়া মার পক্ষে নতুন না। আগে আমার দম বন্ধ হয় নি কোনদিন।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। আজ দুপুরে ঘুমোতে পাবলে ভাল হতো। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না, নাক মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাগটা গিয়ে পড়ল নিজের ওপর। আমি যদি দুর্বল না হতাম, অস্তত মাকে একটা বিঘাট পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম। সুপ্রিয়ার ব্যাপারে মার দুর্বলতাকে আমি একটা বিঘাট পতন বলে মনে করি।

শূন্যে শূন্যে ঠিক সময়ের আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছিল না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় একটা অন্ধকার অন্ধকার মতন ভাব। অচ্য উঠে যে ঘাড় দেখে, তাও ইচ্ছে করা ছিল না। মার ঘুম ভেঙে যাবে। হঠাৎ মা খুম ভেঙে খড়মড় করে উঠে বসল। বলল ইস, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঐ মেঘটি তো বলে গেছে বিকেলে আসবে। বসাবার মত ঘব তো এই একটিই। কখন না কখন এসে পড়বে। তুই-ও ওঠ ঘবটা পরিষ্কার করে ফেলি।

ঘর পরিষ্কার করতে হবে না। ওখা জানে যে আমরা গরীব শ্রেণীর মানুষ। ঘোতনও আসবে। ও যদিও বাইরে খুব সাহেব-সাহেব ভাব দেখাত চুট্টা ববছে, এতো জানে না, আমি ওকে কত ভাল করে চিনি। ও ঠিক আগের মতই আছে। অন্যথ্য এত হাসতে পারে মনে হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মা ঘোতনের কথা খুব অন্যমনস্কভাবে শুনছিল। মার এটা একটা প্রকাণ্ড দোষ। নিজেকেই মানুষ ছাড়া অপমান ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। মা উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। এককলক বোদ এসে ঘবে

ঢুকল। মা বলল, চারটে বেজে গেল, এবারে ওঠ, ওরা হয়তো এসে পড়বে। বিরক্ত হয়ে বললাম, আসে আসুক। আমি শুয়ে থাকবো।

মা আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলািয়ে দিতে দিতে বলল, আজকাল সব কথায় এত রাগ করিস কেন রে। আগে তোব মেজাজ কত ভাল ছিল। আজকাল একটুকুতেই বিবর্ত হোস, ধৈর্য হারিয়ে ফেলিস। কী হয়েছে তোর?

উল্টোদিকে পাশ ফিরে শূন্যে শূন্যে বললাম, কিছুই হয় নি। শূন্যে রায়ে ভাল ঘুম হয় নি বলে ঘুম পাচ্ছে।

মা কথা বলল না। যেমন মাথায় হাত বুলাচ্ছিল, সে ভাবেই হাত বুলাতে লাগল। মা ই যে শূন্য আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে তা না, আমি নিজেও একটা বিঘাট পরিবর্তন অনুভব করছিলাম। প্রচণ্ড বিরোধ যেন আমার মধ্যে মাথা উঁচু করতে শুরু করেছে। কার বিবৃদ্ধি বিরুদ্ধে জানি না। হৃদয় জগৎশূন্য সবার বিরুদ্ধে। কিম্বা বাইবেল কারও বিরুদ্ধে না, শূন্যমাত্র নিজেরই বিরুদ্ধে। মানুষ যখন পরাজিত হতে থাকে, তখন সে সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয় নিজের ওপর। কতগুলো গুপ্ত নখ আর হিংস্র দাঁত দিয়ে সে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে চায়। আর যত ভেতরে ভেতরে বজ্র হতে থাকে, তত বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে সে। তখন সব কিছু ভুলে গিয়ে মরণ খেলায় মেতে ওঠে সেই বিক্ষুব্ধ মানুষ। ধ্বংসের মন্ত্র তাব তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঞ্ঝার তোল। আমি নিজের মধ্যে সেই বিক্ষুব্ধ মানুষকে আবিষ্কার করলাম। কবে শিউবে উঠলাম। নিজেকে এভাবে কোনদিন দেখিনি। দেখবো বলে ভাবি নি।

আমি নিজেকে একজন পরাজিত মানুষ বলে ভাবতে লাগলাম।

কতক্ষণ এভাবে শূন্যেছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজায় শব্দ উঠল। মা উঠতে উঠতে বলল 'সেই কখন থেকে বলাছি ওঠ, ওরা এসে পড়বে। এখন কী করবি?'

শান্ত গলায় বললাম, দরজা খুলে দাও, আমি আর একটু শুয়ে থাকবো।

তোদের ম্যানেজারের মেয়েও তো হতে পারে।

হাক তুমি দরজা খুলে দাও।

দরজা খুলে দিতেই ঘবে ঢুকল ঘোতন। ঘোতনের স্বভাব চীৎকার করে কথা বলা। ও সে ভাবেই বলল ইস, ঘবটাকে যে একেবারে অন্ধকার করে রেখেছিস রে। আলো থেকে এসে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ম' আলো জানালতেই ঘোতন মাকে দেখতে পেল। মাকে প্রণাম করতে গেল ঘোতন। মা সবে গিয়ে বলল, 'থাক সুখে থাকো।' আমি জানি, মা যদি মনে মনে কারও ওপর বিবর্ত হয়, তাব প্রণাম নেয় না। তাব বিবর্তের কারণ বন্ধ হতে পাবলাম। ঘোতন ও মাকে অবহেলা করছে মা মাঝে মাঝে একমাত্র ছেলে হয়েও কাছে ছিল না, এটা মার কাছে বিঘাট একটা অপরাধ।

"ঘোতন খাটের এক কোমর বসে পড়ে বলল, 'তোরা যে কী ঘুমোতে পারিস। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা কাজ সাব্যস্ত হয়ে গেল, আর ও দেশের মানুষ না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত এগিয়ে গেল।'

মা নীচস গলায় বলল, 'গরমের দেশের মানুষেরা একটু বেশী ঘুমোয়।'

ঘোতন মার সঙ্গে তর্ক জড়িয়ে দিল, 'আমেরিকার একটা দিক বেশ গরম মাসীয়া। সেখানকার লোকেরাও খুব কম ঘুমোয়। দিনের বেলায় ঘুমের কথা ওরা ভাবতেই পারে না।'

বারে টেনে কবে না ঘুমিয়ে এলে, ওদেশ দেশের মানুষও দিনের কোলাহল ঘুমোয়।' মা এমনভাবে বলল, যেন ওখানকার মানুষ সম্বন্ধে মার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু কম না।

ঘোতন হঠাৎ খুব শান্ত ছেলের মত হাব স্বীকার করে নিল। বলল, 'রায়ে না ঘুমোলে আঁবাশ্য দিনে ঘুমোনোটা অন্যায় না। তুই কি এখন ঘুমাবি? আমি তাহলে আর একদিন আসবো।' বলে ঘোতন উঠতে যাচ্ছিল ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার ওপর। আমার সঙ্গে সঙ্গে মা আর ঘোতনও সেইদিকে তাকাল।

দরজা ওপাঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করছে লীলাবতী।

উঠে দাঁড়িয়ে লীলাবতীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে এনে বসলাম। মা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ওর সাংগ কথা বলি। তা ছাড়া, ঘোতনও যথেষ্ট।' মা লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল 'ও আমার ছেলের বন্ধু। অনেকদিন ধরে আমেরিকায় রয়েছে। দিন কয়েক হল এসেছে, আবার চলে যাবে।' মা যেন হাতেব সামনে ঘোতনকে পেয়ে বোঁচ গল। অথচ কিছুক্ষণ আগে মা ঘোতনের সঙ্গে কীবকম বীজী ব্যবহার করছিল। মনে মনে সংকল্প করে ফেললাম, একাধি পাটনায় গিয়ে আর দেবী না। যত ভাড়াভাড়ি হয় বাড়ি ঠিক করার মাকে নিয়ে যাব। এখানে থাকলে মার যে কী দশা হবে কে জানে। যার তাব কাছ নিজেই বড় করতে গিয়ে যে কী ছোট হয়ে যাচ্ছে মা। মার বিচারবুদ্ধি কী করে যে লোপ পেয়ে গেল।

আমি উঠছি না দেখে মা আমার বলল, 'যা তোব মামীকে খবরটা দিয়ে আর।'

মার দিকে তাকিয়ে বললাম 'মামীমা ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে জাগিয়ে কী হবে। তারচেয়ে আমরা সবাই গল্প করি। তুমি বাস।'

মা শেষ পর্যন্ত আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। হাত দিয়ে এলোমেলো চুল পিছনে সবাতো সবাতো লীলাবতীকে বললাম, 'দুপুরে ঘুমিয়েছিলেন তো।'

লীলাবতী হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'দিনে আমার ঘুম হয় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম, কতক্ষণ রোদ একটু পড়ে আসবে।' লীলাবতী আমার দিকে তাকিয়ে মিশ্র করে হাসল।



আশ্রি গুরুদেব এসব কথা জাবাছলাম।  
বড়মামীমা যেতেন আন লীলাবতীর সঙ্গে  
স্বাধা বলে লাচ্ছিলেন। সম্ভবত পাববাবের  
নথো এই মানুস'টকেই আমার খুঁজ  
পাডালিক আর সবল প্রকৃতির মানুস বলে  
নলে হয়। মানুস পারিপার্শ্বিকতার দাস।  
একথা হয়তো সম্পর্কিতান সম্পর্কিত  
এরা যায় না। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকতাই  
যেভাবে সবটা যে না। বড়মামীমা ত বই  
একটি উচ্চল দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্য নিয়ে  
হা-হুতাশ কিংবা অর্থ থাকারটা যে

মা ঘর/ছড় বইয়ে যাবা আগেই ঘর  
 চুকলেন, লড়ানো। পেছনে সুপ্রিয়া। শঠাণ  
 নাজ'র যি কিম্বদন্তিও তসে পড়ানাম।  
 অমনি পবনা একটা ১০ জ, আনা ও বসন্ত।  
 হুঁত। নিমেষের তলা মনে নদা মনে পড়ে  
 মল। মা লাবন্য আশ'ক হাত মনে সুখ্যা  
 হুঁত হুঁত লল'ছিল। হাত মনে মনে হুঁত

১৭। অশীষবতী আর ঘোড়ন একসঙ্গে হাত  
 ধুলা গম্ভীর করল। উচিত ছিল সুপ্রিয়ায়ার  
 সখ্যও ওদের পরিচয় কবিয়ে দেওয়া, কিন্তু  
 'না' কোন সময় মানুষ উচিত কাজ কবড়ে  
 ভাল হয়। সুপ্রিয়ায় সখ্যও ওদের পরিচয়  
 বয় দেওয়া ব'ল্যও আমায় পাশে ভেতরের  
 ওয়াব হাণ্ডি বোলাই ছিল। মনে হাটছিল  
 এত মনে হে' খুব করে ঠান্ডা জল দিয়ে  
 ম'খ চেখ না ধু'লে অমাব অম্বাভিত  
 নড়তে থাকে। তাড়াহুড়ি চললে এলায়  
 সবসময় মনে হ'লে একটা শাও দিখিলে  
 মাঝে 'পাঠেব সখ্যে' লেগে লেগে ব'ল্য  
 প'হে চলল এল। এককক্ষ 'দোড়ই' বাধে  
 'দ' চ'ক' গলগল। কলব সামনে কিছুক্ষণ  
 দ'খ্য ব'লল। আশা দিখ হ'ল  
 'দ'জ'ক' দেখার একটু ব'সে। খুব হ'ল  
 হ'য় হ'ল। 'ক'ই এইসকল বাধারই  
 পা'ক' না। থাকল ক'ই না। ক'মল

প্রকাশ ভবন : ১৫, বাংলা চার্টার্ড পীঠ, কলিকাতা ১২

# প্রদর্শনী

## আর্ট কলেজ প্রদর্শনী

সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বর্তমান সমালোচক বরাবরই সাম্প্রতিক বাংলার পশ্চিমবাংলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মৈনাদেশের জন্য কলাশিক্ষা পদ্ধতিকে দায়ী না করে থাকতে পারেন নি। কলকাতার গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্টের ছাত্রদের ১৯৭২ সালের বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখে আমার মনে হল, আগাদের কলাশিক্ষা বালুস্রাব গোড়ার গলদ রয়েছে।

পুরোন ধরনের কলাশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিল্পী তৈরী করা। কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে যে শিল্পী তৈরী করা যায় না, শিল্পী হয়। এই জ্ঞান থেকে পাঠ্যবই বাউচাউস আন্দোলনের প্রবক্তা বললেন, কলা শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য হবে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে কারুকলায় তৈরী করা: যে কারিগররা কারুকৌশল আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিখবে তাদের মনকে সক্রিয় করতে এবং জ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তৃত করতে। হাতে কলমে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের এবং মননের ফলকে যিনি মেলানো পারবেন তিনি শিল্পী হয়ে শিল্পসৃষ্টি করবেন। আর যে আধিকাংশ সংখ্যক শিক্ষার্থী সমাজে সাধন সক্ষম হবেন না তারা অন্তত ভাল কারিগর হয়ে সমাজে নিতান্ত নতুন রুচিসম্মত ভোগাপণা দিয়ে ভূক্ত করবেন। কারো শিক্ষা বার্থ হবে না, কোন ব্যয়ই অহতুক হবে না। পুরোন ধরনের শিল্পীসৃষ্টি মূলক কলাশিক্ষায় সামাজিক ধনের অপচয় ঘটে। শিল্পী একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী হয় কিনা সন্দেহ, অথচ নিরানবই জনৈক শিক্ষার জন্য বাস্তব ও সামাজিক ধন ব্যয় হত। আর শিক্ষার্থী নম্বই জনের জীবিকাভানের ক্ষেত্রে লক্ষ শিক্ষার কোন প্রয়োগ ঘটেনা। এমন শিক্ষার প্রয়োজন কি?

যে কলাশিক্ষায় কারিগরি জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার উপর জোর নেই, যে কলাশিক্ষায় মননের গভীরতা ও জ্ঞানের পরিধি বড়ানোর ব্যবস্থা নেই, যে কলাশিক্ষা শূন্যমাত্র 'কেমন করে করতে হয়' শেখায়—কেন করা হয়' শেখায়না, যে কলাশিক্ষা গুরুমুখী ভাষায় অনুকরণ করতে শেখায় সেই কলাশিক্ষায় শিক্ষিত হয় সত্যিকারের মননশীল উদ্ভাবক শিল্পী হওয়া শক্ত। বউ চাউস প্রতিষ্ঠান নতুন ধরনের কারিগরি শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে পুরোন ধরনের কারিগরি শিক্ষার

মতন শূন্য 'কেমন করে করতে হয়' শেখায় না, কেন করা হয়'ও শেখায়। এই 'কেন করা হয়'এর জ্ঞান থেকেই শিল্পী জন্মায়।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ কলাশিক্ষায়তনেই এই পুরোন পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান ঘটে থাকে; এই পুরোন পদ্ধতিতেই ছাত্ররা গুরুমুখী ভাষায় 'মডার্ন আর্ট' করে থাকেন। সম্প্রতিকালে কলকাতার মহারাজ সমাজীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং বিশ্বভারতীর কলাভবনে এই পুরোন পদ্ধতির কলাশিক্ষা পরিচালনা করে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন কলাবিদ্যা শিক্ষায়তন—কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এখনও কিন্তু রক্ষণশীলের মতন পুরোন শিক্ষা পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে। তারই প্রকাশ দেখা যায় এই কলেজের ছাত্রদের বাৎসরিক প্রদর্শনী-গুলিতে।

চারু ও কারুকলার শিক্ষার্থীদের কছ থেকে কেউ পরিণত শিল্পকর্ম প্রত্যাশা করেন না। যা করেন হাতল মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা এবং খানিকটা কারিগরী দক্ষতা ও শিল্পের ভাষায় স্বকীয় বক্তব্য পেশ করার প্রচেষ্টা এবং খানিকটা সাজ সজীবতা। এর কোনটি সম্পর্কে অবহিত সাধারণ ভাবে এই প্রদর্শনীর প্রদর্শিত কাজগুলিতে দেখা গেল না। তার দায়ভাগ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নয়।

হেলরঙের ছবির বিভাগটি আমাদের হতাশ করেছে। শূন্য যে ভাল প্রতিভা বা ভাল নিসর্গচিত্রের অভাবেই বিভাগটি হতাশা-বাজক তা নয়। বর্ণপ্রলেপন, বর্ণবিন্যাস, রূপাংশ বিন্যাস, বহির্জাগতিক দৃশ্যবস্তুর শৈলীকরণ, উদ্দেশ্যমূলক শৈলীকরণ ইত্যাদি হেলর গুণাগুণের সমাহারে ছবি ছবি হয়েছে ওঠে, ভাস্কর্য শিল্প হয়, তাৎসব্ধ সচেতনতা এবং দক্ষতা অধিকাংশ কাজে অনুপস্থিত। এর উপর আছে শিক্ষকদের কাজের অর্থাত্তিক প্রভাব। অনেক সময়ে মনে হয় শিক্ষক মশাইরা তাদের নিজস্ব রীতিপদ্ধতি ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এরই মধ্যে নীলকমল সিংহ বর্ণপ্রলেপন ও রূপাংশ বিন্যাস, রামলাল ধরের আলো-ছায়া ব্যবহার ও নকলসত্তন ক্ষমতা এবং রীতা খান্নার বিন্যাস জ্ঞান আমাদের আকৃষ্ট করে। জলরঙের কাজ বিভাগটি দুর্বলতর। এ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ দাশের রঙের ব্যবহার, সূচরিত বসুর

বিন্যাসক্ষমতা এবং দেবশীষ বসুর আলো-ছায়ার ব্যবহার কর্মকণ্ড উল্লেখযোগ্য।

তুলনায় তথাকথিত ভারতীয় রীতিতে 'শিক্ষিত কাজের বিভাগটি সমৃদ্ধ'। এ বিভাগে বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন কাজের দেখা পাওয়া গেল। এ বিভাগে ছুর-কাপ্তি দাশ, পার্থসারথী ঘোষ এবং ধর্মপাল তাঁদের কাজে বহিঃস্বাভাবিক দৃশ্যবস্তুর শৈলীকরণ, বর্ণপ্রলেপন, বর্ণাঙ্কিত সংঘটন এবং বিন্যাসে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বলা বাহুল্য, সব কাজটি কাজই জলরঙে বা জলরঙ টেম্পেরায় করা। এ বিভাগে সবাই দশ-মহাবিদ্যা দেবী মহাশয় কলনাকারী কোন একটি শাস্ত্র-ভিত্তিক শাস্ত্রের বর্ণনাকে ভিত্তি করে কাজ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, কোন একটি ভাবনার ভিত্তিতে যদি কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা বা ধ্যান থেকে তাহলে তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের কাজ সহজে স্ফূর্তি পায়।

ভাস্কর্য বিভাগটি দুর্বলতম এবং এ বিভাগে কাজের সংখ্যাও বেশ কম। এ বিভাগে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ দেখা গেল। সেটি বিপন জৈন নির্মিত একটি প্লাস্টারের প্রতিকৃতি।

ভিত্তিচিহ্ন বা মারাল বিভাগটি প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এ বিভাগে বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত বেশ কয়েকটি কাজে মাধ্যম মনস্কতা, শৈলীকরণ, বর্ণপ্রলেপন সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতার প্রকাশ ও খানিকটা দক্ষতা দেখা গেল। তবে মোজাইক টাইল সহযোগে যারা কাজ করেছেন তাদের টাইল সংস্থাপনের সঙ্গে রূপাংশের সম্বন্ধ, টাইল বিন্যাসের সঙ্গে সমগ্র রচনার ছন্দে সম্পর্কে আরও অনেক বেশী সজ্ঞা হওয়া প্রয়োজন। এই বিভাগেও তথা প্রদর্শনীর সবশ্রেষ্ঠ কাজ নির্মলেশ দাশগুপ্তের টেম্পেরায় রচিত 'ভিত্তিচিহ্ন' রঙের বিন্যাসে, বর্ণপ্রলেপের ছন্দে অপরূপ। তা ছাড়া সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে ভাল কাজ করেছেন সুহৃদ তরফদার, মোজাইক দিয়ে দেবশীষ ভট্টাচার্য ও জ্যোৎস্না অরোরা এবং টেম্পেরায় সজল দে।

কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক শিল্প বিভাগটি একদা সর্বভারতীয় খ্যাতির শীর্ষে ছিল। আর বৃষ্টি সে পুরাতন খ্যাতিতে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সেই লুপ্ত গৌরবকে ফিরে পেতে হলে প্রেসের কাজ, বিশেষ করে কলিখনের কাজ, আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিষ্কৃতির কাজ ও কোলাজের কাজ শেখানোর দিক নতুন দিকেই হবে। ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক জ্যামিতি ও নকশা সংগঠনের নিয়মাবলী আয়ত্ত করতে হবে, নতুন উপায় নাই। কারুকলা বিভাগটির কাজগুলিতে নতুন কিছুই পরিণীকৃত হলনা : সবই গতানুগতিক।

—প্রবন্ধজন রায়

# ভেড়ার নাম দক্ষিণা



নুন ঘোষ

সাঁকা পা। হয়ে গেলে ওপাবে সেই  
মাঠ। মাঠের মাঝে এক মেঘপালক ভাগে  
আছে। সঙ্গে তার ডেড়ার পাল। ওরা মেন  
কেমন করে জানতে পারবে। বৃষ্টি ঘাসের গন্ধ  
বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সেই গন্ধ ও গ  
মাগে টেব পোষ। গলে বাতাস ভাগে  
ভাগে ভেঙে মাঠের পব মাঠ পর্বতমা ব ব  
যায়। পালের মেঘা যে-ভড়া সে ভ  
দলেব আছে আছে। মাটি ওপব খেবে মাস  
ছিড়ে নিতে নিতে এগিয়ে যায়। আর  
মাঝে মাঝে আকাশের ওপব মন  
খোসাবাতাস মাগের মনো পেড়ে নেয়। এখন  
তার গতি দেখা করে মেঘপালক ডাক ছেড়ে  
হবে কব। হুউ উউ হরুর বব  
সেই অধলাজী। এই ডাক কেমন করে  
যেন চিনে ফেলেছে। ওরা খাঁসে ধীরে  
আগে যায় মৌদিক। আর দিনের বেলা

যখন গাছে-পালার রোদ খেলাছিল, মাঠে  
ঘাটে মানুষজন ছিল সেই আলোয় আলোর  
এসব দেখে এসেছে।

কিন্তু এই বাঁওববেল, পথে ধেরুতে  
কেমন যেন গা ছম ছম কব ছে। দিনে  
বেলা মাথা ওপব সূর্যামা মাগে মাগে  
থাকে। ওপব কোনো ভরতব করে না তখন।  
মাঝে-মাঝে মাঝে বাঁওববেল-মাঝে আর  
আজুব খেলা হল ছড়া কাটতে কাটতে  
লগে গগমায় আমি লালশাড়ি কিন  
দেখা-মাঝে-। সেই সূর্যঠাকুর এই বাঁওব-  
বেলা এখন আর মাথা ওপব নেই। কেমন  
একটা চাপা ভয় যেন সেই কবলই চার  
দিক ছাড়িয়ে বসেছে।

মাঝে ডাকে, আজুব?  
ক।

তার ভয় কব  
না।

তা হোক। দড়া। মেসে বগে ভুই  
রাঁওববেল। তাক এমন কবে যেতে নেই।  
তার বাঁওববেল দে, কবড়ে দিই।  
আবপব মন, মাঝে ফিসফিস করে  
বল ম জানিস। মেসে বাঁওববেল মা-  
কালী হাথ বাঁতে। তাই।

আজুব বলল জাঁক জানিস তুই।  
মা আমায় জাঁক দিহো। মেসে। মেসে  
এলোচলে মেসে ও ববতু মেট। মেসে  
মেসে, তুলে আমি গিট দিহো।

ওপব মাঝে আজুবের জমাই তাঁরী  
দুখ মনে। আজুবকে কাক ডেক নিশ  
কব আমি আমায় হাত ধরে চ দিকনি  
তুই। আজুব ওর হাতটা ধরে পিছ পিছ  
হাট।

কেমন অশকার? না?

হুঁ।

কুয়া সরু একটা আলের মাথায় উঠে এসেছে। পায়ে তলার দলে আছে কিছ ঘাস।

বাত গভীর হলে কে যে বাশী বাজায়? গভীর বাতে অশকার যেন কাউ-কাউ করে। ঘরের বাইরে, পুকুর পাড়ে বনে-মাঠে-আকাশে সর্বত্র সেই সব ছড়িয়ে থাকে। সেই সব বড় চেনা মনে হচ্ছিল। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে সেই সব। বহুদূর। সে যে কতদূর থেকে ভেসে আসছে। মালু বহুদূর মনে হলো। যেন সেই মেমপালক তুমনি করে ডাক দিয়ে আছে—হুঁ-হুঁ-ব-ব-ব হুঁ-উ-উ-উ—

মালু তার কানের মধ্যে থেকে মেমপালকের সেই ডাকটা পেড়ে এই আলের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা মিলিয়ে নিচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ঠিকই তো। সেই ডাক। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

আঙুরের তখন হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে।

ওমা! কি ভালো মনেই আমার। তুই গরুড পেমাম কাঁচিস।

গরুড গা। ঠাকুর-লতাপাতা বা এ আঁধার—গরুড গা ঠাকুর পেমাম পেমাম পেমাম।—এই শীতলমুঠা ওবা তিন মাঝ উজ্জ্বল কবল। এসব কাজে আঙুরের ভাবি নিষ্ঠা। এত কোনো ফাঁক নেই তাই। তবু মালু যেন আঙুরের নিষ্ঠাও টেকা দিয়ে গেল।

বলল থাম আঙুর। হাত বুলে একটু অব লাম্প দই। আঙুর দাঁড়ালে মালু তখন নিজের মূখব লালো আঙুরের কবে ওব বপালে শুক ছুটাই দলে। আঙুরের এই সময় মনে পড়ল যে মার্গাপসী। কথা। মালুটোর বুদ্ধি আছে। বড় মানুষের মতন তাই মাথা খেল। ঠিক এমনি করে মতখব আর লাগায় মার্গাপসী সন্তে বার্তার গা শূন্য হয়। আঙুর ভাবি অস্বাভাবিক হুঁ হুঁ হুঁ প্রথমটা। কেন যে এমন কল পিসী। মতখব আর লাগলে কি হয় মার্গাপসী। মার্গাপসী বলাচল সার্তাবাবতন লতাস ঠাকুর দেব হাং নিম্নবত থাকে। মালুখব গাখি এ হুঁ স লাগলে সে বেড়াল হুঁয় যায়। মালুখব মও মাও করে মবে। মালুখব আর লাম্প এ থাপা লতাস আং গায় সাগ এ পাবে না। এখন বেড়াল হুঁয়ও মন্তে হয় না। বুদ্ধি হুঁয়ও। মার্গাপসী তাই নবম গাল আল'গ'ত ঠাকুর দমত খিল'খিল করে হুঁয় উঠেছিল। বলাচল দাঁড়া। এ বুদ্ধি একটু ছুঁইয়ে পড়ে।

মালু ঠিক মার্গাপসীর মতো করে তার কপালে বুদ্ধি আর পরিণত দিলে।

আঙুরের কি যে ভাল লাগে এই মালুকে।

এই ছেলের সঙ্গে খেলার কতো যে মজা। কতো যে কাণ্ড করতে পারে মালু। ওর তো ভয়ভয় নেই। আঙুর ওর ভাবি ভক্ত বলে, সে ভাবে, মালুর সঙ্গে ও সারা-জীবন এমনি কবে খেলে-খেলে কাটিয়ে দেবে। বড় হয়ে একসঙ্গে শহরে পড়তে যাবে। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবে—ওঃ! কি যে মজা হবে। মালুর যদি একটা ঘোড়া থাকত—বেশ হতো। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে মালু ঠিক ঝড়ের মতন মাঠ-ঘাট ভেঙে ছুটে বেড়াত। সেই ঘোড়ার পাছায় চাপড় মাবলেই সে পক্ষিরাজ হয়ে যেত। তখন ভয়ে সিঁটিয়ে মালুকে দূরত জড়িয়ে ধরে সে বাস থাকত সেই পক্ষিবাজের পিঠে।—কেন যে মালুর তেমন একটা ঘোড়া নেই।

আলপথ ছোড় খাবা আমবাগানের আবও অশকারে উঠ এলো। আঙুর দেখল আকাশ এবং তার চাবপাশে অশকারটা কেন কাম্পাচ্ছিল। কাক কাক জোনাক জলচ্ছিল। নিভাচ্ছিল। যেন এক কালকুটি গাছ খাবা খাবা হুঁদ হুঁদ ফুল ফুটেছে। আর সেই ফুল ফুটেছে বলেই অশকারটা যেন টিপ-টিপ করে কাম্পাচ্ছিল। বাগানের গাছ থেকে দু একটা পাতা খসে পড়ছে অশকার। খিঁখি আন কটকটে ব্যাঙ কচি ছেলে মতন কাঁদছে। পায়ের তলায় খসখস ভাঙছে শূকনের পাতা। আঙুর সেই গছ আগাছায় ভব আমবাগানের সব বাগান ওপর দাঁড়িয়ে অশকার কেন যেন একটা থম থমনি টেব পল। মালুর একটা হাত হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আঙুর বলল আমার ওস বলাচ্ছ মালু। যদি খাবা পড়ে যায়। যদি খাব ফল আমাদের?

উঃ। খবলেই হলো কিনা? কুয়া দিলে হ্যাঁ।

না ভাই। আমার ভয় কবছে—মালু—?

উঃ।

চ। ঘরে ফিরে যাই।

না। তুই যা। মালু হাতের ওপর থেকে আঙুরের হাতখানা এক ঝটকায় খসিয়ে দিয়ে বল মবতে তব এমনিচেন কেন আমার সঙ্গে কচি খুকী মাষক কোল খুকী থাক'হুঁ। হুঁ হুঁ হুঁ একা ফিরে যা।

কথাব যখন শুনেন আঙুরের রাগ হলো। আমি বুদ্ধি কচি খুকী মাষকের আঁচল ধরে পড় থাকবো। মালুটা এমন

গোয়ার। সে শব্দশব্দ তাকে কষ্ট দেয়। যেমন মূখ চলে মালুর, তেমন হাতও চলে ওর। রেগে গেলে চম্ভাল হয়ে যায়। মালু ওর পিঠে কিল মেয়ে-মেয়ে এখনি ওকে তক্তা বানাবে বলে আঙুর আর বেশি কিছু বলতে সাহস পেল না। শব্দ তাই বুলে-আসা ভারি গলার বললে, আমি বুদ্ধি তাই বলন?

মালু কিছু উত্তর করল না। সে আম বাগানের আগাছা-মোড়া সরুপথে অশকার কাটতে কাটতে হাঁটছিল। তাই দু-চোখ ভাসছে এক মেমপালক। বিবট একট ভেড়াব পাল নিয়ে এই মাঠের মধ্যে সর্বদা জেগে আছে যে মেমপালক। বাথ জাজব এক ডাক শুনেন মালুর মনে হয়েছে এই রাতেব আঁধারে, এই আমবাগানের গাছগাছ হাওয়া কালো কালো গাছে জোনাকের টিপটিপে আলোয় এবং মার্গাপসী—সর্বদা সেই মেমপালকের ডাক সাবাক্ষণ জেগে রয়েছে। মালুরও বুদ্ধির মধ্যেটা কেন টিপটিপ কবছিল। ভেড়াব পালের মধ্যে দুটো খালো কুকুর বসছে। কি মন্দ চোখো তাই। পালের চাবপাশে ঘুরে ঘুরে তাই। পাহারা দয়। মালু দিনের বেলা দেখে এসেছে সেই কুকুরদুটো লাল বচাং জিভ দিয়ে টপ টপ এবং কপ পড়ছে। হ্যাঁ-কবা মূখ ভাঁদব বড় বড় দাঁত। কুকুর দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চবন চোখে তাকাচ্ছে চাবদিকে। আর সেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে মন্তে একখানা লাল-জিভ বাব কব হ্যাঁ হ্যাঁ কবছে ঠাথ।

এসব কথা আঙুরের এখনো বলেন মালু। আঙুরটা য ভীতু।

খববা কুকুরদুটোব জন্য ভয় মালুরও কম নয়। তবে কুকুর বশ কববার মন্তে সে শিখে ফেলেছে। সেই মন্তে মালু আজ প্যান্ট দূর পকেট ভবে নিয়ে এসেছে। মালু জানে। জাজব পা টিপে পা-টিপে গেলেও, সেই ভেড়াব পালের মধ্যে ঢুকতে গেলেই কালো দাঁতাব মতো সেই কুকুর দুটো তাদের দিকে ভেড়ে আসবে। আসবেই। তখন মালুও চট করে পকেট হাত ঢুকিয়ে সেই মন্তে বার করে কুকুর দুটোব সামনে ছাড়িয়ে দেবে। কটক-কাকাদেব বাড়ি যে-টাইগাব আছে মালু, তাই ওপর ইঁতমাধ্য মন্তেটা পবখ করে দেখে নিয়োছে। সে দেখেছে তখন টাইগাব সেই মন্তে টুকবোগুলো নিঃশব্দে বাড়ি হুঁ কব মার্গাপসী থেকে খুঁটে খুঁটে মখে হুঁল'ছ।

মালু পকেটের ওপর হাত রেখে সেই মন্তেব মালু নিল। দু-পকেট ঠাসা আছে মন্তে। সুতরাং মালুর আর তেমন ভয় করছে না। আর ভয়ই বা কিসের? মালু



জাবে, মেঘপালক ভো আর মেলেধরা না। কিন্তু লোকটা যেন কি রকম। মালু দেখেছে, দিনের বেলা সেই গরমের মধ্যেও লোকটা গানের ওপর একটা ভুটকম্বল গুপিয়ে রেখেছিল। মৃদুময় দাড়ি। মাথার ওপর কাপড়ের মস্ত এক পাগড়ি বাঁধা। হাতে পাকা বাঁশের একটা লাঠি। আর লোকটার পায়ের কেমন এক ধরনের হাড়-মড়মড়ে-চিমসে-সে এক ধরনের জুতো। তখন জুতো মালু কখনও চোখে দেখেনি। আঙুরের বাকর সঙ্গে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে তখন কথা বলছিল লোকটা। মালু সেই লোকটার কথা কিছু বুঝতে পারেনি। কি যে ভাষা লোকটার! সে যে কেন উর্দু-ভাষায় কথা বলছে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। মালু লোকটার মৃদুময় ওপর নজর আটকে রেখেও একবর্ণ বুঝতে পারেনি। সে কেবল দেখেছে, কথা বলবার সময় লোকটার কব বেয়ে দু-পাশে ফেনা গাড়িয়ে নাবছে। কি যে নোংরা লোকটা! যেন সাতজন্মো জল ছৌয়নি কখনো! মালুর কেমন গা-দুলিয়ে তখন ওক্ উঠ আসছিল।

মালু সেই সময় আরও তাকজব হয়ে দেখেছে, কি আজব কাণ্ড, কাকীমার কন্যা একটা মেয়েমানুষ সে আলের ওপর বসে বসে তামাক টানছে।

মেয়েমানুষ আবার তামাক খায় নাকি। ভারি মজা পেয়েছিল মালু।

সে তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা অনেক-কাল ধরে দেখেছিল।

পরে জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞাস্য করে মালু জানেছে, মেয়েমানুষটা মেঘপালকের বউ। মালু এই কথাটা বলবার জন্যে চাপা গলায় থাকলে—আঙুরে?

আঙুর ভাবছিল অন্য কথা। সে নতুন নাক বিধিধরেছে। নাকের ওপর একটা হলুদ-ছাপানো-সুতো বাঁধা। আর সেই কারণে ছোট্ট একটা গ্যাস বেরিয়েছে নাকে। ভেতর থেকে ঘা-এর রসটা মরে আসছিল বসে জায়গাটা কেমন সুড়সুড় করছিল। আঙুর ওই নাকের ওপরকার সেই হলুদ সুতোটা মাঝে মাঝেই নাড়াচাড়া করছিল। আর ভাব-ভাল তার মার কথা। সে বড় হয়ে গেছে। মা তাকে কতো গালমন্দ করে। খিৎগা মেয়েমানুষ তোর খেলা নেই লা, এখনো আঁধা-বাকের ঘরে বেড়ানো! ঘরের কুটোটা ভাগলেও যে আমার উপকার হয়—সেসব চিন্তা আছে মাগীর! করবি—মরাবি, আর দুদিন বাদে যখন পরের ঘরে যাব তখন বুঝবি। খাড়াই হয়ে এই ঘরে বেড়ানো তখন ঘেরিয়ে বাবে।

আঙুরের ভারি বন্ধই গেছে পরের ঘরে বসে। তার যেন বড় দার পড়ে গেছে। পরের ঘরে কোন দখে সে মরতে যাবে। বসে গেছে তার। আঙুর মার মধেব ওপর কলা দাঁখিরে খিলখিল করে পাগিয়ে বার।



মা বর্টি পেড়ে বসে আনাজ কুটতে কুটতে তখনও সমানে কতো কি যে বণে যায় তাকে! সেসব খবর কি বাখে মালু?

আঙুর, পিসাবি ডুরে শাড়িখানা একদিন পরেছিল। শাড়ি পরলে তাকে যে কতো বড় মগায! সে আখনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাবপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে সে খাঁষ দেখেনি সেদিন? কতক্ষণ ধরে দেখেছে। অগত মালুটা যেন কি!

মালু হাত বাড়িয়ে আঙুরের একটা হাত টেনে নেয়,—আঙুর কথা ক?

কি কথা কইবে আঙুর, সে মালুর মৃদুময় ওপর আত্মকারে শূন্য চোখ ভাসিয়ে রাখে।

মালু আর আঙুর তখন খালের বাঁধে উঠে এসেছে। দক্ষিণ থেকে একটা নরম বাতাস টানছে ফরফর করে। খালের জলে তাবা মৃটে আছে। আর বাঁধের ওপরে সারি সারি খেজুরের বনে, বাবলার মোপেব ভেতরে অন্ধকার ঢেপে রয়েছে। এই অন্ধকারটা চোপ সটায় নিয়েছে বলে চাপ-পাশটা নজরে আসছে মালুর। মালু বুঝতে পেরেছে আঙুরের এখন কন্ঠ রয়েছে বুকের মধ্যে। এসময় গলা কেমন ভারি হয়ে যায়। আঙুর কথা বলতে পারে না! আর খানিক পর আঙুর কেঁদে ফেলেবে।

আঙুরটা বড় ভীত। মালু বলে এখানে একটা ঘোষা আঙুর। বাঁশল ওপর মাসের চট্টের মধ্যে ওয়া বসে পড়ে।

সামনেই সাঁকো। সাঁকোটা পার হলেই সেই মাঠ। মালু সেই মাঠের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, ঐ যে দেখাচিস তেলের একটা কুপি জ্বলছে মাঠে, এখানে মেঘপালক তাই ফেলেছে। আর বেশি দূর নেই।

মালু আরও একটু সরে আসে আঙুরের কাছে।

জানিস আঙুর, জ্যাঠামশাই যখন মেঘপালকের সঙ্গে কথা বলছিল সেইসময় ওকে আমি কোলে তুলে নিয়েছিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া ফুল, কি যে কচি-কচি-গা। এমন নরম! ভূই দেখিস আমি ঠিক ওকে খুঁজে বার করব। ঠিক তোকে এনে দেব আমি। একে কোলে কবলে তোব সব কন্ঠ তখন ভাল হয়ে যাবে আঙুর। দেখিস।

আঙুর সবও কিছই বলছিল না।

মাঠের মাঝ থেকে আংুর মতো যে কপিরা আলোটা তার দিকে তেড়ে আসছিল। আঙুর বহুত দিবে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিল। তার ভয় করছিল। খালের জলে ছিটকির করে ছোঁড়া অশ্লীল তারা। লক্ষ্যে বাড়ীতে হালকা হাতের কোঁয়া। সেই অন্ধকার খেজুরগাছে আর বাবলার কোপেখান্ডে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে দেখা যায় না। পারে দল হর না। তারা বাজলে নাড়ালে ছিটে। ঘুরে বেড়ার। আঙুরের জন্যে হলো, তার চারপাশে তেমন এক দৃষ্টিও আসে দেখালে। সেই জ্বালা-জ্বালা-জ্বালা-জ্বালা তাকে ঘিরে রয়েছে।

তার সামনেকার কোণের অন্ধকারে কালো কালো খেজুরের সারির মধ্যে কারা যেন কামড়াকামড়ি করছে। আঙুর যেন দেখতে পেল ওরা দৃকন! ওদের কালো কালো শরীর। মণিগিসীকে সেদিন যেমন দেখেছিল আঙুর সম্বন্ধে আধারে! তেমনি কি?

আঙুরকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারে গা-ধতে এসেছিল মণিগিসী। বাঁশবনের তলায় অন্ধকারে তাকে চুপ কোরে বসিয়ে রেখে মণিগিসী ঘাটে বসতে বাঁজিল। আঙুর বসে বসে দেখেছিল, তাকে একলাটি বসিয়ে রেখে বাঁশবনের জমাট অন্ধকারের ভেতর তাণ মণিগিসী চলে যাচ্ছে।

সেই বাঁশতলায় আঙুরকে তখন একা পেয়ে অন্ধকার কোণে এসেছিল। কাণ্ডে কাণ্ডে কটকট করে হাতাশ ভাঙাছিল। হঠাৎ চঠাৎ ঝটপট শব্দ উঠছিল বাঁশবনে। আর কারা যেন শব্দে গাভা গাভিয়ে শব্দ ভুলছিল ক্রমাগত। আঙুরের বুকের মধ্যেই কেমন ছাঁক ছাঁক করছিল তখন। মণিগিসী ঘাটে বসবার নাম করে কেন যে এমন অন্ধকারে চলে গেল।

আঙুর আর বসে থাকতে পারছিল না। মণিগিসী যে-পথে গেছে সেই পথে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সেও বাঁজিল। আঙুরের মনে হচ্ছিল যে যেন তার গলার দ্বার ভেতর থেকে টেনে রেখেছে। সে মণিগিসীকে ডাকতে পারছিল না। মণিগিসী মণিগিসী-গো—। সে কাঁদতে পারছিল না ডাক ছেড়ে। কি যে অবস্থা আঙুরের!

আঙুর সেই অন্ধকারে খানিকটা এগিয়ে গেলে সে দেখেছিল দৃষ্টি মানবকে। কালো কালো শরীর তাদের। বাঁশবনের তলায় মাটির ওপর কামড়াকামড়ি করছে। সেই অন্ধকারের ভেতর সে যেন তার মণিগিসীকে চিনতে পেরেছিল। তবুও তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোয়নি। আঙুর দূ-হাতে চোখ চাপা দিয়ে সেইখানে বসে পড়েছিল মাটিতে।

তার কতক্ষণ পরে মণিগিসী বেরিয়ে এসেছিল। আঙুরের মনে নেই। মণিগিসীকে ফিরে পেলে যেন বেঁচে গেছিল আঙুর।

কি করছিলে মণিগিসী? আমার কেমন ভয় করছিল। তোমাকে যদি মেরে ফেলতো ও!

আঙুর কেনে ফেলেছিল।

পিসী তখন জাইঝিকে আদরে-চুমোর ভুলিয়ে দিচ্ছিল। দূর বোকা মেয়ে কাঁদতে নেই। পিসীকে তোর ভুতে ধরেছিল। এ ভুত পোষা ভুত রে। এ ভুত সবাইকে ধরে। তুই যখন বড় হবি—তোকেও ধরবে। তখন তোরও পোষা হয়ে যাবে, দেখিস।

এই খালের বাঁধের ওপর বসে অন্ধকারে খেজুর বনের দিকে তাকিয়ে আঙুরের এখন মনে হচ্ছিল তাকে সেই ভুতে ধরেছে। আঙুর ফিসফিস করে বললে, মালদ দেখ—ঐ যে এখানে!

ভাল করে দেখে নিয়ে মালদ বললে, ঘাট! ওতো গাছের গাড়াই রে। মূড়ো খেঁকুরগাছ দৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে।

তবুও চারপাশে সেই ভয়। জোনাক পিটপিট করছে। ঝিঝি ডাকছে। আর সব মিলিয়ে রাত গভীরের সেই ডাক—অবিকল সেই মেঘপালকের ডাক সবুজ যেন জেগে রয়েছে। মালদ আঙুরকে বললে, আমরা কালীপূজো করি নে, মা-কালী আমাদেব শান্তি দেবে।

কথাটা আঙুরেরও মনে ধরেছে। এই মহাত্মা সেও যেন ঠিক এই কথাটাকেই বলেছিল। আহ! মালদ, মালদ যে কি ভাল।

অথবা, আঙুরকে তখন সত্যিই ভুতে পেরেছে।

সে যেন নিজের মধ্যে নিজেকে আর নেই। চারদিক অমথম করছে—এমন এই রাত্তিরবেলা। আঙুর বুঝি অবিকল এক দেবতা হয়ে গেছে। ঠিক শ্মশান-কালীকে যেমন দেখায়। হাত তার উর্ধ্বে তোলা। জিত কাটা। আর বাঁপা সামনে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আঙুর।

হে মা-কালী—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেগা মালদ।

আঙুরের আগে কোনো বসন নেই। মালদ ভয়ে ভয়ে আঙুরের পায়ের ওপর দৃষ্টি জড়ো করে রাখাছিল। আঙুরের সাপা পায়ের কি যে এক-আলো ফটে রয়েছে। মল্লন নীলচে সেই আলোর মালদ যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মা-কালীর গলায়, তার বুকের দূ-পাশে ওকি দুই মৃদুমালা গাথা রয়েছে।

এতো নরম আলো তবু মালদ সেখানে চোখ রাখতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, ওখানে চোখ পড়লে তার চোখ জ্বল হয়ে যাবে। তার ভিতর থেকে মা-কালীর মুখের পাশাপাশি আরও কিছু যেন একটা উঠে আসতে চাইছিল। মনে পড়ছিল, সেই যাত্রা-তলার কথা। বিষ্টকাবার বন্দ, পাত্তরকাবা সেই যাত্রায় একবার মেয়ে সের্জিছিল। তার বকে কেমন বল রাখাছিল বিষ্টকাবা। আর—আর—তখন বিষ্টকাবা সেই বলের ওপর মুখ ঘর্ষাছিল—

মালদ এখন মনের ইচ্ছে—থবে ইচ্ছে—সে একবার একবারটি এখন বিষ্টকাবা হয় যার। কিন্তু আঙুর। আঙুর যে মা-কালী হয়ে গেছে। তার গায়ের ওপর নীলচে আলো। সেই আলো সে সহ্য করতে পারছে না।

মালদ কেমন অস্বাভাবিক এক মত। সে যেন সেই সাঁকোর ওপর উঠে এসেছে। এই সাঁকোর ওপর যারা উঠে আসে, তারা যদি মানব হয় তাদের সবার দৃষ্টি তখন মালদ মতন হয়ে যায়। মালদ সাঁকোর-ওঁ-দৃষ্টি নিয়ে তেমনি পিটপিট করে তাকিয়ে ছিল আঙুরের পায়ের দিকে।

এই সময় মালদ একটা কাণ্ড করে ফেলল।

পাশেই পড়েছিল আঙুরের জামা। এম-খাবলায় তুলে নিয়ে জামাটা আঙুরের গায়ের ওপর ছুড়ে মেরেছে সে।

আর তখন—ঠিক তখনই পেছন থেকে গাছের মতন গজের উঠেছে এক কুকুর। আচমকা ভয়ে আঙুর তখন সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মালদকে। আর মালদ শরীরের মগোমগি দেবতার মতন আর এক শরীর শরীর নিয়ে সেও হঠাৎ কখন যে সেই সাঁকোটা পান হয়ে গেছে। সাঁকোটা পান হলোই মাঠ।

সুপ্রভা মালদ দেখল, সেই মাঠের মাঝে মেঘপালকের বড়। কোমরে কলস। ওল ভরতে এসেছিল। সেই মেয়েমানুষটা এত অশ্রুত চুকচুক শব্দে তাণ কুকুরটাকে কাঁদে ফেলে নিচ্ছে।

সেই মাঠের মধ্যে মালদ আর আঙুর আর এক অন্ধকারে পথ হাটছে তখন। তেলের কুপিঙাও এখন নিভে গেছে।

কার্কাঁয়ার বইসী যে মেয়েমানুষ—কোমরে তার ওল-ভরা কলস। সঙ্গে রয়েছে এক ভগবান কালো কুন্দুর। এই মাঠের মধ্যে দিকে এমন অন্ধকারে তারা যে কোথায় চলেছে!

এই মাঠের জগতে নক্ষত্রের মতো ফিল-ফিলে এক মায়াবী আলো। সোনালী অন্ধকার। সেই আলোর এবং অন্ধকারে কোনো কিছুই ঠিক চেনা যায় না। কেমন যেন অচেনা লাগে এখানকার সমস্ত শরীর। ভেঁড়া আর খোড়া এ রাজ্যে মন-বাই-মতো হয়ে যায়। হয়ে যায় পক্ষিরাজ। এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে মালদ আর আঙুর কিসের পিছন পিছন যেন দৌড়ছে। ওরা তাকে ধরবেই।

শব্দ এক মেঘপালক সেই অন্ধকারে দৃষ্টি মানবসভানের দৌড় লক্ষ্য করে—আমি নিশ্চিত জানি—সে হাসছে। কিন্তু কিসের হাসি সে। অভিনন্দনের?

না আর কিছুর?

মেঘপালকের সেই রহস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এখনও তা বসতে পারিনি।

ইদানিং সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের পাতা ওন্টালেই একটি বিজ্ঞাপন বিশেষ-ভাবে নজর কাড়ে। বিজ্ঞাপনটির হেড লাইন হলো, মহিলাদের জন্য একটি নতুন সংযোগ। এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, সুযোগটি চাকরি-সংক্রান্ত এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানের ইংগিত বহন করছে। আর বাস্তবেও তাই। অনুমানের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রায় মিলে যায়। বিজ্ঞাপনটির সারাংশ হলো, জাতীয় সপ্তর কর্মশালার সম্প্রতি মহিলা নেতৃত্বে আঞ্চলিক সপ্তর প্রকল্পের এক নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এবং মহিলাদেরই জন্য। এলাকার গৃহিণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়মিত এবং সাধামত টাকা কমানোর তাঁদের উৎসাহিত করাই হবে সপ্তর নেত্রীর কাজ। এর ফলে এ কাজে নিবৃত্ত প্রতিটি মহিলা নানাদিক থেকে লাভবান হবেন। অবসর সময় কাজে লাগানো যাবে। পাড়াপড়শীর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারলে সংসারে আয় যে বাড়বে সে কথা তো বলাই বাহুল্য। আর আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই তো কাজ করতে বাওয়া। তবে উপরি লাভও খুব একটা ফলনার নয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত বছরের প্রথম দিকে এই পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন। আশা করা যায় এটি জনপ্রিয় হবে।

আমাদের দেশে কাজের বড়ো অভাব। মেয়েদের কাজের অভাব আরো বেশ। সেক্ষেত্রে পার্ট টাইম কাজের তো কোন প্রশ্নই আসে না। বিদেশে অবিশি এরকম ব্যবস্থা আছে। তবে সেসব দেশে কাজের কোন অভাব নেই। ইচ্ছেমতো যে কেউ চাকরি ছাড়তে বা ধরতে পারেন। এবং যখন খুশি। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন সুযোগ নেই। চাকরি একবার ছাড়লে আবার পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই। নেহাত বরাতজার না হলে তা সম্ভব নয়। আর খাঁরা চাকরির জন্য হা-পিড়োশ দরছেন তাঁরাই চাকরি পাচ্ছেন না যেখানে সেখানে স্বল্প সময়ের চাকরির কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবাও সম্ভব নয়।

আমরা যে সামাজিক কাঠামোর বাস করি সেখানে বিয়ের পর অধিকাংশ মেয়েই ঘর-সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। চাকরি করার সুযোগ তাঁরা পান না। আর খাঁরা পেয়েও করেন না তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প। কারণ, আমাদের দেশে এখনো অনেকেই চান যে মেয়েরা ঘর-সংসার নিয়ে থাকুক আর লেখাপড়া শিখলে তা ছেলেপুলে মানুব করায় সাহায্য করবে। এই সনাতন পন্থাটি হাজার পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। আমাদের মেয়েদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও ঘরকেই টানে। কেউ কেউ কাধ্য হয়ে চাকরি করছেন বটে তবে তাঁদের অনেকেই হয়তো এতে অন্তরের সায় নেই। 'কিন্তু এক একটা সময়ে অলস হৃদয়ে খুব ভারি হয়ে ওঠে। সময় আর কাটতে চায় না। সে সময় টুকটাক একটা কাজ পেলে সময়ও কাটে আর দু' পয়সা সংসারেও আসে। এ কারণেই আমাদের দেশে গৃহিণীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা থাকা বড়ো দরকার।

সংসারে নানারকম টানাপোড়েন চলে। আর্থিক টানাপোড়েন তার অন্যতম এবং প্রধানতমও বটে। খরচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয়ের সামঞ্জস্যবিধান করা যাচ্ছে না। এজন্যও গৃহিণীদের একটা আয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এবং তা সংসার বাঁচিয়ে। সংসারের কাজকর্ম করে যে অকসরটুকু পাওয়া যাবে তা ব্যয় করে স্বচ্ছন্দতার

সুবেশ্যাবল্য করতে পারলে সবদিক থেকেই সুবিধা। এই আর থেকে হয়তো ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচটা উঠে আসবে অথবা বাচ্চের দুধের খরচ। হাই আসুক সেটাই সংসারের পক্ষে এক মস্তো সহায়ক।

নিচুপ গিমপনা করার দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। সংসার চালানোর চিন্তাও করতে হয়। গৃহিণীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের বন্দোবস্ত না থাকলেও অনেকে নিজের চেষ্টায় তা করে নিচ্ছেন। এবং এজন্য অবসর সময়টুকু হাতে নিয়ে তাঁরা অনেক দূরে বাতায়ত করেন। একাধিক হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার অনেক মেয়েকে অবসর হৃদয়ে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ রেজিমেন্ট জামাকাপড়ের অর্ডার বাড়িতে এন সেলাই করেন। মোশা কথা, চোটো একটা রাখতে হচ্ছে। সংসারের দু' পরসা আয় বাড়তেই হবে। নাহলে আর্থিক টানাপোড়েন জীবন বিকমর হয়ে যাবে। অধিকাংশ পরিবারেই আজ এই চিন্তা।

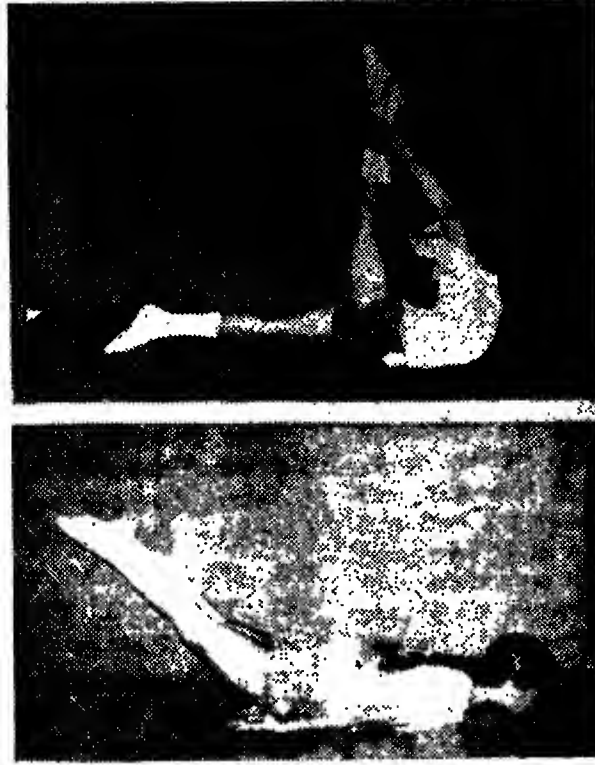
মেয়েদের জন্য স্বল্প সময়ের কাজ যে একেবারে নেই তা নয়। কলোজর পড়ুরা মেয়েদের জন্য একটি কাজ অবশ্য আছে। দুধের ডিপোতে পরিবেশিকার কাজ। প্রতি ডিপোতে এ কাজে মেয়েরা নিবৃত্ত আছেন। প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগ খুব কম। তাছাড়া এখানে কাজের অসুবিধাও অনেক। চুটিছাটার বিশেষ সুবিধা নেই। অসুখ-বিসুখে ছুটি নিলে এক ডিপো থেকে আর এক ডিপোতে ডিউটির বদল হয়। তবে এখানে খাঁরা কাজ করার সুযোগ পান



তারা নিজেদের পড়াশোনার খরচ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেন। প্রাইমারী স্কুলের মনিং সেকশনে শিক্ষকতাও এরকমই একটি সুযোগ। তবে প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগ তেমন নয়। এই চাকরিতে গৃহিণীদের সুযোগও কিছুটা আছে। অর্থাৎ এই চাকরি করে ঘরসংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন খুব একটা ব্যাহত হয় না। আর বারি সকাল সন্ধ্যা অফিস করেন সংসার করার সাথ তাঁদের অনেকখানি অপূর্ণ থেকে যায়। আর্থিক ভাবনা তাঁদের জীবনের রস শূন্য নেয়।

এই আর্থিক ভাবনাই আজকের বড় ভাবনা। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এর ফলে প্রচণ্ডভাবে কাহত হচ্ছে। তাই ঘরসংসারের কথা আর ছেলেপুলে মানবে কবাব দায়দায়িত্ব জলাজলি দিয়ে এখন চাকরি করতে বেয়ত হতে হচ্ছে। কিন্তু চাকরি করতে হলেও নির্দিষ্ট মানের লেখাপড়া জানা দরকার। স্ট্রী শিক্ষায় যথেষ্ট প্রসার সত্ত্বেও গৃহিণীদের লেখাপড়ার মান বে খুব বেশি তা নয়। তা বলে আলাপ-সালাপে মেয়েরা খাটো এমন কথা বলা যায় না। বরং সে কাপারে তারা পুরুষের তুলনায় বেশি দক্ষ। এখন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে, পাশাপাশি দুই বাড়ির কর্তার মধ্যে তেমন জানাশোনা নেই অথচ দুই গিমির মধ্যে রীতিমত অন্তরঙ্গতা। এটি মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ। আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে চাকরি করার সম্ভাবনা যে কখনো কখনো আসে হাতে-নাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নতুন পরিকল্পনায়। অবসর মুহূর্তে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আর গাল-গল্পের মাধ্যমে চাকরি করা। ট্রামে-বাসে ছুটোছুটি নেই। বড়োবাবুর চোখ লাগানি নেই। নিজের ইচ্ছেমতো শব্দ গল্প করা এবং প্রতিবেশীদের সন্তর অভ্যাস গড়ে তোলা।

এরকম পরিকল্পনা আমাদের দেশে আরো বেশি চালু করা দরকার যাতে গৃহিণীরা সুযোগ পাবেন। একাজের আরো সুবিধা যে, খুব একটা নিজের গণ্ডির বাইরে বেতে হবে না। এলাকা-ভিত্তিক দায়িত্ব। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে পরিচয় আরো নিবিড় হবে। এখন দিনকাল যা পাড়াতে তাতে খুব একটা বেশি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। দূরের তো নয় বটেই। কাছেরও নয়। এরকম চাকরির সৌজন্যে অপরিচয়ের বন্ধন যেমন কটবে তেমন যোগাযোগ আরো নিবিড় হবে। কিন্তু শূন্যমাত্র একটি পরিকল্পনায় তো আর সকলের সংস্থান সম্ভব নয়। তাই আমরা জামা করবো, এ ধরনের আরো প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হবে।



মেয়েদের শরীর গঠনের পক্ষে যোগ-ব্যায়ামের ভূমিকা অসামান্য। অল্প বয়স থেকে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় নিয়োগ স্বাস্থ্যলাভ সম্ভব।

গৃহিণীদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের সার্বিক কর্মসংস্থানের কথাও মনে রাখতে হবে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী লোক-সভায় জানান যে, চাকরি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সব বৈষম্য দূর করা হবে। মেয়েদের পক্ষে এটি পরম আশার কথা। তবে সেই সঙ্গে চাকরির ব্যবস্থাও চাই। এ কাপারেও কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। সম্প্রতি ককনগরে মেয়েদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর উন্মোচন হলো। নদীয়া মহিলা সংঘ এর উদ্যোগ। তবে পরবর্তী যে তথ্যটি এখান থেকে জানা গেল তা খুব একটা উৎসাহবাজক নয়। সেই তথ্যটি হলো যে, এ ধরনের কর্মসূচীর উন্মোচন শূন্য নদীয়া নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এতোদিন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে দুটি যে সংশোধন করা হচ্ছে সেটা সুখের কথা।

সংসার মেয়েদের প্রথম কামনা। আর্থিক প্রয়োজনে চাকরিও তাঁরা চান। অধিকাংশ মেয়ের চাকরি হলো সংসারের নূনতম স্বচ্ছলতা বিধান। তার বেশি কিছু নয়। আসল কথা হলো, সংসারের প্রতি যথাকর্তক পালন করে চাকরি করা—যাতে কোনদিকেই অবহেলা না প্রকাশ পায়। এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে এঁদের আকাঙ্ক্ষা

যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে এটাই স্বাভাবিক। নতুন পরিকল্পনায় যেমন তাঁরা সুযোগ পাবেন তেমনই হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টারগুলিও তাঁদের সেই সুযোগ দিচ্ছে। তবে সুযোগের আরো প্রসার দরকার। আরো বেশি গৃহিণীর কাছে আরো এই পথ খুলে দিতে হবে। সংসারের স্বচ্ছলতা বিধানে তাঁদের ভূমিকায় যাতে কোন চুটি না থাকে এবং আর্থিক দৃষ্টিচ্যুতায় ডুবে তাঁরা বেন জীবনের মাদুরমাড়িত দিক বিস্মৃত না হন সেজন্যই এই ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। কারণ, গৃহিণীরা প্রায়ই আক্ষেপ করেন যে, তাঁরা কোন কাজেই এলেন না একমাত্র ঘরকন্না ছাড়া। আজকের আর্থিক টানা-পোড়নের দিনে এরকম খেদোক্তি খুবই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড টানাটানিতেও তাঁরা কোন আর্থিক জোগান দিতে পারছেন না। তারপর কেউ কেউ আরো দৃষ্ট করে, লেখাপড়া জানলে চাকরি করে এই অভাবের অবসান করতেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, লেখাপড়া জানলেই আর এখন চাকরি পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের চাকরির সুযোগ অর্থাৎ সংসারের আশ্রয় বাড়ানোর জারো ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ বাছনীয়। যা হবে কিনা অবসর সময়ের কাজ। সংসার নিবিড় হবে অথচ আশ্রয় বাড়বে।

# মায়ের কাছে লেখাপড়া

বাসে বসে জনার্তদের মহিলা।  
তিনজনই নিজেদের ছোট ছোট মেনেয়ে-  
দের স্কুলে পৌঁছে দিলে বাড়ী ফিরে।  
স্কুল থেকে বাড়ীর দরজা হয়তো গোটা  
চারেক স্টপেজ। কিন্তু সেই চারটি স্টপেজ  
পার হয়ে ছোটদের স্কুলে পৌঁছে দিতে  
তারা নাজেহাল। তাঁদের বিরত ও চিন্তিত  
আলোচনা থেকে বাস্তব জীবনের বিরূপ  
এক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া গেল। যে  
সমস্যা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়,  
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মায়েরাও কয়েকশী  
সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাস বাতিনীজের একজন পাশ্চাত্য মূখে  
বললেন, 'কি যে করি ছেলোটাকে নিয়ে,  
মোটাই স্কুলে আসতে চায় না।' অন্যজন  
তৎপর হয়ে বললেন, 'বড় একগুঁয়ে আমার  
ছেলোটা। স্কুলে আসতে অবশ্য কোন বিরতি  
প্রকাশ করে না, কিন্তু স্নান করতে, খাওয়াতে  
আমি হিমশিম।' দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা  
এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। ওদের কথা শুনে  
নিজের অসহায়তার কথাটা মূখ ফুটে বলে  
ফেললেন। 'আমার ছেলে যেমন ডানপিটে,  
তেমনি গোয়ার। ওকে নিয়ে আশ্বিন  
হয়ে বাই। সকালে ওকে স্কুলে পৌঁছে  
দিলে আমাকে রান্নার কাজটা কোন রকমে  
সমাপ্ত করে ঠিক দশটায় অফিসের বাস  
ধরতে হয়। অথচ ছেলোটা এত জেদি যে  
কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছি না।  
ঘরবার দুটোই করতে হয়, কিন্তু ছেলোটোর  
পেছনে এত সময় দিয়ে চোখে মূখে  
আমি সরবে ফল দেখছি।'

বঙ্গা বাহুল্য মহিলাদের নিজেদের ছোট  
ছোট ছেলের সামলাতে নাজেহাল তার  
কপূর রয়েছে বাড়িগত হাজার রকমের কাজ।  
সুতরাং তাঁদের সমস্যা মোটেই উপেক্ষণীয়  
নয়। কারণ এক সময় এই দরস্ত, জেদি  
সন্তানেরাই জাতির পিতা হয়ে সমাজে  
বাস করবে।

ওদের নানারকম বিরত উক্তি শুনে  
আমরা সেই প্রবাদটা মনে হল 'মাদার ইজ  
দ্য বেস্ট টিচার এন্ড হোম ইজ দ্য বেস্ট  
স্কুল।' মায়েরাই যদি সন্তান পালনে  
গলদগ্রস্ত হন তবে সেই সন্তানদের স্কুলে  
শিক্ষা দেওয়া কতটা সম্ভব? প্রবাদটাকে  
সত্যে রূপায়িত করতে কোন শিশু স্কুল  
বাদ দিলে বাড়ীতেই পড়াশুনা করবে  
একথা মোটেই বলাই না। জন্ম হতেই  
কয়েকটা বছর শিশুরা পুরোপুরি বাড়ীর  
পরিবেশেই বড় হয়। বাড়ীর আনন্দোজ্জ্বল  
সুন্দর পরিবেশ এবং মায়ের সহৃদয় শিক্ষা

শিশুদের মনে যে রেখাপাত করে তা কি  
কোন শিক্ষক বা স্কুল দিতে পারে? হয়তো  
সম্ভব নয়, কারণ শিশুরা একটি দিনের  
জাতি অল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক-  
শিক্ষিকার সম্মুখে উপস্থিত হবার সুযোগ  
পায়। কিন্তু শিশু মাতাই মায়ের ও বাড়ীর  
সকলের স্নেহস্রোতের মানুস। সুতরাং—  
শিশুদের ওপর মায়ের প্রভাব ততটা অল্প  
কালের প্রভাব ততটা হওয়া বোধহয় সম্ভব  
নয়।

শিশুদের বাল্যকাল সুন্দর এবং সুস্থ  
পরিবেশে সুকৌশল পরিচালনার অতি-  
বাহিত হলে ভবিষ্যতে সেই শিশু বড়  
হয়ে একজন আদর্শ মানুসে রূপায়িত হতে  
পারবে এটাই আমরা আশা করবো। সুতরাং  
শিশুকে লালন-পালন করার সপক্ষে মায়ের  
এবং আরও সকলের দায়িত্ব থাকবে শিশু  
কি করে তাঁদের কথা এবং চিন্তা মত কাজ  
করে কোন রকম ভুল পথে অগ্রসর না হয়।

পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব  
নানা কারণে আমরা দিনকে দিন বেশী  
জটিলতার পাক খাচ্ছি। খুব স্বাভাবিক-  
ভাবেই শিশুদের প্রতি যথাযথ কতব্য  
সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। এরই  
পরিণতিতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে  
দূরত্ব বাবধান গড়ে উঠছে। জন্ম হতেই  
কোন শিশু অত্যধিক একগুঁয়ে বা জেদি  
হয় না। সে ক্ষেত্রে শিশুটি বড় হবার  
সঙ্গে সঙ্গে কেন যে সে জেদি হয়ে উঠছে  
সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। শিশুটির কোন  
অভিযোগ থাকলে দরদের সঙ্গে তা শুনতে  
হবে এবং পরে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে  
তাকে ভালমত বুঝিয়ে বলতে হবে।

উদাসীন পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুদের  
সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। শিশুরা  
কখনই তার পিতা-মাতাকে আপনার বলে  
ভাবতে পারে না। সেহেতু তারা খ্যান-  
ঘেনে, অত্যধিক জেদি ও অবাধ্য হয়ে  
ওঠে। শিশুদের সঙ্গে পিতা-মাতার  
এমনভাবে মিশতে হবে বা ব্যবহার করতে  
হবে যেন তাঁরা শিশুর পক্ষেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা-মাতা  
নানান কাজে অত্যধিক ব্যস্ত থাকেন। ফলে  
সন্তানদের দিকে ভাল করে নজর দেবারও  
ফরসৎ পান না। অনেক সময় তাঁরা  
সে সময় তাঁদের সন্তানকে বা ঘরের চেয়ে  
বাইরে কাটাতে বেশী ভালবাসে। বাইরে  
গাটবার অভ্যাসটাই লালনক্রম নেশায়  
পরিণত হয় এবং অস্বাভাবিক মতোই

সংসর্গদোষে নানা রকম দুঃঅভ্যাসের শিকার  
হয়।

এছাড়া পিতা-মাতারা অনেক সময়ই  
সন্তানদের আনন্দ বা গোমরা মূখের  
চেহারার দিকে নজর দিতেই ভুলে যান।  
কেন সন্তান এত উদ্ভেল বা গোমরা মূখো,  
কেন খুশীতে জামা-কাপড় ধুলোবাগি  
মেখে ময়লা করে রেখেছে অথবা গভীর  
মনোকেটে ক্রাসে পড়া বলতে পারে নি  
তার কোন কারণ দেওয়াসাবাদ না করে  
দুঃমদাম পিটে, গালে খানকতক হয়তো  
বসিয়ে দিলেন বাপ-মা। কিন্তু অভিভাবক-  
দের এই অসহিষ্ণুতার পরিণাম হয় বড়  
ভরস্কর। শিশুদের ফর্দাৎ বা মনোবেদনা  
বাই থাকে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা  
করলে হয়তো তার একটা সদৃশ মিলতো,  
কিন্তু মারধোর করেই সন্তানদের মূখের  
রা কেড়ে নিলেন। তারা অতি সাবধানে  
নিজেদের সুখ দুঃখের কথা গোপন করতে  
শিখলো।

সন্তানের একটি ছুটির দিন বাবা  
মায়েরা অনেক সময়ই উপভোগ করতে  
তৎপর। খেলায় খুশী মতো সন্তানটিকে  
কাজের লোক কিংবা আশেপাশের কারুর  
কাছে রেখে বেরিয়ে পড়েন বেড়াবার  
উদ্দেশ্যে। এর ফলে শিশুটি মনে মনে  
অসহায় বোধ করে ও পিতা-মাতার ওপর  
অসন্তুষ্ট হয়।

চাকুরিজীবী মায়েরের ক্ষেত্রেও  
অগাধ সমস্যা। সব ক্ষেত্রেই প্রায় একটা  
অভিযোগ শোনা যায় 'ছেলোটা দুষ্ট,  
একগুঁয়ে, পড়াশুনা করে না ইত্যাদি  
ইত্যাদি।' চাকুরিজীবী মায়েরা নিজেদের  
বেরদ্বার প্রত্যাশিত পূর্ব সমাধা করতে এত  
ব্যস্ত থাকেন যে এরই ফাঁকে কোনও  
রকমে ছেলোমেয়েদের স্নান, খাওয়া, খুব  
সম্ভবত স্কুলে পৌঁছে দেবার কাজটাও  
নেড়ে নেন। তাঁদের সেই স্বল্প সময়ের  
সন্তানের দিকে নজর দেবার ফরসৎ  
কোথায়?

কিন্তু ছুটির সেনালী দিনটির  
প্রতিটি মূহূর্ত যদি সন্তানদের আদর  
ভালবাসার সঙ্গে সকল অভাব অভিযোগ  
জেনে নিরে তা সুবিবেচনার সঙ্গে দূর  
করতে পারেন তবে বোধহয় একগুঁয়ে  
আর দুষ্ট ছেলেরা বাড়ীর সকলের একান্ত  
অনুগত আর প্রিয়পাত্র হতে পারে।

—জাতি চৌধুরী



# প্রেমসংহ

রাবি ঘোষ ও মিঠু মল্লোপাধ্যায় আবদালা মল্লিকনা পরিচালনা : দীনের গুপ্ত।  
ফটো : জমু

## চিত্র-সমালোচনা

নকল সোনা—

‘খা-কিছু চক্‌চক্‌ করে, তাই সোনা নর, এই ইংরিজী প্রবচনটির সত্যতা পশ্চিম-কণ্ঠের চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্প সম্পর্কে ষোল্লোর জারগায় আঠারো আনা খাটে। এবং এই পরম দৃষ্টাদায়ক তথ্যটিকে অত্যন্ত নমনভাবে উদ্ঘাটিত করেছে নব্য-জাত প্রোডাকশন-এর প্রথম চিত্রাঙ্গ ‘নকল সোনা’। অরবিন্দ মল্লোপাধ্যায় প্রথমে সহকারী পরিচালক ও পরে পরিচালক রূপে এই শিল্পটির সঙ্গে অনন্য কুড়ি বছর ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি হৃদয়বানের দৃষ্টি দিয়ে এই শিল্পের প্রতিটি স্তরের কলাকুশলী, কর্মী, অভিনেতা, অভিনেত্রীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে যে বৈশ্বনাথায়ক, মোদনভরা অশ্বকার রাজ্যটি বিরাজ করছে, তারই কথা তাঁর মরমী কলমের মূখে ব্যক্ত করেছেন ‘নকল সোনা’র কাহিনীর মাধ্যমে। নামকরা সৌখীন অভিনেতা ড্যাকলা ওরফে মদন চট্টোপাধ্যায় স্টুডিওর দুপায় বা একস্ট্রার (খেচরো, চুটকী অভিনেতা) খাতায় নিজের নাম লিখিয়েছিল অরূপ চ্যাটার্জি হিসেবে। তার স্বপ্ন ছিল, সে একদিন হয়ত উত্তমকুমারকে টেকা দিয়ে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। কিন্তু ছবির নায়ক চম্পককুমারের হয়ে শ্বিতীয় থেকে সম্প্রদান করতে গিয়ে তার বাম হাতটি কনুই থেকে কাটা গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল তার চলচ্চিত্র নায়ক হবার স্বপ্ন। অথচ ডাবলারই সুপারিশে ঢুকে তারই প্রতিবেশিনী লতা শেষ পর্যন্ত প্লেব্যাকআর্টিস্ট হিসেবে বেশ ভালোই নাম করল এবং পেল পয়সা ও প্রতিপত্তি। একেই বলে কপাল! ডাবলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও তার সেট চিরহীসত রাজা—স্টুডিও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ‘বিশ্বম-পুলকিত দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে স্টুডিওর চরম ফোর (আভ্যন্তরীণ কৃত্রিম দৃশ্য গ্রহণের স্থান), ক্যামেরা-ঘানের নির্দেশে ইলেকট্রিক আলোর সঠিক সংস্থাপন, মেক-আপ বা রূপ-সজ্জার কক্ষ, রসায়নাগার, সম্পদনার কক্ষ ও ব্যস্তাদি, দেখে ছবির শৃটিং, গানের রেকর্ডিং (নৈচিকতা ঘোষ, পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি সংগীত পরিচালকের



পরিচালনাধীনে) এবং ওরই ফাকে ফাকে দেখতে পাচ্ছ উত্তমকুমার, সৌমিত্র, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, চিন্ময় রায়, জহর রায়, অপর্ণা সেন প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীকে বিভিন্ন পরিবেশে। এই সঙ্গে দর্শকের সামনে নিউ থিয়েটার্সের অতীত জয়-জমাট দিনের কিছু স্মৃতিও রোমন্থন করা হয়; শোনানো হয়, বিখ্যাত গোলঘরের ঐতিহ্য, যেখানে সরকার সাহেব (বীরেন্দ্রনাথ সরকার) ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী রূপায়ণ করতেন, যেখানে ওর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী। দর্শককে দেখানো হয়, ‘মুঠি’ চিত্রের শিল্পীরূপে বড়ুয়া সাহেবকে ও পঞ্চজ মল্লিককে এবং শোনানো হয়, পঞ্চজ মল্লিকের মূখ-নিঃসৃত পদ : ‘দিনের শেষে, যুগের সংশয়, যদ্যটাপরা ঐ ছায়া’। কিন্তু এত

গেল চিত্ররাজ্যের উজ্জ্বল দিক। এর অশ্ব-কারমর বিষয় দিকটি?—হ্যাঁ, তাও দর্শকের সামনে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে এবং মনে হয়, অত্যন্ত কঠিন রুঢ়ভাবে। চীফ ইলেকট্রিসিয়ান সত্যীশ মাস্টার (হালদার) বলেছেন, ‘এমন দিন গেছে, যখন পরসার অভাবে সামান্য কেরোসিন তেলের লম্প জ্বালানোও সম্ভব হয়নি’। দেখা যায়, পরিচালক নবীন সেনের আত্ম-স্মিক মৃত্যুর পরে তার ছেলেকে ছুটে আসতে হয়েছে স্টুডিওতে—বাপের দ্বা-ধরচার জন্যে অর্থভিক্ষা করার জড়-প্রায়ে। ছোটোখাটো ‘এক দু-লাইন’ কথা কলার ভূমিকা পাবার আশায় বলে দলে নারী-পুরুষের উমেদারী; অনিশ্চিত ভবি-ষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা পরিচালক কলাকুশলীর দল। দেখে দেখে মনে হয়,

আজ বারো হালধে বেপারোয়া হয়ে, কাজ তাদেরই হস্তে, কামার উত্তে পড়তে হবে। এবং এত সনে হয়, বাংলা চলচ্চিত্রের অধিকারের দিকটা পরিচালক জীবন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত কঠিন বাস্তবিকভাবে তুলে ধরবার প্রয়াসে তাঁর কাহিনীর চাহিদাকে উপেক্ষা করে তার অগ্রাধিকার ব্যাহত করেছেন, অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এই অংশটি শ্রাস্তা তাঁর হাবিও অমরা, ভরোজাস্ত করেছেন এবং দশবারে আনন্দ দেবার পরিবর্তে তার মনকে করেছেন পীড়িত। আমাদের ধারণা, তিনি যদি তাঁর কাহিনীর সুপার-রপে 'চ্যাপলিন' পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য তের ভাষাভাষে সিদ্ধ হত।

ছবির নায়ক 'ভ্যাবলা'র ভূমিকায় পিনাকী সেনগুপ্ত (অপরাজিতের অপদ) কান্তকুমারী অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেছেন। লতার ভূমিকায় কল্যাণী মন্ডলের অভিনয় খুবই সার-লী। সুনীল দাশগুপ্ত, (কাহিনীকার জগাই রায়), পারিজাত বসু (অতীন্দ্র), রথীন বসু (নবীন সেন), সর্বেশ্বর (চম্পককুমার), কৃষ্ণা বসু (চম্পা), কাজল মজুমদার (সম্ভব), অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় (বিক্রম), জগদীশ মন্ডল (জগন), রূপা চৌধুরী (মিনতি), জহর রায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং সব সব নামে উত্তমকুমার প্রভৃতি শিল্পী শ্যামসুন্দর ঘোষ প্রভৃতি কলাকুশলী ছবির সৌষ্ঠব বর্ধনে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। ছবিতে চারটি গান আছে। তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রজগতের চমৎকারদেরকে বিশেষণ করে 'বাং চমৎকার এই দুনিয়াটা' গানটি গেরেছেন শ্যামল মিত্র। ছবির গোড়ার দিকেই হেমন্তকুমার শূনিরেছেন 'একদিনেভেই হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'। এবং একটি শ্রুটিংয়ের দৃশ্যে একজোড়া নায়ক-নায়িকা গেরেছেন : 'উত্তম হিরো হলে সুচিরা হিরোইন..... আবার জন্ম লকো—সুচিরা সেন হবো, উত্তমকুমার হবো।' বাকী সখ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের গানখানি 'কতদূরে—এই পথ আমার নিয়ে যাবে জানি না' সুর ও গায়কের দিক দিয়ে চিত্তকর্ষণী। আবহ-সঙ্গীত কচনায় নচিকেতা ঘোষ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নকণ্ঠে সমবেত 'আ - আ - আ' সুরগানকে ছবির অর্থকথা রূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করে।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত এবং নবজাত প্রোডাকশন্স নিবেদিত 'নকল সোনা' পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনা জগতের একটি বাস্তব চিত্ররূপে অভিনয়ন লাভের যোগ্য।

শাওলী মিত্র/বর্তি তর গঙ্গ। পান্ডোলনা : স্বর্ষিক/বটক। ফটো : অমৃত



## স্টুডিও সংবাদ

ভারত বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হচ্ছে 'পালঙ্ক' রাজেন তরফদারের পরিচালনায় ও দরাশঙ্কর সুলতানিয়ার প্রযোজনায়। নরেন্দ্র মিত্র রচিত একটি কাহিনী অবলম্বনে গঠিত এই ছবিতে থাকছেন সখ্যা রায়, উৎপল দত্ত, আনওয়ার হোসেন, সুপ্রিয়া গুপ্ত, নোফিয়া জামান, ফরিদা আহমেদ, অমল দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের শিল্পী। আলোকচিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও ফারুক আহমেদ (বাংলা দেশ)। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বাংলা দেশের এফ-ডি-সি স্টুডিও এবং কলকাতা উভয় স্থানেই ছবির শ্রুটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তার ওপর আছে অরবিন্দের খাল, মিল, স্টুডিওর স্টুডিও, স্টুডিওর স্টুডিও।

অমৃত পরিচালিত 'সৈদিন দৃষ্টি'— চলচ্চিত্র জারতীর পরবর্তী প্রচেষ্টা অমৃত পরিচালিত 'সৈদিন দৃষ্টি' ছবির চিত্রগ্রহণ স্টুডিও সামলাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে প্রত্যাগমন হচ্ছে। ইতিপূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছবির তিনদিনের বাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক্তার সুধীন দাশগুপ্তের সুরারোপে ছবির দুখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গেছে—গেরেছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। সিদ্ধার্থ দত্ত রচিত ও চিত্রনাট্যমিত ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে থাকছেন—সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও দেবদাস রায়।

ছবিরে খুঁজি—পুরষী কিশোর-এ প্রথম প্রচেষ্টা সূত্রের চিত্রবর্তী 'অনেক দিনের চেনা' অবলম্বনে 'হারারে খুঁজি'র সূত্র সূচনা সংগতি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ হইবে। অভিজিত কলকাতার সুরারোপে প্রযোজনা করছেন—অমৃত মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গী সেনগুপ্ত, মিত্র স্টুডিও, স্টুডিওর স্টুডিও।

কুশাল মন্থোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—স্বদেশ সরকার।

বিভিন্ন চরিত্রে অপূর্ণিত বারী নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবী চক্রবর্তী, সোম্মা দে, অসিতবরণ, শিশ্রা মিত্র, মৃণাল মন্থোপাধ্যায় শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারক চরিত্রে নবগত দীপংকর দেব নাম উল্লেখযোগ্য।

‘রাতের রজনীগন্ধা’—অনুভূতি সার্বভৌম প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ-আর-সি প্রোডাকশনের ছবি ‘রাতের রজনীগন্ধা’র চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। জানা গেল ছবিখানি সম্প্রতি সম্পাদকের টেবিলে গেছে। কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চিত্রনাট্য : প্রশান্ত দেব। সুর : সুধীন দাশগুপ্ত। পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী। নারক-নারিকা চরিত্রে আছেন, আজকের সেরা জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন, পাছাড়ী সান্যাল, দিলীপ মন্থোপাধ্যায়, তরুণকুমার শামল ঘোষাল বঙ্কিম ঘোষ, শৈলেন মন্থোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা মন্থোপাধ্যায়, অনিতা গুপ্ত, নিজননী প্রভৃতি।

চিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনার কমল গাঙ্গুলী। পরিবেশনার এন-এ ফিল্মস।

শরৎচন্দ্রের ‘আলো ও ছায়া’ দ্রুত প্রযুক্তি পর্বে : অমর কথাসিঙ্গী শরৎচন্দ্রের ‘আলো ও ছায়া’ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন এইচ এম ফিল্ম। কালকটী মন্ডলটোন স্টুডিওতে এই ছবির চিত্রগ্রহণ প্রত্যর্গত।

কলকাতা বিলাপ/চিত্রে রাবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্তর রায়।



এগিয়ে চলেছে এবং আশা করা যায় আসতে মাসেই ছবিটি প্রদর্শনের জন্য তৈরী হয়ে যাবে।

ছবিটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হলেন গুরু বাগচী। প্রধান তিনটি চরিত্রে দিলীপ রায়, সুরতা চট্টোপাধ্যায় ও বৃন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, পদ্মা দেবী ও অমরজিৎকে দেখা যাবে।

বিজন পাল ছবিটির সুরকার। মোট ছয়খানি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন বথাক্রমে হেমন্ত মন্থোপাধ্যায়, মায়া দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মন্থোপাধ্যায় মানবেন্দ্র ও মীনা মন্থোপাধ্যায়।

‘রাগের প্রথমভাগ’ মন্ডি প্রতীকার : বিভূতিভূষণ মন্থোপাধ্যায়ের ‘রাগের প্রথম ভাগ’-এর চিত্ররূপ এখন সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়ে মন্ডির দিন গুনছে। নবোদয় চট্টোপাধ্যায় তার স্বরচিত চিত্রনাট্যের উপর এই ছবিটির পরিচালনা করেছেন। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, রাবি ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। রাগের ভূমিকার কুমারী নীরা মালিশ। ছবিটির সংগীত পরিচালক—নিখিল চট্টোপাধ্যায়। ইস্সি ফিল্মস পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সলিল চৌধুরীর—‘এই ঋতুর একদিন’ প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী নিজস্ব পরিচালনায় প্রথম বাঙলা ছবি স্ব-রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বন ‘এই ঋতুর একদিন’-এর চিত্রগ্রহণ কাজ ১৭ জানুয়ারী থেকে কালকটী মন্ডলটোন স্টুডিওতে শুরু করেছেন এবং এ পর্যায়ের শ্যুটিং চলেছে একটানা পাঁচদিন।

শ্রীমতী অজা গোস্বামী প্রযোজিত অজা পিকচার্স এন্টারপ্রাইজের পতাকাডলে

নির্মিত এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, রাবি ঘোষ, চিত্তর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আছাড়া গেল ১৬ জানুয়ারী ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্কোরিং থিয়েটারে ছবির তিনটি গান শ্রীচৌধুরীর সুরারোপে রেকর্ড করা হয়েছে—গেয়েছেন—মায়া দে ও অনুপ ঘোষাল।

## বিবিধ সংবাদ

বার্ষিক উৎসব

আওয়ার অকেশ্যুর সুরগুরু পূজা ও

৩১ ডিসেম্বর সম্মার উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সৌখিন সংগীত-সংস্থা ‘আওয়ার অকেশ্যুর’ সভ্য-সভ্যারা চট্টগ্রামের আশ্রয়-সন্তান বিপ্লবী ও সুর-পাগল সংগীত-চার্য ‘সুরেন্দ্রলাল দাসের উনিবিংশ বার্ষিক স্মৃতি-পূজা ও সংস্থার চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মনোজ্ঞ সংগীত-নুষ্ঠানে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে উপস্থিত দশকসাধারণের চিত্ত সংগীতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন বিরল সার্থকতার।

ঠিক ছটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় সুর-গুরুর অভিনব স্মৃতিপূজা দিয়ে। সুরেন্দ্রলাল পরিকল্পিত ও রচিত ‘মেল দশক’ রাগ-বিচিত্রা সূত্র ও নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেন সংস্থার চল্লিশজন সদস্য-সদস্যা। সেদিনের অন্যতম আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য অনুষ্ঠান হল ‘কংলার গান’। বাংলার কয়েকটি সংগীত বিশুদ্ধ প্রাচীন ধারাতে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেন সর্বশ্রী রাণী দাশগুপ্ত শ্রীলেখা চক্রবর্তী, রথীন ভট্টাচার্য, বীথি দাশ, সুনীলতা বসু ও অরুণা মজুমদার। এছাড়া একক কণ্ঠে বাশু ম-ডল ও শামল দাশগুপ্তের গজল গান, শূভ্রা দেবের মালকোশ রাগে সেতার,

**স্টার থিয়েটার**  
শান্তিপ্রসিন্দ্রি  
৫৫-১১৩৯

আশাপূর্ণা দেবী বর্চি

**মঞ্জুরা**

পরিচালনা: দেবনারায়ণ গুপ্ত  
সংলাপ: কামাধেনু মেন্ন  
অভিনয়: অনিলা দেবী  
চিত্রনাট্য: মন্থোপাধ্যায়

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টা  
প্রতি রাবি ও ছবিটি দিন ৩ ও ৬টা

পাণ্ডিত্য সুরে শ্যামল গুপ্ত ও সৌরেন দেব গীটার স্রোতাবধের বিশেষভাবে আনন্দ দেন। সবশেষে হাসির হিলোল বহির্নে দিলেন সখ্যাত চিকিৎসক ও হাসির গানের সন্ধান-ধন্য গায়ক ডাঃ সরদা গুপ্ত।

**সুরসভার সংগীত সম্মেলন :** সুরসভার তিনদিনের অধীনে এক সংগীত সম্মেলন গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সন্ধ্যায় যথেষ্ট সম্পন্ন হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে গৌরবসিক্ত মালকোষ রাগে খেলা ও পরে ঠংরি গেয়ে শোনান। অপর লিপ্সী কান্তি মৈত্র 'বাগেশ্রী' রাগে খেলা পরিবেশন করেন। অমৃতলাল রায় বাঁশীতে ধ্বনি বাজিয়ে শোনান। এঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়েছিল। রবীন্দ্র ও অন্যান্য লঘু সংগীত পরিবেশনার ছিলেন হেমন্ত মল্লোপাধ্যায় সূচ্যাত্রা মিত্র, চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সমরেশ রায় পূর্বা দাস, অনুপ ঘোষাল, রবীন মল্লোপাধ্যায়, দেবরত সিংহ বাঁশী দাস শ্যামলী বসু, সিন্ধু গুপ্ত দীপ্ত রায়, মণিদীপা শ্যাম, অসীমা ভট্টাচার্য লক্ষ্মী গুপ্ত সর্বাণী শ্যাম, মঞ্জুরী গাঙ্গুলী, সুসমা ঘোষ, সুজাতা সেন শান্তা বসুরায় ও শকুন্তলা বসুরায়। যন্ত্রসংগীতে ও সংগীতে সহযোগিতা করেন স্বপন মল্লোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, অমৃতলাল রায় চাঁদ, বন্দোপাধ্যায় ভোলানাথ সাহা, দলীল ভট্টাচার্য ও শৈলেন মল্লোপাধ্যায়। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী।

#### প্রথম কোরীয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেন্ট্রাল কালকাটর উদ্যোগে কলকাতার প্রথম কোরীয়ান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জনতা প্রেক্ষাগৃহে। এই উৎসব উত্তর কোরীয়ান মার্ভেল কাহিনী-চিত্র 'মেরী স্টেজ' ইন আন এনিমি অকুপায়ড টাউন' উই হ্যাভ নাথিং টু এনিভি ইনাদ ওয়াফ্ট' 'আমন্ত দি ভিলেকাস', 'এ ওয়াইফস ওয়াকিং স্টেস', 'এ মেডেন অফ মাইল্ট কুমগান সান' ও 'এ ফ্রাওয়ার গাল' দেখানো হবে।

**রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংগীত :** ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ হলে তরুণ সঙ্গ পাঠাগারের রক্ত জয়ন্তী উৎসবে উদীচী শিল্প গোষ্ঠী 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সংগীত' শীর্ষক গীতি আলোচনা সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথের আগে লোকসংগীত ছিল অবহেলিত। তৎকালীন ভদ্র সমাজে এর প্রচলন ছিল না। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ-দের সঙ্গেই ছিল তার প্রাণের টান। বাউল ভাটিয়া, কীর্তন, কথকথা, রামপ্রসাদী সুর গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ছিল আদৃত। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই গানকে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের বহু গান রচনা করেন এই সুরে। তারই কয়েকটি

গান, বিভিন্ন লোকসংগীতের সুরে রচিত, পরিবেশিত হয় শৈলেন ভদ্রের পরিচালনায়। সংগীতালয়ে ছিলেন গৌরী বন্দোপাধ্যায়, সুরিতা পাল, আনন্না ভদ্র, ভারতী মৈত্র, তপন সিংহ, তপন ভট্টাচার্য বাদল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ দাস ও জ্যোতি-রত চট্টোপাধ্যায়। গীটারে সহযোগিতা করেন রবীন রায় ও স্বপনা মাইতি।

**ধ্রুপদ সংগীত :** গত ১০ জানুয়ারী সংগীত সন্মেলনীর (৩৬ এ বি প্রতাপাদিত্য রোড) মাসিক অধিবেশনে, কালিশঙ্কর মিত্র, মৃদঙ্গে চৌতাল, লহরা বাজান। পরে বিপ্রদাস নন্দী, সংগীত-তত্ত্ব-বিশারদ, দরবারী রাগে, আলাপ, রাসতালে ধ্রুপদ ধামার ও সুরযাত্রা: তালে ভাঙনা পরিবেশন করেন এঁর সঙ্গে মৃদঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ

সঙ্গত করেন প্রতাপনারায়ণ মিত্র। প্রোডাক্স গীত ও বায়ো বক্শেট আনন্দ পায়।

**খিচুয়ানুষ্ঠান :** আগের দিনে পেপার্টস অ্যান্ড কালচারাল ইউনিটের উদ্যোগে বার্ষিকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৭ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫টার শ্রীশঙ্করতন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। সুনীল মল্লিকের পরিচালনায় ক্রাব সভার 'অভিনয়' নাটক রঞ্জন করবেন। তাছাড়া পি অর্থব পাণ্ডিত্য সরকার ও সিন্ধু চৌধুরীর সংগীত এবং পাদকব এ সি সরকারের ম্যাজিক অন্যতম আকর্ষণ।

**সুভাষ মিত্রের পুরস্কার বিতরণী উৎসব**  
গত সপ্তাহে ব্যারাকপুরের নানা জায়গার পুরের বিধান সংগ্রহ শ্রমীর সুভাষ

## ৭ বর প্রজ্ঞাত্তর দবসে শুক্রবার ২৬ জাধুয়ারি

এই হাংসখাশি লোকগল্পের সঙ্গে দেখা করুন

- একদল দল্ল, বাছা
- একটি মধুর কিশোরী
- একজন স্নেহভারী ঠাকুর আর
- একজন সহস্র তরুণ যে ডাঃ বসু তাড়া হৃদয় জুড়ে। দঃমাইল

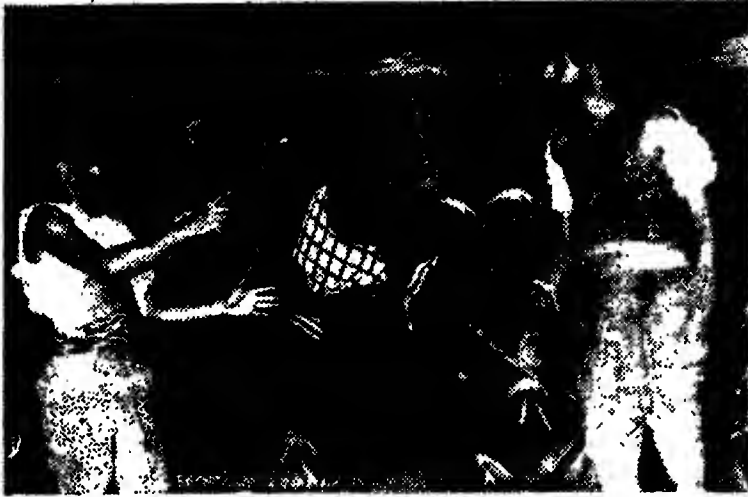


রাক্ষ - রূপবান - ভারতী - অরুণা

পার্কশো - গ্লেন (দুপ্পরের প্রদর্শনী)

আলোচনা - অলকা - নবরূপ - অশোক - ম্যামলা - মণ্ডলিনী  
নারায়ণী - চপা - রজনী - স্বপনা - কৈরী - চলচ্চিত্র  
করীম টকীজ (জামসেদপুর) ও অন্য  
টিভিট বিকল্প মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি আরম্ভ

বনগাঁ মহকুমা এস ডি ও অফিসের সেরা অভিনীত স্ট্রাট নাটকের একটি দৃশ্য।



মণ্ডের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শিশিরকুমার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতাব গত বছরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে পারিষদপরিষদ হয়ে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন নাট্য-সমাজী সুরেশবাবু। দেবী ও প্রধান অতিথি ডঃ চারু দত্ত। পুরস্কার বিতরণ করেন চিত্র ও মঞ্চ শিল্পী শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য। স্থানীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান শ্রীনাট্য কল্যাণ গিরিশচন্দ্রের অমর সৃষ্টি প্রকল্পে অভিনীত হয় শ্রীচন্দ্র দত্তের সৃষ্ট পার্শ্বচালনা। অনুষ্ঠানে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন তরুণ কর্মী শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি।

## মণ্ডাভিনয়

বনগাঁ মণ্ডাভিনয় : বনগাঁ মহকুমা শাসক শ্রীশচীন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এবং শ্রীহরীদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বনগাঁ এস ডি ও অফিসের কর্মীরা নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগীর জীবন্ত স্ট্যাচু এবং রতনকুমার ঘোষের 'স্ট্রাট' নাটক দুটি লাক্সলোর সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

নাট্য নির্দেশকের বিচক্ষণতা ও উপস্থাপনার কৌশল এবং দলগত অভিনয় নৈপুণ্য নাটক দুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। রূপসজ্জা, আলোক সম্পাত ও আবহসঙ্গীতের সূক্ষ্ম প্রয়োগ নাটক

## রজনী

রবিবার / ৪ ফেব্রুয়ারী / সকাল ১০

বেটোন্ট রেশটের দুটি একাঙ্ক

লাজোর বিচার

পাঁচু ও মাসী

থিয়েটার ও অর্কশপের প্রয়োজনা

দুটিকে সাক্ষরতার দ্বারা পেঁছে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পরিচালক শ্রীচট্টোপাধ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাছাড়া মিঃ চৌধুরী, বিপিনবাবু, হরিহর, রঘুরাম ডাকু ও পুন্ডরিক ভূমিকায় যথাক্রমে শচীন সেন, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী, জীকন মজুমদার, সনৎ মন্ডল, ও অর্ধ চ্যাটার্জির প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। নাটক দুটির অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে রেবতীরমণ দাস, জয়গোপাল পালিত ও তারাপদ ভট্টাচার্য-এর সংযত ও সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মনোমুগ্ধ করে রাখে। দ্বী চরিত্রে মৃণাল মিত্র ও গীতা দে প্রশংসার দাবী রাখেন। ব্যক্ত্যপনায় সংস্থার সভাপতি শ্রীঅমল গুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল : আজকাল অফিস ষ্টাফ বিক্রিশ্রম ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনায় মনোযোগ দে প্রাণবন্ত অভিনয়ের নজীর মেলে তার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল সম্প্রতি রুবি ষ্টাফ বিক্রিশ্রম ক্লাবের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' প্রযোজনায়। রঙ-মহলে অনুষ্ঠিত এই নাট্যাভিনয় দর্শকদের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই মুগ্ধ করেছে। প্রতিটি শিল্পীই অভিনয়ে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে 'হাজারি ঠাকুর' ও 'মিত্র' ও 'গঙ্গা বিহার' ভূমিকায় ভবতারণ মুখার্জি, সুশীল রায় তৃপ্ত দাসের অভিনয় সত্যি মনে বাখার মতো হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন রুবি কল্যাণপাধ্যায়, বরেন হালদার, শিবচন্দ্র রায় সমীর সান্যাল, কমলেন্দু মুখার্জি, চঞ্চল মিত্র, প্রবোধ চৌধুরী, পাবতী বানার্জি, শৈলী মজুমদার, মীহার মুখার্জি।

বাঁশের কেলা : কলকাতায় বিশিষ্ট মৌখীন নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ ৩১ ডিসেম্বর চট্টোপাধ্যায় পিণ্ডল পাটতে

হানার বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় উৎসব উপলক্ষে বাঁশের কেলা নাটকটি অভিনয় করে সহস্রাধিক দর্শককে মুগ্ধ করেন। নাট্য পরিবেশনার সংসদের বৈশ্বকীয়তা ও বিশেষ দক্ষতা রয়েছে এই অভিনয় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে।

প্রথম থেকে শেষ অবধি সংবাদময় এই নাটক শিল্পীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ও নিষ্ঠার দর্শক চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। ইতিপূর্বে এ নাটকটি কলকাতা ও মধ্য-স্বলের বহু আসরে যেমন প্রশংসা পেয়েছে এবারও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বরং একথা বলা যায় যে, নতুন একটা বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীরের বৈচিত্র্যময় জীবন ও ইংরেজ রাজতন্ত্রের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম এ নাটকের মূল বিষয়।

অভিনয়ে সকলেরই চরিত্র সম্বন্ধে সচেতনতা ও তাকে সঠিকরূপে দেওয়ার ঐকান্তিকতা বিশেষ লক্ষণীয়। ধীরেন চক্রবর্তী, পুন্ডরীক পাল, সমীর বানার্জি, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, কেষ্ট সিংহ, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র পাল, গৌরহরি ভট্টাচার্য, প্রদীপ বানার্জি, সুরেশ ঘোষ ইত্যাদি মুখার্জি, সুদেখা বানার্জি, রজনী চ্যাটার্জি, অর্ধা ঘোষ, সুধা সরকার, নিমাই দে শিল্পীরা যথাক্রমে বিষ্ণু মোড়ল, অনাদি তিতুমীর, বংশীধর, কালীপ্রসন্ন, হারীশ্যাম, দীনবন্ধু, মিস্কিন, খাজা খাঁ, রুস্তম, সুবেদার, বাদশা, পিয়ারা, ডলি, সীমা, ফুলজান ও সদানন্দ চরিত্রে সার্থক রূপায়ণ করে এ নাটকের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ করেছেন।

টাকার রং কালা : কলকাতার কুশীলব নাট্যসংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি কলকাতার বর্মান্বর্তন সাফল্যের সঙ্গে সুনীল চক্রবর্তীর 'টাকার রং কালা' নাটকটি অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন দিলীপ হাজারী, পার্থ পাণ্ডা, নির্মলশ্যাম রায় চৌধুরী, অসীম সরকার, মানিক দাস চন্দ্রকান্ত সরকার, জ্যোতির্ময় অধিকারী, তপন মিত্র, সমর সাধুখাঁ, মাধবী বোস, শম্পা সিংহ, কল্পনা সাহা, উত্তম মুখার্জি।

ফাঁস : উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মজার'এর শিল্পীরা বিশ্বরূপায়ণ মঞ্চে পরিবেশন করেন শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই প্রযোজনাটি মোটামুটি সার্থক হয়েছে বলতে হয়। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন প্রতিমা কর, স্বপন মিত্র, আনিত তালুকদার, তপন মিত্র, সোমনাথ দাস, সুব্রত সেন, স্বপন দেব, গোতম চক্রবর্তী, দীপক গুপ্ত, নীলিমা দাস, দিলীপ ঘোষ, নিতাই দাস, মোহন মিত্র, ব্রজকিশোর পাল।



## নাট্য প্রতিযোগিতা

চুড়চাঁদ কলকাতা আয়োজিত নবমবর্ষ একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতার যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, কলকাতা, পালপালি (বেংগলুরুতলা), চুড়চাঁদ, হুগলী।

৩নং কলকাতা স্ট্রীট কলকাতা-১-স্থিত ইন্টার্ন রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনার ঐচ্ছিক আন্তঃ রেল বাংলা একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে। যোগাযোগের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী।

নিকটই কাদ : আশ্মিতের 'নিকটই কাদ' নাটকটি সম্প্রতি রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে পরিবেশিত হয়। প্রযোজনা করলেন ইউ-নাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (চাকুরীয়া শাখা) কর্মচারী সমিতির শিম্পীরা। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন তরুণ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন প্রবীর বর্দন রায়, সুশান্ত বসু, দিলীপ পাল, স্বপন দাস, সুধাংশু দাশগুপ্ত, মানিক দে, পাণ্ডুর চ্যাটার্জী, শ্রীমতী পাইন, সুব্রত সিনহা, হারাধন দেবনাথ, বিপ্লব চন্দ্র, চিন্ময় নন্দী, প্রশান্ত ভৌমিক, ননীগোপাল দাস, অমল কর।

কেন্দার রায় : সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে রমেশ গোস্বামীর 'কেন্দার রায়' নাটকটি অভিনয় করেন সাধ্য মজলিস গোষ্ঠী।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই বাবেব নাম করতে হয় তাঁরা হলেন হরি মুখোপাধ্যায়, দীক্ষণরঞ্জন ঘোষাল, নন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী পাইন ও মঞ্জু ভৌমিক। এ ছাড়া ভাস্কর মিত্র, সুশীল নাথ, বরুণ বসু, অনিল ঘোষ, জীবন ঘটক প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন।

দোম্বাই-এ বাংলা নাটকের অভিনয় : বোম্বাইর প্রখ্যাত সংস্থা ই-ড্যা কালচার লীগ বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব সমিতির আহবানে ২৮ জানুয়ারী '৭০ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট' হলে সোমেন্দ্র নন্দী লিখিত 'পিরানদেমোর মতো' একাংকটি মঞ্চস্থ করেন। তাছাড়া ইউ টি সি আয়োজিত সারা ভারত বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতায়ও অংশ গ্রহণ করছেন।

নিখিল বঙ্গ একাংক নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা :

বাঁড়া আসর পরিচালিত নিখিল বঙ্গ একাংক নাটক, অভিনয় আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী। বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র বাঁড়া আসর ৩০নং বঙ্গবাড়ী বাঁড়া, কলকাতা-৮ এই ঠিকানায় পাওক্স হবে।

## অভিনেতা সংঘ-এর বিবেদী

দক্ষিণ কলিকাতার নব-নাট্যসাহিত্য পরিষদ, মঞ্চ প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে ট্রান্স রবীন্দ্রসরোবর সম্প্রতি যে পাঁচদিন ব্যাপী নাট্যসংসদে সন্মিলন করেছিলেন, তার সমাপ্তি দিবসে (১২ জানুয়ারী) অভিনেতা সংঘ মঞ্চস্থ করেছিলেন 'হেনরিক ইবসেন-এর গোষ্ঠাস' অনুসরণে রচিত 'বিবেদী' নাটকটি।

'গোষ্ঠাস' অবলম্বনে লিখিত বাংলা নাটকের অস্তিত্ব একটি অভিনয় আমরা করেক বছর আগে এই কলকাতা শহরে দেখেছিলাম এবং মনে পড়ে অভিনয়ের দিক দিকের সৌন্দর্য মনে রেখাপাত করতেও সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু অভিনেতা সংঘ-এর 'বিবেদী' মূল নাটকের মর্মবাহকে যে আশ্চর্য প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করেছে, আগে-দেখা নাটকটি সে-পরিমাণ স্পষ্ট প্রাঞ্জলতা দাবি করতে পারেনা। জানি না, 'বিবেদী' নাটকটি কার লেখনীপ্রসূত; কিন্তু তিনি যিনিই হোন, তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এমন একটি রচনা উপহার দেওয়ার জন্যে। পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী সাবলীল সংলাপ এই রচনাটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। নাটকের প্রধান চরিত্র মিসেস হেলেন আল-ভিৎয়ের জীবনবৃত্তান্ত ও জীবন-জিজ্ঞাসাকে সম্পূর্ণভাবে মূর্ত করে তুলেছে এই সংলাপ। মাত্র মধ্যাহ্নের বা বিকাল নির্দেশক খবরিকার আগে মিসেস আলভিৎয়ের মুখে 'ভূত! ভূত!' না দিয়ে 'বিবেদী' আত্মা, সেই 'বিবেদী' আত্মার আবির্ভাব।' গোছেন দিলে অধিকতর শোভন হত।

নাটকের ঘটনাস্থল করা হয়েছে মিসেস আলভিৎয়ের বসবার ঘর। অত্যন্ত সুপার-কল্পিত এই কল্পিত উপদেশী আলভিৎ-পত্র সুবিদ্যমান। মৃত ক্যাটেন আলভিৎয়ের মৃত্যু ছবিটি পর্বন্ত সেখানে স্থান পেয়েছে। চরিত্রোচিত রূপসজ্জা এই নাট্যাভিনয়ের সর্বসঙ্গী সফলতা করেছে। মঞ্চ-প্রক্ষেপণে কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে। জন-দিকের খাবার-ঘর থেকে ওসওয়াল্ড (না, অসওয়াল্ড?) ও রোজনার ভেসে-আনা কণ্ঠস্বর শোনা গেছে প্রেক্ষাগৃহের বা দিকের লাউডস্পিকারের মাধ্যমে। এবং ভাপল সেনের আলো জড় বেশী চোখ-গাধানো না হয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হলে শ্রবণে কতি হত কি?

'বিবেদী' অভিনয়ের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর সামগ্রিক অভিনয় পারিণাট্য। প্রতিটি চরিত্রই আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। বিবেকের সঙ্গে সামাজিক আদর্শের যে সংঘাত দ্বারা মিসেস হেলেন আলভিৎ প্রতিনিয়ত জর্জরিত, তাকে জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন নীলিমা দাস তাঁর দীপ্ত অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর সহ-স্বরণী চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে এই মিসেস আলভিৎয়ের ভূমিকাটি প্রোঞ্জল হয়ে থাকবে। পিতার উচ্ছল চরিত্রের উত্তরাধিকারী ওসওয়াল্ড অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। আপাত উচ্ছলতার মাঝে দঃসাম্য দূরন্ত রোগ যে তার নিজেরই অবিম্বা-কারিতার ফল, এই চিন্তা যে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, এই অবস্থাটি সুদূরভাবে বাস্তব হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। শেষ পর্বন্ত জ্ঞান,

## ভারতের স্বাধীনতা লাভের রক্ত-জয়ন্তী অর্থাৎ

রবীন্দ্র-সংলাপ ও সংগীতের সমাবেশে সাতটি-পর্বে সম্পূর্ণ

(পর্ব : মৃতি-বন্দন, রাধী-বন্দন, মালা-চন্দন, জর-স্যান্দন, অভিবন্দন, দিক-স্পন্দন ও মর্ত্যবন্দন)

রবীন্দ্র-সহকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র কর-রচিত ও প্রকাশিত মহা-গ্রন্থ

## “জনগণমন-অধিনায়ক”

ভারতের 'জাতীয়-সংগীত'-রচনা কাহিনীর নাট্যরসী বিচিত্র-আলেখ্য

'আলেখ্য কোটো নহে, আভাস মাত্র'—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা : বিশ্বভারতীর প্রাচীন-উপাচার্য ডঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস

প্রবন্ধ : শ্রীসত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথের ফোটো-শোভিত ডিমাই ৮ পেন্সিল বোর্ড-বাঁধাই ৪৬২ পৃষ্ঠা

মূল্য : দুর্দিক টাকা

গ্রন্থের অর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা :

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, ভুবনভাড়া, পোঃ বোলপুর, জিঃ বীরভূম

পরিবেশক : পারমিতা প্রকাশন, কলেজ রোড, পোঃ বোলপুর, জিঃ বীরভূম

প্রাপ্তিস্থান : ১। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২  
২। কার্কা, কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ৬।১৫ ধীরেন ধর সরণী, কলকাতা-১৮।

খানিক কক্ষের চক্ৰবাহী  
অভিনয়ী নয় তার প্রকাশের  
সুখটা এমি হাও, আমায় সুখটা এমি  
হাও' লক্ষ্যকালে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি  
করেছিল। সেই মাতাল, খোঁড়া সুরিন্দ্রবাদী,  
'মোটে' মানব ইংস্ট্রাণ্ডের ছবিটি বাস্তব  
রূপ পরিগ্রহ করেছিল নির্বল বোম্বের অভিনয়  
কালের মাঝে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথায়  
পাথে কোনোভাবে খুঁড়িয়ে চলতে পারলেই  
হ'ল—এই চিন্তাধারার মানব ইংস্ট্রাণ্ড  
নাটকের অন্য সব চরিত্র থেকে আলাদা পথের  
পথিক, এ-সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তার  
বাস্তবধর্মী অভিনয় দ্বারা। ধর্মভীরু,  
সমাজের পুণ্ড্রাবোধ দ্বারা অকুণ্ট বস্তু  
বস্তু পাত্রী ম্যাডাম-এর ছবিটি পরম  
নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যস্ত সংবেদনশীলভাবে  
চিত্রিত করেছেন অশোক মিত্র। আবার  
বেথানে তারই অসতর্কতার ফলে অনাথ-  
আশ্রমটি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে বলে ইংস্ট্রাণ্ড  
ম্যাডামের ওপর দোষারোপ করছে, সেখানে  
সেই অপরাধবোধ থেকে মর্দিত পাবার ছুট  
ফটানি ম্যাডামের চরিত্রকে কিছুটা ভণ্ড  
হলেও চিত্রিত করে। এবং এখানেও  
অশোক মিত্র সার্থক নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন  
করেছেন। পরিচালিকারূপে মিসেস আলভিঃ  
স্মারা স্নেহের সঙ্গে পালিতা রেজিনার  
চরিত্রটি পরিচ্ছন্নভাবে রূপায়িত করেছেন  
আরাত ভীষণ। ওসওয়াল্ডের আগমনে তার  
ভাবান্তর এবং শেষ পর্যন্ত তার জন্ম-  
মৃত্যু প্রবণে মগ্নত মানবের প্রতি তার  
কিরীতি—এই অভিনয় ২০৬৬ তার অভিনয়  
কালের মাধ্যমে।

অভিনয় সংঘ-এ। মিত্রাণী একটি  
স্বল্পকালীন নাট্যভূমিকা।

অন্যান্যকাল 'কাল হলে'

বর্তমানে ভারতীয় নাট্যজগতে  
কিছুটা কালও একটি প্রতিষ্ঠিত নাম।  
এই মজারি নাটকের 'তুলক',  
'সংস্কার' প্রভৃতি রচনা নাট্যক্ষেত্রে একটি  
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছে।  
গ্রীকগাড়ের রচনা নাট্য 'চর-মদন'-এর  
বহুতা হচ্ছে, মানব সর্বস্বই পূর্ণতার জন্যে  
কাল এবং এই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাই  
মানবের জীবনে আনন্দ জন্মদাতা। এই  
সঙ্গে আর একটি বহুতরকণ্ড গ্রীকগাড়  
উপস্থাপিত করেছেন : মানবের মস্তিষ্কই

**রঞ্জনানন্দীকার**  
৫৫-৬৪৬৬

২৭শে জানুয়ারি ৬৪টার  
২৮শে ফেব্রুয়ারি ৩ট ৬৪টার  
৫২৭-২৬৩৫ অভিনয়

**তিন পয়সার পালা**

নির্দেশনা : অজিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৫ : ৩৫



তার প্রকৃত সম্বন্ধ, মস্তিষ্কই তাকে দেয়  
বাস্তব, বিশেষত। তাই দেবদত্ত ও  
কপিলের মধ্যে যখন মস্তকের পরিবর্তন  
ঘটল তৈরি হচ্ছিল, তখন ধীরে ধীরে ওদের  
পরিবর্তন দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত  
কপিল হয়ে উঠল দেবদত্ত ও দেবদত্ত হয়ে  
পড়ল কপিল। এবং যে হয়-বদনের  
মস্তক সমস্ত সম্বন্ধভাগ ছিল হয় বা  
অস্ব এবং পশ্চাৎভাগ ছিল মানব, সেও  
হয়ে উঠল পুরোপুরি হয় বা ঘোড়া।  
গ্রীকগাড়ের মতো নারীরা বরাবরই বীর  
অ দেহান্তির উপাসক। তাই দেখি, নারী  
স্বয়ংবরা হয়ে অশ্বের কণ্ঠ দেয় বরমালা,  
নায়িকা পশ্চিমী কপিলের শরীরে নির্দিষ্ট  
দেবদত্তক (দেবদত্তের মূখমণ্ডলকে) পেয়ে  
খশীতে নেচে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত যখন  
দেবদত্তের মূখমণ্ডল তার দেহকেও আগ-  
কার মতো দেবদত্তরূপে করে নেয়, তখন  
সে বিধব হয়ে পড়ে এবং কপিলের ঘরণী

হতে এগিয়ে যায়। অবশ্য মস্তকবন্ধে  
দুঃস্বপ্নেই যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন  
জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে সে তার  
কামনার অগ্নিকে পুড়িয়ে মারে।

এই রূপক নাটকটি—যার মধ্যে কালী  
মূর্তি জীবন্তভাবে আবির্ভূত হয়ে অভিনয়  
শাপ দেয় এবং একের ধড়ের সঙ্গে অন্যের  
মুণ্ড যোজনা হতে দেখে মজা উপভোগ  
করে, পুতুলের সজীব হয়ে স্বামী ও স্ত্রীর  
মনোজগতের বিশ্লেষণে মেতে ওঠে—  
সাধারণ দর্শকের চক্ষে একটি পরম উপ-  
ভোগ্য রূপকথায়ই সামিল হলেও আসলে  
যে একটি মনস্তত্ত্বভিত্তিক নাটক, তা প্রথম  
প্যারাগ্রাফ থেকে পাঠকেরা সহজেই বুঝতে  
পারছেন। এবং রসিক দর্শক অভিনয়  
হতই অগ্রসর হবে, ততই উপলব্ধি করতে  
পারবেন।

সৌভাগ্যবশত তাঁর উপস্থিতি স্পষ্ট  
হল। তাঁর পিছনে পিচ দিকখানায় নাট্যমঞ্চ  
অনুষ্ঠিত হল। তারই চতুর্থ দিনে (১১  
জানুয়ারী) জনমিকা নাট্যগোষ্ঠী ত্রিগুণ  
কাণ্ড রচিত এবং ইউ ও কার্লস স্মারা  
হিলীতে অনুষ্ঠিত 'হয়-বদন' নাটকটিতে  
রত্নম্বর করলেন। নির্দেশক রাজেন্দ্রনাথ  
নাটকটিতে রেজটীয় ঢংয়ে উপস্থাপিত  
করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি চতু-  
চকোণ স্তম্ভ ও বসবার জন্য একটি  
কাঠের বেঁধে দশা-সজ্জা হিসেবে  
এখানে - ওখানে স্থাপিত করে এক-একটি  
দশা গঠন করা হয়েছে। মণ্ডের দক্ষিণ-  
সম্মুখ ভাগের একটি ছোটো ঘেরা জায়গায়  
আসন গ্রহণ করেন ভাগবত, যিনি সূর্য-  
ধারের কাজ করেন নাট্যক্রিয়ায় ভূমিকা  
ভাষণ ও বিভিন্ন নাট্যাংশের মাঝে ব্যাখ্যা-  
মূলক সংযোগসাধন করে। আর বাম-  
সম্মুখ ভাগের ঘেরা অংশে বসেন গায়ক-  
গায়িকা ও বাদ্যকারবন্দ। এরা নাট্যক্রিয়ায়  
মাঝেই বিভিন্ন চরিত্রের ভাবনাচিন্তাকে  
গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে দর্শকদের  
জানিয়ে দেয় যে, তাঁরা আসল কোনো  
ঘটনা দেখছেন না, মাত্র অভিনয় দেখছেন।  
অনেকটা বিগত যুগে আমাদের যাত্রায়  
অনুসৃত রীতির সামিল।

সুন্দর বাচনভঙ্গী সূর্যধাররূপী  
ভাগবতের ভূমিকায় আদিত্য বিক্রমের।  
অভিনয় ব্যাপারে তিনি যে সুদক্ষ, তার  
প্রকাশ তাঁর প্রতিটি ভঙ্গীতে, চলনে,  
বলনে। দৈবদণ্ড যে একজন কবি ও  
শিল্পী তার প্রত্যয়িত স্বাক্ষর রেখেছেন  
শিবকুমার কখনকুনওয়ালা। দেহ বলে  
কলীঙ্গান, সরল প্রাণ, বহুধর একান্ত অনু-  
গত কাপিলের ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে  
তুলেছিলেন শরৎ শেঠ। কাপিলের মুখ  
যখন দেবদত্তের দেহের সঙ্গে মিলিত হল,  
তখন তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল  
পশ্চিমীকে পাবার বাসনা, যে-বাসনা এত-  
দিন সুস্থভাবে বাসা বেঁধেছিল তার  
অন্তরের অন্তরতম স্থলে। এই ভাবা-  
ন্তরকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন  
শ্রীশেঠ। স্বেচ্ছা নির্বাসনের পরে কাপিল  
আবার যখন পুরোপুরি কাপিল, তখন  
তার পশ্চিমীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে  
শেষ পর্যন্ত অভিনয়টুকু আরও রাজনা-  
পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নায়িকা  
পশ্চিমী বেশে বীণা দীক্ষিত চরিত্রটিকে  
সুস্থভাবে চিত্রিত করেছেন। এছাড়া রবি  
ওয়াংচু (হয়-বদন), সশীল মিশ্র (মহা-  
কালী), রামগোপাল বগলা (১ম নট),  
মোহনশঙ্কর পাণ্ডেলী (২য় নট) প্রভৃতি  
স্ব স্ব ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ  
করেছেন।

জনমিকা প্রযোজিত 'হয়-বদন' একটি  
সর্বোৎকৃষ্ট উপভোগ্য নাট্যাভিনয়।

## টাকার ছায়াছবি



কবরী চৌধুরী

ফোরের চারপাশে অন্ধকারের ভেতর  
ডুবে রয়েছে। সোফার ওপর যেমন খুঁশি  
হয়ে ছাড়িয়ে বসে আছেন অনেকে।  
সকলেরই অন্ধকার অন্ধকার মূখ। এই  
মুখের ছায়ার ভেতরই পরিচালক সুভাষ  
দত্ত। সুভাষবাবুও সোফায় বসে। ওর  
চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। অন্য-  
মনস্ক হয়ে এক সময় তিনি বলছেন।

—ওরা কি কাজ শুরুর করবে না?

—ওদেরকে ত নিষেধ করছে কাজ  
করতে। সেটের পারমিশন এখন দেয় নাই।  
সোফায় বসে-থাকা সুভাষবাবুর দিকে  
কয়েকজন লোক এগিয়ে এলেন। অমনি  
চেঁচামেচি শব্দ হয়ে গেল।

—এই লাইট অন। লাইট অন।

দু নম্বর ফ্লোরের সমস্ত আলো  
জ্বলতে শুরুর করল। একজন বলে  
উঠলেন।

—আরে, ওইগুলো জ্বালাইয়া লাভ  
নাই। লাস্ট যেটা নিভাইলা, ওইটাই  
জ্বালাইয়া রাখ।

জনৈক ভরলোক আক্ষেপ করে  
বললেন।

—কালকেও শট নেয়া হল না।

—ওই সেটের ত প্রস্তুতি ছিল না  
কালকা।

বেশ বোঝা যাচ্ছে পরিচালক সুভাষ  
দত্ত তাঁর ছবি বলাকা মন নিয়ে দারুণ  
চিন্তিত এবং ব্যস্ত। বলাকা মন সুদর্শনা  
নায়িকা কবরী চৌধুরীই প্রযোজনা করে-  
ছেন।

এক টাকা—কনট্রাক্ট

এক ডি সির রেকর্ডিং ফ্লোরের দরজা  
ছুরে একান্তে গল্প করছিলেন ওরা  
দুজনে। এক টাকার একখানা নোট ঘুরিয়ে  
ফিরিয়ে দেখতে দেখতে প্রখ্যাত সংগীত-  
পরিচালক লতা সাহা বলে ফেললেন।

—এই যে বছরের প্রথম দিনের আয়।  
তার মানে এক টাকার কনট্রাক্ট হল  
কুণ্ডবাবু। বাকিটা পরে।

যিনি এ-টাকা দিলেন সত্যাবাবুর হাতে,  
তিনি হচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালক মহেশ্বর  
ইরাসিন। ইরাসিন সাহেব অবশ্য ছবির  
নাম এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি।

সত্য সাহা সুদারোপিত ছবিগোষ্ঠীর  
নাম হল—মাতা হরিশঙ্কর, বাহা বলিষ সত্য

রেডিও, রেডিওগ্রাফ, রেকর্ড মেসার,  
টানজিটার রেডিও ও রেডিওগ্রাফ, টেপ  
রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেডিওরটার  
ইত্যাদি মগ ও বিক্রেতা কিনা করা হয়।  
যেখানকারও হস্তকাষিত আছে।

রেডিও এক কটো টোয়ল  
৩৫, পেশে চম এডিসিট, কলিকাতা-১৩।  
ফোন : ২৪-৪১১৩

খালি, মধ্যমিতা, অসম্পন্ন পৃথিবী, অসম্পন্ন, জনতার আদালত, নবজন্ম, অন্ধ অতীত, অভাগিনী, বলাকা মন, অন্ডরালে। তাছাড়া আরো অনেক।

#### রাজ্যাক

রাজ্যাক যে ওয়ার বাংলার সেরা নারকদের একজন, সে কথা নতুন করে জানিয়ে লাভ নেই। স্টুডিওর এক নিজস্ব কজন ভদ্রলোক কথা বলারলি করছেন। তা থেকে বুঝলাম, রাজ্যাক চিত্র-পরিবেশক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন। ওর নিজস্ব চিত্র-পরিবেশন সংস্থার নাম হল রাজ্যাক প্রডাকশনস। রংবাজ এই প্রডাকশনেরই ছবি।

রংবাজ ছবিতে রাজ্যাক-কবরীকে জুটি হিসেবে দেখা যাবে অনেকদিন পর। ওরা নাকি এ-ছবিতে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। রংবাজ পরিচালনা করছেন জাহিরুল হক। হক সাহেব পরিচালকরূপে এই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করছেন। সংগীতের দায়িত্ব আনোয়ার পারভেজের। রাণী সরকার শিল্পী, রেজা, নারায়ণ চক্রবর্তী, সুমিতা, আনোয়ার হোসেন প্রভৃতির রয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রচিত্রে।

#### স্টুডিও পরিপন্থ্য

ঢাকার স্টুডিও সংখ্যা হল তিন। সে-কথা এখানকার চলচ্চিত্রকুশলীরা জানা-লেন। এই তিনের ভেতর এফ ডি সি-ই আয়তনে নাকি সবচেয়ে বড়। সব ঘরে খুঁজে মন হল এতে ফ্লোর রয়েছে চারটে। অনেক সময় অবশ্য এক-একটা দেয়াল দাঁড় করিয়ে এসব ফ্লোরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হয় প্রয়োজনে।

অন্য দুটো স্টুডিওর নাম হচ্ছে বেলাল স্টুডিও, পপুলার স্টুডিও।

গেল বুধের পর স্বাধীনভাবে ছায়া-ছবি পরিচালনা করার কাজে নতুনরা এগিয়ে এসেছেন অনেক সংখ্যায়। এতেই নাকি স্টুডিওতে ভিড়, মানে 'গ্যাঙ্গাম' সৃষ্টি

হয়েছে বেশ। কলে ছবি তৈরির কাঁচামালের বাজারে আগুন জ্বল।

#### জীবনতৃষ্ণা

জীবনতৃষ্ণা ছবির কথা আগে একবার (গত সংখ্যায়) সামান্য বলেছি। এবার ওই ছবির কিছু নেপথ্য কাহিনী আপনাদের সামনে তুলে ধরি।

ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক টেকিং-এর জেরে মহড়া শুরু হয়ে গেছে রেকর্ডিং ফ্লোরে।

ওয়ান-টু-থ্রী-ফোর।

সা-সারে-গা-

বেহালায় করুণ স্বর, তারপর সরোদ, সেতার, বাঁশর টানা সুর, অর্গান, খানিক দূরে দূরে বিরাট দুটো পিয়ানো বাজছে। সব মিলিয়ে সুরের ধানি ছটকে পড়ছে ফ্লোরের চারপাশে। জীবনতৃষ্ণা ছবির খানিক অংশ প্রদর্শন-ঘরের পর্দার গায়ে ভাসতে দেখা গেল। অমনি ফাইন্যাল মিউজিক টেকিংও শুরু হল।

'অনেক দৃঃখের মধ্যে কষ্ট করে যে'চে থাকতে হয় মানুষকে', এ-চুক্তিতে এই ব্যথাকেই পরিচালক এইচ আকবর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই মিউজিক গ্রহণ করুণ ভাবেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হল।

জীবনতৃষ্ণার ববিভা সূচন্দা দুজনেই কাজ করছেন। ববিভা হচ্ছে রোমান্টিক নায়িকার চরিত্রে। আর সূচন্দা ট্রাজিডি রোলে। নায়ক হলেন রাজ্যাক। প্রবীর মিত্রও রয়েছেন।

'প্রবীর মিত্র দারুণ অভিনয় করেছে।'— ছবি দেখতে দেখতে একথা বলে ফেললেন পরিচালক এইচ আকবর নিজেই।

আরও বললেন তিনি।

—'এ-ছবির সৃষ্টিং যখন চলছিল, তখন কলকাতা থেকে কাঁচক ঘটক মহাশয় এসে-ছিলেন ঢাকার এই স্টুডিওতে। প্রবীরের অভিনয় দেখে কাঁচকবাবু এতে খুশি হয়ে-ছিলেন যে, তিতাস একটি নদীর নাম-এব নায়ক হিসাবে ঠিক করে ফেললেন ওকেই।

প্রবীর মিত্র প্রিন্সিপাল আর্টিস্ট বলেন এ-ধারণা অমিও করতে পারি।

#### ভাঙানি প্রসঙ্গ

জনৈক চলচ্চিত্রকুশলী একটা ঢাকার একখানা নোট বয়-শোপের ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—

—ভাঙাইয়া আন ত।

ঢাকা হাতে নিয়ে ছেলেটা তবু বিস্ময়-বোধক চিহ্নের মত দাঁড়িয়েই রইল। বলল।

—এক ঢাকার ভাঙানিই পাওয়া যায় না ঢাকায়। আর আপনি স্টুডিওর ভেতর একটা টাকা ভাঙাইতে দিতাহেন। খুজবা পরসা শম্ম ভাবতে চাইল। বাইতাহ। ভারতীয়রা নাকি আমগ খেজরা লইয়া ওখানে নিব তৈরি করতাহে।

ভদ্রলোক ছেলেটাকে ধমকের সুরে বললেন।

—কিছু না পাওয়া গেলেই তোমরা কও ভারতীয়রা লইয়া গেল, তাঁরা যে কি করল আমগ জন্য, সেই কথা ত একবারও কওনা মিঞা।

শুভেচ্ছা ভারতের চলচ্চিত্রের জন্য

স্টুডিওর গেট ঘেঁষে বেরিয়ে আসছি এমন সময় নায়িকা শাবানা সাদা রঙের গাড়ি থামিয়ে মুখখানা সামান্য বার করে বললেন।

—নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনাদের ওখানকার সমস্ত চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের জানিয়ে দেবেন।

শাবানার বাবা ফয়েজ চৌধুরীও বলে উঠলেন একই সঙ্গে।

—শুভেচ্ছার কথা মনে রাখবেন কিন্তু।

—গিরিধারী কুন্ডু

গত ৩৭ সংখ্যা অমৃততে প্রকাশিত ঢাকার ছায়াছবি নিবন্ধটি গিরিধারী কুন্ডুর লেখা। ভুলক্রমে ওই সংখ্যায় লেখকের নাম বাদ পড়ে গেছে। —সম্পাদক, অমৃত



কিথ ফ্রেচার মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের ৪র্থ দিনের খেলায় বেদীর বলে ক্রমচূলে তার ২১ রানের মাথায় চৌহানের হাতে ধরা পড়েছেন।



## খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

তৃতীয় টেস্ট খেলা

মাদ্রাজে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারত ৪ উইকেটে হেরে বর্তমানে ২-১ খেলায় এগিয়ে গেছে। মাদ্রাজে এই নিয়ে ভারত-ইংল্যান্ডের মধ্যে যে ৫টা টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল: ভারতের জয় ৩, ইংল্যান্ডের জয় ১ এবং ১১ মাদ্রাজে ভারতের জয় ১৯৫১-৫২ মিলে এক ইনিংস ও ৮ রানে, ১৯৬১-৬২ মিলে ১২৮ রানে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ৪ উইকেটে। অপরদিকে ইংল্যান্ডের জয় ১৯৬৩-৬৪ সালে ২০২ রানে। ১৯৬৩-৬৪ সালের খেলাটি ড্র যায়।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের মত মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টেও ভারত শেষ পর্যন্ত তার বোলারদের কাঁধে চড়ে বিজয়-মঞ্চে উঠেছিল। ভারতের জয়লাভের মাধ্যমে শেষ দিকে বোলারদের ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানে শেষ হলে ভারতের জয়লাভের জন্য মাত্র ৬৬ রানের দরকার হয়। হাতে ৫২ মিনিট সময়-চতুর্থ দিনের ৫২ মিনিট এবং পঞ্চম দিনের পুরো খেলার সময়। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম ১৬ রানে ৪টি এবং বেদী ৩৬

রানে ৪টি উইকেট নিয়ে ভারতের জয়লাভের পথ সহজ করেছিলেন।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেসে জিতে ব্যাটসম্যানের দান প্রথম নিয়ে বিশেষ কোন নুসখা করতে পারেননি। প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৪২ রানের মাথায় শেষ হয়। লাস্টের সময় ইংল্যান্ডের ৪টি উইকেট পড়ে ৭৫ রান উঠেছিল। চাপানের আগে ১১০ রানের মাথায় তাদের ৭ম উইকেট পড়ে গেলে অনেকেই ভেবেছিলেন চাপানের আগেই ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবে। কিন্তু তা ঘটতে দেননি ফ্রেচার, আরনল্ড এবং গিফোর্ড। চাপানের সময় দেখা গেল রান বেশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭০ (৮ উইকেটে)। ৯ম উইকেট জুটিতে গিফোর্ড (১৭ রান) এবং ফ্রেচার ৮৪ মিনিটে অতি মজার ৮০ রান জুড়ে দলের কাহিল অবস্থার অনেক উন্নতি করেন। ফ্রেচার শেষ পর্যন্ত ৯৭ রান করে অপরাধিত থেকে যান। তার খুবই দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তিন রানের জন্য তিনি সেন্টুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তার এই নট-আউট ৯৭ রানই টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তার সর্বোচ্চ রান। ফ্রেচার ২০০ মিনিট খেলে তার নট-আউট ৯৭ রানে ১০টা বাউন্ডারী এবং ৪টি ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। চন্দ্রশেখর ৯০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

প্রথম দিনের বাকি ৬ মিনিটের খেলায় ভারত তাদের ১০টা উইকেট হাতে ধরে রেখে ৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৭৫ (৪ উইকেটে)। লাস্টের সময় রান ছিল ৫২ (২ উইকেটে) এবং চাপানের সময় ১০৪ (০ উইকেটে)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দুরানী (৩৮ রান) এবং মনসুর আলি ৬৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অপরাধিত ছিলেন মনসুর আলি (৫০ রান) এবং কিস্কনাথ (৯ রান)।

তৃতীয় দিনে চাপানের আগে ভারতের প্রথম ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৪২ রানের থেকে ৭৪ রানে এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনে ভারত প্রথম ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতই এক ইনিংসের খেলায় ৩০০ রান প্রথম সংগ্রহ করেছে। ৫ম উইকেটের জুটিতে মনসুর আলি এবং কিস্কনাথ ৬৬ রান জুড়েছিলেন। মনসুর আলি ২০২ মিনিট খেলে তার ৭০ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং ২টা ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। দীর্ঘদিন পর মনসুর আলি ভারতীয় টেস্ট দলে নিষ্পত্তি হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের স্থান অক্ষয় রাখেন।

তৃতীয় দিনের চাপানের ৩২ মিনিট আগে ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য খুন্সী করে এবং বাকি সময়ের খেলায় ৩টি উইকেট খুন্সী করে ৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। আদিল এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় চন্দ্রশেখরের হলে ক্যাচ জুড়ে ইজিগিলের হাতে ক্রম পক্ষে চন্দ্রশেখর তার টেস্ট উইকেট খেলার মাধ্যমে



টেন্ট উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, চন্দ্রশেখরকে নিয়ে প্রথম '৫ জন ভারতীয় খেলোয়াড় টেন্ট ক্রিকেট খেলায় '১০০' বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন। চন্দ্রশেখর ব্যতীত অপর চারজন হলেন 'ভিন্দু' মানকাদ (১৬২ উইকেট), সত্যেন্দ্র গঙ্গোত্রী (১৪৯ উইকেট), এরাপল্লী প্রসন্ন (১৩৩ উইকেট) এবং বিবেকসিং বেদী (১১৪ উইকেট)। চন্দ্রশেখর তার ২২তম টেন্ট খেলার মাধ্যমে তার ১০০তম উইকেট পান। এখানে উল্লেখ্য, টেন্ট খেলায় চন্দ্রশেখরের প্রথম শিকার ছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ (বোম্বাইয়ের ২য় টেস্ট, ১৯৬৪)।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানের মাধ্যমে শেষ হলে খেলার গতি সম্পূর্ণভাবে ভারতের অনুকূলে চলে যায়। মাদ্রাজের মাটিতে ইংল্যান্ডের এই ১৫৯ রান এক ইনিংসের খেলায় তাদের পক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের রান ছিল লাগের সময় ৫ উইকেটে ১১৫ (ডেনেশ নট-আউট ৫৫) এবং চাপানের সময় ১৫৪ (৮ উইকেটে)। ইংল্যান্ডের ১৫৯ রানের মাধ্যমে ৯ম উইকেট (ডেনেশ) এবং ১০ম উইকেট পড়ে। দলের সহ-অধিনায়ক মাইক ডেনেশ ৭৬ রান করেন। এই ৭৬ রানই তার টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রসন্ন ১৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৩৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতের জয়লাভের পথ সুগম করেছিলেন। খেলায় এক সময় প্রসন্নর রোহিং পরিসংখ্যান ছিল ১০ রানে ৪টে উইকেট। তিনি তার শেষ ওভারে ইংল্যান্ডের ১৫৯ রানের মাধ্যমে ডেনেশ এবং পোককের উইকেট পান।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান তুলতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে

খিলেন সিং বেদী



এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৩২ রান সংগ্রহ করে। ক্রিস ওল্ড ভারতের ১১ রানের মাধ্যমে ইজিনীয়ার এবং ওয়াদেকারের উইকেট নিয়ে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলায় অপরাধিত ছিলেন চৌহান (৭ রান) এবং দুরানী (১০ রান)।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ যখন অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তখন জয়লাভের জন্যে মাত্র ৫৪ রানের প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট এবং পুরো একদিনের খেলা। এই দিন জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকী ৫৪ রান তুলতে ভারতবর্ষ আরও ৪টে উইকেট হারাতে হয়েছিল। লাগের আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। দলের ৮৫ রানের মাধ্যমে গাভাস্কারের উইকেট লক্ষ্য করে গিফোর্ড যে বলটি

এরাপল্লী প্রসন্ন



ছাড়েন তা 'নো-বল' ঘোষিত হয় এবং এই 'নো-বল' থেকেই জয়লাভের প্রয়োজনীয় এক রান হাতে এসে যায়। এখানে উল্লেখ্য টেন্ট ক্রিকেট খেলায় 'নো-বল' থেকে জয় সূচক রান পাওয়ার নজির টেন্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২৪২ রান (ফ্রেচার নট-আউট ৯৭ রান। চন্দ্রশেখর ৯০ রান ও বেদী ৬৬ রানে ২ এবং প্রসন্ন ৪৭ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৫৯ রান (ডেনেশ ৭৬ রান। বেদী ৩৮ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১৬ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৩১৬ রান (মেনসুর আলি ৭৬ ওয়াদেকার ৪৪, দুরানী ৩৮, কলনাথ ৩৭, প্রসন্ন ৩৭ এবং ইজিনীয়ার ৩১ রান। আরনল্ড ৩৪ রানে ৩ গিফোর্ড ৬৪ রানে ৩ এবং পোকক ১১৪ রানে ৪ উইকেট)।

ও ৮৬ রান (৬ উইকেটে। দুরানী ৩৮ রান। পোকক ২৮ রানে ৪ এবং ওল্ড ১৯ রানে ২ উইকেট)।

রোহিনটন বারিয়া ট্রফি

১৯৭২-৭৩ সালের আন্তঃ বিশ্ব বিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসে ২৭ রান বেশী করার সুবাদে দিল্লীকে পরাজিত করে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রোহিনটন বারিয়া ট্রফি জয় করেছে। প্রথম জয়ী হয় ১৯৭০-৭১ সালের ফাইনালে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মাদ্রাজ : ১৮০ রান ও ৩৫০ রান (২ উইকেটে। বিজয়কুমার ৫৮)

দিল্লী : ১৫৩ ও ১৮৭ রান (৫ উইকেটে) হরি গিদোয়ানি ৬৫ এবং এস চেন্দ্রনট আউট ৪২ রান)

**এফ্টারসুন**  
কার্বাকল, শোম, চুপকরুত মা, পোড়া বা পোড়ার মা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।  
বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি  
লিটল এন্ড কোং কলিকাতা-১৬

# নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

## লেখকদের প্রতি

১। অমৃত প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার সকল রকমে পাঠ্য-বেশ। অনুদীর্ণ রচনার খবর দ-মাগের মধ্যে জানান হয়। অমৃত-নীতি রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আব-শ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তা-করে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃত' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টসীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতবা তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতবা।

## গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আব-শ্যক।

২। ডি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

## চাঁদার হার

	কলিকাতা	সকল স্থান
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০ টাকা ০০.০০	
বাৎসরিক	টাকা ১২.৫০ টাকা ১৫.৫০	
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫ টাকা ৮.০০	

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০২
বাৎসরিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

## 'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আমল চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২ম বর্ষ  
৩য় বর্ষ

অমৃত

৩৯ সংখ্যা  
জুলাই-৫০ পৃষ্ঠা  
বিশেষ-২ পৃষ্ঠা  
মোট-৫২ পৃষ্ঠা

Friday, 2nd February, 1973 শুক্রবার, ১৯ মাঘ, ১৩৭১ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১০২৮	চিঠিপত্র	
১০২৯	সম্পাদকীয়	
১০৩০	দেবোৎসবদেশে	—শ্রীপঙ্কজরীক
১০৩৪	ইন্দ্রিয়া বৃগের সাত বছর	—শ্রীপ্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়
১০৩৬	হেমের ডিনটি	(কবিতা) —শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১০৩৬	স্টোফ	(কবিতা) —শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
১০৩৬	বখন বৃষতী এসেছিল	(কবিতা) —শ্রীশুভশঙ্কর ভট্টাচার্য
১০৩৭	চিলের ডাক	(গল্প) —শ্রীগোপাল সামন্ত
১০৪১	কখনো দিন, কখনো রাত	(উপন্যাস) —শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১০৫৫	এই আমাদের দেশ	—শ্রীযোগনাথ মৃধোপাধ্যায়
১০৬০	মনের খবর	—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
১০৬৪	আপনি কেনন আহেন	—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
১০৬৬	আমরা গড়ে তুলি	—শ্রীদিলীপ মৌলিক
১০৬৮	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীঅরুণকান্ত
১০৭১	একটু উকতার জন্যে	(উপন্যাস) —শ্রীবৃন্দাবন গুহ
১০৭৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅভয়শঙ্কর
১০৮০	বনমালিপুত্রের মারি	—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
১০৮৪	দিলকালের হিসেব	—শ্রীশান্তিলাল মৃধোপাধ্যায়
১০৮৭	কূল কোটার আগে	(উপন্যাস) —শ্রীশৈলেন রায়
১০৯২	সম্পাদকের সঙ্গে অমৃতের	লেখক ও পাঠকেরা
১০৯৪	সুস্বাসন—মহাকাশচারিণী	—শ্রীশুভশঙ্কর পাঠক
১০৯৬	জলসা	—শ্রীপ্রাণা আদিত্য
১০৯৮	প্রেকাশ	—শ্রীচন্দ্রাপদা
১১০০	খেলাধুলা	—শ্রীনন্দীকর
		—শ্রীদর্শক

**আধুনিক চিকিৎসা**

পারিবারিক চিকিৎসার  
কর্মক্ষেত্র ও সময়  
বোঝা পুঙ্খ।

আমাদের  
প্রতি  
গিফট—

ডাঃ প্রব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষজ্ঞ  
জলপে  
লিখিত—

১১৪-৫-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০-১০০১-১০০২-১০০৩-১০০৪-১০০৫-১০০৬-১০০৭-১০০৮-১০০৯-১০১০-১০১১-১০১২-১০১৩-১০১৪-১০১৫-১০১৬-১০১৭-১০১৮-১০১৯-১০২০-১০২১-১০২২-১০২৩-১০২৪-১০২৫-১০২৬-১০২৭-১০২৮-১০২৯-১০৩০-১০৩১-১০৩২-১০৩৩-১০৩৪-১০৩৫-১০৩৬-১০৩৭-১০৩৮-১০৩৯-১০৪০-১০৪১-১০৪২-১০৪৩-১০৪৪-১০৪৫-১০৪৬-১০৪৭-১০৪৮-১০৪৯-১০৫০-১০৫১-১০৫২-১০৫৩-১০৫৪-১০৫৫-১০৫৬-১০৫৭-১০৫৮-১০৫৯-১০৬০-১০৬১-১০৬২-১০৬৩-১০৬৪-১০৬৫-১০৬৬-১০৬৭-১০৬৮-১০৬৯-১০৭০-১০৭১-১০৭২-১০৭৩-১০৭৪-১০৭৫-১০৭৬-১০৭৭-১০৭৮-১০৭৯-১০৮০-১০৮১-১০৮২-১০৮৩-১০৮৪-১০৮৫-১০৮৬-১০৮৭-১০৮৮-১০৮৯-১০৯০-১০৯১-১০৯২-১০৯৩-১০৯৪-১০৯৫-১০৯৬-১০৯৭-১০৯৮-১০৯৯-১১০০-১১০১-১১০২-১১০৩-১১০৪-১১০৫-১১০৬-১১০৭-১১০৮-১১০৯-১১১০-১১১১-১১১২-১১১৩-১১১৪-১১১৫-১১১৬-১১১৭-১১১৮-১১১৯-১১২০-১১২১-১১২২-১১২৩-১১২৪-১১২৫-১১২৬-১১২৭-১১২৮-১১২৯-১১৩০-১১৩১-১১৩২-১১৩৩-১১৩৪-১১৩৫-১১৩৬-১১৩৭-১১৩৮-১১৩৯-১১৪০-১১৪১-১১৪২-১১৪৩-১১৪৪-১১৪৫-১১৪৬-১১৪৭-১১৪৮-১১৪৯-১১৫০-১১৫১-১১৫২-১১৫৩-১১৫৪-১১৫৫-১১৫৬-১১৫৭-১১৫৮-১১৫৯-১১৬০-১১৬১-১১৬২-১১৬৩-১১৬৪-১১৬৫-১১৬৬-১১৬৭-১১৬৮-১১৬৯-১১৭০-১১৭১-১১৭২-১১৭৩-১১৭৪-১১৭৫-১১৭৬-১১৭৭-১১৭৮-১১৭৯-১১৮০-১১৮১-১১৮২-১১৮৩-১১৮৪-১১৮৫-১১৮৬-১১৮৭-১১৮৮-১১৮৯-১১৯০-১১৯১-১১৯২-১১৯৩-১১৯৪-১১৯৫-১১৯৬-১১৯৭-১১৯৮-১১৯৯-১২০০-১২০১-১২০২-১২০৩-১২০৪-১২০৫-১২০৬-১২০৭-১২০৮-১২০৯-১২১০-১২১১-১২১২-১২১৩-১২১৪-১২১৫-১২১৬-১২১৭-১২১৮-১২১৯-১২২০-১২২১-১২২২-১২২৩-১২২৪-১২২৫-১২২৬-১২২৭-১২২৮-১২২৯-১২৩০-১২৩১-১২৩২-১২৩৩-১২৩৪-১২৩৫-১২৩৬-১২৩৭-১২৩৮-১২৩৯-১২৪০-১২৪১-১২৪২-১২৪৩-১২৪৪-১২৪৫-১২৪৬-১২৪৭-১২৪৮-১২৪৯-১২৫০-১২৫১-১২৫২-১২৫৩-১২৫৪-১২৫৫-১২৫৬-১২৫৭-১২৫৮-১২৫৯-১২৬০-১২৬১-১২৬২-১২৬৩-১২৬৪-১২৬৫-১২৬৬-১২৬৭-১২৬৮-১২৬৯-১২৭০-১২৭১-১২৭২-১২৭৩-১২৭৪-১২৭৫-১২৭৬-১২৭৭-১২৭৮-১২৭৯-১২৮০-১২৮১-১২৮২-১২৮৩-১২৮৪-১২৮৫-১২৮৬-১২৮৭-১২৮৮-১২৮৯-১২৯০-১২৯১-১২৯২-১২৯৩-১২৯৪-১২৯৫-১২৯৬-১২৯৭-১২৯৮-১২৯৯-১৩০০-১

# চিঠি পত্র

## শহীদ স্মৃতি-বাসরে উপেক্ষিত প্রফুল্লচন্দ্র

এই পৌষ '৭৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় শ্রীপুলকেশ দে সরকারের 'শহীদ স্মৃতি-বাসরে উপেক্ষিত-প্রফুল্লচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে কিছুর ত্রুটি-বিবৃতি রয়েছে। লেখক একটু সতর্ক এবং স্বতঃস্ফূর্ত হলে মারাত্মক ত্রুটিগুলি হয়তো এড়াতে পারতেন। তিনি মজুমদারপুরে দুইটি বোমা বিস্ফোরণের খবর কোথা থেকে পেলেন? ৪ঠা মে, ১৯০৮, সোমবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

"....they had in their possession three revolver, and one bomb."

কাজেই একটি বোমাই ফেটেছিল এবং বোমাটি যে ক্ষুদীরাম ছুঁড়েছিলেন তা তাঁর প্রথম বিবৃতিতেই পাওয়া গিয়েছিল। পুলকেশবাবু প্রফুল্লচন্দ্রের 'গঙ্গা-স্নানও নির্বিঘ্নে হল' কোথা থেকে জানলেন? এ খবরতো কেউ পরিবেশন করেন নি। বারীন্দ্রকুমার প্রমথের স্বাক্ষরোক্তির আগেই প্রফুল্ল চাকীর (দীনেশ রায় নয়) নাম আমরা জানতে পারি ১৯০৮ এর ১৪ই মে 'সঙ্গীত' সাময়িক পত্রিকায়। কাজেই পুলকেশবাবু 'বারীন্দ্রকুমার প্রমথ স্বাক্ষরোক্তিতে নামোল্লেখ না করলে মিথ্যা নামই সত্য হয়ে থাকত' এই উক্তি অযৌক্তিক। প্রফুল্ল চাকীর মাথা খড় খেঁচ ছিন্ন করে যে লোকটি লালবাজার নিয়ে এসেছিলো তার কথা পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা বিপ্লবী জি, পি, স্বামীর চিঠিতে জানা যায়। '.....বর্তমানে লালবাজারে পুলিশের দারোগা পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর ভাই হেমচন্দ্র লাহিড়ী এই কাজটি করেছিলেন। বাবু হেমচন্দ্র লাহিড়ী এংলো অফিসে বাস করেন। কলিকাতার সর্বজনপরিচিত পেন্সনভোগী পুলিশ। এই সেই পুলিশ। কিন্তু স্বাধীন ভারতের নাগরিক কি এদের চিহ্নিত করে রাখতে পেরেছে? পুলকেশবাবু যে অভিযোগ তুলে ধরেছেন 'প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি নেই, মূর্তি নেই, তাঁর নামাঙ্কিত সেতু নেই, রাস্তা নেই', তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারও সম্পূর্ণ নিষ্কিয়। অবশ্য লেখক প্রফুল্লচন্দ্রকে বড় করে দেখাতে গিয়ে ক্ষুদীরামকে 'কাজের পুতুল' করে ছেড়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র সিনিয়র কর্মীর মত রিভালবারটি হাগ করে আত্মদান করেছিলেন। ক্ষুদীরামও তা করতেই, কিন্তু তিনি পিস্তল চালাতে জানতেন না। এ সম্পর্কে 'বঙ্গালী'

পত্রিকার উপদেষ্টা সেনগুপ্ত লিখেছেন— 'ক্ষুদীরাম আমাদের বলেছিল.....সে নিজের পিস্তল চালাতে জানিত না, যদিও সঙ্গে বেশ বড় একটি পিস্তল ছিল।' (শনিবারের চিঠি, অক্টোবর, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-৫২৩)। ক্ষুদীরামের প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিতীয় শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও তৃতীয় ক্ষুদীরাম। ফাসীর মধ্যে উৎসর্গকারী প্রথম শহীদ ক্ষুদীরাম। আধুনিক বাংলার প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী লেখকের এই বৃত্তিও ভাঙিহীন।

স্বপনকুমার ঘোষ,  
বারুইপুর পুরাতনবাজার, বারুইপুর,  
২৪ পরগণা।

## নতুন উপাত্ত

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মাস্টার্স গঠিত হয়ে জায়ে শংখ্যার উন্মিত হয়েছে এবং নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে বহু বেকারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দু-এক মাস থেকে বাসে, ঘোঁষে চুরি, ডাকাতি, পকেটমার ইত্যাদি ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে আর আজকাল অনেক সময় কাসে গেরেদের হাত কেটে রক্ত বের করে দেওয়া হয়। এর জন্য সরকারের উচিত পুলিশ ও জলেশ্ট্রারের সাহায্যে দোষী লোকদের ধরে শাস্তি দেওয়া। জনসাধারণেরও কর্তব্য যে এই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শুধু একা পুলিশের পক্ষে এইসব জঘন্য অপরাধ আটকানো সম্ভব নয়।

এই বাংলা নেতাজী ও আশুতোষের মত বীরের। বাঙ্গালীদের এইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে হামলা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা যথেষ্টই আছে।

আমি আশা করি সরকার ও জনগণ এইসব অপরাধ আটকাতে পারবেন।

গৌতম ভট্টাচার্য  
রুড়কী (ইউ পি)

## 'যাত্রাদলের যাত্রা বদল' প্রসঙ্গে

অমৃত, ১২ বর্ষ, ৩ খণ্ড, ৫৬ সংখ্যা পড়লাম 'যাত্রাদলের যাত্রাবদল'। লেখক শ্রীমদারীশঙ্কর ভট্টাচার্যের এই লেখাটিতে প্রবন্ধের তথ্য সম্পদ তেমন নেই। লেখার অন্যান্য দোষ-ত্রুটি বাদ দিয়ে আমি একটি বহুজন জ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল পরিবেশনার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেখক ৮৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— '১৮৭১-এ ন্যাশানাল থিয়েটারের পল্লভ ছিলেন...' গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে আমাদেব সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রতিল্লভ শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হল— তা হল ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে কি করে ন্যাশনাল থিয়েটারের পল্লভ হয়? আজ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান যে কোন বাঙ্গালীই আশা করি জানেন যে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে এই ডিসেম্বর 'নৌদর্পণ'ের জন্মের ম্যারা 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' ম্যার উন্মোচিত হয়।

এই প্রথম অভিনয়ের স্থান ছিল চিৎপুরে 'খাঁড়ওয়াল বাড়ী' নামে খ্যাত

মহাস্থান 'মল্লিকার বাড়ী'। এর ষাঁড়বাটী চারশ টাকার ভাড়া নিয়ে প্রথম রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে যদি কারও সন্দেহ হয় তবে তিনি শ্রীমদেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' অথবা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' কিংবা এই ধরনের বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস সম্পর্কিত যে কোন এক খানি বই বুললেই তার নিরসন করতে পারবেন।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর 'অমৃত' সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ সম্পাদক শ্রীভূষণকান্তি ঘোষ মহাশয় স্বয়ংই 'বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন করবার জন্য পূর্বকথিত মহাস্থান সান্যালের বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন মল্লিকার আমবা জানি।

জীবনকুমার রায়চৌধুরী  
কলকাতা-২০

## দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কত লোক মারা যান?

অমৃতের ৩৬ সংখ্যায় পারমিতা সেন মজুমদারের চিঠিটি পড়লুম। তাতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা পরিমিতা দিয়েছেন, সেই পরিমিতার সত্য যদিও তিনি গোপন করেন নি, তবুও সংশয় জাগে, এই রকম গোনাগুনতি হিসেবে, রাষ্ট্র-বিদগণ মিলিয়ে কি মানুষ-গুলি মরেছিল?

আমার তা মনে হয় না। তাহলে, ঐ যুদ্ধে নিহত প্রথম এবং শেষতম ব্যক্তিটির নামোল্লেখ বাধা কোথায়?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যুদ্ধের সময়, সব মানুষই যে কেবল কামান-বন্দুকের মুখে মরে, তা কিন্তু নয়। কেউ মরে দুর্ভিক্ষে, কেউ-বা মরে যুদ্ধের আনুর্বাণিক প্রতি জিয়ায়। পল্লোলিকা কি সেই মৃত্যুর সংখ্যাটা জানেন? আমার কিন্তু তা জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি পণ্ডাশের মন্তব্যের দ্বন্দ্বি। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে কত মানুষ যে মরেছে না খেতে পেয়ে, কিংবা অখাদ্য-কথাদ্য খেয়ে মহামারীতে, তার ইয়ত্তা নেই।

তাদের সংখ্যা কত?

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময়, এই তো সেদিন, সংবাদপত্রের পাতায় খবর বেরিয়েছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুর হারকে নাকি বাঙ্গালী মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষ্য দিয়েছে। বুঝতে পারছি, আবেগের মহত্ত্ব ঐ রকম অতিশয়োক্তিও প্রশ্রয় পায়। কিন্তু ইতিহাস তো অববেগের পথে চলে না, বুদ্ধির পথে এগিয়ে থাকে, তথ্যনির্ভর হয়।

আমি সঠিক সংখ্যাটি জানতে চাই। আপনারা যদি, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ-সহযোগে তা জানান, তাহলে বাধিত হব।

মোজাম্মেল হক কলকাতা-১৭

# সম্পাদক

## একটি শান্তি আন্দোলন

কত দিন আর মানুস, প্রতিষ্ঠা করবে, শান্তি তার চাই। যুদ্ধের রক্ত দিয়ে ভিয়েতনামের মানুস গত পঁচিশ বছর ধরে এই শান্তির জন্যই অপেক্ষমান। শেষ পর্যন্ত মহাপ্রত্যাশী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা করেছেন, ভিয়েতনাম থেকে তিনি সৈন্য ফিরিয়ে আনছেন। ইন্দোচীনে স্থায়ী শান্তি আন্দোলক, এই তিনি চান। ভিয়েতনাম নিজেরা তাদের মধ্যে আলোচনা করে বাকী বিরোধ সব নিষ্পত্তি করুক, এই তাঁর কাম। পার্থক্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে শান্তিচুক্তি। আর্মিস্টিস, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কম্বোদী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিরা সবাই এই বৃদ্ধবিরতি চুক্তিতে জানিয়েছে সম্মতি। ২৮ জানুয়ারী থেকে ভিয়েতনামে হঠাৎই অস্ত্রসংকল্প এবং গোলাগুলি বর্ষণের বিরতি। আমরা আশা করব, এই চুক্তির মর্মাদা রক্ষা করবে সকল পক্ষ। শব্দ, ভিয়েতনামে নয় গোটা ইন্দোচীনে, লওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড সর্বত্রই শান্তি স্পষ্ট হতে। কোথাও শান্তির সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে না।

চুক্তি কার্যকর হবার দু' মাসের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে অবশিষ্ট আমেরিকান সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবেন নিক্সন। উত্তর ভিয়েতনাম যদি দেখে সমস্ত আমেরিকান বৃদ্ধবন্দী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের খিট সরকারকেই একমাত্র বৈধ সরকার বলে আমেরিকা স্বীকার করে, কিন্তু জাতীয় মন্ত্রিসভার হাতে যে-সমস্ত এলাকা রয়েছে তা অন্যের সাহায্যে দখল করার কোনো চেষ্টা হবে না, একথাও বলা হয়েছে চুক্তিতে। কী ভাবে সমঝোতা হবে তা সাধারণ সরকার ও জাতীয় মন্ত্রিসভা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা দ্বারা নিষ্পত্তি করবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যে সীমারেখা আছে সম্ভব সমঝোতার রেখা বরাবর তা কোনো স্থায়ী রাষ্ট্রীয় সীমান্ত নয়। অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে জেনিভা চুক্তির সময়ে একে যেমন বৃদ্ধবিরতি সীমারেখা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাই থাকল। তবে উত্তর বা দক্ষিণ কোনো ভিয়েতনামই জোর করে এই সীমারেখা বলের চেষ্টা করবে না।

উত্তর পক্ষই যদি এই চুক্তি আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে পালন করে তাহলে ইন্দোচীনে শান্তির নতুন অব্যাহতের সূচনা হতে পারে। বৃদ্ধবিরতি চুক্তির জন্য নতুন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, পেরু ও হাঙ্গেরি নিয়ে। এর সঙ্গে সার্বিক কমিশন থাকবে আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং প্রতিনিধিদের নিয়ে। তারা সবাই কড়া ও নিরপেক্ষ মনোর সাথে বাতিল চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘিত না হয়। উত্তর পক্ষই অনেক বৃদ্ধ নিয়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সার্বিক ক্ষেত্রে জরুরীকায়ের নিষ্পত্তি হয়নি। জাতীয় মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণভাবে উদ্বেগ করছে পারে নি সাধারণ সরকারকে। আমেরিকা তার বোম্বার্ড বিমান দিয়ে নতজানু করতে পারেনি হানককে। তাই রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই আজ সকল পক্ষ এগিয়ে এসেছে।

আমেরিকা অবশ্য কয়েকটি যে, সাধারণ সরকারকে তারা সাহায্য দিয়ে থাকে। যদি তারা গুলশঙ্কার দিয়ে সাহায্য করে তাহলে শান্তিচুক্তির আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কারণ, তাহলে চীন ও রাশিয়া হুগ করে থাকবে না। শান্তিচুক্তির আড়ালে চলবে প্রহরণ সজ্জা। এর পরিণাম কি হতে পারে তা আমেরিকার চেয়ে ভাল আর কে জানে। সুদূরতঃ আমরা আশা করব আমেরিকা সেই ভুল আর করবে না। সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী নিষ্পত্তি এবং পেট্রোলিয়াম প্রয়োজনের আর কীদে পা সেবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকা বলছে, উত্তর ভিয়েতনামের বৃদ্ধবন্ধ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এই সাহায্য কী ভাবে দেওয়া হবে এবং উত্তর ভিয়েতনাম কখন কী শর্তে তা গ্রহণ করবে তা পৃথিবীর মানুস সার্বহে লক্ষ্য করবে। কিন্তু তা হবে স্থায়ী শান্তির একটি উজ্জ্বল সোপান।

হ্যাঁ তি দিন যখন, আমেরিকার সমুদ্রের প্রতি আঘাতের কোনো বিস্ময় নেই। আমেরিকা যদি ভিয়েতনাম থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যায় আমরা পূর্ণসন্তোষ নিয়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাব। হ্যাঁ তি দিন আজ নেই। দুই ভিয়েতনামের সংঘর্ষিত এবং বৃদ্ধবিরতি জাতি দেখে যেতে পারেন নি। আজ যদি তা সার্থক হয় তাহলে তার স্বপ্ন সার্থক হবে। কিন্তু যতদূর ঘনে হচ্ছে দুই ভিয়েতনামের একীকরণের সম্ভাবনা এখন নেই। কার্ভি ভিয়েতনামে এখন তিনটি সরকার—উত্তর ভিয়েতনাম, সাধারণ এবং কম্বোদী বিপ্লবী সরকার। কিছদিন আগে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এম লাই একজন জাপানী নেতার কাছে বলেছিলেন, ভিয়েতনামে তিনটি সরকারই স্থায়ী হতে চলেছে। তিনি কেন এই কথা বলেছিলেন, শান্তিচুক্তির বরাদ্দ দেখে তা বানিকটা আশ্চর্য করা যায়। বৃদ্ধবিরতি পৃথিবীতে অনেক দেশই বিভক্ত হয়েছে। কোনো দেশই জোড়া লগনি। ভিয়েতনামেরা ভাবতেই পারে না এক দেশ, এক জাতি এইভাবে বিভক্ত থাকবে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে দেশ একাক্ষ হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের একের জন্য এমন দীর্ঘসংগ্রাম, এত আত্মত্যাগ, এত সাহিয্যতা আর কোনো দেশ বা জাতি দেখায় নি। জার্মান জাতি বিভাগ মেনে গিয়েছে, কোরিয়ায়ও। ভিয়েতনাম ব্যতীত, উজ্জ্বল ব্যতীত। জানি না তাদের স্বপ্ন সকল হবে কিনা। তবে এই বৃদ্ধবিরতি তাদের কর্তব্যকর্ত দেশে শান্তি আন্দোলক, এই আশাই আমরা করি।

# দেশে বিদেশে

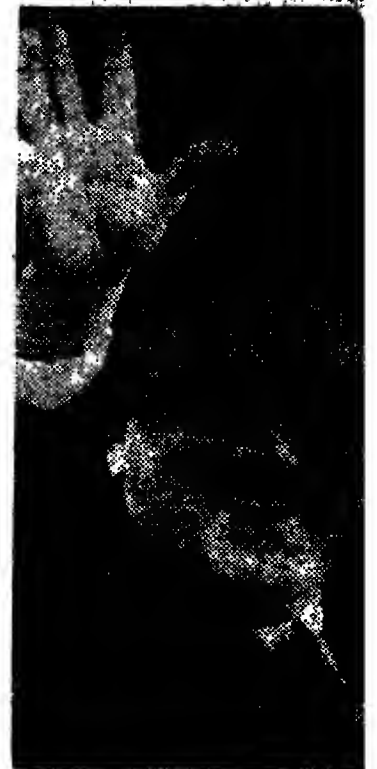
অক্টোবরে সেট ঘোষণা শোনা গেল,  
যে ঘোষণা শোনার জন্য সারা পৃথিবীর  
মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা  
করেছিলেন।

“আজ ১৯৭০ সালের ২০ জানুয়ারি  
প্যারিস সময়ের বেলা সন্ধ্যা বারটার  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ডক্টর হেনরি  
কিসিংজার ও ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্রের  
পক্ষে বিশেষ উপদেষ্টা লে ডুক থো  
ভিয়েতনামে যুদ্ধবাসন ও শান্তি পুনঃ-  
প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর  
করেছেন।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম  
গণ প্রজাতন্ত্র এই আশা প্রকাশ করেছে যে,  
এই চুক্তি ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি  
সুনিশ্চিত করবে এবং ইন্দোচীন ও  
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থায়ী শান্তি  
সুদৃঢ়ীকৃত করতে সাহায্য করবে।”

যুগপৎ ওয়াশিংটন ও হ্যানয় থেকে  
এই ঐতিহাসিক ঘোষণা একটি নতুন

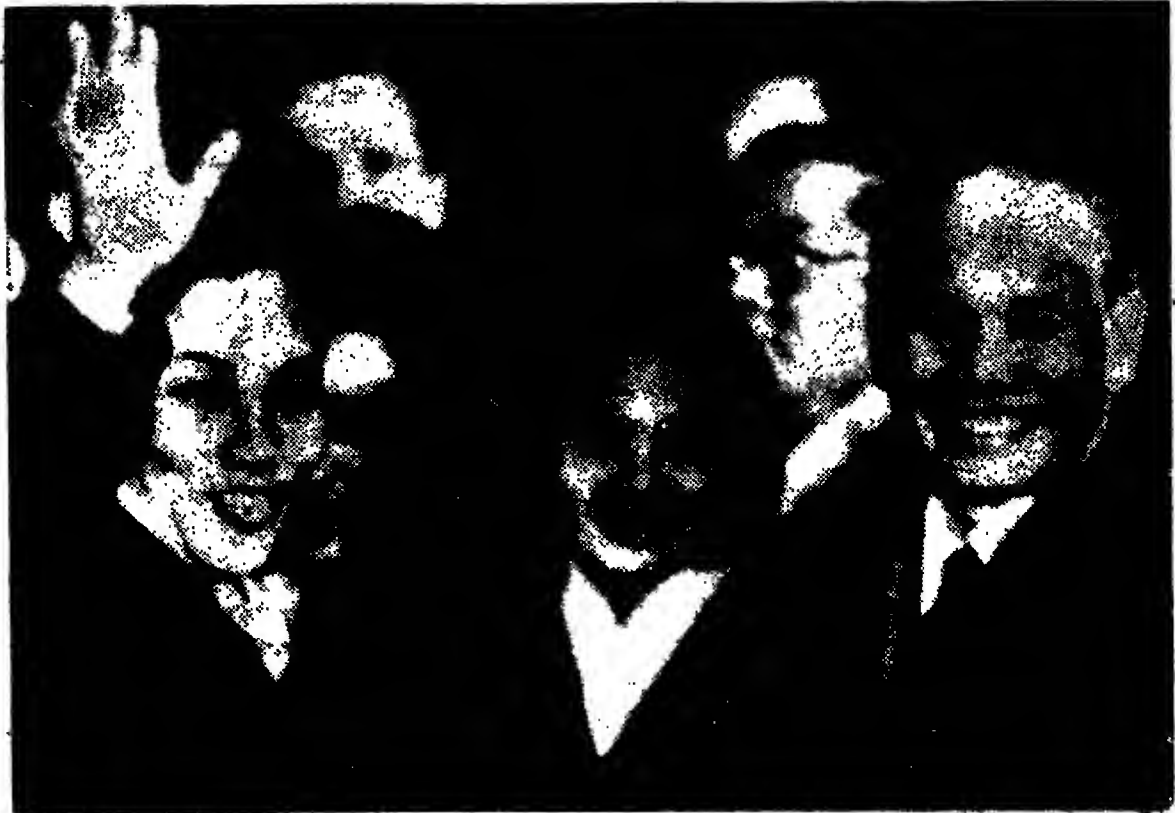


লে ডাকথো



কিসিংজার

## হে যুদ্ধ বিদায়!



দক্ষিণ ভিয়েতনাম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্যারিস শান্তি আলোচনার প্রতিনিধি দলের নেতা  
নগ্নেন থি বিন (বামে) ভিয়েতনাম থেকে ওরলি বিমানবন্দরে পৌঁছে জনতার প্রতি হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন  
জানিয়েছেন। হ্যানয় শান্তি প্রতিনিধিদলের নেতা লুয়ান থুই (ডায়নে) ডাকে সম্বন্ধ জানান।



দক্ষিণে যুদ্ধ শোনা। বলতে গেলে ২৪ বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। ব্যাপারটা বড় থেকে বড়। যুদ্ধের সময়ও যে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে পারেন। পাতলা হয়ে নি, যেভাবে পাকিস্তানের পলায়নবাদী অস্ত্রবাহীরা পাকিস্তানের সীমা উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লে জুক খোর বারবারে জরুরী গোপন আলোচনায় যাচ্ছে। যুদ্ধবিবর্তিত হুঁচি সম্ভব হলে এই যুদ্ধ ও যে শান্তির মধ্যে ব্যবধান কতটা বড়। যুদ্ধে মানুষের শব্দ, কষ্টভরা হৃদয়ে পৃথিবী একটি করে দেয়। প্রতি সেই যুদ্ধ ও সেই শান্তি ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। কটিলতা, কষ্ট, মরতের স্বাদ সমাজে হয়ে গেছে। পৃথিবীতে স্বাক্ষরিত যুদ্ধ-বিবর্তিত হুঁচি কি অস্বাভাবিক পদ্ধতির লেবে আলোকের নিখানা দেখান। অথবা এক অধিকার সূত্রের থেকে অন্য সূত্রে নিয়ে গেছে? এই সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কখনো এখনও বাকি আছে। আপাতত যুদ্ধ এই সামান্য স্বাক্ষর যে, যে নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও কল্যাণী যুদ্ধে তারা পৃথিবীর মিলনের উপর একটি দুঃসহ বোঝা হলে চোখে ছিল তার অবসান হল।

দুই প্রমুখ মূল হুঁচি (এক প্রমুখ আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে স্বিপাক্ষিক, আর এক প্রমুখ আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, সাময়িক সরকার ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের মধ্যে চার পার্শ্বিক) চারটি প্রোটোকল তাদের মধ্যে তিনটি দুই প্রমুখ করে। সব মিলে মোট ৮২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত দুই যুদ্ধবিবর্তিত দলিল একটি কত্থ নথি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, চুক্তির মূল শর্তাবলি হচ্ছে:-

(১) ভিয়েতনাম সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও আপেক্ষিক অখণ্ডতাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সব দেশ মর্যাদা দেয়।

(২) ১৭ জানুয়ারি গ্রীনউইচ মীন টাইমের রাতি ব্যাপার সময় থেকে যুদ্ধ-বিবর্তিত পালিত হবে। এই সময় থেকে ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্রে আমেরিকার সব প্রকার তৎপরতা কমে করা হবে এবং উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্রপথে ও জলপথে পাতা সমস্ত মার্কিন মাইন নষ্ট করে ফেলা হবে।

(৩) সৈন্যসংগ্রহ সংক্রান্ত চুক্তি কার্য-কর না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সৈন্য যে দায় জারগার থাকবে।

(৪) দক্ষিণ ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তিকে প্রত্যবে না এবং সেদেশের অভ্যন্তরীণ কাগজে সে হস্তক্ষেপ করবে না বলা প্রত্যজ্ঞপিত হয়েছে।

পূরাম-একদিকে মার্কিন বি-৫২ বোম্বার, দ্বিগুন উত্তর ভিয়েতনামে বর্ষা-কালীন জল-জলত, এখানে একটি ৫০০ পাউন্ডের বোম্ব ফেলার দৃশ্য।



(৫) চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ষাট দিনের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং সাময়িক সরকারের কাম্বুখানীয় অন্যান্য সব দেশের সৈন্য-বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (লক্ষণীয় এই যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্য-বাহিনী সম্পর্কে এ ধরনের কোন শর্ত নেই। অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে।)

(৬) এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর থেকে নিষিদ্ধনের দ্বারা নতুন সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ (সাময়িক সরকার ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার) দক্ষিণ ভিয়েতনামে বাইরে থেকে নতুন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রবেশ করতে পারবে না।

(৭) বেসব সামরিক ও বিদেশী অস্বাভাবিক ব্যক্তি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই

পক্ষের হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদের ৬০ দিনের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হবে।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনাম সরকার মেনে নিচ্ছেন যে, (ক) দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পবিত্র; (খ) আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে যথার্থ অবাধ ও গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ তাদের দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্থির করবে।

(৯) দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিবর্তিত মেনে, চুক্তি, শান্তিরক্ষা করবেন এবং সবত্রফে সমস্ত সংঘর্ষ বন্ধ করে বাবস্তার দ্বিগুণের বিষয় আলোচনা-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি করবেন।

(১০) যুদ্ধবিবর্তিত পর দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় অস্বাভাবিক

রাজধানী সারগন থেকে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চুহুতের মধ্যে সৈন্যবাহিনী ১নং সড়ক বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার পর  
যানবাহন ও লোকজন পালিয়ে পড়ে।



শ্রীমাংসা গড়ে তুলবেন, বিশেষ ও শত্রুতার  
অবসান ঘটাবেন, যাঁরা এ পক্ষ বা ও পক্ষের  
সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এমন ব্যক্তি বা  
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও বৈষম্য  
নিষিদ্ধ করবেন। উভয় পক্ষ জনগণের গণ-  
তান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করবেন।

(১১) যুদ্ধবিরতির অব্যাহিত পরে  
দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয়  
আপোষমীমাংসা সংক্রান্ত একটি জাতীয়  
পরিষদ স্থাপন করবেন। এই জাতীয়  
পরিষদের কাজ হবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের  
দুই পক্ষ যাতে চুক্তি কার্যকর করেন  
সেদিকে লক্ষ্য রাখা, জাতীয় আপোষ-  
মীমাংসা গড়ে তোলা ও গণতান্ত্রিক  
স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত  
করা হবে। অবাধ ও গণতান্ত্রিক সাধারণ  
নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও এই  
জাতীয় পরিষদের থাকবে।

(১২) দক্ষিণ ভিয়েতনামে অব্যাহিত  
ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস ও  
তাদের নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি দক্ষিণ  
ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষ-  
মীমাংসার ভিত্তিতে নিষ্পন্ন করবেন।

(১৩) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের  
মধ্যে আলোচনা ও চুক্তির ভিত্তিতে ধাপে  
ধাপে ভিয়েতনামের একীকরণ সম্পন্ন  
হবে। সম্পদশ্রম অক্ষরেখার দ্বারা চিহ্নিত  
সামরিক সীমান্ত রেখাটি সামরিক এবং  
এটা কোন রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক সীমানা  
নয়। এই শর্তের দ্বারা দুই ভিয়েতনামকে

কার্যত একই দেশের দুই অংশ বলে  
স্বীকার করে নেওয়া হল।

(১৪) প্যারিস সম্মেলনে যোগদানকারী  
চার পক্ষের প্রতিনিধিরা একটি চারপক্ষীয়  
যুদ্ধ সামরিক কমিশন গঠন করবেন।  
দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি চুক্তি যাতে  
কার্যকর হয়, মার্কিন ও অন্য সৈন্যবাহিনী  
যাতে চুক্তি মত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়,  
মার্কিন ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দেশের  
সামরিক ঘাঁটিগুলি যাতে ভেঙে দেওয়া হয়  
ও বন্দীদের যাতে ছেড়ে দেওয়া হয়

## বিশেষ ফিচার

### কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল বা যট্টে,  
কিন্তু ঘটনার কথা ছিল অজট ঘটনাই,  
অথবা অনেক দিন আগে ঘটছিল বা  
কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে  
অথবা কারো পরনো কোনো চিঠি বা  
অভিজ্ঞান চোখে পড়ে—তারই ওপর এক  
পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম হলেও  
প্রবীণ ও নবীন লেখকদের কলমে এই  
ফিচার ব্যুৎপন্ন দীপ্তিতে আর হৃদয়-  
বৃত্তির গভীরতার লক্ষ্যভেদ করবে তাতে  
সন্দেহ নেই। শুরুর হচ্ছে পরের সংখ্যা  
থেকে।

সেদিকে এই কমিশন নজর রাখবেন।  
সৈন্যাপসারণ ও যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাপনের  
কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই  
চারপক্ষীয় যুদ্ধ সামরিক কমিশনের কাজ  
শেষ হয়ে যাবে।

(১৫) এছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনামের  
দুই পক্ষ একটি বিপাকিক সামরিক  
কমিশন গঠন করবেন। চারপক্ষীয় সামরিক  
কমিশনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও  
এই বিপাকিক কমিশন চালু থাকবে।

(১৬) কানাডা, হাঙ্গারি, ইন্দোনেশিয়া  
ও পোল্যান্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত  
হবে একটি আন্তর্জাতিক তদারকি ও  
নিয়ন্ত্রণ কমিশন। এই কমিশন চুক্তি  
কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর  
রাখবেন।

(১৭) এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দ্বিতীয়  
দিনের মধ্যে চুক্তিটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার  
জন্য, যুদ্ধাবসান সুনিশ্চিত করার জন্য,  
ভিয়েতনামে শান্তিরক্ষার জন্য, ভিয়েতনামের  
জনগণের মৌলিক অধিকার ও  
দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আত্ম-  
নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য  
একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান  
করা হবে। এই সম্মেলনে থাকবেন  
ভিয়েতনাম প্রদেশের সঙ্গে জড়িত চার পক্ষ  
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েতনাম ও  
দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই সরকার), চীন,  
ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, জিটোন, কানাডা,  
হাঙ্গারি, ইন্দোনেশিয়া ও



প্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনেরেল।

(১৮) কাম্বোডিয়া ও লাওস থেকে সমস্ত কিলোমিটার সারিয়ে নিয়ে আসা হবে এক বাইরে থেকে ঐ দুই দেশে সৈন্য, সামরিক উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ পাঠান হবে না। কাম্বোডিয়া ও লাওসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মীমাংসা বিদেশের হস্তক্ষেপ বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাময়িক নিজেরাই করবেন।

এইসব শর্তের মূল কথা হল, ইন্দো-চীনের দেশগুলিকে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির পরবর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মূলত ভিয়েতনামের ভিতরকার যে দুই প্রতিপক্ষ শক্তি সেখানকার সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়েছিল সেই দুই শক্তিকে রূপান্তরিত করে এখন রাজনৈতিক মোকাবেলার পথে আসতে বাধ্য করা হল। কারণ, দীর্ঘ বক্তব্যী যুদ্ধের কথা দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভিয়েতনামের প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। এখন ধরুন যে নিষ্ঠুর যুদ্ধ যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নি তেমনি এমন অ-ফলপ্রসূ যুদ্ধও আর কখনও হয় নি। এই একটি যুদ্ধ আমেরিকার যত্নে রাজনীতিক বিদগ্ধ করেছেন; প্রকৃতপক্ষে শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিপক্ষের অপরাধের প্রতিরোধকৃত্যের

প্রমাণ দিয়েছে, ক্ষুদ্র শক্তিগুলির বকলমে বৃহৎ শক্তিগুলির লড়াইয়ের প্রকলতা তুলে ধরেছে, কিন্তু যা হয় নি তাহল চূড়ান্ত জয়পরাজয়ের মীমাংসা। আমেরিকার মানুষ এখন তাদের মনের শান্তি ফিরে পাবে, বিশ্বের বিবেক পাবে স্বস্তি। কিন্তু দুই ভিয়েতনামের যে প্রায় চার কোটি মানুষ তাদের বর্তমান প্রজন্মে শত্রু যুদ্ধ, ধ্বংস, অনাচার ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি তাদের জন্য নতুন সুদিন ফিরে এল কিনা কে বলবে?

কারণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ যখন আর কোন বাস্তব পাল্লা না নিয়ে পরস্পরের যুদ্ধোদ্বেগ দাঁড়াবেন তখন মহান ভিয়েতনামী একজাতীয়তা বোধের উচ্ছ্বাস অতীতের সব বিরোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, একবার প্রমাণ হতে এখনও বাকি আছে। আর যদি বাস্তবে তার বিপরীতটাই প্রমাণিত হয় তাহলে ভিয়েতনামের যুদ্ধ অধিকতর যথার্থভাবেই গৃহ-যুদ্ধে পরিণত হতে চলেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২৮-১-৭০

প্ৰদুর্ভরাক

#### দ্রুত সংশোধন

গত ৩৭ সংখ্যার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে আলোচিত শ্রীজিৎ তাকুমার সেন-গুপ্তের গ্রন্থটির নাম পড়তে হবে 'গন্যা কন্যা'।

#### যুদ্ধে কয়কতি

বার বর্ষব্যাপী ভিয়েতনাম যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে দশ লক্ষেরও বেশী প্রাণবলি হয়েছে। মার্কিন সৈন্যের উদ্ভাদিত বিষয়ক সাব-কমিটির হিসাব মত কেবল দক্ষিণ ভিয়েতনামেই বেসামরিক জীবনহানির সংখ্যা (১৯৬৫ থেকে ১৯৭২-এর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত) ১০,০,০০০।

অন্যান্য কয়-কতির পরিসংখ্যান নিম্ন-রূপে—১৯৬১-র ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭০-এর ১৩ই জানুয়ারী প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিসাবমত—মার্কিন সৈন্য যুদ্ধে নিহত ৪৫,৯৩১; অন্যান্য কারণে নিহত ১০,২৯৬; মোট হত্যের সংখ্যা ৫৬,২২৭ (কোরীয় যুদ্ধে মোট ৩০,৬২৯ মার্কিন সৈন্য নিহত)। আহত ৩০৩,৬০৫; যুদ্ধে নিখোঁজ ১২৭৬; বন্দী ৫৮৯। দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য বাহিনীর (১৯৬০ থেকে) কয়-কতি—নিহত ১৮৮,০০০, আহত—৪৩০,০০০ এরও মিত্র বাহিনীর (দঃ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাই-ল্যান্ড সৈন্য ইত্যাদি—৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২ অবধি নিহত ৫,২১১; মার্কিন হিসাবমত উত্তর ভিয়েতনাম ও এন এল এফ-এর হত্যা-হত্যের পরিমাণ ৯২৮,০০০ নিহত।

এই যুদ্ধে যুদ্ধরাত্তির ১০,৫০০ কোটি ডলার (৯৮,৫৫০ কোটি টাকা)।

১৯৬৬ সাল থেকে ইন্দোচীনে মার্কিন বিমান ৭০ লক্ষ টন বোমা ফেলেছে।

# ইন্দিরা যুগের সাত বছর

## প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান ভারতকে আমরা ইন্দিরা যুগ বা প্রগতির যুগ বলে বর্ণনা করতে পারি। কারণ, গত সাত বছরে দল-নেত্রী হিসাবে বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন ভারতবাসীর অন্তরে। এই বিশ্বাস হোল যেতে থাকে বিশ্বাস, নতুন সমাজ ও জীবন প্রতিষ্ঠার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হোল দেশ গঠনের বিশ্বাস। এবং সামাজিক নাম প্রতিষ্ঠার আশা। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাইরের চাপ সব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শ্রীমতী ইন্দিরা প্রথম দিন থেকে বিপদ বা বাধার সম্মুখীন হয়ে চলছেন বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিশ্বাসের সাফল্য এনেছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কালে, সাত বছরে প্রধান কাজগুলি আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রম করিতে পারি :

- (১) ১৪টি কাক জাতীয়করণ,
- (২) কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ;
- (৩) নতুন কংগ্রেসের অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্র বিরাট নির্বাচনী সাফল্য এনে '৬৭ সালের প্লানি দ্বি' ;
- (৪) বাংলাদেশের মৃত্তি সংগ্রামকে সাহায্য দান, পাকিস্থানী কবল থেকে উদ্ধার, বঙ্গবন্ধুর মৃত্তি এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সেবার দ্বারা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি ;
- (৫) পাকিস্থানের সঙ্গে মৃত্তি ভারতের সাফল্য ও বাংলাদেশে পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণ ;
- (৬) ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি ;
- (৭) ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ;
- (৮) ভারত-পাকিস্থান শান্তি চুক্তি ও দখলীকৃত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ, সীমান্তের সীমানার পুনর্বিন্যাস ;
- (৯) রাজন্যভাতার কিলোপ ও সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সমাজবাদী অর্থনৈতিক কাব্যের রূপাঙ্কণের সূচনা ;
- (১০) দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা ভারতে উন্নয়নসূচী রূপায়ণ, অর্থ বরাদ্দ, রাজ-নৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠা।

ইন্দিরাগী একক এক উজ্জ্বল ইতিহাস। নতুন কংগ্রেসের দলনেত্রী হিসাবে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে-ছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তিনি আদর্শ সংগঠক। তেমন

ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে ভারতের উন্নয়ন-মুখী নতুন জরাজীর্ণ সূচনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাসের নেতৃত্ব ও অপূর্ব ব্যক্তি, বাস্তবধর্মী অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ভারতকে পদে পদে সাফল্যের পথে নিয়ে চলেছে। তিনি দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। গত ৭ বছর প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী গান্ধী যে কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, বাস্তবধর্মী চিন্তা ও সজ্ঞনধর্মী বিশলবীর ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ঐতিহাসিক। তিনি যা ভাবেন তাই করেন। কথায় ও কাজে তাঁর অপূর্ব মিল। তাঁর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁকে নতুন দায়িত্ব পালনে সর্বদাই বিজয়িনী করেছে।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল—এই সাতটি বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস, উন্নয়ন-শীল কর্মকাণ্ডের মল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাবো নিজের প্রতি, দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি তাঁর কি গভীর বিশ্বাস। যে বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণ করেছিলেন, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে তিনি একক এক সাফল্য এনেছেন। এখন তাঁর সংগ্রাম হোল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, একমাত্র চিন্তা হোল কোটি কোটি দুঃস্থ গরীব মানুষের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গাণী উন্নতি।

শ্রীমতী গান্ধী দেশে ও বিদেশে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের জন্য আজ বিদিত। তিনি বাংলাদেশের মৃত্তি, শরণার্থীর সেবার মধ্য দিয়ে যে নতুন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। বিশ্বের বৃহত্তম গণ-ভ্রমের তিনি যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণ করেন তখন দেশজোড়া বিক্ষোভ, অশান্তি, খাদ্যাভাব, বিবিধ অশুভ প্রতিভিক্ষার ঘটনায় তিনি হিম্মত খাচ্ছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিবিধ বিক্ষোভের মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পারের তলা থেকে মাটি সরে যায়। নানা সঙ্কটে ভরপুর ভারতের কতগুলো রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা হারালো। কিন্তু তাঁর কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের নেতৃত্বে নতুন কংগ্রেস পড়ে উঠেছে। একটি রাজ্য বাদে প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেস ৭১ ও ৭২ সালের নির্বাচনে বিরাট সাফল্য এনেছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেমন অপূর্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন, তেমনি ভারতকে উন্নতির পথে পরিচালনাও বিরাট ব্যক্তি ও কর্ম-ক্ষমতায় পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান-মন্ত্রীরূপে এই ঘটনাবলী জীবনের কিছ-



তথা নীচে উল্লেখ করা হোল।

১৯৬৬

২৪ জানুয়ারী—ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী রূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শপথ গ্রহণ করেন। ১৯শে জানুয়ারী তিনি শ্রীমোদরাজী দেশাইকে পরাজিত করে সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন।

২০ অক্টোবর—দিল্লীতে টিটো, নাসের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন।

১৯৬৭

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার অভিযান।

১২ মার্চ—গমরায কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত।

১০ মার্চ—শিবতীরবার প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণ।

১৯৬৮

১৪ অক্টোবর—রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ।

১৯৬৯

১৯ জুলাই—ব্যাপক জাতীয়করণ, সিমান্ত কার্যক্রম।

২০ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে নির্মল প্রাণী শ্রীতি ভি গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনে শ্রীগিরির জয় শ্রীমতী গান্ধীরই জয় হলো। তাঁর নীতির জরাজীর্ণ সূচিত হোল।

১২ নভেম্বর—দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে শংখজাতকের অভিযোজনা আনলেন। সংসদীয় দলের নতুন নেতা নির্বাচনের সিমান্ত নিলেন। অপর-দিকে ওয়ার্কিং কমিটির ১০ জন সদস্য ঐ সিমান্তকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। সংসদীয় দলের ১৮২জন সদস্যের মধ্যে ২২০ জন প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন করলেন এবং নতুন করে আস্থা ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলো।

১২ নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকগণ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির

এক বিশেষ অভিযোজন ডাকলেন। এই বিশেষ ডাকের দ্বারা ভারতের ৭০৬ জন নিম্নরূপ প্রতিনিধির মধ্যে ৪০২ জন এই অভিযোজনে যোগ দিয়েছেন।

২৭-২৯ ডিসেম্বর—নতুন কংগ্রেসের জন্ম ও জন্মবার। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন দলিক কংগ্রেসের সম্মেলন হোল—শ্রীজগদীবন রম্ম ইন্সটিটিউট কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ন্যায়ন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধী এক বিশিষ্ট অর্থনৈতিক কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে নতুন ভারত গড়ার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

১৯৭০

২৭ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা বাতিলের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ মাস আগে কেন লোকসভা নির্বাচন চান তার কারণ উল্লেখ করে জাতির উদ্দেশে বক্তার ভাষণ দেন।

১৯৭১

৫ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযানের শেষ পর্ব সমাপ্ত করেন। ৪০ দিনব্যাপী নির্বাচনী অভিযানে শ্রীমতী গান্ধী ৩৬ হাজার মাইল সফর করেন, তিন শতাধিক সভায় ভাষণ দেন। তাঁর এই সভাগুলোতে মোট প্রায় দুই কোটি প্রজাভা যোগ দিয়েছিলেন।

১১ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারী দল কংগ্রেস নির্বাচনে অতুতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মোট ৫১৫টি আসনের মধ্যে ৩৫০টিই তাঁর দল দখল করে। নির্বাচনী ফল ঘোষিত হওয়ার পর তিনি তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে ঘেঁষা করেন যে, এখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাঁর মধ্য লক্ষ্য।

১৭ মার্চ—নির্বাচিত কংগ্রেস পরিষদের দলের সভার শ্রীমতী গান্ধী পুনরায় নেত্রী পদে নির্বাচিত হন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীজগদীবন রাম ও সমর্থন করেন শ্রীওমাই বিজয়ন।

১৮ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

৩১ মার্চ—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে সংসদে শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

২৪ এপ্রিল—পরিচালনা কমিশন নতুন করে গঠন করেন এবং শ্রীজগদীবনকে পরিচালনা দপ্তরের ভার দেন।

২ মে—প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মেলন করেন।

২৪ মে—লোকসভার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ব্যাপারে সম্মেলনী ভাষণ দেন। বিশ্ববাসী ও রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশে তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে সক্রিয়

মহামাসার জন্য তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

১ জুন—ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব বাংলা থেকে উদ্ভাস্তুর আগমন বন্ধের ব্যাপারে সকলের উদ্দেশ্যে দাবী জানান।

১৮ জুন—পূর্ব বাংলার সমস্যা ভারতের সমস্যা বলে তিনি বর্ণনা করেন। এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন—যেকোন আক্রমণকে প্রতিহত করতে ভারত প্রস্তুত।

২৮ জুলাই—প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সংবিধানের ২৪ ও ২৫ সংশোধন বিল পেশ করেন এবং মৌলিক অধিকারের আংশিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

৯ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ২০ বছরব্যাপী 'শান্তি ও মৈত্রী' চুক্তি সম্পাদন করেন।

১০ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার সম্পর্কে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট ভারবাহী প্রেরণ করেন।

২৫ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাইর কাছে একটি পত্র পাঠান।

২৭ সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী মস্কো সফরে যান।

২৮ অক্টোবর—বিশ্ব সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। বিশদিন সফরে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। এই সফরের সময় বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বাস্তব অবস্থা, ভারতীয় উপমহাদেশে আশঙ্কার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশের প্রতি সার্বভৌমতার জন্য আহ্বান জানান।

২৪ নভেম্বর—সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ভাষণ দেন।

২৭ নভেম্বর—বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান ও মুজিবুর রহমানের মুক্তি জন্য প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

৩০ নভেম্বর—প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানকে সৈন্য অপসারণের আহ্বান জানান।

২ ডিসেম্বর—সংবিধানের ২৬ সংশোধন বিলের ওপর লোকসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি ও সংযোগ সুবিধা লোপ বিলের আবশ্যিকতা উল্লেখ করেন। বিলটি গৃহীত হয়।

৩ ডিসেম্বর—কলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। ঠিক সেইদিনেই ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান সশস্ত্র আক্রমণ সুরু করে। রাজধানীতে ক্রিয়ে গিয়ে

তিনি পাকিস্তানী আক্রমণের মোক-বিলার নিদেশ দেন। ঐ রাতেই জাতির উদ্দেশে বেড়ারে তিনি পাকিস্তানের এই আক্রমণের মোকাবিলায় সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন।

৪ ডিসেম্বর—সংসদে তিনি জানান : পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের খবরও তিনি জানান। ভারতের নৌ ও বিমানবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কথাও বলেন।

৬ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করে।

১৬ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করেন বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা আত্ম-সমর্পণ করেছে। পাকবাহিনী আত্ম-সমর্পণ করার বোঝাতে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের একতরফা বৃদ্ধি-বিস্তার ঘোষণা করেন।

৩১ ডিসেম্বর—সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা : তৃতীয় পাকের মধ্যস্থতা ব্যতীতই পাক-ভারত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

১৯৭২

২ জানুয়ারী—গিল্লীতে নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা।

১০ জানুয়ারী—গিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সদ্যমুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর প্রথম সাক্ষাৎকার ও সংবর্ধনা।

২০ জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রীর মেঘালয় ও অরুণাচল নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে।

২১ জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুনর্গঠিত মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের উদ্ভাধান।

৫-৮ ফেব্রুয়ারী—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কলকাতা সফর ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধীর যোগদান।

১৫ মার্চ—রাজ্যে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও রাজ্য বিধান-সভার নির্বাচন কংগ্রেসের বিরূপ সাফল্য।

২৭ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধীর বাংলাদেশ সফর ও বিশাল সংবর্ধনা লাভ।

১৯ মার্চ—ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত।

২৮ জুন—২ জুলাই—সিল্লার ভারত-পাকিস্তান চুক্তি সম্পাদিত হোল। আলোচনার মারফত উভয়ের সমস্যা সহজ হোল। দপলীকৃত এলাকা বিনিময়ের সূত্র রচিত হোল। বল-প্রয়োগের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মারফত উভয়ের সমস্যা সমাধানের আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হোল। ইন্দিরার শাস্তিনীতির জরাজীর্ণ আবহ সূচিত হোল।



১

এই চিহ্ন

ডোরা-করেন্সি

অষ্টম অঙ্ক

উক্ত এক কল

গাথা চলচে মূখে মূখ্যে

হলেন পোশিত

মুখ নয়, তাকি

তেরখাই হোলে হুটে চলে  
যানে যানে জাতি  
একল সন্ধ্যা সোনার  
মিষ্টি-চুল মেয়ে  
আদি সন্ধ্যা সন্ধ্যা  
কল মূখ্যে মূখ্যে  
চোটে করে এনে  
কোলা সন্ধ্যা সন্ধ্যা

কে যেন বলল : আমি

পাখির মত  
সানি সানি  
অপার বোঝে  
আর এক  
অচিরে  
কে যেন বলল : আমি

অষ্টম অঙ্ক

পৃথিবীতে নাকি  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক

## অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক  
অষ্টম অঙ্ক



# চিলের ডাক

## গোপাল সামন্ত

রবিবারের দুপুর। ছুই-ছুই বেলা।  
বিনয়বাবুর সঙ্গে গল্প হাঁড়ল এক বন্ধুর  
বাড়িতে বসে। একথা সে কথায় ঘুরতে  
ঘুরতে শেষে শব্দ আর স্মৃতির প্রসঙ্গ  
চলে আসে। কথাটা উঠতেই আমি বলে  
উঠি—আজ্ঞা, বলুন তো, ছুই দুপুরে  
একটা চিলের ডাকই কী মাননকে  
কতোকাল আগেকার একটা সন্মানে ফিরিয়ে  
নিয়ে যায় না?

ঠিকই বলেছেন—তিনি বলে উঠলেন,  
একটা চিলের ডাক শুনেই আমি হঠাৎ  
তিরিশ বছর আগেকার এক হোলকটকের  
গরের মধ্যে ফিরে আসি।

সেমন আচমকা আমি চিলের কথা  
বলেছি। তেমনি দ্রুত এক স্মৃতি-  
ফলকানো উত্তর।

আরও কিছু কথার পরে আমি উঠে  
দেলাম। দুপুরের খায়ার সময় হয়ে  
গেছে, এবারে বাড়ি ফিরতে হবে, ওকেও  
বলতে হবে অনেক দূরে সেই মানিকভাঙ্গা।  
বলত, চিলের কথাটা কেন আমি বললাম—

অনিচ্ছায় বাড়ি ফেরার সময়— চিলের  
ডাক তো আমি কতোকাল শুনিনি।

ভারপরে বাড়ি ফিরেছি। খায়ার  
পাট চুকিয়ে জানালার কাছে বসেছি,  
তখনই মনে পড়ল আবার সেই কথাটা।  
এখানে বসেই তো আগে আমি চিলের  
ডাক শুনেতে পেতাম! কিংবা বিছানার শুরে  
কেন কোন ছুটির দুপুরে। আমার  
সামনে যে আকাশটা আজ ভায়ের রোদে  
জ্বলজ্বল করছে ওখানে আগে সামনের  
বাড়ির একটা নারকেল গাছ পাতা নাড়িয়ে  
দুলতো, দীর্ঘ সেই গাছটার মাধ্যম দ্বারা  
চিল বাসা বেঁধে অনেকদিন ছিলো—এই  
অলিগঞ্জে, কলকাতায় অতীব বেমানান।  
নিতান্ত অসভ্য—কাঁটাহাড় কাঠকুঠে কেলে  
তারা এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছান-উঠান নাথায়  
করে নিতো; আর মাঝে মাঝে দুপুরে  
তাদের তীক্ষ্ণ শব্দ ভেদ করে চলে যেতো  
এ-পাড়ার শান্ত আশ্রয়ে।

কিন্তু আমার ভালো লাগতো। ডাকটা  
আমাকে অনেক দূরের কেলেক্সান্ডার  
একটা দুপুরের মধ্যে নিয়ে যেতো।

সেই শব্দটা কী এখনও হচ্ছে জানাথাক—

কতো দূরের এক অতীতের মধ্যে ফেরে—  
সেই দুপুরে—আকাশ—চিলের ডাক... আমি  
কলকাতা থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে  
গিয়েছি। বাড়ির সামনে আমালগ্নই ছড়িয়ে  
সাঁওতাল-পাড়া। সেখানে আমার জন্ম-  
চাঁদী বীরদ-সাঁওতাল আমায় কীভাবে  
ছিলো-লাগানো একটা স্মৃতির কবর  
দিয়েছে। তাঁর কবরটা—একটার  
মাধ্যম লোহার কলা লাগানো, বাকি দুটো  
শিল্পের তৈরি মাধ্যম। শিল্পের দ্বিতীয় কিল  
সারি চেরা-গালক বড়ো আর আরো কিল  
সুন্দরভাবে লাগানো, ডব, আমার পালক  
নয়—এগুলো সবই শিল্পের দ্বিতীয় কিল  
মোটা, মোকা, হালকাও; কিন্তু কলকাতা নয়।  
একটু জোর লাগলে নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে।

বীরুন আমাকে বোকার—ই অনেক দিন চলাবেক, তুরা তো শোহোরকে থাকিস, তাঁর ইন্দক আর কতো ছাড়বি।

না, না আমি অনেক ছাড়বো। তুমি জানো না, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড়ো মাঠ আছে, সেখানেই ছাড়বো, কোনো একটা শক্ত জিনিস দিয়ে করে দাও।

বীরুন ভাবতে থাকে।

আজ্ঞা, কণ্ড দিয়ে করলে কী হয়?

সী কী ই গায়ের কণ্ডিতে হবেক। কিন্তুক আরেক রকম বাণ ছিলো—সীটা ই দেশে তো মিলবেক নাই।

আমাদের কথার কাছাকাছি আরও দু-জন সাঁওতালপাড়ার পুরুষ। মেয়েরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। বীরুনের বোঁ একটু দূরে খেজুরগাভার তৈরি চটাইয়ে সিঁখ ধান শুকোতে দিচ্ছে, তার কিশোরী মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার খনুকে তাঁর লাগিয়ে ছিলে টানা দেখছে; আমাদের কথাও সে শুনছিল নিশ্চয়—এগিয়ে এসে বীরুনকে কী যেন বলল। সাঁওতালী ভাষা আমার জানা নেই, তবু কথার ভাবে মনে হল সে যেন এই তাঁর বৈষয়েই কিছু বলছে।

ও কী বলছে রে?—আমি প্রশ্ন করি বীরুনকে।

বলছে বী আছেক একটা, উ দেখেই এসেছেক, কিন্তু সী তো ই গাঁয়ে লয়, অনেক দূর, কে আনবেক?

ঠিক তখনই কী, তাঁর কুঁয়ন হয়েহে দেখি—বলতে বলতে আর একজন মানুষ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সে আমারই এক-রকম কাকা-পানকাকা। আমারই বয়সী বলে আমাদের মধ্যে তুমি ডাকের সম্পর্ক, গ্রামেই সে বরাবর থাকে; কাল আমি এখানে পেঁপীছোঁয়ার পর থেকে সারাদিন প্রায় তারই সংগ কেটেছে—বলতে গেলো আমার এ-গাঁয়ের গাইডই এখন সে।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনলে সে বীরুনকে বলে—তা ভোঁরা কেউ গিরে কেটে এনে দে না।

কিন্তুক ই গাঁয়ে তো লয়। আর বাড় সী যদি—

ভিনু-গায়ে অচেনা লোকের বাড়ি কণ্ডি সঁতাই ওরা কাটতে পারে না। লোকটা বুদ্ধে পনকাকা একটু চুপ করে যায়, তারপর আমার দিকে গিরে বলে—চলো, আমরাই গিরে কেটে গিরে আসবো, কিন্তু দু-পুরুষের খাওয়া হলোই বেরিয়ে পড়তে হবে, দূর তো কম নয়—কেতে আসতে চারকোশ—পারবে তো অতোটা হাঁটতে।

পারবো না মানে?—আমি প্রতিবাদ করে উঠি।

কথা আর না বাড়িয়ে সে দূরে বীরুনের স্নেহকে প্রশ্ন করে—ঠিক কোন জায়গায় বলতো বাড়টা?

বাকা পার হয়ে পশ্চিমে গাংপুদের কাছাকাছি একটা গ্রামের দক্ষিণে এক জঙ্গলের মতো জায়গায় একটা বড়ো আম-গাছের কাছাকাছি সেই বাড়টা—সে নিশানা দেয়। পনকাকার পক্ষে স্বপ্নে, কিন্তু আমি একটু অবাক হয়ে ভাবি—এতে সে কী করে খুঁজে বের করবে? তবে ওটা আমার চিন্তার বিষয় নয়। আমার শব্দ একটু ভাড়াভাড়ি সেখানে পেঁপীছোঁয়া দরকার। বলে উঠি—দু-পুরুষ তো প্রায় হয়েই এল, এখনই খেয়ে বেরুলে হয় না?

ও একটু হাসে—আমরা কি তোমাদের মতো শহরের লোক যে সকাল দশটায় সব খাওয়া দাওয়া শেষ? তবে দেখি, আজ বৌদিকে তোমার নাম করে বললে কী হয়!

ভাড়াভাড়ি রামার কথাটা বলতেই হয়তো সে বাড়ি চলে যায়, আমি তাঁর-ধনুক নিয়ে হাটা দিই বড়ো-পুরুষের দিকে। আমাদেরই বংশের কোন এক বড়বাবুর কাটানো—তাঁরই নামের ওই বিশাল পুকুরটা যেন দাঁঘির মতো বড়ো। পাড়গুলোও তেমনি চওড়া। আর অনেক কালের পতিত হওয়ায় ওদিকে মানুষের আসা-যাওয়া খুবই কম। তাঁর ছোঁড়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা ওটা ই গাঁয়ের মধ্যে।

পাড়ের ওপরে সারি সারি বাবলাগাছের মধ্যে কোন একটা বোঁ নিয়ে তার গাঁড়ির এক জায়গায় ওপরে নিচে দুটো কাংশিক রেখার মাঝখানে লক্ষ্য করে আমি তাঁর গলোকে ছাড়তে থাকি। সবগুলো তাঁরই ছোঁড়ার পরে সেদিকে ছেঁটে গিরে তাঁর ছোঁড়ের আবার অন্যদিকে ছাড়তে দিই—এমনিই চলতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক সময় খাওয়ার ডাক এল।

দু-পুরুষের খাওয়া শেষ করে দু-জনে দুটো কাটার নিয়ে আমরা সেই ডলতা-বাঁশের বাড়তে জমা, চলছি। আমাদের খামারবাড়ির পিছন-দরজা দিয়ে বের হলোই আর একটা পুকুর—তালবনা। তার নিচে রামার দক্ষিণ মাঠ। মাঠের ওপারে মাইল-

খানেক দূরে বাকা-নদী। নদী পার হয়ে কোথায় যেন সেই অজানা জায়গা যেখানে আমাদের বাড়বান।

তালবনা একটা সুন্দর মাঠ। পুকুরটার চারদিকে সীমানার ধারে সারি সারি তাল-গাছ—সেজন্যই হয়তো এই নামকরণ; কিন্তু এটার পাড়ের ওপর বাবলাগাছও কিছু কম নেই। তার কাটাগুলোও সব জায়গায় এমন ছড়িয়ে আছে যে খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়—কাল বিকেলেই তো এখানে আমার পারে একটা কঁটা ফুটে গেছে। সেই কথা মনে পড়ায় মাটির দিকে তাকিয়ে আমি হাঁটছি, তখনই দু-পুরুষ কেন চমকে উঠল হঠাৎ—

তাক! এক কান্নার মতো শব্দ আকাশ থেকে নামছে, মাঠের ওপর দিয়ে, আকাশের মধ্যে দিয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে দু-পুরুষের স্বপ্নভেদ করে চলেছে দূরে—চলেছেই।

আমি থমকে দাঁড়াই—ওটা কিসের ডাক?—ও একটা চিল—পনকাকা বলে।

আমি অবাক হয়ে বাই। চিল, চিলের ডাক। সেই যে কলকাতার আকাশে কাকের মতো, কিন্তু অনেক বড়ো একরকম পাখিকে আমি কতো উড়তে দেখেছি এইরকম তার ডাক? ডাকটা থামলো কেন? আবার ডেকে উঠুক চিলটা, আমি আর একবার শুনবো।

পনকাকা কথা শেষ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। কিছুটা দূরে গিরে সে বুদ্ধল যে আমি তার সংগে চলাছি না, থেমে দাঁড়িয়ে বলল—কী, কাটা ফুটলো নাকি?

কাটা নয়। এ অন্য কিছু। ডাকটার রেশ আমার মনের মধ্যে চলেছে—যে কোনো স্বপ্নের দেশ থেকে ভেসে ভেসে আসছে—খুব করুণ দূরে কে যেন তাকেই কেঁদে কেঁদে ডাকছে যে দূর থেকে শোনে, কাছে আসতে চার, তবু পারে না কিছুতেই—

কিন্তু এমনি একটা কথা ওকে বলা যায় না। বলে উঠি—এই পুকুরটা একটু দেখাছি।

ওটার তোমাদের দু-আনা ভাগ আছে। এখন চলে এসো তো; কতো দূর বেতে হবে জানো?

সঁতা, তাঁর বৈষয়টা আমি ফুলেই গিয়েছিলাম—সেটাও কম জরুরী নয়। চিলটাও আর ডাকছে না। দ্রুত পা চাঙ্গিয়ে আমি ওর কাছে চলে বাই যেখানে পাড়ের সীমানায় সেই তালগাছের সারি। দুটো গাছের মাঝখানে আমরা হাঁটছি, তখনই আবার সেই চিলটা ডেকে উঠেছে তেমনি আগেকার মতো দূর—শব্দ আরও একটা করুণ—যেন যাকে ডেকেছিল সে সাড়া দেয় নি, দিতে পারে নি। পারবে না তাও যেন জানা—তাই আরও করুণ দূরে শব্দ ডেকে ডেকে যাওয়া—

আমি মূখ ভুলে খুঁজি কোন গাছটা থেকে সে ডাকছে, কোন পাতার মধ্যে বসে আছে, কিন্তু দেখা যায় না—শব্দ সবচেয়ে পাতাগুলো এক রোদ-জলজ্বল আকাশের নিচে অল্প অল্প কণ্ডি, তালগাছের কানো গাঁড়িগুলো যেন মোটা মোটা সোল খামের

বিতা সস্ত্রোপচারে  
অর্শ থেকে  
আত্মসংপাতার  
জন্ম  
অ. ডনসা  
ফলন  
ব্যবহার করুন!

মতো আকাশ স্পর্শ করে উঠে তাদের মতো  
হাতগুলো দিয়ে আকাশটাকে ছুঁতে করে  
রেখেছে—এগুলো মনে পড়েই ওটা কোন  
মাটিতে হঠাৎ খসে পড়বে।

চমকে উঠে পন্থাকার গলার লম্বে  
—আবার ভূমি খামছো? এখানে এতো দেরি  
করলে দেখো গেছে হুজুতো কণি লা নিয়েই  
ফিরে আসতে হবে।

আমি প্রভু পা চালিয়ে দিই ওর দিকে।  
মাঠের মাঝখানে কোণকূর্ণ ও হেঁটে চলছে;  
কিন্তু আমার শব্দের পারে এই ফাটা ফাটা  
গরম মাটিটা বেন কাঁকরের মতো কটুছে;  
তার কটা ধানের শব্দ গোড়ার পা লাগলে  
যেন শিরিষ কাগজেই আঙুলগুলো ঘষে  
ঘষে বাজে। লাগনের আলের উপর উঠতেই  
আমি বলে উঠি—এবারে আলের ওপর দিয়ে  
চলো, উঃ মাটিটা যা শব্দ!

হ্যাঁ, বাব্বা! এ হলো এ'টেলমাটি—খাঁটি  
এ'টেল! শুরুরালে পাথরের  
চেয়ে একটুও কম নয়!

খুবই খারাপ মাটি তো?

বলো কী? এ'টেলের মতো ধান আর  
কোন মাটিতে হয় বলতে পারো?

আমার কাছে নিশ্চয়ই সে কোন উত্তর  
চাখনি। ও এখন বলছে মেনেই নিই আমি—  
ওর মাটির দিকে তাকিয়ে দেখি—এখন  
মাতাই পাথরের মতো—তেমনই কাঁচা  
হলুদ রং শব্দ তফাৎ ইকড়ি বিকড়ি ফাটল-  
গলো। সমস্ত মাটিটা বেন টুকরো টুকরো  
কুটে গিয়েছে—তার মধ্যে ওই কাটা ধানের  
গোড়গুলো একদিনের সবুজের স্মৃতি নিয়ে  
এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু ওইসব ফাটল  
আবার একদিন বর্ষিতে ভিজ বম্ব হয়ে  
যাবে, এই মাঠ সবুজ হয়ে উঠবে, অনেক ধান  
ফসলে—আজ দেখে তা মনে বিশ্বাসও করা  
যায় না। এখানে একবার বর্ষাকালে আসব  
গ্রামে মনে মনে ভাবি।

পন্থাকা আমার কথায় এখন আলের  
ওপর দিয়ে হাটছে। সে এবারে এই মাঠের  
সব জমি আমাকে চেনাতে সুরু করেছে—  
এইটে তোমাদের জমি, তিন বিঘে দু'হুটকে—  
খুব ভালো জমি, বৃষ্টি ঠিক হলে বিঘে  
খোল মনের বেশি ধান হয়। আর, এইটে  
হলো কোয়ারদের—বু' বিঘে ন'হুটাক। ওটাও  
খুব ভালো কিন্তু জোমালেকটার মতো নয়।

কথা শুনতে শুনতে আলের ওপর দিয়ে  
শুনো ঘাস মাড়িয়ে, শুনো ছিটিয়ে কখনও  
ডাইনে কখনও বায়ে পন্থাকার পিছনে  
হয়ে খুঁজে আমি চলছি। দূরে কোন্  
একটি জমির দিকে আগল দৈখিয়ে সে  
বলে—ওই হে দেখছো, একটা উঁচুতো  
আল, তার দক্ষিণের জমিটাও তোমাদের—  
আড়াই বিঘে—একটু নালাল, কম বর্ষিতে  
খুব ভালো ধান হয়—

আমি অনেকদূর হয়ে একটা কথাই  
ভাবছি—এই বিশাল জায়গার মতো মাঠের  
অগনহুটি ওইসব আলের ছোটা ছোট ছাঁচ  
আমার কাছে সব একই রকম লাগছে—

আমি যখন ও কি করে সব জমি চিনে-সিঙে  
পারছে? আর এগুলোয় কতো খবরই কর  
জানো। আমি তো সারা জীবন এখানে  
থাকলেও একরকম পারতাম না।

পন্থাকানা আরও কী বেন বলছে, কিন্তু  
আমার সামনে এই মৃত মাঠের ওপরে  
অনেকদূর আগেকার নদীর চিহ্ন সেই নীল  
সবুজ রেখাটা ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠে এবারে  
তার মধ্যে থেকে গাছ বেরিয়ে এসেছে।  
আরও কাছে নদীটা। খুব কাছে নদীর বন।  
এখনই আমি একটা নদী দেখতে পাবো—  
সত্যিকারের নদীর মতন। বাঁকা-সদীর যে  
দিকটা আমি গ্রামের পাশে আসার সময়  
পল্লব ওপর থেকে দেখেছি সেখানে শব্দ  
ধানের আড়ৎ, ধানকল—তার বাইরে জমাকরা  
পাহাড়ের মতো ছাইয়ের গালা, আর শব্দ  
মানুষের বাড়ি-ঘর। আমি এক খিনি  
জামার মধ্যে নদীটাকে কিছুতেই নদীর  
মতো লাগে না।

—দ্যাখো, এখানে কিন্তু আর এ'টেল  
নেই, সবই শুনো জমি—আল, আখ কলাই  
এইসব হয়। তোমরা কিন্তু শুনোয় ফসল  
কিছুই পাও না বলতে গেলে। অতো যে  
শুনো জমি তোমাদের—

বলে একটু থামে সে, তারপর বলে—  
ভাগে কী আর শুনোয় চাষ হয়।

শুনো নামটা কেমন বেন সুন্দর লাগছে,  
কিন্তু আমি জানি যে দৌরাশ মাটিকেই ও  
শুনো বলছে, ভালোম সে কথা ওকে বলি,  
কিন্তু নদীর দিকে একবার তাকিয়ে চাইঃ  
ওকে অধিক করে একটা হুট দিয়ে আমি  
তার পাড়ের ওপর গিয়ে উঠি।

এক মহুতে একটা বনই আমার চোখের  
সামনে—কতো রকমের গাছ গুল্ম লতা।  
সব এক জায়গায় ভিড় করে নিচে ওপরে  
এখানকার সমস্ত জায়গা সবটা মাটি ওরা  
এখানকার সমস্ত জায়গা সবটা মাটি ওরা  
দখল করে নিয়েছে—ওদের মধ্যে যে-সাবর্ণি  
দিকে যারা এগিয়ে গিয়েছিল তাদের খোলা

ভালগুলোকে কেউ ছাড়িয়ে নেওতা হয়েছে,  
কিন্তু নদীর দিকে খানকিছু—এখানে কিছুই  
বেন হুড়িড় খসে পড়ছে—ভাল বাঁকিয়ে  
নদীটার অন্যই বেন হুঁতে গিয়েছে জায়। বন  
গাছের পাতার পাতার এখনটা ছায়া ছায়া  
অন্ধকার—তার আড়ালে ফাটা চোখে  
পড়ে না ওখান থেকে—গাছের ডালকে কঁকে  
চোখ বাকিয়ে আমি ফাটা দেখতে চাইছি,  
তখনই চোখ পড়ে—আরে! এ কী! এখানে  
বনের মধ্যে সেই আশ্চর্য লতায় ফুলটা  
একটা গাছের মাঝার কতো জলজ ফুলে  
আছে!—সেই যে নীল ফুলকো ফুলকো  
পাপড়ির মাঝে ছোট একটা হলুদ ছিট—এর  
ফুল—যে লতাটা আমি কলকাতার আমাদের  
পাড়ার একটা বাড়ির গেট-এর মাঝার কতো  
হতা করে ফুলতে দেখেছি, শুনোই অনেক  
দূর, কী-বেন একটা গোলভারি মাঝ, কিন্তু  
এখানে এই বনের মধ্যে সে নাভবীম সে  
নিজাই একটা গাছের মাঝার দ্বিধারে এ-রকম  
ফুল ফুটিয়ে রেখেছে!

ওই লতাটার কোন চারাও হুজুতো ওর  
কাছাকাছি আছে। আমি সামনে এগিয়ে  
গোলাম। এক ভাল সরিয়ে লাগা করে আর  
একটু ভিতরে গিয়ে আরও একটা ভাল  
সরাতে বাঁকি, জমকে উঠলাম—সাপ!

পন্থাকা সাবধান করছে—আরে সাপ!  
যাছো কোথায়? এখানে দারুন সাপ!

আমি খেয়ে লিড়িয়ে পড়ছি। সাপ দেখা  
যায় না, শব্দ পালের নিচে মাটি—আড়াল  
করা কোপ আর শব্দকো ভালপাড়া। এখানেই  
কী সাপ বা পন্থাকা বলছে?

পন্থাকা বলে উঠে—চলো এসো, এক  
নদীর ধার তার আবার গ্রীষ্মকাল, বনের  
মধ্যে ও-রকম কখনও ঢুকবে না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ছব্দ  
মনটা খারাপ হয়ে গেছে—সাপের কলর  
ভয় পেয়ে লতাটার একটা চারা খুঁজে লুখা  
হওয়া না।

—চলো এসবের পন্থাকা পার হতে হবে—  
বলে ও লিড়িকে আয়ে। একটু এগিয়ে



দু-পাশে ছোট ছোট গাছের মধ্যে দিয়ে  
হামুকের হাটা-পথ দিয়ে এগিয়ে চলে।  
এখানে গাছ অন্যরকম—আমি দেখি।  
মানুষের চলা পথটা সব সময়ই অন্যরকম  
হয়।

সামান্য একটু হাটার পরেই আমরা এক  
আশ্চর্য সাক্ষর সামনে চলে এসেছি। আমি  
অবাক হয়ে দেখছি। শব্দই বাঁশ দিয়ে তৈরি  
এই অদ্ভুত সাক্ষরটাকে—নদীর ওপারে  
ওপারে বাঁশের খুঁটি মাঝখানেও কীভাবে  
বেন বাঁশ পুঁতে, তার গায়ে বাঁশ বেঁধে এক  
সেতু তৈরি হয়েছে যার ওপরে ধরে চলায়  
জনা বাঁশের একটা হাতলও করা আছে।

পনুকা সাক্ষর দিকে এগিয়ে যায়।  
আমিও ওর পিছন পিছন তার ওপরে উঠছি,  
ও বলে ওঠে—না, দুজনে একসঙ্গে নয়  
আগে আমি পার হই, তারপর তুমি উঠবে।  
না হলে দূরে উঠে একেবারে নিচে ছিটকে  
পড়তে হবে।

সাক্ষরটা পার হয়ে গিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে  
সে বলে—দেখো, খুব সাবধানে কিন্তু, না  
দূরে যার, দেখো—

আমি আস্তে আস্তে সাক্ষর ওপরে  
উঠে সাবধানে পা ফেলি। বাঁশগুলো সবশুদ্ধ  
দুজনে শূন্য করেছে, আমার একটু ভয় ভয়  
লাগছে, কিন্তু সাক্ষরটা আমি পারও হয়ে  
গেলাম। ওপরে পৌঁছোতেই পনুকা বলে  
ওঠে—কখন তো পৌঁছিয়ে এসে; তুমি ঠিক  
শহরের ছেলের মতো নাও।

—কেন; শহরের ছেলে কী রকম?

উদাহরণের গল্পটা শুন করেই সে—  
আমাদের গ্রামেরই এক বাড়ির আত্মীয় এক-  
জন কলেজে পড়া ছেলে সাক্ষর পার হতে  
গিয়ে কি-রকম জলে ছিটকে পড়েছিল তারই  
কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে চলছি, এ-কথা  
সে-কথা বলছি আমিও। গল্প বদল হয়ে  
শেষে, কখনও বা স্তম্ভভায় শব্দ পথ পেরিয়ে  
যাওয়া মাত্রের মধ্যে দিয়ে, কাশবনের ফিকে  
ফিকে হাটা-পথ দিয়ে, রেল-লাইনের ওপরে  
উঠে স্কাইপার পারের পারে, কিছুটা পরে  
নিয়ে আবার মাত্রের ওপর, দক্ষিণ-পশ্চিমে  
আমার অচেনার মধ্যে দিয়ে অনেক পথ;  
একটু সম্মান শেষটার, তার পরেই হঠাৎ এক  
বিশ্ময়ের বাঁশ-ঝাড় একটু বনের মধ্যে  
জায়গার।

দ্যাখো, দ্যাখো, এই যে!—আমি প্রায়  
চিৎকার করে উঠলাম।

এ একেবারে অন্যরকম বাঁশ। একেবারে  
সোজা লম্বা লম্বা গাট। কণ্ঠ নিচের দিকে  
প্রায় ঝুঁকিয়ে নেমেই হয়। পাতাও খুব কম। ঠাণ্ডা  
কন কাড়টা বেন বিশাল এক আখের বোকার  
মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

কাড়ের দিকে কাটারি নিয়ে এগোতে  
গিরে হঠাৎ খেমে আমি বলি—একটু দেখলে  
হয় না কইনের কাড় তাদের না বলে—

আরে, কে কী বলবে! এ তো গিরের  
বাইরে। আর শব্দ কণ্ঠই জে কাটেতে এসেছি  
আমরা—বাঁশ হলে না হয় কথা ছিলো।

কিন্তু বাঁশ—মরো—  
কেউ কিছুর বলবে না, আর তোমার  
বাবার নাম শুনলে তো—  
বাবার নাম! বাবাকে ওরা কী করে  
চিনবে?

বাং চেনে না! এখানে সবাই সবাইকে  
চেনে—অমরক গিরের অমরক, অমরকের ছেলে  
অমরক—তা সে এখানে থাকুক বা শহরেই  
চলে যাক—

আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। পনুকা  
এসব বিষয়ে ভুল কিছুর বলবে না। কণ্ঠ  
কাটেতে এগিয়ে বাই—একটু অব্যস্তিত তবুও  
মনের মধ্যে, তারপর ভুলে যাই। নিচের  
দিকের সব কণ্ঠ শেষও হয়ে গেছে।

এতো অনেক কণ্ঠ হলো—পনুকা  
বলে ওঠে।

তখন আমি বাঁশ বেয়ে ওপরে উঠতে  
বাছি। বলে উঠি—দেখোছো, ওপরের দিকে  
কতো ভালো ভালো কণ্ঠ।

আরে, আরে, করছো কী? পড়ে যাবে।  
এই নরম বাঁশে কখনও ওঠা যায়?

সত্যিই বাঁশগুলো নরম। একসঙ্গে দু-  
তিনটে বাঁশের ওপর-ভর দিয়ে তবেই উঠতে  
পারা যায়। আমি উঠে বাই ফোনমতে। ঘন  
ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি বাইরের বাঁশ তেঁত  
সরিষে। তারপরে কণ্ঠ। এ-বাঁশ ও-বাঁশ  
টেনে, ফাকে ফাকে গলে, এদিকে ওদিকে  
ঘুরে নাগালের মধ্যে সমস্ত কণ্ঠ এক সময়  
কাটাও হয়ে গেল। আমি নিচে নেমে এলাম।

পনুকা তখন সেগুলোকে জড়ো  
করছে এক জায়গায়। আমার দিকে তাকিয়ে  
বলে, তুমি একটা গেছো বটে! কিন্তু এত  
কণ্ঠ এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়।

কণ্ঠগুলোর দিকে তাকাই। সত্যি, মন্দ  
হয়নি। ওগুলো কাটার উত্তেজনা কমেও  
এসেছে, হাত পা জ্বালা করছে এবারে।  
তাকিয়ে দেখি—ওই ঝাড়ের মধ্যে কিসের  
কখন লেগে হাত পা সবই ছড়ে আঁচড়ে  
গিয়েছে অনেক জায়গায়, শব্দ ডান হাতেব  
কম্পের ওপরে কিছুটা রক্ত কুটে বেরিয়েছে।  
সার্ভের কোনটা ভুলে নিয়ে আমি সেটাকে  
মুছে নিছি, তখনই চোখ পড়ে গিয়েছে ওর।

দেখি, দেখি কতোটা কাটলো? —বলে  
এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরতে যায়—  
তখনই বললাম যে উঠো না!

—কাটাটা ছেড়ে দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে  
বলি—ও কিছুর নয়, একটু ছেড়ে গিয়েছে।

আমার মূখের দিকে কয়েক মূহুর্ত,  
অবাক চোখে তাকিয়ে সে আবার কণ্ঠ  
কাছে ফিরে যায়। সেগুলো গোছাতে  
গোছাতে বলে ওঠে—তোমার আর কলকাতার  
ফিরে গিরে কাজ নেই, এখানেই তুমি থেকে  
যাও।

কণ্ঠগুলোকে গুঁছিয়ে দুটো সমান ভাগ  
করে বাঁধার জন্য সে লতা খুঁজতে চলে যায়।  
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের জায়গাটা

দেখছি, একটা প্রশ্নও মনের মধ্যে এসে  
গেছে—আচ্ছা, এই রকম একটা জায়গায়,  
আমাদের গ্রাম থেকে এতো দূরে এই বাঁশ-  
ঝাড়টার কথা বীরেনের মেয়েটা কী করে  
জানল?

পনুকা ফিরে আসতেই তাকে  
প্রশ্নটা করি। ও উত্তর দেয়—কে জানে!  
হয়তো জ্বালানি-টালানি কাটেতেই এদিকে  
এসেছিল, কিংবা অন্য কিছুর হতে পারে।  
ওরা তো সাঁওতাল, গ্রামে এসে চাষ করলেও  
বন-জঙ্গল কোনদিন ভোলে না।

জ্বালানি কাটেতে? এতো দূরে?

আমার প্রশ্নের সুরটা হয়তো ওকে  
অবাক করেছে, আমার মূখের দিকে সে  
আবার তাকিয়ে আছে, তারপর চোখ সরিয়ে  
নিয়ে বলে—কী করবে, বাঁশের করলো  
কেনার পরসা নেই, নিজেদের গাছ নেই,  
তাদেরও তো রাখতে হয়।

আমি চুপ করে যাই। মনটা কেমন  
যেন লাগে।

লতা দিয়ে বেঁধে সত্যিই দুটো চমৎ-  
কার বোঝা তৈরি হয়েছে। দুজনে সে-  
দুটোকে তুলে নিয়ে আবার হাটেতে হাটেতে  
কথা বলতে বলতে পৌঁছে বাই বাঁকা নদীর  
সেই সাক্ষরটার কাছে। এবারে আমি  
প্রথমেই ওতে উঠছি, ভয় করছে না,  
হিসাবটা জানা হয়ে গেছে—হাটলে সাক্ষর  
দুলাবেই, শব্দ সেই দোলানিধ তালে তালে  
পা ফেলে চলতে হয়।

তালবনায় পাড়ের কাছে এসে আমি  
থমকে দাঁড়াই। এখানেই সেই চিলটা ডেকে  
উঠেছিল, অনেকক্ষণ থেকে আবার সেটা  
শুনতে চলেছি। কিন্তু এখনও ডাকেনি।  
পনুকার দিকে ফিরে বলি—এখানে একটু  
বসে গেলে হয় না?

খুব এলিয়ে গিয়েছো, না? উঃ বা  
রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গেল।

বলতে বলতে সে কোথাটা পাড়ের  
ওপর ছুঁড়ে ফেলেছে। আমিও আমার  
বোঝা নামিয়ে দিই। কণ্ঠের ওপরে আমরা  
দুজনেই বসে পড়ি। কোঁচার খুঁটটা আলগা  
করে ঘাড় গলা মুছেতে মুছেতে সে বলে—  
বলো তো আজ তাতটা কী রকম? তোমা-  
দের কলকাতার শুনছি এতো গরম পড়ে  
না—

কথাটা ও হয়তো ঠিকই বলেছে, কিন্তু  
আমি চিলের কথাই ভাবছিলাম। বলে উঠি  
—আচ্ছা, চিলটা আর ডাকছে না কেন  
বলতে পারো?

চিলটা? কোন চিলটা?

সেই যে বাবার সমস্ত এখানেই ডাকছিল  
যেটা? কেন তুমি পোনোনি?

ও তো রোজই ডাকে দুপুরে। আচ্ছ  
কিন্তু আর ডাকবে না।

কেন?



চিল দৃপ্তর ছাড়া ডাকে না—বল  
আমার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রশ্নটা করে  
—চিলের কথা নিয়ে এতো ভাবছো কেন  
বলো তো?

এমনিই—আমি বলি ওর মুখের দিকে  
চলে। আমারও মনে একটি প্রশ্ন—রোজ  
শুনলেই কি চিলের ডাকের সেই করুণ  
সুরটা মানুষের কাছে হারিয়ে যায়? না  
কি আর কিছ?

কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার যখন  
সাঁওতালপাড়ায় এসে ঢুকলাম, তখন রোদ  
চল গিয়েছে, তবু দুপুরের রোদে-  
তাদিনে মানুষগুলো তখনও ঘরের মধ্যে  
থেকে বের হয়ে আসেনি। শুধু বীরুনের  
সেই মেয়েটা একটা মুরগীর পিছন ছুটে  
একটা ঘরের আড়ালে চলে যাচ্ছে দেখলাম।

পন্থাকা ডাক দিল—বীরুন আহিস্।  
সে উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বাইরে  
বেরিয়ে এল। আমাদের দুজনের হাতে  
কণ্ডির বোঝার দিকে একটু বিস্ময়ের  
দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—ই যে অনেক কাঁও  
এনেছিস।

বলতে বলতে সে এগিয়ে আসছিল,  
হারপরে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে—  
দাঁড়া, তুদের বসার উটা নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে  
যায়। বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটা বাঁশের  
খাটিয়া নিয়ে—পায়া, ঘেরা সবই বাঁশ দিয়ে  
তৈরি, তাতে কী এক রকম খাস বা ঘাসের  
মতো দেখতে কিছু একটা দিয়ে পাকানো  
দড়িতে সুন্দরভাবে বোনা—এটাতেই সে  
আমাকে কাল এবং আজ সকালেও বসতে  
দিয়েছিল।

বসা আমার দরকারও ছিল। সারাটা  
দুপুর রোদ মাথার ওপর দিয়ে গেছে,  
পথও কম হাট্টনি আমরা। বসে পড়ে পন্থ-  
কাকাকেও কসতে বলি। কিন্তু ও এখন  
বসবে না। চায়ের কথা বলতে বাড়িতে  
যাবে।

সে বাড়ি চলে গেছে। কণ্ডির দুটো  
বোঝাই খুলে ফেলা হয়েছে। খাটিয়ায় বসে  
বসেই আমি কণ্ডি বাছাই করছি, বীরুনকে  
দুধিয়ে দিচ্ছি আমার হিসাবটা—এটাতে  
দুটো তীর হবে। আর, এইটায় মোটা  
দিকটা কেটে ফেলে শুধু একটা তীরের  
মতো রাখবে—এমনিই সব হিসাব।

এতক্ষণ আমাদের আশেপাশে সাঁও-  
তালপাড়ার আরও কয়েকজন এসে দাঁড়ি-  
য়েছে—সবারই চোখেমুখে একটু কৌতূহল  
—যেন এককম একটা ব্যাপার তারা আগে  
কখনো দ্যাখেনি। বীরুন আমার হিসাবটা  
বুঝেছে, কণ্ডিগুলো ভাগ ভাগ করে  
রাখছে, তার পিছনে কয়েকজন পুরুষ,  
বাঁদিকে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তিন-  
জন নারী—বীরুনের মেয়েটাও তাদের মধ্যে  
আছে। ওরা সবাই আমাদের কণ্ডির দিকে  
দেখছে আর নিজেদের ভাষায় কী যেন বলা-  
বলি করছে। ভাষাটা না জেনেও বেশ বোঝা  
যায় যে, এই কণ্ডি অথবা তীরের বিষয়েই  
কিছু বলছে ওরা।

কণ্ডি ভাগ হচ্ছে, গোনা চলছে, আরেক-  
জন সাঁওতাল বীরুনের পৃথক এসে আমা-  
দের কাছে হাত লাগিয়েছে, মেয়েদের কথার  
গুঞ্জন আসছে, সেতারের মতো টুং-টাং  
সাঁওতালী ভাষায়—তারাই মধ্যে হঠাৎ একটা  
হাসির শব্দ উঠেছে। কী নিয়ে হাসছে  
দেখতে আমি তাদের দিকে তাকাই।

আর, ঠিক তখনই যেন কথা বলতে  
বলতে থেমে গেছে বীরুনের মেয়েটা।  
সে হাসছিল—হাসিটা মুখে লেগে রয়েছে  
এখনও। কিন্তু কেন? কী বলছিল ও?  
ওর চোখে চোখ রেখে বলি—কী বলছিল  
রে?

হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গিয়েছে সে—  
চোখেমুখে এক লজ্জা-মাখা অন্যায়ের ভাব।  
আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে একটু  
পিছিয়ে যায়। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তো।  
কী বলছিল যে—আরেকটু জোরে আমি  
বলে উঠি—বল না, কী বলছিলি?

তবু ও উত্তর দেবে না। মুখের

চেহারাটা যেন অনেক বদলে গেছে। শুধু  
ওরই নয়, সবাইকার। আর স্তম্ভতা।

আমার বিস্ময় বেড়ে বেড়ে উঠে—  
কী এমন কথা ও বলছিল যে হঠাৎ এককম  
—অন্য মেয়েদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আমি  
বলি—এই, তোরা বল না, ও কী বলছিল  
যে?

একটু সময় তারাও চুপ করে আছে।  
শেষে উত্তর দেয় একটি বয়স্ক মেয়ে—  
শম্ভু সাঁওতালের বোঁ-উ বুলিছিল বী  
মুনিবটা যেন ঠিক সাম্‌তাল।

একটা কালো মেঘ সরে গিয়ে যেন  
হঠাৎ খলবল করে রোদ কোঁকিয়ে এসেছে—  
আমি হেসে উঠে বলি—তাহলেই তো সব-  
চেয়ে ভাল হতো!

বলে বীরুনের মেয়ের দিকে তাকাই।  
কিশোরী। পুইডগার মতো শ্যামলা-  
সতেজ। কালো চকচকে চামড়া। গলায়  
রাঙিন পুঁতির মালা, খোঁপায় কী এক-  
রকম নাম-না-জানা ফুল। মুখ ঘুরিয়ে  
সে এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।


# অশোক

## স্টেইনলেস

### নং ১

## যাহার বিশেষত্ব

## অনেক



১। ভারতের সর্বপ্রথম স্টেইনলেস স্কেট।

২। ভারতের সর্বাধিক বিতরণী স্কেট।

৩। ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় স্কেট।

BMA/A/198N

অশোক স্টেইনলেস—ভারতের নং ১ স্কেট।

# উদিত সন্ধ্যের দেশে

কমলা মদুখোপাধ্যায়

বর্তমানের 'অরণ্যচল'—যাকে কিছুকাল আগেও 'নেমা বনা' হোত, সেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল যেহেতু আমাদের কাছে অপরিচিতই থেকে সেত বর্ষ ১৯৬২ খ্রিঃ এ অঞ্চলে ভারত-চীন সংঘর্ষ ঘটিল। আজ থেকে ৭৫০—৮০০ বৎসর কাল ধরে এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে গিরিকর্ণেরে, গহ্বাভে, নদী উপত্যকার সহ সব পার্বত্য উপত্যকা ও গোষ্ঠী বাস করছে, তাদের বিক্ষয় আগমন্য কতটুকুই বা খবর রাখি? অতএব এই অঞ্চলের আনুভূতিক সীমারেখার ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজ বিচার করলে বলা যায় এই সব পার্বত্য উপত্যকাগুলিই এক হিসাবে আমাদের সীমান্ত প্রহরীর কাজ করছে।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে নিচের কল্পনা এর অবস্থিতি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কোনমতেই একে উপেক্ষা করতে পারি না। ভূটান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের সংযোগ তিনদিক দিয়ে এ অঞ্চল ভারতের সীমা নির্দেশ করছে। উক্ত হিমালয় গিরিরাজী ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ঢাল, হয়ে লোহিত জেলায় শেষ হয়েছে তারপর সরে, ফলস্বে দক্ষিণ পূর্বদিকের পাতলাই পর্বত শ্রেণী—যার অপর দিকে ব্রহ্মদেশ। ভূটান সীমান্ত থেকে সর্বসিঙ্গির লংক, অবধি পর্বতের উচ্চতা ১৮০০০—২১০০০ ফুট তারপর লোহিত সীমান্তে কারবোর কাছে, যেখানে, সানপো নদী ভারতে প্রবেশ করেছে, সেখানে এর উচ্চতা ১৬০০০—১৭০০০ ফুট। তিহাং ও লোহিত নদীর মাঝে গিরি-শৃঙ্গগুলির উচ্চতা ১০০০ থেকে ১৯০০০ ফুট। এর লোহিত জেলায় প্রকৃতির রূপ ভয়ঙ্কর, কোথাও পর্বত গিরিশাখ, কোথাও সুউচ্চ পর্বত শাখাভাবে উঠে উঠছে। এক পর্বত শ্রেণী থেকে অন্য পর্বত শ্রেণী না উপত্যকার মাঝার কোনও সোকা রাস্তা নেই তাছাড়া মাঝে মাঝে রয়েছে অসংখ্য পার্বত্য নদী—যেজন্য বিভিন্ন উপজাতিগুলির মধ্যে মেলামেল ও সৌহার্দ্য কম। তিব্বত জেলায়



এই উচ্চতা এসে ৬০০০ ফুটে নেমেছে। এই অঞ্চলের পার্বত্য প্রাচীর, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে অস্বাভাবিকভাবে আকারে বেঁধে ধরে রেখেছে। এই উচ্চতা পর্বত শ্রেণী, গভীর গিরিখাত, ঘন অরণ্যাবৃত পর্বত কন্দর—এসবের পটভূমিকার জীবনযাত্রা কঠোর ও রক্ত হলও বিভিন্ন সময়ে, পার্বত্য নদী ও তার শাখাগুলি ধরে মগোজার জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বহুদিন ধরে, বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি, ঘন বৃষ্টিপাত, (২০০ গুই ইঞ্চি) গভীর জংগল, বনা পন্থে উপস্থিতি এদের পলকপরের সংযোগ সাময়িক সম্পর্ক স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে, উপরন্তু সমতলবাসীদের সংযোগ এদের বেশী সম্পর্ক স্থাপন হতে পারেনি। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তর ও পূর্ব থেকে আগত অধিবাসীদের আরও দক্ষিণে আসায় প্রদেশে বাবার গম রুদ্ধ করে রেখেছে, ফলে এসব তিব্বতী-ব্রহ্ম গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ও

সাময়িক দিক থেকে এক বিশেষ স্বাভাবিক বজায় রেখেছে। এখানকার অধিবাসীদের চোখের বেষণে কিছু সাদৃশ্য আছে—এসব দেহের গঠন মল্লবৃত্ত ও মোটামুটি সাদৃশ্য নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উঁচু, চক্ষু তীব্র ভাবে চেয়ে, মুখ ও দেহ রোমহীন, গায়ে রং বাদামী। এদের মধ্যে দাফলা, আপাতানী, দিগমর, মিশমীদের মেয়েরা তো রীতিমতো সুন্দরী। প্রধান গোষ্ঠী হল ২০টি, শাখা প্রাণাথ্য সমেত উপগোষ্ঠীদের সংখ্যা ৭০টি, ৮১ লক্ষ নিকলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করে মাত্র ৪ লক্ষ লোক, যাদের মধ্যে কম পক্ষে ৩০ ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত—সং তিব্বত-বর্মণ, গাংখী, অস্ত্রকৃত্ত। কোনও কোনও উপজাতি ব্রহ্মপুত্র নদী পার না হতে পারলেও পশ্চিমে সিকিম ভূটান, কোর্চিবহাণ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল—কে.চ, মেচ, জা, জা। এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব উপজাতি গোষ্ঠী সীমান্তের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা

বাণেশ্বর, মাধবেন সন্ন্যাসীদের অহমদের ও সমতলবাসীদের, সপো সপ্পক স্পপনেনথ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—সেই দিক থেকে আসামের সপো এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

এই অঞ্চলের কয়েক শত বৎসরের ইতিহাস অনেকটাই কিম্বদন্তী—প্রাচীনকালের ইতিহাসের মধ্যে মহাভারতে এদের 'কিরাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠী ও রাজবংশের সঙ্গে এখানকার দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বহুদিন ধরেই হয়েছে তার বহু প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া গেছে। পূর্বাঞ্চলের নাজনাবন্দ, এমনকি দিল্লীর সল্টারিও যে এখানে তাদের সভ্যতা বিস্তার বা রাজ্য ভয় করতে এসেছিলেন তার নিদর্শন বহু পাওয়া গেছে। যে সব প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য গোষ্ঠীগণের সংঘর্ষ ও সম্পর্কের বেশ কিছুটা ধারণা করা যায়—বিশেষ করে মহাভারতের বিভিন্ন পরিচয়ের সঙ্গে এখানকার কাহিনী, নগস-গালির নাম ও তাদের রাজবংশের নাম জড়িত। কামেস্ত জিলার ভেরেশী বা কমেস্ত নদীর দক্ষিণ তীরে ভালুং পুন্ডে বেঙ্গুরে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, এখানকার আকা উপজাতির দাবী করে যে এ দক্ষিণাঞ্চলের পূর্বপুরুষ ভালুং (মহাভারতের জাম্ববান—যার সঙ্গে সম্ভ্রান্তক মণি ও জাম্ববতীর কাহিনী জড়িত) এর দুর্গ। এই ভালুং বা জাম্ববান ছিলেন বাণরাজার নতি। বাণরাজা রাজত্ব করতেন শোণিতপুন্ডে (বর্তমান তেজপুর) তিনি ছিলেন বর্ণ-বাহার, বংশধর। লোহিত জেলায় সন্নিবাসিত কিছুটা উত্তর-পূর্বে কুন্ডিল নদীর তীরে যে সব প্রাসাদ ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে এর নাম ছিল ভীষ্মকনগর বা কুন্ডিলনগর। রাজা ভীষ্মকেব কন্যা রুক্মিণীকে গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি রুক্মিণীকে হরণ করে এখান থেকে লাসকার নিয়ে যান। কিছুটা উত্তর-পশ্চিম পথে যেখানে তাঁরা নিশ্রাম করেন তাকে এখন বলা হয় মালিনী-পান—এখানে পার্বত্য মালিনী লেগে তাঁদের নাকি অভ্যর্থনা করেন। এখানকার বাল-পাসাদের ধ্বংসাবশেষ, পোড়ামাটির মূর্তি ও বাসনপল এখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়। ভীষ্মকনগরের কয়েক মাইলের মধ্যে বিখ্যাত তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে—যার কিছু দূরে শিবলিঙ্গ ও গৌরীর প্রতীক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে—বর্তমানে লোহিতের প্রধান লহর হেজুতে শিব মন্দির গড়ে এই সব দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুবর্নসিঁরি জিলার দুইমুখের নিকট মায়াপুরে (বর্তমানের ইটা) জিতারী বংশের পলাতক রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে দক্ষিণ উপজাতিদের এলাকায়। আর লোহিতের তীরে রজকুণ্ড বা পরশরামকুণ্ড হতে আজও ভারতীয় জনগণের তথা স্থানীয় মিশমীদের এক প্রসিদ্ধ ভীষ্মস্থান বলে পরিগণিত। এখানে নাকি পরশরাম কুঠার

বোম্বের ধর্মীর রথ



দিয়ে আঘাত করে লোহিত নদীর গভীরে উৎসর্গ করে দেন। এই সব চিহ্ন ও প্রমাণাদি দেখলে বোঝা যায়—সুবর্নসিঁরির দক্ষিণা, লোহিতের মিশমী, সিয়াং-এর আদি প্রভৃতি উপজাতি, বিভিন্ন সময়ে বিহরণাত রাজবংশ-দের সাহায্য ও সহযোগিতা করছে, না হলে বিদেশীদের পক্ষে বহুকাল ধরে এই সব অঞ্চল টিকে থাকা সম্ভব হতো না—। এই সব সময়েই তারা আর্থ ও ভারতের অন্যান্য রাজবংশের সান্নিধ্যে এসে তাদের কাহিনী ও সংস্কৃতি কিছুটা গ্রহণ করেছে। লোহিত জেলার মিশমীদের একটি শাখাকে 'চুলিকাটা' বলা হয়, এদেরকে 'ইদু' মিশমীও বলা হয়। তারা বলে রুক্মিণী হরণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণীর ভাই বৃক্যক বৃক্ষে পরাজিত করেন কিন্তু প্রাণে না মেরে চুল কেটে নতাকে অপমানিত করেন। মিশমীরা সেই বৃক্যকের বংশধর। তা সত্ত্বেও বলা যায় আর্থ বা অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদের খুব বেশী প্রভাবিত করে না।

আসাম বর্মিজ ছাড়াও পর্বতীয় কাল মীরজুমলার সঙ্গে আগত ইতিহাসিক সাহাবুদ্দিনের লেখাও এ অঞ্চলের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১২২৮ সালে অহম

রাজা সুকাফা পাতকোই পর্বতের পথ দিয়ে ভারতের এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁর আগেও বোরো, কাছাড়ী, বরাহী, চুতিয়া, মোলক প্রভৃতি গোষ্ঠী এখানে প্রবেশ করে রাজত্ব করেছেন—তাদের সময়েও এই সব পার্বত্য গোষ্ঠীগণের সঙ্গে সংঘর্ষ আসতে হয়েছে। তবে অহম রাজারা একটানা ৭০০ বছর রাজত্ব করেন। সুতরাং বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে একটা নীতি তাঁদের নিতে হয়েছিল প্রয়োজনের খতিয়েই তবে সম-সময়েই যে সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য উপজাতিদের মাঝামাঝি লেগে থাকতো তা নয়। এটা ঠিক, এরা সমতলে এসে হানা দিয়ে, বালদানের জন্য মানুষ চুরি করেছে, বিক্রী করেছে। জিনিস গরু লুণ্ঠন করেছে, জেমানি আবার সমতলবাসীদের সঙ্গে ব্যবসায় করেছে। অহম রাজবংশের অনেকের সংগেই এদের মেয়েদের বিবাহ হয়েছে। পর্বতীয় বৃগো সুন্দর পূর্বাঞ্চলে আরবদের বা খামটিদের যখন শাসনকারীর বিভিন্ন পত্রে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে অহমরাজারা নিকোদের মেয়েদেরও বিবাহ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় না তাঁদের মোট নীতি ছিল এই সব উপজাতিতে

সরাসরি প্রত্যেক শাসনের আওতার না থাকা, তবে এদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সম্ভাব্য ব্যবস্থা রাখা ও এদের নিজেদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখা। তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি, অর্থ বা জিনিসপত্র উপঢৌকন দেওয়া হত যাতে এরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে বাইরে সমস্তলবাসীদের উপর উপশ্রুত না করে। সমস্তল ও পার্বত্য ভূমির কোন সাধারণ স্থানে যেখানে সকলেই আসতে পারে সেই সমস্ত স্থানে—যথা সদিয়া, বইমারা, উদলাগারি প্রভৃতি স্থানে শীতকালে বসার শেষে এই মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হত যেখানে লক্ষাধিক জিনিসপত্র তো কেনাবেচা হতোই, উপরন্তু পরস্পরকে জানা-পোনার সুবিধা হতো। কিন্তু এদের স্বাভাবিক ক্ষমতা কমে আসে। বালুপাথর থাকা গ্রহণেরও ইচ্ছা ছিল না। পরবর্তীকালে ইংরাজদেরও ছিল না। দীর্ঘদিন অহম জাতি গোষ্ঠীদের পাশাপাশি পানার ফলে সংঘর্ষ ও অন্যান্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অহমদের সঙ্গে বেশ খানিকটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিজেদের ভাষা ছাড়া একমাত্র অহমদের ভাষাই এরা প্রায় বৃত্তে পারে। যখন ১৮৩৮ সালে শেষ অহম রাজ পুরুষের সিংহের কাছ থেকে ইংরাজরা আসামের শাসন অধিকার গ্রহণ করেন—তখন অসংখ্যক অসংখ্যক জনা, কিছুদিন পর্যন্ত উপজাতিদের উপশ্রুত ও উপদ্রব খুবই ব্যাপক পাম—তখন ইংরাজ শাসকরা এদের সম্পর্কে একটা 'ইতিবাচক' নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তবে মোটামুটি তারাও অহম রাজাদের নীতিই বজায় রাখেন। এই অনর্থক, পার্বত্য, বালু ও কঠিন জীবনযাত্রার অভ্যস্ত দুর্ভিক্ষ জাতিদের নিজেদের শাসনাধীনে আনবার বিশেষ চেষ্টা করেননি তারা—তাদের নিজেদের 'অঞ্চলেই' গতিবিধি সীমিত করার নীতি গ্রহণ করেন। সেইকালে আন্তর্জাতিক সীমান্তের এই অংশে ব্রিটিশদের বিদেশী আক্রমণের ভয়েন কিছু আশঙ্কা ছিল না। লক্ষ প্রাকৃতিক কঠোর ও কঠিন পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিরা যদি সীমান্তের অপব্যবহারের দেশ তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বসবাস রচনা করে 'বাহাদুর' রাজা হিসাবে থাকে, তাহলে সেটাও বেশী সুবিধাজনক হবে বলে ইংরাজ শাসকদের মনে হতো। এঁরাও অহম রাজাদের মত উপদ্রব বা 'পোসা' দিতে এবং শীতকালে যখন বর্ষার প্রচণ্ড দাপট কম থাকতো সেই সময়ে সদিয়ার প্রায় 'আন্তর্জাতিক' মেলাতে আসতে এদের উৎসাহিত করতেন। ১৮৭৬, ১৮৮২ ও ১৯০১ সালে সদিয়াতে যে মেলাগুলি লস, হাব ও বিবরণ পাওয়া যায় এশিয়ারিক মোস্ট্রিটির জগতের ও বিভিন্ন গোষ্ঠে। এই সব মেলাগুলিতে অসংখ্য মির, মিশমী, গাম্টি ও সিংফো উপজাতি, আরব বা আদিবা প্রথম দিকের অসমনি কাণ্ড তখনও তানা ইংরাজ শাসকদের শত্রু বলেই গণ্য করতো। পাশাঘাটে আরব বিদ্রোহ দমনের পর এরা এদের শত্রুভাব ত্যাগ দেয় ও এই সব মেলাগুলিতে যোগ দিতে সুরু করে। এই সব মেলাগুলিতে খুব ধুমধাম হতো, মিছিল হবে নৌকা সাজিয়ে ইংরাজ রাজ-

পুরুষের আসতেন, রাজী পোড়ানো হতো, বিভিন্ন উপজাতিদের নৃত্য-গীত হতো। ১৮৭৬ সালে প্রায় ৩৬০০ উপজাতি জন-সাধারণ উপস্থিত ছিল—। বহু বর্ষের দুর্ভিক্ষ-বিভ্রত হতো—টট, ছোড়া, ছোড়া, কুঁকুর, লবণ, কন্দল, ইয়াকের ছোড়া, মগনানি, লক্ষা, মোম, বিহা হাতীর চাঁত, কমলালেবু, সোনা, মা প্রভৃতি অসংখ্য। পার্বত্য গোষ্ঠীরা প্রধানতঃ কিনতো আসামের ও বিলাতী সুড়ির কাপড়, সুতা, চাল পান, তামাক, পিত্তল-কাঁসার বাসনপত্র, ঘণ্টা, লোহার যন্ত্রাধি, লাঙ্গল প্রভৃতি। দিগার, মিশমীরা কিনতো পুড়ির মালা, খামটি ও সিংফোরা তাদের ভাঁড়ের জন্য কিনতো সুতো, সিংফোরা কিনতো, চা, চিনি, গুড় তেল। মিশমীরা বেশ কয়েক মণ মিশমী তিতা বা কপিল তিতা (একরকম মূল বা থেকে অসুখ হৈরা হয়) গাথন বা গম্বুজের শিকড়, মোম ও মগনানি-বিরী করতো। তিব্বত থেকে ব্যবসায়ীরা এসব কিনতো। দুবা বিনিময়ের মাধ্যমেই অবশ্য নেভাকেনা চমতো। এই সব মেলায় নালিশ, অভিযোগগুলিও শোনা হত ও তার ফরাসিয়া হতো। ১৮৮২ সালে ৩০০০ মত উপজাতি উপস্থিত ছিল ও ৫০,০০০ টাকার দুবাধি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

এইভাবে বিভিন্ন উপজাতিদের নিজে-দেয়কে জানা-পোনার লক্ষ্যে চাঞ্চল্য ও তাদের শাসক তথা আদ্যোপাশের সমস্তলবাসীদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছিল কিন্তু ১৯১১ সালে লুইস রাজকর্মচারী উইলিয়ামসন ও গ্রায়ারসনকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ ও হত্যা করার পর আরব ও সিংফো উপজাতিদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান হয়। এই সংঘে ভৌগোলিক সঙ্গীতও সুরে হয়।

উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই নৃত্যবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভূতাত্ত্বিক, রাজ-কর্মচারী, ব্রিটিশ সৈন্যদল ও অন্যান্য এসব অঞ্চল যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেগুলি এ অঞ্চল জানতে হলে পড়া আবশ্যিক।

এই সব সশস্ত্র বিদ্রোহের পর শাসন ব্যবস্থা আনও বেশী সংগঠিত করা হয়। শাসনের সুবিধার জন্য বালিপাড়া ও সদিয়া—সাতটি স্থানকে এজেন্সী গঠিত হয়—সেসবায় নাগা পার্বত্য অঞ্চল সদিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চলকে সেজা ও সুবনসিরি অঞ্চল ও সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে আরব ও মিশমী অঞ্চল ভাগ করা হয়। ১৯৪২ সালে তিরাপ স্বতন্ত্র জেলার স্বীকৃতি পায়। নাগাল্যান্ড থেকে আলাদা করা হয়। ইংরাজদের সময়ে টিলা-চাল। শাসন ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ও নমনীয় করার চেষ্টা সুরু হয় ১৯৪৭ খৃঃ পর থেকে। ইংরাজ আমলে এ অঞ্চলকে ভাবতবাসীর চোখেই আড়ালে রাখার চেষ্টা ছিল। ১৯৪৭ খৃঃ পর থেকেই শাসন কার্য সম্বন্ধে নীতি অনুসারে চালান হয়। ১৯৫৪ খৃঃ জেলাগুলির সদর শহরগুলি স্থাপিত হয়, সার্বভাষাশন ও সার্কেল অফিস সংগঠিত হয়। ১৯৬৫ খৃঃ ভারত সরকারের বর্ধ-

বিস্তারক মন্ত্রকের দস্তর থেকে এর শাসনভার বর্ধিত মন্ত্রকের হাতে আসে। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজ্যপাল এ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকতেন। আসল শাসক ছিলেন রাজ্যপালের পরামর্শদাতা, তাঁকে সাহায্য করতেন কর্মচারীরা। সি এস অফিসার পরামর্শে কর্মচারীরা ১৯৭১ খৃঃ অবধি আসামের শাসন ব্যবস্থাকে চালাত। ১৯৭২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে এ অঞ্চলকে অরুণাচল রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়—বর্ধিত প্রধান অফিস অধ্যক্ষীভাবে শিলং—এই থাকে। খুব সম্প্রতি এই অঞ্চলের প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়েছে ও তার প্রথম অধিবেশনও হয়েছে। তাতে সিংহ হয়েছে শীর্ষে প্রধান কেন্দ্রটি শিলং থেকে সুবনসিরির জিরো বা তার কাছাকাছি কোল জারগার নিয়ে যাওয়া হবে। এ শাসন প্রাপ্ত অফিসারকে কমিশনার বলা হয়। পাঁচটি জেলা কামেস্ত, সুবনসিরি, সিয়াং লোহিত ও তিরাপের শাসনভার ডেপুটি কমিশনারদের হাতে। ১১টি সাং-ডিভিশনের তার সহকারী বা অর্থাৎ কমিশনারদের হাতে। বর্তমানে ১৬টি সাং-ডিভিশন ও ৭৯ সার্কেল অফিস আছে বিভিন্ন শাসকদের অধীনে।

প্রতি জেলার ১টি করে উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কয়েকটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। পাশাঘাটে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সতরাং উচ্চ শিক্ষা পাবার জন্য কোনো গোঁহাটি পর্যন্ত যেতে হয় না। অসমীয়া ছিল এতদিনকার শিক্ষার বাহন কিন্তু নাগা প্রভৃতি অন্যান্য উপজাতির মত বর্তমানে এরাও অসমীয়া-ভাষার প্রতি বিরূপ ও বৈষম্য কিছু আন্দোলন হবার পর বর্তমানে ইংরাজীই এদের শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে। প্রতিমাসে স্কুলগুলিতে ২০০—৩০০ টাকা কর্তব্য পড়ে—বর্মভিলা, কামেস্ত ও সিয়াং এই জাত-জাতীদের সংখ্যা বেশী। আদি উপজাতি যেমন মিশমীরা বা টাগনরা বা লেখাপড়ার আগ্রহী বলে মনে হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে পড়াসেতার সংখ্যা অসংখ্য অবস্থা ভেদে বিভিন্ন। দীর্ঘ উপজাতিগণিত বেশী শিক্ষিত।

বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও প্রতি জেলায় একটি লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম আছে। প্রতি জেলার একজন রিসার্চ অফিসার আছেন। তিনিই এর ডায়গ্রাম—তাহাড়া স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকরা এদের সহকারী হিসাবে কাজ করছেন। এই মিউজিয়ামে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ অস্ত্র-ধনু ও পদার্থ জীবনযাত্রার নানাবিধ উপকরণ হাতে লেগে পুঁথি, পিত্তলের মূর্তি, কখনো প্রত্ন সংগৃহীত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেক জেলায়। এগুলি এখন অতীত বিষয়—কিন্তু বহু স্থানেই এগুলির সংরক্ষণার্থে অধিবাসীদের সম্পর্ক খুঁজে নিবার এই রিসার্চ অফিসাররা তো এসব উপকরণ সংগ্রহ করেনই, তাহাড়া আঞ্চলিক অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে তাদের বিবরণ তথ্য সংগ্রহ

করে লিখেছেন প্রচুর। এই অল্পের  
আধুনিক পরিচয় জানতে হলে এইগুলির  
মূল্য কর নয়। বইগুলি শিল্প বা দিল্লী  
থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সব জেলাতেই  
স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পাশীঘাটে হাসপাতাল  
আছে। কঠোর জীবনে অভ্যস্ত এই উপ-  
জাতিরা, ভিরিয়েন এন্টাইনের ভাষায় বলতে  
গেলে পরিবেশ এদের প্রভু। এখানে  
প্রকৃতি কৃপণ, কিছুই প্রায় দেননি এদের—  
কিন্তু কত সব ক্ষয় আপাতদৃষ্টিতে

অপ্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে এরা নিজেদের  
জীবনধারণের উপাদান সৃষ্টি করে নিয়েছে,  
এই মদ্যজিহ্মগুলি না দেখলে বিশ্বাস করা  
যায় না। বেত ও বাঁশ দিয়ে দুরন্ত পার্বত্য  
নদীগুলির উপর শব্দ পলেই বানায়নি,  
বেতের কোমরবন্ধ ও পরিধেরও তৈরী  
করেছে। বেতের তৈরী জামা ও অন্তর্বাস  
প্রস্তুত করেছে অন্যান্য উপকরণের অভাবে।  
পার্বত্য অঞ্চলে পোকা-মাকড় বিবাহ কীটের  
হাত থেকে বাঁচবার জন্য বস্ত্রাবরণ তৈরী

করেছে কি সব বিচিত্র উপাদানগুলি দিয়ে  
যে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।  
বেথানে তুলাগাছ আছে, সেখানে তো, বেশী  
সমস্যা নেই, কিন্তু বেথানে তা নেই সেখানে  
বিভিন্ন গাছের তন্তু দিয়ে গাছাবরণ  
বানিয়েছে, তাছাড়া প্রতি জানোরারের চামড়া-  
গুলি তো বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছেই। ঘাসের  
বাঁজ ও বৃক্ষাদি ও লোম থেকে শক্ত ও  
মজবুত শিরস্ত্রাণ, ঘাসের স্কার্ট, প্রকৃতির  
দেওয়া যা কিছু, উপকরণ, তা সবই কানে

**সুপার সার্ক দিয়ে একবার ধুলেই  
অন্য যে কোনও পাইডারে  
ধোয়ার চেয়ে জামাকাপড়  
অনেক বেশী কসাঁ হয়**

সুপার সার্ক রয়েছে সবার সেরা কাপড়কাচার পাইডার।  
এমন কি জামাকাপড়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ময়লাও টেনে  
বার করে, জামাকাপড় হয় অনুপম কসাঁ—বা অতের ঈর্ষ।  
জাগর। সুপার সার্ক যে ভারতের সেরা ব্যাণ্ডের  
পাইডার এতে আর আশ্চর্য কি ?

**সুপার সার্ক সবচেয়ে সাদা করে ধোয়**  
(নীল বা লাল করবার কিছুই মেশাতে হয় না।)



লাগিয়েছে। বিভিন্ন গছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে ব্যবহার করেছে। সবচাইতে আশ্চর্য হতে হয় এদের বিভিন্ন নমনা বা নক্সাগুলি দেখলে। বেশীর ভাগই জ্যামিতিক রেখার আঁকড়, বিভিন্ন রকম রং-এর ব্যবহারে এরা অতুলনীয়। বস্ত্রগুলিতে ধর্মীয় প্রতীকও আছে যেমন ড্রাগন, হাঁস, কীট-পতঙ্গ। প্রত্যেক জেলার আছে কারু-শিল্প কেন্দ্র, তাতে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক বজায় রেখে তাঁত, কাঠের কাজ, গাছের কাজ ও অলঙ্কার শেখান হচ্ছে। স্থানীয় লোকরাই কর্মী। এই রকম একটি কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-প্রাপ্ত শিল্পী সত্যেন বরদলই মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি বিভিন্ন নক্সা সংগ্রহ করে মেয়ে বাঁধারে রেখেছেন। সামান্য একটা ডিকাইন বা রং বদল করে, নিত্য নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছেন। তবে এখানে এগুলির চাহিদা এত বেশী যে আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভবই হল না। না হলে মিশমী কোটগুলির কারুকার্য এত সুন্দর ও এত প্রচলিত যে না কিনতে গেলে দুঃখ হোল। মিশমীরা কোমরে স্বপ্নবাস ব্যবহার করে ও উপরে এই কোট ব্যবহার করে। তনে টান্ডাতেও এদের খালি গারে থাকতে দেখা যায়। যদুর্ধ্বগিহ, শান্তি, পাল-পাথর তারা এই কোট ব্যবহার করে—ফলে এগুলি সহজে নষ্ট হয় না বা ছেঁড়ে না—একটি দাঁতি কোটেই জীবন কেটে যায়।

পশ্চিম থেকে পূর্বে ৫টি জেলার নাম কামেঙ, সুবনসিরি, সিরঙ, লোহিত, ও তিরাপ। কামেঙ জেলা ভূটানের পাশে। কামেঙ বা ভরেশী নদী তিব্বত থেকে এসে রঙ্গপুত্রে মিশেছে—তার নামেই এ জেলা। রাজধানী বম্‌ডিলা—এখান থেকে ১৩২ মাইল উত্তরে তাওরাঙ ঠঠ যে রাস্তা দিয়ে দালাই লামা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। সামরিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেজপুর থেকে যেতে হয়। এখানকার গড় উচ্চতা বেশী—স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে উত্তরে মনপা উপত্যকার শেরদুপেন ও আরও দক্ষিণে আকা গোষ্ঠীর বাস। মনপা ও শেরদুপেনেরা বৌদ্ধ—ওখানে থাকার সময়ে গ্রন্থপুজা বলে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল—ভূটানের পুরোহিতরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এরা তাওরাঙ মঠের নিরঙ্কুশ আছে। মনপাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে ভূটানের সংগে। সম-ভূমির সংগে বেশী সম্পদ শেরদুপেন ও আকাদের। আকারা সম্ভবতঃ সমভূমি থেকেই এসেছে। অহম রাজাদের পূর্বে তেজপুরের কাছে প্রতাপগড়ের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম পর্বত এদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। অহম রাজাদের সময় এসেব প্রতিপত্তি হ্রাস পায়, তখন মাঝে মাঝে সমতলে এসে লুটপাট করে উত্তরে পালিয়ে যেত। কিছুটা বৈক্যধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, মিসমারীতে কিংকোবালব দর্শনে মাঝে মাঝে যায়। অহম রাজারা এদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাস করার জন্য মোলানপুকুরী গ্রামে ১৪৪ বিঘা জমি দান করেন।

এখানকার অন্যতর উপজাতি মিরি—তার সংখ্যার কম, তার পরের জেলা সুবন-সিরি, এই নদীর নামের জেলা। রাজধানী জিরো। সমস্ত অরণ্যচলের কেন্দ্রীয় রাজ-ধানী এখানে উঠির আনবার কথা এরই কাছাকাছি কোনও জায়গায়। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী সংগঠিত ও উন্নত গোষ্ঠী হোল আপাতানী। এরা কৃষিকার্য করে জীবন যাপন করে। শান্ত, সুসংগঠিত, পর্বতযেরা উপত্যকাগুলিতে চাষ করে। বেশ সমৃদ্ধ, নিজেদের সম্পত্তি বিবরে বেশ সচেতন। যার হাত বেশী জমি—সে তত ধনী। এরা মিলে মিলে থাকতেই ভালবাসে—এবং এদের গোষ্ঠী-জীবন খুবই সুসংগঠিত। জিরোর কাছাকাছি থাকতে, আধুনিক সভ্য জগতের সংস্পর্শে সব চাইতে বেশী এসেছে। উপ-জাতিদের মধ্যে এদের ধনভাস্কিক সমাজ হল যেতে পারে। এদের ঠিক বিপরীত হোল দাফলা—এরা হিংস্র ও দুর্গব—গোষ্ঠী-জীবন একেবারেই সংগঠিত নয়, পরিবারই এদের সমাজ-জীবনের কেন্দ্র। একটি লম্বা ধরনের বিস্তৃত গহ্বরে ৪০।৫০জন পরিবার থাকে, প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকে। আপাতানীদের এরা তৈলে নীচে পাঠিয়েছে—তাদের নীচের অঞ্চল থেকে বেরোতে দেয় না। কারণ এদের অঞ্চলদেই আপাতানীদের বার হতে হয় বহু স্থানে।

কমলা ও হুদ নদীর সঙ্গমস্থলের পূর্ব দিকে থাকে মিরি উপজাতি। পর্বতের ঢালো থাকে বলে সেচ চাষ করে না—কুম চাষ করে। এদের গ্রামগুলি ছোট। শীতকালে সমতলে নেমে আসে চামড়া, রং ও রবারের বিনিময়ে লবণ কাপড়, ছোরা, লা প্রকৃতি কিনতে। এ-ছাড়া সুন্দর, গেল ও তাম্রগিরি থাকে কিছু উত্তরে। এদের মধ্যে তাম্রগিরি খুবই অশান্ত উপজাতি। এখনও সম্পূর্ণভাবে শাসনের আওতার আদৌ নাই। ১৯৫৩-৫৪ সাল অবধি এরা বিদ্রোহ করেছে। ঐ সময়ে আসাম রাইফেল দলের বিভ্রামরত এক সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। থাকেও এরা বনা, রক্ত, অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্বত অঞ্চলে। বাসুদেব বসুর নেতৃত্ব সুন্দরী নেফা বইটিতে এদের সুন্দর বর্ণনা আছে। এদের জীবনযাত্রা কঠোর, চমকোলেব প্রাদর্ভাব, পুষ্টিকর খাদ্য নেই, রাস্তাঘাট নেই, তাই প্রকৃতি মানুষ সকলের বিরুদ্ধেই এদের সংগ্রাম। তবু এদের অঞ্চলে এখন ডাক্তার ও কৃষি-বিশেষজ্ঞরা গেছেন এবং এদের কাছাকাছি থাকার জন্য উত্তরে ডাণোরিজোকে সার্বভাষিনের শাসন কেন্দ্র করা হয়েছে।

ভূতীয় জেলা হোল সিগাঙ। রাজধানী আলঙ এইখানে সানশো নদী ভারত সীমান্ত গেলিঙ-এর নিকট দিয়ে প্রবেশ করে। দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে ডিহাং নাম নিয়ে। সদিয়ার কাছ থেকে নদীর নাম রঙ্গপুত্র। বৃষ্টি আমল থেকে এখানে শাসনকার্যের কেন্দ্র পাশীঘাট যা বেশ উন্নত ও স্বাভা-বাতের দিক দিয়ে সার্বভাষিনক। কলক, বাগক ও অন্যান্য শহরের সার্বভাষিন এখানে আছে। উত্তরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী থামা ও

ধরার নেতা উপজাতি মাল করো। মালভাণ্ডে বাস করে আবার বা আসি। সমস্তকামারীদের দেওয়া নাম আবার (মানে অব্যাহত) এরা পছন্দ করে না। এখন তাই এদের বলা হয় আসি। এরা বেশ আত্মবিশ্বাসপূর্ণ গর্বিত ও বোধাজাত। এদের চেহারা ও গঠন বেশ শক্ত ও মজবুত, খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়—উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে বশ্যতা স্বীকার করেছে। এদের বিভিন্ন ল্যাংগালির মধ্যে পদম, মিনিয়ঙ, শীমেঙ, গিলিয়াঙ গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। একমাত্র এই শেষোক্ত উপজাতিদের মধ্যেই সম্ভবতঃ তিব্বত, সীমান্তে বসবাস করার জন্য বহুপতি প্রথা চালু আছে। লোহিত জেলাতেও এদের দেখা যায় সাধারণতঃ এরা সদিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আবার পলিশের কাজও করে—এবং দোভাষীর কাজ বেশ দক্ষ। আবার বা আসি-দের বেশ ঐতিহাসিক বোধও আছে, ভবিষ্যতের ধারণাও আছে। দাস প্রথা এ অঞ্চলে কমবেশী সর্বত্র প্রচলিত ছিল—তবে এদের মধ্যেই বেশী ছিল—এ কারণেই ইংরাজ শাসকদের সংগে শেষ অবধি লড়াই চলছিল এদের এই অধিকারে হাত দেওয়াতে। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ দক্ষ ও দরদারি করতে বেশ ওস্তাদ। এরা তামাকুসেবী ও আফিং প্রিয়।

এর পরে আসে লোহিত জেলা—উত্তর-পূর্ব দিক থেকে লোহিত নদী এসে সদিয়ার কাছে রঙ্গপুত্রে মিশেছে, এই নদীর নাম। নুসারেই জেলার নাম। সমস্ত জেলার মধ্যে এই জেলাই মনকে নানা বৈচিত্র্য আকর্ষণ করে। সব চাইতে পূর্ব সীমান্তের এ অঞ্চলটি, প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, উদ্ভিদ প্রকৃতির দিক দিয়ে বিস্তারিতভাবে কাছে খুব প্রয়োজনীয়। অসংখ্য গিরি শিরা উদ্ভঙ্গ পর্বত গিরিখাদ, পাবতা নদী, প্রবল বর্ষা এখানকার অধিবাসী মিশমীদের কখনই সন্নিহন হয়ে বসতে দেয়নি। এইসব প্রাকৃতিক কারণে এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রা কম আর্থ বা উন্নততর সভ্যতার বেশীর ভাগ নিদর্শন—বথা পরশুরাম কুন্ড, ভীষ্মগণ, তারেশ্বরী মন্দিরের কায়বাহিনী দুর্গা মূর্তি ও শিবলিঙ্গ সবই এই জেলায় পাওয়া গেছে—এগুলি নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। লোহিত নদীকে মিশমীরা বলতো টি-লাঙ (টি মানে জল) যার থেকে খুব সম্ভব লোহিত নামটি হয়েছে—পরবর্তী কালে সংস্কৃতীকরণ করে লোহিত্য নাম দেবার চেষ্টা হয়েছে। এ-নদী ধরেই মিশমীরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান গোষ্ঠী আছে ১। ইদু বা চুলিকাটা মিশমী, এরাই সবচাইতে বেশী উন্নতনৈর। এরা কুম চাষ করতে, আবার সদিয়াতে এসে কেনা-বেচা করতেও খুব উৎসাহী ছিল। ১৮৪০ খৃঃ ও ১৯৫০ খৃঃ-র ভূমিকম্প পাহাড়ের উপর দিকে গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন করে যায়—তখন এদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ছাড়া হয়। এরা আগে লোহিতেব পশ্চিমে দিহাং নদীর উপত্যকার বসবাস

করতো। এদের হালিকটা মিশনীও বলা হয়। (কারণ আগেই বলা হয়েছে) এদের এখানকার কয়েকটি ১৬০০০—১৭০০০ গিরিশিগেও নামগুলিও খুব মজার—তাত্ত্বেরা, টিমো-থেরা, টিগত-থেরা ইত্যাদি। ইন্দু মিশনীদের চেহারা সম্পূর্ণ মঙ্গোলীয় নয়—এরা বেশ সন্মী। ২। দিগার, বা ডারাগুন মিশনী—ছোট পার্বত্য নদী দিগারের তীরে বসবাস করে ও তৃতীয় ভাগ হোল মিজি মিশনী বা কামান—পূর্ব দিক ঘেঁষে বাস করে—এসেছে কোন দেশ থেকে। শেখোভ দুই গোষ্ঠী লম্বা চুল রাখে ও বর্ণটি করে হল বেঁধে একটা গোল দিয়ে দেয় মাখান দিয়ে। মেয়েরা মাথার রেশের গরনা পরে। এদের ভগবান ইত্যাদি সম্পর্কে খুব বেশী কল্পনা নাই—ধর্ম মানে হোল কতকগুলি আচার ব্যবহার, কিন্তুবে অমঙ্গলকে, ব্যাধিকে নানা প্রকৃতি দ্বারা দূরে রাখা যায়। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো, তাছাড়া আবার, সিঙফো, খামটি এদের সঙ্গেও অনবরত সংঘর্ষ লাগতো। আবার এদের চোর, ঠগ প্রভৃতি নামে ভূষিত করেছে। এরা পরশুরাম কুন্ডেও মাঝেমাঝে সময় কমান করে—মাছগুলিকে মনে করে মৃতদের আত্মা।

এর পর উল্লেখযোগ্য হোল খামটি উপজাতি—সমগ্র অঞ্চলে বোধহয় এরাই অতীতকাল থেকেই সব চাইতে বেশী উন্নত। এরা ব্রহ্মদেশের সান প্রদেশ থেকে এসেছে—লোহিত নদীর দক্ষিণে বাস করে। আসামের ইতিহাসে এদের বেশ কিছু ভূমিকা আছে। ধর্ম—বৌদ্ধ, 'তাই' 'পাই' হোল এদের ভাষা। এদের পূর্ব-পূর্বেরা এক সময়ে মণিপুরে ত্রিপুরা, ইরেনান, ও শ্যাম দেশের বিরূপে ভুখন্ডে রাজত্ব করতো। অহমদের আক্রমণে ১২২৮ সাল থেকে এদের প্রভাব ও রাজত্ব কমতে থাকে। ইরাবতীর উৎসমুখ থেকে এরা প্রায় ৩০০ বছর আগে বিভিন্ন সময়ে আসে ও তেওগাপানী নদীর ধারে বসবাস শুরু করে। অহম (অর্থ তুলনা-চীন-অসম)দের রাজত্বগুলি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এরা সদিয়ার কাছে নেমে আসে ও সদিয়ার শাসনকর্তা 'খোয়া গোহাইনকে' সরিয়ে নিজেদের শাসক বসায়—পরবর্তী-কালে এদের প্রভাব অহম রাজারা ও বটিশরা মেনে নেন। এই অঞ্চলে এদের রাজা বলা হয়। এদের বংশের চৌখামন বড় গোহাই বহুদিন পাল-মেটের সদস্য ছিলেন—এখন এর ছোট ভাই সদস্য। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও জমির মালিক এরা কাঠের ও অন্যান্য নানাবিধ ব্যবসা আছে—এ অঞ্চলে এরাই প্রধানতঃ শাসনকারীকে প্রভাবিত করেছেন। চৌখাম প্রদেশেই এদের প্রভাব এখন সীমাবদ্ধ। ডাং মহেশ্বর নেওগ (গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ভাষার প্রধান, এর 'লোহিতের প্রাচীন কাহিনী প্রবন্ধ ও 'সীমালয়ের শিখা' বইটিতে এদের বিবরণ নিয়ে বিস্তৃত কাহিনী লেখা হয়েছে। এরা বেশ শিখিত, ধাতু ও ভাটের কার্বে

নিপুণ, কাঠের ও অন্যান্য কারুশিল্পের কাজে সুদক্ষ। খামটি বা অতীতকাল থেকেই বিখ্যাত। চেহারা তত সদস্য নয়—রং শ্যামবর্ণ—। অহম সরকারের রাজ-কর্মচারী হিসাবে কাজ করার সময়ে এরা অসমীয়া মেয়েদের বিয়ে করেছে। বহু-খামটিরা এখন তাদের পুরাকালের ধরনেই গহনিন্মণ করে। ভাল ব্যবসা বোঝে পরিগ্রহী। এরাই উৎকৃষ্ট চাল ও আলু চাষের প্রবর্তন করেছে। প্রাণী-বিভাগ থাকলেও সমবায়িক ভিত্তিতে চাষ করে। অল্পদিন পূর্বেও দাসপ্রথা খুব প্রচলন ছিল।

এর পর আছে সিঙফো—এরা এসেছে উত্তর ব্রহ্মদেশ থেকে—কিচিন বংশ থেকে উদ্ভূত এরা। বর্তমানে নোয়া ডিহং নদী থেকে আরও দক্ষিণ অঞ্চলে এদের বাস। (অহম রাজ ছুপুয়ার আমলেই অসম নাম চালু হয় ও এরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন) অহমদের শেখ খাখীন রাজ গোবীন্দ সিংহের রাজত্বকালে মোঘা মারাঠা বিদ্রোহের সময়ে এরা আসামে প্রবেশ করে ও খামটিদের তাঁড়িবে ডেংগাপানী নদী ও বড়ী ডিহং-এর কাছে নামরূপে বসবাস শুরু করে। ইরাক-রাজা যত্নে এরা বর্মীদের পক্ষে যোগ দেয়। পরে ইংরাজরা খামটি ও আবারদের সাহায্যে অগ্রসর হলে আক্রমণ করল। দাস প্রথা এদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল চাষ-বাসের কাজ প্রধানতঃ দাসরাই করতো। এদের যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা নেই, এক-একজন প্রধানের অধীনে কয়েকটি গ্রাম থাকে। বর্মী-যুগের সময় এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্বি-পথগুলি নিকট থাকতো বলে এদের সংগে বোঝাপড়া করা হয়। কিন্তু ঐ দাসপ্রথা নিয়েই কোনও মীমাংসার আসতে বেশ দেরী হয়েছে। এদের আচার-ব্যবহার বিবাহ-পর্বাতি সবই ভিন্ন। এদের ভাষা কারেনদের মত। মণি-পুরী, কুকি, নাগা ও আবারদের সঙ্গেও কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও এরা বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে পূজা করে। খামটিদের মত অত নিপুণ না হলেও ধাতু গলাবার কাজ জানে—নিজেদের কাপড় বোনে, গাছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে। বৃটিশ অভিযাত্রীদের এরা চা-এর বীজ ও চা উপহার দিত, তাতে মনে হয় এ অঞ্চলে চাষের চাষ প্রচলিত ছিল। আফিমও আসক্তি এদের কর্মোদ্যমে পক্ষে প্রধান সাধ।

এর পর সর্বদক্ষিণ-পূর্বের জেলা তিরাপ—যার প্রধান শহর খোনসা। এই অঞ্চলটি ৫০০ থেকে ১৫০০০ ফিট উঁচু। তিরাপ নদী দঃ-পূর্বে থেকে প্রবাহিত হয়ে সদিয়ার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গী মিশেছে। লোহিতের রাজধানী তেজুতে যেতে হলে ও তিরাপে আসতে হলে তিনসুকিয়া দিয়ে আসাই সুবিধাজনক। এখানে বাস করে ডাঙসা, ওয়াঙ-চু ও নকটে উপজাতি। তাংসাদের লুৎতুঙ, মকচুঙ, হাখী প্রভৃতি

কয়েকটা উপজাতি ভারত-বর্ম সীমান্তের কাছে বাস করে। বর্মীদের মত বর্মী-পুরুষ নির্বিশেষে লুটি পরে। মেয়েরা সাট ও পদ্মগড়ী, মেয়েরা গাউন ব্যবহার করে। প্রবল অহিঙ্সেন্দেবী। এরা উন্নত-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াঙচুরা বেশ চটপটে ও বুদ্ধিমান জাত। বৈকবধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও প্রকৃতি পূজাই প্রধান। ধনী ও দরিদ্র প্রাণী বিভাগ আছে। কিন্তু দাস-প্রথা নেই। গ্রাম-প্রধানরাই গ্রামের হর্তাকর্তা। এদের খাড়ী-গুলি খুব বড় বড় হয়। পাখরের বড় খড় ও কাঠের বিরাট অংশ নিয়ে তরবার 'বুটি' তৈরী করতো। অতীতে অন্যান্য অনেক গোষ্ঠীর মতই এরা ছিল নৃশূন্য শিকারী। এখন নৃশূন্যের পরিকর্তে কাঠের নৃশূন্য গলায় পরে ও বিভিন্ন কাঠের প্রকৃতি ব্যবহার করে (যথা—কাঠের পাইপে)। নৃশূন্যের নানাবিধ নিদর্শন এদের গৃহে পাওয়া যায়। কাপড়-চোপড়ের চাইতে হাতীর দাঁড়, লিঙ-এর ও শব্দের গরনা পরতে বেশী ভালবাসে। ফুলের গরনা ও পাখীর পালাকও এদের অলঙ্কৃত করে। অববিবাহিত ছেলে-মেয়েদের জন্য মোরাত্ত বা বৌধ শরনগৃহ আছে। শিকারই প্রধান জীবিকা। এরা নাগাদের প্রতিবেশী।

তৃতীয় উপজাতি নকটে—বেশ খানিকটা বৈকবধর্মের প্রভাব আছে এদের ওপর। সম্ভবতঃ সনভূমির কাছ থেকেই তা এসেছে। বোরহাট ও নামসাতের মাঝে ২১টি লকপের কুলা আছে, তাছাড়া শীত-কালে নদীর জল থেকে লকপ তৈরী করে। অতীতকাল থেকেই শিবসাগর ও এইসব অঞ্চলে যৌথ প্রায় লকপ তৈরী ও বিক্রী হয়।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে এইসব উপ-জাতিদের তিন ভাগ করা যায়—উত্তর সীমালয়ের ও পূর্ব সীমালয়ের আধ-বাসীরা মনপা, খামটি, সিঙফো—প্রধানতঃ বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত। এদের কাছাকাছি বেসব গোষ্ঠী থাকে যথা—শেরদুকপন, তারাও এদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। এরা সামাজিক দিক থেকে বেশ উন্নত, চাকবাস ও কুটিরশিল্প লক্ষ্য পদ্ধতি-পালন করে ও কবলা-বাগিচাও করে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী যারা মধ্যবর্তী অঞ্চলে বৃগমি পার্বত্য ও অরুণজয় অঞ্চলে থাকে, যেমন দাফলা, তাপিন, গেলঙ, হিলিয়ার, আপাতানী, মিশনী-আবর—এরা প্রকৃতির সঙ্গে তথা মানুষের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব করার সচেতন। তবে সিন্নাও জেলার উপজাতিরাই পঞ্চমটা ভাল

## মিশনরী বালিকা



শাকার জন্যই বোধহয় সবচাইতে বেশী উন্নত। প্রধানতঃ প্রকৃতির ও অমূল্য শক্তির উপাসক এরা। তৃতীয় গোষ্ঠী দক্ষিণাঞ্চলে থাকে, যেখানে সম্রাটমির জনসাধারণের সঙ্গে মেলবার সুযোগ ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বৈক্য ধর্ম গ্রহণ করেছে পুরো-পারি-না হলেও আংশিকভাবে।

খৃষ্টিয়ানিটিতে অনেক প্রভেদ থাকলেও এদের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। ধনী-নিরীক্ষ প্রেরণী-বিভাগ থাকলেও কিন্তু জাতি-ভেদ নেই। বিবাহ করে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু স্বকল্যে নয়। সমাজ পিতৃ-প্রধান, ছেলের বহু-বিবাহ প্রচলিত বিবাহ-পূর্ব মেলাসেশার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বিবাহের পর কিবস্ত ও সতীষ রক্ষা করতে হয়। বহুপতিত প্রথা খুবই কম। বিবাহ-কিছল সম্রাজ্ঞে অনুমোদিত। কম-কেন্দ্রী সব উপজাতিদের মধ্যে দাস প্রথা প্রচলিত। তবে খার্কিট সিঙফো ও আপা-অন্যদের মধ্যেই বেশী। দাসদের সঙ্গে বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা জিম তাদের সঙ্গে পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের

মত ব্যবহার করা হয়। মৃতদেহগুলিকে হয় কবর দেওয়া হয় অথবা পাখী ও পশুদের খাবার জন্য দেওয়া হয়। শোক প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেসব উপগোষ্ঠী বেশী উন্নত, তাদের মধ্যে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা মোরও প্রকৃতির চল আছে—অনেক ক্ষেত্রে যৌথ কৃষি ও উৎপাদন পদ্ধতিও আছে—কিন্তু যেখানে জীবন-সংগ্রাম তীব্র সেখানে পরিবারই প্রধান (দায়লা, তাগিন, মিশমী)। যেখানে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সেগুলিকে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় অনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলি এখনও পশ্চাৎপদ। প্রাকৃতিক শক্তির বা দৃষ্টান্ত-গুলিকেই তারা প্রধানতঃ পূজা করে তাদের মধ্যে বলিদান প্রথাও প্রচলিত। পূর্বে নর-বলিও হোত। সমস্ত উপজাতিগুলি তামাকসেবী ও পাইপধারী।

ধীরে ধীরে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এরা। কিন্তু অতীতে বিশ্বাস ও প্রথাগুলি এদের মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক জড়িত—সেগুলি সহসা যাবে না। কয়েকটি উপ-

জাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার পর মনে হয়েছে এরা বেশ আত্মসচেতন—সুতরাং মৃত পরিবর্তনে খুব লাভ হবে না। তাছাড়া এই অঞ্চলগুলি অনুর্বর ও পাবিত্য-ময় খাদ্যপ্রবা প্রায় কিছুই হয় না—যদিও বেশ কিছু মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। এখানকার রাজ-কর্মচারীরা এ-বিষয়ে বেশ সচেতন। তবে এ-দেশের ভিতরে প্রবেশ করা দুরূহ—একে তো প্রাকৃতিক বাধা, আসামের ডিব্রুগড় থেকে পাশীঘাট, লাম্ফ-পুর্ থেকে জিরো, তেজপুর্ থেকে বমডিলা যেতে হয়, তাছাড়া এসব অঞ্চলে যেতে হলে অনুমতি দরকার। হঠাৎ বেশী লোক গেলে খাদ্য-বাসস্থানের অভাব হবে। খাদ্যপ্রবা সবই বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়—স্থানীয়ভাবে বালি, ঘব, আলু, আপেল, ওষধিযুক্ত প্রভৃতি উৎপাদন করার চেষ্টা হচ্ছে। মিশনারী প্রভাব এখানে একেবারেই ছিল না—সেটা কতকটা সুবিধায় ব্যাপার হয়েছে—তবে বাইরে থেকে নানাবিধ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাও চলে। তবে অনেক ছেলেমেয়ে এখন দার্জিলিং, গৌহাটি, পুর্নুলিয়া, দেবাদুন অবধি পড়তে যাচ্ছে। ভারতবাসীদের সঙ্গে পরিচয়ের পরিধিও কেড়ে চলেছে—অনেকে এত সব বাধানিষেধ রাখার বিরোধী।

মাই হোক—যে কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কঠোরতার মধ্যে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, হার মেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসনি—তাছাড়া প্রকৃতির কৃপণ হস্তের দান থেকে পাওয়া সবকিছুকেই জীবন যাত্রার কাজে নিপুণভাবে লাগিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টিও করেছে, তা বিশ্লেষণ করলে মুগ্ধ হতে হয়। গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে এরা ছিল, পারস্পরিক ও বিদেশীদের প্রতি অবিশ্বাস, যৌথ সামাজিক জীবন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সবগুলিরই হঠাৎ পরিবর্তন করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষায় রেখে ভারতীয় জন-গণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হোক, এটাই আমাদের আশা ও ইচ্ছা—জাতীয় সংহতির দিক থেকে এদের সঙ্গে ব্যবহার ও আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে রক্ষা ও কঠিন প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে বেভাবে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, সেই অদম্য প্রাণশক্তি যা অতীতে উদ্ভামতা, চঞ্চলতা ও অস্থির জীবনযাত্রার প্রকাশ পেয়েছে, একবার নিজেদের প্রেরণ কি তা ঠিকভাবে বদলে এই শক্তিই তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে ও বহুতর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার অংশীদার করে তুলবে আশা করি।

# কথনো দিন কথনো রাত

আশা হুর্না দেবী

উপন্যাস

(৩)

মার গানের খাতা।

দিদি আমার মনের দিকে বিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'বিশ্বাস হয় তোব রুচি?'

তা বিশ্বাস করা শকুই বটে।

অবশ্যই মার যা মতি দেখছি, তার সঙ্গে 'গানের খাতা' বস্তুটির হিসেব মেলাতে পারি না।

তাহাড়া শশুই তো যেমন তেমন একটা খাতা নয়, খাতটার চেহারাখ রীতিমত আভিজাত্যের ছাপ। স্যাকুরার দোকানের গহনার বাজের মত গাঢ় বেগুনী রঙের মখমলে মোড়া মলাট, তার উপর সোনার জলে অতিশয় অক্ষরে লেখা—'গানের খাতা'।

—অথবা বাকারে কেনা চার-ছ' আনা খাতা নয়, কারো উপহারের সামগ্রী।

অবশ্য মলাট খুলেই বোঝা গেল কার দেওয়া উপহার। ভয়ে বন্ধুর মধ্যে কেমন দড়দড় করে উঠলো আমার, দাঁড়িয়ে থাকতে পাবলাম না, মাটিতে বসে পড়লাম।

এমা, ওই শুলোর ওপর বসনি তুই? দিদি বলে উঠলো, 'একটা মাদুর আনলেই হতো।'

ব্যাকুলভাবে বললাম, 'দিদি থাক, রেখে দে, দেখতে হবে না।'

এমনিতে আমাব দিদির থেকে সব বিষয়েই সাহস বেশী। দিদি উঁচু টুঙ্গে উঠতে পারে না দিদি আরশোকা মাঝে পড়ে না, দিদি দাদাদের অনর্পিত্বাভিতে কঁদে ড়য়ার খলে পেলিসল ববার বার করে নিয়ে 'একটু বারহার' করে নিতে পারে না, দিদি রাতের ছাতে একা উঠতে পারে না, দিদি মার চোখের সামনে বসে গল্পের এই পড়তে পারে না, দিদি মাব বেগে দেখে গানটান করা চুলের বেণী খলে ফেলে আলগা করে অচিড়ে নিতে পারে না, দিদি মার স্মার্টন 'আর খেতে পারছি না' বল থালার ভাত ফলে উঠে যেতে পারে না, এমনকি স্নানক কিছুই দিদি পারে না যা আমি পারি, কিন্তু এমনি আমার দিদির থেকে স্নানক গিয়েছিল। কেমন ভয়-ভয় করছিল। যেমন করে কামা পেরে যায়।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ দিদির মধ্যে একটা জোবালো সাহসের জেদ দেখতে পেয়েছিলাম। দিদি বললো, 'কেন, এতো ঘবিড়াবার কী আছে? একটু দেখলে তো আর করে যাবে না?'

খুব স্পষ্ট করে না ভাবতে পারলেও দিদির কথার কিতু আমার মনে হলো, খাতাটা করে না গেলেও মার কোথায় বসে কিছু করে যাবে!

—কী সেটা?

বিশ্বাস? সত্যতা? সত্যতা? কে জানে।

কিন্তু তুই দেখবে যা, আমি দেখবো না' এমন বলার মতো নিলোভেও তো হতে পারলাম না। নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণে কাছে চিরদিনই ভয় পরাস্ত, নীতিবোধ পরাস্ত।

চিনিসটা উপহারেরই।

উপহার প্রাপ্য, এবং উপহার দাতা নাম সোনার জলে না হলেও গাঢ় বেগুনী কালিতে ছাপার অক্ষরের মতো পরিপাটি অক্ষরে লেখা।

নির্ণায়ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি সেদিকে—অনেকটা মোহাচ্ছন্দের মতো। অক্ষরগুলো তো জানা জগতেরই, শব্দ গুলোর মানেও অজানা নয়, কিন্তু এমনি অনর্নিহিত মানেটা? সে কি আমার জন্ম জগতের

কে এই—

অশেষ প্রেমায়ী, অনন্ত সুখদায়িনী শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী

প্রাণাধিকাস?

কে এই ওই চারুহাসিনী 'চিরভূতা'— শ্রীমতেশ্বর গণেশপাধ্যায়

দিদির মধ্যে একটা বিচিত্র বিষয় হাসি ফুটে উঠলো। দিদি আমার দিকে না তাকিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আশেত বললো, 'পাবার চাঁটেতে পা ঠেকলেও মা নমস্কার করেন!'

আমি খুব সাবধানে ভেতরের কামামত ভাবটা চেপে বললাম, 'চিরভূতা' কেন দিদি? বাবা তো গুরুজন!'

দিদি একবার একটু তাকিলোর ভাবে বলে উঠলো, 'ভগবান জানে। সেকালে বোধহয় এইকমই লেখার কাসান ছিল।'

বারা, মার আমলটাকে আমরা 'সেকাশে' বলতাম। যদিও পরে হিসেব করে দেখেছি আমার মখম মলাট বছর আর দিদির বারো, তখন মার বয়স ছিল ছত্রিশ, আর বাবার চুয়ারিশ। দাদা জন্মাবার আগে মার নাকি একটা মেয়ে হয়ে গিয়েছিল মাবা গিয়েছিল 'বাবার দাদা'। দাদা আরি-যে-লো বছর বয়সে জন্মেছে।

সেই মেয়েটা শৈশু থেকেই মা নাকি মাছবোটা বসি ডিঙিয়েছিলেন, তাই মেয়েটা গেল। দাদার বেলায় মাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়েছিল। বাহি ডিঙানো, পানের বোটা ডিঙানো, শনি-শনি বারের ছাতে যাওয়া, আরো কত কী যেন বাছ-বিচার করতে হয়েছে। দাদা জন্মতে ঠাকমা মারা হয়ে বসেছিলেন, 'যাক বাবা প্রথম সন্তানের নির্দিষ্ট ফড়ীটা মেয়ের ওপর দিয়ে ফুটে গেছে, পাঁচা গেছে।'

মাব মনেই শোনা এসব।

আমরা ভাবতাম, 'কী সেকালে কুমারী?'

অতএব সেবালেব ফ্যাসান নিয়ে 'দিদি' হাচ্ছিল। করলো।

কিন্তু শশুই তো ওই উপহার পড়ার লেখাটুকুই এতো বিচলিত করান আমার। পড়টার ওপাঠে একপানা ফটো আঁটা ছিল না বোলে কোণে আঁটা দিয়ে?

এবার এমনি দম্পতির ফটো।

না, একবারে সদ্য বিবাহিত নব-দম্পতির নয়, সোলার টোপর আর সোজার মনুট পরা বরকনের সেই ফটো তো আমাদের ঘরের সামনের দেয়ালটাতেই টাঙানো রয়েছে, বুলে আর শুলোয় বিবরণ। অত্যা উঁচু থেকে বোঝা যায় না, নতুন বরকনের মত চোখ কেমন!

এ ছবি 'একশোজনের সামনে আঁকি করে বসিয়ে তুলে নেওয়া ফটো নয়, দিলী সপ্রতিভ ভগ্নীতে কসে থাকা নির্ভেদক ইচ্ছের তোলা ফটো।



আজ্ঞা সেকলে কি কলোজাকারের  
সোফানে গলে ছাব ভোলার রেওরাক ছিল।  
বোধহয় ছিল না। হয়তো কোনো অসুস্থতা  
বসন্তের তেজা ছবি। বার সামনে বোকে  
মুখ খুলে বার করা যায়। ছাবটা এই—  
নবীন বখ, একখান কারকাখচিত চেরের  
পাশবন্দ, তার মাথার ঘোমটা খোলা, এলো  
সুন্দর মাশি পটে কাঁধে সামনে ছড়ানো।  
স্বারে কলকলো লেশ কোলানো একটি  
খী-কোরাটার হাতা জ্যাকেট, পরশে বোধকার  
পাশী শাড়ি। বরের স্ত্রীঅঙ্গে অবশ্য খুঁত-  
পাজাবিই, তবে কাঁধ থেকে খুব কাঁদা করে  
কোলালো রসেছে একটা কলকাদার চণ্ডা-  
পায়েল শালা। সেই কারকাখময় চেরের  
হাতার উপর বসে থাকা বরের একটা হাত  
নিজের হাঁটুর উপর, আর একটা হাত  
চেরের পিঠি বেষ্টন করে বোরের কাঁধের  
ওপর আলতো ডাবে রাখা।

এ-রূপে এ ছবির ভঙ্গী দেখলে  
নিঃসন্দেহ নবীন-দম্পতির। 'কী গাইমা বাবা,  
বলে ছেসে উঠবে, কিন্তু সেকালে যে এটা  
একটা নৃ-সাহসিক প্রগতিসলভ কাজ হয়ে-  
ছিল তাতে আর সন্দেহ কী।

ছবিটা হাতেই রয়েছে, তাই বর-বধুর  
মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে  
ডাকিবে আছি। এতো সুন্দর মুখ-চোখ নাকি  
চারহাসিনী দেবীর আর রমেশচন্দ্র গঙ্গো-  
পাধ্যায়ের? আর এতো চুল ওঁদের মাথা?।

মার যে 'ন-বো' ছাড়া আস্ত আর কোনো  
একটা নাম আছে, খেরালই ছিল না। মামান  
বাড়িতে আমাদের বাড়িটা ছিল দৈবাতের  
ঘটনা, সেই দৈবঘটা ঘটেছে, অথবা মামান  
কেউ এলে মার একটা ডাক-নাম শুনতে  
পেঁজাম, 'দাসি'।

গঙ্গোপাধ্যায় গুঁঠিতে শূঁই ন-বো।  
'বোদি'ও বলতো না কেউ। কাকাও  
বলতেন ন-বো, পিসিমারও বলতেন ন-বো।  
কোঠিমারা তো বলবেনই। অর বাবার মখে  
ওই 'ন-বো' ছাড়া আর কিছু শুনিনি।  
ওই ন-বোরের মধ্যে কোথায় ছিল এই  
নববধু?

দিদি অনেককণ ছবিখানাব দিকে  
ডাকিবে একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে পাতে।  
'ওলটগুলো।

প্রথম পৃষ্ঠার মাত্র দুটি চর—  
কী মোহিনী জানো বখ,  
কী মোহিনী জানো—  
'অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।'  
চমকে গোলাম!

মার গানের খাতা, এই তো বসন্ত, তার  
ওপর আবাব শ্যামাসঙ্গীত নয়, রামপ্রসাদী  
নয় একেবারে প্রেম-সঙ্গীত! ধাবণ-কল্পনাব  
সীমা ছাড়ানো একটি অম্বাত যেন।

ওলটোতে ওলটোতে দেখা গেল আল-  
হোড়াই তাই। শূঁই ভালবাসার গান। খুব  
খুব ছাপার অক্ষরের মতো করে লেখা।  
আর সেই সব গানের তলায় তলায় গীতি-  
আবিরও নাম লেখা। কোনোটার নীচে লেখা  
গিরিশ ঘোষ, কোনোটার নীচে কীর্ত্তি-  
কুমার, কোনোটার বা নিখুঁত, করকণি  
নীচে রবীন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ বলার 'অভয়পীঠ' ডব্বনো  
আসনি, কেউ কলতো রবীন্দ্র 'কেউ কলতো  
রবীন্দ্র'। মা শেবেরটাই পছন্দ করেছিলেন  
দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, গানের সংগ্রহসমূহ  
গীতিকারের নামটিও লিখে রাখা, এ-তো  
গীতিমতো রুচি আর নিষ্ঠার ব্যাপার।  
চারহাসিনী দেবীর মধ্যে এই রুচি এই  
নিষ্ঠা তাহলে ছিল একদা!

কিন্তু অবাক হতে তখনো অনেক  
বাক।

অনেকগুলো পাতা ওলটোতে ওলটোতে  
চোখ আটকে গেল। একটি শালা পৃষ্ঠার  
লেখা—'নিজের লেখা গান।'

স্রীমতী চারহাসিনী দেবী।  
দিদি!

আমি প্রায় আতর্জন করে উঠি।  
'মা আবার গান লিখতেনও?'

দিদি স্থির চোখে ওই লেখাটার দিকে  
ডাকিবে বললো, 'তাই দেখছি।'

তারপর আবেগ-আবেগ গলার বলে  
উঠলো, 'মার এখনকার হাতের লেখা  
দেখিস তো?'

একদা আমরা মারের কাছকে 'সেকাল'  
বলেছি ওঁদের আচার আচরণকে 'সেকলে'।  
এখন মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে দেখি  
নিজেরদেই নিজের 'কাল'কে 'সেকাল' বলে  
বুঝতে পারি, নিজের সেই 'সেকালের'  
আচার আচরণগুলো হাসাকর রকমের  
সেকলে লাগে। এ-তো অস্পষ্ট উল্লেখিত  
হতাম আমরা। বিজয়াদশমীর দিন 'দুর্গানাম'  
লেখার আগে জুল সিঁশিখেবে ফেললে মনে  
হতো সর্বস্ব হারালাম বুঝি। সর্বস্বভী  
পাশের দিন খুব সকাল সকাল অঞ্জলি হয়ে  
গেলে, উপোষটা না লাগলে, মনে হতো  
পুরো পূর্ণি হল না। আর ওই স্রীপদ্মমীর  
আগে টোপাকল খেয়ে ফেলা? সে তো  
ভাবাই যায় না। তাছাড়া—ভাইবোনের মধ্যে  
সৈন্দ্রি ভুল করে কেউ বই পড়ে ফেললে  
'তাকে ধিকারের শব্দ বিধে প্রায় শূঁইয়ে  
দেওয়া হতো।' দাদা তো স্রীপদ্মমীর আগের  
রাতে টোপাকল সব বই-খাতার ওপর একটা  
চাদর ঢালা দিয়ে রাখতো আর দেয়ালেও  
কলপে-ভারগুলো উটে রেখে দিতো।

তা সত্ত্বেও হয়তো ঘটে যেতো কোনো  
দুর্ঘটনা। হয়তো চোখে পড়ে যেতো একটা  
পুঁবনো চিঠি, বা ওইরকম অন্য কিছু,  
শুধু যে ভেঙে পড়ে যেতাম। আমারই হয়তো  
একটু বেশী ছিল এটা, এদিকে 'দাসি' ডাকা  
বুকে। 'মেয়ে-ডাকাত' ইত্যাদি সূচক  
বিশেষকণ ভূষিত হলেও, ভিতরে এই অশ্লৈ  
বিচলিত, উত্তেজিত, অশ্লৈ বিগলিত ভাবটা  
আমারই বেশী ছিল।

না চাইতেই মাথা কোনো খেলনা পুঁতুল,  
বা দাদার একটা পেস্টিল কলম দিয়ে  
আমার চোখে কল এসে যেতো। কল অস-  
হল দৈবা যদি মা কাছে এসে মাথায়  
একটু হাত রাখতেন, আমার ডুকে 'কে'দে  
উঠতে ইচ্ছে করতো। ওই হাতটা অবশ্য  
খুবই দুল্লভ ছিল আমাদের কাছে। জন্ম  
অসুখে হলে, মা সাব-কলি খাওয়ার জন্যে  
তাড়না করতেন, সময় মারিক ওষুধ নিয়ে

যেতো 'বিড়ী-বিড়ী'র বোকা, 'বিনা-বজ্রাক'  
নজ্জের গলার চেলে দিড়েন, চুলে জট পড়ে  
গেলে প্রবল আকাংক্ষা 'হি'চড়ে 'হি'চড়ে  
আঁড়ি দিয়ে 'কলি'করতেন, এবং অসুস্থতা  
যে 'সম্পূর্ণ' নিজের কোবে ঘটেছে এ-বিধে  
অবহিত করিয়ে দিয়ে ডবিঘাতে সাবধান  
হবার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু 'কপালে হাত'  
যাকে বলে জনশ্রী-লেন-কল্পণ? সেটা  
আমাদের কাছে দৈবঘটের ঘটনা, দেবদর্শিত  
পাওয়া।

অথচ এতোটুকু অসুখেই 'ডাক্তার আনো  
ডাক্তার আনো' করে বাবাকে বসন্ত করতে  
ছাড়তেন না মা। এবং একটু বেশীর দিকে  
গড়ালেই মা কালীর কাছে দুম-দুম করে  
জানত করে বসতেও পড়তেন।

মার এই মতিই দেখতে 'অভাস'  
আমরা। বদমায বয়েসমাত্র তখন গ্রিসোথ।  
মানে আমার স্পষ্ট স্মৃতির জগতে যেটা  
করেছে, হয়তো বা গ্রিশের নীচেই।

কিন্তু এ-তো আমরা দম্পতিই  
ছিলাম। মামার বাড়িতে দেখেছি মামান  
মেরদের 'মা' বলে গারে পিঠে লেপড়ে  
বসতে গলা খরে ঘুমোতে, সে সব কি  
আমরা কল্পনাই করতে পারতাম?

মনে খেদ, হেঁজু, আমাদের মা, এমন  
শুকনো 'খটখট কেনে?' অথচ আজ একটা  
ভাঙা-হাটল দিয়ে মাকে তার বিপরীতটা  
দেখে এমন কটকট আবেগ উথলে উঠছে  
কেন?

হয়তো আসল কথা, আমরা যাকে যেমন  
দেখতে অভ্যস্ত, মার সব্বোধ বা খারগা  
কল্পনায়, তাকে তা থেকে অন্যরকম দেখলেই  
বিচলিত না হয়ে পারি না। কারণ সেটা  
ওই খারগার মতো নাড়া মের।

তাই দিদি এখন বললো, 'মার এখনকার  
হাতের লেখা দেখিসতো?' আস্তে পাও  
কাত করলাম। দেখি বৈকি, মাঝে মাঝে  
মাসিদের চিঠি দেন, পোস্টকার্ডে। এক পরস।  
দামের পোস্টকার্ড, তাও 'মা ঠেখ' ধবে  
সবটা ভরিয়ে ফুলে, উঠতে পারেন না।  
দু-চার লাইনে সেরে দেন এবং বাঁকাচোকা  
অক্ষরে ধরা পড়ে অক্ষরের ছাপ।

আর হাতের লেখা দেখা যায়, খোপাব  
খাতার বা কলচ কখনো কোনো বাক্য  
দোকানের কদর। সে-লেখাব আখরের কথা  
না তোলাই ভাল।

চারহাসিনী দেবী সেই 'নিজের লেখা'  
দীর্ঘ দীর্ঘ গানের দু-চার লাইন এখনো  
ধেন আছে—'বেমন—

'কতো হল জানো, হে-পরানবধু  
আমি অতো বুঝি না যে—  
অকলাবালার হৃদয়েতে জাট  
সদাই বেদনা বাকে।'

জগদা—  
'ভালবেসে মিলিল না, প্রাণের তিস্রা—  
ও তব চরণডলে প্রাণ দিই আশা।'  
একটা গান তো প্রায় সবটাই মনে আছে—  
'নিশিদিম আমি পঞ্চপনে রেখে আঁধি,  
তোমারই আসার আশা' হে নাথ,  
উত্তলা হইয়া থাকি।



কথা (৩য়) প্রথম ভাগে প্রাণসার,  
উৎসার বন্ধ, কীটপ পল হাত,  
বাসনা হয় যে প্রাণসার পথে—  
কিছু বই হয়ে পাখী।

আজ্ঞা সাংখ্যাতিক সাংখ্যাতিক কিছু লাইন  
আছে, কিন্তু থাক। পুরুষদের প্রসঙ্গে  
আমি কেবলই বলাই সঙ্গত।

বলেসে মার-বল?

তা হোক, সাহিত্য বিচারে একেবারে  
‘অকম’ ছিলাম না, গানগুলো যে লেখার  
দিক থেকে বিশেষ উচ্চমানের নয়, তা বন্ধ  
ফেলতে দেবী হুর্নি। ‘কিন্তু বিষয়বস্তু?’  
সেটাও বন্ধ ফেলছি। তাইনা বন্ধেব  
মধ্যে অতো আলোড়ন উঠছিল।

তার সঙ্গে অপরাধবোধ।  
বন্ধের মধ্যে ‘টিপ’ ‘টিপ’ করছে, মনে  
হচ্ছে ‘ব’ একটা ‘ক’র কাজ করছি। তাই  
বন্ধটাকে শান্ত করতে সময় লাগলো।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য কথা!  
চারহাসিনী দেবীর মধ্যেও এইসব  
ছিল। প্রেম, ব্যাকুলতা, বিরহবেদনা। আর  
সেই অনুভূতিগুলি সম্পর্কে বোধ ছিল,  
এবং সেটা পুকাশের চেষ্টা ছিল।

এ কী বিশ্বাস করা যায়?  
কল্পনাই করা যায় না যে।

তাছাড়া—ওই প্রেমপ্রেমগুলো কার  
উদ্দেশ্যে? সदा সর্বদা খাঁর সঙ্গে খিটিমিটি,  
খাঁর জন্যে মেজদা আড়ালে বলে ওঠে, ‘ওই  
কেমে গেল সাপে-নেউলে। নারদ। নারদ—  
সেই ত্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গাপাধ্যায়ের জন্যে?’

দিদির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে  
খাচ্ছিলাম, খতমত খেয়ে খেয়ে গেলাম। দেখি  
দিদি মূখটা নীচু করে বসে আছে, দিদির  
চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

এটা কী?

এতোক্ষণ তো দিদিই সাহসের পরা-  
কাটা দেখাচ্ছিল।

এখন আবার আমার মতো ভয় খাচ্ছে!  
ভয়ে ভয়ে বাঁচ, ‘এই, কার্ণাহিস কেন?’  
দিদি ধরা গলায় বলে, ‘মানুষ এতো  
বদলে যায় কেন রে?’

ওমা! এই জন্যে দিদি কাঁদছে।

আমার তো কামা পাচ্ছিল একটা দোষ  
করা দোষ করা ভয়ে। ‘ভিতর থেকে কে  
বেন বলছিল, ‘গুরুজনের জীবন সম্পর্কে’  
বেশী জেনে ফেলা অন্যায়, বৃথাবা পাপ।

কিন্তু দিদি যে অন্য কথা বললো।

অবাক হয়ে বললাম, ‘অন্য কেউ বদলে  
গেলে তোর কী?’

‘কী জানি। বস্তু কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে  
হরতো আমিও একদিন এই রকম বদলে  
যাবো। তখন আমাকে আর আমি বলে চেনা  
যাবে না।’

হঠাৎ মনে হলো, এখন দিদির আর  
কি দিদি বলে চিনতে পারছি না।  
দিদি যেন আমার নাগালের অনেক উঁচুতে  
উঠে গেছে। দিদির দৃষ্টির বিষয়বস্তুর সঙ্গে  
আজ্ঞার পুরুষের অনুভূতিক মেলাতে  
পারছি না।

এতদূর অবার দিদির আর আমার  
সংসদ্রব্য ছিল এক, দুজনে দুজনের এক-  
বারে কাছাকাছি ছিলাম, এখন কী হতে  
চলছে? দিদি দূরে সরে যাবে? দিদি  
আমার থেকে বড় হয়ে যাবে?

কোথা থেকে একরাত অজ্ঞান এসে  
জড়েলো। দিদির ওপর রাগ এসে গেল।  
বললাম, ‘ঠেনে, দৃষ্টি কাল্পনিক, কুই। সবাই  
বাঁচ বললার—ককসো বললার না আমি  
বলে মনের জোর করে থাকলেই হয়।’

তারপর বয়েসের অনুরূপ বৃদ্ধিতে  
বলে ফেললাম, ‘তাছাড়া ভালো তেল মাখলে  
টাকও পড়ে না, নিরমিত ব্যায়াম করলে  
দুর্ভিক্ষ হয় না। আর ফিটফিট সেলে  
থাকলে বড়োও দেখায় না।’

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে  
ফেললো।

জলজল চোখেই কৌতুকের ছায়া কুটে  
উঠলো, বললো, ‘দূর বোকা, আমি কি ওই  
এদলের কথা বলছি?’

আন্তে আন্তে দিন যাচ্ছিল।

অন্যের কল দেখে দিদির চোখ দিয়ে  
জল পড়ছিলো, অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি,  
দিদি নিজেই আন্তে আন্তে বদলে যাচ্ছে।

দিদির খেলাধুরে ধলো জমছে, দিদির  
পুরুষের বাকস প্রায়ই বন্ধ পড়ে থাকছে।  
আমি প্রলম্ব করতে ডাক দিই, দিদি,  
এই সময় মা ঘুমোচ্ছেন, আমি না পড়ুল  
খেলি।

দিদি বলে, ‘এখন ইচ্ছে করছে না রে,  
পরে খেলবো।’

সেই পুরটা আর বড় একটা আসে না।

অথচ দিদিরই পড়ুল খেলার মন ছিল  
বেশী। আমার অনেক ডানপিটেমি খেলা  
ছিল। আমি দাদাদের কার্যমবোধ নিয়ে  
কার্যম খেলতাম, ছাতে গাঙ্গু বড়ো চুপি-  
চুপি দুপুরবেলা দাদাদের ভ্রমার থেকে  
মার্বেল সরিয়ে এনে গুলি খেলতাম ‘প্লিসিস  
নাইন টুয়েলভ’ করে, আমি খালি  
দেশলাইয়ের বাস দিয়ে রেলগাড়ি বানাতাম,  
উনুন ধরাবার কাঠ থেকে বেছে বেছে  
পাতলা কাঠ নিয়ে খেলাঘরের উনুনের  
জন্যে সরু সরু কুচি করে জড়ো করতাম  
ডাঙা ছারি দিয়ে; আর মাটি দেখলেই  
তাতে জল ঢেলে মাটির পড়ুল খেলনা  
বানাতে বসতাম।

দিদির এগুলো আরও খারাপ  
না।

দিদিই তখন আমার ডাক দিচ্ছিল  
রুটি, কী দলিলাকিত হচ্ছে, আর-নক  
খেলি। গিমীর মেজবো তো আর  
নাড়তে বাগের বাঁচি বেড়াতে গেল  
সলো, এখন ওর পালার রানটা এক  
তার ঠিক নেই। ছোট্টবো তো  
এদিকে বড়বোয়ের ছেলের জন্যে  
পবন্ত কাষাই করেছে আজ, বড়ো  
গিমীর।

এককম কথা দিদি অনর্গল  
হঠাৎ দিদির ওই পুরুষের সংস্কার  
অর্গল পড়ে যাচ্ছে বেন।

অভ্যাসের বশে যদিও  
কোনো দিন খেলে, তার মধ্যে  
একশতই অভাব, তা আমি প্রাণে  
পাই।

আমায় চেঁচিয়ে বলতে  
‘দিদি, কুই তো এখন থেকেই বললার  
করেছিস।’

কিন্তু দিদি দৃষ্টি পাবে ফেলে

অগত্যাই ছাতে উঠে পাচ্ছিল  
কুকুরে সেই ধানকল দেখি, সেই  
খানি উদ্ভূত আকাশের নীচে বিরাট  
চকচকে সিমেন্ট বাঁধানো, তার উপর  
ঢেলে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মজার  
দিয়ে দিয়ে ঠেলেছে।

এক এক সময় ধানের আয়তন  
নিরে শূন্যে পড়ে, গায়ে রোদ লাগে  
করে না।

আমার রোজই নতুন লাগে।

দিদি ঘরে শূন্যে গল্পের রই পা  
তবে আজকাল প্রায়ই দারুণ  
করছেন-মা দিদির।

দিদি নাকি বেহুশ হয়ে যাচ্ছে,  
রাজা হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম  
দিচ্ছে।

‘এ্যালাকাডি’ শব্দটার মূলক  
আজও জানি না, অর্থাৎ ‘জা’  
‘অবহেলা’।

মার চেঁচামেচি শুনলেই  
নীচে নেমে আসতাম। তখন  
একহাত নিতে শূন্য করতেন, ‘এই  
এক রাজকন্যে তৈরী হচ্ছেন।  
অবতার। সমস্তকণ ছাতে ছোঁয়

প্রকাশিত হইল—

ডায় প্রকাশ কল্যাণাবার প্রণীত

## ধাত্রীবিত্তা

(৩য়, পথ্য এবং অসংখ্য চিত্র-সহ আধুনিক প্রসব বিজ্ঞান শিক্ষাবার সুসজ্জিত  
মূল্য—৪.৯০

অন্যান্য গ্রন্থ—(ক) অবার ৩য় ০.০০ (খ) অবার অর্জন রোগ ১.৫০ (গ)  
নন্দরোগ চিকিৎসা ১.৫০ (ঘ) সৌন্দর্য রোগ ও তাহার চিকিৎসা ১.৫০

প্রাপ্তিস্থান—এম জি রায় এমড কোং, ৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।  
কিং এমড কোং, ৯০ ও ৯১ কল্যাণ গান্ধী রোড কলিকাতা। হ্যান্ডবয়ন-বারিলাই  
কোং, ১৬৫ বি বি গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেখি সেই খেই করে হাতে ওঠা।  
ইনি তো রাতদিন নাটক-নভেল  
পড়ে আছেন। বড়ো চোরদায়ে ধরা  
পড়ছে। এই আমি। বেলা গড়িয়ে গেল,  
শুকনো কাপড়গুলো দড়িতে  
সোঁতে গেল। তোমার নাম নেই। ... দিদির  
বর 'বয়েস হয়েছে', মা-বাপের ঘরে আর  
বসবে না, তুমি, তুমি পারো না বড়ো  
কাজে সেজে এটুকু করতে?"

আমি ভাড়াটাড়ি এগিয়ে যেতাম।  
কতকণে দিদিও অবশ্য কতকাল  
বসে দিলেছে।

দাদার বাড়িতে থাকলে কিন্তু মা ঠিক  
করবে কথা বলতেন না, বিশেষ করে  
মেজদার মা রীতিমত ভয়ই করতেন। আর  
দাদাকে কেন সম্মত।

মেজদার এরকম কথার একটুও  
কানে গেলে মেজদা মাকেই বকে দিতো।  
বলতো, 'আজ্ঞা মা, শব্দ-ব্যাড়ি  
করে তো খেতে মনবেই, আর অন্য কিছু  
পাক না পাক, বকুনিটা ঠিকই খেতে  
পারবে। এখানে যে কদিন আছে একটু  
শান্তিতে থাকুক না।'

মা তখন কীদো কীদো হতেন, 'আর  
শব্দ-শব্দ-শব্দ-শব্দ আমায় গজনা দিয়ে  
কি, 'মেয়েকে কিছু শেখাওনি' তখন?

ওঃ গজনা? তার হাত এড়াতে পারবে  
কি? তোমার বখন মেয়ে, তোমার ওটা  
খেতেই হবে মা। তবু ভাল না হলেও খেতে  
হবে, মেয়েকে বাপের বাড়িতে আনতে  
হলেও খেতে হবে। কী হবে না?"

তখনকার মতো মা ব্যাজার মধ্যে  
সেই, 'বাপ-দাদার আশ্বাসের আশ্বাসেরই  
আশ্বাসে থাকে মেয়েরা। তবে থাক, কিছু  
কথাবো না। আদর করে নাটক-নভেল  
পড় নাও, বোনেরা লিখনায় অঙ্গ ঢেলে  
কাজে তাই।'

কিন্তু তারপরে আর টা শব্দটি  
কেন না।

মেজদা কিন্তু এঘরে এসে বলতো,  
ওই কাজটাগুলো সময়ে করে  
কেন না কেন বাবা! সামান্য নিয়ে বখন  
করেন।'

আবার বাবা?

আবার কানে অবশ্য হরমই যেতো।  
বাবা বাড়িতে থাকলে তো মার একমাত্র  
প্রসঙ্গই ছিল। ছেলেমেয়ের নামে  
কাজ।

এখন বুঝতে পারি, ওটা আর কিছু  
না, আমার সন্তান 'পারফেক্ট' হোক এই  
কাজে একটা বাসনা তাঁর মনের মধ্যে বন্দ  
ছিল। কিন্তু সেটা হওয়াবার জন্যে  
কি পদ্ধতি আবশ্যিক সে সম্পর্কে জান  
ছিল না। তাই অহরহ উপদেশ, বকুনি, আর  
কান্নাকাতি নিয়ে গিয়ে ফেলা, এই পথেই  
চলতেন।

কথা আবার আর এক কথা বলে মাকে  
আপত্তি দিতেন, 'তো কীই বা এমন কাজ?  
তো কে তুমিই করে নিতে পারো। এখন  
তো আর তোমায় রান্না করতে হয় না।'  
মা, 'কাজটা ঠিক।'

ওই অকিনাল ডাক্তার রোগে আমার  
বছর খানেক পর থেকে আমাদের বাড়িতে  
এক 'বামনদার' আবির্ভাব ঘটেছিল।  
প্রথমে এসেছিল, মার একবার 'পানবস্ত্র'  
হওয়ার। বড়ো বরসে কচি ছেলেদের রোগ  
দেখে লবাই। (মানে আমাদের সেই 'শুকনো  
বাড়ির জ্যেষ্ঠা' পিসিমারা। মাঝে মাঝেই  
তো বেড়াতে আসতেন ওরা।) 'হি হি' করে  
ছিলেন। তবে ওরাই বিধান দিচ্ছিলেন,  
একশ দিন ঘরে আটকে থাকতে হবে, রান্না  
রান্না হওয়া চলবে না, বাড়িতে মাছ  
ঢুকবে না, পান খেয়ে মার ঘরে কারো  
ঢোকা চলবে না। আর লালপাড় শাড়ি  
পরে তো নয়ই। মা-শীতলার ব্যাপার তো।  
মাছ পান আর লালপাড় শাড়ি দেখলেই  
উনি চটে বান।

তা সেই সময় কোথা থেকে যেন ওই  
বামনদিকে জড়িয়ে আন্য হলো। দু বেলা  
রান্না করে দিয়ে চলে যেতো, খেতো না।  
ঠিকে লোক বাকে বলে। তা সেটাই পরম  
লাভ।

তারপর মা সেসে ওঠার পর বাবা বল-  
লেন, বেশ তো চলছে, বামনদারের থেকেই  
হোক।'

মা যে পদলিকিত হয়েছিলেন তাতে  
সন্দেহ নাস্তি, তবু বলতে ছাড়াই নি, 'মাস  
মাস করকরে আটটা করে টাকা। শব্দ দুটি  
রেখে দিয়ে বাওয়ার জন্যে? টাকা কি  
খোলামকুচি?'

কিন্তু থেকেও গেল বামনদার।

আবার বেশ একটা নিশ্চিন্দ জেদ ছিল।

বাবা বেশী কথা বললেন না, শব্দ  
বললেন: 'গরীব-গরীব মানব, একটা  
টাকার পেয়ে গেছে, ওর অমটা মারাটা ঠিক  
হবে?'

মনোরমাদির বাড়িতে আড়াই টাকায়  
বামনদার আছে।

'আহা সে নিশ্চয় বাওয়া-পরা।'

মা ঠোঁট উল্টে বললেন, 'একটা মানুষের  
খেতে পরতে আবার কত লাগে?'

সেকালে অবশ্য তাই বলতো লোকে।

তা সে বাই হোক মাকে আর রান্না  
করতে হতো না। কিন্তু সেকথার উল্লেখ  
হলে খুব রেগে যেতেন। বলতেন, 'রোসো  
কালই ছাড়াছি ওকে। আমি কেন তোমার  
সংসারে বসে থাকো। দাসীবাঁদী আদি  
তাই থাকবে।'

আর তখনই হঠাৎ হঠাৎ সেই মখমল  
বাঁধানো খাতাটা মনে পড়ে যেতো আমার।  
তবে মা বলতেনই, ছাড়তেন না।

কিন্তু ওই 'বয়েস ধরা' কথাটা মা-  
বাবার সামনেও বলতেন না এটা লক্ষ্য  
করোছি। দিদি একা থাকলেই বলতেন চাপ  
রাগের গলায়। আমার কানে অবিশ্য  
যেতো।

একদিন দিদিকে জিগোস করে বসলাম,  
'আজ্ঞা দিদি, মা ওই কি একটা কথা বলেন,  
'বয়েস ধরা' ওর মানে কী রে?'

দিদি কড়া গলায় বললো, 'জানি না।  
জার কাউকে জিগোস করতে যাঁচি না,  
খবরদার।'

না, জিগোস কাউকে করিনি, তবু  
কেনন করে যেন ওর একটা অর্থ আবিষ্কার  
করেও ফেললাম।

দিদি যে মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান  
গাইতো 'দিবস রজনী আমি যেন ক্যার  
আসার আশার-ধরিক, ডাই চপ্পল মন চকিত  
নয়ন তুষিত আবুল আশি—' অথবা 'বাতাস  
আসিরা কছে গেছে কখনে প্রিয়তম তুমি  
আসিবে—' এসব যেন শব্দ মন্থন গানই  
নয়, যেন গানের হুম্মবেশে গভীর কোনো  
অর্থ বাহী কথার আত্মপ্রকাশ। ওর মধ্যেই  
ওই কথাটার মানে।

বাবা কুমারী মেয়ের মধ্যে 'প্রিয়তম'  
শব্দটা উচ্চারিত হওয়া যে খুবই গাঢ়  
এ জ্ঞান টানটান ছিল আমার, তবু দিদিকে  
ওখন কেনন অস্বস্তি সন্দেহ দেখতে লাগতো,  
তাই 'হি হি'কার দিতে পারতাম না।

দিদির গলা বেশ মিষ্টিও ছিল।

ওই মিষ্টি গলার সঙ্গেই একদিন এক  
মিষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে গেল; আমাদের  
বাড়িতে। মেজদার বন্দু দিলীপ, যে এতাবৎ-  
কাল মেজদার মারফত আমাদের খতো পত্র-  
পত্রিকা আর বই জড়িয়ে আসছে, সে এক-  
দিন হঠাৎ নিজেই একগায়া বই  
হাতে নিয়ে এসে বললো, 'তোদের বাড়িতে  
কে গান গায় রে অমন? সেদিন শুনতে  
গেলাম, ঠিক কলের গানের মত—'

মেজদা হো হো করে ছেসে উঠে  
বললো, 'আমাদের বাড়িতে গান? স্বপ্ন  
দেখিছিস নাকি? তাও আবার কলের গানের  
মত! বাড়িওয়ার বাড়ির কলের গানই  
শুনিয়েছিস বোধহয়।'

দিলীপদা বললো, 'না রে। তোদের  
বাড়িরই ছাত থেকে সুরটা ভেসে আসছিল।'

এসব কথা অবশ্য দালান থেকে শুনতে  
পাচ্ছিলাম। ওঘরে ঢুকে নয়। দাদাদের  
বন্দুটম্বর সামনে বেরোনের 'পারমিশনি'  
আর ছিল না আমাদের। অনেকদিনই ঘুচে  
গিয়েছিল।

তবে মেজদার গলা তো চড়াই,  
দিলীপদাও বেশ খোলা গলার কথা বল-  
ছিল। কারণ সেদিন মা আর বাবা বাড়ি  
ছিলেন না তখন। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে  
গিয়েছিলেন ঠাকুরদার বাৎসরিক কাজে,  
অথবা কারো অসুখ শুন্যে ঠিক মনে নেই।  
মোট কথা আমাদের সেখানে আবার দরকার  
ছিল না।

তাছাড়া—বামনদিকে রাখার পর থেকে  
মার এই একটা কাজে কিছু কিংবদন্তি  
হয়েছিল।

মেয়ে আগলানো।

আমার আট, আর দিদির দশ, তখন  
থেকেই মাকে বলতে শুন্যেছি, 'যেখানেই  
যাবো মেয়ে গলার গেঁথে যেতে হবে। মেয়ে  
বড় হওয়ার এই জ্ঞান। সাথে কি আর  
মেয়েতে ছেলেতে এতো তকাং করেছে  
লোকে। ছেলে বড়ো হওয়া জরুরা, মেয়ে  
বড়ো হওয়া ভয়।'

এখন মাঝে মাঝে বাবার সপ্নে যিন্বে-  
টার দেখতে গেলে, মা বামনদিকে বলেন,  
'বামনদার, তোমার বাবা দু-জানা পরসস'

# সুপ্রা ওয়াশিং পাউডার ওগে অসাধারণ কেন জানেন ?



সুপ্রা ওয়াশিং পাউডারের  
পরিষ্কার করার ক্ষমতা চের বেশী!  
খুব ঘন ফেনায় ময়লা কাটিয়ে  
দেয়! এমন কি খরসে কাচেনেও  
যেকোন গভীর দাগ  
অনায়াসেই উঠে যায়!

জোরদার সুপ্রা ওয়াশিং পাউডারে কাচা কাপড়-  
চোপড়ে একটি বাড়তি উজ্জ্বলতা বুটে ওঠে। খর  
জলে কাচলেও তার হেরফের হয় না। পরিষ্কার  
ও স্বচ্ছকক করে কাচার বিশেষ উপাদান রয়েছে  
এই ওয়াশিং পাউডারে। অল্প ওয়াশিং পাউডার  
হার মানলেও সুপ্রা কখনো হালি ছাড়ে না। এর  
অদ্বৈত কেন্দ্র কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে সুবিরে  
খাচা ধুলায়লা সব দূর করে দেয়। আপনার  
জামাকাপড় অন্যরকম পরিষ্কার ও স্বচ্ছকক হয়ে  
ওঠে। কাজেই নিরীরা আত্মকাল বেশির ভাগই  
সুপ্রা ব্যবহার শুরু করেছেন। আপনিই বা বাকী  
কাকে কেন ?

বিশেষ  
উপাদান  
উপরী

**সুপ্রা**

অনায়াসে কাপড় কাচার  
একটি শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডার !  
(সুপ্রা প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১)

বিশেষ উপহার  
সবকাল পর্যন্ত!



আপনার জন্য  
মাত্র ৮০ পয়সা

হাটো ইকনমি সাইজ সুপ্রা  
কিনালে এই বড় স্ট্যান্ডার্ড  
মাড্রিস চামচটি পাবেন।

খোঁজতে দেব, তুমি একটু বসে থেকো।  
জ্যোৎস্না না আসি দিদিদের দেখো।

মা চলে গেলে দিদি রাগে দাঁত পিঁবে  
জ্যোৎস্না, দিদিদের দেখো। রথিনী-  
রথিনীদের কাছে কী মান-সম্মানটাই বাড়লো।  
দিদিরা যেন ঘর ভেঙে চলে বাবে। ঠিক  
কিন্তু হন, একদিন সত্যি তাই করলো।

দিদি আজকাল বড় মেজাজী হয়ে  
গাফিলত সত্যি। মেরেদের একা বাড়িতে রেখে  
বসে নেই। এ তো অবধারিত ব্যাপার,  
রথিনীদের সংসারেই আছে। তবে?

তা বাক সেদিন বসন্তের উপ-  
শ্রুতিতেও সেই অশ্রুত ঘটনা!

মেজদা বললো, 'সরুটা ভেসে আস-  
লো? হাত থেকে? সন্ধ্যাবেলা বোঝায়?'

'তাই মনে হচ্ছে?'

মেজদা আবার হাত ফাটিয়ে হেসে ওঠে,  
তবে আর দেখতে হবে না, হাতের অধি-  
স্তানী দেবী কোনো শিখচাঁর গান  
শুনেনি।

আমার মনে পড়লো, কদিন আগে  
রমা যেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন,  
দাঁড়ি হাতে উঠে বেশ গলা ছেঁকে গান  
গাইল।

শুনে আমারই ভর ভর করছিল। এতো  
গলা তুলছে কেন বাবা! হতে পারে ওদিকটা  
শিল্পী, কিন্তু এদিকটার তো বাড়িটাড়ি  
কি? যদি কেউ বকে

কলে রমেশবাবুর বাড়ি থেকে  
গান ভেসে আসছে। বলেওছিলাম  
কখনো একবার, কিন্তু দিদি গ্রাহ্য করেনি।  
শুধু মেয়ে আমার চুপ করে বসেছিল।

সেদিন কিছ মনে হরনি, কিন্তু আজ  
কি মনে হলো, দিদি কী হচ্ছে করে গলা  
হুলিছিল? দিদি কি জানতে পেরেছিল কেউ  
দর গান কান পেতে শুনছে।

দিলীপদা বললো, 'যেহ'

'আমরা তুই ছিলা কেখার?'

আর আমি তো জোর কাছেই আস-  
লাম। সিঁড়ির সামনের দরজা খুলে দিলে  
জামের এই বাঘনবি না কে বললো, 'দাদা-  
বাবু, বাড়ি নেই, শুনলে চলে গেলাম,  
শুনই শুনলাম—'

আমরা দোতলার বাসিন্দা, সিঁড়ির  
আমের দরজাটাই আমাদের সদর দরজা।  
জিএব এটা অবিস্বাস্য নয়, হাতের গান  
শুনলে ভেসে এসেছে। একইতো সিঁড়ি  
তে গেছে।

মেজদা হঠাৎ হাঁক পাড়লো, 'এই রুটি  
তোরা ছাড়ে গান গান?'

মা-বাবা বাড়ি না থাকার, মেজদাও যেন  
স্বরাগ পেয়েছিল। নইলে বন্ধুর সামনে  
বড়ো হয়ে থাকার বোমকে জুকে? 'কিন্তু  
কি তখন কব না কি? এগিয়ে বন্ধুর পার  
করি করি না?'

আমি এসে পাঁড়তেই মেজদা বললো,  
দিলীপ বলছিল এবাড়িতে নাকি—কলের  
গানের মতন গান হয়। গান বুকি?'

আমিই বরাবর একটু হুসুলসহী বলেই  
বোঝায় মেজদা আমাকেই সন্দেহ করলো,  
কিন্তু জানে না তো জলে তল দিদি কতো  
দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। দিদি নিখাৎ  
দিলীপদাকে অন্তরে রেখে গলা তুলে  
গেয়েছে। তবে দেয়াল সত্যিই বদ  
ডালো।

আমি কট করে সেটাই বলে বসলাম,  
'আহরে! আমি গান গাইলে তো মোপারা  
চুটে আসতো। গান দিদি গায়। কতো গান  
জানে। বদ ডালো গায়।'

মেজদা যেন চমকিত হয়ে বলে উঠলো,  
'তাই না কি? কোথা থেকে শিখলো?'

'এনি। বাড়িওয়ালার কলের গান  
শুনতে।'

রেডিওর নামও শুনিনি তখন আমরা।  
কাজেই তার প্রশ্ন নেই।

মেজদা ডাকলো, 'এই শুনী, তুই নাকি  
একটা ওস্তাদ গায়িকা হয়ে উঠেছিস? কই  
গা দিখনি শুনী, কেমন কলের গানের  
মতন!'

দিদি অবশ্য প্রথমটা 'যেহ বলে চলে  
গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাইল। মেজদা  
অভয় দিয়ে বললো, 'গা না বাবা, শাসন-  
কর্তারা তো বাড়ি নেই। দাদাও নেই।'

দিদি গাইল।

হাঁও ঘরের মধ্যে সামনে বসে নর,  
দাদাদের জানালার কাছে বসে।

গাইলো

'আমার মাথা নত করে নাও হে তোমার  
চরণ ধলার তলে।'

বুঝলাম বেশ সাবধানে বেছেগেছেই  
গেয়েছে। তবে, আমার অকালপক মনের মনে  
হলো, ওর মধ্যেও যেন কিছু অর্থ লুকনো  
আছে।

দিদির সুরের আবেগেই কি?

দিদির গলা কাঁপছিল।

কাঁপেই পারে। এতোবড়ো একটা  
ঐশ্বর্যবিক কান্ড ঘটছে!

মেজদা বললো, 'আরে সত্যিই তো।  
ঠিক ঠিক সুরেই তো গাইলি মনে হচ্ছে।  
আহা শিখতে টিখতে পেলো তোর উন্নতি  
হতো! তা বা আমাদের একখানি বাড়ি!  
অতলাতন...গা, আর একটা গা—।

দিদি আন্তে ধরলো—

...আমরা কাঙাল বলিরা করিও না হেলা  
আমি পথের জিয়ারী নই গো—

আর ঠিক সেই সময় বজ্রপাতের মত,  
দরজার শেকল নড়ে উঠলো।

কে জানতো যে মা-বাবা এতো ডাড়া-  
ডাড়ি কিরবেন! তারপর?... বজ্রপাতের পর  
যা হয় তাই।

সেদিন প্রথম বাবাকেও বিরতি প্রকাশ  
করতে দেখলাম।

দিলীপদা আশিষ্য তখন চলে গেছে।

বাবা মেজদাকে বললেন, 'কিন্তু যখন  
হালকা, তখন কী? কখনো কখনো  
কিন্তু? তোমার কী? কখনো কখনো  
হবে ভেবে দেখো।

আর দিদি...  
বলেই 'তুমি একজন বাবির...  
গান গাইবে? তোমার কী? কখনো  
নেই? কই, আমরা তো...  
গাইতে পারো।'

—বাবার মুখে 'তুমি'

এরপরেও দিদি শতবার ভেঙে পড়বে  
না?

বললে তো বলতে পারতো তোমরা কবে  
আমাদের সম্পর্কে এতোটুকু কৌতূহল  
প্রকাশ করেছো যে শুনছি? আমাদের অনেক  
খাওয়াতে হয় 'তাই' জানো, জানো পরোতে  
হয় তাই জানো। আমাদের মধ্যেও যে একটা  
মন আছে, জানো সেটা?

একাল হলে হয়তো বলতো।

আমরা কতো কী বলতো হয়তো।

কিন্তু সেখানে মেরো কে কবে ভাবতে  
পেরেছে গুরুত্বের মধ্যেও ওপর উঁচুত  
কথা শুনিয়ে দেওয়া বার?

বেচারী দিদি! কিছুটি বলেনি, তবু মা  
তার ওপর বাক্যব্যয় বর্ষণ করেই চলেছেন।  
দিদি যা করেছে তা যে প্রায় 'খারাপ' হয়ে  
থাকার মত, সেটাই বুঝিয়ে যাচ্ছেন তাকে  
মা। 'তোমরা বন্ধুর বাড়ি মেয়ে, ভাল-  
মন্দবোধ নেই তোমার?'

অনেক বলার পর আবারও যখন নতুন  
বেগে শব্দ করলেন, 'বড়ো ভাবার, ততোই  
নতুন করে। আশ্চর্য্য। হয়ে... যদি  
আমি! আমার মেরে হয়ে, এতো শিক্ষাদীক্ষা  
পেরে তুই কিনা এককণ্ড আমি চোখে  
আডাল হতেই পরপর বকে গান, শোনাও  
বসলি? তাহলে তো দাঁতনের জন্যে বিশেষ  
দরকারে উল্লেখও যেতে হলে, তাকে বদে  
চাবি দিয়ে রেখে বোঁতে হবে। না হুজুই  
হয়তো—'

তখন ওই হয়তোটা আর উচ্চারণ করতে  
দিল না মেজদা। হঠাৎ এসে হাতজোড় করে  
বলে উঠলো, 'মা তোমার পারে পড়াই, এবার  
ওকে রেহাই দাও। বলো, তো সব সোম  
আমার। আচ্ছ! তোমাদের থিয়েটারে গিয়ে  
নাচ-গান দেখার সোম হয় না, অথচ ছেলে-  
মানুষ মেরেটা একটা গান গেয়েছে বলে  
একেবারে মহাপাতক হয়ে গেছে।'

কী জানি কী ভেবে মা হঠাৎ চুপ করে  
গেলেন।

কিন্তু সত্যিই কি শব্দ আমাদের মাই  
এতো নিষ্ঠুর ছিলেন?

না, তা বলা যায় না।

সেকালে মায়েরা জানতেন এটাই মাঝ-  
কতব্য। আমাদের তো তখন শব্দ বকেই  
কান্ড দিলেন, আমার বড় পিসিমার মত মা  
হয়তো এতোবড়ো গাইতে গাপে মেরেই পা  
করে ফেলতেন।

(রমণী)

হাওড়া  
ফ্রেন্ডস  
সোসাইটি  
রেনারসী-সিন্দ-জি  
ফ্রেন্ডস-সোসাইটি  
১৯৫৬, ৩১ জানুয়ারি



# এই আমাদের দেশ

আজকের এই সুগম স্বাভাবিকের আগে  
দেশপ্রিয় দুঃস্বাদ নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই  
না একটা দেশকে কণ্ঠেটুকু চেনা যায়?  
চিনতে হলে শুধু ভুলো নর জানা দরকার  
তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের  
কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা।  
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই  
১৪ দিক থেকে আলোচনা করা হবে—  
আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে  
আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব  
আমরা।

## কোচবিহার

প্রাচীন দেশীয় রাজ্য ও বর্তমানে  
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম জেলা  
কোচবিহারের কাছাকাছি রাজ্যের সাংস্কৃতিক  
অংশ সীমাহীন। বাংলাভাষা বৈদিক জ্ঞাত্য  
ও ইতরজনের ভাষা বলে উৎপত্তি ছিল  
সেদিন কোচবিহারে। সে-ভাষা রাজমহালা  
লাভ করে। অর্ধ শতাব্দী আগে, যখন  
বাংলাভাষা সম্পূর্ণরূপে জড়তন্ত্রে হরনি  
তখনও কোচবিহারের, খাবতীয় রাজকার্য  
বাংলাভাষার সম্পন্ন হত। ভূটান, আহোম,  
এমনকি পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের  
কাছেও কোচবিহার রাজ্যের সব চিঠি লিখিত  
হত বাংলা ভাষায়। ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কোচ-  
বিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কৃত্তক  
আহোম রাজাকে লিখিত যে চিঠিখানির  
সংধান পাওয়া গেছে, এখনও পর্যন্ত  
সেইটিই বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

অসমিয়া ভাষার উন্নয়নেও কোচবিহার  
রাজ্যেরকারের অবদান সামান্য নয়। আসামের  
শ্রেষ্ঠ কবি ও নব্য বৈষ্ণব আলোচনের  
প্রবক্তা শঙ্করদেব সম্ভবত আহোমদের  
উৎপত্তিই আসাম ত্যাগে বাধ্য হয়ে রাজ্য  
নরনারায়ণের শাসনকালে (১৫৫৫-৮৭)  
কোচবিহারে আসেন। কোচবিহারে অবস্থান-  
কালে শঙ্করদেব 'রামবিজয় নাটক' লেখেন  
এবং রাজ আনুকুল্যে সে নাটক অভিনয়-  
নয়নও কল্যাণ হয়। মধুপুর গ্রামে ছিল  
শঙ্করদেবের আশ্রম। সেখানে অবস্থানকালে  
ভাগবতের ও অনুবাদ করেন এবং মধুপুরেই  
শঙ্করদেবের জীবনদীপ নির্বাণিত হয়।  
পরবর্তীকালে শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য  
মার্কণ্ডেব সম্ভবত একই কারণে রাজ্য  
লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে (১৫৮৭-  
১৬২৫) কোচবিহারে আসেন নেন ও রাজ-  
সভায় অধ্যয়নকালে বাংলা ও অসমিয়া  
ভাষার বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 'কেনচ-  
বিহার' রাজসরবারের গোষকতার মূল  
সংস্কৃত থেকে রামায়ণ ও মহাভারত  
বাংলায় অনূদিত হয়।

স্ট্যান্ডার্ডকাল একাউন্টস অফ কুচ-  
বিহার গ্রন্থে ছাটোর 'কোচবিহার' নামের  
উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,  
'বিহার' শব্দটি বৌদ্ধবিহার থেকে আসে।  
এ মন্তব্য হরত ভুল নয়, কারণ 'বিহার'

শব্দের অর্থ মিলানকেত, আবাসস্থল। তবে  
পূর্বে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ  
বিস্তৃত হওয়ার পরেও দীর্ঘ সাড়ে চারশ  
বছর ঐ রাজ্যটি কামরূপ নামক একটি  
বহু রাজ্যের অংশ ছিল। বৌদ্ধ শতাব্দী  
সূচনার কোচ রাজারা বর্তমান কোচবিহার  
অঞ্চলে কামতাসীন হওয়ার পর রাজ্যের  
নাম রাখেন 'কোচবিহার' অর্থাৎ কোচদের  
বাসস্থান।

স্বতন্ত্র কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-  
কাল সম্ভবত ১৫১০ খ্রিঃ তার প্রতিষ্ঠাতা  
রাজার নাম চন্দন। তিনি কামরূপ রাজ্যের  
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঐ রাজ্যের  
পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র  
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তের বছর রাজত্ব  
করার পর অল্প বয়সেই চন্দনের মৃত্যু হয়।  
তার মৃত্যুর পর ১৫২২ খ্রিঃ বিম্বসিংহ  
রাজা হন ও তাঁর ভাই শিবাসিংহ হন।  
রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী-রায়কং। এই রায়কং পদ  
করে বংশানুক্রমিক হয় এবং বাসুদেবপুর  
হয় রায়কংয়ের স্থায়ী কামড়ম ও কাম-  
কেন্দ্র। ১৫৫৪ খ্রিঃ বিম্বসিংহ স্বেচ্ছায়  
সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র  
নরসিংহ রাজা হন। কিন্তু অল্পকাল পরে  
তিনিও তাঁর ভ্রাতার অনুদলে সিংহাসন  
ত্যাগ করলে ১৫৫৫ খ্রিঃ নরনারায়ণ কোচ-  
বিহারের রাজা হন।

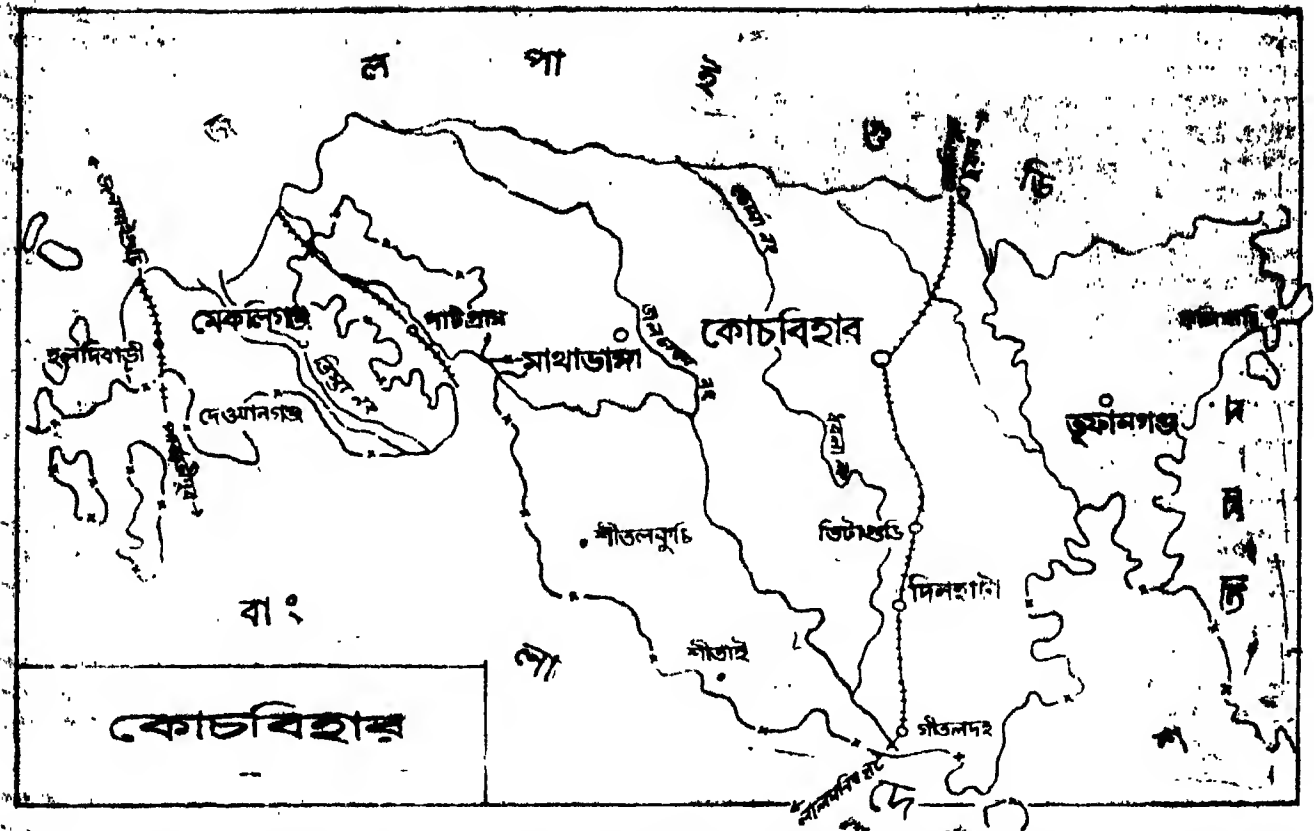
মহারাজা নরনারায়ণের পরাক্রমে সমগ্র  
উত্তরবঙ্গ, ভূটান, আসাম, কাছাড়, জয়ন্তীরা,  
গণপুত্র ও ত্রিশূরা কোচবিহারের বধ্যভা  
স্বীকার করে। রাজা নরনারায়ণের  
নামাঙ্কিত যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত  
হয় তা নারায়ণী মুদ্রা নামে পরিচিতি লাভ  
করে এবং একদা সমগ্র পূর্বে ভারতে সে  
মুদ্রা প্রাচা ছিল। কালাপাহাড় কৃত্তক  
বিধ্বস্ত প্রাগজ্যোতিষ শহরের (বর্তমান  
গোহাটি) কামাখ্যা মন্দিরটি নরনারায়ণের  
গোষকতার পুনর্নির্মিত হয়। স্বাধীন  
মার্কণ্ডেব কোচবিহারের নৃপতিদের মধ্যে  
মহারাজা নরনারায়ণই ছিলেন সর্বাধিক  
পরাক্রমশালী। আবার রাজা শাসনেও তিনি  
'মনিরাম'কতার উজ্জল আদর্শ স্থাপন  
করেন। তাঁর উদ্যোগই বাংলাভাষা কোচ-

বিহারের রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। তাঁর  
রাজত্বকালে পরিব্রাজক রায়লক ফিচ কোচ-  
বিহার পরিদর্শন করেন (১৫৮৬) এবং তাঁর  
নয়ন লিপিতে কোচবিহার রাজ্যের বিশালভা  
বর্ণনাকালে লেখেন, ঐ রাজ্য তখন প্রায়  
১১ মাইলের সীমা স্পর্শ করে এবং চীনের সাগর  
তার বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। রাজ্যের  
মুদ্রাসীরা ছিল অতি ভর এবং সম্পূর্ণ  
গ্রহিৎস। সে সমগ্র কোচবিহার রাজ্যে ভেড়া,  
গরু, কুকুর, বিড়াল, পাখি প্রভৃতির জন্য  
শাসপাতাল ও পিঁজরাপোল ছিল।

মহারাজা নরনারায়ণের সব অস্তিত্বের  
প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর অনুজ শঙ্কর-  
দেব, যিনি চিলা রায় নামে পরিচিত  
ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশাল রাজ্য  
সুশাসনের জন্য রাজা নরনারায়ণ ও চিলা  
রায় সঙ্কোচ নদী বরাবর রাজ্য ভাগ করে  
নেন। চিলা রায় হন পূর্বে অঞ্চলের রাজা  
এবং তাঁর রাজধানী হয় বর্তমান কোচ-  
বিহারের পূর্বে প্রান্তে তুফানগঞ্জ পল্লভার  
কলবাড়ি তালুক। সেখানে ভগ্ন মূর্তি ও  
বাধ আর চিলা রায়ের নামাঙ্কিত শব্দ  
পুষ্করিণী আর্জ ও চিলা রায়ের একদা  
সমগ্র রাজধানীর সাক্ষ্য ও স্মৃতি বহন  
করে। শঙ্করদেব চিলা রায় নামে খ্যাত  
হওয়ার কারণ, তাঁর আত্মপরিচিতি ছিল  
চিলের মত তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

তেরিশ বছর রাজত্বের পর ১৫৮৭ খ্রিঃ  
নরনারায়ণ পরলোকগমন করলে তাঁর এক-  
মাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হন। লক্ষ্মী-  
নারায়ণ দুর্বল প্রকৃতির শাসক ছিলেন।  
আগল সেনাপতি শের আফগানের আক্রমণে  
তাঁর রাজ্য বিপন্ন হলে তিনি ১৫৯৬ খ্রিঃ  
সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি রাজা মান-  
সিংহের সঙ্গে দেখা করে কোচবিহারের  
যোগল সাহায্যের, সামন্ত রাজ্য  
স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব দেন। রাজা লক্ষ্মী-  
নারায়ণ ঐ আচরণে কোচবিহারের প্রাক-  
শালী স্বাধীন বিকল হলে, তিনি যোগল  
দুর্গে আশ্রয় নেন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য  
যোগলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন  
মহাজা খাঁর নেতৃত্বে মোকল সেনারা কোচ-  
বিহারে প্রবেশ করে কয়েক দফা করে ও





প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠ করে স্বস্থানে ফিরে আসে। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্রাট দিল্লীর শাসক। গৌড়ের মোগল শাসক আবার কোচবিহার আক্রমণ করে। তখন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে একটা আপসে আসেন। স্থির হয় যে, মোগল বাহিনী আর কখনও কোচবিহারে প্রবেশ করবে না আর কোচবিহারও মোগল সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করবে না। নারায়ণী মন্দির প্রতিলিপ ও ঐ চুক্তি অনুসারে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে শীতল হয়। পর্যটন বহর রাজ্যের পর ১৬২৯ খৃঃ লক্ষ্মী নারায়ণের মৃত্যু হলে তার পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হন।

বীরনারায়ণও দুইজন রাজা ছিলেন, সেক্ষেত্রে ভূটান ও আরও কয়েকটি রাজ্য তার শাসনকালে কোচবিহার রাজ্যের সাব-জোন্ড অধীকার করে এবং সেই সঙ্গে কর দেওয়াও বন্ধ করে। তবে বীরনারায়ণ বিদ্রোহী রাজা ছিলেন। তার শাসনকালে কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী আশাশুতোষ স্থানান্তরিত হয়। পাঁচ বছর রাজত্বের পর ১৬২৫ খৃঃ তার মৃত্যু হলে পুত্র প্রতাপনারায়ণ রাজা হন ও ১৬৬৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রতাপনারায়ণের শাসনকালে প্রথমে, ১৬৩৯ খৃঃ চট্টগ্রামের (তখন নাম ছিল ইসলামাবাদ) শাসক ইসলাম খাঁ কোচবিহার আক্রমণ করেন। তবে সে আক্রমণের পরিণতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তারপর

১৬৬১ খৃঃ বাঙালার শাসক মিরজুমলা কামরূপ অভিযানের পথে কোচবিহারে প্রবেশ করেন ও সব হিন্দু মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন। রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রাণরক্ষা করতে বনে গিয়ে আশ্রয় নেন। মিরজুমলা তখন ইসফাহানের বেগকে কোচবিহারের শাসক নিযুক্ত করে আসাম অভিযানে অগ্রসর হন। কোচবিহার বাংলায় শাসককে দশ লক্ষ নারায়ণী মূদ্রা দানে স্বীকৃত হয়। কিন্তু কোচবিহারে অবস্থানরত মিরজুমলা সেনানাহিনী এমন পীড়ন শুরু করে যে, কোচবিহারের জনগণ শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় ও আত্মসমরপনকারী রাজাকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। প্রতাপনারায়ণ সেই আহ্বানে সাড়া দেন এবং কোচবিহারের বিদ্রোহী জনগণের আক্রমণে মিরজুমলার সৈন্যরা গৌহাটিতে পশ্চাদ-পসরণ করে। এতে ক্ষুব্ধ মিরজুমলা আবার কোচবিহার দখল অগ্রসর হন। কিন্তু পথেই অসুস্থ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণ সুপশ্চিদ্ধ, কবি ও ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তার পোষকতায় জগন্নাথ, রাঙ্গেশ্বর ও সন্দেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরিকল্পনায় রাজ্যে অনেক সড়ক সেতু নির্মিত হয়।

১৬৬৫ খৃঃ রাজা প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু হলে কোচবিহার রাজ্যে কিছু দিন বিশৃঙ্খলা চলে এবং রাজা প্রতাপনারায়ণের দিল্লীর পুত্র মদননারায়ণকে সিংহাসনে পসিয়ে রাজ্যের প্রধান নাজির মহীনারায়ণ

সর্বস্বা হরে বসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদননারায়ণ নাজির মহীনারায়ণকে রাজ্য ত্যাগে বাধ্য করেন এবং বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থানকালে মহীনারায়ণ নিহত হন। ঐ সময় মহীনারায়ণের পুত্র ভূটানের রাজার সহায়তায় কোচবিহারের সিংহাসনে বসলে তৎপর হন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ১৬৮০ খৃঃ অপটুতক অবস্থায় মদন-নারায়ণের মৃত্যু হলে মহীনারায়ণের পুত্র-দের আবার তৎপরতা শুরু হয়। আর তাদের রাজ্য দখলে সহায়তার জন্যে ভূটানী সৈন্যদল কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করে কাপক লুণ্ঠতরাজ শুরু করে। বিদ্রোহ ও বিহীনভাবে সমগ্র কোচবিহার রাজ্য হতভী হন। সেই সময় রাজ্যকে দখল উপদেশে কোচবিহারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ১৬৮২ খৃঃ প্রতাপনারায়ণের পাঁচ বছর বয়স্ক প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তারপর ১৬৮৯ খৃঃ ইকাদশ বার নেতৃত্বে এক মোগল বাহিনী ঘোড়াঘাট থেকে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে ও বহু এলাকা দখল করে নেয়। ঐ সময় বালক রাজার পক্ষে নাজির জগন্নাথ মোগল আক্রমণ প্রতিরোধে তৎপর হন। কিন্তু তার স্বল্প-বিশেষ ক্ষমতা হয় না এবং ১৬৯১ খৃঃ তার মৃত্যু হয়। তার দু বছর পরে, মাত্র বোল বছর বয়সে মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে রাজ্যে আবার অস্থিরতা অবস্থা দেখা দেয়। মহীন্দ্র-নারায়ণের মৃত্যুতে কোচবিহারে যেচ রাজ-বংশের শাসনের অবসান হয় এবং রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, অনুমোদনক্রমে

পরলোকগত নাজির জগন্নাথরায়ের প্রাচুর্য-  
স্বত্ব রূপনারায়ণ ১৬১৩ খ্রিঃ কোচবিহারের  
রাজা হন। রূপনারায়ণের শাসনকালে  
মুসলিম আক্রমণের ফলে কোচবিহারের বহু  
অংশ বিচ্ছিন্ন এবং কোচবিহার রাজ্য  
মোটামুটিভাবে বর্তমান কোচবিহার জেলায়  
সীমাবদ্ধ হয়। রূপনারায়ণ আঠারোকেটা  
থেকে রাজ্যের রাজধানী তৈরি নদীর পূর্ব  
পারে গুরিমাটিতে স্থানান্তরিত করেন।  
স্থানটি বর্তমান কোচবিহার শহরের সমীপ-  
বর্তী অঞ্চল। ১৭১৪ খ্রিঃ রূপনারায়ণের  
মৃত্যু হলে তাঁর ছোট পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ  
রাজা হন এবং সে সময় কোচবিহারের  
অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হয়। একদিকে ভূটান,  
অপরদিকে রংপুরের মুসলমান ফৌজদারের  
আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় উপেন্দ্র-  
নারায়ণকে। তিস্তা নদীর পশ্চিম পারে  
সিংহেশ্বর ব্যারের যুদ্ধে তিনি মুসলিম  
আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। তখন চতুর্থ  
রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ভূটানীদের সঙ্গে  
সন্ধি করেন এবং ১৭৩৭-৩৮ খ্রিঃ ভূটানী-  
দের সাহায্যে মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত  
করেন। উপেন্দ্রনারায়ণ গুরিমাটিতে  
একটি নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং  
৪৯ বছর রাজত্বের শেষে ১৭৬৩ খ্রিঃ শেষ-  
নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রথম মহিষী  
তাঁর সঙ্গে সহমরণে বান এবং প্রথম  
মহিষীর ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়া মহিষীর  
পুত্র ধর্মেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করা হয়।  
ধর্মেন্দ্রনারায়ণের বয়স তখন মাত্র চার বছর।

শিশু ধর্মেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে  
রাজ্যে আবার একটা অনিশ্চিত অবস্থার  
সৃষ্টি হলে ভূটানীরা মহারাজা উপেন্দ্র-  
নারায়ণের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিবলে কোচ-  
বিহারের শাসন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ করায়ত্তে  
আনতে তৎপর হয়। রাজধানীতে ভূটানের  
একজন রেসিডেন্ট ও ভূটানের এক বাহিনী  
সৈন্য রাখার ব্যবস্থা হয় এবং ঐ রেসি-  
ডেন্টই কোচবিহারের সর্বস্বত্ব হয়ে ওঠেন।  
ওদিকে রাজগুরু গোসাই রামানন্দর প্ররো-

চনার রীতিশ্রী নারক এক রাত্রির হাতে  
শিশুরাজ্যে ধর্মেন্দ্রনারায়ণ মাত্র ছয় বছর  
বয়সে নিহত হন। কিন্তু রাজদরবারের  
কর্তার মনোভাবের জন্য কোন অন্ধি-  
কারীকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা ব্যর্থ  
হয় এবং ধর্মেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের  
রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। ভূটানরাজের  
চেষ্টায় রাজগুরু গোসাই রামানন্দ মৃত ও  
নিহত হন।

এদিকে কোচবিহারের অভ্যন্তরীণ  
ব্যাপারে ভূটানের হস্তক্ষেপ দিনে দিনে  
বাড়তে থাকে। ১৭৭০ খ্রিঃ ধর্মেন্দ্রনারায়ণ  
বন্দী হন ও তাঁর অনুগত নাজির দেও  
খগেন্দ্রনারায়ণ পলায়ন করে প্রাণরক্ষা  
করেন। ভূটানের ইচ্ছা অনুসারে ধর্মেন্দ্রের  
ছোট ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে  
বসেন কিন্তু তিনি দু বছর নামেমাত্র রাজা  
থাকার পর ১৭৭২ খ্রিঃ মারা যান।  
রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে খগেন্দ্র-  
নারায়ণ প্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন  
এবং ধর্মেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধর্মেন্দ্র-  
নারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করেন।  
কিন্তু ভূটানের অনুগত দেওয়ান  
দেও রামনারায়ণ তাতে আপত্তি জানান  
এবং রামনারায়ণের সমর্থনে ভূটানের সৈন্য-  
বাহিনী এগিয়ে আসে। তখন বালক রাজা  
ও রাজপরিবারের সকলকে নিয়ে খগেন্দ্র-  
নারায়ণ বলরামপুরে আশ্রয় নেন। আর  
অরক্ষিত কোচবিহারে প্রায় বিশ হাজার  
ভূটানী সৈন্য প্রবেশ করে রাজধানীসহ  
প্রায় সমগ্র রাজ্য দখল করে নেয়। ভূটানের  
আদেশক্রমে দেওয়ান দেও রামনারায়ণের  
পুত্র বিজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা  
বলে ঘোষণা করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে খগেন্দ্রনারায়ণ  
কোচবিহারকে ভূটানের অধিকারভুক্ত করার  
উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শরণ  
নেন। কোম্পানিও তৎক্ষণাৎ সে-ভাবে সাড়া  
দেয়। বালক রাজা ধর্মেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে

কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেই ধর্মেন্দ্র-  
নারায়ণ এবং ১৭৭৩ খ্রিঃ ৫ এপ্রিল ইং  
ইন্ডিয়া কোম্পানি ও কোচবিহারের রাজা  
ধর্মেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষর  
হয়, তার শর্ত অনুসারে শত্রুর বিরুদ্ধে  
কোচবিহারের রাজা ও রাজ্যকে রক্ষা করতে  
কোম্পানি ক্যাপ্টেন জোন্সের নেতৃত্বে তার  
কোম্পানি সৈন্য ও দুটি কিল্ড-গান  
রংপুর থেকে কোচবিহারে পাঠায়। আর  
বাহিনী ঝড়ের গতিতে কোচবিহারে প্রবেশ  
করে সমগ্র রাজ্য থেকে ভূটানী সৈন্যদের  
বিতাড়িত করে। তারপর কোম্পানির  
সৈন্যরা ভূটানে প্রবেশের উদ্যোগ করলে  
ভূটান-রাজ নিরুপায় হয়ে তিস্তা স-  
কারের শরণ নেন। তখন তিস্তার সার্ব-  
ভৌম তিস্রু লামার মধ্যস্থতায় ভূটানের  
সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৭৪ খ্রিঃ  
২৫ এপ্রিল একটি সন্ধি হয়, যে-সন্ধির  
অন্যতম শর্ত অনুসারে কোচবিহারের  
মহারাজা ধর্মেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাই  
দেওয়ান দেও ধর্মেন্দ্রনারায়ণ ভূটানের  
হেফাজত থেকে মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তিলাভের পর রাজা ধর্মেন্দ্রনারায়ণ  
প্রথম যেখানে ডাঙ খান পশ্চিম তুরসের  
সেই স্থানটি ঐ ঘটনার পর রাজ্য  
ডাঙ-খাওয়া নামে পরিচিত হয়।

দীর্ঘকাল বন্দী থাকার জন্য রাজ্যের  
প্রত্যাগমন করেও রাজার মনের বিষম জ্বা-  
ল দূর হয় না। সেকারণে রাজার পুত্র  
ধর্মেন্দ্রনারায়ণই রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন  
এবং রাজ্যের শাসনকার্য চালাতে থাকেন।  
নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ। সে-সময়  
শাসনকার্য নিয়ে নাজির দেওর সঙ্গে মহা-  
রানী ও তাঁর গুরু গোসাই সর্বানন্দ  
প্রায়ই বিবাদ হতে থাকে। ইতিমধ্যে  
১৭৭৫ সালে ধর্মেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে  
ধর্মেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসনারোহণ কিংবা  
গত্যন্তর থাকে না। তারপর ১৭৮০ সালে  
রাজা ধর্মেন্দ্রনারায়ণের একটি পুত্রের



কোচবিহারের পূর্বতম রাজকীয় দপ্তর আজকের সরকারী অফিস ভবন।



রাজ্য হয় এবং তার নাম রাখা হয় হরেন্দ্র-  
নারায়ণ। ১৭৮০ সালে ষোল্লক্ষনারায়ণের  
জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র হরেন্দ্র  
নারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করা  
হয়।

এ সময় কোচবিহারের প্রভাবশালী মহল  
মহারাজা ও নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের  
অধীনে স্থিতিশীল ছিল। আর খগেন্দ্র-  
নারায়ণ ইংরেজ অফিসারদের সমর্থনের  
দ্বারা মহারাজা, শিশুরাজা হরেন্দ্রনারায়ণ  
ও তাঁদের সমর্থকদের বন্দী করে নিজেকে  
রাজা বলে ঘোষণা করেন। মহারাজার  
অগণিত সমর্থক খগেন্দ্রনারায়ণের হাতে  
বিস্তৃত হয় এবং খগেন্দ্রনারায়ণ নিজের নামে  
সকল কাজ প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে  
খগেন্দ্রনারায়ণের সমর্থক ইংরেজ অফিসাররা  
কলিঙ্গ রাজ্যে খগেন্দ্রনারায়ণ দ্বারা বন্দী  
হয়ে পড়েন ও মহারাজা সেই সুযোগে ইংরেজের  
কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠান। ইংরেজরা  
রাজ্যের সমর্থনে এগিয়ে এসে খগেন্দ্র-  
নারায়ণকে গণহত্যা করেন এবং খগেন্দ্র-  
নারায়ণ রাজ্য ত্যাগ করে আগামে চলে যান।  
পরে তাঁর একটি অনুচর সার্বভৌমভাবে  
সকল হয়েও ইংরেজের হস্তক্ষেপে বাকি হয়।  
হরেন্দ্রনারায়ণ ৫৬ বছর রাজত্ব করায়  
পর ১৮০১ সালে পরলোকগমন করেন।  
তার দায়িত্ব পর একে একে রাজা হন  
শিবেন্দ্রনারায়ণ (১৮০১-৪৭), নরেন্দ্রনারায়ণ  
(১৮৪৭-১৮৬০), নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬০-

১৯১১), রাজ-নরেন্দ্রনারায়ণ (১৯১১-  
১০), বিজয়নারায়ণ (১৯১০-১১) ও  
জগদীশেন্দ্রনারায়ণ। ১৯৪১ সালের ১২  
সেপ্টেম্বর কোচবিহার বখন ভারতীয় ইউ-  
নিয়নে যোগদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তখন  
জগদীশেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজা  
ছিলেন।

১৭৭০ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির  
সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে  
ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের মধ্যবর্তী  
সময়ে কোচবিহার ছিল স্বাধীন রাজ্য। এই সময়  
ইংরেজ সরকারের সহযোগিতার ও হরেন্দ্র-  
নারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ  
নৃপতিগণের তৎপরতার কোচবিহারের মধ্য-  
স্থ থেকে আধুনিক রূপে উদ্ভব ঘটে।  
১৮৫৯ সালে রেভিনিউ সার্ভেয়ার জে জে  
পেমবার্টন কোচবিহারের যে মানচিত্র প্রস্তুত  
করেন তাই বর্তমান কোচবিহার জেলার  
প্রথম সরকারি মানচিত্র। ১৮৬২ সালে  
(অর্থাৎ সিপাহিবিদ্রোহের পর) ভারত  
সরকার কোচবিহারের রাজ-সরকারকে যে  
সম্পদ দেন তাতে কোচবিহারের রাজার  
মহারাজা বাহাদুর উপাধিকে স্বীকৃতি  
দানো হয় এবং তাঁদের পদের অজাবে  
দণ্ডকণ্ঠে গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।

জগদীশেন্দ্র নরেন্দ্রনারায়ণের আমায় মহা-  
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের শালনকালে ১৮৭২  
খ্রিঃ কোচবিহারে প্রথম মেলাকল্যাণ হয়।

তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ও জনপ্রিয়  
নৃপতি। সুপরিচালিত সদরায় কোচবিহার  
শহরটি তারই নির্দেশমূলক নির্মিত হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯  
সালের ২৮ আগস্ট ভারত ও কোচবিহারের  
মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯  
সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্যটি ভারতের  
অঙ্গীভূত হয়। এই সময় থেকে এই বছরের  
৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচবিহার ছিল  
ভারতের একটি চিক কলিননার শাসিত  
প্রদেশ। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক  
আইনানুসারে ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি  
কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার  
পরিণত হয়।

(২)

কোচবিহার জেলার আরতন-সুভেন্দ্র  
জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হিসাবে জন্মসময়  
১০০৪-১ বঙ্গাব্দ, তার পশ্চিমবঙ্গের  
ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস এবং  
সার্ভে-এর হিসাবে ১০২২-৬ বঙ্গাব্দ।

হিমালয়ের উন্নয়ন অর্থাৎ  
উন্নয়নকারী এই জেলাটি সম্পূর্ণ স্বাধীন,  
তবে দক্ষিণ বরাবর কিছুটা চন্দ্র। উন্নয়ন  
পরিণত সুভেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ ১৮০  
ফুট ও সর্বনিম্ন ১৫০ ফুট। কোচ-  
বিহারের সমস্ত উন্নয়ন ও উন্নয়নকারী  
আছে জগদীশেন্দ্র জেলা-পুত্র আসাম,

আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঙ্গালেশ্বর। পূর্ব-পশ্চিমে জেলায় সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ৬৪ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে সর্বাধিক প্রস্থ ৩০ মাইল।

অগণিত নদী, উপনদী, শাখানদী আর ঝিল ঝিল ও জলার পূর্ণ হয়ে আছে সমগ্র কোচবিহার জেলা। সারা জেলায় মাটির ধরনও একই রকম; ওপরের স্তরে আছে সহজে ভগ্ন, ছর থেকে তিন ইঞ্চি পুরু দো-আঁশ মাটি, আর তার নীচে গভীর বালির স্তর। মাটি নরম বলে অল্প জায়াসে চাষ হয় এবং উর্বরা বলে ফসলও ভাল হয়। কিন্তু বর্ষার প্রভাব নদীগুলি যখন খেতে আসে তখন দূর্বল মৃত্তিকাস্তর কোন বাধাই তাকে দিতে পারে না। আর পারভাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম নদীগুলি প্রতি বছরেই অগণিত নরনারীর অশেষ দুঃখের কারণ হয়।

কোচবিহারের আর এক বৃত্তাঙ্গ, আজ পৰ্যন্ত তার মাটির নীচে কোন খনিজ পদার্থের সম্ভবন মিলে নি।

কোচবিহারে বনভূমি খুব বেশি নেই। সারা জেলায় দুটি বড় ও চারটি ছোট সংরক্ষিত বনভূমি আছে। বড় সংরক্ষিত বনভূমি দুটি হল—পাতলা-খাওয়া ও গারোদহাট বনভূমি। পাতলা-খাওয়া বনভূমির আরতন প্রায় সাড়ে চার হাজার একর ও গারোদহাট বনভূমির আরতন প্রায় দশ হাজার একর। ছোট চারটি সংরক্ষিত বনভূমির নাম—কোচবিহার (২০৪ একর), গোসাইঘাট (৫২ একর), মহিষবাড়ি (৩৬ একর) ও পলাতি তেলধার বনভূমি।

কোচবিহার জেলায় নদীগুলির বৈশিষ্ট্য প্রায় সব কটি নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জেলার উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে প্রায় সব নদীই ক্রীণ ও অগভীর কিন্তু বর্ষার প্রচণ্ড ও কুল্লাবী। পশ্চিম দিক থেকে পর পর উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল—তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোৰা, কালজানি, রাইডাক অথবা সন্দেখ ও গদাধর।

এদের মধ্যে তিস্তা বৃহত্তম ও সর্বাধিক বেগবতী। জেলার উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে প্রবেশ করে তিস্তা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জেলার অভ্যন্তরে মাত্র দুটি মাইল নদীটি প্রবাহিত এবং তার মধ্যে কোন উপনদী এসে তিস্তার পড়ে নি বা কোন শাখা নদীও তিস্তা থেকে নিগত হয় নি। তিস্তার তীরে আছে মহকুমা শহর মেকলিগঞ্জ।

জলঢাকা নদী জেলার বিভিন্ন স্থানে মাসাই, নিপ্পানারি, ধরলা ইত্যাদি নামে পরিচিত। জেলার অভ্যন্তরে ৬০ মাইল অগণিতর পথে জলঢাকার দ্বারা অনেক-গুলি নদী এসে পড়েছে। তার ডানদিকে এসে পড়েছে সদুপুঙ্গা, ধরলা, খটোলা বা গিলবারি আর বাহিরকে কুল্লাই, জিলাপ, দুদুইয়া মদখাই ও দোল নদী।

তোৰা নদীর প্রকৃত নাম হল তোৰোবা, অর্থাৎ কৃষ্ণ নদী এবং এ নামেই নদীটির প্রকৃত পরিচয় মেলে। উত্তর দিক দিয়ে জেলার প্রবেশ করে প্রায় বাট মাইল প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এমন খোলা, সর্বনাশা নদী উত্তরবঙ্গে আর একটিও নেই। গত সেফল বছরে এই নদী যে কতবার গতি পরিবর্তন করেছে তার কোন হিসাব নেই, আর প্রতিবারই সে ধ্বংস করেছে কত জনপদ, মরুভূমিতে পরিণত করেছে কত শ্যামল প্রান্তর। সারা কোচবিহার ছড়িয়ে আছে মড়া তোৰা, বড়া তোৰা অথবা চড়া তোৰা নামের বৃক্ষ জলা অথবা শূন্য নদী খাতে আর সেগুলির ধারে কাছে পড়ে আছে একদা গড়ে ওঠা বাজার গজ জনপদের জীর্ণ স্মৃতি। কোচবিহারের অভ্যন্তরে তোৰা নদীতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শূন্য ধরবারি নদী এসে পড়েছে।

কোচবিহার জেলার মোট মোজার সংখ্যা ১০২৯, তার মধ্যে ১০১টি জনহীন। গ্রামের সংখ্যা ১১৯৬ ও শহর ৬টি। তবে একমাত্র কোচবিহার শহর ছাড়া কোলটিতে মিউনিসিপ্যালিটি নেই। অন্য শহরগুলির শৌর দারিঙ্গ টাউন কমিটির উপর ন্যস্ত আছে।

জেলার মহকুমা পাঁচটি—সদর (২৪৪-৮ বর্গমাইল), তুফানগঞ্জ (২২৪ বর্গমাইল), দিনহাটা (২৭১-৯ বর্গমাইল) মাখাডা (৩৪০ বর্গমাইল) ও মেকলিগঞ্জ (১৯৮-৯ বর্গমাইল)। প্রতি মহকুমার প্রধান শহর মহকুমার নামেই পরিচিত। শূন্য তুফানগঞ্জ মহকুমার সদর শহরের নাম কুলবাড়ি।

জেলার সদর কোচবিহার শহরের আরতন ২-২৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা '৭১ সালের হিসাব অনুসারে ৫০,৭৩৪। শহরে পুরনো তুলনার নারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার কম। কোচবিহার শহরটি কোচবিহার জেলার বিশেষ সম্পদ। তোৰা নদীর তীরবর্তী এই শহর মহারাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ ভূপাছাদুরের নির্দেশনায় একটি সুকিয়ামত পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়। দখারে ভবনপ্রণীত স্বয়ং প্রাপ্ত পথ, পথের দ্বারে ভূগোষ্ঠীদিত শ্যামল মঙ্গল অঙ্গল, ইত্যদিত পুষ্পময় উদ্যান ও কুজবন, স্বচ্ছসুন্দর দীঘ ও সরোবর সারা শহরটিকে মনোরম করে তুলেছে। শহরের

অন্যতম আকর্ষণ, সাগরদীঘর পুকুর পায়ে অবস্থিত ৭৯ কুট মিনারবৃত্ত জ্যামিতি-জটিল হুপটি ১৮৯২ সালে নির্মিত হয়। এমন একটি চিত্তাকর্ষক শহুরে এ রকম কমই আছে। কোচবিহারের বাহিরাগতদের মধ্যে একটি বড় অংশ হল মধ্যবিত্ত বাঙালী, যারা সেখানে গিয়ে বস বাঁচেন কোচবিহার শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সেখানকার রাজ পরিবারের বাঙালিমানার আকর্ষণে।

অর্থ বর্গমাইল আরতনের দিনহাটা শহরটি কোচবিহার শহরের ষোল মাইল দক্ষিণে রংপুর রোডের দ্বারা গড়ে উঠেছে। শহরটির লোকসংখ্যা প্রায় বারো হাজার। দিনহাটা শহর কোচবিহার জেলায় কৃষিপণ্যের একটি বড় বাজার।

মাখাডা গরুরের দিক দিয়ে কোচবিহার জেলার দ্বিতীয় শহর। জলঢাকা নদীর ডান পায়ে অবস্থিত, অর্থ বর্গমাইলেরও কম আরতনের এই শহরটির লোকসংখ্যা সাত হাজার। ডাকঘর অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র।

তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত মেকলিগঞ্জ খুবই ছোট শহর এবং লোকসংখ্যা হাজার দুয়ের বেশি নয়। কিন্তু ডাকঘর বড় বাজার হিসাবে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ। একদা বর্মার ডাক ব্যবসারীদের অঙ্গীশ্য গোনা ছিল এই শহরে। এখান থেকে ডাক কিনে নৌকার করে রংপুরে কালিগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তারপর সেখান থেকে ঝাড়াই-ঝাড়াই হয়ে ডাক চলে যেত বর্ষার। শরৎবাবুর প্রীকান্ত-দ্বিতীয় পর্বে রংপুর থেকে বর্মার ডাক কিনে নিয়ে বাওয়ার উল্লেখ আছে। সেই যে বাঙালী ছোকরাটি যখন তার সঙ্গ-বিশ্বাসী বর্মী স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে দাদার সঙ্গে কলকাতার পালিয়ে আসছিল তখন সে বলে আসে যে, রংপুর থেকে ডাক কিনে এক মাসের মধ্যে রংপুরে ফিরে আসবে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রধান শহর কল-বাড়ির লোক সংখ্যা তিন হাজারের বেশি নয়। হলদিবাড়ি মহকুমা শহর না হলেও উল্লেখযোগ্য। অর্থ বর্গমাইলের কিছু বেশি আরতনের এই শহরটির লোকসংখ্যা চার হাজার। হলদিবাড়ি পাটের বড় বাজার। (পরবর্তী সংখ্যার কোচবিহারের মান)

—যোগনাথ মদখোপা

**কাজী মডার্নল ইসলামের**

**শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ**

১। কুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম.....১৪'০০

২। গুল বাগিচা.....৩'৫০. ৩। কাব্য আনুপা...৪'০০

৪। পূবর হাওয়া.....২'০০. ৫। ফুলশাখী মঙ্গলিকা.....২'০০

**মোহন লাইব্রেরী** ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট

ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকতা-১



# মনের থবর

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই,  
কিন্তু মন?  
মনের অসুখও ডো সমানই অকম করে  
দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীর  
ভীষণ জটিলতার যুগে, অভিন্ন  
চিকিৎসক 'মনের খবর' সেই সব মনোব্যাধি  
ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা  
করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

আমাদের দেশে মানসিক রোগীদের  
বে নানাবিধ সমস্যা আজও প্রায় অনড় হয়ে  
বসে আছে সেই সম্বন্ধে সামান্য কিছু  
উল্লেখ করব।

শরীর থাকলেই শরীরের ব্যাধি কম-  
বেশী হবে বা হতে পারে এই সত্য আমরা  
যত সহজে নিজেরা স্বীকার করে নিয়েছি  
মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা সেইভাবে  
সেটা স্বীকার করে নিতে আজ পারি নি।  
মানসিক রোগ যে মনের রোগ এবং তাকে  
রোগ মনে করেই যে তার চিকিৎসা করান  
সম্ভব আজও আমরা তা সহজভাবে মনে  
নিতে পারি নি। শরীরের রোগ হলে  
আমরা প্রথম থেকেই কিছ-না-কিছ-ও বৃদ্ধ-  
পুথ্য ইত্যাদির আশ্রয় নিই। কিন্তু মনের  
রোগের বেলায় কোন যে সেই রকম ব্যবস্থা  
করা হয় না তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে  
রোগীকে রোগের জন্য শাসনও করা হয়।  
কখনো বা রোগীকে উপেক্ষা বা অবহেলা  
করা হয়। আবার কখনো তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-  
বিদ্রুপ এমন কি তাড়না পর্যন্ত করা হয়।  
কতক দিন আগে একটি তেরো-চোদ্দ  
বছরের যুবক ছাত্রকে দেখাতে আনা হয়।  
তার কাছে ও তার সঙ্গীরা আত্মীয়দের কাছে  
জানা যায় যে ছেলোট ছয় মাস আগে থেকে  
হঠাৎ অল্প অল্প তেতলামি শুরু করেছে  
এবং ক্রমে তা বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম অবস্থায়  
খাড়ীর অভিব্যক্তিগণ তাকে বকার্বিক  
করতে আরম্ভ করেন। তাতে রোগীর  
উন্মত্তি না হয়ে বরং তার বিপরীত ফল  
দেখা দেয়। সে ক্রমে বাড়দের এড়িয়ে যেতে  
চেষ্টা করে। যখনই তাদের সঙ্গের কথা  
বলতে বাধ্য হত তখনই তেতলামি বেড়ে  
যেত। ক্রমে এমনই অবস্থা হয় যে সে  
বাড়দের সঙ্গে প্রায় কথাই বলতে পারত না।  
অপরিচিতদের সঙ্গে ভয় না পেলে তবু সে  
মোটামুটি কথা বলতে পারত। স্কুলে  
শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে  
অসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বাড়ীতে ও  
ইস্কুলে যেমন শাসনের মাত্রা বেড়ে চলে  
অন্য দিকে ইস্কুলের সহপাঠীদের এবং  
খাড়ীর অন্যদের তরফ থেকে তাকে নকল  
করে ব্যঙ্গ করার মাত্রাও বেড়ে যায়। ফলে  
এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ঘরে-  
বাইরে কোথাও সে শান্তিতে থাকতে পারে  
না। ক্রমে তার স্বাভাবিক শান্ত মৈজাও  
উঠা হতে থাকে। যখন তাকে আমার নিকট

আনা হয় তার আগে সে বেশ করেকবার  
ইস্কুলে ও পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে  
মারামারি করে আরও জটিল অবস্থার  
সৃষ্টি করে তুলেছে। এই রকম ঘটনা যে  
কেবল তেতলামির ভাগ্যেই হয় তা নয়।  
এই কলকাতা শহরেই রাস্তার যে সব  
মানসিক রোগী ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময়  
পাড়ার ছোট ছেলেরা তাদের নানাভাবে  
উত্তাহ করে কোঁপিয়ে তোলে। যখন রোগী  
কিন্ত হয়ে তাদের ভাড়া করে, তারা তখন  
দৌড়ে দূরে সরে যায় বটে কিন্তু অবিলম্বে  
আবার রোগীর পিছু পিছু চলে নানা  
মন্তব্য করে এমন কি সময় সময় তাকে  
টিল মেরেও মজা উপভোগ করতে থাকে।  
আমরা এই সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে  
ছেলেদের আমরা কিছ-না বলে অতি  
স্বাভাবিকভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যাই।  
কখনও বা বয়স্ক লোকদেরও এই বিষয়  
মজা উপভোগ করতে দেখিছি। আরও বহু  
উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু তার প্রয়োজন  
নেই। এই রকম আচরণের মূলে আমাদের  
মানসিক রোগ ও ঐ রোগীর মানসিক  
অবস্থার সঙ্গে পরিচয় না-থাকা এবং  
রোগকে রোগ বলে না জানার ফলে রোগীর  
অস্বাভাবিক আচরণকে বহুদূরপাল্লার আচরণ-  
এর মত কৌতুকপ্রদ বলে মনে করা সম্ভব  
হয়। রোগকে যদি রোগ বলে চেনা-জানা  
না হয় তবে তা সহজেই বিদ্রুপের বিষয়ও  
হতে পারে। মানসিক 'রোগী' নানা রকম  
অগভর্ণী বা নানা অস্বাভাবিক কথা বলে  
বা ঐ একই কারণে অর্থাৎ তাকে রোগের  
লক্ষণ বলে না চিনতে পারায় কৌতুকপ্রদ  
বলে মনে হয় এবং আমরা সেই অনুসারেই  
ঐ রোগীদের প্রতি ব্যবহার করে থাকি।  
মানসিক ব্যাধিও যে ব্যাধিই এই জ্ঞান  
আমাদের আজও তেমন নির্বিড় হয়ে উঠতে  
পারে নি। এটা যে কত প্রয়োজন তা আরও  
বিশদভাবে বোঝানোর প্রয়োজন হয়ত  
সকলের পক্ষে নেই কিন্তু জনসাধারণের জন্য  
এও প্রয়োজন আছে। এই বিষয় ভারতীয়  
মনঃসমীক্ষণ সমিতি নানা উপায়ে শারীরিক  
ব্যাধির চিকিৎসা ও অন্যান্য শিক্ষিত জন-  
সাধারণের মধ্যে মনের রোগ সম্বন্ধে নানা  
উপায়ে সচেতনতা আনার চেষ্টা করে  
চলেছেন। তাঁদের প্রকাশিত বাংলা ষ্ট্রামাসিক  
'চিন্তা' পত্রিকায় মন সম্বন্ধে নানা বিষয়  
সহজবোধ্য আলোচনার মাধ্যমে মানসিক

রোগ, তার প্রতিকার, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত  
ও শিক্ষাশিক্ষাপ্রাপ্তি প্রভৃতি নানা  
বিষয়ের সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচয় করিয়ে  
দিচ্ছেন। সামাজিক অবস্থার, বিশেষ করে  
মানুষের জ্ঞান বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন  
ঘটানো কঠিন কাজ। তবু সেই চেষ্টা থেকে  
বিস্তৃত থাকলে এই মৃতকল্প সমাজের স্বাস্থ্য  
ফিরিয়ে আনা অসাধ্য হবে। সুতরাং বার  
পক্ষে বতটুকুই হোক এই চেষ্টা চালিয়ে  
যেতে হবে। আর অন্য পথ নেই। উপযুক্ত  
শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।

এতক্ষণ কেবল এক রকম সমস্যার  
কথাই বলছি। কিন্তু এটাই সবটুকু নয়—  
অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সমগ্র সমস্যাটি আরও  
অনেক বিস্তৃত ও জটিল। যেমন, যে পরি-  
বারে কোনও মানসিক রোগী থাকে, যদি  
সেই রোগ এমন হয় যে পরিবারের সুখ-  
শান্তি বিঘ্নিত হয় তবে পরিবারের অন্যান্য  
সকলে খুব বেশী দিন সেই রোগীকে  
আবশ্যিক সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে,  
তার সঙ্গে রোগীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার  
করতেও আর পারেন না। তখন রোগী  
রোগের প্রকোপে যে সকল লক্ষণের  
তাড়নার অন্যদের বিরক্তিভাজন হয় সেই  
রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না পেয়ে শাসন,  
অবহেলা, তাচ্ছল্য ইত্যাদি অন্যান্য এবং  
আরও পীড়াদায়ক অবস্থায় পড়ে যন্ত্রণা  
ভোগ করতে থাকে। একদিকে রোগের  
যন্ত্রণা অন্যদিকে প্রিয়জনের নিকট থেকে  
উপেক্ষা, শাসন ও অবহেলা কুড়িয়ে যন্ত্রণা,  
বৃদ্ধির ফলে তার জীবনকেও দুঃসহ করে  
তোলে। আমরা নিজেদের নিকটতরদের  
সুখ-স্বচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের জালে এমন আবদ্ধ  
থাকি যে অপরের, বিশেষ করে মানসিক  
রোগীর দুঃখ কষ্টের দিকে ক্রমে অকহেলা  
করতে থাকি।

এর ফলে রোগীর অবস্থা ক্রমে অধিক-  
তর খারাপ হতে পারে। কেবলমাত্র ওষুধ  
দিয়ে বা অন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা  
করে দিলেই মানসিক রোগীর মনের  
স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অনেক সময়ই সম্ভব  
হয় না—রোগীর প্রতি সহানুভূতি থাকা  
একান্তই প্রয়োজন। আমরা সেই অজি-  
প্রয়োজনীয় সহানুভূতি থেকেই তাদের  
বঞ্চিত করি। যে মনের রোগ সারাবার জন্য  
একদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় অন্য



যদিও এই মনকেই যদি আঘাত করতে থাকে হয় তাহলে চিকিৎসার ফল যে আশাশ্রয় হতে পারে না তা সহজেই বোঝা যায়। রোগীর কল্যাণের জন্যই যে আমাদের প্রতিগত স্বার্থ কিছ; তাগ করতে হবে এও আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা দরকার। শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয় তবু অনেক পরিমাণে লজাগ থাকি। রোগীর রোগ যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য নানা রকমে প্রয়াসীও হই। শারীরিক রোগগ্রস্তদের সঙ্গে অর্থাৎ তাদের যন্ত্রণা কষ্ট ইত্যাদির সঙ্গে আমরা আপেক্ষাকৃত সহজে একাধতা বোধ করি। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের সেই একাধতা তেমন লক্ষ্য হয় না। তাই এই দু'প্রকার রোগীর প্রতি আমাদের আচরণের বৈষম্য দেখা দেয়। 'মানসিক' রোগীও যে এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এই সম্বন্ধে আমরা বহুশ্রুতি সচেতন নই। মানসিক রোগীর যে আমাদের মতই দুঃখ-দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতা, (অল্পেক্ষ রোগী) থাকে আমরা তা জানি না। তাদের সঙ্গেই খেলায় খুশীর ব্যাপার বলে মনে করি বলেই অতি সহজে তাদের দুঃখ-দুঃখের বিবেচনাটা আমাদের মন থেকে বাদ দিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এ ছাড়াও যার মানসিক রোগ হয়েছে আমরা যেন তাকে আমাদের রোগী ও সমাজ থেকে চিরদিনের মতই বাদ দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। মানসিক রোগ সারে না এই রকম এক প্রান্ত ধারণা আমরা অনেকেরই আজও পোষণ করে চলি। যদিই বা কেহ মানসিক রোগ থেকে সেরে ওঠে তাও তার সম্বন্ধে আস্থা-বোধ আমাদের যেন আর ফিরে আসতে চায় না। মনে যেন রেশ থেকেই যায়। ভয় হয়, একবার যার মানসিক রোগ হয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার যে কোনও সময় সে গোলমাল সুরু করে দিতে পারে। শরীরের রোগ সম্বন্ধে সহজে আমরা এমন আস্থা-হীন হই না। শরীরের রোগ হলে তা কিছ; দিনেই সেরে উঠবে অথবা কোনও স্থায়ী ক্রি় হলেও সে তার সাধারণত কাজ চালাতে পারে এই আশা ও বিশ্বাস আমাদের মনে থাকে। কিন্তু মনের রোগের বেলায় আমাদের এই আস্থাটাই ভেঙে যায়। অতীতে যখন চিকিৎসার তেমন উন্নতি হয় নি তখন মানসিক রোগ সারানো কঠিন ছিল এটা সত্য। বর্তমানে এই মানসিক রোগের চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে বার ফলে অনেক রোগ নিম্নলিখিত রোগও সম্ভব হতে পারে। অবশ্য কি শারীরিক কি মানসিক কোনও ব্যাধিরই সব রোগ সারানো বা স্বা স্ব রোগীকে পূর্ণ সুস্থ করে তোলা আজও সম্ভব হয় না। তবুও মনের রোগ হলে সেই রোগীর সম্বন্ধে ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ সাধারণের মনে থেকে যায়। তার ফলেই তেমন রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও অনেক সময় সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা দেখা দেয়। এক ভদ্র

লোকের কথা মনে পড়বে। ৩৫।৩৬ বছর বয়সে তিনি কলকাতার এক বড় ব্যাংক কাজ করতেন। কলেজের পড়া শেষ করে ব্যাংকের কাজে যোগ দেন। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে অল্প দিনেই ভাল পদে উন্নীত হন। পরিবারের একমাত্র উপাধীনশীল হওয়ার পরিবারের দায়-দায়িত্ব তাঁকেই পোষাতে হত। হঠাৎ মানসিক রোগ দেখা দেওয়ার এবং রোগ তীব্র হয়ে ওঠার চাকুরী থেকে ছাটি নিতে হয়। চিকিৎসা প্রায় এক বৎসর হওয়ার পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতদিন আর বন্ধ থাকার ও চিকিৎসা ও পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করতে সক্ষম টাকা খরচ হয়ে যায়। যখন রোগ সারল তখন আর্থিক সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যাংক আধার চাকুরীতে যোগ দিতে গিয়ে ব্যাধির সম্মুখীন হন। কতৃপক্ষ তাঁকে তার পূর্বপদে কাজে নিতে রাজি না হওয়ার সেই চাকুরী চলে যায়। ব্যাংকের কতৃপক্ষ তাঁকে সেই ব্যাংক এক অতি-সাধারণ কাজে বহাল করে নিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঐ পদে কাজ করা সম্ভব নয় মনে করে সে চাকুরী তিনি গ্রহণ করেন নি। আরও নানা অসুবিধা কাজের চেষ্টা করেও সফল লাভ হয় নি। ক্রমে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। একদিন তাঁর বিবর্ততার অবস্থার আমাকে এসে বলেন—'ভালোবাবু, আপনারা আমাকে ভাল করে তুললেন কেন? পাগল হয়েছিলাম সেই তো ভাল ছিল। এখন ভাল হয়ে উঠে

সমাজে, পরিবারে আর ঠাই পাই না। আমাকে কেউ কিংকস করে না। চাকুরী দেয় না। আমি আগের মতই এখন কাজ করতে পারি, কিন্তু ওরা আমাকে কাজ দেয় না। রোগে মরলাম না কিন্তু এখন মা-থয়ে মরবো, পরিবারের আর সকলকেও মরতে বাধ্য করব। কেন আমাকে ভাল করলেন ডাক্তারবাবু, পাগল থাকলে তো এ দুঃখ আমার সইতে হত না। ভাল হতে চেয়েছিলাম ভাল করে বাস করবো মনে করে, কিন্তু এখন?'

এই সামাজিক সমস্যার সমাধান আমরা না করলে আর কে করবে? খুব ঠিক কথা বলেছিলেন সেই ভদ্রলোক। ভাল করে বসকস করতেই যদি না পারলেন, অতীত রোগের ছাপ সুস্থ হওয়ার পরেও যদি ভবিষ্যৎ জীবনের পথরোধ করে দিড়ার— তবে তেমন সুস্থ জীবন পেয়ে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন কি?

দেশের নেতাদের, সমাজকল্যাণকামীদের, সমাজসেবীদের ও জনসাধারণের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর মানসিক রোগীরাও যেমন দাবী করতে পারেন, আমরাও তেমনই এই প্রশ্ন তাঁদের ও নিজদের জিজ্ঞাসা করতে পারি। কোন প্রশ্ন করলেই কাজ শেষ হল না—এর প্রতিকার চাই। আমরা নিজের দেশকে জনকল্যাণকামী দেশ বলে মনে করে থাকি। তাই এই কল্যাণটুকু আমরা

## সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীসারদামাতা রচিত—

অল ইন্ডিয়া রোডও বেতারে বসেছেন,—  
বইটি পাঠকমণ্ডলে গভীর রেখাপাত করবে।  
বৃগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন  
আলোচ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল  
হসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

বহিঃপ্রকাশিত পত্র মূল্য—৮

## গৌরীমা

—শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবার উপর জীবনচরিত—

বৃহস্পতি—তিনি একাধারে পরিচালক  
উপস্থিতি, কর্মী এবং আচর্য। ঘটনার  
পর ঘটনা চিত্রিত সুন্দর করিয়া রাখে।  
গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন  
ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ চাইয়া থাকিবেন॥

বহিঃপ্রকাশিত পত্র মূল্য—৫

## সাদনা

বেদ, উপনিষৎ, পীঠা মহাকাব্য প্রভৃতি  
শাস্ত্রের সংগ্রহিত ভাষ্য এবং উপাঙ্গ  
সাড়ে তিন শত বাংলা হিন্দী ও জাতীয়  
সঙ্গীত গ্রন্থের সংগ্রহ ইত্যাদি।  
বঙ্গভাষী বঙ্গের—এমন মাননীয় সত্য-  
গীতি পুস্তক বাৎসরিক আর দৌধ নাই।  
পরিচালিত বঙ্গ-প্রকাশক—৬

## দুর্গামা

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মানসকল্যাণ :

—শ্রীসরদাপ্রদী দেবী রচিত—

অল ইন্ডিয়া রোডও এবং বিভিন্ন পত্রিকা  
এতক প্রশংসিত।  
প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী

ভারতবর্ষের বঙ্গোপাধার মহাশর লিখিত

...জীবনীটি পড়ে এইটাই একটি বিশ্বাসের  
মত মনে হয় যে এমন একটি মানব  
আমাদেরই সমসাময়িক কালে, অতি দ্রুত  
পরিবর্তনশীল কালের পটভূমিকায় সমাজ  
এক আদর্শকে আপনার জীবনে ধারণ  
লাভন ও প্রতিষ্ঠিত করে জীবন  
কীভাবে করে গেলেন। এ জীবন  
পাঠ্য এ জীবন লক্ষ্যে সুলোভন : ও  
মহিমামূলক। ... আমি এই জীবনকথা পড়ে  
ভীতলাভ কবোঁ; এবং পঠিতকালের কাছে  
অকৃতজ্ঞ হইনি। বইখানি হুল্লো করে বলাতে পারে  
ভারত এই গ্রন্থপাঠে অমূল্য ভূমিকা  
করবেন॥

বহিঃপ্রকাশিত পত্র মূল্য—৮

## শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

দাবী করতে পারি। মনে রাখতে হবে উল্লিখিত ভূপ্রলোক একাই নয় এই সমস্যার পড়েন নি, অনেকেরই এই মানসিক রোগ এক সময় হয়েছিল বলে জীবনের নানা সমস্যা নানা পথে অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করে। শরীরের এমন অনেক রোগ আছে যার ফলে আরোগ্য লাভের পরেও রোগী আর রোগপূর্বের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ ফিরে পায় না। তবুও, বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন, তাদের কাজ পেতে এমন কি তার আগের কাজ ফিরে যেতে যেমন কোনও বাধা দেখা দেয় না। কিম্বা তা নিয়ে ভাবিবারেও সন্দেহও কাজকে বিচলিত করে না। কিন্তু মনের রোগের বেলায় এমন ভিন্ন বিচার-বিবেচনার কারণ আমাদের আত্মার অভাব, মনের রোগ সেরে যাওয়ার পরেও আমরা যেন রোগের সম্পূর্ণ বা কাজ চালাকার মত সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহান থেকে যাই। কেবল তাই নয়, ভাবিবারে যে কোনও সময় যেন নোটিশ না-দিয়েই কখন আবার সেই মনের রোগ চেপে বসবে এমন একটা বিশ্বাসও যেন সাধারণের মনে থাকে। এক কথায় মনের রোগীর উপর ভরসা যেন আর থাকে না। একবার মনের রোগ হলেই সে যেন সমাজচ্যুত হয়ে অস্পৃশ্য হয়ে যায়। এরকম ধারণার মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা ও দীর্ঘদিনের সংস্কার। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা এই অর্থ বিশ্বাসের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে। তা না হলে এই সমাজে মানসিক রোগী সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না।

একটু ভেবে দেখলে সহজেই ধরা পড়বে আমরা যাদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছি তাদের মধ্যে অনেকেই দেহিক ও মানসিক বিচারে সম্পূর্ণ সুস্থতার পর্যায়ে পড়েন না। শরীরের কথা নাই বা তুললাম। মনের দিক দিয়ে বিচার করলেও পরিচিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব অনেকের মধ্যে কি রোগের মাত্রাধিকা, স্থাথপরতা,

নীচতা, হিংস্রতা, খুঁতখুঁতে স্বভাব, শত্রুবাদ, সন্দেহাভিভক্তি, অভিযোগের অর্থাত্তিক ভর, দারিদ্র্যবোধ-হীনতা ইত্যাদি বহু মানসিক রোগ লক্ষণ দেখতে পাই না? তাদের সম্বন্ধে আমরা কি বিশেষ কোনও কথা-নিবেশ আরোপ করে চলি? এই লক্ষণগুলির কোনওটা যদি আভ্যন্তরীণ প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বাধ্য হয়ে আমরা সতর্ক হই। মানসিক রোগী বহন সুস্থ হয়ে ওঠে তখন তারা কি এদের চেয়ে বেশি অকর্মণ্য বিবেচিত হবে? অনেক রোগের পুনরাব্রতনের সম্ভাবনা থাকতে পারে সত্যি। কিন্তু আবার যে আগের মতোই বাড়াবাড়ি রোগ দেখা দেবেই এমন কথা তো কল্যায় না! তাছাড়া যদিই বা পুনরাব্রতন হয় তবে তখন আবার চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলাও ভ সম্ভব। তবে মানসিক রোগীদের বেলায় এই চিরব্রতনের মনোভাব কেন থাকবে?

আমাদের দেশে বড় বড় কয়েকটি শহরে ছাড়া এত বড় দেশের কোনো জায়গাতেই মানসিক রোগ নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামের ও ছোট শহরের রোগীদের চিকিৎসা আজও বেশীর ভাগই ঝাড়ফুক, মানত, মন্দির-যোগ, কবচ, পূজার বালা ইত্যাদিতেই আবদ্ধ থাকে। খুব কম রোগীই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ পায়। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যানুযায়ী কিছু চিকিৎসা করেন। তাতে একবারেই যে কোনও ফল পাওয়া যায় না এমন নয়। তবে কু রোগীই অচিকিৎসার বা কিনা চিকিৎসার জুগে পরিবারের ও নিজের বহু কষ্টের কারণ হয়। পরিবারে একজন মানসিক রোগী থাকলে সে-পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়, আর্থিক জটিলতা বাধি পায়। সব-পেক্ষা কঠিন হয় শিশু ও বালক-বালিকাদের মানসিক স্ফাঙ্করণ। বাড়িতে মানসিক রোগী থাকলে সেই সব রোগীর

বিকারগ্রস্ত অবস্থার তাদের উদ্ভা-বর্জ্য ব্যবহারাদির বিশৃঙ্খলতা, অস্পষ্টতা, অশালীনতা ইত্যাদি শিশু-মনের উপর বিঘ্ন-ক্রিয়ার কার্য করে। মনের সুস্থ গঠনের জন্য যে পরিবেশ দরকার মানসিক রোগী থাকার তার অভাব ঘটায়, শিশু-মন বিঘ্নিত হতে থাকে। পরকটী জীবনে এর কঠিন প্রভাব লক্ষিত হয়। সমাজের দিক দিয়ে এটা একটা অতি বড় কতি। যে-শিশু সমাজের ও দেশের ভবিষ্যৎ, তারা জীবনের সূচনাতেই যদি এইরকম মানস-রোগের অপরিহার্য প্রভাব পড়ে তবে বড় হয়ে সে সুস্থ জীবন সহজে যাপন করতে পারেন না। সেইজন্য সমাজ-জীবনেও নানী-সুন্দরী দেখা দেয়। প্রথম থেকেই সেই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। কিন্তু আজও আমাদের সেই সচেতনতা দেখা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় সব মানবই গ্রামে বাস করে। শহরবাসীর সংখ্যা তাদের তুলনায় অতি সামান্য। তবু সাধারণ মানবের জন্য মানসিক রোগ চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা তাদের জন্য নেই সত্য, তবে সে-ব্যবস্থা যাওয়া কিছু আছে, মানসিক রোগীর জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ নানা সমস্যায় বেড়াফালে পড়ে দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। কি পরিমাণ এই রোগ ক্ষেড়েছে তাও সঠিক করে বলার উপায় নেই। লোকগণনার সময় মানসিক রোগীর পরিসংখ্যানের ভাল ব্যবস্থা কিছু নেই। অথচ সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে কিছু করতে হলে এই সকল তথ্য একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই সব বিষয়ে কত গিছনে পড়ে আছি তা একটু নজর দিলেই বুঝতে পারা যায়।

মনের রোগ চিকিৎসার বিষয়ে যে সমস্যা ও অবস্থা চলছে, সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পরে ক্রমে মনের সম্বন্ধে কিছু পরিচয়, মনের রোগ কেন হয়, তার প্রতিকার ও রোগ নিরূপণের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

বলেছি, বড় বড় কয়েকটি শহরে কিছু কিছু চিকিৎসক মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন। সরকার পরিচালিত মানসিক হাসপাতাল ভারতের প্রায় প্রতি রাজ্যেই একটি আছে। কিন্তু তাদের মোট শয্যা-সংখ্যা এতই কম যে প্রয়োজনের এক-শতাংশও তা দিয়ে মেটে না। যে-সরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বড় শহরের আওতাধীন গড়ে উঠেছে এবং মোটামুটি লম্বজনক ব্যবসায় হিসাবেই চলছে। অবশ্য এটি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কিছু রোগী, যেমনই হোক, কিছু চিকিৎসা পাচ্ছে। আমাদের দেশে ১৯১২ সালে বে আইন Indian Lunacy Act নামে প্রচলিত হয়। আজও সেই আইন মানসিক রোগীর চিকিৎসার বিষয়ের আরেক বড় বাধা হয়ে

# ডাটা

## শ্রী ডা মশলাই

### কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত

### (কুকর্মী)

প্রাঃ লিঃ এর

একমাত্র ব্যাণ্ড

আছে। সেই বহুলাংশে 'পাগল' হওয়া মানসিক রোগের কারণে প্রাথমিকভাবে রোগে চিকিৎসার বিবরণ ভাবনার কোনও অবসর থাকে না। সেই সময়, মানসিক রোগীকে (বাহুল্য-প্রণয়ীদের) কয়েকখানার মত ব্যবস্থার আটক করে রেখে, অন্যদের কর্তৃত্ব মিনারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পাগল, পাগল বা মানসিক হাসপাতালের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তখন 'ঐ রোগের চিকিৎসার কোনও ভাগি ওষুধ ইত্যাদি জানা ছিল না। কাকেও আটক করে রাখতে হলে জেলা-শাসক বা জরপ্রাপ্ত কোনও সরকারী মহকুমাস্বত্বের আদেশ প্রয়োজন হয়। এই জন্য মানসিক রোগীকে হাসপাতালে আটক করে রাখতে হলেও উক্ত আদেশ-নামার প্রয়োজন হয়। সকলের পক্ষে, বিশেষ করে জনের লোকের পক্ষে বহু মাইল দূরে রোগী নিয়ে গিয়ে আশ্রয়িত হাজার করিয়ে বহু টাকা দিতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে আরজি পেশ করে আদেশ-পত্র নিয়ে পরে হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা যে কত কঠিন ও কয়সাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও আশ্রয়িতের ছাপবৃত্ত পাগল আখ্যা পেতে অনেকেরই প্রবল আপত্তি, সামাজিক কারণে থাকে। অনেক আলাপ-আলোচনা ও সভা-সমিতি এজন্য হয়েছে। কিন্তু আজও এর প্রতিকার কিছু করা হয় না। সরকার অনড়। রোগ হলে চিকিৎসার সুবিধার জন্যও যদি আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় তবে এর চেয়ে আদিম দুরবস্থা আর কি হতে পারে। উপরন্তু চিকিৎসার জন্য যদি রোগীকে প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করে রাখতে হয় তা রাখতে হবে। শরীরের রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি অস্ত্রোপচারের পরে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় না? রোগীর কল্যাণের জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ব্যবস্থা করার জন্য আদালতের নির্দেশ দরকার হবে কেন? মানসিক রোগও রোগ। এই রোগের জন্য যে ব্যক্তি গ্রহণ প্রয়োজন তা কেন নিতেই হবে। আপত্তি উঠতে পারে, এমন সহজ ব্যবস্থার সুযোগ করে দিলে স্বার্থপর ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজনকে রোগী সাজিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে নিজের বৈবাহিক বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করে দিতে পারে। এর প্রতিকারের জন্য বহু উপায় উদ্ভাবন সম্ভব। কিন্তু সেই জন্য রোগীর চিকিৎসা বন্ধ থাকতে পারে না। বত নিখুঁত আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন সন্দেহ নিজের স্বার্থের ভাবিদে এক সময় তার মধ্যেও কার্কে খুঁজে বের করে যা আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আবার নতুন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

ইতিহাস এর প্রমাণ দেখেই সে-কালে চিকিৎসা তখন ভাল ছিল না। বর্তমান সবার মানসিক রোগের বহু বহু প্রমাণ বাজারে প্রায় প্রতি মাসেই আকাশগর্ভে। বহু গবেষণা চলছে—বার কলে নতুন উদ্ভা-জানা হচ্ছে এবং এই রোগের চিকিৎসার সুফলও দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখার প্রশ্ন আর নেই। আগে বলছি সব রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব হয় না। সেই রকম রোগীদের জন্য ভিন্ন রকমের আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে। রোগের চিকিৎসার উপকার পাবার সম্ভাবনা আছে আইনের কবলে পড়ে তাদের যদি সম্বলমত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পেরা যায় এবং লেগেই হলে বাওয়ার রোগ যদি দুরারোগ্য হয়ে ওঠে তা অতি দুঃখের কারণ হয়। আইন বাচাতে গিয়ে যদি একটিও জীবন নষ্ট হয়, তবে সেজন্য দায়ী কে হবে? রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। জল, মার্জিনস্টেটের এ-বিবরে কোনও এজিয়ার থাকতে পারে না। বর্তমান আইন কবল্যা এ-বিবরে অচল।

খুব এই নয়। চিকিৎসকের অভাবও এক বড় সমস্যা। উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসক খুব কমই আছে। অনেক পৈতৃক রোগচিকিৎসকও আজকাল ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা দিতে থাকেন। অর্থলিপ্সার উপরেও চিকিৎসকের বিবেক উন্নত ও প্রবল থাকা দরকার। যে রোগ চিকিৎসার বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়া সম্ভব সেই রোগীকে বত সহর সম্ভব বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোই কর্তব্য। তা সম্ভব না হলে সাধারণ চিকিৎসক বতটুকু চিকিৎসা করতে

পারেন-তাই করবেন ডাক্তার আর উপার-কি? মনে রাখা উচিত যে, বর্তমানকালে মানসিক চিকিৎসা এক বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে এবং এর জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা-ভালিকা মনের রোগ সম্বন্ধে বতটুকু লেখানো হয়, তা নিতান্তই প্রাথমিক প্তরের। সুতরাং কলেজ থেকে পাশ করে বার সাধারণ ডাক্তার হয়ে বের হন, তাঁদের পক্ষে, বিশেষভাবে মানসিক রোগ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা না নিয়ে এই রোগীর চিকিৎসা করা সঙ্গত নয়।

মানসিক রোগীর প্রতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গত ব্যবহার এবং রোগীর সেবায়ের জন্য শূদ্রব্যাকারীর বিশেষ শিক্ষা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণকে এ-বিষয় প্রচারের দ্বারা অবহিত করতে হবে। এই রোগীর শূদ্রব্যাকারী জন্যও বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থার দরকার। তা না হলে চিকিৎসার সুফল ব্যাহত হতে পারে। চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ দরকার, অনেক সময় তা বাজারে পাওয়া যায় না। বিদেশী ওষুধের আমদানি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার এই সমস্যা কোনো কোনো সময় গুরুতর হয়ে ওঠে। ডাক্তার বিশেষ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে অর্থ বা নামের লোভে কিছুসংখ্যক দর্শনাত্মক নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে প্রচার করেন। এতে রোগী-দের দর্ভাগ বাড়তে ও অর্থনাশ হয়।

রোগ হলে তার নিদানের ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন, যাতে রোগ না হয়, সেই ব্যবস্থা করা আরও বেশী প্রয়োজন। মানসিক রোগ কি প্রকারে প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু কলবার ইচ্ছে রইল।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

শ্রীমুত এখন হইতে ২৫০ গ্রাম  
টিনে পাইবেন।



অন্যোক্তক রচিত প্রাইভেট লিঃ  
২৬, কটন শ্রীট, কলিকাতা-৭

# আপনি কেমন আছেন

আপনি কেমন আছেন?

—উত্তর খুঁই প্রাজল—‘প্রাণ রাখতেই  
প্রাপ্য’...কিন্তু প্রাণ রাখার  
চেঁচটার যে ওষুধপ্রণ ভাঙার না দেখিয়ে  
নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর  
খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই,  
তাতেও কম প্রাপ্য লাভ ঘটে না।  
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ,  
পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়ার্কশপ চালান  
করবেন এই বিভাগে।

## বসন্ত উচ্ছেদ

এক বৃদ্ধ—হ্যাঁ এক বৃদ্ধকেও আগে  
কিছুসংখ্যক সংসদ ও সোভিয়েট ইউ-  
নিয়নের সহযোগিতায় এদেশ থেকে বসন্ত  
উচ্ছেদের যে বিলম্বিত কর্মসূচী আমরা নিয়ে-  
ছিলাম, আজ স্বীকার করতে হচ্ছে, পূর্ণ  
সাক্ষ্য তাতে আসে নি। এ বছর আবার  
নতুন করে ঘোষণা করতে হচ্ছে, বসন্ত  
সহস্রাব্দীর আশঙ্কা প্রবল, শহর কলকাতায়  
বসন্ত গড়ে মৃত্যু হচ্ছে সপ্তাহে ১০,  
সবাই টীকা নিন। ২৪-পরগণা, হাওড়া,  
হুগলী, কুর্চাবহারও আক্রান্ত।

অল্প প্রাচুর্য্য দেশগুলিতে, এমন কি,  
সোভিয়েট ইউনিয়নের এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত  
অপসারসমূহেও বসন্ত রোগ সম্পূর্ণ  
মিউট হয়েছে অনেক আগেই। আরও  
আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশে সাধারণত  
যে সব রোগে আমরা বেশী ভুগি এবং  
অকালমৃত্যু কল্ল করি, তার মধ্যে সম্ভবত  
বসন্তই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ প্রতিরোধ্য।  
শারীরিক কষ্ট নগণ্য, টেকনিক্যাল ও  
সাংগঠনিক হালুয়া কম, এখন কি খরচও।

কেন এমনটা হয়! ওরা বা পারে,  
আমরা তা পারি না কেন! এবার শীত  
পড়ে নি বলে? কিন্তু প্রকৃতির উপরেই  
হাঁদ নিভর করতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানের  
স্থান কোথায়? জনসংখ্যা কমান যাচ্ছে না  
তাই? কিন্তু সে সব মনে রেখে, জেনে-  
শুনাই তো উচ্ছেদের কর্মসূচী নেওয়া  
হয়েছিল। কমল খাই হোক, আলোজ্যটা  
একসপার্ট মূলে সীমাবদ্ধ না রেখে  
খোলাখলি ছড়িয়ে ভাল। এমন কি মত-  
বৈষম্য যদি থাকে, শুদ্ধও। কারণ এত বড়  
একটা বিশ্বব্যাপী বহুল দেশে কোন গণ-  
কর্মসূচীকে উল্লসিত্যের ছাপ ছাপ, সমর্থন  
করা যায় না, একাধিক ক্ষেত্রে জা আমরা  
কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু ঠিক যে, অতীতে গিসারিনে  
সেবার বসন্তের যে টীকা ব্যবহার করা হত,

নিরাম মত ঠান্ডার (৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে)  
তা রাখা হত না বলে তার পোটেন্সী কম  
বা নষ্ট হয়ে যেত, অনেক সময় তা ‘উঠত’  
না—অর্থাৎ রক্তে বসন্ত বিরোধী শক্তি বা  
অনাক্রম্যতা সঠিকভাবে জাগত না। ফলে  
হয় টীকা দিয়ে কোন ফল হত না, অথবা  
একই লোককে বছর বছর টীকা দেওয়ার  
প্রয়োজন হত। অথচ সে-ধরনের বিস্তৃত ও  
সুশৃঙ্খল সংগঠন আমাদের ছিল না।  
সোভিয়েট ইউনিয়নে তৈরী ঠান্ডার শৃঙ্খল  
টীকা (ফ্রীজ ড্রায়ড ভ্যাকসিন) বিনামূল্যে  
পাওয়ার পর এই টেকনিক্যাল অসুবিধা  
দূর হয়েছে। এখন আমরা এই উন্নত  
ধরনের শূন্যে টীকা ভারতেও তৈরী  
করাছি। অবশ্য মনে রাখা দরকার, মাদ্রাজে  
তৈরী এই শূন্যে টীকাও চার সপ্তাহের  
কেন্দ্রী ৩৭-ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা এদেশের  
স্বাভাবিক তাপমাত্রার আবহাওয়ার রাখা  
উচিত নয়, রাখলে পোটেন্সী নষ্ট হতে  
পারে, টীকা বিফল হতে পারে। কাজেই  
প্রাইমারী বা জীবনে প্রথম টীকা দেওয়ার  
পর টীকা যদি না ‘ওঠে’, সল্ভেই করা  
যেতে পারে যে, হয়ত কোন টেকনিক্যাল  
ত্রুটির জন্যে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়  
নি। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশুদের বেলায়  
অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আর  
একবার টীকা দেওয়াই উচিত। মনে রাখা  
দরকার, বসন্তে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী  
—কখনো কখনো শতকরা প্রায় ৭০—৮০  
পর্যন্ত।

আগে ধারণা ছিল, একবার টীকা নিলে  
অনাক্রম্যতা হয়, রক্তে এ বিশেষ রোগ বিরোধী  
শক্তি জমাতে সাড় বছর। এখন বলা হচ্ছে,  
না জানি, কত থাকে বছর তিনেক। তবে  
বিশ্বব্যাপী সংস্কার মতে কেবল দেশ বা  
যে সব জমিতে বসন্ত প্রাচুর্য্য দেখা দেয়,  
সেখানকার অধিবাসীদের বছর বছর টীকা  
দেওয়াই নিরাপদ। কারণ অনাক্রম্যতা  
সকলের দেহে সমান পর্যায়ে থাকে না।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দীর্ঘকাল  
অপুষ্টিতে ভুগলে, বিশেষ করে বারা  
প্রোটিন কম খায় তাদের দেহে অনাক্রম্যতা  
বেশী দিন রোগ-জীবাণুদের প্রতিহত করার  
মত উচ্চ পর্যায় থাকে না, কমে যায়।  
আমাদের দেশে শাকসবজি দরিদ্রদের  
ক্ষেত্রে একথাটা মনে রাখা উচিত। নইলে  
টীকার সুফল বা আত্মনিরাপত্তা সম্পর্কে  
প্রান্ত ধারণা থেকে যেতে পারে।

অনেক যা মনে করেন, আমি তো  
আমার শিশুকে বাইরে যেতে বা অন্য ছেলে-  
মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দিই না — আমার  
শিশুর বসন্ত হবে কেন! কিন্তু আমরা  
জানি, বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণু বিশেষ  
বিশেষ জায়গাতে সক্রিয় ও প্রজননশীল হয়ে  
ওঠে, তাদের সংক্রমণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়।  
বসন্ত-জীবাণুর দাপট বাড়ে শীতের  
শেষে শূন্যে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়,  
মিঠে হলেও মলর বাতাস তাদের অলঙ্কো  
ছাড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে, মানুষের  
শরীরে ওরা ঢোকে স্বাসপথে। কাজেই  
ঘরের মধ্যে বা কোলের মধ্যে রেখে পার  
পাওয়ার উপায় নেই। আগে দেখা যেত,  
রোগের প্রকোপ বাড়লে কিংবা প্রচলিত  
আইনমত সপ্তাহে বিশ-ত্রিশটা রোগীর  
মৃত্যু ঘটলে তবেই আমাদের টনক নড়ত,  
বিপদ সংকট ও প্রতিবেদক ব্যবস্থা নেওয়া  
হত তারপর। অফিসার মহলে একটা  
চেন্টাও চলত বিপদকে ধামাচাপা দেওয়ার।  
এবার শীত আসতে পেরী হওয়ার বসন্তের  
আগমনী একটু আগেই আশঙ্কা করে  
কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবেই আগে থাকতে টোল  
সহরং দিয়েছে। টীকা নেওয়া শুরুর হয়ে  
গিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই যে  
সাক্ষানতা ও প্রস্তুতি, এর দ্বারা মহা-  
হারীকে প্রতিহত করা বাবে তো? বসন্ত  
উচ্ছেদের কর্মসূচী সাফল্যের পথে এগোবে

তো? এগোলে কতটা এগোবে? বসন্তকে চিরবিদায় দেওয়া বাবে কত দিনে?

প্রশ্নটা কঠিন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জটিল সব সামাজিক প্রশ্ন—যা নিরন্তরই প্রতিরোধ করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সাফল্যগুলির সামাজিক প্রয়োগকে। আসলে অশিক্ষা এবং কুসংস্কার আমাদের দেশে এত ব্যাপক এবং এত গভীর যে বসন্তে ভুগে ছেলেমেয়েগুলো অস্থির হয়ে রয়েছে কিংবা হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরছে না দেখেও বহু লোক টীকা নিতে চান না বা দিতে দেন না। টীকা নিলে বসন্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় জেনেও দেন না। এমনও দেখা গিয়েছে, বহু সাধা-সাধনার পর যা শেষ পর্যন্ত নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কৈালের শিশুকে টীকা দিতে দেন নি। বখন বলা হয়েছে, শিশুরা দুর্বল, ওদের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ শক্তি কম বলে শিশুদের পক্ষে বসন্ত অতি মারাত্মক, যা প্রচণ্ড রোগে গিয়েছেন ওরকম অল্পক্ষেণে কথা উচ্চারণ করার জন্যে। এই বেদনাদায়ক কুসংস্কার বাঙালী মায়েরদের মধ্যে যেমন আছে তারচেয়ে বেশী আছে অবাঙালী বসন্তবাসিনীদের মধ্যে।

অবশ্য সঙ্গে কিছু বাস্তব সমস্যাও রয়েছে। প্রাথমিক টীকা দেওয়ার পর যে প্রতিভিয়া এবং সাময়িক অসুস্থতা দেখা দেয়, টীকাদাররা তার কোন দায়দারিত্ব নেন না। ফলে চাকুরীজীবী দরিদ্র মায়েরা সূত্রে থাকতে ভুতে কিলোন এবং আনুর্বঙ্গিক চিকিৎসার স্বল্পভার — কোনটাই পছন্দ করেন না।

অভিজ্ঞতার দেখা গিয়েছে, সুস্থ ও সকল মানুষের সেহে খুব কম পরিমাণ

রোগ-জীবাণু ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে কখনো কখনো একটা স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা আসে। সেই কারণে মহামারী পীড়িত এলাকার বসবাস করেও কেউ কেউ অসুস্থভাবে রেহাই পেয়ে যান। এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, বিরল ঘটনা মাত্র। এই কঠিন নিতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক এবং চূড়ান্ত বোকামী।

আজর এও দেখা গিয়েছে, যারা কোন দিন বসন্ত-পীড়িত এলাকার বাস করে নি বা ঘরের শরীরে বসন্ত-জীবাণু কখনো প্রবেশ করে নি, টীকা না নিয়ে মহামারী অঞ্চলে এলে অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধ শক্তির অভাবে তারা রোগের সহজ শিকার হয়ে পড়ে। অপর দিকে বসন্ত-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পর দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকে গবাস্ত করে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে সাধারণত ১৪ দিন। সুতরাং জীবাণুবাহী কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন গ্রামাঞ্চলে বা অন্য কোন রাজ্যে যান সেখানকার অধিবাসীদের টীকা দেওয়া হয়নি, তবে সেই ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার পর সেখানে বসন্ত দেখা দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা থাকে।

পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছু অবাঙালী আসছেন কর্মসংস্থানের আশায়। আবার এই রাজ্যের গ্রাম থেকে বা অশুশ্রুতর থেকে শহরে আসা-যাওয়া করছেন অনেকে। কখন এরা আসেন, কোথায় ডেরা কাঁধেন, কেই বা তার খবর রাখে। ভদ্রের খুঁজে বের করে টীকা দেওয়া খুবই কঠিন। যেহেতু এই সব আগন্তুকদের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিরক্ষরের সংখ্যা কিছু কম

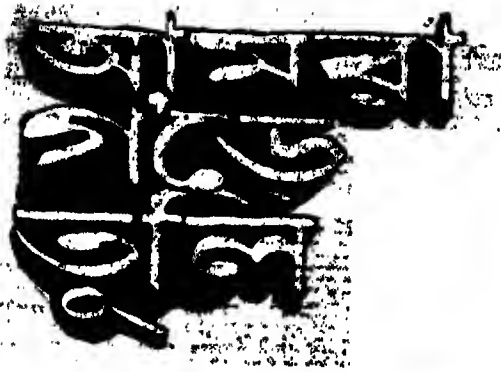
নয়, সুতরাং একমুখিক রোডে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত প্রসার এবং সর্বত্র লক্ষ্য রাখা একমুখিক প্রচেষ্টা কঠিন করে রাখা। টীকা দেওয়ার জন্যে বসন্ত উদ্ভেদের সময় কোন সময় পথ জমজমাট না। এবং এই সময় টীকা দেওয়া হলে বেশ কয়েক বছর করে—কত দিন বা রোগের প্রকোপ হার (মৃত্যুর হার) খুবোতে এলে পৌঁছায়। আর বাহুল্য। এত বড় একটা বিপদ জনবহুল দেশের বর্তমান ও আগামী দিনের প্রত্যেকটি মানবকে বছর বছর টীকা দেওয়া সহজ কাজ নয়। কাজেই সাময়িক সাফল্যে আশ্বস্তি নিয়ে নেওয়াটা হাড়ভেঁই হবে।

প্রসঙ্গত আইন পাশ করে বসন্তের টীকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা এসে পড়ে। বর্তমান মহামারী-বিরোধী আইনটি সংশোধন করে নতুন আইন যদি করভেই হয়, তবে হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে যা ও শিশুকে ছেড়ে দেওয়ার আগে এবং ডাক্তার, নার্স ও বাটলারের পক্ষে শিশুকে টীকা দেওয়া অবশ্যকরণীয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু গার্লস্কা ও গণউদ্যোগ ছাড়া খুব আইন পাশ করে বা জরুরীকালে সমাজ সংস্কার যে সম্ভব নয়, তা আমরা সবাই জানি। সুতরাং অমায়িক ব্যক্তিমূলক সফল এই পূর্বসূচী যদি পাশ করা যায়, তবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে মারী-গুটিকাকে নির্মূল করা নিতরই সম্ভব। বসন্ত উদ্ভেদের রত পালনে প্রত্যেকের কাঙ্ক্ষিত কৃষিকারি পল্লব করলে নিরাস হওয়ার কারণ নেই।

—জাফরী সার্বভৌম







লোকে বলে—অবকয়ের বৃষ্টি, ভেঙে পড়ার দিন,  
কিন্তু মতিভাই কি ভাই?  
আমরা কি গড়েও তুলছি না?  
অন্তত ক্রাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে  
খাঁ খাঁ ভাকাই ভাইলে কিন্তু অনা চেহারাই  
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো  
ইতিহাসকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা  
করাই, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।  
আমাদের নবযুগের যুগসমাজের সেই  
অজানা সৌন্দর্যবৃত্তির প্ররাসকে তুলে  
ধরা হবে এই বিভাগে।

## শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট

...হলের লাল রঙের বাড়ীটা বইয়ের  
থেকে দেখলে যেন অনেক পুরাতনের  
কীটভার ক্রান্ত পরিষ্কার। অন্ধাচে  
কানোচে, এখানে-ওখানে যেন মন্ডর  
অতীতের নিম্নবাস করছে। কিন্তু না।  
চোখের আবছা আকালটা সরে গেল মনের  
অন্তরে ছুঁবে গিয়ে। ভিতরে এসে অন্ধভব  
করলাম, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন  
একটি ধ্যানমগ্ন সমুদ্রে মন্ডর হয়ে উঠতে  
চাইছে। কলকাতা এখানে ভাবা পেরেছে যেন  
এক আশ্চর্য সুন্দর নীরবতার।...

...কলকাতার বাগবাঝারের রাস্তা ধরে  
সেই এগিরে আসুন। অমৃত পরিষ্কার  
আঁকস ঢুকতে গিয়ে যে ছোট গলিটা, তার  
উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীটা।  
দেখবেন লেখা আছে 'শিশিরকুমার ইনস্টি-  
টিউট'। মহাশয় শিশিরকুমারের নরম গড়ে-  
ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসের গভীরে  
যেতে পারলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে খুঁজে  
পাওয়া যাবে আমাদের দেশের শিক্ষা  
সংস্কৃতি। সাহিত্য, সমাজনীতির কিছ,  
প্রদীপ্ত সংকেত।...

...যে চেহারায়, যে নামে আজকের  
'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট' দাঁড়িয়ে আছে  
অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। বাগা-  
শরীর প্রথম কম্পিত মন্ডরে তা ছিল  
কিন্তু অন্য রঙে, অন্য পড়ার কুশালতা টাকা।  
আজকের আলপনাকে চোখ ভরে দেখতে  
গেলে, মন ভরে তার সৌন্দর্য অন্ধভব  
করতে গেলে ফিরে ভাকতে হবে সেই  
দিনগুলোর দিকে যে সময়ে কিছ,  
উল্টোপন্যাস মেলবন্দনে, কিছ, আবেশ আর  
কিছ, সম্প্রীতির ছোঁয়ায় গড়ে উঠেছিল  
একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান।

সময়টা ছিল ১৯২০। কলকাতার দার  
শামসুজ্জোয়ার কীটপতর। কিন্তু বই  
সংগ্রহ করে একটা লাইব্রেরী কলকাতা  
হয় না। ভাবলো স্যুট-আউটন স্কুলের  
উদ্যমী ছেলে। তাদের সে অবস্থা শব্দ  
মনের কোণেই নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল না,  
বাক্যকল্প নিতে উল্লস হয়ে উঠলো।  
সহযোগিতা এবং সাহায্যও কিছ, আসতে  
শুরু করলো। তাই দিনে অথবা অল্প

সময়েই বই দিয়ে একটি গ্রন্থাগার অর্থাৎ  
লাইব্রেরী গড়ে উঠলো। এই সব ছেলের  
উল্লস, উল্লসীলতা খেলাধুলার মধ্যেও  
সোজা ছিল বই পড়াকে আর  
খেলাধুলাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নেওয়া  
হোল। একটি নাম তৈরী হোল 'কীটপতর  
সম্প্রীতি' ক্রাব এবং লাইব্রেরী'। প্রতিষ্ঠিত  
হোল ৫১১ কীটপতর লেনে স্বর্গীয়  
নীরববরণ গুহর বাড়ীতে।

ক্রাবটি গড়ে উঠলেই কয়েক দিনের মধ্যেই  
প্রাথমিক অন্ধভব করা গেল। নতুন নতুন  
সভা এলো কতো উদ্যমের জোয়ার নিয়ে।  
বইয়ের সংখ্যা বেখানে ছিল প্রথমে ২০,  
সেটা এসে দাঁড়ালো ২৪০। জনপ্রিয়তাও  
সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগলো। স্বাভাবিক-  
ভাবেই দেখা দিল স্থানান্তার। তাই আবার  
ক্রাব সরে গেল ১৯২০এ ৪১, বোসপাড়া  
লেনে স্বর্গীয় নরেশ নাগচৌধুরী বাড়ীতে।  
এর পর থেকে ক্রাবের সব শাখার কাজই  
মোটামুটি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো।  
কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেল মাঝখানে।  
ক্রাবের পরিচিতিও হোল সুসুপ্রসারী।

সকলের সঙ্গে ভাল রেখে এলো ১৯৩১।  
২৮শে জুন উত্তর কলকাতার বিষ্ণুকা  
হলে বসলো ক্রাবের মিটিং। এই মিটিংয়ে  
খিলাট একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। ক্রাব  
এবং লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে  
মহাশয় শিশিরকুমারের পুণ্য নামে একটি  
নতুন নামকরণ করতে হবে। এবং ক্রাবের  
চলতি শাখার সঙ্গে আমদতে হবে শিক্ষা-  
চর্চার শাখা, অর্থাৎ সেখানে থাকবে  
সঙ্গীত, নাটক এবং অন্যান্য শিল্পের অন্-  
শীলন। মাস পেলে 'শিশিরকুমার ইনস্টি-  
টিউট'। স্বাভাবিকভাবেই জারগারও কল  
হোল। প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে, নতুন  
চেহারায় গড়ে উঠলো আজকের জারগার  
অর্থাৎ ৭১১ বাগবাঝার স্ট্রীটে।

লাইব্রেরীতে ততদিনে বইয়ের সংখ্যা  
দাঁড়িয়েছে ৩৪২০ এবং একটি বিনা  
পুলার পড়ার খরচ উদ্বৃত্ত তৈরী হয়েছে।  
মিটিং দৈনিক সংবাদপত্র ও বাইশটি ছোট  
ছোট ম্যাগাজিনও এখন সংগৃহীত হয়েছে।  
বছরের ইতিহাস মিলিয়ে দেখতে গেলে

ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী নানানভাবে বিকশিত  
হতে শুরু করে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ থেকেই।  
১৯৩২-এ লাইব্রেরী কলকাতা কর্পো-  
রেশনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা গ্র্যান্ট পায়  
এবং ১৯৩৩-এ তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০  
টাকা। বই এবং সভা সংখ্যাও বাড়তে থাকে  
প্রচুর পরিমাণে। এই সময়ে এই লাইব্রেরী  
থেকেই কিছু বক্তৃতা এবং রচনা প্রতি-  
যোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়ে  
বক্তৃতার অংশ মেনে ডাঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-  
পাধ্যায়, ডাঃ ডি এন মৈত্র, অধ্যাপক রাজা  
প্রমুখ বিদ্যমান ব্যক্তিত্ব। এই সময়তেই  
'বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের' সঙ্গে  
এই লাইব্রেরীর নাম মিলে হোল। ১৯৩৪-এ  
লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা হোল ৭০৯৫,  
আব সভাসংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৪১০৫। এই  
সময়ে ইনস্টিটিউটের সভাপতি - কালকাতা  
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গড়ে তোলার  
ব্যাপারে নেতৃত্ব নেন। সেই থেকে শুরু করে  
আজ পর্যন্ত শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের  
লাইব্রেরী তার আকার বাড়িয়েছে অনেক,  
প্রভাব প্রসারিত করেছে অনেক দূর পর্যন্ত।  
অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া সভাসংখ্যা এখন  
দাঁড়িয়েছে ৫০০। গ্রন্থাগারের-সংগ্রহশালার  
জমা হয়েছে ২৫০০০ বই, তার মধ্যে ১৬  
হাজার বাংলায় লেখা, ৯ হাজার ভারত-  
বর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও ইউরোপীয় ভাষায়  
লেখা বই। ইনস্টিটিউটের প্রাচীন সভাপতি  
শ্রীমদ্যাদবীন্দ্র চোখের নামানুসারে যে 'বি-  
রিডিং রুম' এখনো আছে, তাতে প্রায়  
প্রতিদিন ১২৫ জন পাঠক-পাঠিকা  
জানাজেনে বাগানত থাকেন। এই রিডিং  
রুমে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সবকিছু  
সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক পত্রিক টেবিলে  
সজানো থাকে। ...

প্রতিষ্ঠান সভাপতি গোলাপলাল  
চোখের নামানুসারে এখনো গড়ে উঠেছে  
অনেকদিন আগে একটি বিশদীকরণ।  
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্ট করার  
জমা, নানান স্ফূর্তির বই এসে পাঠক  
জমিরে এই বিভাগে। বইয়ের সংখ্যা  
ও হাজারের ওপরে। পাঠক-পাঠিকার  
সংখ্যাও অনেক। কতি কতি ছেলে-মেয়েদের

মুখের তার একটি প্রাপ্তবয়স্ক আসির বেন লেনে ওঠে এই শিল্পবিভাগে।

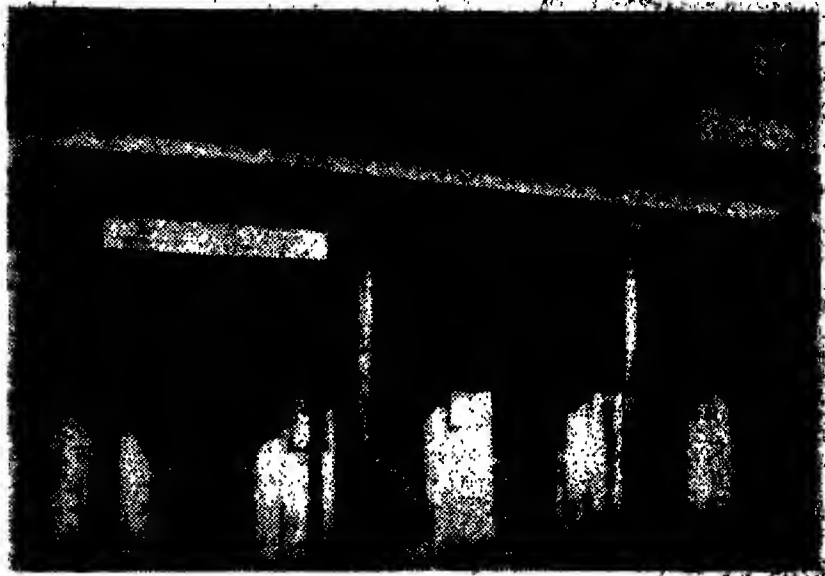
ইনস্টিটিউটের সভারা প্রায় প্রথম থেকেই এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে লোককে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ করে তুলতে গেলে, আরো অন্যন্য বিষয়ের ওপর যথাব্যোগ্য আলোকপাত করতে হবে। তাই লাইব্রেরীর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে সাহিত্য বিভাগ, খেলাধুলা বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, সংগীত ও নাটক বিভাগ, এ্যাম্বুলেন্স বিভাগ। এই দিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে ইনস্টিটিউট বেন বৃহত্তর জীবনসাধনার একটি ইতিহাসই মেলে ধরেছে বলে মনে হবে।

মননশীলতার সমৃদ্ধির জন্য ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ যে সাহিত্য বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন জনৈক আগে, আজ তা ফুল ফুলে নানাভাবে, নানা উল্লেখ্য সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে এবং এখনো পূর্ণোদ্যমে চলছে। রচনা প্রতিযোগিতাও এই বিভাগের একটি অন্যতম আকর্ষণ। এই ধরনের নানান তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হোত 'সংবাদিকা' নামে একটি প্রচার পত্র। আওশকল আর্ট প্রজিযোগিতাও সংগঠিত হয় এই বিভাগের মাধ্যমে। এতে স্থানীয় স্কুলের ছেলে ছাড়াও বাইরের স্কুলের অনেকেই অংশ নিয়ে থাকে।

ইনস্টিটিউটের খেলাধুলা বিভাগ একটি সমৃদ্ধতর বিভাগ। আউটডোর এবং ইনডোর দু-রকমের খেলারই ব্যবস্থা আছে এখানে। খেলার প্রাকচাণ্ডা ইনস্টিটিউটের ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। তাল, ক্যারাম, প্রভৃতি চলছে একটি ঘরে এবং তাকে ঘিরেই সোজার হয়ে উঠছে অনেক কঠ, সেক-কঠে হড়ানো আছে মটো, মটো উল্লাহনা। বেগল রোড রেস এসোসিয়েশনের সহায়তায় ইনস্টিটিউট প্রতি বছর দশ মাইল-ব্যাগী দৌড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। ইনস্টিটিউটের সভারা অনেক বছর থেকেই বিভিন্ন জায়গার ফুটবল, রিক্স, ক্যারাম এবং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আসছেন। অতীতেও অনেক সাফল্য আছে এরা জয়ের মালা গলার ধারণ করে এনে-ছেন। এতে প্রোরব বর্ষ গেরেছে ইনস্টিটিউটের। ১৯৬৭ থেকে সবসাধারণের জন্য অক্সন রিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রায় দুশো গোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর অংশ নেয়।

সমাজজীবনে যখনই নেমে এসেছে বিপর্যয়ের কালো ছায়া, নিরাশার ঘন অন্ধকারে যখনই বিপর্যস্ত হয়েছেন মানব, মন্যবোধ তখনই ইনস্টিটিউটের সভারা সাধারণতঃ এগিয়ে গিয়েছেন সমাজের ধারসূত্র পর করে মানবের দৈনন্দিন জীবন শান্তি, শান্তি, শান্তি তুলে। সুস্থ, সবল এক নতুন সমাজ কল্যাণ ও শান্তি।

শিল্পকলা ইনস্টিটিউট



মস্কো গড়ে উঠুক, এই হোল তাঁদের প্রয়াসের লক্ষ্য। ১৯৩৪ সালে যখন ভূমিকম্পে বিহারের নানা জায়গার অসাধারণ ক্ষতি হয়, তখন ছিল ইনস্টিটিউট আলোকিত সুরস্বতী পুজোর মহুত। স্বাভাবিকভাবেই এই মহুতে প্রতি বছরই প্রাণময় আনন্দের জোয়ার বয়ে বেত, কিন্তু সেই সময়ে সভারা আমোদ-প্রমোদের সর্বকম আবেগ ত্যাগ করে সুরস্বতী পুজোর জন্য সংগৃহীত সব অর্থ বিহারের তখনকার ক্ষতিপূরণ ও গ্রাণকাবের জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনকার সব সংবাদপত্রে এ-মহৎ কাজের যথেষ্ট স্বীকৃতি মূখর হয়ে উঠেছিল।

এরকম আরো অনেক কাজের নজর আছে। সমাজসেবাই এসবের মূল লক্ষ্য। কিছু কিছু লোক বারো সাতা দারিদ্র্যে তাঁর কশাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ছেন, তাঁদের নিয়মিত সাহায্য দেওয়া হয় এই বিভাগ থেকে। ভালো কিছু ছাত্র বারা 'যথার্থ' গরীব, তারা তাদের স্কুল-কলেজের বেতনও পায় এখান থেকে। পুজোর সময়ে গরীব-দুঃখীদের নানারকম কাপড়-জামাও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

মনের অতলে বেসব আবেগের আবেগজন, তার প্রকাশেই তো শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সভারা এই সভা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। তাই ইনস্টিটিউটের প্রায় প্রায়শ্চিক লগ্ন থেকেই এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৫ থেকে।

শারি করে আঁক পল্লভ অনেক ভালো ভালো উল্লেখযোগ্য নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। প্রায় পণ্ডাণ রাতির ওপর শায়ার আকরে পরিবেশিত হয়েছে মহাশয় শিল্পকমারের তত্ত্বলক সৃষ্টি প্রিন্সাই সময়াস। এছাড়া সে সব উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয়েছে সেগুলো ত্রোজ অনিল ভট্টাচার্যের 'অকল্যাণীয়া', অমিল

ভট্টাচার্য, বিহারক ভট্টাচার্য, পুঁচিভ, প্রদীপসে হাওরা, 'পুনেরীষক ভব', 'আত আধীন্য', বিহারক ভট্টাচার্য, 'মেঘনাদ', 'ভব', 'অতন', 'মোটির ঘর', 'শরৎচন্দ্রের বাঘের মেরে', 'রবীন্দ্রনাথের 'শেখরকা', 'চিা কুমার সভা', 'বশীকরণ', 'শরৎচন্দ্রের 'পাখারের 'বধু', 'চর্য চন্দন', 'ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক', 'জরাজম্বের 'এ বাজী ও বাড়ী', 'শম্ভু মিত্রের 'কাপ্তানসংগ', 'রবীন্দ্র মিত্রের 'মানময়ী গালস স্কুল', এবং আরো অনেক।

অতিনয়া ছাড়াও বাঙ্গালিক-সংগীত প্রতিযোগিতার আরেকটা সভারা সঞ্চর থাকেন। এতে বছর প্রতিযোগিতার পঞ্চমসং হয়। এবং সেই সময়গুলো প্রায়ের গুরুত্বই ভরে থাকে।

ইনস্টিটিউটের সভারের সমাজসেবায় আর একটি বিশেষণ দেলে, এ্যাম্বুলেন্স, নাসিং ও ক্যাডেট ডিভিসন। ১৯৪৫-এ যখন শিবতীর বিশ্ববৈধের কল্যাণ, 'চিা চারদিকে' 'সমাজিক কল্যাণ' এক অধ্যবসায় নিয়ে এসেছিল, তখনই সৃষ্টি হয় শিল্পের কুমার ইনস্টিটিউট এ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন। এই ডিভিসনের কর্মীরা বিক্রম জায়গায় দু'রে দু'রে রোগীর সেবা করে থাকেন। যখন বসন্ত ও কলেরার সারা অঞ্চল ঘিরেছিল তখন এই বিভাগের কর্মীরা দু'র বসন্তে গিয়েও রোগীদের সেবা শাস্রবা করতেন। নিম্নলিখিতভাবে ইনস্টিটিউটের অন্য রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

গত ১৯৭০-এ শিল্পকমার ইনস্টিটিউটের সংলগ্ন জমি নির্মাণ হল। থেকে ১৯৭৩-এ এই ওঠে যাঁদের ইনস্টিটিউট সভারা যে নানা বিষয়ে জড়িত, 'চিা হালিস্তি ও শাপক মন' ইতিহাসে 'চিা মিতে পেরেছেন, এ দিকের 'চিা' সংগ্রহ নেই।



## বিজ্ঞানের কথা

### শিশুর মোটা হওয়াটা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়

আমরা সবাই চাই মোটামোটা গোলগাল শিশু। আমাদের ধারণা, এমনি হওয়াটাই শিশুর স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শিশু জন্মাবার পরেই মায়ের তাই প্রাণপণ চেষ্টা থাকে, কী করলে শিশু মোটা হয়। আর শিশুর কাগজের পাতায় তো শিশুকে মোটা করবার উপায়ের বিজ্ঞাপন থাকেই— তাতে স্বীকৃতি এক শিশুর ছবি ও নিশ্চিত ফলাফলের গ্যারান্টি সহ বিশেষ

এক শিশুখাদ্যের ঘোষণা, যেটি খাওয়ালে শিশু মোটা হবেই। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখে বাবা মায়ের ধারণা আরও বৃদ্ধি পায় হর যে শিশুকে মোটা করার চেষ্টা সর্বথা করবার, মোটা শিশুই প্রতিপালনের সার্থক দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। এখন যদি বলা হয়, শিশুর মোটা হওয়াটা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়—তাহলে কথটা এমনকি শিশু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মত থেকে শব্দেও

বিশ্বাস করতে পারবেন এমন কোনো লোকের সংখ্যা কম। শিশুখাদ্যের টেলার গারে ছাপানো হিসেব থাকে কোন 'বয়েসের শিশুর কতটা ওজন হওয়া উচিত' উচ্চ শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার আধিকারিণী মহিলাকেও দেখোছ। শিশুর শিশুটির ওজন এট মাপারিও মাপ ছাড়িয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্ক পোষণ করেন যে শিশুটি রোগী। ফলে শিশুটিকে মোটা করে তোলার দুরন্ত একটি অয়োজন ভালো রকমেই শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া, এখনকার অর্ধশতাব্দীর দিনে অতি অল্পসংখ্যক শিশুই পুরোপুরি মায়ের দুধে মানুষ হতে পারে, কৃষ্ণ দুধই নির্ভর। এ অবস্থায় অয়োজনটা যেন আরো জোর পায়। কেননা, একেই হিসেবটা খুবই সহজ আর উপায়টা নাগালের মধ্যে—শিশুকে মোটা করতে হলে বেশি করে খাওয়ানো চাই, টিনের গুড়ো ভালো গুলেলেই শিশুর খাদ্য তৈরী, তার আর বাধা কিসের। কিন্তু এখানেই বিপত্তি, শিশুর স্বাস্থ্যের ভিত্তিই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ মানবটির স্বাস্থ্য বিশেষ হানি ঘটবার কারণ তৈরী, হজ্ঞ। শিশু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা, হয়তো মতুন মায়েরের বখানায়ই অবহিত করে থাকেন শিশুদের কতকগ পুরে পুরে কতখানি করে খাদ্য খাওয়ানো উচিত, কিন্তু তার চেয়েও ঘন-ঘন বা বেশি-বেশি খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা যে ক্ষতিকর সেই হুঁশিয়ারীর অভাব আছে মনে হয়। উপরন্তু শিশুখাদ্য নিয়ে অবাধ বিজ্ঞাপনের এই দিনে আরও ঘন-ঘন ও আরও বেশি-বেশি খাদ্য খাওয়ানোর দিকেই প্রবৃত্তি। কয়েকজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর সাংপ্রতিকতম গবেষণা অনুসরণ করে এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে উপস্থিত করতে চাই।

এই বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন গ্রীমতী শ্যালোট অ্যান্ডারসন ও অপর একজন সহযোগী বিজ্ঞানী। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল-এ একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ব্রিটেনে এক বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যা দীর্ঘমতায় ভাবনার বিষয় হয়ে পড়ছে। প্রায় একই সময়ে একই পরিধায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন শেফিল্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিশুখাদ্য বিষয়ক লেকচারার এল এস তাইংস। তিনি বলেন, এই বিপত্তি ঘটছে শিশুকে অনেক আগে থেকেই দানাশস্য, মিশ্র বৈষকড় ও অত্যধিক ঘন দুধ খাওয়ার-ফলে। তথ্য-সংগ্রহের জন্য তিনি ২৬১টি শিশুর জন্মের সময়ের ও

হয় মাস বয়সের ওজন নিয়েছিল। এই ২৬১টি শিশুর মধ্যে মাত্র ২১টি পুরো-পারি মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হচ্ছিল। এই দলে মাত্র ৪টির ওজন ছিল মাত্রাতিরিক্ত। তুলনার কৃত্রিম দুধ খেয়ে তারা মানুষ হচ্ছিল সেই দলে মাত্রাতিরিক্ত ওজনের শিশু ছিল শতকরা ৫২-৬ ভাগ।

৪০টি শিশুর খাদ্যতালিকা খুঁটিয়ে পূর্ববর্ণন করা হয়েছিল। তা থেকে সব-চেয়ে আশঙ্ক্যর কথা বা জানা গিয়েছিল তা এই যে ৪০টি শিশুকেই খেতে দেওয়া হচ্ছিল কঠিন খাদ্য এবং অধিকাংশকে এক সম্প্রদায় বয়স না হতেই চামচে করে খাওয়ানো হচ্ছিল। লেখক বলছেন, এই ক্যান্টিনটা হালে শূন্য হয়েছিল এবং একনো তিনি দায়ী করছেন বৈবিক্‌ডের উৎপাদন-কারীদের। তিনি বলছেন, শিশুকে কী ও কতখানি খাওয়ানো উচিত সে সম্পর্কে বৈবিক্‌ডের উৎপাদনকারীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং এই সমস্ত পরামর্শ শূন্য হয়েছিল এমনভাবে চলতে শূন্য করেন যার ফলে শিশুকে অত্যধিক খাওয়ানোর ঝোঁক বেড়ে যায়।

তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৃত্রিম দুধ সম্পর্কে। সম্প্রতিকালে বিষয়টি নিয়ে তিনি আরো গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা থেকে জানা যায়, মায়েরা শিশুর জন্যে কৃত্রিম দুধ তৈরি করে বড়ো বেশি ঘন করে। তার ফলে সেই কৃত্রিম দুধে ক্যালরি, অ্যামিনো অ্যাসিড ও সোডিয়ামের মাত্রা সর্ব-পরিমাণ গরুর দুধে যতোখানি থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত ঘন দুধ খাবার দরুন শিশুর কিডনিতে চাপ পড়ে এবং কোরো শিশু ভুঁকার চোঁচাতে শুরু করে। শিশুকে যে জল খাওয়ানো দরকার এই বোধ অধিকাংশ মায়ের নেই, এমনকি শিশুকে শূন্য জল খাওয়াতে অধিকাংশ মায়েরই আপত্তি। মায়েরা তখন কী করে? শিশু চোঁচাতে শুরু করলেই খাওয়ার সময় না হওয়া সত্ত্বেও সেই অতিরিক্ত ঘন দুধ আরো এক-বার খাইয়ে দেন। তাতে বিপত্তি বাড়ে বই কমে না।

মায়েরা যাতে এই ভুল না করেন সেজন্যে আজকাল অনেক ডাক্তার শিশুকে স্বাভাবিক গরুর দুধ খাওয়ার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রেও একটা সমস্যা এসে পড়ে। হাস-পাতালগুলোতে গরুর দুধ বড়ো একটা চলে না, কেননা গরুর দুধের যোগান বজায় রাখা ও মজুত করা—দুইই সমস্যা। আর হাসপাতালগুলোতে না চলা পশ্চত মায়ের গরুর দুধের দিকে টানা শক্ত ব্যাপার। মায়েরা কী করেন? প্রসূতি ওয়ার্ডে শিশুকে যে ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধ খাওয়ানো হচ্ছিল সেই ব্র্যান্ডটিই চালিয়ে যান।

মায়ের দুধ খেয়ে যে-সব শিশু বড়ো হয় তাদের ওজন কখনো মাত্রাতিরিক্ত হয় না, এটা সবক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে একটা বাদ আছে। বাদ-না শিশুকে

অনেক আগে থেকেই কঠিন খাদ্য খাওয়ানো শুরু হয়। কাজেই এমন দুধ বাদ, তৈরি করা যায় বা সমস্ত দিক থেকেই মায়ের দুধের মতো তাহলে আর শিশুর ওজন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংল্যান্ডের একটি হাসপাতাল এমনি মায়ের দুধ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে এবং সম্ভবত অচিরেই তৈরি হতে শুরু করবে।

শিশুর খাওয়া যে অতিরিক্ত হতে পারে, এটা গবেষণার বিষয় হয়েছে সম্প্রতিকালে। আগেকার কালে মায়েরা বলতেন, শিশুকে কখনো বেশি খাওয়ানো যায় না। কখনো ঠিক নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমনকি আজকের দিনেও কোনো কোনো বৈবিক্‌ডিনিকে এই ধারণার বশ-বর্তী হয়ে শিশুকে খাওয়ার ব্যাক্ষা। অবশ্য একথা ঠিক, শিশুকে পুরোমাত্রার মিশ্র খাদ্য খাওয়ানো শুরু করার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর ওজন শেষ-পর্বন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নয়। এখানেও কথা আছে। হালের গবেষণার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, পরবর্তী জীবনে মোটা হয়ে পড়ার সংকে শিশুজীবনে বাড়তি ওজন হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এই সূত্র অনুসরণ করে ভবিষ্যৎবাণী করা চলে আজকের দিনে যে-সব শিশুকে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ানো হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে তাদের সবাইকে মেদবহুল বপুর্ন বোকা করে বেড়াতে হবে।

শিশুস্বাস্থ্যের গবেষক একজন বিজ্ঞানীর একটি আবিষ্কারের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। তার নাম ডঃ চার্লস ব্রুক, তার দুজন সহযোগী হচ্ছেন জুন লয়েড ও ও এইচ উলফ। তারা দেখেছেন, যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের শরীরে এক বছর বয়স হবার আগেই মেদকোষের (অ্যাডিপোজ সেল) সংখ্যা বেড়ে যায়। তারা বলছেন, 'মনে হয় শরীরের মেদকোষের সংখ্যা মোট কত দড়াবে তা পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় গেশবকালের মধ্যেই। যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের নিয়ে আমাদের গবেষণা থেকে জানতে পেরেছি, বেশি খাওয়ার ফলে শরীরে মেদকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে এক বছর বয়সের মধ্যে।' তাঁদের মতে, একজন মানুষের শরীর

মেদকোষের সংখ্যামাত্র দুই বছর বয়সে হতে পারে ঠিক হয়ে যায় এই এক বছর বয়সের মধ্যেই, যখন শরীরের ওপরে খাদ্য-প্রতি-খাদ্য সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী কালে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিকই থেকে যায়, খাওয়ার ব্যাপারটা যেমনই চলুক না কেন। পরিবর্তন ঘটে শূন্য মেদকোষের আকারে।

কী সাংঘাতিক কথা! জন্মের পর থেকে এক বছর বয়স পর্বন্ত কোনো শিশুকে বাদি বেশি-বেশি খাইয়ে মোটা করে তোলা হয় তাহলে সেই শিশুটিকে কিনা তার জীবন টানতে হবে মোটা জীবন ধরে, হ্যাঁ তাই একাধিক বিজ্ঞানী নিশ্চিত হয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন। হাতে কলমে পরীক্ষা করে তারা দেখিয়েছেন, খাওয়ার হেরফের ঘটিয়ে মেদকোষের সংখ্যা কমানো যায় না। একজন নন, নানা বিজ্ঞানী নানা সময়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন ব্যাপারটা তাই ঠিক। জীবনের প্রথম বছরে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার ফল হিসেবে শতকরা অল্পতম আশিটি ক্ষেত্রে মেদবহুলতার ভুগতেই হয়।

ডঃ ব্রুক মনে করেন, ডাক্তাররাও অনেকখানি দোষী। শিশুকে প্রতিদিন কতখানি খাদ্য দিতে হবে সে-বিষয়ে তারা কড়া নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তার মতে শিশুকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরি-মাণ খাদ্য যে খেতেই হবে এ-ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি থাকা উচিত নয়। শিশুর ওজন একটানা বাড়ছে কিনা সেটাই আরো জরুরি বিষয়। শিশুকে বড়ো ভাড়াভাড়ি দানা-শস্য ও কঠিন খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি বলছেন, দানাশস্য ও কঠিন খাদ্য দেওয়ার বয়স হচ্ছে তিন থেকে ছয় মাস, কদাচ তিন থেকে ছয় দিন নয়। ডঃ ব্রুক তার গবেষণার এলাকার লক্ষ্য করেছেন, অনেক মা-ই শিশুকে তিন থেকে ছয় দিন বয়সের মধ্যে দানাশস্য ও কঠিন খাদ্য দিতে শুরু করেন।

ডঃ ব্রুক মায়েরদের পরামর্শ দিয়েছেন, বৈবিক্‌ড তারা যেন বাড়িতেই তৈরি করেন, তৈরী বৈবিক্‌ড যেন না কেনেন। তৈরি বৈবিক্‌ডে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো অবশ্যই থাকে, উপরন্তু থাকে শিশুকে মোটা করার জন্য অনেকগুলো বাড়তি



বেনারসী • সিন্ধু • তাঁত  
মিল বস্ত্র • গোস্বাক  
হোসিয়ারী

৪৫/৩, জি.টি.রোড (সিউএ) স্বাওড়া

উপাদান। কাকিতে বৈকুণ্ঠ তাঁর করলে সেখান উপাদানগুলো বান পড়ে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা থেকে আমাদের দেশের মানুষেরও শিক্ষা নেবার আছে। সবচেয়ে বড় শিক্ষা—শিশু কেমন উঠবেই শিশুর মধ্যে যেমন ধারণা না দেওয়া। শিশুকে খাওয়াতে হবে নির্দিষ্ট সময়—সাধারণ দিন থেকে চার ঘণ্টা—পবে পরে। শিশুরই না খাওয়ানো—চাকচ বা কিন্নকে খোর করে পেললে তো কলচ নর। শিশু নিজের থেকে যেতো খাবে ভাতোটা, কুড়েই তার খাওয়া শেষ করতে হবে। শিশুর পেটে কাঁপা, রাঙিয়ে দেবে খান ইত্যাদি অনেক কিছুই হলে রয়েছে এই অবলম্বিত বা বৈদ্যিক খাওয়ানো। কুড়ীরত, শিশুকে দুই খাওয়ার মধ্যে রন্ধকর্তী সময়ে যেতোটা পরোক্ষর জল খাওয়ানো।

প্রত্যেক মানুষের মনে রাখা উচিত, জন্মের পরে এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে তিনি কী ও কিভাবে খাওয়ানো উচিত ওপরে অনেকখানি নির্ভর করছে সেই শিশুর পরবর্তী জন্মের গোটা জীবন।

প্রত্যেক মানুষের মনে রাখা উচিত, এ ক্যাট বোঝি ইজ নট এ ক্রিট বোঝি। কথারি নেওয়া হয়েছে ইংলন্ডের এক বৈকুণ্ঠ-প্রস্তুতকারকের বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে। আমাদের দেশে অল্প বিজ্ঞানের ভাষা উঠে। আর সে-কারণই আমাদের দারিদ্র্য আরো বেশি।

## দীর্ঘায়ু লাভে কোন চমক নেই

মানুষের গড় আয়ু কত বছর হওয়া উচিত—৫০? ১০০? ২০০? ৩০০? জানবে কি আমরা লাভ করতে পারি? মানুষের বৈদ্যকে কি চিরস্থায়ী করা যায়?

এসব প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাজে, বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। কোনোটা

বিজ্ঞানসম্মত, কোনোটা উদ্ভট। তারপরেও প্রশ্নগুলো এখনো উঠছে। এখনো জবাব দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়া-কন্ট্রোল একটি সম্মেলনে বিশ্বের ৪০টি দেশের ৩,০০০ বিজ্ঞানী মিলিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছিলেন। এবং এই প্রশ্নগুলোর জবাব তারা দিয়েছেন—উদ্ভট নয়—বিজ্ঞানসম্মত।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈদ্যকে চিরস্থায়ী করার কোনো উপায়ের সম্ভাবনা করতে যাওয়াটা আপাতত নিষ্ফল হতে বাধ্য। কিন্তু আধি-ব্যবহৃত না দুগে দীর্ঘ জীবন লাভ করা কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ভাবার বলছেন, মানুষ অবশ্যই ১০ বা ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত সুস্থ-সবল জীবন কাটতে পারে। রুশ দেশের এক শারীর-বিজ্ঞানী একবার বলেছিলেন, “আমাদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের পক্ষে একশো বছর বয়স হবার আগে মারা যাওয়াটা হবে দাঁড়ায়ে সম্ভাব্য ব্যাপার।” ক্রিমিয়ার সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের উক্তি এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

জীবনের পরামর্শ বাড়িয়ে তোলার বাস্তবসম্মত পথ আছে দুটি। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং আধিব্যাধি ও পরিবেশের প্রতিরোধতা দুরীকরণ। এই পথে ফল লাভের একটি প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে গড় পরামর্শ সোভিয়েত আমলের আগে ছিল ৩২ এখন ৭০।

দ্বিতীয় পথ—সুসংগঠিত সুসম্মত প্রমাণ। একটি বিবরণ লক্ষ্য করার মতো—যাঁরা একশো বছর বা তারও বেশি কাল বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন কর্মী। অন্যদিকে যারা কোনো শারীরিক প্রমাণ করে না, কোনো রকম খেলাধুলা বা শরীর চর্চাও নয়—তারা তিরিশেই বাড়িয়ে যেতে শুরুর করে। হাঁটা কর্ম-তৎপর জীবন যাপন করেন, কখনো

কখনো তাঁরা এমন কি নন্দই বছর বয়সেও তারকা করার স্বপ্নে পড়েন।

মলকে সজীব রাখা দীর্ঘ জীবন লাভের আরেকটি উপায়। দেখা গিয়েছে দীর্ঘায়ু সাধারণত করে থাকেন অত্যন্ত কর্মতৎপর, উৎসাহ ও উদ্দীপনার জরুরি ও সদা উৎফুল্ল। কখনো তাঁরা নিদ্রা হয়ে থাকেন না, বড়ো রকমের আশা পেলেও সেখান থেকে সামলে উঠতে পারেন।

দীর্ঘ জীবন লাভের অপর একটি উপায়ের সম্ভাব্য এই সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তা হচ্ছে, যে সব জৈব প্রক্রিয়া ঘটার দরুন মানুষ বড়ো হয় সেই প্রক্রিয়াগুলোই প্রতিরোধ করা ও বাড়িয়ে দেওয়া। এটি ঘটানো কোনো দুরের ব্যাপার নয়, এখনই হতে পারে ও কিছুটা হলেও।

মানুষ বড়ো হয় কখন? জৈব শরীরের বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক সংযোগগুলোর মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা ব্যাহত হলে। যদি বিশেষ ভেদক বা বাস্তব প্রভাব প্রয়োগ করে এই ব্যাহত হওয়ার ব্যাপারটি কোনো যার তাহলে মানুষের পরামর্শও অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা আরো একটি কথা বলেছেন। মানুষের বড়ো হওয়া দুই, কতকগুলো জৈব প্রক্রিয়ার কর্মজোরা হওয়া নয়—হানির নেওয়ার নতুন প্রক্রিয়ার আবির্ভাবও। এ-ব্যাপারটি জীবনের সকল পর্যায়ে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কাজেই, জৈব প্রক্রিয়া কর্মজোরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করার নতুন প্রক্রিয়া কতখানি জোরদার হচ্ছে তার ওপরেও মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভ নির্ভর করছে। হানির চলা এই প্রক্রিয়াগুলো আয়ত্ত করতে পারলে অবশ্যই পরামর্শ দীর্ঘ হতে পারে।

—জয়দেব





# একটু উন্নত জীবন

চিপলাস

১১৫/১১

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল।

কাল হেমালয়ের হাট ছিল। হাট থেকে মুরগী কিনে মুরগীর ঘরে রেখেছিলাম। আনাছও কিনেছিলাম। মিসেস কিংএর কাছে বলে প্রতিরোধিলাম এক ভজন কেকের জন্য। আগে অর্ডার না দিলে কেক পাওয়া যায় না।

ফার্নি মেমসাহেব রুটি ও রোজ দিচ্ছেনই, কাল রাতে ছুটির জন্যে বাণ সেরে কুখা বলে পাঠালাম। ভোরবেলা হালিও এসে মেটে দিবে বাবে বাতে রেকফাস্টে ও খেতে পারে।

লালিকে বর্ডে হাসানকে খবর দিয়ে পাঠালাম। হাসান 'বাবুচি'। এ বাড়িতে নাকি হাসানকে কখনো কেউ এলেই হাসানের ভাক পড়ত।

ভাকতেই যে কি ভালো লাগছে। আজ ছুটি আসছে আমার কাছে। বিনা নিমন্ত্রণে, নিজে বেচে, নিজের সপাত অধিকারে সে আসছে আজকে। অধিকার আমাদের অনেকেরই অনেক ব্যাপারে থাকে হস্ত অনেকের কাছে, কিন্তু সে অধিকারের ভাণ্ডার ও তার সীমা আমরা অনেকেই সঠিক বুঝতে পারি না।

এতদিনে, এতদিনে যে ছুটি আমার এই ভাক-সেওয়ে পলকুটিরে, আমার এই খনা জীবনে তার নিজের ভূমিকা এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এ কথা মনে করেই মন খুশীতে ভরে আছে।

আমি কাইরের দিকের একটা ছোট ঘরে থাকি, সেখানেই আমার লেখার টেবল, টানা সব। তার পাশে একটা বড় ঘর—অন্য পাশেও বড় ঘর আছে। ছুটি কোন ঘর পছন্দ করবে, কোন ঘরে সে থাকবে জানি না। তাই দু'ঘরেই বিছানা পাড়িয়ে রাখলাম বিকেলে। ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে রাখলাম।

ছুটি সদপ খেতে ভালোবাসে। হাসানকে মাদুপ, জিকেন-রোস্ট, পুড়িয়ে সস্তা বানাতে বলে দিলাম।

পছাত্ত থেকে ময়কলাস্কির দিকলী আসে। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসো নিজে যায়। নিভিয়ে পেওরা হয় সেখান থেকে। হঠাৎ অশ্বকার হয়ে গেলে ছুটি ভয় পেতে পারে, তাই সব ঘরে ঘরে বড় মোমবাতি লাগিয়ে দিলাম, তার পাশে রাখলাম দেশলাই।

গল্যা হাস চামার রাস্তা দিয়ে যখন প্রতিদিন যায় তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। চারখারে গাড় অশ্বকার নেমে আসে।

সব বন্দোবস্ত শেষ করে, লঠন হাতে মালকে নিয়ে, ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরে আমি বড় রাস্তার এসে দাঁড়ালাম।

এখানে এইই নিয়ম। যে যখন ফেরে, তার বাড়ির মালি (সাহেবরা বলে, কুলি) বাড়ির সামনে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গিরধারী জ্বাইভার বাস খামার। যার যার বাড়ির পথের সামনে সে সে নেবে বার, মালি মাল বলে নিয়ে বাড়ি যায়।

একটুকু দাঁড়িয়ে থাকার পরই দু'ব থেকে একডো থেকেডো রাস্তার গোড়ানি তুলে ফাস্ট গীয়ারে সেকেন্ড গীয়ারে আসতে শোনা গেল গিরধারী জ্বাইভারের গল্যা বাসকে।

দেখতে দেখতে হেড-লাইটের আলো দেখা যেতে লাগল। হেলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগল বাসটা।

আমি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মাল, এগিয়ে গিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে লঠন উঁচু করে ধরলো। বাসটা থামলো। ভিতর থেকে মেরেলি গলার কে যেন হিল্লিতে বলল, মদুকো হি'রাই উতারনা?

গিরধারী বলল, জী, মাইজী।

বাসটা দাঁড়িয়ে একটা অধিকার জনোয়ারের মত বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, একজন্ট পাইপের ধূমোদ গণ্ডে পিটিস ফুলের গন্ধ মনে গেল। পেছনের দককা দিয়ে ছুটি নামল।

কতদিন পরে ছুটিকে দেখলাম। ক-ত-দি-ন পরে।

একটা হালকা সবুজ সিকের লাড়ি পরছে, গায়ে লম্বা বড়িভালো শাল, পরে চুটি।

কনডাক্টর একটা ছোট সার্টকেস হাত বাড়িয়ে দিল—মাল, সেনেকি নিজে নিজেই ছুটি বলল, তুমি কে?

সংলাপ বলতে, মাল, বুকো না, মাল, আভুল তুলে বলল, বাবু হুইংসপর হায়।

ছুটি অঝাক গলার ওকে বলল, বাবু হি'রা তকু আরা?

তারপর ওরা দু'জন ভাকভাকি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাসটা চলে পেরেছিল।

লঠনের আলোর চারিদিকের অশ্বকার আরো ভারী হয়ে ছিল। ছুটি আমার কাছে এসে, একেবারে আমার সামনে দাঁড়াল—অনেককণ আমার মূখের দিকে সেই লালচে অশ্বকারে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, প্রায় ফিস ফিস করে ওর বুকোর মধ্যে থেকে বলল, কেমন আছেন? আপনি এখন কেমন আছেন?

কাউকে দেখলেই যে কারো এত ভাল লাগতে পারে, সমস্ত সস্তা হাওয়া লাগা সজনে ফুলের ডালের মত দু'লে উঠতে পারে, তা ছুটিকে দেখতে পেয়েই নতুন করে মনে হল।

ছুটির গল শুনলে, ওর চোখে তাকালে, ওর কাছে দাঁড়ালে কেন আমি এতখানি খুশী হই? কেন হই আমি কিছুতে বুঝতে পারিনি কোনোদিনও।

আজকে আমি কত বেখুশী কীবে খুশী, আমি কাউকে বোকাতে পারবো না। আমার স্বপ্নের, আমার মূখের, আমার আনন্দের আমার দুখাগানীরা, দুমভাঙানীরা ছুটি আজ কতদিন পরে আমার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মালকে বললাম—লঠনটা আমার হাতে দিবে এগিয়ে যেতে, গিরে লালিকে কসিফ জল চড়াতে বলতে।

মাল, এগিয়ে গেল। আমি বললাম, তুমি কেমন আছ? তুমি কেমন আছ বল?

হুটি হঠাৎ আমার হাতথেকে লঠনটা ফিরে আমার হৃৎকর কাছে ফুলে ধরল, বলল, কতদিন আপনাকে ভাল করে দেখি নি, কই টুপীটা খুলে নে একটু, খুলে নে না।

টুপীটা খুলতে খুলতে আমি বললাম, তোমার স্বভাব একটুও বদলাননি কলেজের লোকটার মতো।

হুটি অনেকক্ষণ আমার হৃৎকর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন।

টুপীটা পরতে পরতে আমি বললাম, তাত বাকই। তোমার চেয়ে কসে আমি অনেক বড়, কসে বাওরই ত স্বাভাবিক। কসে এবং চোয়ারও।

বললে অনেক বদলাননি। নিজেকে বললে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই বদলে গেছেন। কিন্তু এভাবে নিজেকে... লাভ কি?

আমি বললাম, হুটি পড়ানোর জন্যে তোমার বক্তৃতা সেওরা অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন চলো। বাড়ি পৌঁছে—তারপর বা ফলার আছে শোনা যাবে।

বাড়ি কি অনেকদূর? বলে সাফটিকে ভাল করে টেনেটেনে নিল হুটি।

বললাম, এই এক কালি মত। তোমার হৃৎকর শীত কতক, না?

হৃৎকর ফিরিয়ে হুটি বলল, এখানে বেশ শীত জ্বা, রীতির চেয়ে বেশী শীত—হাত দুটো শীতে কুঁকড়ে গেছে।

চলতে চলতে আমি আমার ডান হাতটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার হাতে তোমার হাত রাখ, হাত গরম হয়ে যাবে।

হুটি রীতিমতো হুট করে এক চমক ডাকল। জরাজীর্ণ হুটি, না।

একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, কতদিন, আমার সমস্ত শীতের দিনে আপনিই আমার দিকে আপনার উকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, চিরদিন। আপনাকে মানাভবে, নানা জনের হারফে দৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু আপনার জন্যে করতে পারিনি। এখন বোধহয় আপনার ঠান্ডা হাতের দিকে আমার হাত

বাড়ানোর সময় এসেছে—আমার হাতে, আপনি হাত রাখুন, বলে হুটি ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

বাঁ-হাতে লঠন নিয়ে হুটিতে হুটিতে হুটির বাঁ হাতে আমার ডান হাত রাখলাম। অনেক অনেকদিন পরে হুটির হাতে হাত রাখলাম।

ভালোবাসা করতে কি বোকার আমি জানি না, উকতা কথার মাঝে কি আমি জানতে চাইনি, কিন্তু বহুদিন পরে এককনের হাতে হাত রাখতেই আমার সমস্ত শরীর কেন যে এমন করে ভালো লাগল খিঁচিয়ে উঠল ভাঙ কি আমি জানি? এই উকতা, এই আলো, এই ভরস্বে ভালোলাগা, এর কি কোনো নাম নেই?

হুটি আমার হাতখানি ওর সুন্দর নরম আঙুলে ও ভালুতে দৃঢ় অথচ হালকা করে ধরে রইল। আমাদের দুজনের হাতের উকতা দুজনের হাতে ছড়িয়ে গেল। কারো হাতই আর ঠান্ডা রইল না। আমার হঠাৎ মনে হল, আমি কোনো কিংহী হৃৎকর হৃৎকে হাত রেখেছি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হুটি বলল, আপনার বাড়ির চারপাশটা কেমন তা দেখা হল না। বিজুপাড়া গেরুতে না গেরুতেই ত অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। রীতিতে আমার এক কথু বলছিল, জারগাটা সুন্দর, সত্যিই সুন্দর না?

বললাম, সকলের সৌন্দর্যজ্ঞান ত সমান নয়, তবে তোমার চোখে হয়ত অসুন্দর লাগবে না। কাল তোমাকে সব দেখাব।

দূর থেকে বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল। হুটি বলল, ওমা, এই জগলে ইলেকট্রিসিটি আছে? ভাবা যায় না, এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ছবির মত ছোট ছোট টালির কাংলোর ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে। তাই না?

জবাব দিলাম না কোনো। আমার সদা-রোগমুক্ত শরীরপ্রাপ্ত ক্রান্ত মনটা এমন ভালোলাগার আমেজে বদল হয়ে ছিল যে কোনো ভুল কথার কলেই সে আমেজ আমি নষ্ট করতে রাজী ছিলাম না।

বাড়িতে ঢুকে হুটি সব ঘুরে ঘুরে দেখল—ওর চোখ বারবার দেওয়ালের বড় বড় ফাটল ও মেঝের লম্বা লম্বা ফাটলের দাগ দেখতে লাগল। একটু পরে ও বলল, বাড়িটা এমন কেন? চতুর্দিক ফাটা, জরাজীর্ণ?

বললাম, বাড়িতে যে-থাকে তার মতই ত বাড়ি হবে? বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক যে-দামে এ বাড়ি কিনেছিলেন তাতে একটা মোটর সাইকেলও কেনা যায় না। সাহেব চলে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া। সুবিধামত দাম পেয়ে কিনে নিচ্ছেন। কাল সকালে তোমার এতটা খারাপ লাগবে না, দেখো। ও বাড়িটা বাড়ি হিসেবে ভাল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু বাড়ির পরিবেশটা ভাল। পরিবেশের জন্যেই শৃংখল লাগে।

হুটি এসে ভিতরের বসবার ঘরের খেতের চেয়ারে বসল।

লাল এসে বলল, বাঘরুমে গরম জল দেওয়া হয়েছে।

হুটি উঠে হাত দুখ হুটে বাঘরুমে গেল।

ও আমার পরশের ঘরেই থাকবে বলছে—বলছে ওর ভর করবে ওপাশের ঘরের ঘরে শূতে।

বাঘরুমে থেকে ঘুরে এসে হুটি কফি ঢালতে লাগল, বলল, আপনি ত এক চামচ চিনি খেতেন, এখন কি বেশী খান?

আমি হাসলাম, বললাম, আমি কফি খাবো না হুটি, আমার খাওয়া দাওয়া এখনো নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। বাড়তি কোনো কিছু খাওয়া যাক।

হুটি কফি ঢালা কথ করে কফির ছোট পট্টা শুনো ধরেই বলল, কে এসব বলেছে? কোন্ ডাক্তার?

মান্দারের সহধর্মী ডাক্তার। যিনি এখন আমাকে দেখছেন।

হুটি চোখ নামিয়ে আমার জন্যে একটি কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল, তাকে বলবেন যে রীতির লেডি ডাক্তার অন্যরকম প্রেসক্রিপশন করেছেন। কফি আপনার খেতেই হবে।

আমি যে দুদিন থাকব, আমি বা খাব, বা রাখব, সবই আপনার খেতে হবে। তারপর একটু খেয়ে বলল, আজকালকার ডাক্তাররা খালি শরীরের চিকিৎসা করেন, যেন শরীর একটা লোহার জিনিষ—তার সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কফির কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে খুব অভিমাত্রী গলার বলল, সত্যি। আল এতবড় একটা অসুখ হল, আমাকে একবার মনে পড়লো না আপনার, আমাকে একটা খবরও পাঠালেন না। আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।

কফির কাপটা তুলতে তুলতে আর বললাম, কেন খবর পাঠাব? তোমার মনে আছে? তুমি রীতি আসার আগে আমার একবার ভীষণ চোখের অসুখ হয়েছিল। আমি দিন-রাত চোখের কাজ করি, তাই, যখন সাতদিন চোখ বন্ধে পড়ে থাকতে হয়েছিল তখন কি যে অবিশ্বাস্য অসহায়তা আর বন্ধ্যা ভোগ করেছি, তাঁকি বলব। চোখ বন্ধেই এককনের হৃৎকর দেখতে পেতাম। সত্যিই বলছি, এককনের চোখ দেখতে পেতাম।

প্রায় পাঁচ দিনের দিনে তোমাকে নিয়ে ডায়াল হাতড়ে-হাতড়ে কোন করেছিলাম, বলেছিলাম, একবার এসো, তুমি দেখতে এলে আমার ভাল লাগবে।

তুমি বিদ্রূপের গলার বলেছিলে, আপনার কি দেখার লোকের অভাব। তারপর, মনে আছে কি-না জানি না, আরো, অনেক কথা বলেছিলে।

আমার মনে সৌন্দর্য সত্যিই সন্দেহ হয়েছিল, সে আমার প্রাণ তোমার ভাল বাসবারটুকু কতখানি দেখানো এবং কতখানি সত্যি। তোমার উপর আমার জেনে কিছু

## হাওড়া কুঠকুঠীর

সর্বপ্রকার চমৎকার, বাড়ির, অসাড়তা  
কুঠা, একজিয়া, সোরাইলিস, দৃষ্টি  
কুঠারি, অসাড়তার জন্য সাক্ষ্যে অথবা  
পূর্বে স্বাক্ষর লিখুন। প্রতিভাভাষ্যপিত্ত  
জরাজীর্ণ কুঠা কুঠার, ১৫২ হাওড়া ঘোষ  
জেন, বসন্ত, হাওড়া। শাখা : ০৬,  
বহাওয়া কুঠার, রোড, কলিকাতা-১।  
ফোন : ৩৩২২০৬।

আলো আছে কি নেই, সেদিন কোন ঘেঁড়  
শেয়ার পর অসম্মানিত হলে বলে বলে শব্দ  
তাই ভেবেছিল।  
কালকে আমার এ অবস্থার কথা তাই  
জানাইনি।

ভালই করেছেন। আমি ভাবছি, কাল  
তোমার কপসই রাতী চলে যাবে। বে ডট-  
লোকেস নিজের অধিকার এবং নিজের সঙ্গে  
অমীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা  
নাই, তারি সূচনা করা বাড়িতে একজন  
অবিবাহিতা মেয়ের—খাটাতো ভাল দেখায়  
না। আমাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক যদি  
এতই শব্দ হয় যে অভিমানের বেশ কেউ  
কাউকে কোনো কথা বললে তাতেই সম্পর্ক  
শেষ হয়ে যেতে বলে, তাহলে অন্যতে হবে  
সম্পর্কটা এখনো যথেষ্ট পাকা হইনি।

কবাব দিল্লার না? আমি; সেলায়া-খরা  
ওর হাতের উপর আমার হস্তা-স্বাধীন  
ও কোনো কথা বলল না, লুপ্তিত মধ্যে  
বন্দ্য দরজার দিকে চেয়ে চাইল।

কি কখনো শেষ হবে ছুটি-বলল, ওহ  
ভুলেই গেছিলাম, আপনাদের জন্ম একটা  
জিনিস এনেছি বলে ওর-মরে গেল।

ফিরে এল একটি পলিথিকের—ম্যাপ  
নিরে, ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলল,  
দেখুন ত, এই পলোডারটা, আপনার গায়ে  
হয় কিনা।

একটা সুন্দর ফুল-সিলভাস পলোডার  
বুনেছে ছুটি। হাই-ক্ল্যা। বাকের ও হাতের  
কাছে সাদার কাজ করা। আর দুটো ছাই-রঙা  
বড় মোজা।

ভাবলাম, এই ঠান্ডায়, আপনার কাজে  
লাগবে। অনেক দিন আপনাকে কিছু দিই  
নি। পছন্দ হয়েই আপনাদের?

আমি চুপ করে রইলাম। চুপ করে ওর  
দিকে চেয়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের চোখ এত কথা  
বলে, চুপ করে কারো দিকে চেয়ে থাকলে  
চোখ অনগল এত কথা বলে যে সে সময়ে  
মুখে কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের কলমের বা মতের ভাষা  
কোনো দিনও বোঝায়, চোখের ভাষার  
সম্বন্ধ হতে-পারবে না। আমার ছুটির  
চোখের দিকে চেয়ে আমি বছরের পর বছর  
কাট্টে দিতে পারি, আমার বছর—।

চোখে কিছু বললে, বলার কিছু থাকি  
থাকে বা অন্য জিনিস সম্পর্কে নিয়ে ভাবিয়ে  
নিতে পারে। কিন্তু না লিখে-বললে সব  
নিরপেক্ষ বলা হতে পারে, নিরপেক্ষ হইলে  
গোপন ও অব্যক্ত কথাই কালসময় বেদনা  
তখন হারিয়ে যায়। এক দায়ের নিরপেক্ষতা।

আমার ফুসফুস ইচ্ছা রাখিয়া হয়ে  
গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় এখনো তেমন  
আছে, আমার হৃদয় কেমন কেমন ছিল।  
আমার ছুটি আমার চোখের সামনে থাকলে  
আমার হৃদয় এখনো তেমন বসন্তমুগিয়ে  
বাজে। তখন আমার একটা গল্পে ইচ্ছা  
করে না।

যেদিন নিশ্চিন্তভাবে আমার ঘেঁড়  
কাছে নেই, এমন কি আমার হৃদয়ের কাছেও  
নেই, এবং থাকবে না, জানক ও অন্য-কারো

হঁসে গেছে অথবা অন্য কারোরই না হঁসে ও  
কেবল ওর নিজেরই হঁসে গেছে, সেদিন  
আমার বাটার আর কোনো ভাগিদ থাকবে  
না।

ইচ্ছা ছুটি বলল, এখনো আমি বিশ্বাস  
করতে পারছি না। আমি সত্যিই তাতে  
পারছি না যে আমি আমাকে একটা বছর  
দিলেন না কেন?

কি লাভ হত বল জানিয়ে? আমি  
বললাম, সকলের সব অশান্তি দূর করতে  
তুমি নিজেকে কোলকাতা থেকে দূরে  
নিষ্কাশিত করলে। তোমার কাছে আমি কত  
ছোট হইলে আছি, ছোট হইলে থাকি, তা তুমি  
জানো না। তাছাড়া এ এমন একটা অসুখ,  
যে অসুখে তোমার নিজের কথার কিছুই  
হিসপাতালে ভিত্তি হইবেইলাম, ভাঙার  
হিসেন, বাসরা হিসেন। রসাতিকে  
এরকমভাবেই থাকতে হয়। তুমি এলে  
তোমারই কত হত শব্দ।

চিকিৎসা নাই-ই বা করলাম, সেবা  
নাই-ই বা করলাম, আপনার কাছে ত থাকতে  
পারিতাম।

তোমার কি ধারণা তুমি কখনও  
আমার থেকে দূরে থাকো? আমার সঙ্গে  
তুমি ত সব সময়ই থাকো। সমস্ত সময়।  
এতগুলো বছরে মনে পড়ে না কখনো  
তোমার কথা একবার না ভেবে একদিনও  
যদি এসেছে আমার অথবা তোমার মুখ না  
গান পড়ে হৃদয় ভেঙেছে। তুমি কি কখনোও  
ভানোনি যে, তুমি সব সময়ই আমার  
সঙ্গেই থাক।

ছুটি ওর বড় বড় বাগ্গিচায় ঢেকে  
দুটি তুলে আমার দিকে চাইল। কোনো  
ধরায় দিল না কথার।

লালি খাবার লাগিয়ে দিইছিলাম।

খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে বললাম, তুমি  
কিন্তু খাওয়ার সময় দুটো বসে থাকবে।  
আমার খাল, আমার কাপ সব আলসা করে  
রাখবে—আমার ঘরেও মোটে ঢুকবে না।  
তুমি ভাল করেই জান, এ রোগের নিবাস  
নেই। যতখানি পারো আমার ছোয়া বাঁচিয়ে  
লেবে।

ছুটি অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল।  
বলল, বুঝি আপনি যেমন সব সময়  
আমার ভেঁয়া পাঁচিয়ে চলেছেন?

আমরা গিয়ে খাওয়ার টেবলে বসলাম।  
সস্তা লোহার ফোফিঙ টেবল, ফোল্ডিং  
চেয়ার, ফাটা বেগুয়াল, কাটা মোজা।

এ ঘরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। খাওয়ার ঘরের  
পাশে রান্নাঘর—মধ্যে এক ফালি ঢাকা  
বারান্দা—কিন্তু দূর পাশ খোলা। রান্নাঘরটা  
উত্তরে। এমন হাওয়া আসে যে বলর নয়।  
হাওয়া আসুক আর নাইই আসুক এ ঘরটা  
থুই-ঠান্ডা হয়ে থাকে সব সময়। দিনে  
কোনো সময়েই এ ঘরে বোধ ঢোকে না।

শালটা ভাল করে মুড়ে বসল ছুটি।  
ঠান্ডার ওর ঠোঁট থাকিয়ে গেছে। কিন্তু ছুটি  
আমার মতোমাখি বসেছে, তাই আমার মনে

হবে এই কাটা-কটো নয় এই সাদা  
আসরালের সৈন্য, সাদাকালি ছুটি এসেছে  
বলে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

হাসান এসে খুব গরম সপ্ত দিবে গেল।  
আমি বললাম, শীতগিরি খাও, নইলে  
দু' মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

ছুটি বলল, আমার ভীষণ শীত করছে,  
বলে টেবলের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে  
আমার হাটতে রাখল। আমার হাত ওর  
হাটে নিয়ে ওর হাত গরম করে দিলাম।

লালি ভাড়ার থেকে আচারের টিনটা  
বের করে আমল।

ছুটি দেখে প্রায় চাঁৎকার করে উঠল,  
কাল, এ কি? এ আচার আপনি এখানে  
কোথায় পেলেন? আচ্ছ। কবে কোলকাতার  
বলোইলাম, ভীষণবাসি, আর আপনি সে কথা  
মনে করে রেখেছেন? বলুন না কোথায়  
পেলেন?

আমি হাসলাম, বললাম, খিজুরি  
থেকে আনিছিলাম।

ছুটি অরাক গলার বলল, আপনাদের  
মনেও থাকে আচ্ছ। সব খুঁটিনাটি কথা।

বললাম, থাকে, সবই মনে থাকে,  
সমস্ত খুঁটিনাটি কথা মনে থাকে। যা মনে  
রাখতে ইচ্ছা হয় সেগুলোই সবই মনে থাকে।

এ আচার তবে রীতিতেও নিশ্চয়ই  
পাওয়া যাবে। আচ্ছ। এত ভালোবাসি  
অবধ আমার নিজের একবারও মনে হয় নি  
যে রীতিতে খোঁজ করি।

ভাত হল। এখন আপনার খাবার কি  
দিয়ে? আল ত তোমার লসনা একবারে  
সাহেবী রান্না হয়েছে।

কাল খাব। কাল আর কিছুই খাব  
না। শব্দ আচার দিয়ে এক খালা ভাত খাব।

বললাম, পাগলি।

খাওয়া লাওয়ার পর মধ্যে ছোট ভুই-  
রুমে চেয়ারের উপর পা তুলে শাল, মুড়  
শাড়ি টেনে বসল ছুটি। বলল, মশলা  
খাবেন? বলে ওর ব্যাগ থেকে একটু  
কোটো বের করে একটা মশলা দিল। তারপর  
বলল, কটা শাজ?

দশটা। আজ আর গরম নয়।  
এতখানি বাসে এসেছে। আজ তাড়াতাড়ি  
শয়ে পড়ো। অজিগার ভোরে, কখন ওটো  
তুমি? নটা না-দশটা?

ও হাসল। বলল, আজ না স্যার।  
নিজের অনেক কাজ করতে হয় ভোরে উঠে।  
আমি কি আর সেই আত্মমিষ্ট আদরে  
মোহাটি-আছি? এখন অনেক শব্দ হয়েছি  
আমি, অনেক কিছু করতে হয় আমাকে  
নিজের জন্যে। কাল দেখতেই পারেন, কখন  
উঠি।

বললাম, কাল কোন সময় কি খাবে  
এখনি বলে রাখ। হাসানকে আমি সব  
দুনিয়ায় রাখছি।

দুর্ভাগ্যবশত গেল বললাম, দেখুন,  
আপনার বাসটি কখনো ভাল স্পষ্ট হয়ত  
পারবে কিন্তু সমস্ত সময়কালই কোনো  
তাড়াতাড়ি আপনাকে পলিথিকের নল সানি

কালকে আমিই সব রাঁধব—আমি আমার  
বা-খুদী আপনাকে রেখে থাকব।

—তাহলে আমি খুদী যে হবে তাঁতে  
সন্দেহ নেই—কিন্তু চারিদিকে এত সন্দেহ  
জাগ্রা আছে তোমাকে দেখাবো, তোমাকে  
নিজে খাবার যে আমি একদিনের জন্যে  
এসে হোসলে চুকবে এটা মোটেই ভুল  
হবে না।

—আহা। যে রাঁধে সে মেন চুল বাঁধে না।

—আ হাঁহুত বাঁধে, কিন্তু আমি এমনিতেই

রোজ অনেক কষ্ট করো—আজি কষ্টে কখন  
তাসবে যখন থাকবে তখন অন্তত তোমাকে  
একটু আরামে রাখতে দিও। আমি এখানে  
সময় করে সাজব, সকল বিকেলে চারিদিকে  
বাঁড়িয়ে বেড়াবো, কিন্তু সবর এসে থাকবে—  
বাসস—এখানে তোমাকে আর কিছুই  
কবতে হবে না।

—না। তা বললে হবে না। লেদী মেরেন  
মত বলল ছুটি।

—তাহলে একটা রুকা ছোক। হাসানই

রাখবে, কিন্তু আমি শব্দে একটি পদ  
রেখে। কেমন?

—কি ভাবল মেন ও। তারপর বলল,  
বেশ, তাইই হবে।

একটু পরে ও বলল, চলুন সবার পজা  
বাক।

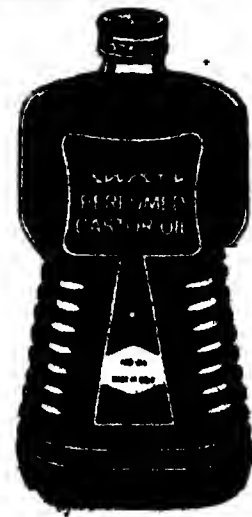
ওর সঙ্গে আমি ওর ঘরে গেলাম।  
বললাম হাতে ভর পাবে না হ? ভর পেলে  
আমাকে ডেকে। আমি পাশেই থাকব।  
তোমার বাগানের নীচে উঠ বইল, বোজেনে



সব হেয়ার অয়েলই তো আপনার চুল  
পরিপাটি রাখে, কিন্তু

**স্বাস্থিক পারফিউমড  
ক্যান্স্টার হেয়ার অয়েল**  
আপনার চুলকে ক'রে তোলে ঘন আর  
চকচকে ও নিরোগ। তাছাড়া,  
চুলকে রাখে সুন্দর সুবিস্তৃত ক'রে।

তাই তো প্রতি বছর হাজার হাজার পরিবার সুখ  
স্বাস্থিক পারফিউমড ক্যান্স্টার হেয়ার অয়েল ব্যবহার করতে শুরু করেছে।



Shalpi-HPMA-22/72 84

সকলে বিষয়বিশিষ্ট সেনাবী করল আমাকে;  
আশানাকে। অল্পবাদ বখান হাথা, শেতে সহই  
করব তবে নিজেদের ঠকাব কেন? কার  
জন্যে ঠকাব? আমাদের সকলে ঠকাবে আর  
আমরা কেন অন্যের ঠকাবার আগে এতবার  
ভাবব?

আমি ওকে বিছানার বঁসিরে দিবে  
বললাম, আমাকে তোমাকে ঠেকায় এমন  
কোনো শক্তি তু নেই প্রতিবীতে। তোমার  
শরীরটাকে এই মহত্তে পেলেই কি ওদের  
উপর আমার ক্ষম হবে ছুটি? এই যে তুমি  
আমার সামনে বসে আছে, এই তোমার সমস্ত  
তুমি, তোমার মন, তোমার সুগন্ধি শরীরের  
তুমি, এই সমস্ত তুমিই ত আমার, আমার  
চিরদিনের। সে চিরদিনের, যা  
ব্রাহ্মের কক্ষ অত তাড়াহাড় পেতে নেই।

তোমার পরিত্যক্ত আমায়—যখনই আমি  
গোড়ায় চাই তখনই পান—এর জন্যে এত  
অধিকার কেন তোমার? আমি ত এই  
বাহ্যিক তোমার বকে জড়িয়েই থাণী—।  
তুমি হলে বাক্য কেন আমার অসং এখনো  
সাহসিন। আমি ত সেনেশনে তোমার প্রতি  
অধিকার করতে পারি না।

ছুটি আমেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর  
বাক্স, পুঁকশা, আমার মন হয়ত আপনার,  
কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে অন্ত নিঃসন্দেহ  
হয়েছে না। আমার শরীর আমারই, আমার  
একর, এ পরীর অন্য কারো নয়। আমি  
জানি, আমার মন আপনার ডাকে চিরদিন  
সাজা বেবে, ভয় হবে যদি পরীর না হয়ে।  
আমার ভারী ভয় হয় যদি কখনো এমন হয়  
যে, আপনি কিছু চাইলেন আমার কাছে  
কিন্তু আমি দিতে পারলাম না।

তারপর একটু, যেমে রঙ্গল, জানিগা,  
আবার কবে কর্তৃহীন পরে আপনাকে এমন  
ভাবে এমন নিঃশব্দতায় এরকম আপনায়  
নিঃশব্দ কাছে পাবে। পরে আমাকে কিন্তু  
দোষ দেবেন না। বলতে পারবেন না,  
আপনায় প্রতিটি কিছুমাত্র অঙ্গের ছিল  
আপনাকে।

আমি ওর গালের সঙ্গে গাজ। ছুট্টিয়ে  
বললাম, কখনো বলব না ছুটি, এ কথা  
কখনো বলবো না। তুমি দেখো, কোনো-  
দিনও বলব না।

(कृष्णः)

श्री गणेशाय नमः

**क्र. ७७७**  
**नारायणी ३ सि. ७७७**  
**७७७ सि. ७७७ (७७७) ७७७**

1

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



# সাহিত্য সংস্কৃতি

## অভিনেত্রী জীবনের অভিশাপ

হিন্দী ছায়াছবির একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী ছিলেন মীনাকুমারী। অনেকগুলি সার্থকনামা ছায়াছবিতে তিনি যে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অপরূপ। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব-বাওয়ারা নামক চিত্রে সৌরীর ভূমিকায় অভিনয় করে মীনাকুমারী খ্যাতিলাভ করেন। তার শেষ ছবি 'পাকীলা'। এই ছবিটি সম্পূর্ণ হতে লেগেছে প্রায় বোম্বাই শহর এবং এই বোম্বাই শহরই চিত্রাভিনেত্রীর জীবনের ঘটনাবহুল বিরোধান্ত অব্যাহত।

বিশেষে অভিনেত্রীদের জীবন-কথা অনেক আছে। গ্রেটা গার্বো নিজেই লিখেছিলেন তার আত্মজীবনী। গ্রেটা ছিলেন সেকালের রহস্যময়ী চিত্রাভিনেত্রী। আই উইল ক্লাই টুমরো অভিনেত্রীর জীবনী হলেও তা সাহিত্যের ধর্মীপা দেখায়। বাংলা ভাষার একটি বিখ্যাত উল্লেখ্য আই উইল ক্লাই টুমরো'র জীবনী লেখকদের রচিত। এ উপন্যাসের চিত্রায়ণও হয়েছে। সুতরাং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীর জীবনোন্নিহিত পরম আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর কাহিনী। তার মধ্যে আছে বিবাহ-বিচ্ছেদের আনন্দ বেদনা এবং সামান্য মানসিক সূক্ষ্ম-দৃষ্টির বাস্তব স্পর্শ।

বিশেষ মেহতা কর্তৃক লিখিত মীনাকুমারী নামক জীবনীগ্রন্থ সম্প্রতি ইন্ডাজী নামক কোম্বাই শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং কলি বাহাদুর তা নিয়ে বথারীতি একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে

এই জনপ্রিয় জীবন কথার আলোচনা পরিবেশিত হল।

মীনাকুমারীদের দেশ ছোট্ট সাহেবের দেশ, সেই গ্রামটির নাম ভেরা। মীনার পিতা আলি বকস ছিলেন একজন হারমোনিয়াম-বাদক, এবং জীবিকার সম্বন্ধে এসেছিলেন বোম্বাই শহরে। সেখানে দাদারে কুকা কোম্পানীতে বাদকের কাজ পেলেন আলি বকস, আর পেলেন তার জীবন সঙ্গিনী প্রভাবতীকে। প্রভাবতী নাকি জনৈক বাঙালী খৃষ্টান নর্তকী এবং লেখকের মতে প্রভাবতীর জননী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। বালো বিধবা হয়েছিলেন, তার পর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মীরাতে যাত্রা করেন এবং সেইখানে জনৈক উর্দু কবি প্যারেল্লাল 'পাকীর' মীরাতীকে বিবাহ করেন। এঁদের দুটি কন্যার অন্যতমা হলেন এই প্রভাবতী—তিনি পরে আলি বকসকে বিবাহ করে ইকবাল বেগম হয়েছিলেন এবং মীনাকুমারীর মতে ছিলেন পরমাসুন্দরী। এইখানে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো পুত্রের কন্যা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। অতএব এই তথ্য ভুল। বাংলার বাইরে অনেক সময় যে কোনো বাঙালী রমণী ঠাকুর-বংশের রমণী এই পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রভাবতীর জননী হয়ত এই ধরনের কেউ হবেন কিংবা ঠাকুরবংশের দূর সম্পর্কের কেউ হবেন। রবীন্দ্রনাথের কেউ নয়। তবে আমরা

যদি বাঙালী তাঁরা সবাই তঁর রবীন্দ্রনাথের স্বজন, সেই হিসাবে প্রভাবতীর জননীকেও আমাদের আপন জন এই স্বীকৃতি দিতে হবে।

আলি বকসের তিন কন্যা, খরসীদ, মাহজবীন (মীনাকুমারী) এবং মালিকা। আলি বকস ঘোড়ার পুত্র সম্প্রদায়ের আশা করেছিলেন তাই মাহজবীনের জন্মের সময় তিনি কুর হন। তবে শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান হয়ে -চার্লসের মত মূখ্য এই মেয়ের নামকরণ করেন মাহজবীন। চন্দ্রমুখী হওয়ার চাঁদের নামে এই মেয়েটির নামকরণ করা হয়।

অতি অল্পবয়সে মীনাকুমারীকে তার পিতা আলি বকস একদিন প্রকাশ স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে শিশুর ভূমিকায় অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে দেন। স্টুডিওর কর্তা বিজয় ভাট এই শিশুঅভিনেত্রীকে নগদ পাঁচপ টাকা দেন। সেদিন থেকেই সন্দেহ হল মীনাকুমারীর অভিনেত্রীজীবন।

মীনাকুমারী নিজেই বলেছেন—

আমি প্রথম বৌদন করে গিছলাম আমি ভাবিনি যে, বালাজীকনের মধুরভাষা অবলম্বন ঘটিল। তেবেইছলাম দেবদাসী স্টুডিও বাব তার পর আমার সেই স্কুলে ফিরে যাব। অন্য সবার মত কিছ, শিশু কিছ, খেলাধুলা করব। কিন্তু তা আর হোল না।

একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন মীনাকুমারী, কিন্তু কিছুই হল না। লিঙ্গেরা কাছে পড়ানো হল না। বেটুকু শিখেছিলেন তা 'প্রাইভেট' পড়ালেখায় হল।

মীনা উদ্ভূত ভাষা জানতেন, এ ছাড়া ইংরাজী ও হিন্দিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। উদ্ভূত ভাষার লেখা মীনাকুমারীর অনেকগুলি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে।

যা কিছু বন্ধুসামান্য (শৈশব দিনের) তাঁরা স্কুলের সহপাঠী নন, এরা সবাই চুড়িচোরা-চব্বরে একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত নৃত্যক সন্দেশ এবং যেবী মমতাক (পরে মধুবালা) এই সৃজন মীনাকুমারীর বালাজীবনের সাথী।

তাঁর জীবনে যে মানুষ্যটির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কামাল আমরোহীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৩৮-এ। তখন বয়স তাঁর ছিল ছ'বছর। কামাল এসেছিলেন সোরাব মোদীর 'জেলার' ছবির জন্য একটা ছোট ভূমিকার অভিনয়ের জন্য আলি বকসের কাছে। পিতার আহ্বানে সেদিন কলা খেতে খেতে মীনাকুমারী দৌড়ে এসেছিলেন আগন্তুকের সামনে। মাহজবীন (মীনা) কিন্তু সেই যাত্রা নির্বাচিত হলেন না। তিনি বিজয় ভাটের 'এক হি দিল' ভাবতে ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন আর এই বিজয় ভাটই মাহজবীন নামটির বদলে 'বেবী মীনা' নামকরণ করেন।

যখন আঠারো বছর বয়স তখন কামাল আমরোহীর একটি ছবি এক ইংরাজী পত্রিকার প্রকাশিত হয়। তখন বাজারে গুরুত্ব 'মহাল' ছায়াছবির 'চিন্মাটকান' ও পরিচালক হিসাবে কামাল এক লাখ টাকা পেয়েছেন। অভিনেতা, বা চিত্র-পরিচালক কামাল মীনার চিত্র লয় করেন নি। মীনা আকৃষ্ট হল কামাল আমরোহীর লেখক সত্তার প্রতি। যে মানুষ্যটি তাঁর হৃদয় হরণ করবেন তার একটা সুস্পষ্ট ছবি ছিল মীনার মনে। তিনি চতুর হবেন বান্ধবমান হবেন। তিনি হবেন কবি, লেখক। মানুষ্যের বাহ্যিক আকৃতিটা কিছু নয়—তার সচেতন সংবেদনশীল মনটাই সব কিছু। মীনার চোরে কামাল ছিলেন পনের বছর বেশী বয়সের, তিনি তখনই বিবাহিত। তথাপি মীনা গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন এই কামাল আমরোহীর প্রতি।

কামাল আমরোহীর ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে মীনাকুমারীর চিত্তে বিদ্রোহময় লোলে গেল, তিনি বলেছেন :

I had a lightning flash before my eyes, bringing realisation with stunning shock which left me trembling sick with a strange apprehension. This was the man of my dreams, the ideal enshrined in my heart, I did not want to believe it. I tried to deceive myself—

রোমান্টিক মন মীনাকুমারীর। সে কেবল চিন্তা করে, এ কি স্বপ্ন। না মায়া। না মতি-ভ্রম। অন্তর থেকে কে গেরে ওঠে—সেই আমি এই আমি। তুমি যাকে খুঁজে বেড়াও আমি সেই জন।

এই কালে কামাল আমরোহী আনার কলি ছবির কাজে ব্যস্ত। মধুবালা নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন সব দ্বিচ্ছাসক, এমন

সময় যখন এল মধুবালা শেষ মধুভূত পরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি রাজী নন।

কামাল সেই সময় মনে মনে ভাবছেন কাকে নারিকার ভূমিকায় নেবেন। সেই রাতেই বান্দ্রার লোক পাঠালেন আলি বখসের বাড়ি। যদি মেজ মেরেকে কোনো-মতে এই ভূমিকা গ্রহণে রাজী করানো যায়। আলি বকসের কাছে প্রস্তাব পৌঁছাতে তিনি সহজেই রাজী হলেন। কামাল তখনই একজন প্রসিদ্ধ পরিচালকের খ্যাতি অর্জন করেছেন। মীনাকুমারীও খুশী।

আনার কলির কাজে যখন কামাল গম্ভীর হয়ে ঘুরছেন আগরা-দিল্লী তখন মধুবালা পাওয়া গেল মোটর দুখটনার মীনাকুমারী আহত হয়েছেন। মীনাকুমারী হাসপাতালে গভীর হতশায়া আছেন। সিনেমা অভিনেত্রীর স্বপ্ন যুঁকি সফল হল না। কি জানি কি আছে কপালে?

তারপর একদিন চোখ খুলেই মীনাকুমারী দেখল হাসপাতালের বিছানার পাশে কামাল আমরোহী দাঁড়িয়ে। মধুর কণ্ঠে কামাল জানতে চাইলেন—কেমন আছো এখন?

মীনাকুমারী বললেন—আমি তখন আমার নিজের গড়া স্বপ্নে। কে কি বলছে জানার প্রয়োজন নেই—কামাল আমরোহী দাঁড়িয়ে আছেন সামনে আমি তাতেই খুশী। যার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি, তিনি স্বয়ং এসেছেন আমাকে দেখতে।

এর পরই সরু হল প্রেমলীলা। বাজারে কানকানি ছড়ালো। কামাল আমরোহীর বয়স বেশী এবং বিবাহিত। মীনা কি 'দুস্মারি দিবা' হবেন? এদিকে কামাল

এক মীনার দৃষ্টির মধ্যে নিজস্বের বিবাহের প্রসঙ্গ কোনো আলোচনা নেই। সবাই ক'ছে বিয়ে হোক। তারপর একদিন বন্ধুজনের চেষ্টার ও আল্লাহ শির হল বিয়ে হয়ে দৃষ্টির।

১৯৫২-র ১৪ই ফেব্রুয়ারী আলি বকস মেরেদের নিয়ে ডাঃ জুসুসাওয়ার ক্লিনিকে গেছেন। তিনি এ্যাক্সিডেন্টের পর মীনাকে তার আহত হাতটির চিকিৎসার জন্য প্রতিদিনই এখন নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে। সেদিন মেরেদের রেখে আলি বকস তাঁর মোটর খোরাতেই মেরেয়া আর ক্লিনিকে গেল না। কাছাকাছি ছিলেন কামাল আমরোহী আর তাঁর সেক্রেটারী। চারজন মিলিত হয়ে একটি প্রকৃষ্ট ব্যইকে উঠলেন, তারপর মাহজবীন ও সইখদ আমীন হারদার (কামাল আমরোহীর আসল নাম) দুজনের সিরি এবং সন্নী উভয় হাতেই সাঁদ হয়ে গেল।

দুই বোন আবার ক্লিনিকে ফিরে এলেন। একটু পরেই আলি বকস গাড়ি নিয়ে ফিরলেন, মেরেদের ডুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত এনে চললেন—তখন কিন্তু তিনি কপনও করতে পারেন নি যে, তার একটি কন্যার বিয়ে হয়ে গেল এই মাত্র। সদ্য বিবাহিতাকে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন। এই জীবন নাটকের বাকী অংশ আগামী সপ্তাহে পরিবেশিত হবে।

—অজয়কর

M E E N A KUMARI — (BIO-GRAPHY): By VINOD MEHTA. Published by JAICO PUBLISHING HOUSE :: BOMBAY PRICE Rs. 5 only.

## সাহিত্যের খবর

### উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

ডক্টর শিশির চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হিসেবেই নয়, বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে চিনেছিল, কবিতার অনুবাদক ও সমালোচক হিসেবে। তাঁর শ্যামলা রঙ, দীর্ঘ শরীর এবং উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এককালে রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' কাব্যের কবিতাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে, তিনি অনেকের প্রশংসাজ্ঞান হয়েছিলেন। তরুণ কবিদের কবিতাও পড়তেন মনোযোগ দিয়ে। এবং যখনই যার কবিতা ভালো লাগত, তখনই অনুবাদ করে অন্য-ভাষীদের কাছে, তাঁর কবিতা পৌঁছে দিতেন। এই সেদিনও, স্নাতকতর কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তিনি, মূল্যের ধনি ও অর্থগৌরবকে অব্যাহত রেখে।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের কাছেও ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপক। পড়াশোনা করেছেন মিট ইনস্টিটিউশন, সেন্ট পলস কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৫ সালে লন্ডন যুনিভার্সিটিতে যোগ দেন, আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের টেকনিক নিয়ে গবেষণার জন্য। দু বছর পরে পি-এইচ-ডি হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিচয় এত অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল, বে-বইগুলি ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সে-বইগুলির নামই উল্লেখ করাছি : (১) অলডাস হাকসলি—এ স্টাডি; (২) দি নভেল অ্যাঙ্ক দি মডার্ন এপিক; (৩) জেমস জয়েস—এ স্টাডি ইন টেকনিক; (৪) দি টেকনিক অব দি মডার্ন ইংলিশ নভেল; (৫) প্রোবলেমস ইন মডার্ন ইংলিশ ফিকশন, এবং (৬) ভার্জিনিয়া উলফ। বাংলাদেশ সম্পর্কে, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ

স্বদেশে : মি বাথ' অব এ সেনা-এর  
সময় প্রবর্তন। কোরা' বিহার প্রদেশ  
স্বদেশে রিভিউর প্রাচীর তার  
কবিত্ব এখন রচিত হয়েছে।

### কলকাতার শ্রীমতী রূপ হালদে

আমন্ত্রণ জানান তাঁকে ভারত সরকার।  
একজন তিনি দুই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক  
বিনিময়ের কর্মসূচী অনুসারে। প্রথমেই  
উল্লেখ দিচ্ছি। ভারতের বরেন্দ্র জয়পুর,  
আগ্রা, বারাণসী, বোম্বে, কলকাতা। কল-  
কাতারও এসেছিলেন তিনি। জার্মান গণ-  
তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্যতম জনপ্রিয়  
লেখিকা রূপ হালদে।

১৯২০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি জন্ম-  
ছিলেন তিনি। প্রথম মহাবল্লভ শেখ হলে  
তার দু বছর আগেই। অর্থনৈতিক দল  
আর মন্ত্রণালয়িত তুলসি তখন জার্মানি।  
সেই সময়েই রুশের বাবা কেনেন একটি  
ছোট সোফা। যা লাভ হত তাতে কোন  
রকমে চালানো সম্ভব হয়েছিল রুশ আর  
তার বোনের মাধ্যমিক শিক্ষা। স্কুলের গান্ডি  
শেখ হবার পর রুশের বাবা বনেন মেয়ে  
ভাবিয়ে সম্পর্কে চিন্তিত সে সময়েই রূপ  
নিলেন এক অসুস্থ সিংহাস্ত।

এক বছর প্রাইভেট হাউসহোল্ডে  
কাটিয়ে মাধ্যমিকশিক্ষা ও ফিজিক্যাল কাজ  
নিলেন সেনাবাহিনীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা-  
ব্রহ্মক স্টেশন পানিবিভাগে-তে। তখন  
থেকেই আগে লেখার ইচ্ছে, লিখেও কেলে  
কিছু কিছু, কিছু ছাপান নি।

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা  
করেন একটা জার্মান-জাপানী ইউনি-  
ভার্সিটি টিচাস' হোমে। সে সময়েই  
জাপানী পদার্থবিদ সিন-ইটচিরো  
টোমোগার সম্পর্কে আসেন। করেক বছর  
বাদে ইনি পেরেছিলেন নোবেল পুরস্কার।  
নোবেল পুরস্কৃত এই বিজ্ঞানীর প্রভাব  
পড়েছিল রূপ হালদে'র উপর। তারই  
স্বীকৃতি হল ১৯৬৫তে প্রকাশিত লেখিকার  
'মনোনে ইয়. গেগেনভিউ' উপন্যাসটি।

রূপ হালদে পানি মিউজিতে বেশ কঠিন  
গাণিতিক হিসেব-নিকশের কাজে ছিলেন  
মন। নাবসী বাহিনীর সেই ভয়ঙ্কর অস্ত  
'এ-৪' প্রজেক্টের জন্য এয়ারোডায়নামিক  
হিসেব-নিকশ করতেন তিনি। এই সমস-  
কার অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখেন 'ইনজেল  
ওনে লস্টেক্সার'। বেরোর ১৯৫৯-এ।  
'আমি ক্যাসিওরো প্রতিক্রিয়ার কোনা  
মামে আর লক্ষ্য বন্ধে পারিনি আগে।'  
জালান' হিসেব-কাজ। পরে অবশ্য বুঝে-  
ছিলেন তিনি। তবু ব্যক্তিগত সবসময়েই  
আজা-নিরাশার স্বপ্নে ছিলেন দোদুল্য-  
মান। মানসিকতার দিক থেকে একসময়  
ছিলেন নাবসী'দের একান্ত কাছে। সময়ের  
পট-পরিবর্তনে কত-বিষতও কম হননি।  
অন্যভাবে ছিল বেদনাও। এক সময় রেড  
'ফ্রান্স'ও হুখোমিথ পড়েছিলেন রূপ।  
পরিণতিত ভাবিয়ে ও নিত্যন্তই ব্যক্তিগত  
অপরোধে তার কোন কোন গল্পের  
ছিল বিবরণত। আবার স্বাধীনতার

কথাও লেখেন কখনো-কখনো ছাপ।  
একই বিষয় নিয়ে ১৯৭৩-এ  
লেখেন 'গেগেনভিউ' নিয়ে উপন্যাস।  
১৯৪৫-এ ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ আধিকৃত  
অঞ্চলে। পরে পার, হলেন সীমানা। এলেন  
সোভিয়েত অঞ্চলে। ১৯৪৬ সালে থেকেই  
রীল্যান্স লেখিকা। লিখেতে শুরু করেন  
বিশেষভাবে বেতার নাটক। মানবতাবাদী  
খণ্ডিই ছিল এসব রচনার মূলে। শব্দ  
উপন্যাস নয়, গল্প, কবিতা, গীত-সাহিত্য  
সবদিকেই রয়েছে তার প্রতিভার স্বাক্ষর।

এই জনপ্রিয় জার্মান লেখিকাকে গত  
২০শে জানুয়ারি সম্বন্ধনা জানালেন ভারত-  
গণতান্ত্রিক জার্মান সাহিত্য সমিতি।  
'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তরে সেদিন উপস্থিত  
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভরুণ ও অনতি-  
ভরুণ কবি-গণনাট্যিক বুদ্ধিমতীরা। রূপ  
হালদে'র প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরেন  
কলকাতার মি ডি আর দত্তাবাসের 'ভাইস-  
কমন্স মি এইচ ডি হিমার। লেখিকাও  
বললেন তার নিজের কথা। মেলে ধরলেন  
সাহিত্য সম্পর্কে তার ভাবনাচিন্তা।  
জানালেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অসীম প্রাণের  
কাহিনী। একে একে উত্তর দিলেন উপস্থিত  
সাহিত্যিকদের প্রশ্নগুলি। অনুদানে সভা-  
পতিত করেন কবি ভরুণ সান্যাল।

গণতান্ত্রিক জার্মানির এই লেখিকাকে  
আরেকটি অনুদানে সম্বন্ধনা জানান সব  
ভারতীয় কবি-সম্মেলন। ১০ হিল্লুখান  
রোডে আরোজিত ২৪ জানুয়ারি এই সভায়  
পোমোহিত্য করেন সভাপতিত্ব গহ।

দুদিনের এই ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার  
বীরাংশ নেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন  
অমলাশঙ্কর রায়, মণীন্দ্র রায়, সুধীরজ্ঞান  
মুখোপাধ্যায়, অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণাভ  
দাশগুপ্ত, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, শান্তকুমার  
ছোঁ, আশীশ সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-  
পাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, লীলা রায়,  
হরেন চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, ধনঞ্জয় দাশ  
প্রমুখ।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

কয়েকদিন আগে ভারত ঘুরে গেলেন  
কবি উইলিয়াম স্ট্যাফোর্ড। এসেছিলেন তিনি  
রবীন্দ্রনাথের দেশ দেখতে, ভারতীয় কবি-  
সাহিত্যিকদের সাম্প্রতিক ভাবনা-চিন্তার  
পরিচয় নিতে। উইলিয়াম স্ট্যাফোর্ড প্রমণ  
করলেন দিল্লি, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ,  
বাংলালোর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত সম্মানিত  
লেখক স্ট্যাফোর্ড এ পূর্বন্ত পেয়েছেন  
একাধিক পুরস্কার। ১৯৬২-তেই পান তার  
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ট্রাভেলিং থ্রু দ্য ডার্ক'-  
এর জন্য ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড। অন্যান্য  
কয়েকজন আমেরিকান কবির সঙ্গো মিলে  
একসময় ভ্রমণ করেন গালিফের গজল,  
উদ-থেকে। মি স্ট্যাফোর্ড জন্মেছিলেন  
১৯১৪ সালে কানসাসে। বর্তমানে তিনি  
শোর্টল্যান্ডের লুই অ্যান্ড-ক্রাক কলেজের  
ইংরেজ সাহিত্যের আবাসিক অধ্যাপক।

### শ্রীমতী রূপ হালদে

বরষের তুলনায় নিরসন্দেহেই কাজটি  
গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, একজন ভরুণ লেখকের  
পক্ষে এমনতরো দায়িত্ব পালন হেলাফেলার  
নয়। কেননা এই জানুয়ারির ২২ তারিখেই  
পা দিলেন তিনি সুরে তেঁতিলে। অথচ এর  
মধ্যে এক ডাক্তার তার নাম আজ পরিচিত  
চেকোস্লোভাকিয়ার মানবজনের কাছে।

লেখকের নাম পিটার জারোস। মাত্র  
কিছুকাল আগেই রাষ্ট্রশাস্ত্রের শেখ হয়ে  
তার ফিলজফিক্যাল ফ্যাকাল্টির পড়াশোনা।  
এখন কাজ করছেন 'সংসদিক' হিসেবে  
চেকোস্লোভাকিয়ার বেতারে।

পিটার জারোস' হলেন স্লোভাকের  
ভরুণ গল্প-লেখকদের মধ্যে অন্যতম শি-  
খালী এবং জনপ্রিয়। বরষা বনন তার মাত্র  
তৈশ তখনই বেরোর তার 'আলোককরকারী'  
ছোট গল্প 'সড়কে বিচ্ছিন্ন'। গল্পটিতে ভরুণ  
মানসিকতার এক সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন  
লেখক। বর্ষ-মনের নানামুখী ভাবনা-  
চিন্তার জাল বিস্তার করেছেন অপরূপ  
গীড়াল গদ্যে। ভরুণের টেনিসনে ভরা মন-  
শীল এই গল্প প্রকাশের পরই সাড়া পড়ে  
হার পিটার জারোসকে নিয়ে। সেই থেকে  
প্রায় প্রতি বছরই বেরুচ্ছে একটি করে তার  
গল্প-সংকলন কিংবা উপন্যাস। ১৯৬৪-তে  
বেরুলো 'নিজেকে বানাও মহাসাগর'। পরের  
বছরই প্রকাশিত হল 'হরার'। এই উপ-  
ন্যাসটি শব্দ পাঠকদেরই নয় সমালোচক-  
দেরও চমকে দেয়। ১৯৬৬-৬৭তে বেরো  
যথাক্রমে 'স্কেলস' এবং 'জার্মি'।  
'টমোভাভিগিটি'। পরের বছর বেরুলো  
'মিনিউট'। এই গ্রন্থে 'উন্মোচিত' হল  
লেখকের প্রতিভার নতুন দিগন্ত। জন্মভূমির  
কথা, সেখানকার মানবের ছেলোবোর  
দিনগুলি রাতগুলি, আর কিংবদন্তীর  
কাহিনী-সব কিছু মিলে দিয়ে গল্প  
ছানলেন নতুন স্বাদ। একই বছরে প্রকাশিত  
হয় 'মর্ত' নিয়ে ফিরে আসা'। ১৯৭০-এ  
বেরুলো 'রক্তের দাগ'। এই গল্প-সংকলন  
লেখককে এনে দিল নতুন সম্মান। পেলে  
পুরস্কার। দিলেন স্লোভাক রাইটর  
পাবলিশিং হাউস।

## নতুন বই

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবনবী (প্রথম খণ্ড :  
উপন্যাস) : গোপীমোহন সিংহরায়  
ভারত : ১০।১ বঙ্কিম চ্যাট্টো  
স্ট্রিট, কলকাতা-২২। আঠারো টাকা।  
পাঠ খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরিত্র-  
ভিধান ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশের সংকল্প  
নিয়ে শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় এই  
প্রথম খণ্ডে 'প্রাচীনকালিক সর্চি'-সমগ্রে  
মোট ৩৪৪-পৃষ্ঠার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-  
গুলির জনপ্রিয়-পরিচিতি দিয়েছেন বিশদ-  
আলোচনায়।

লেখকের জন্মভূমি হলে, বইখানির 'পূর্বা-  
ভাষা' অর্থে একথা জানিলো, হয়েছে।  
লেখকের নিজের কথা—'আমার প্রচুর  
আত্মজীবনী-লেখ আছে যেন তারা (চরিত্রগুলি)  
একেবারে জীবনরসিক। না হলে পড়ে—  
সেদিকে তিনি নজর রেখেছেন। তিনি 'আবো  
জানিয়েছেন—প্রায় দু' হাজারের মতো  
চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাদের  
ব্যক্তিগত ও রূপবৈচিত্র্যের কথা চিন্তা  
করলে তাঁকে মনোব্যতিক্রমের মহাকাবি বলাই  
সমীচীন হয়।'

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই পরি-  
চ্ছন্ন—বিশেষভাবে এই ধরনের বইয়ের (বা  
বহুদিন বহু পাঠক-লেখক-গবেষকের নিত্য-  
ব্যবহারের সামগ্রী হয়ে থাকবে—) পক্ষে  
যে আদর্শ রক্ষা করা উচিত, এতে তা  
আছে। তবে চরিত্রভিধানের চরিত্রগুলির  
পরিচিতি অনেক ক্ষেত্রেই একটু বেশি  
বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে হতে পারে।  
মূল বইয়ে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ  
চরিত্রের অবস্থানসূচক খরিয়ে দেবার  
চেষ্টাটুকুই যথেষ্ট। শ্রীযুক্ত সিংহরায় কিন্তু  
সেই সীমারেখাতে নিজের 'প্রবল' আত্ম-  
রঞ্জননি। নৌকাডুবির 'অক্ষয়', প্রজাপতির  
'নবম্বের অক্ষয়' মনোজ্ঞ, চার অধ্যায়ের  
'জ্যোতি', চতুর্থের 'সামিনী', যোগাযোগ-  
এর 'বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায়', চোখের বাঁধার  
'বিনোদিনী', 'মহেন্দ্র' এবং এইরকম বিভিন্ন  
চরিত্রের প্রসঙ্গে প্রায় পুরো কাহিনীই  
তাঁকে সংক্ষেপিত করতে হয়েছে। এরকম  
ঘটা অব্যাহত নয়—'গোরা'র 'মনোরঞ্জন'  
একটি নাম মাত্র—এক চিত্রেই তার পরিচিতি  
পরিবেশনযোগ্য, কিন্তু নায়ক স্বরূপ 'গোরা'  
তো স্বভাবতই বেশি জায়গা দাবি করবে।  
তবে, সেক্ষেত্রে আট-নয় পৃষ্ঠার ব্যাপ্তি  
অতিব্যাপ্তি বই কি।

লেখকের অধ্যবসায় অপরিমিত।  
রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর এই কাজটি  
যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।  
হৃদয়প্রসাদ মিত্র

স্বামিজীর পুণ্যপ্রসঙ্গে (জীবনী) : স্বামী  
অজ্ঞানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপুঠি,  
বেলুড় মঠ। দশ টাকা।

যোড়শ শতকে খ্রীষ্টাব্দের জীবনী  
রচিত হওয়ার আগে যখন যখন তাঁর  
অনুসারী প্রধান ভক্তদের জীবনী রচিত  
হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেই জীবনী-  
সাহিত্যধারার অনুসরণ দেখা যায়, উনিশ  
শতকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত  
লিখিত হওয়ার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন  
শিষ্যের জীবন ও বিরাট সত্তার বিস্তৃত  
পরিচয় দিয়ে বর্তমান সংস্করণটি বিবেকা-  
নন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ হিসেবে  
প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয়  
সংস্করণ। প্রায় বছর তিনেক আগে প্রথম  
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের  
বৈশিষ্ট্য হল—এই সংস্করণের প্রতিটি  
জীবনী লেখক কর্তৃক পুনঃসম্পাদিত ও  
অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। মোট  
তেরোজন শিষ্যের জীবনকাহিনী বর্ণিত

হয়েছে। স্বামী জ্ঞানানন্দ, বিজয়নন্দ,  
বিহারীন্দ্র, অরুণচন্দ্র, আশ্বিনন্দ, শ্রী-  
মতি, সুরমাসিং, ইত্যাদি জীবনচরিত্রগুলি  
লিখক সত্তা ও আত্মজীবনী সত্তা রচনা  
হয়েছে। শ্রীমদ্রক্ত, অরুণচন্দ্রের অধ্যাপক  
শ্রীমতী স্বামী, মহাবিশ্বকর্মে লিপিত ভূমিকা  
অংশটি, অজ্ঞানন্দ রচনা। কয়েকটি  
দলপ্রাপ্ত ফটো এ গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ।  
স্বামিজীর রচনাশৈলী এবং সকলেই প্রণয়।  
প্রকাশের আভ্যন্তরীণ থাকলেও তাঁদের  
প্রত্যেকের চরিত্রেই স্বামিজীর দিব্যপ্রকাশ  
আছে। বর্তমান সংস্করণে তাঁদের নিবন্ধন  
করেছেন আলোচ্য হিসেবে—তাঁরা প্রত্যেকেই  
প্রত্যক্ষভাবে শ্রীমদ্রক্ত-বিবেকানন্দের ভাবা-  
দোলানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই উনিশ  
শতকের বহিষ্ঠ ভূমিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকা-  
নন্দকে নিয়ে যে বিরাট ধর্মাবলোম দেখা  
দেয়, তার গবেষণার বর্তমান গ্রন্থ অনেক  
নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও অন্যান্য বিবরণের সম্বাদ  
পায়নি। এ গ্রন্থ শুধুমাত্র বিশেষ ভক্তদের  
কাছেই প্রিয় নয়, সাধারণ ধর্মজিজ্ঞাসু  
শ্রদ্ধাধারীদের কাছেও এ গ্রন্থের সমান আকর্ষণ  
আছে। সর্বোপরি, লেখক স্বামী অজ্ঞান-  
নন্দের ভাষা, গীতা ও আলোচনাতীর্থে অত্যন্ত  
সরল ও সার্বজনীন হওয়ার পাঠকদের পাঠ  
সহজসাধ্য হবে।

জলের আলপনা। কাব্য সংকলন : বিজয়নন্দ  
দত্ত। কবিতা পরিষদ, ৬০।২।৮, সেক-  
রোড, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

বিজয়কুমার দত্ত জলের আলপনা'র  
কবিতাগুলিতে প্রেমের কথার অকপট,  
প্রাণের সূক্ষ্ম চেতনায় অতলসারী। 'ভাঙ্গ-  
নাসার অনুভবে কবি বলেন—'চিরন্তনী  
প্রেমিকার পারে মাথা রেখে/সকাল সন্ধ্যায়  
শান্ত দপ্পরের গুন অবসরে/আমি একা  
চিহ্নহীন খেঁচন মাস্টার।' (বয়স)।  
আবার স্মৃতি-অনুভবে সূক্ষ্মতার বসে  
উঠছেন—'কি যেন কখনো ছিল/আজ নেই,  
ওজন ডাবনার/পায় পায় ধানিত নুপুং  
(শেষ সম্বল)/স্মৃতির সঙ্গে মগতভাষণ'  
কবির হৃদয়-অনুভব পবিত্র, আলোর-ধোয়া  
পরিচ্ছন্ন—'মনে পড়ে, কবি সঙ্গে ঘনিষ্ঠ  
সংলাপে/সমস্ত পৃথিবীর, 'হাজার স্মৃতি'  
আলো/জ্বলছিল চোখের শিরায়।' (মনে  
পড়ে) আলোচ্য কবির 'কবিতা রোমান্টিক  
অনুভাবনা মনোবাসী, চিরকল্পগুলি চার-  
পাচ-এর দশকের বহু কবির শব্দ অভিজ্ঞতা  
স্বরূপ করায়। তবে কবির প্রেম-অনুভবে  
স্বাভাব্য আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই  
গদ্যায়ক, তাই কোন কোন কবিতায় অস্বাভাবিক  
শব্দভাষ্যকর হয়নি। কবি ছন্দের কোন  
সতর্কতা কবি-ভাবনা যেতে 'সবলসংস্কার'  
আজমোখীন, তাই শব্দ ছন্দ, চিত্রকল্প-  
ব্যবহার বাজনাযক।

খ্রীষ্টাব্দের-লীলাবর্ত (পূর্ববর্তী) : সুরেন্দ্র-  
মোহন শাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান : মহেন্দ্র  
লাইব্রেরী, ২।৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,  
কলকাতা-৯। দাম : আট টাকা।

নৈতিক শক্তির উদ্বোধনে : রম্যগের  
বঙ্গবাসী মহাপ্রভু খ্রীষ্টাব্দেরকে পেরেছিল,

বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে।  
তিনি ছিলেন মনবত্বের ও আধ্যাত্ম-  
কতারও একমাত্র প্রেরণাক্ষর।

তাঁর মহাপ্রভুর পুত্র তাঁর জীবনকে  
কেন্দ্র করে অনেকে অসংখ্য কাব্য রচনা  
করেছেন এবং ভক্তের আকুলতা নিয়ে  
বেকবীর ভাবাদর্শ ও আধ্যাত্মদর্শনের  
পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। দীর্ঘ কয়েক  
শতাব্দীর ব্যবধানেও, সেইসব আশ্চর্য  
গ্রন্থের এতটুকু অবলোম্বন ঘটেনি।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, শ্রীযুক্ত  
সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, মহাপ্রভুর মতো  
বিশাল ও গম্ভীর, খ্রীষ্টীয়তন্য মহাপ্রভুর  
অপূর্ণ লীলারিণি বর্ণনা করেছেন, মিত্র ও  
অমিত্র পরায়ে। প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সরল।  
আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি প্রত্যেক ভক্ত  
ও রূপীগণকে পাঠকের কাছে, সংগ্রহযোগ্য  
বলে বিবেচিত হবে।

### সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর। বিশেষ শব্দ। সংখ্যা ৫৪। বর্ষ।  
সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২,  
টেমার সেন, কলিকাতা-৯। দাম—  
১ টাকা।

আধুনিক কবিতা নিয়ে যেসব পত্র-  
পত্রিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে কণ্ঠস্বর  
তাঁদের মধ্যে একটি। এ পত্রিকাটি শুধু  
তরুণ কবিদের অগ্রপুত্রই নয়, আধুনিক  
কবিতা আন্দোলনেরও একটি বিশেষ দলিল।  
এ সংখ্যার প্রায় পঞ্চাশজন তরুণ কবি  
কবিতা লিখেছেন এবং এসব কবিতার  
খ্যাতি নতুন। এছাড়া আছে কয়েকটি  
প্রবন্ধ।

কবিতার নতুন ছন্দ, আল্পক, বিবরণ-  
বস্তু নিয়ে কয়েকটি কবিতা কিছুটা রীতি  
ভাঙার রীতিতে লেখা হয়েছে। বিশেষ  
করে চন্দ্রনীল, ভট্টাচার্য চন্দন, স্বামী  
লাহিড়ি, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও গণেশ সেনের  
কবিতা উল্লেখযোগ্য।

চাষবাস। প্রথম সংখ্যা। প্রথম বর্ষ।  
সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২,  
টেমার সেন, কলিকাতা-৯। দাম—  
৫০ পয়সা।

চাষবাসের ভাল পত্রিকার খুবই অভাব।  
অধিক দক্ষ পাওয়ার জন্য চাষীরা আগ্রহী।  
কিন্তু মাটি, সার প্রয়োগ, বাঁজের ব্যবহার,  
কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে চাষী-  
দের নানা প্রশ্ন। এ পত্রিকাটি চাষীদের  
সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে  
অতি সহজ বাংলায় সহজ ভাবে। চাষীরা  
কীভাবে পুষ্টি পাবেন, কোথায় দ্রব্যাদি  
বরাদ্দ হবে, কীটনাশক, সার প্রয়োগের উপ-  
কয়েকটি ভাল লেখা ছাড়াও আছে এ  
গানের কৃষি পঞ্জী, অধিক ফলশালী গম  
চাষ, বোরো ধান চাষ, আলু ও শাকসবজি  
চাষের উপর ভাল প্রবন্ধ। উৎসাহী চাষীদের  
এ পত্রিকাটি খুবই কাজে আসবে। পত্রিকাটি  
বহু পরিচ্ছন্ন ও সুপরিচ্ছন্ন। মূল্যে  
প্রধানমন্ত্রীর চাষ করার ছবিটি চমৎকার।



# বনমালিপুরের মাঠ

হেমচন্দ্র  
ঘোষ

দাঁঠাকুর মোরা আর নীল বোনবো না!  
নীলকুটির দেওমান বনমালির মনের  
উপর দৃষ্টি রেখে করিম কথাগুলো। এক  
নিশ্বাসে বলে ফেললো। তার চোখের দৃষ্টি  
কঠোর অথচ ভয়বিহীন।

বনমালি খেঁকিয়ে উঠলো।

—অথবা গোলমাল কোরো না—কবিব্র।  
সাইয়েদের সঙ্গে লড়াই করবে তোমরা!  
হুঁ-হুঁ-হুঁ তো খেঁকি, গোলমাল বাধলে  
যেটা ভাল সেটাও থাকে।

—হুঁ-হুঁ কি করবো! পাড়ার সবাই  
মোড়ে মোড়ল বানিয়েছে তাদের কথাটা তো  
মানতে হবে!

করমালির কথাই হেমচন্দ্র পাঠে দাঁড়িয়ে—

করিমের দিকে ফিরে বললেন—এখানে  
আসার পর থেকেই তোমার সঙ্গে চেনা-  
জানা অনেক উপকার করেছে—আমরাও  
বিজয় কম করিনি। বনি তোমার ছিলোটা  
কি! ওইতো শব্দ ভিটেটুকু—আর এখন  
তুমি একজন বড় জোতদার। কার দয়ায়?

স্বামীর দিকে আঙুল দীর্ঘায় ত্রিম  
বলেন—ই-ই-ই তো তোমায় বড় করেছেন—  
মানতে চাও না, চাও না?

করিম মাথা খেঁট করে রইল—একটু  
খেম-খীর কষ্টে বলল—মানবো না! সব  
মানছি মাতান। একটা কথা—দেশের সবনাশ  
ভেকে এনেছে এই নীল চাষ! জানু দিয়ে  
সেটা বুঝতে হবে।

বনমালি বিরক্ত হয়ে বলল—তবে দাদু  
নেও কেন?

একটা শব্দ উত্তর করিমের  
ঠোঁটের আগায় এলো কিন্তু সে নিজে  
সামলে নিয়ে বলল—দাঁঠাকুর! দাশনৈব  
কথাটা কি তোমার অজানা আছে! কারকুণ  
মশাই দশট টাকা দেবে লিখবে বিশ! যে  
ক্ষেত্রে দশট ইয় না সেখানে দিতে হবে  
পাঁচ মণ—না দেও সে আমি কোম্পানীর  
খাতায় খাম হয়ে গেল।

বনমালি রেগে উঠল—চিৎকার করে  
বলল—কে বলে—কোন শয়তান! নামটা

একবার শুন, দেখিয়ে দি তাকে।

এবার করিমের পর্ব দৃঢ়—তুমি জান না।  
কোনটা তোমার অজানা দাঁঠাকুর! দেশের  
মোরা চাষী, মৈদের কত আশা—তুমি মেগের  
নোক মোদের বাঁচাবে!

—আমি কিছই করিনি। বেইমানের  
দল। আমি না থাকিলে, গাটা তো এতদিনে  
উজোড় হয়ে যেতো। ভাটরা-ইচ্ছেপূর আর  
আছে নাকি! সেখানে শকুন চরছে।

—মোদেরও না-হুঁ তাই হতো—মোরা  
না হয় সব করবে যেতুম। সাইয়েরা কখন  
খুঁড়ে হাড় তুলে কারে লাগান—মোদের  
হাড়ও না-হুঁ তাদের কারে লাগিতো!

বনমালি অন্যটা ভাব করে বলল—কি,



দেখিঃ সাহেবদের সঙ্গে লড়ার মতলব।  
এখন চিন্তা করার সময় আছে।

করিম এয়ার হেসে ফেলল।

মোরা কি আর মানদুব দাঠাকুর।

দহাত চিং করে বলল-গ্যাথো না-  
দাঠাকুর। আজ্ঞালাগলোর গাথে মোটে কড়া  
পড়েছে-লড় জামড়ো-টিপলে বাথা বিব।  
লড়ার কথা বলছে-লড়ার লোক আছে।

—এই জেলার—এই বারাসতে।

—না গো-না।

করিমের চোখদুটো উন্মুল হতে উঠল।

—লড়বে যশোরের শিশির ঘোষ।

সাহেবদের সাত ঘাটের জল খাইরে দেবে।

বনমালির মূখে একটু হাসি ফুটলো—  
জাম্বালাভুর বলল—ওঃ, শিশির ঘোষ।  
এক ফু—ঠেটিদুটো উঠ করে বনমালি একটা  
ফু দিল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে  
বলল—ওসব মতলব উতলব ছাড়ো—যেমন  
চলছে সেই ভাবে চলো—সইলে বিপদ, মহা  
বিপদ।

—শিকরগাহার কোন খবর রাখো দা-  
ঠাকুর।

ভেংচি কেটে বনমালি বলল—রাখি-  
রাখি—সব রাখি। বশটা ছোড়া নিয়ে শিশির  
ঘোষ মিটিং করল—মেকোজ সাহেবের  
জেঠেলরা বোম্ব অমনি দৌড়।

—দাঠাকুর। ভূমি তালে জানো না—

ভুল শুনছো! মাই সেখানে ছিলুম আরে  
লোক—খালি মাথার সমুদ্রের—হাজারে  
হাজারে লাঞ্ছনাখে। সাহেবের লোকেরা  
তির সীমানায় এলো না—সাহসই করল না।  
সিঁমিবাবু বলল—ভাইসব। নীল তো ভোমরা  
বনকেই না—দাদনও নেবে না। মোরা হৈ  
হৈ করে উঠলুম—নীল মোরা বোনবো না—  
দাদন। নেবোই না—জান থাকতে না।  
দাঠাকুর। ভূমি ঐ সাহেবটার কথা বললে—  
ও যেটা এক মহা শরতান। চাষীর ভাল  
ভাল অল্পবয়সের মেয়েগুলোকে কুঠিতে এনে  
বন্দী করে রেখেছে। কেউ বলে পঁচিশটা—  
কেউ বলে পাঁচশো। কথাটা উঠতিই সব  
লাঠি নিয়ে ছুটল। কুঠির সামনে ঠকাঠক  
লাঠি। একটা পেরাদা এল—বলল সাহেব  
তো নেই।

করিম হেসে উঠল।

—দাঠাকুর। সাহেব তখন যশোরে—  
পলাতক।

বনমালি কিছুকণ চুপ করে  
রইল—তারপর কৌচকানো মূখখানার  
কালো কালো শিরগুলো মোটা  
মোটা হয়ে উঠেছে—করিমের দিক  
থেকে মূখখানা সরিয়ে নিয়ে গাম্ভীর্যের  
ভাব দেখিয়ে চুপ করে রইল—তার লম্বা  
লম্বা হাটদুটো নাচাতে সুরু করে দিল।

চাটুকা-গামীর সুর নরম, বললেন—  
বাপু, আমার ব্যাপারীর আবার আহাজের  
খবর কেন? হাঙ্গামা-হুজুদুর দিকে খেও  
না, করিম—ওসব কাজে মাথা না দেওয়াই  
ভাল। তোমাকে ছেলের মতো দেখি।  
দাঠাকুর তো তোমারে কোন অভাব  
রাখেননি।

—ঠিক, খুব ঠিক রাখান। কিন্তু সেরার  
তো আর পথ নেই। সেদিন শকুন্তলবার—  
জুজার নামাজ হলো—কসম নিলেন, নীল  
আর বোনবো না—জান গেলো না।

বেঙ্গল ইন্ডিয়া কনসার্ন। সারা বাংলার  
প্রমুখ প্রতিষ্ঠান। চাবিশ পরগনার উত্তরে  
একটা নাতি-বৃহৎ জেলা—বারাসত।  
কলকাতার কাছে। বিলেতের দুর্গ ছেলের  
থরে এনে এখানে মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়ার  
জন্যে ইংরেজরা ক্যাডেট কোর কলেজ করল  
—স্যান্ড হাস্টি অফ বেঙ্গল পাবলিক বা  
নোকোপথে কলকাতা ছিল—সহজসমা, যোগা-  
যোগের সুযোগ ছিল প্রচুর। সার এন্ড্রাহাম  
রবার্টস লর্ড রবার্টসের বাবা। তিনি  
ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল, কিন্তু ছেলে-  
গুলো ছিল আরক্তের বাহিরে। ভারত সরকার  
উঠিয়ে দিলেন কলেজ। সারা ইউরোপে তখন  
নীল চাষের সাজা পড়ে গেছে। বাংলা হচ্ছে  
উপবৃত্ত কেন্দ্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন জামে  
নীল কুঠি উঠলো। সাহেবরা নবাবী কৈতোর  
বাস করার সুযোগ করে নিল। বারাসত  
জেলার গুরুত্ব তখন বেড়ে গেছে। সাহেব  
সিভিলিয়ান জেলার কর্তা—ভাগলপুর আর  
বরিশালের মতো বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের  
বাংসরিক বারো হাজার টাকার বদলে  
আঠার হাজার টাকার মাইনে ঠিক করা হল।  
বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্যে বড়লাটের  
দরবারেও ভাবির চলল। বারাসত ছিল  
পল্যাম্প স্টেশন। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটরা  
নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হুন্ডা রেখেই  
চলতেন। চলত খানাপিনা, চলত অনেক রাত  
পর্যন্ত বাজীর নাচ আর বিলাতি সরাব।  
অপবরসী অববাহিত ম্যাজিস্ট্রেটরা নীল-  
কুঠিতে সবেই রাত কাটাতো। এর দক্ষিণা?  
কনসার্নের দুর্গ লোকদের অপরাধ মাপ  
করা। বেঙ্গল ইন্ডিয়া কনসার্নের প্রধান  
আফিস নবাবীর মূলনাথে। দ্বিতীয়  
আফিস বারাসতে। জেনারেল ম্যান্ডেয়ার  
সারম্বর বারাসতটাকে বেশী পছন্দ করত।  
মূলনাথের চাষীগুলো আদব-কারদা জানতো  
না—যেন খাজা-খাজা। কলকাতার কাছেই  
বারাসতে লোকগুলোও ভাল। নিতান্ত  
কাজের গতিক ছাড়া সারম্বর বারাসত ছেড়ে  
গাকতো না। নীলকর সাহেবদের বারাসতের  
বাড়ী প্রকাণ্ড—গাথিক স্টাইলের। চারপাশে  
প্রচুর জমি, ফুলের বাগান, দিশিবিলাতী  
ফুলের মেলা। ডলির কথার সাহেব গোটা-  
কতক জবা গাছ বসিয়েছে। রোজ সকালে  
বেমারা ডলির মার জন্যে ফুলগুলো পৌঁছে  
দেয়। তিতুমীরের উপদ্রব একসময়ে থল  
ছিল। কুঠির পিছনটা সুরক্ষিত করার জন্যে  
লম্বা বেড়বাঁশের সারি বসানো। নারকেল-  
বেড়ের বাঁশের কোলা লড় বোঁটক্ক মরং  
কবে দেন। নিষ্ঠুর ওয়াহিবরা ছুরডগা  
তবুও তাদের মধ্যে দু-চারজন জড়িয়ে  
লুকিয়ে দল পাকার—সদ্বিবামত নীলকুঠি  
লুট করে—জলাহার পাথকদের সবস্ব কেড়ে  
নেয়। বম্বা নবীর ওপর তাদের  
উপদ্রবটা ছিল বেশি রকমের।  
নতুন রোগ মাদারিয়ার বাংলার  
ল্যাম্বা কুর হতে চলছে—সম্পদ

অলকো উঠে বসে তবু বাঙালী-বাঙালী—  
সে তাঁর মর্দাদা হারাননি। বোশেবে বনলেন।  
চারের সুযোগ এসে ফেল। চাষীর ভোড়-  
ভোড় বাসন্ত হয়ে উঠলো। সে বছর  
বোশেবের গোড়াকোই বর্ষা শুরু হয়ে গেলো।  
কালো জমিট মেঘের সংবেদ প্রাকৃতিক  
বিপদর ঘটিলে দিল। প্রচণ্ড বড় সঙ্গে  
প্রবল বর্ষা একযোগে বরার বকটকে বেন  
ভেঙে চুরমার করে দিল। লোকজন বার  
হচ্ছে না—মেটে রাস্তার হাটুড় কাটার শব্দ  
প্রয়োজনের তাগিদে দু'একজনকে বেরুতে  
হচ্ছে। সারম্বর দোতলার দক্ষিণ ধারায়  
এলো। একটা ইঞ্জিনেরা হেঁটোকে এলিয়ে  
দিয়ে তাকিয়ে রইল চলল মেঘের দিকে—  
খুসর বরণ মেঘগুলো কেন একের পর  
এক ছুটে চলছে দৃষ্টির বাহিরে—আবার  
কপেকের সংবেদ দায়িনীর হৃৎকরে  
কপিঁরে দিচ্ছে ধরিদার বুকখানা। সারম্বর  
বেশ ভাল লাগছিল। সারম্বর কাউন্স-  
গুলোর মাথা কড়ো হাওয়ার নইরে পড়ছে—  
বাবুই পাখীর বাসগুলো দলেছে মোকদ্দার  
মতো। প্রাকৃতিক মাধুর্য সে উৎকর্ষ হয়ে  
উঠলো।

—ডলি।

ডলি সারম্বের খব পির। বাজী  
হলেও তাকে সে একেবারে আপনজন করে  
নিরেছিল। ডলি এসে গাড়া সাহেবের  
পিছনে—সাহেবের কাঁটা ছুঁয়ে। হুকো-  
বরদার গড়গড়া রেখে গেছে—কম্বরী  
ডামাকের গণ্ডে জারগাটা তরঙ্গের হয়ে  
উঠেছে। আমাকে নিভোর সাহেবের উৎকর্ষ  
নয়নদুটো ভরিয়ে তুলল শব্দেদের  
হবিগলো।

ডলি। ইউ সি! এটা ঠিক কেন ছোম  
ওরদার! স্কটল্যান্ডের কোলে টিলার পর  
টিলে খোঁচাতে মেঘের আবরণ নিয়ে মিলে  
গেছে দৃষ্টির অন্তরালে। কি সুন্দর!  
সারম্বর চোখের পাতাদুটো বন্ধ করলো।

—ডলি। মাই ডারলিং।

ডলি সামনে এসে মোক্কেত কসে পড়ল  
—তার মাথাটা সাহেবের কোলে ডুবিয়ে দিয়ে  
সে নিশ্চুপ—আবেশে তার দেহ উত্তপ্ত  
হয়ে উঠেছে।

—ডলি! বাবে আমার সঙ্গে বিলেতে?

ডলি উঠে বলল। সারম্বের মূখের  
ওপর দৃষ্টি রেখে বলল—মা কি আব  
যেতে দেবে!

—তোমার মাকে বাকিরে বলব—তিন-  
চার মাসের ভেতরই তো আবার ফিরছি।

—মা কিছুতেই ছাড়বে না। ওখানে  
গেলে নাকি অখাদ্য খেতে হয়।

সারম্বর জোরে হেসে উঠলো।

—হুকুর।

সারম্বর ডাকলে কিরিত্তে, তার মূখ-  
খানা কঠোর হয়ে উঠেছে—লড় পলায় করল,  
কি! এখন এখানে। ইতিমত!

নবীন সারম্বের খাস আঁখি।  
সাহেবের মেজাজ—তার গতিক, নবীন ভাল  
রকমেই জানতো। বিদ্রোহের পর একজা  
দিতে সে প্রথমে মোটেই রাগী হরনি।  
ওসারনারের শকনো মূখ, তার জ



জোট জাগল সাহেবের পেরে বলবে।  
কিরগাছার মোরা হলপ নিছি—মোরা  
জোট জাগলো না—কিছুতেই না।

মাভবর সাহেবের সঙ্গে গোলাবাল  
করতে নারাজ। সাহেবরা তো আর অর্ধ  
হাড়বে না—হাড়গোড় গুড়ো করে দেবে—  
শুধু শুধু কতকগুলো জান যাবে।

ছোড়ার দল বলল—ইস। মোরা পাইর  
সাকরেন—মোরা লাঠি ধরতি জানি।

বড়ো ইমান লম্বা দাড়িটা হুমে নিয়ে  
বলল, লাঠি। লাঠিতে কি গুলি আটকার ?

—না পারি জান দেবো।

ইমান ছেলের হাত ধরে টান দিল—চ—  
আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। এক লহসা  
তাঁধার হল—বোটা একা। চ—চ বাড়ী চ।

উখলও খুঁব হৈচৈ। করিম চোঁচয়ে  
বলল, মোর জবান এক। মই বলিছি  
বোনবো না তো বোনবো না—জান থাক  
আর থাক। কাজীপাড়ার গেলমে। মাথা  
নেড়ে নেড়ে কাজীসাহেবরা বললো—বাউ  
দেখছি জিন চপেছে—এ পাগলামি কেন ?  
সাহেবরা কি মানব রে—ওরা হচ্ছে হুরীর  
পোলা। এক লহমে উড়িয়ে দেবে।

বনমালি আবার এলো।

—করিম। তোমার ভালই বলাছি গোলা-  
বাগ করা না—ভাল হবে না।

করিম একটু হাসলো—ভাল হবে না  
জানি। দাঠাকুর। মই তার তোরাকাত  
রাখি নে। মরণ তো আছে। জ্যান্ত মরণ  
চেয়ে একেবারে মরাই ভাল। সাহেবরা ইচ্ছে  
মত গরু বাছুর ধরে নিয়ে যাবে—সোমখ  
সোমখ মেয়েদেব ঘরে রাখা যাবে না। এ  
অবস্থার আর বেঁচে থেকে লাভ কি  
দাঠাকুর ? তুমিই বলো না।

—তুমি তো সাহেবদের পেয়ারের লোক।  
তারা তোমার সব কিছুই তো ভাল করেছে।

গম্ভীর হয়ে করিম বলল, এ দুনিয়ার  
মই একা নই দাঠাকুর। আজ এবাড়ী  
কাল ওষাড়ী শেনে মোর বাড়ী। সাহেবদের  
আর চিন্তে থাকি নেই দাঠাকুর। কির-  
গাছার হলপ নিছি, নীল মোরা বোনবো  
না। এ কথা আর নড়চড় নেই।

বনমালি মধু ফিরিয়ে নিল।

—মরার জন্যে পিপড়ের পাখা ওঠে।  
দেখছি—তোমারও পাখা উঠেছে। করিম  
একটু হাসলো।

—দাঠাকুর। ভর দেখিও না মোরে—মই  
ভর পাবার মানব না।

বনমালি ফিরলো সোজা কুঠিতে।

—বু।

—হুজুর।

—কি হলো। কি করলে ?

—হুজুর। কয়েকটা বড় নিকম্বারাম।  
কত বললাম, কত বোঝালুম—সেই এক গো—

নীল বনবো না! শুধু তাই না—আল-  
পাশের গা থেকে লোক জড় করে জোর  
জোটে বেঁচেছে বলে শিশির ঘোষ নাকি  
বলে দিচ্ছে।

—ওকে দাদন দিচ্ছে?

—দাদন! বোধহয় না—ওর জমিগুলো  
তো কোম্পানীর খাস। টাকাটা হুজুরের  
জাবলে জমা হয়। বলে কি—কালই মাঠে  
লাগল দেবো।

—লোকজন সব ঠিক আছে? বিশে-  
নরু। দরকার বুলে চকরঘাটার পাইক-  
দের খবর দিও।

—হুজুর।

পরিদিন সকলে আকাশে মেঘের ভাঁজ  
নেই। সূর্যের নিস্তেজ আলো বাঁশ বনের  
ফাঁকে ফাঁকে মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।  
উলুখড়ের মাথাগুলো তখনও ভিজে।  
গাম্ভীর খানখানের অল্প জলে ছোট ছোট  
মাছের কাকগুলো ঘুরেফিরে খেলা করছে।  
করিম লাগলো কাঁধে নিল।

করিমের স্ত্রী বাইরের উঠানে গেবরের  
হুঁকা দিচ্ছিল—স্বামীর কাছে এগিয়ে  
এলো।

—বনমালিপুত্রের মাঠে চাষটা দিয়ে  
আসি ?

—আজ না হয় থাক না। মোর দিনটায়  
ভাল ঠেকছে না।

—খ্যাং! যেমন কথা? মেয়ে লোকের  
অচল ধরে বসে থাকবো—লোক কি বলবে!

—আজ বিষাদ বার—আজ না হয় থাক  
না।

করিম একটু হাসল।

—চাষ দেবো এতে আবার বিষাদ—  
শুককুর কি।

—কি জানি। মোর দিলটা যেন কেমনতর  
থক থক করছে।

দৃঢ়কণ্ঠে করিম বলল,—

—কথা দিচ্ছি—লাগল দেবো। তা  
দেবোই—নইলে মোরে মানবে কেন?

ভাবিষ্যতের এক অমঙ্গল আশংকা  
করিমের স্ত্রীর মনটাকে যেন আচ্ছন্ন করে  
ভুলল।

—তা হলে মইও যাবো।

—খ্যাং! মেয়ে লোকে কি মাঠে যায়!  
সাহেবরা জানলে মসকরা করবে—হাসাহাসি  
করবে।

—করুক গে—মই যাবই।

মুখটা কাঁচুমাঁচু করে করিমের স্ত্রী  
বলল—

—মের দিলটা যেন কেমন কেমন  
কোরছে।

করিমের স্ত্রীও পাছ পাছ চলল।

বনমালিপুত্রের মাঠ যেন দিগন্তে মিশে  
গেছে। পূর্বদিকের তিন বিঘের বন্দ—সর  
মাটি লাগে না—চাষের ভাল জমি। লাব-  
নরুকে বলে বনমালি করিমকে জোগাড় করে

দিচ্ছে। করিমের দল পাকি বছর। একরে  
আর এ জমিতে সে নীল বনবে না—হলপ  
নিচ্ছে। কয়েকদিন আগে কুঠিটা হলো  
বটে কিন্তু অন্যটা টেনে গেছে মাটিটা খট-  
খটে। চাষের জো হয়নি শুধু করিমকে  
লাগল দিতে হবে—সববার সাবনে বে সে  
কথা দিচ্ছে—এখন আর জোর উপায়  
নেই। আলের পাশে শুকনো একটা বেজুর  
গাছ—তার তলার পরে দুটো ছেঁড় দিল।  
লাগলটাও রাখলো।

করিমের স্ত্রী ভয়ে ভয়ে স্বামীর আরও  
নিকটে এল।

—দেখো না—এ তো এ তো সাহেবের  
লোক দল বেঁধে আসছে।

করিম তাকালো।

—মোর জমিতে মই চাষ দেবো তাতে  
কর কি।

ভয়ে করিমের স্ত্রীর গলাটা যেন শুকিয়ে  
আসছে।

—ওরে বাবা! কত লোক—সববার হাতে  
লাঠি-সড়ক।

করিমের স্ত্রী একটু এগিয়ে এলো।

—দাঠাকুর। এত লোক কেন?

—কেন? ন্যাকা! কার জমিতে। করিম  
জানে না—এটা কোম্পানীর খাস জমি।

—মোরা একশি থাকি।

করিমের কাছে এলো।

—লাগল দিতে হবে না—বাড়ী বই  
চলো।

গলার স্বর চড়িয়ে করিম বলল—মোর  
ভুই—মই চাষবো—বারপ করার কে?

বনমালি এগিয়ে এলো।

—কার ভুই—কার ভুইরে?

দৃঢ়স্বরে করিম বলল—

—মোর।

বনমালি আঙুল নেড়ে বলল—এখনও  
বলছি বেরিয়ে যা।

স্বর তার কঠোর।

—নইলে—

—নইলে? কি হবে দাঠাকুর।

বনমালির ইংগিতে করিমের ওপর লাঠি  
পড়ল।

করিমের স্ত্রী দৌড়ে বনমালির দ্বারা  
পা জড়িয়ে ধরলো—

—দাঠাকুর। আর মোরো না—কাল  
রাতে এতটুকু ঘুমুই নি—মোরো না—  
দাঠাকুর।

করিমের স্ত্রী জান হারিয়ে ফেলল।

করিম তখন মাটিতে—তার কুঁড়িভক্ত  
দেহের আঘাত থেকে রক্ত করছে।

বনমালি বলল—দেখতোরে এখনও  
নিঃশেষ পড়ছে নাকি।

রাম পাইক নাকের কাছে হাত নিয়ে  
বনমালির দিকে তাকিয়ে—

—নাঃ।

# দিন কালের হিসেব

## শর্করা-সংকট

যত গুড় (বা চিনি) ঢালা যাবে নিশ্চয় তত মিষ্টি হবে, কিন্তু গুড় চিনি স্যাকারিন বা অন্য কোন সুইটেনিং সাবস-ট্যান্স না দিয়ে অমৃত চা-এ কি প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিষ্টি স্বাদ আনা যায় না? এক কাপ চা চেয়ে গৃহকণ্ঠীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ফেরি-ওয়ালার কাছ থেকে জিনজার-গ্রুপের এক ভাঁড় চা গান করতে করতে এই কথাই ঝরঝর ভাবছিলাম। ইঠাৎ মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই অনবদ্য পরিহাসের কথা : "...সৈদীন ল্যাণ্ডলেডী'র (মুদ্রণের সুবিধের জন্য বাংলা অক্ষর ব্যবহার করলাম) মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, 'না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখেছিনে।' (মুরোপ-প্রবাসীর পত্র)

তখন ভাবলাম, 'ঠাট্টা যদি সত্যি হত আহা!'—যদি আমাদের প্রত্যেকের নেলির কম্পর্শে চিনিবিহীন চা মিষ্টিতায় ভরে উঠেছে বলে মনে করতে পারতাম তবে আজকের এই শর্করা-সংকটে আমাদের আর ভুগতে হত না—আমি অন্তত প্রত্যাখ্যানের জ্বালা আর মৃৎপাত্রে জিনজার গ্রুপের আশ্বাদন এড়াতে পারতাম।

অর্থনীতিবিদ স্টিগলারের আক্ষেপও মনে পড়ে গেল : যদি আমাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকত...

স্টিগলারের আক্ষেপ কিন্তু এক দিক দিয়ে ভুল। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকলে অর্থনীতি বলে কোন শাস্ত্রের চর্চা কখনই হত না, আর ফলে স্টিগলারের নামও কেউ জানত না।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই কাল।

কোন কিছুর লিখতে কবে এক পেয়ালা চায়ের অভাব করা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা লিখতে বসে সৈদীন তাই করেছিলাম, কিন্তু রাসায়নের থেকে সংকীর্ণত জবাব পেলাম : 'ফ্রিবি-ফ্রিবি'। লেখা মাথায় উঠল। কিছুক্ষণ

দিনকাল কেমন চলছে,

তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।

কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আভের

খবর মেলে ধরা হবে এই

বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু

সচেতন হতে পারি।

বসে থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। মোড়ের মাথায় একজন ফেরিওয়ালার অনিবার্ণ চুল্লীতে পেতলের কলসী বসিয়ে সর্বদা গরম চা বেচে জানি। সেই দিকেই অগ্রসর হলাম। দেখলাম ফেরিওয়ালার ঠিকই তার জায়গায় বসে। এক ভাঁড় চা নিয়ে আশ্বাদন শুরুর করতেই জার্তাবাদের দেরী হল না—জিনজার-গ্রুপের চা।

'জিনজার-গ্রুপ' নামটা দেওয়া এক সরকারী কলেজের অধ্যাপক। সৈদীন এ কলেজে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কলেজের ক্যানটিন থেকেই চা এল। এক চুমুক দিয়েই বন্ধুর পাশে বসে তাঁর এক সহকর্মী মন্তব্য করলেন : জিনজার-গ্রুপের বলে মনে হচ্ছে—তারপর এস্ট্রা থেমে আবার অন্য লোক ডুরা দেয় ভাগ্যে আমি তারে চিনি।

প্রথম চুমুক নয়, দ্বিতীয় চুমুকে আমিও বুঝলাম যে চাটা অফিসিয়াল গ্রুপ বা চিনির চা নয়—চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে ইক্ষুগুড়। জিনজার গন্ধনাশের প্রচেষ্টা করা হয়েছে জিনজার বা আদ্রক দিয়ে। জিনজার-গ্রুপের এই চা বহু পুরোনো হলেও স্প্রিটি এর প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে শর্করা-সংকটের দরুন।

প্রথমে সমীক্ষাটির নমুনা দেব ঠিক করেছিলাম 'চিনি-সংকট', কিন্তু এক বন্ধু (বাংলা ব্যাকরণবিৎ) বললেন : ঠিক হবে না, অনেক গুরুচড়ালী দোষ ধরবে। তারপর তিনিই নির্দেশ দিলেন : নাম দাও শর্করা-সংকট। এতে গুরুচড়ালী দোষ কাটবে, আর অনুপ্রাসের দরুন শোনাবেও ভাল।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুর পরামর্শই গ্রহণ করলাম, যদিও বা ইংরেজ মহাকবিবর সেই প্রশ্নটি বারবার খেঁচা দিয়েছিল : হোয়াটস ইন এ নেম?

সংকটের প্রকৃতি-পরিচয় :

শুধু গৃহকণ্ঠী বা আমার মত চা-খোরেরা না, শর্করা-সংকটের কবলে আজ কে-না পতিত? সাধারণ রেস্টোরাঁ, চায়ের স্টল, মিষ্টির দোকান, বেকারী, লজ্জেশের কারখানা, আইসক্রীম বা সফট্‌ফ্রিঙ্কের ব্যবসা, এমনকি ওষুধের ল্যাবোরেটরীও

শর্করা-সংকটের দরুন আর অস্পষ্টতা সংকুচিত।

রেস্টোরাঁ ও চায়ের দোকানের মালিকের অভিজোগ, চিনির আগুন দামের জন্যে চায়ের দাম বাড়তে হয়েছে, আর তার দরুন চায়ের বিক্রি কমে গেছে। অনুরূপ-ভাবে মিষ্টির দোকানের মালিকও বলে থাকেন, তিনি সাইজ ছোট করতে এবং ওজনের হিসেবে দাম বাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সাইজ ছোট বলে খন্দের মনে ধরে না, আর ওজনের হিসেবে দাম বেশী বলে কিনলেও কম কেনে।

কারও যুক্তিতে ভুল নেই। উপকরণ বা ইনহুটের দাম বাড়লেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গেলে চাহিদার পরিমাণ কমে যায়—অর্থনীতির এ অতি সাধারণ তত্ত্ব। কিন্তু এই অবস্থার ফল যে তৃতীয় পর্যায়ী, চতুর্থ পর্যায়ী অর্থাৎ সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হয় না।

ধরুন, চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে রেস্টোরাঁ, চা-এর স্টল, মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতে বিক্রি কমে গেল। পরকর্তী পর্যায়ী ফল—উৎপাদন হ্রাস এবং তার দরুন নিয়োগ হ্রাস—হয়ত রেস্টোরাঁ বা চায়ের দোকানে দু'একজন শিশু-পরিবেশক বা কারিগর ছুটিই হল। এই ত' সৈদীন এক ছোট বেকারীর মালিক বললেন : কি করব মশাই, পেঙ্গুই তৈরী কণ্ড করে দিয়েছি। দু'জন কারিগরকেও জবাব দিলাম।

দু'জন কারিগরকে জবাব দেওয়ার অর্থ হয়ত এই নিয়োগহীনতার দিনে দু'টি পরিবারকে অনশনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া।

এইভাবে চিনি বেথানে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ সেখানেই ঘটছে অস্পষ্টতার উৎপাদন হ্রাস। উৎপাদন হ্রাসের ফলে নিয়োগ-হ্রাস, নিয়োগহ্রাসের দরুন আয় হ্রাস এবং তার ফল বেকারত্ব ও খনবৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ ছাড়া 'কনজামসন বা ভোগ হ্রাস ত' আছেই—বাড়ীতে বরাদ্দের বাইরে এক পেয়ালা চা চেয়ে পাওয়া যায় না, পৌষপার্বণের দিনে গৃহকণ্ঠী পুলাপিঠের প্রকারভেদ ও পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হন, জল-খাবারের ক্ষেত্রে চিনি মাড়াই কল চালাবার চেষ্টা করা হয়, শর্করাপ্রিয় কচাদের সতর্ক

করে দেওয়া হয় যে 'শ্বিতীয় দফা চিনি চাইলে পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। কারণ হিসেবে বলা হয়, বাজারে চিনি নেই।

বাজারে কিন্তু চিনি আছে—খোলা বাজারেই আছে, তবে তার বা দাম তাতে প্রয়োজনমত কেনা অধিকাংশ জনজীবীর বা ছোটখাট সামর্থ্যের বাইরে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে এই দামে প্রয়োজনমত চিনি কেনা পরিবারের পারচেষ্টা-স্বাভাবিক বা ব্যয়বস্তু-নীতি দ্বারা কোনমতেই সমর্থিত হতে পারে না। অর্থাৎ, চিনির জন্যে এই পরিমাণ ব্যয় করলে অন্যান্য প্রবাসীর ভোগ এত কমে যাবে যে পরিবার কিছুতেই সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা ভরসাম্যের অবস্থায় উপস্থিত পারবে না। যেমন, ঐ বেশী দামে চিনি কেনার জন্যে পরিবারকে যদি দুধ বা মাছ বা ঐ রকম কিছু ওপর খরচ কমাতে হয় তবে পরিবারের সময়সীমার লক্ষ্য—সর্বাধিক পরিতৃপ্তিলাভ করা—সাহায্য হতে পারে। এই র্যাশ্যনিং বা ব্যয়বস্তু-নীতি বা ন্যায্যতার দোকানের মাধ্যমে যেটুকু চিনি পাওয়া যায় তা দিয়েই, বা অপরিহার্য ক্ষেত্রে খোলা বাজারে কেনা কিছুটা যোগ করে কাজ চালাতে হয়। অর্থাৎ এই র্যাশ্যনিং ব্যবস্থার বাইরেই হল দেশের অধিকাংশ জনগণ, আর ন্যায্যতার দোকানও সংখ্যায় পর্যাপ্ত নয়। উপরন্তু, চিনির দোকান প্রতিষ্ঠা যেসব মামল বা প্রতিষ্ঠানের কাছে চিনি উৎপাদনের অন্যতম ইনপুট তাদের খোলা বাজারে থেকেই বিক্রয় হলো এই উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। ফলে তাদের উৎপাদন প্রবাহে মূল্যবোধ-মূল্যসূত্রবৃদ্ধিতেই সহায়তা করে।

অতএব, শর্করা-সংকট ভোগ উৎপাদন আর নিয়োগ বন্টন মূল্যসূত্র—অর্থনৈতিক কর্মসূচির সবল দিকই পরিব্যাপ্ত। এবং এই সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। অনেকেরই আশংকা যে আগামী আর্থিক বছরে (১৯৭৩-৭৪) শর্করা-সংকট জনসাধারণের পক্ষে আরও ভয়ঙ্কর ও বেদনাকর এবং সরকারের পক্ষে আরও অসমর্থতার কারণ হয়ে উঠবে।

এখন দেখা যাক, কেন এমন হল—এই শর্করা-সংকটের উৎস কোথায়।

**সংকটের কারণ :**

প্রাথমিক পর্যালোচনায় ভারতের ন্যায় দেশে আজকের শর্করা-সংকট অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কারণ, বিগত তৃতীয় দশকের সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারত অন্যতম প্রধান চিনি উৎপাদনকারী দেশ (এই দিক দিয়ে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে সপ্তম স্থানাধিকারী, যদিও বা কয়েক বছর আগে স্থান ছিল চতুর্থ) এবং গত দশ বছরে ৫০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে (১৯৬১-৬২ সালে ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ৪২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন) সমর্থ হয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করেছে।

একটু ভালো দেখলে কিন্তু সংকটের

কারণগুলো সহজেই ধরা পড়ে। মোটামুটিভাবে দেখলে সংকটের কারণ চারিখণ্ড বা চারদিক : উৎপাদন হ্রাস ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি (অর্থনীতির ভাষায় ঠিক চাইবা বৃদ্ধি হয়ত বলা বার না)। উৎপাদন হ্রাসের মৌল কারণ প্রতিবন্ধ-আবস্থাওয়া বা কোন স্থানে অতিবৃষ্টি এবং কোন স্থানে অনাবৃষ্টির দরুন ১৯৭১-৭২ সালে আখ-যোগানে ঘটিত। কৃষিজাত প্রাথমিক শিল্পের প্রধান ইনপুট, বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল কৃষিপ্রধান দেশে তার উৎপাদন হ্রাস যে কোন বছর ঘটতে পারে। এ ছাড়া অবশ্য তলে তলে অন্য কারণও দানা বাঁধছিল।

দেখা যায়, অনেক ফ্যাকটরী জোনে আখ চাষের জমি অন্য চাষে স্থানান্তরিত হয়েছে। শ্বিতীয়ত, আগের চেয়ে বেশী পরিমাণে আখ চিনির কলে না গিয়ে বিভিন্ন প্রকার গুড় ও দিশি চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৃতীয়ত, চিনি শিল্পের—বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের চিনি শিল্পের ওপর জাতীয়তাবাদের খাড়া কলিয়ে রাখা হয়েছে।

এইসব মধ্যে ও গৌণ কারণের জন্যে ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের ৪২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনে।

অপরদিকে বা প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আখ জনবিসংকরণ ও জনগণের ভোগ-পদ্ধতির পরিবর্তন। বিগত দশ বছরে (১৯৬১-৭১) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে—২৪.৬ শতাংশ বা মোট ১০.৭৮ কোটি। শিশুর খাদ্যে বেশ চিনি লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশীই লাগে, তা ভুললে চলাবে না। আর ভোগ-পদ্ধতির দিক দিয়ে সমস্যাটির বিচার করলে দেখা যায় যে, আগে যারা গুড় ইত্যাদি ব্যবহার করত তাদের অনেকেই চিনির দিকে ঝুঁকিয়েছে।

এর ওপর কিছুটা রপ্তানির আবশ্যকতাও আছে। মোট কথা, দশ বছরে চিনির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ লক্ষ মেট্রিক টনের মত—৩১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন। এই অবস্থায় বর্তমান বছরে (১৯৭২-৭৩) যে শর্করা-সংকট দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

**আগামী বছরে প্রত্যাশা কি রকম?**

আগামী বছরে (১৯৭৩-৭৪) সংকট আরও ঘনীভূত হবে বলে যে আশংকা করা হচ্ছে তার মূলে আছে বর্তমান বছরে নিদারুণ খরা বা অনাবৃষ্টি।

ভারতে ২২০টির মত চিনির কল আছে। এর মধ্যে ৯৮টি বিহার ও উত্তর-প্রদেশে অবস্থিত এবং এই দুইটি রাজ্যই মোট এক-তৃতীয়াংশের ওপর চিনি উৎপাদন হয়। চিনি উৎপাদনে অপর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মহারাষ্ট্র ও থরায় সমান প্রণীভূত। এই থরায় দরুন অনুমান করা হচ্ছে যে বর্তমান বছরে উৎপাদন গত বছরের অর্ধেক ৩১ লক্ষ

মেট্রিক টনেও পৌঁছাবে না। তার ওপর আবার বছরের মধ্যে মজুতও কিছু থাকবে না (বা প্রতি বছরই থাকে)।

অপরদিকে ১৯৭০-৭১ সালের তিস্তিতেই স্বাভাবিকতরীণ প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ অর্ধত ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়ে বলে ধরে নিলে এবং এর মধ্যে পঞ্চাশ-মূলক ছোটো-ভিত্তিতে ১ লক্ষ মেট্রিক টন রপ্তানির ব্যবস্থা করতে হলে মোট ম্যুনেতম প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াবে ৪১ লক্ষ মেট্রিক টনে।

অতএব, আগামী বছরে মোট ১০-১১ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি-ঘাটতির আগছাকা রয়েছে। এর ফলে চিনির বরাহ ব্যাবস্থা আর দাম যে কোথায় দাঁড়াবে বলা কঠিন।

অর্থাৎ আগামী বছরই চতুর্থ পরি-কল্পনার শেষ বছর, যে বছরে চিনির উৎপাদন ৫০ লক্ষ মেট্রিক টনও ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল।

**প্রতিবন্ধানে সরকারী প্রচেষ্টা :**

চিনি একাধারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনের উপকরণ বলে শর্করা-সমস্যা বা সংকটে সরকারের পক্ষে নিশ্চিত হয়ে কসে থাকা কল্পনাও করা যায় না। এবারও নিশ্চিত থাকতে পারে নি। খোলা বাজারে দাম চড়তে শুরু করা মাত্রই সরকার বিক্রি ও বিলবস্তু-ব্যবস্থার ওপর নানারকম নতুন বাধানিষেধ আরোপ করে। লেভি চিনির অনুপাত (যে চিনি র্যাশ্যনিং ও ন্যায্যতার দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয়) ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ শতাংশ নিয়ে যায়; ফলে খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে থাকে ৩০ শতাংশ। একসাইজ ডিউটি বা অস্তঃশুল্ক বাদ দিয়ে লেভি চিনির দাম দ্বিগুণ করা হয় কুইন্টাল প্রতি ১৪৭-১৯ টাকা এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে।

শর্করা-শিল্পের অভ্যুদয় হল, এই দাম উৎপাদন-বয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিহীন বলে অবাস্তব, এবং এর অর্থ শিল্পকে বাকী ৩০ শতাংশ চিনি খোলা বাজারে বেশী দামে বেচে লেভি চিনির বিক্রির দরুন কর্তাপূরণ করতে অনুমতি দেওয়া। ১৯৭১ সালের মে মাসে যখন চিনির দ্বিগুণণ করা হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল ঐ একই। এবার লেভির শতাংশ বৃদ্ধির (৬০ থেকে ৭০) দরুন কর্তাপূরণের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? অর্থাৎ খোলা বাজারে চিনির দাম ত বাড়বে—এতে এক ক হচ্ছেন কেন?

**জাতীয়করণের দাবি :**

এই সোজা বৃদ্ধি সংকটও শিল্প কিন্তু অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায়নি। খোলা বাজারে চিনির দাম বৃদ্ধির দাবিও অনেকাংশেই চাপানো হয়েছে শিল্পের ওপর এবং চিনির কলের মালিকরা শর্করা-প্রচেষ্টা (সুগার ব্যারন) আখ্যায় শেরতেন বারি আখ্যায়ী ও জনসাধারণ উভয়কেই লোভন করে নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্পে



সরকারী চিনির কারখানার মালিকদেরও নতুন ব্যবসারী গোষ্ঠী বসে কাজ হতে পারে।

এই ব্যবসায় শর্করা শিল্পের জাতীয়-কায়দে বাস্তবায়ন হওয়াই স্বাভাবিক, এবং সেই ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশে তা এই দাবি কিছু বেশি জরুরি হতে পারে।

শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে

জাতীয়করণের কোনোই ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হবে। এই সমস্যা প্রদেশের উত্তরে কয়েক মতাবিরোধ আছে দেখা যায়। সরকারও এ ব্যাপারে কিছুই করিচ্ছে না। তাহলে এতদিন জাতীয়করণের পথই বেছে নেওয়া হত। তার পরিণতিও সরকার এক অনুসন্ধান কমিটি (শর্করা-শিল্প অনুসন্ধান কমিটি) নিয়োগ করেই বসে আছে এবং উত্তরপ্রদেশে এই নিয়ে রাজনীতির মেলা চলছে।

আমাদের দেশের মত অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ শিল্পের সমস্যার সমাধান হিসেবে জাতীয়করণের পথ মরিচা হয়েই পড়তে পারে। এর বেশ কয়েক ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়। শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে তাও এমনিই। শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রেও এর ফলে কিছুটা খোলা থেকে সোজা আগুনে গিয়ে পুড়িয়ে আগুণকা থাকবে না?

বিশেষত শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পাদন থেকে দেখা যায় যে, অবস্থা কোন ক্ষেত্রে অনুকূলের দিকে আসে নি, বরং কোন ক্ষেত্রে রপ্তানিও সংশোধন করে উন্নত অবস্থায় পরিণত হয়েছে। শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে এই রকম অবস্থাই হয়। শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক অনুবিধার ফল হবে ভয়াবহ। উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়বে। তাহলে তবে অবস্থা যে কি দেখানো হয় তা বর্ণনাও করা যায় না। মোট কথা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এবং উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়বে। শিল্পকে নিয়ে হস্তক্ষেপ করা বাধ্য হতে হবে না।

শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে

ভারতের মোট ২২০টি চিনির কারখানা ৭৯টি সরকারীকৃত ভিত্তিতে গঠিত। অল্পের মধ্যে, কলিকাতাকে সমস্যার ক্ষেত্রে নিয়ে আসলেই সব সমস্যার সমাধান হবে—সংকট দূরীভূত হবে। কিন্তু দেখা যায়, একমাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া কোন রাজ্যই সরকারী চিনির কারখানা কার্য-সম্পাদন আশাপ্রসন্ন নয়। উপরন্তু, সমস্যার প্রত্যক্ষানের কার্যপদ্ধতিকে সকল সময়ই বর্জন করে চলেছে। অর্থনীতি-এ না সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন? অর্থনৈতিক লক্ষ্য হলে বর্জনসম্ভব অধিক মূল্যবান গাছ লাগে। এর জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কম বা হয় হোক। এ-ক্ষেত্রে পৌছতে হলে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে চোখ বুলে থাকতে হয়। অপরদিকে বেশী উৎপাদন আর কম দামের দিকে দৃষ্টি দিলে অর্থ-নৈতিক লক্ষ্য বাহ্যিক হয়।

অতএব, সমস্যার শর্করা শিল্পের সংকট দূরীকরণের পথ বলে মনে হয় না।

শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে

মনে হয় বর্তমানের আংশিক বিনিয়োগ নীতিই প্রকৃত পন্থা, তবে এই নীতির বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

শর্করা-সংকটের মৌল কারণ হল পরিমাণে আখের যোগানের অপ্রতুলতা—অর্থাৎ এই শিল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল পাবে না। প্রতিফল আবাদোয়ার আখের যোগান কমে গেলে তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করবার নেই, কারণ তা হল বহুতর কৃষি-সংগঠনের প্রশ্ন। কিন্তু আখ চাষের জমি বাড়ে অন্য চাষে স্থানান্তরিত না হয় এবং যে পরিমাণ ফল জন্মায়, তা বাড়ে এ জোনের কলগলোতে গিয়ে পৌছায় তার জন্য ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে করণীয় হল আখের দাম বৃদ্ধি করা। প্রতি-বিধানটি নিয়ে সরকারও ভাবছে এবং শোনা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে উত্তর ভারতে আখের দাম কলকাতা-পাতি ১২ থেকে ১৩ টাকা দায় করা হবে। (বর্তমানে ন্যূনতম দাম ৭-৩৭ টাকা)। দাম এতটা বাড়লে বরাদ্দ চিনি কল্যাণ-প্রতি বর্তমান ২ টাকার পরিবর্তে অর্থাৎ ২-৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি এবং খোলা-বাড়ারও দাম ৫ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে ভারতীয় চিনির সংস্থার ধারণা। অপর-দিকে যদি আবার সম্পূর্ণ বিনিয়োগ-ব্যবস্থায় ফিরে গিয়ে লেভি-চিনির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়, তবে অনেক মিলই দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হবে।

তাহলে যা করতে হবে তা হল : আখের দাম বাড়ানো। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জন্য আলাদা আলাদা দাম ধার্য করা। অবশ্য ন্যূনতম দাম ১/১০ টাকা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের সময়-কাল (সময়-কাল বা ক্রাসিং-সীজন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম—৩ থেকে ৫ মাস); উৎপাদনের ক্ষমতা, নিষ্কাশন-ক্ষমতা (রিকভারী) ইত্যাদি বিচার করে জোন-গলোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তৃতীয়ত বিভিন্ন প্রকার গুড় ইত্যাদির উৎপাদন এবং চিনি উৎপাদনের মধ্যে সংহতিসাধন করতে হবে। চতুর্থত, উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম থাকবে, ততদিন বর্তমান বছরের মত অল্পাধিক থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখতে হবে। পঞ্চমত, দক্ষিণ কলগলি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই অবলম্বন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিচালনা কমিটির সুপারিশগুলো বিশেষভাবে অনু-ধ্যান করা যেতে পারে। বর্তমানে ভারত চিনির কল মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই কেন্দ্রী-ভূত, আখের চাষ কিন্তু বিস্তৃত লাভ করছে। সুতরাং প্রয়োজন হল আরও চিনির কল স্থাপন করা। এ-সম্পর্কেও মনে হয়, অর্থনৈতিক পর্যায়ে সরকারীকরণের পথে

না পিঠে বাড়তি উৎসাহের ওপরই নির্ভর করা উচিত। তবে সরকারের স্বার্থ-রক্ষার আখের দাম-সেই দিতে হবে। সন্তোষ, নিষ্কাশন বা রিকভারী বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ ভারতের কলগলোর আধুনিকী-করণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কলগলো-মোটাই আধুনিকী-করণের দাবি আছে। আর-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ-উৎসাহিত করবার জন্য আর্থিক-সহায়তা উপলব্ধি প্রদান উপায়ের প্রয়োজন। চিনি ও আখ থেকে উপজাত-সম্পদ হিসেবে যে শক্তি-সুরাসার, কাঁচকাঁচ ইত্যাদি তৈরী করা যে সম্ভব তা সকলেই জানেন। পরিশেষে, শর্করা-নীতি সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতেই গৃহীত ও কার্যকর হওয়া উচিত। এ-সম্পর্কে প্রাদেশিকতাকে—আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিলে ফল হবে।

উপসংহার :

নির্দেশিত প্রতিবিধানগুলো নতুন কিছু নয়, তবে এ পর্যন্ত কালক্রমে বাস্তব-বিশেষ থেকে সনাক্ত দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গঠন করে কার্যকর করবার প্রচেষ্টা করা হয়নি। দেখা যায়, সকল সময়ই অবস্থা বদলে আসে, উপায়ের অবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে শর্করা-শিল্পে সকল সময়ই নিঃস্বপ্ন কাল্পনিক ওপরে। যে-বছর বরাদ্দ প্রকৃত-কাল প্রায় জনমত বা প্রয়োজনীয়তার অর্থ উৎপাদন হয়েছে, সে-বছর চিনির অপ্রতুলতা-জনিত কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি। কিন্তু যে-বছর ফসল একটু বা কিছুটা কম হয়েছে, সে বছরই মাথাচাড়া দিলে উঠে পড়ল সমস্যা, যা বর্তমান বছরের মত কখনও কখনও সংকটের সঞ্চারিত হয়েছে। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে দৈব নির্ভরশীল করে রাখা উচিত নয়। সুতরাং আখের যোগান বাড়তে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে এ যোগানের বাড়ে চাহিদাও হয়। এই জন্যেই প্রয়োজন সর্টিফিকেশন শর্করা-নীতির, যে-নীতি অবশ্যই দীর্ঘকালীন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রচিত হবে।

আশা করা যায়, উপরি-বর্ণিত প্রতি-বিধানগুলো সংগঠিত করে এই দীর্ঘ-কালীন শর্করা-নীতি পঞ্চম পরিকল্পনা চড়ন্ত রূপ নেওয়ার আগেই ঘোষিত হবে। এই রকম আশার কারণ, নির্দেশিত প্রতি-বিধানগুলো মোটেই নতুন নয় (অন্তত আমাদের মাথা থেকে বেরোয়নি)—মোটামুটি সরকারী স্তর থেকেই বিভিন্ন সময়ে এগুলো ঘোষিত হয়েছে। তবে এদের মধ্যে সংগতি-সাধন করে পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘকালীন নীতি কখনও ঘোষিত হয়নি। এই প্রয়োজনই আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায়, এটা জিনজার-পের সংসদীয় বা সংসদের বাইরে দাবি।

# ফুল ফোটার আগে

শৈলেন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকক্ষণ ধরে হাত পা মুখ ধুলাম। হাতে জল নিয়ে ঘাড় ভেজালাম। হঠাৎ চোখ কান গলা যে কেন এত গরম বসে উঠলো! এক এক সময় নিজের শরীরের মধ্যে কী যে হয় মানুষ নিজেই বোঝে না। সব মানুষই বোঝে না, না... আমিই বঝি না। বা এমনও হতে পারে, সব মানুষের শরীরের মধ্যে সেরকম কোন অস্থিরতা আগে না। সব যাবৎপক্ষেই তারা শান্ত থাকে, আর এই শান্ত থাকারটা নির্ভর করে তাদের মানসিক সুস্থতার ওপর।

ইচ্ছা করে অমেরুটা সময় নষ্ট করে বাইরে এলাম। আমি মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ ধরে। শুধু যে মানসিক সুস্থতা, তা না। আমার শরীরকেও নিজের বেশে আনতে সচেষ্ট ছিলাম। বাইরে এসে দেখলাম, ঘোতন আর লীলাবতী গল্প করছে। মা, সুপ্রিয়া আর বড়মামা আলোচনা ভাবে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বড়মামা বললেন, 'শুনলাম তুই নাকি বেরোবি?'

বললাম, 'ঘোতনের সঙ্গে একটা বেরোবো। কবুরী কাজ আছে।'

বড়মামা সাবধান করে দিলেন। 'তাকাতাড়ি ফিরে আসিস। দিনকাল জরায় খরাপের দিকে যাচ্ছ। চড়ুদিকে বোমা, গোলাগুলি। কলেজ স্ট্রীটের দিকে আজও গুলি চলেছে।'

বললাম, 'আমি কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাব না।'

বড়মামা মেন নাছোড়বান্দা। 'বললেন, কেননা দিকে যাবি?'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কল্টোলার দিকে।'

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'এই সন্ত্রাসের সময় কল্টোলার যাবি?'

উত্তর, খুঁজে, ছেঁড়ছিলাম। হঠাৎ আমায় হতভম্ব করে দিয়ে সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'ও ঠিক জানে না বড়মামা। আমাকে একবার কসবা'র দৈর্ঘ্যে হুঁতে হবে। একা একা এ

পথে যাওয়া ঠিক হবে না বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাক ভেবেছি।'

বড়মামা খুব খুশী হলেন না। বললেন, 'কসবাও ভাল জায়গা না। ওদিকে গোলমাল তো লেগেই আছে, সাবধানে যেও।'

সুপ্রিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। 'সাতটা বেজে গেল, ওঠা যাক।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘোতনও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমিও যাব এখন।'

লীলাবতী ঘোতনকে বলল, 'আমাকে কামাক স্ট্রীটে নটিংয়ে দিয়ে যাবেন?'

আমার মনে হচ্ছিল লীলাবতীকে লিফট দোর কটা বসি। সুপ্রিয়ার সঙ্গে নিশ্চয়ই গাড়ি রয়েছে। সুপ্রিয়া একটা কথাও বলল না। লীলাবতীর ওপর থেকে দাঁটি সারিয়ে নিতেই সুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সুপ্রিয়া আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

ঘোতন 'আর লীলাবতী বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ লীলাবতী পিছন ফিরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কাল সকালে আসবো।' বলে মা আর বড়মামাকে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘোতন একটা কথাও বলল না। কিন্তু ওর চোখ দেখে বড়মামা, ঘোতন দারুন জোরে নিজের মনে মনে হাসছে।

ওরা বেরিয়ে যেতে ঘরে রইলাম আমরা চারজন। বড়মামা একটা চেয়ারে বসে আছেন। বড়মামার মুখোমুখি তক্তপোবে বসে রয়েছি মা। আমি আর সুপ্রিয়া দাঁড়ানো। বড়মামা বললেন, 'কাল সকালে কি তোর কাজ আছে?'

বললাম, 'কেন?'

'একবার দমদমে বাস। ভোদের বাড়িটা দেখে আসিস। আর পেরারা যদি থাকে, নিয়ে আসিস গোটা কতক। কতদিন পেরারা খাই না।'

'আপনি অনুকর্দন পেরারা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, দুই ভোদার পক্ষ থেকে

শক্তি জানি চিবোতে পারেন না বলে।' কথাগুলো নিজের কানেই ককর্শ শোনাল।

বড়মামা একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং খুব মজার কথা শুনলেন মেন। সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'ছেলেবরসে খুব পেরারা খেতে ভাল-বাসতাম। বড়োবরসে ছেলেবরসের ভাল লাগাটা আবার ফিরে আসে। লক্ষ্য করে দেখো, বাবা ছেলেবরসের মিন্টি ভালবাসে, তারা বৃদ্ধবরসে আবার মিন্টির দিকে আকৃষ্ট হয়।'

বড়মামা এমনভাবে বললেন, মেন বীর গবেষণার পর এই মূহুর্তে চরম তথ্যটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

সুপ্রিয়া অনমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল। ও মেন কথা বলতেও ভুলে গেল। বড়মামা আমাকে তাকা দিয়ে বললেন, 'আর দেবী করিস না। তাকাতাড়ি গিয়ে তাকাতাড়ি ফিরে আসিস। তুই না ফেরা পর্যন্ত চিন্তায় থাকবো।' এর পরে আর থাকা যায় না। বাধা হয়েই সুপ্রিয়ার পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে আসতে হল। বাইরে একটা নতুন স্কমকে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা গাড়ির সম্মুখে যেতেই উদ্ভিগ্না জাইভার তাকাতাড়ি দরজা খুলে ধরে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি আর সুপ্রিয়া পিছনে বসলাম। দুইজন দুই কোনায়। মাঝে একমাত্র সমান ব্যবধান। আমি এদিক দিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া ওদিকের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছিল। বড় রাস্তার পড়ে জাইভার গ তবাক্সান জানতে চাইল। সুপ্রিয়া বলল, 'লেকা।' অথচ কিছুক্ষণ আগে ও বর্ণোছিল, কসবা। কসবাই আটক-গল্লত হয়ে পড়ছিল। সুপ্রিয়া যে মনে মনে একটা বড়মুগ্ন করছে, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অথচ কী সেই বড়মুগ্ন, এবং তার প্রকাশ কোন পথ ধরে হবে, তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একবার মনে হল দরজা খুলে নেবে পাকি। কিন্তু গাড়ি তখন দ্রুতগতিতে সেকেন্ড দিকে ছুটে চলছে।

জন্মের দিকে মূখ্য করে গাড়ি লাঞ্চারে পড়ল। 'নাগড়ে বাজিলাম, সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বলল, 'একটু বসবো, পরে হাটবো।' তারপর ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ইচ্ছে করছে তুমি একটু বোঝিয়ে আসতে পার। ছোঁকী নিয়ে গেল।

সুপ্রিয়া আমার দিকে কাত হয়ে বসল। 'এদিকে আলো বিশেষ নেই। সুপ্রিয়া নিশ্চয়ই আমার মুখ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আমায় দিকে তাকিয়ে থেকে স্বাভাবিক গলার সুপ্রিয়া বলল, 'হঠাৎ চলে এলো কে?'

আমিও বখাশি স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম, 'পুলোয় কোলকাতার বাইরে থাকতে ভাল লাগে না।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের অবস্থার সঙ্গে ভাল য়েখে চলতে পারতো।'

হেসে বললাম, 'মাসীর যদি গোঁফ হতো, মাসী তা হলে মামা হতো।'

অবাক লাগে তখনই যখন মানুষ আবোল ভাবোল কথা দিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চায়।'

খুব হাস্যকাবে বললাম, 'কিন্তু যে দোষ করে নি, দোষ ঢাকার প্রশ্ন তার ওঠে না।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁক করে পড়ে তাঁর অথচ চাপা গলার চীৎকার করে উঠল, 'একশোবার দোষ করেছে। লীলাবতী ভাল মেয়ে না।'

'ও অসম্ভব ভ্রূক করে। সে কথা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।'

'শুধু যে ভ্রূক করে তা না, মিস্টার কাপড়ের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্কও রয়েছে।' সুপ্রিয়া ক্রমশই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

শান্তভাবে উত্তর দিলাম, 'একদা এক মিস্টার কাপড়ের এক মিস দেশপাণ্ডের কন্ট্রলন হয়ে মস্ত অবস্থার গাড়িতে এসে বসেছিল। বসেছিল, ঠিক না, তাকে এনে বসানো হয়েছিল।'

'এত কথা তুমি জানলে কি করে?' 'সেই প্রশ্নটা আমারও।'

'আমি শুনছি।' 'কার মুখে?' হঠাৎ আমি যেন সুপ্রিয়ার চেয়ে সখল একজন মানুষ হয়ে গেলাম।

সুপ্রিয়া জেদী মেয়ের মত বলল, 'যার মুখেই শুনি না কেন, কথাগুলো সত্য।'

'আরও গোটা কয়েক সত্য কথা তোমার জানা উচিত।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। আঁখি আঁলোর দেখলাম ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বললাম, 'লীলাবতী সরল, মিশুক। ওর দম্পত নেই। ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে। আর নিজের স্বার্থ সিঁথির জন্য জাপরকে কব্জাত নেকড়ের সামনে ঠেলে ধরে না।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার কপালি দুলল কপালী হয়ে গেল।

সুপ্রিয়া বলল, 'আমি তোমাকে কব্জাত নেকড়ের সামনে ঠেলে দিচ্ছি?'

হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কামার মত শব্দ বার হল, সব চেয়ে বিস্ময়কর কি জানো। মানুষ যখন নিজের চরম দুরভিসন্ধি সরলতা দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে।'

সুপ্রিয়া কঠিনভাবে বলল, 'কী বলতে চাও?'

'বক্তা খুব সতর্ক, এত সহজ যে বলটা খুব কঠিন হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন, আগাকে পাটনায় পাঠিয়েছিল কেন?'

'প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধা না। অফিসের কাজেই তুমি পাটনায় গেছ। কোন ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে ওঠে না।'

'স্বতীয় প্রশ্ন, যদিও প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি বাধা না, কিন্তু প্রশ্নগুলো তোমার শোনা দরকার। স্বতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে জামসেদপুরে পাঠানো হয়েছিল কেন, আগে থেকেই ডিলার আপপয়েন্ট করা হয়ে গিয়ে থাকলে, এই তামাশার কী দরকার ছিল? তৃতীয় প্রশ্ন--'

হঠাৎ সুপ্রিয়া অসাড় ভাবে বলে উঠল, 'অন্য কথা বলো।'

'কী কথা বলবো। কী কথা বলা যায় তোমার সঙ্গে?'

সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল। ও আর আমার দিকে তাকিয়ে নেই এখন। এতক্ষণ ও আমার দিকে ঝুঁক বসেছিল। ধীরে ধীরে ওপাশে সরে বসল। ওদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মূখ্য করে বসল। লেকের এদিকটা অন্ধকার। কিন্তু আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। সেই আলোতে লেকের জলের কিছুটা অংশ চিক-চিক করছে। ওপারের গাছগুলো এক একটা জমাটবাঁধা অন্ধকার। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হতে লাগল, সুপ্রিয়া যে শুধুমাত্র আমার ওপর অবিচার করেছে তা না, ও আমাকে ভয়ানক দূরের মানুষ বলে ভেবেছে। দূরের মানুষ বলে না ভাবলে মানুষ মানুষকে এত অপমান করতে পারে না। একটা চিঠি লিখেছিলাম পাটনায় পৌঁছে, সে চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলল, 'ফেরা যাক।'

'ড্রাইভারকে কাছে পিঠে দেখা গেল না। দরজা খুলে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলাম, সুপ্রিয়া আবার বলল, 'আমার ওপর রাগই করো বা আমার সঙ্গে বলার মত কথা খুঁজে নাই পাও, ক্ষতি নেই।' নিজেকে সামলে চলো। দেশপাণ্ডে ভাল লোক না। আজ সকালেই মিস্টার কাপড়কে ফোন করে জানিয়েছে, তুমি তার মেয়েকে পৌঁছে দিতে কোলকাতায় এসেছো। চাকরি করতে গেলে সুদাম নিজে চাকরি করা দরকার।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলাম, 'সুদাম দুর্নীতি মানুষের।' 'কিছু এসে যায় না। মিথ্যে কথা বার বা ইচ্ছা রটাতো পারে।'

'এত লোক থাকতে সবাই তোমার নামেই বা এত মিথ্যা কথা রটায় কেন?'

'আমি কি কথা?'

'তুমি ঘন ঘন দেশপাণ্ডের বাড়ি যাও। লীলাবতীর সঙ্গে পেছনের বাগানে রেডাও। পাটনায় অনেক বেড়াবার আরগা আছে।'

ককশ গলার বলে উঠলাম, 'তোমার স্বতীন্দ্রিয় দেখছি 'সব'ই হাড়িয়ে রয়েছে।'

আর এক মুহূর্তও বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। দরজা খুলে বাইরে এসে গলা ছেড়ে ড্রাইভারকে ডাকতে লাগলাম।

গাড়ি সাদা গাভিনা দিয়ে গাড়িহাটার দিকে চলেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। যদিও চুপ করে ছিলাম, মন শান্ত ছিল না। বারবার মনে হতে লাগল যোতনদের সঙ্গে আমারও বোঁয়ে বাওয়া উচিত ছিল। আমি জানতাম সুপ্রিয়া আজ কসবা যাবে না। জেনেশুনেও ওর দাঁড়ে পা দিলাম। শুধু আজ না, বরাবরই দিয়ে আসছি। একটা পাপের বোঝা যেন আমার মাথায় চাপানো আছে। একটা অভিশপ্ত মানুষের মত সেই যোনা যেন বেড়াতে হচ্ছে আমাকে। এই গম্ভীলিকা প্রবাহ থেকে আমি কি কোন দিনই মুক্তি পাব না? শুধুই কি অধৈর্য মত অন্য একটা ইচ্ছার ভাঙনায় ভুট্টে চলবো, যে ইচ্ছা কোন দিনই আমার নিজের ইচ্ছা হতে পারবে না।

হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা কানে এলো, 'সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য।'

একটা চাবুক যেন এসে পিঠে পড়ল। কাঁখালো গলার বললাম, 'যা অপ্রিয়, তাই সত্য না।'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে আবার বলল, 'রাগারাগির কথা না। কথা হচ্ছে নিজের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষেরই থাকা উচিত।'

'সে উচিত বোধ যদি থাকতো, তাহলে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হতে তুমি।' বলে সুপ্রিয়ার দিকে তাক্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সুপ্রিয়া বিস্মিত হল। 'আমার বিপদ হতো?'

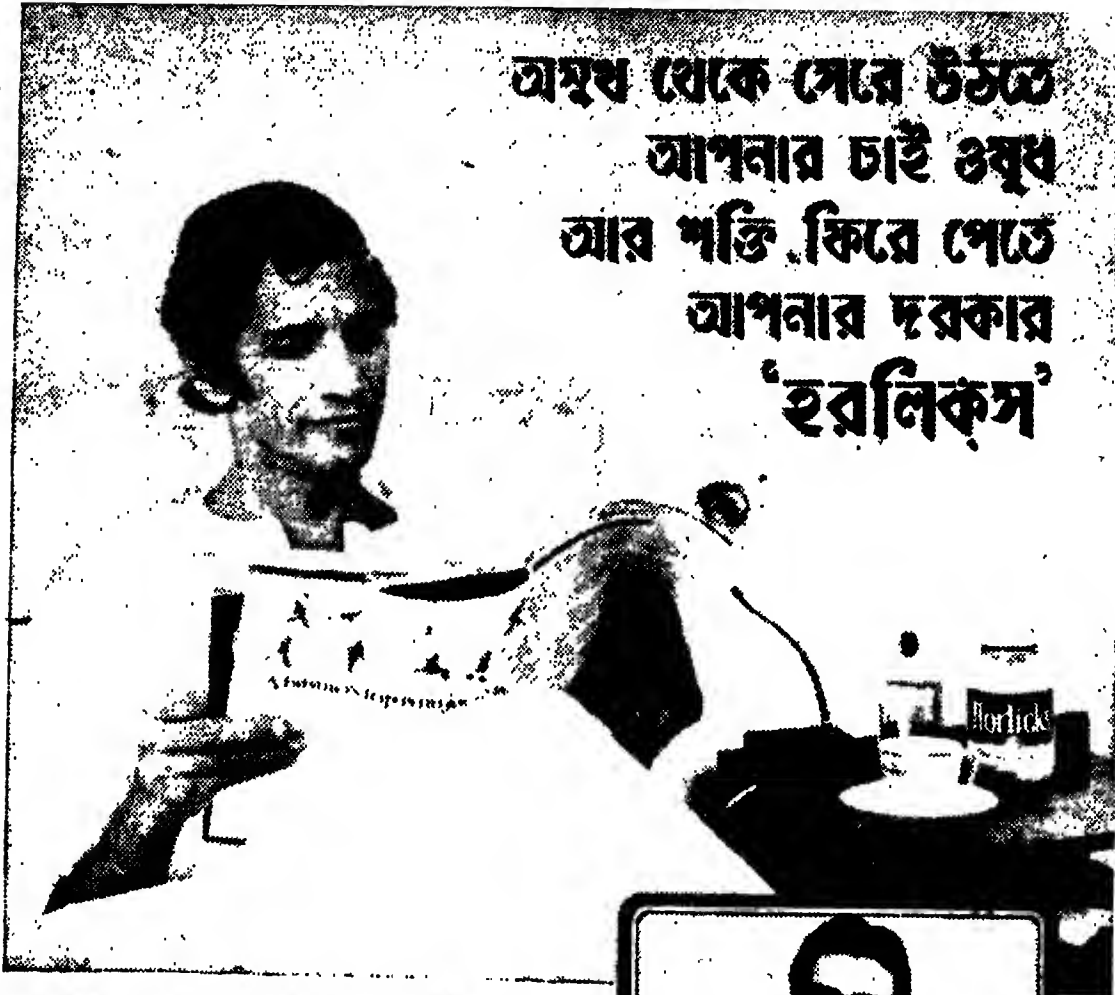
'হ্যাঁ তোমার।' একটা কদম্ব মানুষ যেন আমার ভেতর থেকে চেঁচাতে লাগল, 'কারণ নিজের স্বার্থ অপরের বিনিময়ে চরিতার্থ করতে বাধ্য হতো তোমার।'

সুপ্রিয়া ছোট্ট ধমক দিয়ে বলল, 'লীলাবতীকে দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ অনিমেষ একে দম্পত্য মত অবহেলা করে।'

'না, অনিমেষ তা করে না, উপায় নেই বলেই অনিমেষকে দূরে দূরে থাকতে হয়।'

'কেন? উপায় নেই কেন?' সুপ্রিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ও আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'উপায় নেই কারণ বিভা আর কোন স্ত্রীলোককে সহ্য করতে পারে না। আর কেউ যে অনিমেষকে ভালবাসবে, তার কাছে



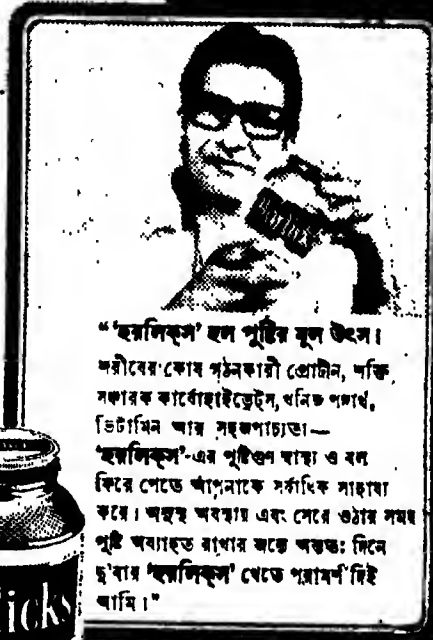
অস্থির থেকে সেরে উঠতে  
আপনার চাই ঔষধ  
আর শক্তি ফিরে পেতে  
আপনার দরকার  
'হরলিক্স'

অস্থিরবিশ্রুত আপনার শরীরের সব প্রোটিন আর  
পুষ্টিশক্তি নাশ করে আর তাই আপনি দুর্বল হয়ে  
পড়েন। তখন এই ক্ষতি পূরণের জগ্গে আর স্বাস্থ্য  
ফিরে পেতে আপনার দরকার বাড়তি পুষ্টি।  
'হরলিক্স' আপনাকে এই বাড়তি পুষ্টি যোগায়  
এমনভাবে যাতে আপনার দুর্বল পেটেও তা  
দিব্য হজম হয়। তাছাড়া 'হরলিক্স' তাড়াতাড়ি  
সেরে উঠতে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ করার  
শক্তি গড়ে তোলে আর অঘোরে ঘুমোতেও  
সহায়তা করে।

তাইতো সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা রোগভোগের  
পর 'হরলিক্স' খেতে বলেন। আজ প্রায় ১০০  
বছর ধরে তাঁরা এই পরামর্শই দিয়ে আসছেন।

**'হরলিক্স'-**

পুষ্টি ক্ষোভাতে অতুলনীয়



"'হরলিক্স' হল পুষ্টির মূল উৎস।

শরীরের কোষ গঠনকারী প্রোটিন, শক্তি  
সঞ্চয়ক কার্বোহাইড্রেট, বনিত পদার্থ,  
ভিটামিন আর লব্ধপাচ্যভা—

'হরলিক্স'-এর পুষ্টিগুণ স্বাস্থ্য ও বল  
ফিরে পেতে আপনাকে সর্বাধিক সাহায্য  
করে। অস্থির অবস্থার এবং সেরে উঠার সময়  
পুষ্টি অব্যাহত রাখার অল্পে অল্প দিনে  
ই 'হরলিক্স' খেতে পরামর্শ দিই  
যাযি।"

'হরলিক্স'—বেড়ি উঠে উৎসাহ

HL-94/ A

কাছে থাকবে বিজ্ঞা তা চায় না। চায় না বলেই পার্টনার গিরে তোমাকে ছোট্টলে থাকতে হয়।

মনে হল সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ দাঁত গিরে ঠোঁট কাষড়ে ধরে রইল। ও বেন কথা হারিয়ে ফেলল। ওর এই বিকল্প অবস্থা দেখে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠল। একে ক্ষতি-বিক্ষিত করার নেশা আমাকে পেয়ে বলল। 'লীলাবতীকে তুমি হিংসে করো।'

'লীলাবতীকে আমি হিংসে করতে বাব কেন? ও তো চাকরির ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না।'

'চাকরি ছাড়াও মানুষের অন্য ক্ষেত্র থাকে।' ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা আমাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছিল।

'এই ক' দিগের মধ্যেই অনেক জ্ঞান বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

সুপ্রিয়ার বিদ্রূপ গারে না মেখে উত্তর দিলাম, 'স্বাভাবিক মানুষ আ-জীবন অর্থ সঙ্গে থাকতে পারে না।'

সুপ্রিয়া বেন চাপাধরে গর্জ 'উঠল, 'তুমি স্বাভাবিক না। একটা বিদ্রী কক্ষ-জেলসে ভুগছো তুমি।'

'সে জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়, সে তুমি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। একশোবার তুমি। তুমি আমাকে তেড়ে চরমার করে গিরেছো। আমাকে লোভী করেছে, মানুষের চরম অধঃপতন—বিশ্বাসঘাতকতা, তুমি আমাকে দিবে তাই করিরেছো। এক-এক ধাপ করে আজ ক্ষত নীচে নেমে গেছি আমি।' অশ্রুকারের মধ্যে বেন আমি ঢুকরে কোঁদে উঠলাম।

ভেবেছিলাম, আমার এই অসহায় অবস্থার সুপ্রিয়া দৃষ্টিভিত্ত হবে। ও আরও গ্লোমে গেল। বিরতভাবে বলল, 'বা বলতে চাও সোজা ভাষায় বলো। কী বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে তুমি? কার সঙ্গে করেছে?'

সুপ্রিয়ার নিষ্ঠুরতার আমার অন্ত-রাখা হাছাকার করে উঠল, 'তুমি জানো না, কী করেছি আমি! অফিস ইউনিয়নের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি? ওরা যখন সংগ্রাম করার জন্যে জীবন-মরণ পণ করে ছিলো, তখন আমি চোরের মত পালিয়ে গিয়ে বড় পোটে করেন করিনি? আমার কলিগদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নর এটা?'

সুপ্রিয়া বেন আমাকে সাম্না দিতে চাইল, 'তুমি থাকলে ওদের এর চেয়ে বেশী কিছুই ভাল হতো না, বরং তোমার ক্ষতি হয়ে যেত। ওদের দাবী পুরোপুরিভাবে মিটেছে।'

'না, মেটে নি। ওদের আসল দাবী ছিল কোম্পানীতে ওদের একটা পাকাপোত স্থান দিতে হবে। ম্যানেজমেন্টে ওদের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই।'

সুপ্রিয়া ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, 'অবান্তর কথা-তুলে সবাইকে বিভ্রত করো না। তাতে কারও শান্তি হয় না।'

'বে প্রশ্ন তোমাদের বিব্রত করে, তাকেই তোমরা অবান্তর প্রশ্ন বলো। আমার প্রশ্ন ছিল, আমরা কারা। তোমার কাপড়ের সে প্রশ্নের বখাষ উত্তর দের নি।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'বেছেছ সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। অফিস আর বাই থেকে, নাটকের আলম না। তোমরা কারা, এ প্রশ্নের জবাব তোমাদেরই দিতে হবে। বাইরের কেউ সে উত্তর দিতে পারে না, দিলেও সেটা তোমাদের মনের মত হবে না। আমি যদি বলি, তোমরা একদল শ্রমবাহীন মানুষ, বাবা নিজের ভাল-মন্দ বন্ধুতে না পেয়ে অকারেগে শ্রমই চেষ্টাও।'

'তা হলে বলো, বাদের কাছে এই প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা একদল হ্রস্বহীন যন্ত্র। মানুষের সূখ দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের হ্রস্ব স্পর্শ করে না। কিন্তু এক-দিন আমরা এবং আমি বিশ্বাস করি, সেদিন খুব দূরে না, বোদিন এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতেই হবে।'

সুপ্রিয়া ভীক, ছুরির ফলার মত বলিকরে উঠল, 'সেদিন যদি আসেই, আমিও বলে রাখছি, আমি তোমাদের সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একই কথা বারবার বলে বাব, শ্রম চীৎকার চেঁচামেচি করে মানুষ কমতা অর্জন করতে পারে না, মানুষ কমতা পার নিজের কাজ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, ঐকান্তিক চেষ্টা দিয়ে।'

হাসির মধ্য দিয়ে বিষ ছড়াতে ছড়াতে বললাম, 'কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম, এটা নাটকের আসর না। তোমার কথা দিয়ে তোমাকেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

সুপ্রিয়া বেন আমার কথা শুনতেই পেল না। জেদী মানুষের মত বলেই চলল, 'আমি একদিন খুব সামান্য চাকরি নিয়ে এই কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলাম। আজ আমি যে উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তার জন্যে বাইরের থেকে কোন সাহায্য এসে নি। আমাকেই নিজের চেষ্টায় উঠতে হয়েছে।'

নিজের চেষ্টায় বলো না। তোমার রূপ আছে, বরস আছে, আর কাপড়ের মত পরেব মানুষ আছে, তোমাকে কে বাধা দেয়।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ হুপ করে গেল। কী বলতে গিয়েও বলল না। গাড়ি তখন গাড়িরাহাটার রেডলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐকিটায় বেশ আলো, সেই আলোয় সুপ্রিয়াকে দেখতে চাইলাম। সুপ্রিয়া মুখ ফিরিয়ে বসেছে। ওর মুখের একটা অংশ আর খাড় দেখা যাচ্ছে শ্রম। সুপ্রিয়ার এই অংশ দেখে ওকে সুপ্রিয়া বলে মনে হচ্ছিল না। সুপ্রিয়া গলার একটা হার পরেছে। আলো পড়ে সেই হার চিকিচক করছে।

হঠাৎ মনে হল, আমার এখানে নেমে পড়া দরকার। যোতনের সঙ্গে আজ রাতেই আমাকে দেখা করতে হবে। দরজা খুলে নেমে পড়লাম। ভেবেছিলাম, সুপ্রিয়া বাধা দেবে। কিন্তু সুপ্রিয়া একটা কথাও বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না পশ্চত। বে-

রুখ বসেছিল সে রকমই বসে রইল। গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে হল, সুপ্রিয়া ঠিক সেই-ভাবেই বসে আছে। মুখ ফিরিয়ে রাস্তাই দেখছে।

যোতন বাড়িতেই ছিল। বলল, 'কি ব্যাপার। ভাল অভিনয় পর্ব শেষ হল।'

'বাস-অভিনয় আমার কি। লীকসের উঁচু পদে রয়েছে, একটা খাতির জাঁতির করতে হয়।'

যোতন হেসে ফেলল, 'ভেরী ভেরী গড়। তোমার হাস্যব দৃষ্টি সত্যি সত্যি প্রশংসনীয়।'

অন্যপক্ষ বললাম, 'তারপর তোর খবর কি। আমাকে ক্ষতত একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

যোতন বিস্মিত হল, 'কেন?'

'একজন সুন্দরী মেরের সঙ্গ্য পাওয়া যে-কোন পুরুষের পক্ষে লোভনীয়।'

যোতন তাতাতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। বিশেষ করে যে টায়ে রত্নীন পালীর সঁপানী হতে পারে।'

'তুই লীলাবতীকে মন খইয়েছিস যোতন?'

যোতন নিজের মুখের সামনে হাত নাড়িয়ে বলল, 'মদ মদ বলিস না, ছোট্টলোকের মত শোমার। স্লিক্স বল, বেশ মজোরো গন্ধ। বেশ টানতে পারে রে মেরেটি।'

'ভাল করিস নি যোতন।'

যোতনের চোখ বেশ লাল দেখাচ্ছিল। সেই লাল চোখ ছোট করে ও বলল, 'আর বাই করিস, উপদেশ দিতে আসিস না। ইচ্ছে করলে এই বরনের বস্তা-পতা বাগী আমিও বহুং বহুং ছাড়তে পারি। সন্দেশী থাকার সময় এসব খুব কপজভ। তার-পর, এত রাতে এলি কেন, তাই বল?'

'আমাকে আমেরিকায় নিয়ে চল যোতন।' বলতে বলতে যোতনের একটা হাত ঢেপে ধরলাম।

'এই কথা। দেখিল শেষ পর্বন্ত রাহুর প্রেমের লোহার আমার জীবন ওষ্ঠাগত করে ডালিস না বেন।' বলে যোতন পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

কি করে হেসে ফেললাম, 'তোকে একটা জলদসের মত দেখাচ্ছে।'

যোতন বিরত হয়ে বলল, 'মদ না খেয়ে তোরা—বাগ্যালীরা বা নেশা করতে পারিস দেখার মত। আর বক-বক করতে হবে না, বাড়ি যা। আমি এখন ঘুমটো। কাল সকালে দেখা হবে। একসঙ্গে বেরোবো তখন। তোর ভিলা, পালপোর্ট আরও রা-বা লাগে স্নর ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে ওখানে তোর একটা চাকরির জোগাড় করা দরকার। গুডনাইট।'

যোতন এককক্ষ আমাকে তাড়িয়েই গেল।

—এগারো—

সকাল নটার সময় লীলাবতী এল। সঙ্গে এক যোতন। যোতন আমায় মুখ নক্সা হল। প্রথম দিনেই বুঝতে পেরে-ছিলাম, এ বাড়িতে সুপ্রিয়াকে যে নজরে



যেখানে সবাই, লীলাবতী সে দৃষ্টি-  
বাক্যই পায় নি। লীলাবতীর চোখের  
সে জন্মের কিছুটা দারী, আমার জন্মের  
হয়েছিল। এক একটা রূপ নিজের প্রথমতীর  
অপরকে পীড়া দেয়। লীলাবতীর রূপ সে-  
রকম। আগুনের শিখার যেমন দাহন থাকে,  
ওর সমস্ত শরীর ঘিরে রয়েছে সেই  
দাহিকাশক্তি। পতঙ্গ নিজেকে পুড়িয়ে  
মারতে সেই শিখার দিকে ধরে চলে। বড়-  
মামা, মাসীমা, মা সবার চোখে  
আমি একটা বানরে-আসা আতঙ্ক দেখতে  
পেয়েছিলাম। আমি বাতে আগুনের  
শিখার না পড়ে মরি, তাই নিয়ে ওদের  
উদ্বেগ।

বড়মামা তখনও অফিসে বেরোন নি।  
বাইরের ঘরে এসে প্রথমেই উনি লীলাবতীকে  
দেখলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে  
ডাকলেন। বড়মামার চোখে যেন ভৎসনার  
দৃষ্টি। ঘোতনের দিকে তাকিয়ে বললাম,  
'তোরা এলি ভালই হল; বাড়িতে একা-  
একা ভাল লাগছিল না।' কথাটা বলার  
হঠাৎ দরকার ছিল না। বলতে হল বড়  
মামাকে শুনিয়ে। মামা যাতে বুঝতে পারেন  
ঘোতন আর লীলাবতী এক সপ্তেই এসেছে।  
লীলাবতীর সঙ্গে সৌহার্দ্য যদি কারও  
গড়ে উঠে থাকে, সে ঘোতনের সঙ্গেই।  
আমার সঙ্গে না। বড়মামা সবাইকে দেখে  
নিরে বেরিয়ে গেলেন। কোন কথা বললেন  
না।

ঘোতন হঠাৎ বলে উঠল, 'এক-একজন  
মানুষ নিজেকে নিয়ে ভীষণ ভাবে। তোর  
মামাটি সেই ধাতের মানুষ।'।

ঘোতনের কথার অবাধ হলো, 'কি  
করে বুঝলি?'

সন্ধ্যার কথার উত্তর না দিয়ে ঘোতন  
বুড়িরে বলল, 'এইসব মানুষেরা শুধু যে  
নিজে ক্ষুণ্ণ পায় তা না, অকারণে অনেককেই  
দুঃখ দেয়। বাড়িতে বসতে ভাল লাগছে  
না। চল, বাইরে যাই কোথাও।'

'কোথায় যাবি?'

ভাঙ্কিলোর ভাণ্ডিতে ঘোতন বলল,  
'যাবার জায়গার অভাব। নে, ওঠ।'

যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বল-  
লাম, 'তোরা দুজনে একসঙ্গে এলি কি  
করে রে!'

ঘোতন উত্তর দেবার আগেই লীলাবতী  
হেসে উঠে বলল, 'টেলিগ্যাথি মারফৎ  
যোগাযোগ করে।'

পার্ক স্ট্রীটের একটা 'বার'-এ এসে  
দু'কল ঘোতন। আমি আপত্তি তুলেছিলাম,  
'এই সাত সকালে মদ খাবি ঘোতন?'

ঘোতন উত্তর দিল না। শুধু ঠোঁটের  
একটা পাশ একটু, বেকাল, যার মানে  
হল, মদ খাওয়ার আবার সময় অ-সময়।

ঘোতন খুব রসিরে রসিরে 'প্লাসে  
চুমক দিচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে লীলা-  
বতীকে দেখছিল। লীলাবতী একটা আগুন  
রংগের শাড়ি পড়েছে। ও যেন জ্বলছে।  
ওর দিকে বেশীকণ তাকিয়ে থাকতে চোখ  
খরখর করছিল। মদের একটা 'প্লাসে আমার  
দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঘোতন বলল, 'মনে

হচ্ছে জীবনে মদ খাব না। ঘরে দ্যাখ,  
নে।' হাত পুড়তে বাজিলাম, ও আবার  
বলল, 'ভর পেয়ে কী হবে। ভর পেতে  
পেতে দেখবি, ভরটাই এক নম্বর ভোকে নিয়ে  
পিংপং খেলেছে। পড়িস নি সেই কবিভাটা,  
কাওরান্ডস। ডাই মেনি টাইমস বিফোর  
ডেথ। বেশী লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু যে-  
টুকু শিখেছি, একেবারে সাজা। ঘিল,  
ফাটিয়ে ফেললেও ভুলবো না।' বলে ঘোতন  
হঠাৎ মক্কা হাসিতে ফেটে পড়ল।

তখনও ইতস্তত করছিলাম, খাব কি  
খাব না। আমার অবস্থা বুকে নিয়েই যেন  
ঘোতন বলে উঠল, 'তোরা দুটো সাঁথি ভোকে  
নিরে খেলা করছে। একটা চাইছে ভোকে  
পেছনে টানতে, আর একটা চাইছে পেছন  
থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিতে।'

কাতর কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'আমি কী  
করবো ঘোতন?'

ঘোতন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,  
'পিছনে হটার চেয়ে সামনে এগোনোর  
মধ্যে অনেক বেশী প্রিল রয়েছে। আর চিন্তা  
না করে দু'গা বলে দে গলার ঢেলে।'

ঘোতনের কথা মত সবটাই এক সঙ্গে  
গিলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে গলাটা জ্বলে  
উঠল। একটা বিকৃত শব্দ জিভটাকে  
আড়ুট করে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে  
ঘোতন আর লীলাবতী এক সঙ্গে হেসে  
উঠল। লীলাবতী ঘোতনের সঙ্গে পাল্লা  
দিয়ে মদ খাচ্ছিল। ওর সমস্ত মুখ টুস-  
টুসে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জোনাকীর  
মত জ্বলছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর  
ঘোতন প্রশ্ন করল, 'কিরে, কেমন লাগছে?'  
ফিক করে হেসে ফেললাম, 'মন্দ না,  
কানদুটো বেজায় গবম হয়ে উঠেছে। মাখটা  
খুব হালকা লাগছে।'

ঘোতন মুখ সরু করে বলল, 'আরও  
কত কি লাগবে। তখন রোজ খেতে চাইবি।  
ভরে ভরে বললাম, 'কিন্তু সবাই যে  
বলে মদ খাওয়া খুব খারাপ।'

ঘোতন বলে উঠল, 'বোকারা বলে, আর  
যাদের পরসো নেই তারা বলে। আর কারা  
কলে জানিস, সেই সব লোকেরা যারা  
মরবার আগে বহুবীর মরছে, তারা। আমি  
যেদিন আমেরিকার গিরে পেঁছলাম, পকেটে  
কি ছিল জানিস? একটা ডলারের নোট,  
গোটা কয়েক সেন্ট, আর ছোট্ট একটা  
কাগজে ছোট্ট একটা কবিতা।' ঘোতন সরু  
করে বলতে লাগল, 'অদৃষ্টেরে শুধালেম,  
চির দিন পিছে/অস্বাভ্য নিষ্ঠুর কলে কে  
মোরে ঠেলিছে/সে কহিল, ফিরে দেখো,  
দেখিলাম আমি/সম্মুখে ঠেলিছে মোরে  
পশ্চাতের আমি। সেই আমিটাকে তোর  
চিমে বার করে আনতে হবে যে কিনা তোকে  
সামনের দিকে ঠেলবে।'

বিদ্রান্তভাবে বললাম, 'কিন্তু সেই  
আমিটা যদি ঠেলতে ঠেলতে আমাকে  
পাতালের অন্ধকারে নিয়ে যায়।'

ঘোতন দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত  
করে বলল, 'যার যদি থাক। সেই অন্ধকারের  
মধ্যে ভাঁজের গিরে তুই বলবি, হে ইন্ডার  
আমাকে আলো দাও। জগৎ আলোয় করে  
তোলো। দেখবি সত্যি সত্যি আলোর  
স্থান পাৰি।'

হেসে ফেললাম, 'যা, এ যেন বাইবেলের  
গল্প।'

ঘোতন প্রতিবাদ করল না। চেয়ারের  
পিঠে হেলান দিতে দিতে শব্দ বলল, 'না  
বললাম, বরস হলে বুঝবি।'

'তুই যেন বরসে আমার চেয়ে কত  
বড়।'

'বরসে না হোক, জানে তোর ঠাকুরার  
ঠাকুরা।'

ঘোতনের কথা বলার ধরণে লীলাবতী  
খিল খিল করে হেসে উঠল। লীলাবতীর  
হাসিটা খুব মিষ্টি। শুধু যে মিষ্টি তা  
না, প্রাণবন্তও। হাসি ধামিয়ে লীলাবতী  
আমাকে বলল, 'আপনার বন্ধুটি রিয়ার  
জেম।'

বুঝতে না পেরে ঘোতন বলল, 'কার  
কথা বলছেন মিস দেশপাণ্ডে?'

'আপনার।' বলে লীলাবতী মিটিমিট  
করে হাসতে লাগল।

ঘোতন কান্দা করে মাথা নুইয়ে বলল,  
'থ্যাংকস ম্যা।' তারপর গলা ছেড়ে ঘোতন  
ডাকল, 'বোয়ারা।' ও কাছে আসতেই-হুকুম  
করল, 'আউর দো পেন।'

লীলাবতী বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

আমি বলে উঠলাম, 'আর খাস নে  
ঘোতন। তোর নেশা হবে। আপনিনও আর  
খাবেন না মিস দেশপাণ্ডে। অপরের  
বাড়ীতে থাকতে হয় আপনাকে। ও'রা কী  
না কী ভাববেন।'

লীলাবতী কথা বলল না। ঘোতন  
বলল, 'নেশা করার জন্যেই তো খাই। নেশা  
হলে খুব মজা লাগে না?' ঘোতন যে  
আমাকে প্রশ্ন করেছে বুঝতে পারি নি।  
চুপ করে আঁচ দেখে ও আবার ধমকের  
সুরে বলল, 'এমন কিছু শব্দ প্রশ্ন না যে  
এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে। ইয়েস,  
অথবা নো, যা হয় বলে দে একটা।'

'তা তো বটেই। নেশা না হলে মানুষ  
শুধু শব্দ পরসো খরচা করবে কেন?'

আমার কথা শুনে ঘোতন বলল, 'দ্যাটস  
রাইট, তোর হবে। চল তোর পাসপোর্ট  
ইত্যাদির কবস্থা করে দি-ই।'

'আজ থাক ঘোতন।'

ঘোতন স্নেহের হাসি হেসে বলল,  
'নট টুমরো। কাল কাল করে যে কাল  
বয়ে যায় বন্ধু, যা করবে আজ। শুধু আজ,  
শুধু আজ। নট টুমরো।' বলতে বলতে  
ঘোতন উঠে দাঁড়িয়ে বাজিল। টাল খেয়ে  
বসে পড়ল।

হেসে বললাম, 'কী হল?'



সম্পাদকের সঙ্গে

## অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা

স্বল্পে বাঙালী, এবং বিদেশে ফরাসী-  
কেন, সম্পর্কে নানারকম গল্পগুচ্ছ ছড়িয়ে  
পড়ছে, আভাব্য বশে। হেমিংওয়ে আভার  
অর্জিত থেকেই লিখেছিলেন "মডেল  
ফিল্ট"-এর টুকরো টুকরো লেখাগুণি।  
অল্পে আভার গল্প বাংলা সাহিত্যেও  
ফিল্ট নয়। ফিল্ট ছিল তাঁর আভা,  
পল্লির আভা, শনিবারের চিঠির আভা,  
কৃষ্ণকান্তি আভা—এমন আরো বহু আভার  
আভার।

দৈনিক বাইশে জানুয়ারী। আভা দিতে  
নয়, অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা সম্পা-  
দকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, ৭২।১  
বাংলাভার স্ট্রীটের বাড়ীতে। উপলক্ষ যেটা  
ছিল তার কথা পরে বলছি। ছাতের ওপরে  
প্যাডেল বঁধা থেকে শব্দ করে মাইকের  
গলগলে শব্দ—সবই ছিল। সভাপতি অমদা-  
শঙ্কর রায়। মণ্ডের মাঝখানে বসেছিলেন,  
কিংবদন্তীর নারকের মতো অমৃত-সম্পাদক  
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ঘোষ, দৈত্যকী মেজাজে।

শ্রীকৃষ্ণকান্তি ঘোষ এবার নিখিল  
জগৎ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি  
নির্বাচিত হয়েছেন। এসব নেই, এই সম্বন্ধনা  
বক্তার সুরোচ্চ। কৃষ্ণকান্তি বক্তার প্রবীণ  
সাহিত্যিক কলম, জগৎ মতো, ছোটো-  
ছোটো কলম পাতেন না। চলতে ফিরতে ধবং  
হয়। তিনিও এসেছিলেন, অমৃতের লেখক-  
হিসেবে, সম্পাদক জাভিনন্দন জনরতে।

বলেন, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য  
সম্মেলনের একটি সেকশনের অতি ছিল,

যখন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ  
মেনের মতো মানুসেরা এই সম্মেলনের  
সভাপতি হতেন। কিন্তু অনেকদিনের অব-  
হেলায়, এই সম্মেলন গুরুত্ব হারাতে বসে-  
ছিল। আমি আশা করব, তুহারবাবু, সেই  
গোরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কেননা,  
তিনি যোগ্য ব্যক্তি।

খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

আচম্ভ্যকুমার মেনগুপ্ত ধানবন্ধুকে  
আশ্চর্য্য আবহ তৈরী করতে পারেন। শব্দ  
নির্বাচনেও তাঁর জড়ি নেই। কিছুকাল  
আগেও, তিনি স্মরণ করতেন যে, নোয়া-  
খালির বাঙাল শিশুকে সাউথ সুদারবান  
স্কুলের ছেলেরা ফোঁপয়ে মারত, পূর্ব-  
বঙ্গীয় উচ্চারণের জন্য। এইবার পূর্ব-বঙ্গ  
বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হয়েছে। যেন বলতে  
চান, দাখো, বাঙাল ভাষার কী ভেজ।  
কী মিহমা!

কিন্তু এমন একটা তৃপ্ত-পরিবেশে কৃষ্ণ  
কেউ আক্ষেপের ভাষা খুঁজে পান না?

আচম্ভ্যবাবু বললেন, তুহারবাবু এমন  
মানুষ, আসন যার অলংকার নয়। আসনেরই  
তিনি অলংকার। সাহিত্যকেই তিনি ভাল-  
বাসেন না, সাহিত্যিকদেরও ভালোবাসেন।  
তাঁর সংগশে এলে, নিখিল সঙ্কে র মান  
করার পূণ্য অর্জিত হয়। নিখিল ভারত  
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়ে,  
তিনি আসরকে সম্মানিত করেছেন।

তখন শীত ও শীতের কুশাশা নেমেছে  
ঘন হয়ে। মাথার ওপরে খোলা আকাশ।

মণ্ডের সামনে হলুদ রঙের প্লাইউডের  
চেয়ারগুদিলতে বসে ছিলেন নানাবরসী কবি-  
সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর গরিষ্ঠ অংশ।  
প্রমথনাথ বিশী গল্প করছিলেন শচীন্দ্রনাথ  
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কৃষ্ণ ধরের মুখে  
প্রসন্নতার আবেশ। রাম বসু একটু কেন  
অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। এবং কৃষ্ণ  
সান্যালকে দেখে মনে হচ্ছিল, ছোটোখাটো  
একটা ভাষণ দিতে তিনি অনিচ্ছুক নন।

খুব লজ্জুক চেহারার কবিসাহিত্যিক-  
রাও সেই মুহূর্তে স্বেচ্ছামুখে হয়ে  
গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ, উপলক্ষের সীমা ছাড়িয়ে,  
সবলেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন  
ধূত। লক্ষ্যটা কি? সম্পাদকের সঙ্গে পুস্ত-  
মিলনের সংযোগে সেতু নির্মাণের চেষ্টা?  
তাই হবে হয়তো। আভা ও আনুষ্ঠানিক  
ভাষণের স্বসম্মোত বইছিল তখন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন : নিখিল জগৎ  
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগে ছিল, কৃষ্ণকান্তি  
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। বাংলা সাহিত্যের  
দিকশাল পুরস্কারই তার সভাপতি হতেন।  
সম্মেলনের দিনগুলি ছিল, আমাদের কাছে,  
দুনিবার, কিংবদন্তীর গল্পের মতো,  
আকর্ষণীয়।

কিন্তু ক্রমে ঐ সম্মেলন, তার গুরুত্ব  
হারায়। প্রকৃত সাহিত্য-সাধকের পরিচরিত,  
জনপ্রিয় লিখিয়েরা, সভাপতির আসনে  
বসতে থাকেন। তরুণেরাও বসিত। এই  
পরিপ্রেক্ষিতে, তুহারবাবু, একটি আশ্চর্য

কাজ করেছেন, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পর্যায়ে নতুন রত সম্মেলনের মতো। সেটি হলো, যখন যে-রাজ্যে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হবে, সেই রাজ্যের ও আঞ্চলিক ভাষার প্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে শ্রদ্ধাভাজন করার ব্যবস্থা, তিনি করেছেন। এর ফলে, ভাষার পরিধি বাড়ল। হিন্দীর মূর্তি মটবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই ভেবে আশাশ্রিত যে, তুহারদার, যোগ্য লোক। তাঁর মতো মানুষ যদি তরুণদের উৎসাহিত করেন, এবং স্বাধীনতার জন্য দরজা বন্ধ না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ক্ষেত্র গৌরব ফিরে আসবে।

মনোজ বসু, তুহারদারকে বলেন 'তুহারদা' তাঁর কণ্ঠস্বরে আনুষ্ঠানিকতার লেগামা ছিল না। যেন ঘরোয়া আসরে বসে আলাপ-আলোচনার ব্যস্ত।

বললেন, 'তুহারদা, এবার যে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। তিনি দেশে এবং বিদেশে খ্যাতিমান পুরুষ। আমি বাংলা-দেশে গিয়েছি। সেখানকার মানুষ তাঁকে গভীরভাবে প্রাণ্ডা করে। ভারতবর্ষেও তিনি পরিচিত। সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে জানে।

বললেন, বাংলা অন্যান্য বিজ্ঞান-মন্ডল ল্যাংগুয়েজের মতো নয়। হিন্দীর চেয়েও বড়ো। একথা যেন কখনো ভুলে না যাই। তুহারদার কাছে আবেদন, ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতে হবে।

মনোজ বসু আরো বললেন, আমরা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনের কথা বলে চোঁচিয়ে মরছি। কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ দিচ্ছি না। তুহারদা সেই প্রমাণ দিয়েছেন। হিন্দীকে, দক্ষিণীভাষাকে, তিনি মর্যাদা দিয়েছেন, পুরুষকার দিয়ে। আমার বিশ্বাস, তাঁর

নেতৃত্বে আমরা আবার স্বাধীনমুখ হতে পারব।

এরপর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি শ্রুতিচারণার আবেগ নিয়ে কথা বলছিলেন। মাইকে তাঁর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট আন্তরিকতার ছিটিলে বাজিল।

বললেন, কিংবদন্তী-প্রেষ্ঠ পুরুষেরা আমার সামনে, চারদিকে, বসে আছেন। এই পরিবেশে, আমি কিংবদন্তী-প্রেষ্ঠ মানুষকে প্রাণ্ডা জানিয়ে, নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের নায়ক বললেও তাঁকে, অত্যাধি হয় না। তাঁর পরিবারের সাহিত্যপ্রীতি ও আজ জনশ্রুতির বিষয়। আমার মনে হয়, শ্রীমত তুহারকান্তি ঘোষ মনেই একটা বিরাট ইনস্টিটিউশন। তাঁর কাছে আমাদের দাবীও অনেক। তরুণ কবিসাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি, তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে, হাঁদের ধ্বংস প্রবন্ধের সঙ্গে সাহিত্য জড়িয়ে আছে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে, তাঁদের যেন স্থান হয়।

কথা বলতে বলতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যেন, দশ বছর আগেকার দিন-গুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন। নাকি গত-প্রাতীহকের সমকালে দাঁড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন, অতীতের কথা?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বললেন, আমি তখনো লেখক হইনি। সবে লেখা শুরু করেছি। প্রথমে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম অমৃত পরিকায়। ছাপা হয়নি। আবার পাঠালুম। ছাপা হল। তারপর থেকে খত লেখা পাঠিয়েছি, কোনোটেই ফেরত যায়নি। আজ 'সসংক্ষেপে' স্বীকার করছি, অমৃতের মধ্য দিয়েই আমি প্রথম জনস্বীকৃতি পাই। এবং সেই কাগজের সম্পাদক শ্রীমত তুহারকান্তি ঘোষ। আমার উপন্যাসও প্রথম ধারা-বাহিকভাবে বেরোল, তাঁরই সম্পাদিত অমৃতে।

মাইকের স্পষ্ট মর্ডান জরুরী রূপ-ধারণার কি রকম জেনে আনন্দিত হতে যান! ভালো কথাগুলির গুরুত্ব বোধ হচ্ছিল না।

বললেন, বাগবাজারের ঐতিহাসিক ঘোষ-পরিবারের কথা স্মরণিত। শ্রীমত তুহারকান্তি ঘোষকে দেখলে আমার মনোবৃত্তি বারবার মনে পড়ত। আমি কলকাতা, আসার-আসারের বাঙালী। কিন্তু কলকাতার বাঙালী কলচারের সার্থক প্রতীকগুলির, আমাদের মধ্যে যে-রকম পরিচয়তার উপস্থিতি, সেই-ভাষেই নিজেকে আমি বিশ্বাস রাখতে পারিনি। ফাঁসি সম্পাদিত মর্ডানে আমি একটা সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখেছি, প্রায় এক বছর ধরে। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এরপর এলেন কামরুজ্জামান বিহারী। তিনি বললেন, তুহারদার, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। জাতীয় কর্মকাণ্ডের দক্ষ ও কৃতি ব্যক্তি। বহু আগেই, তাঁর এই পদে নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু তাঁর বলার ভাষাতে পরিহাসের সুরটি প্রচ্ছন্ন ছিল না। বললেন, তুহারদার, আপনাকে মানচিত্র নিয়ে বসতে হবে। ভবিষ্যতে যখন সম্মেলন করবেন, তখন এমন ছায়গাই নির্বাচন করতে হবে, যেখানে দর্শনীয় কোনো কিছুই থাকবে না। কেননা, এই উপলক্ষে কেউ সাহিত্য করতে যান না, এলফ্যান্টা গৃহা, কি অন্য কিছু দেখতে যান।

আরেকটি কথা। কোনো প্রকাশককে যেন ভবিষ্যতে এই সম্মেলনের সভাপতির আসনে বসানো না হয়। কেননা, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ট্যুরিস্ট আর ব্যবসায়ীদের জন্য নয়।

কথাটা খাঁটি। এবং আরো খাঁটি কথা বলেছেন বিহারী মিত্র। তাঁর ভাষার : 'আমি লেখার কাজে রিহাসল দিয়েছি। বলার কাজে দিইনি। কাজেই...'



সম্বন্ধনা সভার বনমূল, মনোজ বসু, অমদাশঙ্কর রায়, তুহারকান্তি ঘোষ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেন অস্বস্তি। তিনি বললেন, তুষার-  
বাবু সঙ্গীত হইলেন একন্যে আমি  
জানিতাম। তবে, সম্মেলন করে যে সাহিত্য  
হয়, একথা আমার মনে হয় না। এবার  
কল্যাণসাহিত্য সম্মেলনের খবর কেবল  
বঙ্গভূমিতে বোঝাচ্ছে, অন্য কাগজে  
কোনোদিন। কেন? সাহিত্য যদি বড় জুকা  
হয়, তাহলে কি এটা ঘটত, না, ঘটতে  
পারত? আশা করি, তুষারবাবু, এই অনাচার  
স্বাধীন করতে পারবেন।

সম্মেলনখবর ঘোষ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে  
কল্লেন, আমি গদ্যে কিছু বলব না। কবিতা  
লিখে এনোছি। তাই পড়ে শোনাব।  
কবিতাটির নাম 'তুষারভারতী'।

বঙ্গ সাহিত্যের চুড়া  
সাহিত্য মাধক  
ভারতীর একনিষ্ঠ  
নিভা আরধক  
হে তুষার, তব কলিত  
নিখিলক দ্যুতি  
গড়ে পঠকের চিত্তে  
নবীন প্রত্নতি  
প্রভাতের; মর্ত্যে তুমি  
আনিলে অমৃত,  
সগরের সত্যানের  
হল সঙ্গীত  
নতুন জীবনে; তব  
প্রতিভা স্বাক্ষর  
ধটাইল বঙ্গদেশে  
নব যুগান্তর।  
মহাশয় পিতার রচা  
অমৃতবাজার  
যত্নবশে করে পূর্ণ  
সম্পদা তোমার।  
শব্দ ভারতী তার  
বীণাখানি তুলে  
সমীপিল তব হস্তে  
সর্ব দ্রুত তুলে।  
জানি তুমি সুরাঙ্কিতে  
মর্যাদা তাহার।  
ভারতের প্রতিমূর্তি,  
লহ নমস্কার।

কমল ভাণ্ডারী তুমি  
পরম বৈকব  
সাকল্যে মণ্ডিত হোক  
আজ মহোৎসব।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় তুষারবাবুর বসিষ্ঠ  
বন্ধু। অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে  
পারেননি। কিন্তু লিখে পাঠিয়েছেন,  
'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের  
সভাপতিত্বপে নির্বাচিত হওয়ার, অমৃত-  
বাজার ও অমৃত পরিবার সুবিখ্যাত  
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি খোকে সম্বর্ধনা  
আপন করতে, আজ যে আয়োজন হয়েছে,  
শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি সেই  
অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারলাম না।  
আমার এ অক্ষমতা, আশা করি, আপনার  
মার্জনা করবেন। এ অক্ষমতা যে কতখানি  
মর্মান্তিক, তা ভাবার প্রকাশ করতে পারা  
যায় না। কারণ, শ্রীমান তুষারকান্তি আমার  
আত্মীয় আত্মীয়, আমার একান্ত আপনার  
জন।'

দীপকারণন বসু মাইকের সামনে  
দাঁড়িয়ে কেন পূর্ববর্তী বক্তাদের প্রসঙ্গ  
টেনে কথা বলছিলেন। সবাই সত্যক।  
মনোযোগী।

দীপকাবাবু বললেন, তুষারবাবু কেবল  
বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবেননি, ভারত-  
ভাবনার প্রাণিত হয়ে দুটি পুরস্কার দিয়ে  
আসছেন ১৯৬৬ সাল থেকে। আজ যদি  
ধাসামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হত এবং  
কোনো অসমীয়া সাহিত্যিক পুরস্কৃত  
হতেন, তাহলে হয়তো তার ফলাফল  
ভালোই হত।

এরপর ভাষণ দিলেন বুদ্ধদেব গুহ।  
তিনি বললেন আগে তিনি শিকার কাহিনী  
লিখতেন, কিন্তু তাতে তেমন সাড়া পাননি।  
এলেন উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্রে।  
অমতে আমি উপন্যাস লিখোছি, এবার  
শুরু করছি নতুন উপন্যাস। তুষারবাবুর  
কাগজে এ সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

সম্বর্ধনার উত্তরে তুষারবাবু, অমদা-  
শঙ্করের দিকে ডাকিয়ে বললেন, বড়তা বড়

কলিতকর। বাঁমা শোমনে, ভবিষ্যৎ পরিভ্রম  
কম হয় না।

ঠিক সেই আভার মেলাজে ধীরে ধীরে  
কথা বলছিলেন তিনি। খুব আশ্বেত আশ্বেত  
বললেন, সুধীর সরকারের দোকানে তারি  
আজ্ঞা জমত।

হ্যাঁ। কি বলছিলেন কেন? ঢাকার  
সম্মেলন করলে কি হয়? হোক না।

অমদাশঙ্কর আপত্তি জানিয়ে বললেন,  
তা কি করে হবে? বাংলাদেশ এখন আলাদা  
রাষ্ট্র। ভিন্নদেশ। ওখানে সম্মেলন করতে  
হলে আলাদা নাম নিতে হবে। ভারত-  
বাংলাদেশ সাহিত্য সম্মেলন বা ঐ রকম  
কিছু। না হলে অপরিসীম উত্তেজনা, ভেবে  
দেখছেন?

প্রোতাদের কাছে বেশ উপভোগ্য মনে  
হচ্ছিল। আভা? হ্যাঁ, আভাই বটে। তারি  
অমৃত-সম্পাদকের সঙ্গে গল্প করতে  
এসেছেন। লেখক ও পাঠকের সঙ্গে যিনি  
যোগাযোগ ধীরে সেন, নেপথ্যে থেকে,  
তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এই-ই  
তো উপায়। সম্বর্ধনা কেন তারই উপলক্ষ।

তুষারবাবু বললেন, আপনারা আমাকে  
সম্মান দিচ্ছেন, সেজন্যে আনন্দিত। এই  
যে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করছি—  
তার মূল্য কি কম? আপনারা আমি  
আত্মীয় বলে ভাবি। আমার বিশ্বাস,  
ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ  
হবে। এবং নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য  
সম্মেলনের মারফতেই হবে।

কে যেন বললেন, বৌবনে-তুষারবাবুকে  
মনে হত রাজার কুমার। আজ মনে হচ্ছে,  
তিনি রাজা। সম্রাট। এই সম্রাটই এখন  
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের  
সভাপতি।

এরপর সভাপতি অমদাশঙ্কর বললেন,  
আমার পরম হিতৈষী ও বন্ধু তুষারকান্তি  
খোকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আমি নিজেকে  
ধন্য মনে করছি।

—শুভকর পট্ট

## সদ্বাগতম—মহাকাশচারিণী

বিশ্বের প্রথম এবং অস্বতীয়া মহা-  
কাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা অব্যাহত  
এসেছিলেন কলকাতায়। এসেছিলেন ২৮  
জানুয়ারী। দীর্ঘ ১০ বছর আগে ঠিক  
মহাকাশ জয়ের পুরী ভারতবর্ষ তখন কল-  
কাতার ভ্যালেন্টিনা এসেছিলেন। সেটা  
ছিল এক ঐতিহাসিক সফর। এবার তিনি  
এক মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে ভারত  
সরকারের অতিথি হিসাবেই এসেছেন  
ভারতের প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।  
সম্পন্ন সখী, হলেন—সোভিয়েত মহিলা  
সাহিত্যের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী জেনিরা  
পুস্কুরনিকোভা (একদা বলশোই বালে  
কল্লেন লিপনী ছিলেন) এবং সদস্য

গ্যাশিনা কোলোভা। শ্রীমতী তেরেসকোভা  
নিজেও ঐ মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

কিয়ানবাঁটিতে তাকে সম্বর্ধনা জানাতে  
এসেছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী  
শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, ভারতের মহিলা  
ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি,  
ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি, প্রদেশ  
কংগ্রেস মহিলা শাখা এবং কয়েকটি মহিলা  
সংস্থা। ভি আই পি লাউজ থেকে শুরুর  
করে রানওয়ের সর্বমুখী ছিল আবালবৃদ্ধ-  
বিশিষ্ট ভর্তি। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির  
তরুণ সদস্যরা তাকে গার্ড অফ অনার—এ  
সম্মানিত করেন। তারপর চম্পনের টিপ  
মালা এক ফুলের তোড়ায় সম্মানিত করা  
হয় অতিথিবর্গকে। ভারত-সোভিয়েত শ্রীমতী

জিন্দাবাদ' ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা যুগ  
যুগ জিও' ধনিত্তে বিমানবাঁটি মূখ্যরিত  
হয়ে ওঠে। এরপর অতিথিদের আনা হয়  
ভি আই পি রুমে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের  
জবাবিত হয়ে ওঠেন শ্রীমতী তেরেসকোভা।  
প্রাথমিক পরিচয়াদির পর শুরুর হয় কল-  
কাতা পরিভ্রম। গত '৬০-র কলকাতা তাকে  
বড়ই আকৃষ্ট করেছিল। তাই দুব্বার বাড়িতে  
ছুটে এসেছেন রাজধানী দিল্লি থেকে কল-  
কাতার। দ্বন্দ্ব কিয়ানবাঁটি থেকে সোজা  
হোটেল জিনিসপত্র রেখেই কলকাতা  
দেখতে বোঝেন পড়লেন শ্রীমতী তেরেস-  
কোভা ও তার সঙ্গীরা। সঙ্গ দিল্লিছিলেন  
কলকাতা সোভিয়েত দূতাবাসের পক্ষ  
বনচারিবন্দ। মহামতি লেনিনের স্ট্যাচুতে

দমদম বিমানঘাটিতে সোভিয়েট মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্য ও পর্যটনমন্ত্রী শ্রীতরুপকান্ত সেন (সর) বামে) মাদাম তেরেসকোভাকে স্বাগত জানান। ছবিতে বাম দিক থেকে শ্রীতরুপকান্ত সেন, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনন্দন ইসলামকে দেখা যাচ্ছে।



প্রস্থা জানিয়ে শুরুর হোল ফলকাতা প্রমণ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রাপ্ত। সময় খুবই কম। এরই মধ্যে চুকিয়ে ফেলেন দুপুরের খাওয়া। যোগ দিলেন পর পর দু-দুটো সংস্করণ। অনুষ্ঠানে। মাত্র একদিনের ছোট সময় এবারের এই কলকাতা পারিভ্রম্য। আরো আশা ছিল তার মনে কিন্তু তা আর ফলবতী হলো না। হ্যাঁ, ১০ বছর আগের কলকাতা আর আজকের কলকাতায় অনেক গরমিলই খুঁজে পাচ্ছিলেন শ্রীমতী তেরেসকোভা। পয়টিকের দৃষ্টিতে তবু বারবারই কতজায় অতিভূত হয়ে পড়ছিলেন কলকাতার জনগণের কাছে। সোভিয়েত মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে তাই তিনিও সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি উচ্চাঙ্গের সূচনা আরো জানান যে ভারতের যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই ভারত-সোভিয়েত বন্ধন তিনি লক্ষ্য করেছেন। সে-বন্ধন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, শিল্প-বিজ্ঞান-কারিগরী, এমনকি সামাজিক স্তরেও প্রসারিত হয়েছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে এই বন্ধনের বন্ধন আরো মজবুত হবে।

শ্রীমতী তেরেসকোভার চাঁদে যাওয়া পৃথিবীর কাছে বিস্ময়কর হলও সমগ্র নারীসমাজের কাছে এ এক গর্বের বস্তু। ভারতীয় মহিলারা কোনদিন চাঁদে যেতে পারবে কি? এমন প্রশ্ন অনেকেই শ্রীমতী তেরেসকোভাকে করছিলেন। তিনি হেসে একটাই জবাব দিচ্ছিলেন, শব্দ ভারত কেন যেকোন দেশের মেয়েরাই যেতে পারে। তবে তাকে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে হবে। খুব কঠিন অধাবসায় ছাড়া কি আর এসব সম্ভব হয়? তার আগে সে-দেশকে 'বিজ্ঞান ও কারিগরী' ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নত হতে হবে।

তেরেসকোভার কাব্য ছিলো ট্রান্স-ড্রাইভার, আর যা সূজাফলের প্রাথমিক। এই পরিবারের কেউ কি, সৈদীন ভাবতে পেরেছিল যে, এই মেয়েই এমন এক দারাজাক কণ্ড ঘটিয়ে বসবে-কর ফলে ইতিহাসে তার নাম চিরদিন জলজল করবে? একাত্তা আর অধিকময়ের ফলই তা সেই রবার ফ্যাক্টরীর লালকায় কম্পিটিভ্যালোন্টনা ক্রমে ক্রমে সূজাফল কম্পি থেকে সূতো প্রযুক্তিবিদ্যা আরম্ভ করেন। দিনে-করতেন কারখানায় কাজ, আর রাতে পড়াতেন। এয়ার ফোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং

মাকালোভীর স্নাতক হয়ে একেবারে মহাকাশযাত্রী। এসবই সাধনা কটা বহুরক কণা। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায় না থাকলে আজকের সফলতা সম্ভব হত কি?

আর পাঁচজন মেয়ের মতই পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখী মহিলা। স্বামী আর কন্যা নিয়ে সখের সংসার। চাঁদে যাওয়া এবং ঘরকমার কাজ করা দুটোই তার কাছে সমান সম্মানজনক। তিনি জীবন মহাকাশে যেতে চান এবং যথাকথ ডোড-জোর চলেছে। কবে যাবেন—এমন প্রশ্ন করার তিনি সহ্যসা বললেন, দিখটা এখনও ঠিক হয়নি, সেটা আমার দেশ ঠিক করবে। আজ্ঞা আপনি তো মেয়ে, একজন মেয়ের চোখ দিয়ে আপনর কাজে মহাকাশ কেন্দ্র লেগলিছিল, এমন প্রসঙ্গ উল্লেখ তিনি বলেন, এসব ক্ষেত্রে মেলে-মেয়ের কোন প্রভেদ নেই। আমি একজন বৈজ্ঞানিক। আমি বৈজ্ঞানিকের চোখেই সৈদীন মহাকাশ দেখে-ছিলাম। হ্যাঁ, মহাকাশে গেছি। আমার যাকো। এক সেটাই আমার কাজ।

—সিপ্রা আভিভ্য



# জলসা

সাহিত্য ও সংগীতে তুহারকাণ্ডিত ঘোষের  
সম্বন্ধনা.

গত ২৫শে জানুয়ারী যুগান্তের অফিসের ঘরোয়া উৎসব-সম্মান আড়ম্বরহীন, ব্যয়স্বল্পে অনুষ্ঠিত। কিন্তু বিদগ্ধ রসিকের প্রস্থার স্নেহে আন্তরিকতার সমন্বয়। টলটলে, পূর্ণিতার চিত্তহারী। উপলক্ষ—নিখিল ভারত কল্ল সাহিত্য সম্মেলনে এ বছর সভাপতিত্ব রূপে নির্বাচিত শ্রীযুত তুহারকাণ্ডিত ঘোষের প্রতি তার অনুরাগী অমৃতের লেখক, পাঠক ও কর্মীদের উদ্যোগে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় ২২ জানুয়ারী দৈনিক যুগান্তের অফিসে।

সাহিত্যিকদের রঙিন মনের উজ্জ্বলতার সঙ্গে সমান্তরাল ছন্দে চলছিল রবীন্দ্র জগীত শিল্পীদের সুরের দীপারতি।

অনুষ্ঠান সূর্য হর শ্রীমতী মায়া সেনের নিষ্ঠানভীর কণ্ঠের 'আজি এ আনন্দ সম্মান' দিয়ে। স্বপ্নদাপোর উদাত্ত সুরে রচিত হয় এক শূচিস্থলের পরিবেশ। তারপরই 'আনন্দ সম্মান'র এক নির্মল আনন্দকে শিল্পী অল-কুন্ত করেন টপার মীড ও জমজমার অঙ্গুর কারুকাঁড়িতে 'হৃদয়বাসনা আজ' দিয়ে। লক্ষ্যকুণ্ডলিন তুহারবাবুর রচিত এই সাবেকীংগের গান দিয়ে যেন শিল্পী অভিনন্দিত করেন।

বাণী ঠাকুর পরিবেশন করেন 'দুঃখ রাতে ছে নাথ'—সুন্দর সুমার্জিত কণ্ঠের শিল্পী-চরিত্র পরিবেশনা শ্রোতাদের মন অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

সুখিয়া সেন তার আপন পরিবেশন-শৈলীর আধারেই সুর করেন 'আজি এ আনন্দ সম্মান' দিয়ে। তারপর 'ফুল বলে



বাগুকের মদন কুণ্ড  
তুহারকাণ্ডিত ঘোষ সম্বন্ধনা সভার অপূর্ব  
জায়গাল বিস্তার করে দশকমন্ডলীকে  
অভিভূত করেন।

মায়া সেন



বাণী ঠাকুর

সুখিয়া সেন



সাগর সেন

ধন্য আমি'র পথ বেয়ে এসে থামল 'মোর সম্মান' এর সাধ্য ছায়া। গানের নির্বাচন, সুরের আবেদন এবং শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গীর উজ্জ্বল ছাপ ছিল প্রতিটি গানে।

সর্বশেষ শিল্পী সাগর সেনের সুগাম্ভীর ভরাট কণ্ঠে সূচিত হোলে মর্যাদাদীপ্ত উপসংহার 'আজি শূভদিনে পিতার ভবনে', 'এক সভা' এবং বিশেষ অনুরোধে পরিবেশন করেন আরো তিনটি গান। বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী শিল্পী তার স্ব-মানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই তার ভক্ত-শ্রোতারা শেষ অবধি তাঁদের আসনে অবচলিত ছিলেন।

শিল্পীদের মেজাজকে সুসঙ্গাতে উদ্দীপ্ত করেছেন সর্বশ্রী গোবিন্দ বসু, স্বপন অধিকারী, চঞ্চল খান ও ননী উপাধ্যায়।

সেদিনের উত্তাল সংগীত-সম্মান যেন সাহিত্য ও সংগীতের প্রবীণ সমন্বয় ও পৃষ্ঠপোষকের প্রতি নবীন যুগের একটি মধুর প্রণাম।

বন্ধুদল কানন দেবী সম্বন্ধিতা  
স্বর্নগবে তরঙ্গ প্রাণের সবুজ স্বপ্ন  
দিয়ে গড়ে ওঠা এক অবসারিক প্রতিষ্ঠান

'বন্ধুদল' তাদের বাৎসরিক উৎসব উদযোজন করেন শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষকে সম্বন্ধনা জানিয়ে।

সম্বন্ধনার উত্তরে বিনম্র ভাষণে কানন দেবী বলেন, 'সম্বন্ধিত হবার মত এতটুকুও কিছ' যদি আমার মধ্যে থেকে থাকে তা আমার প্রতি সহস্র স্নেহশীল দেশবাসীর স্মৃতি। এই সুযোগে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্বন্ধনা আজকাল বহু জায়গায় পাবার সুযোগ ঘটছে—তবু আজকের এই সম্বন্ধনা আমার কাছে বড় মধুর। কারণ আমার সন্তানত্ব প্রতিবেশী তরুণ দল এই সম্বন্ধনা সভার উদ্যোক্তা। সংস্থা প্রসঙ্গে বলেন, 'বন্ধুদল' সংস্থা নতুন। কিন্তু নতুন নয় এর অন্তরের সৌন্দর্য-পিপাসা, দুঃখ, স্বপ্ন, সমস্যা-জর্জরিত জীবনের তিক্ততাকে উপেক্ষা করে আকাশের দিকে মনকে মেলে ধরার স্বপ্ন। সকল বাধাকে জয় করে এই আনন্দ-বরণের প্রতি যেন এরা অক্লান্ত থাকে।

কানন দেবীর হাতে মানচিত্র ও অর্জমান করেন অমিতাভ গুপ্ত ও পলি গুপ্ত।

দ-দিনের উৎসব সভার এক একটি দীপ জ্বালিয়ে দিলেন যে সব শিল্পীবৃন্দ, তাঁরা

হলেন সঙ্গীত হেমন্ত মথোপাধ্যায়, শ্রীকেন  
মথোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়,  
কল্যাণ বসু, শক্তিপদ বসুয়ার, বটক নন্দী,  
গোরাগঙ্গা দেব। সঙ্গীতের মাঝে বৈচিত্র্য  
সৃষ্টি করেন সঙ্গীত হেমন্ত মথোপাধ্যায়  
ললিত কন্ঠের আধার দিয়ে। যোগেশ দত্তর  
মুকতিনাম ও খুব উপভোগ্য হয়।

সঙ্গীতে সবাই লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী।  
এদের সম্মুখে নতুন করে কিছু বলার নেই।  
তরুণ শিল্পী গোরাগঙ্গা দেব উদীয়মান। কিন্তু  
পরিণতির সূক্ষ্ম আভাস তার সরেলা হাত  
ও ছন্দ প্রকরণে। স্থানীয় শিল্পী শক্তিপদ  
বসুয়ারের কন্ঠও মধুর।

অনুষ্ঠান সন্তোষভাবে পরিচালনা করবার  
কৃতিত্ব প্রাপ্য স্বপন ভট্টাচার্য ও তপন  
ভট্টাচার্যের।

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের রক্ত-  
জয়ন্তী উপলব্ধি : এ বছর মহাজাতি সননে  
তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন রক্ত জয়ন্তী  
বর্ষপুর্তি উপসব উদযাপন করেন।  
সঙ্গীত সম্মেলনের রক্তজয়ন্তী উপসব  
ভারতে-এই প্রথম। এই সপ্তে এই সংস্থার  
সঙ্গে যুক্ত আর দুটি প্রতিষ্ঠান অল বেঙ্গল  
মিউজিক কম্পিটিশন এবং তানসেন মিউ-  
সিক কলেজেরও রক্তজয়ন্তী পালিত  
হয়েছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সভা ও  
শিষ্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা  
প্রিন্সেসেন মথোপাধ্যায়কে একটি বিশেষ  
সম্বর্ধনা সভা আহ্বান করে সম্মান জ্ঞাপন  
করেন। এ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন  
তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম সভা-  
পতি কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।  
শ্রীরায়চৌধুরী সেনা ধরাণার সঙ্গীতধারার  
একনিষ্ঠ প্রচারক বলে তাকে অভিনন্দিত  
করেন।

এবারের দীর্ঘ দশদিনব্যাপী অধি-  
বেশনে যন্ত্রসঙ্গীতের তুলনায় কন্ঠসঙ্গীত  
নিঃপ্রভ।

কন্ঠসঙ্গীতে মনে রাখবার মত অনু-  
ষ্ঠান করেছেন ওস্তাদ আমীর খাঁ ও জিতেন্দ্র  
অভিষেকী।

আমীর খাঁর সাহিত্যভাষার সংযত  
গাম্ভীর্য অন্য সব ব্রটিকে তুলিয়ে দিয়েছে।  
মরু লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়ে উঠেছে  
তার শব্দকল্যাণ, চন্দ্রকেন্দ্র ও চন্দ্রমধু।  
এ-শক্তি দুলাভ বলেই আজও আমীর খাঁ  
অজের।

জিতেন্দ্র অভিষেকী তাঁর শ্রু-দিনের  
অনুষ্ঠানে গাইলেন ভূপালী, সোহিনী, রাম-  
কলী। কন্ঠের পরিসর, মাধুর্য ও আবেগ  
মিলে অভ্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয় শ্রীঅভিষেকীর  
অনুষ্ঠান।

বহুদিন বাদে শোনা গেল শ্রীমতী  
পদ্মাবতী শালিগ্রামের গান।

মণোম্বর খাঁর গানে অনুভবের চেয়ে  
আলোকশৈলীর কৌশল প্রদর্শনের অপর-  
তাই বেশী।

ভাল লাগলো শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের  
বাগেশ্রী পঞ্চম। আগেকার চাঞ্চল্য-আলোক  
প্রদর্শনের ব্যগ্রতা-স্বরের মোহনায় সংহত।  
ব্রহ্মলানুষ্ঠানে শ্রীশিশির গুহ তাঁর

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রভাষের অনূর্ব সম্ভব  
খটিয়েছেন।

বাগিশ দেব বর্মণের আলাপ উচ্চ মানের—  
সেই ভুলনার ধামার কিছু স্থান।

যন্ত্রসঙ্গীতে নিখিল মথোপাধ্যায়ের  
বাগেশ্রীর আলাপে গুরুদেব আলোড়িতদের  
সরলতা ও শূচিতা—আবার গানের অঙ্গে  
আলি আকবর খাঁর কম্পনার রং লেগে  
এক আশ্চর্য শ্রী ফটে ওঠে। এর ওপর  
শিল্পীর অম্লিষ চিত্তের অনুধাবন ও  
আছেই।

প্রবীণ শিল্পীস্বর শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের  
সরোদ ও বিমল মথোপাধ্যায়ের সেতার—  
শোনিবার মত।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের 'কৌশিকী কানড়া'  
ও মণিলাল নাগের 'মারু বেহাগে' দুটি  
যৌবনদ্যুত মনের গতিবৈচিত্র্যের দুটি পথ-  
রেখা মেলে ধরেছে।

যতীন ভট্টাচার্যের বাজনায় সুরের চেয়ে  
লয়কীরার প্রাধান্যই বেশী।

আমজেন্দ্র খালি খাঁর সরোদ শিল্পী  
সকল আকর্ষণই ছিল। কুমার রাজেন্দ্র  
সিং-এর বেহালায় 'গজবী টোড়ি' আর

হিমেনে ছড়ের শক্তিশালী স্বর ছাড়াও বে  
কন্ঠটি মন আকর্ষণ করে সে হোলো তাঁর  
উত্তর ভারতীয় বাদনশৈলীর সঙ্গে দক্ষিণ  
ভারতীয় স্বরকল্পনের সূ-লগ্নাতি।

গৌর গোম্বামীর বাঁশের বাঁশিতে  
নাঝানো 'চাঁদনীকেদারা' আসরে বেশ একাধা  
টাদের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইররাত  
খাঁর 'দেশ' তানে লয়ে আঙ্গিক দক্ষতার স্ন-  
বদ্য।

ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর সানাই-এ 'বৈরাগী  
ভৈরব' রাগিণেবের ববনিকার কৃষ্টিতে তুলস  
প্রভাতী আলোর শৃঙ্খ, শান্ত পুকারিত-  
আত্মমগ্নতা।

কানাই দত্তর তবলা লহরার, বোলার  
ঠেকা ও কারদা তার আনন্দ ও দক্ষতার  
স্বাক্ষরবাহী।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনু-  
ষ্ঠান হোলো কৌশিক বসাকের সেতার, শ্রীম  
বসুর কন্ঠসঙ্গীত এবং সঞ্জয় মথোপাধ্যায়ের  
তবলা লহরার প্রচুর প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুরা বার।

—চিত্রাঙ্গদা



হৃদয়ের স্বাস্থ্য রক্ষার ও সংক্রমণ রোধে  
বিশেষ উপযোগী। মধুর গন্ধবুজ

**বোরোলেপ**

এই এন্টিসেপটিক ক্রীমের ব্যবহার সংক্রমণ হতে রক্ষা করে আপনাকে  
হৃদয়ের স্বাস্থ্য রক্ষা রাখে। বিবিধ সাধারণ চর্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।  
সকল ক্ষততে নিয়মিত ব্যবহারে বোরোলেপ গাঢ় চর্মকে শুষ্কতা ও রক্ততা  
হইতে রক্ষা করিয়া শ্রু ও মোলায়েম রাখে।

কস্টমেন্ট ডিভিশন



**বেঙ্গল কেমিক্যাল**

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, আগ্রা, গুয়ালাটর



८ नमः

এস্টেটের রাণীরাণী প্রাণায়নীর জন্মাং-  
সবে। পাঁচ দশমিন একসঙ্গে যোগ করল  
কি উপায়ে রাণীর পনেরো লক্ষ টাকা দামের  
হীরেয় গহনা হস্তগত করা যায়। বহু  
কৃষ্ণের লড়াইয়ের পরে পাঁচ দশমিনের  
একজন মনোমোহন সুনীলকে এবং অপর  
দশমিন গুরুত্ব সিং তার রাণীরাণী  
প্রাণায়নীর নিয়ে পৃথক পৃথক মোটরে  
রওনা হল। বাকী তিন দশমিন কিনো  
খামা, প্রেম চোপড়া ও প্রাণ-অপর তিন-  
খামি গাড়ী চেপে ওদের সঙ্গে যোগ দিল।  
পথে বহু ধস্তাধরিত ও জুড়ো-যুগ্মের  
পরে সুনীল মনোমোহনের মত্বা ঘটতে  
নমর্থ হল। পরে তারই মোটর চেপে সেই  
গুরুত্ব সিংহের সম্মুখীন হল। দুই  
মোটরের সংঘর্ষ যখন চব্বি উঠল, তখন  
জ্ঞানহারা রাণীকে মোটর থেকে ফেলে  
দিয়ে গুরুত্ব সুনীলবংশী মনু নারায়ণের  
সম্মুখীন হল। প্রচণ্ড মল্লধর্মের পরে  
যখন প্রমাণিত হল দুজনই সমান সক্ষম

মনঃ নারায়ণ প্রযোজিত 'ও দূশমন' ছবির এই হচ্ছে কাহিনীসারাংশ। ছবির নাম যদিও 'ও দূশমন' আসলে তা হওয়া উচিত ছিল 'পাঁচ দূশমন বনাম সুদীল' বা আরও ভালো শব্দে 'সুদীল'। কারণ ছবির নায়ক সুদীল-এর বলাকাঁই ও প্রে ভালেম্বাসা দেখাবার জন্যই এই ছবি এবং প্রোডাক্টার মনঃ নারায়ণ নিজেকে এর কাহিনীকার ও নায়ক সুদীলের ভূমি অভিনয়কারী, শিল্পী। তা ছাড়া পাঁচ দূশমনের সাফাং পাওয়া যায় ছবির প্রায় মাঝামাঝি পৌছবার পরে। তার আগে, পর্যন্ত তার ছোট ভাই, বিপথগামী রাজক প্রায় তার চোখের সামনেই নিহত হওয়া এদের মা ও পুত্রসিং-কর্তা গোপাওয়ার সুদীলকেই রাজকুর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা এবং নিজের দোষস্বাদের চেষ্টাই সুদীলের প্রকৃত হত্যাকাবীর সম্মান প্রবর্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এই 'পাঁচ দূশমন'-এর সম্মুখীন হওয়ার ঘটনাগুলিকে দর্শক প্রত্যক্ষ করেন। ছবির দ্বিতীয় অংশে যখন দর্শক মনোমোহন, বিনোদ খান্না, প্রে চোপড়া, শওঘা সিংহ ও প্রাণ-এই পাঁচ দূশমনের কার্যকলাপ দেখবার জন্যে উদগ্রীব, তখন এদের মধ্য কাউকে কোনোক্রোয়ফর্মের শিশি নিয়ে, কাউকে বা ছ' চেন্দাব রিভলভার নিয়ে নিজ নিজ অস্তিস্থি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেন। 'কিছু শেষ পর্যন্ত দর্শক কি দেখেন? দেখেন যে, প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে সুদীল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এবং ছবির কাহিনী অনুযায়ী প্রতি লড়াইয়ে সেই জয়লাভ করবে এও জামা কখনো সাসপেন্স সেটক সেটি হচ্ছে, এ পাঁচ দূশমনের মধ্যে এক সেই হত্যাকাবী 'রাজক'। শওঘা সিংহ-ই হল রাজক। এটা জানবার পরও দর্শকদের একটি উপরি লাভ হয়। যখন তারা জানতে পারেন যে প্রাণ আসলে দূশমন নয়, সে হচ্ছে একজন যোয়েন্দা।

‘ও দ্ব্যশমন’ এমন একটি ছবি. . .  
 সর্বাংশে বটকপ্রধান এবং সেইসঙ্গেই  
 ছবিতেই প্রকাশ্যে বিংশদশ শতাব্দীর  
 মনোভাৱের প্রকাশ্যেই স্পষ্টতঃ

॥ निराण्णी नसिद्वन्ना ॥

১৪ জানুয়ারীর সম্মতীয় সম্মেলন  
উদ্দেশ্যে সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলাসমূহ  
দ্বিতীয়বারের মতো আনন্দময় ব্যক্তিদের



## नाम्दीकार

आम-आमही मद्यक अडिनम

- ১৯৮১ রক্তনা নটী বিনোদিনী ৪র্থ
- ১৯৮২ রক্তনা নটী বিনোদিনী ৫ম
- ১৯৮৩ মন্তে অজনা নাট্যকারের সম্মানে ২২৮তম
- ১৯৮৪ রক্তনা শের জাফগান ২২৫তম
- ১৯৮৫ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩১৪তম
- ১৯৮৬ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩১৫তম
- ১৯৮৭ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩১৬তম
- ১৯৮৮ ধামবাবু তিন পরসার পালা ৩১৭তম
- ১৯৮৯ স্ববীন্দ্র সেন শের জাফগান ২২৬তম
- ১৯৯০ রক্তনা নাট্যকারের সম্মানে ২২৯তম
- ১৯৯১ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩১৮তম
- ১৯৯২ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩১৯তম
- ১৯৯৩ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২০তম
- ১৯৯৪ রক্তনা নটী বিনোদিনী ৬ষ্ঠ
- ১৯৯৫ রক্তনা নটী বিনোদিনী ৭ম
- ১৯৯৬ ধামবাবু শের জাফগান ২২৭তম
- ১৯৯৭ ধামবাবু নটী বিনোদিনী ৮ম
- ১৯৯৮ রক্তনা শের জাফগান ২২৮তম
- ১৯৯৯ কল্যাণেশ্বরী মাসা রক্তের দিন ১২৬তম
- ২০০০ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২১তম
- ২০০১ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২২তম
- ২০০২ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২৩তম
- ২০০৩ শেখ জাফগান শের জাফগান ২২৯তম
- ২০০৪ রক্তনা নটী বিনোদিনী ৯ম
- ২০০৫ রক্তনা নটী বিনোদিনী ১০ম
- ২০০৬ রক্তনা নাট্যকারের সম্মানে ২৩০তম
- ২০০৭ রক্তনা নটী বিনোদিনী ১১তম
- ২০০৮ রক্তনা নটী বিনোদিনী ১২তম
- ২০০৯ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২৪তম
- ২০১০ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২৫তম
- ২০১১ রক্তনা তিন পরসার পালা ৩২৬তম
- ২০১২ হুতুগ শের জাফগান ২৩০তম
- ২০১৩ কোমল শের জাফগান ২৩১তম

## ସୋଟ୍ ଚଢ଼଼ାଉ ଆଦିନୟ

নির্দেশনা : অভিজ্ঞতাপূর্ণ বঙ্গদেশপাঠ্য

উদ্ভাসিত। সৌদনের পুরস্কার বিতরণসভায় প্রতিভাচর্চিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের আধিকারী শিক্ষার্থীদের ডিস্ট্রিক্ট ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং ডুয়ারবাবু। চার কিংবা পাঁচ বছরের শিশু-কাল থেকে সুরু করে পনের বছরের কিশোর কিশোরীদের নিষ্ঠা ও প্রযত্নের শিক্ষাগ্রহণ ও যোগ্যতায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিবরণ শুনলেন এই প্রবীণ শিশু বিদ্যময়ে। কৌতুহলে, আনন্দে, আগ্রহে। তারপর তাঁর সন্ন্যাস, সন্দর্ভ স্নেহকরা ডাবণে অভিনন্দন জানালেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ব্রীসমর চট্টোপাধ্যায়কে।

তিনি বলেন, শিশুদের এই বিচিত্র  
মেলায় আমি সময়বাবুর কল্পনার  
আকাশকে যেন দেখতে পেলাম। সন  
দুর্ভোগের অবসানে এই প্রতিষ্ঠান তার  
লক্ষ্যে যেন পৌঁছয় ঈশ্বরের কাছে আজ এই  
আমার প্রার্থনা।

দীর্ঘ আঠারো দিনের অন্তর্ধানের সব-  
গুলিতে উপস্থিত থাকা আমাদের পক্ষে  
সম্ভব হয় নি কিঞ্চিৎ মিঠুয়ার বিনিদ্র-  
রজনীতে প্রকৃতির সঙ্গ খেলা, মায়ন চট্টো-  
পাধ্যায় পরিচালিত কথক নৃত্যের আশ্রকে  
‘রূপলেখা’ নৃত্যাভিনয়ের আসরের আনন্দ  
থেকে বঞ্চিত হইনি।

সংস্কার অন্যতম কম্পী শ্রীমসিত মৈত্রের কাছে জানা গেল এবারের উৎসব বাইরের শিল্পীর অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের অনুষ্ঠানের প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে বেশী।

একালের জোরালো অনুষ্ঠান 'তালিকায় ছিল 'সং অফ ইন্ডিয়া', 'ছড়া গান' 'হ-ব-ব-র-ল' 'ভ্যামিং চেলো', 'ছড়ায় শ্রীঅরবিন্দ', চন্দ্রালিকা, মীরাবাই, রামাপ্রণ, ডিস্টোম্যা গ্রুপের 'মধুর অংগ'। এছাড়া নৃত্যের 'রূপকথা' নৃত্যনাট্যে লোকরঞ্জনের 'স্বৰ্ণকামন' ও 'মৌগাজিরা এল বনে' ও দর্শকের প্রচুর আনন্দ দেয়।

অনার্যিকা কল্যাণ-গর্গ-এর 'জ্যোতিষ' -এর  
শত উদ্ভাষন অন্তর্গত

গেল রবিবার, ১৬ জানুয়ারী, সকাল ১০টার রবীন্দ্রসদন-এ অনামিকা কলা-সংগম-এর 'লোকগণ'-এর শব্দ থান-স্থান-উদ্বেোধন সদস্যগণ হারেছে। সংস্থা সভাপতি শ্যামসুন্দর কানোরিয়ার স্বাগত ভাষণের পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণকান্ত ঘোষ উদ্বেোধনী ভাষণে বলেন : 'অনামিকা কলাসংগম সংস্থা বিত্তের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মীদের মধ্যে একটি যথার সম্পর্ক পড়ে। তোলবার উপায়স্বরূপ এই যে নতুন, নতুন, সশীতানুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে মালিকের মধ্যে কর্মীদের পরোক্ষাধিকারের ব্যবস্থা করেছেন, এই অভিনব প্রচেষ্টাকে আমি সর্বাঙ্গিকরূপে স্বাগত জানাচ্ছি।' উপস্থিতদের নাটকানুষ্ঠান, নতুনমাটা, বালি প্রভৃতি প্রচুর বায়সাধা অনুষ্ঠান। অনামিকা সংস্থা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক

সহায়তার একদিকে যেমন তাদের কর্মীদের  
এইদিকে শেখবার সুযোগ করে দিচ্ছেন,  
অন্যদিকে তেমনই এই সকল দৃশ্যশব্দে  
(পারফর্মিং আর্ট-এর) অনুষ্ঠানের  
বথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম  
হবেন। উল্লেখ্যন অনুষ্ঠানের পরে বোম্বাই-  
এর শচীনশঙ্কর সম্প্রদায়ের দি ট্রো' এবং  
অপরপর ব্যালে প্রদর্শিত হয়। (লোকমুখ  
সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা দৃষ্টব্য)

আমরা শুনে সদুশী হুদুম, 'অনামিক'  
গোষ্ঠীর সুযোগ্য নাট্যপরিচালক শ্যামানন্দ  
জালান এ-বছরে ভারতীয় সমগীত-নাটক,  
আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছেন।  
অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিই এই পুরস্কার  
দেওয়া হয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ  
অনুভব করছি।

ঢাকুরিয়া সাধা মহাজনের  
বার্ষিক অনুষ্ঠান : ঢাকুরিয়া  
সাধা মহাজনের সভাপতি  
পত্নী ১৪ জানুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর  
তে ডায়াল রংগমঞ্চে স্বাদশ বার্ষিক প্রীতি  
অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন, এই উপলক্ষে  
অন্যান্য বৎসরের নায়ী এবারও তাঁরা যে  
নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তা ছিল স্বগত  
রমেশ গোপালীনা বৃন্দল অভিনীত নাটক  
‘বেদনা পাশ’। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মহাজন  
সভাপতি বীণেশ্বরীনাথ উপস্থিত দর্শক-  
দের স্বাগত, সম্মান জানান ও তাঁর  
মাতৃদেবী বহুতা বা বাংলা রংগমঞ্চে শতবর্ষ-  
পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় নাট্যশিষ্টে  
সম্মতিতে পদবীন্দন ও বহুগান শিল্পীদের  
অবদান গভীর প্রাণে সহকারে সমরণ  
করেন।

অপর সজারা অনুষ্ঠানের প্রথা  
আকর্ষণ "কেদার রায়" নাটকটি অভিনয়  
করেন। অতীতের বিশিষ্ট শিল্পীসম্মুখে  
বহুবার আলো ও এই প্রখ্যাত নাটকটি  
সর্বসমুদয় অভিনয় মজলিস সজারা  
এবারও প্রদান করেন যে তাঁরা নাট্য  
পরিবেশনায় সত্যি দক্ষতার দাবী করতে  
পারেন। ঐতিহাসিক চিত্রভূমিকায় রচিত  
এই নাটকের সামাজিক পরিপ্রেক্ষি বিশেষ  
ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও এই ব্যাখ্যায়  
যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাটকটি  
সম্প্রদায়িক—দক্ষিণা ঘোষাল ও প্রসাদ  
বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট চরিত্র রূপায়  
অভিনয় দৈপ্ত্যের পরিচয় দেন—প্রসাদ  
বন্দ্যোপাধ্যায় (কেদার রায়), হরিশোপা  
মন্দ্যোপাধ্যায় (চাঁদ রায়), দক্ষিণা ঘোষা  
(কাভালো), নন্দ মন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমন্ত  
সংশীল দত্ত (সিংগা খাঁ), মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
(মহানীসিংহ), সংশীল নাথ (কামর), জমি  
চট্টোপাধ্যায় (মুন্সুফ), শ্রীমতী পাই  
(সোমো) ও কুমারী মঞ্জু ভৌমিক (রঙ্গী)  
অন্যান্য ভূমিকায় প্রশংসারোগ্য অর্জন  
করেন সবশ্রী জীবন খটক (রজক), শ্রী  
প্রসাদ মন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বনাথ), ভাস্কর  
মিত্র (নারায়ণ রায়), বসন্ত বসু ও অনিল  
ঘোষ। এদের সকলের দলগত অভিনয় ও



অন্যদিকের সুযোগসম্পন্ন উপস্থিত দশক-বৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।  
জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গির সুলভাশক্তি বৃদ্ধি।

**অনামিকা কলাসংগমের নতুন পরিকল্পনা**  
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'অনামিকা কলাসংগম'-এর কর্মসূচির সূচনা যারা সুপরিচিত, তারা এদের প্রশংসা না করে পারবেন না। মৌটেকী, রামলীলা, কাণ্ডালা এবং সস্তা নাট্যগানের আসরের উত্তরে চোখের সামনে এঁরা পরপর ছুঁলে ধরেছেন প্রকৃত শিল্প-পদ্ধতি অভিনয় কলা, লোকসঙ্গীত ও নৃত্য, নৃত্যনাট্য এবং এর অবশ্যজ্ঞাবী কলাসম্পদ ভাঁদের ঘাটেছে, রুচিপরিবর্তন। শুবই তাই নয়, 'অনামিকা' শিল্পপীঠগোষ্ঠী শ্যামনন্দ জালানের দক্ষ নির্দেশনায় হিন্দী নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়ে উন্নত মানের এমন একটি আদর্শ কলকাতার হিন্দী ভাষাভাষীদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, যাকে অনুসরণ করে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নাট্যসংস্থা এই নগরীতে গড়ে উঠেছে। মঞ্চাভিনয় এবং অপরাপর ক্রিয়ামূলক শিল্পের (পারফর্মিং আর্ট)-এর ক্ষেত্রে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিরাট রুচির বিবর্তন ঘটানো অল্প কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

সম্প্রতি শ্যামসুন্দর কানোবিষার নেতৃত্বে অনামিকা কলাসংগম দেশ-বিদেশের উচ্চ-শ্রেণীর অভিনয়, নৃত্য, সংগীতাদি পরিবেশনের জন্যে আর একটি নতুন পাবিক-কল্পনা গ্রহণ করেছেন। বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক প্রমাণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত কর্মী-ও নির্বাহিকদের (এক্সিকিউটিভদের) যাতে এইসব অভিনয়াদি দেখতে মালিক-গোষ্ঠী সাহায্য করেন এবং ফলে মালিক-কর্মী সম্পর্ক উন্নত হয়, তার জন্যে এঁরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এঁদের পরিকল্পিত 'লোকমঞ্চ' বিভাগের সমন্বিত গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। এঁদের আয়োজিত প্রতিটি প্রদর্শনীর বারোখানি আমন্ত্রণ-পত্র—দুখানি নির্বাহিতদের জন্যে ও দশখানি অপর শিক্ষিত কর্মীদের জন্যে—এঁরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দেবেন বার্ষিক এক হাজার টাকা চাঁদার পরিবর্তে। নানকম্পে বছরে কয়েকটি কিংবা তারও বেশী উদ্ভাষণের প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন বলে এঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা শুনলাম, এরই মধ্যে অন্তত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান 'লোকমঞ্চ'-এর সভ্যপদ গ্রহণ করেছেন। কাজেই আমরা স্থিরনিশ্চয়, অনামিকা কলা-সংগম-এর এই অভিনব প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত হবেই হবে।

**রঙমহলে—নতুন নাটক 'তথ্যসূত্র' :**  
অনর্থ-খ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের আর একখানি আলোড়ন-সৃষ্টিকারী নাটক 'তথ্যসূত্র' গেল প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে রঙমহলে শুরুর হয়েছে। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল সেন। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন—

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ, মিস্ট্র, চক্রবর্তী, তুষার বন্দোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, দিলীপ মৌলিক, জুনি দেবী, গীতা মিত্র, মন্দিরা রায়, মমতা বন্দোপাধ্যায়, সীমা, জুনি চট্টোপাধ্যায় এবং সুরম দেবী। এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন 'তথ্যসূত্র' রঙমহলের দশকদের তৃপ্তিদান। পূর্বগৌরব অক্ষয় রাখলে, এ বিশ্রাম আমাদের আছে। নাটকের গানগুলি লিখেছেন শিবদাস বন্দোপাধ্যায় এবং সুরাযোজনা করেছেন শৈলেশ রায়।

**সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয় বর্ষ :**  
গরিফা সেন্ট্রাল ক্লাবের পরিচালনায় সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৭ মার্চ, ১৯৭৩ থেকে। সামগ্রিক প্রযোজনায় থাকবে তিনটি অংশের প্রদর্শন যথাক্রমে ১০২ টকা, ৭৫ টকা ও ৫২ টকা। যোগসংক্ষেপে তিনটি :

গরিফা সেন্ট্রাল ক্লাব (কালভুদ), পের গরিফা, ২৪ পরগনা।

**নিহত সূর্যের ওপরিষ্ট :** গত ১৯ জানুয়ারী 'আরনা' নাট্যসংস্থা অয়োজিত সেনগুপ্তের 'নিহত সূর্যের ওপরিষ্ট' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে করায় ওয়.ই.ই. মঞ্চস্থ করেন।

এই রূপকথমণী নাটকটির সুন্দর সংলাপ এবং কাহিনীর বিস্তারিত খুবই চমকপ্রদ। আজ সৈন্যদল সমুদ্রতীরবর্তী উপর কটাক্ষপাত করেই এই নাটকটির মূল বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। নাট্যকার অজিত সুন্দরভাবেই মহামানব, বুদ্ধ, মাতাল, কাব ও ডাকাতকে বেছে নিয়েছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের বাস্তব রূপকে দেখানোর। আবার এর মাঝে স্তাবক ও প্রতীক এই দুটি চরিত্রের উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। পরিচালনার গুণে (অঙ্গীক সেনগুপ্ত) নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়। কিন্তু প্রথম সূত্রপাতিটি বড় একেবারে

নগ্ন সারল্যের সহায়তা আর সজ্জিত অভিজাত্যের চমক নিয়ে গড়ে উঠেছে পল্লীর এক নবীন ছন্দে নগর-বিলাসের নিম্ন অভিজাত



প্রযোজনা ও পরিচালনা নরেশ কুমার • সংগীত লক্ষ্মীকান্ত পাল্লোলান

জনতা - জেম - নবীনা (তিনটিই তাপনিয়) - প্রভাত - গণেশ খান্না - রূপালী - খাতুনমহল - মৃণালিনী (দমদম) - নুচিলা (রেহলা) মায়ামাল (খিদিমপুর) - পূর্ণাশা (কসবা) - নবভারত (হাওড়া) শিবানী (শালিগ্রাম) - মানসী (শ্রীরামপুর) - বিভা (বেলঘরিয়া) অতীন্দ্র (বাংকপুড়া) - রূপালী (চুঁচুড়া) - লক্ষ্মী (টিটাগড়) রূপঞ্জী (ভাটপাড়া) - বিজয় (কাশীপুর) - লিলায়া সিনেমা (লিলায়া) অশোক (পাটন) - শ্রীমহাবীর (ভিগওয়াড়) - কোনারক (কাজিরকোনা) মনোজ (মোদিনীপুর)

লাগলো। কিছু অঙ্গবঙ্গ করে নিলে প্রথম দিকটা আরও আকর্ষণীয় করা যায় বলে মনে হয়। আলোকসম্পাতের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে আলোর ব্যুতী যেখানে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি চরিত্রের ওপর পড়েছে, সেখানে আলোর কাজ খুবই উচ্চমানের হয়। সাদাবড়ো যেখানে আগুন নিয়ে প্রতিটি চরিত্রের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, সেখানকার ফ্লিফিট খুবই ভালো এবং অর্থপূর্ণ হয়।

সকলের অভিনয়ের মধ্যে কিছু দুটি ধর্য পড়ে। অবশ্য আরও কয়েকবার অভিনয় করলে এ-দুটিগুলো সংশোধনীয়। তবুও এর মধ্যে মহামানব চরিত্রাভিনেতা সোমনাথ ভট্টাচার্যের অতি অভিনয়ের বৌক অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন। ভট্টাচার্যের চলা-বলার মধ্যেও কৃত্রিম ভাব লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন : সঞ্জয় চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, পীষ্ম সরকার, প্রশান্ত কাজীলাল, প্রবীর ভট্টাচার্য, কুমারমোহন চ্যাটার্জি ও অলোক সেনগুপ্ত।

মঙ্গলসফল নাটকের চিত্ররূপ : স্টারে অভিনীত মঙ্গলসফল নাটক 'শর্মিলার' চিত্র রূপের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। প্রধান সহযোগী জয়ন্ত চ্যাটার্জি এক সাক্ষাৎকারে জানান : গত ২২ জানুয়ারী পার্ক হোটেলে কলকাতায় এক বিখ্যাত হোটেলের নিয়মিত ক্যাবারে নতাপটিমসীর নৃত্য অংশগ্রহণ করার পর ছবির শেষ পর্যায়ের কাজ দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চলছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী মার্চেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

**বেনারসী**  
**সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের**  
**বৈচিত্র্য**  
**ব্যানার্জি ব্যানার্স**  
বড়বাজার - কলিকাতা-৭  
ফোন: ৩৩-২০৭৪

তিনি আরও জানান, এ-ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করছেন : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মূখার্জি, অসিতবরণ, বাসন্তী চ্যাটার্জি, দীপ্তি রায়, কণিকা মজুমদার, সুনীল চৌধুরী, চিন্ময় রায়, রাজশ্রী বসু ও শর্ভেঙ্গী চ্যাটার্জি।

সুধীন দাশগুপ্তের সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন মামা দে ও আরতি মূখার্জি। অন্যান্য বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন সুনীল ঘোষ (পরিচালক), সুনীল চক্রবর্তী (ক্যামেরার), অনিল সরকার (সম্পাদনা)। চিত্রটি সিনে কোমালিটির পতাকাতলে নির্মিত হচ্ছে।

জয়ন্তগুপ্তের একাধিক নাটক প্রতি-রোজিতা : স্থানীয় দেবেন্দ্র বেঙ্গলী দ্রাবে সভাপতিত্ব সুবোধ রায় ও সম্পাদক মোহিত কুমারের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় একাধিক নাটক প্রতিযোগিতা গত ১০ জানুয়ারী থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীকিরণ মৈত্র বিশিষ্ট অতিথি ও বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ :—

শ্রেষ্ঠ নাটক—“আসামী হাজির”, প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ প্রযোজিত। ২য় শ্রেষ্ঠ নাটক—“এক যে ছিল রাজা”—অশনি প্রযোজিত। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—তুষাররঞ্জন বসু (আসামী হাজির), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রঞ্জিত ঘোষ (আসামী হাজির), ২য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—তপন ব্যানার্জি (এক যে ছিল রাজা)। শ্রেষ্ঠ পামর্বাভিনেতা—গোবিন্দ দে (এক যে ছিল রাজা), ২য় শ্রেষ্ঠ পামর্বাভিনেতা—তারাপ্রসাদ বসু (বিষব রেখা), বিশেষ পুরস্কার—মাঃ দেবশর্মা শ্যামরায় (কোথায় আলো)।

‘কবি চন্দ্রাবতী’ যাত্রাভিনয় : কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ গত ২৫ জানুয়ারী মহাজাতি সদন নেতাজী স্মরণসব কর্মিটির আমন্ত্রণে মহাজাতি সদনে শ্রীরঞ্জনকুমার দে রচিত ‘কবি চন্দ্রাবতী’ নাটকটি সাফল্যের সুযোগ অভিনয় করেন। যাত্রাভিনয়ে সৌখীন শিল্পীসংস্থা-গুলির মধ্যে এই সংসদ একাধিক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, তাই এদেশ পরিবেশিত নাটকের মধ্যে যে দলগত সংহতি ও অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই বিরলদ্রষ্ট। জয়চন্দ্র ও

চন্দ্রাবতীর মধুর কাহিনী এ নাটকের বিষয়বস্তু। ‘বন্দন সংঘাত, প্রেম ও বিরহের সমন্বয়ে এ নাটকটির আবেদন। সকল কজনকেই আনন্দদান সক্ষম। শিল্পীরা তার সঙ্গে অভিনয়ে চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। কাহিনীর রসধনতা ও শিল্পীদের প্রাণরসতা যেন এক হয়ে গেছে। বংশীদাস, জয়চন্দ্র, হাসেম আলি, হাসেম আলি, সিপার, শিবচন্দ্র, হলায়ধ, পুষ্পায়ধ, কেনারাম, রহিম, কান্তলাী, চন্দ্রাবতী’ নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় প্রভৃতি চরিত্রে রূপদান করেছেন, ধীরেন চক্রবর্তী, নিখিল দাস, প্রদীপ ব্যানার্জি, সুরেশ ঘোষ, ইতু মূখার্জি, গৌরচন্দ্র পাল, অসিত ঘোষ, দিলীপকুমার, কান্তি, বাগচি, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঋণা বসু, সুলেখা ব্যানার্জি, বেলবুল দে, রীতা মূখার্জি, গৌর অধিকারী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীঅজিত সাহা। লক্ষ্য নাটকের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি।

#### ‘কবি’ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু

সমগ্র সাহিত্য জীবনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ক’খানি উপন্যাস লিখেছেন, ‘কবি’ তার মধ্যে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। কাহিনীর বলিষ্ঠ বহুতা তার প্রকাশকালে সমসাময়িক সমাজ জীবনকেই নাড়া দেয়নি, আজও তার আবেদন অক্ষুর আছে। এই সঙ্গীতপ্রধান গ্রাফিক প্রেমের কাহিনীটি যখন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় আজ থেকে চম্বিশ পঁচিশ বছর আগে তখন তার জনপ্রিয়তার কথা আমরা ভুলিনি। আমাদের চোখের সামনে সেইসব চরিত্র যেন আজও জীবন্ত—সেই কবিয়ালা, ঠাকুরকি, বসন, রাজন, মাসি ইত্যাদি।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মাতালিয়া প্রোডাকশন্স কবির নতুন চিত্ররূপ আবার আমাদের উপহার দিতে চলেছেন। বসন আর কবিয়ালায় প্রেম আবার নতুন করে আমাদের মনের মর-স্থানটিকে নাড়া দিয়ে যাবে।

#### কলকাতায় মিঃ টমাস জে বাটা

মিঃ টমাস জে বাটা ২৪ জানুয়ারী দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। ১৯৭০ সালে দূরপ্রাচ্য সফর ক্রমসূচীতে ভারতে অবস্থানকালে মিঃ বাটা ভারতের পাদুকা-শিল্পের কারিগরী উন্নয়ন পর্বেবেক্ষণ করেন এবং ভারতীয় কোম্পানির কার্যাবলী, কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে সর্বাধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি বাণিজ্যিক কর্মকৌশল, ফ্যাসানের প্রবণতা বিষয়ে পরামর্শ দেন।

মিঃ বাটা ২৮ জানুয়ারী কলকাতা ত্যাগ করেন।

**কেশুত**  
গুণবতি, সফলতম কেশ চর্চক  
কেশচর্চক

# খেলা ধূলা

দর্শক

## ভারত বনাম ইংল্যান্ড

চতুর্থ টেস্ট খেলা

কানপুরে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের মধ্য টেস্ট খেলা অসমীয়াসিতভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ভারত ২-১ খেলার ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে এগিয়ে আছে। সুতরাং ভারত বোম্বাইয়ের ৫ম অর্ধশত শেষ টেস্ট খেলাটি জু রাখতে পারলেই 'রাবার' জয়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য, কানপুরে এই নিম্নে এই দুই দেশের মধ্যে যে চতুর্থ টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ০। ইংল্যান্ড এখানে ১৯৫১-৫২ সালের টেস্টে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল।

ভারতবর্ষ টেসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়ে মোটেই সন্তোষ করছে পারে নি। প্রথম দিনের ৩৫০ মিনিটের খেলায় তারা দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৬৮ রান তুলেছিল। দাদাই লস্কর চলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের রান তোলার বহর দেখে ক্রিকেট খেলার লোকের বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। স্কোর বোর্ডে লাগের সময় কোন উইকেট না-পড়ে ৫১ রান এবং চা-পানের সময় দুটো উইকেট পড়ে ১১০ রান দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ গাভাস্কার ২০১ মিনিটে ৬৯ রান করে আউট হন। আবার তাকে স্বমহিমায় ফিরে আসতে দেখে



ফারুক ইজিনিয়ার

সুদীপ গাভাস্কার



সকলেই খুশী। বিগত তিনটি টেস্টে তাঁর খেলা খুবই খারাপ হয়েছিল-৬ ইনিংসে মোট রান ৬০ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর কানপুর টেস্টে এই ৬৯ রানই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় তাঁর দিক থেকে সর্বোচ্চ রান। আরও উল্লেখ্য, কানপুরের এই চতুর্থ টেস্টে তিনি তাঁর ৬৯ রানের মধ্যে ২২ রান সংগ্রহ করলে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০০ রান পূর্ণ হয়। ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে গাভাস্কারই তুলনায় কম টেস্ট ম্যাচ খেলে ১০০০ রান



জি আর বিশ্বনাথ

টনি লাইস



পূর্ণ করেছেন। তাঁর বাজার রান পূর্ণ হয়েছে ১১তম টেস্টের ২১তম ইনিংসে। প্রথম দিনের খেলায় অপরাধিত ছিলেন ওয়াসেকার (৪১ রান) এবং বিশ্বনাথ (২৪ রান)।

দ্বিতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৩২ (৭ উইকেটে)। এইদিন তারা আরও ৫ উইকেট খুইয়ে পূর্ণদিনেব ১৬৮ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১৬৪ রান যোগ করেছিল। ভারতের রান ছিল নাগের সময় ২৫২ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ২৯১ (৪ উইকেটে)। অধিনায়ক ওয়াসেকারের দৃষ্টিগোচ্য তিনি মাত্র ১০ রানের জন্যে স্বদেশের মাটিতে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ওয়াসেকার ৩২২ মিনিট খেলে তাঁর ৯০ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং ১টা ৬৩র বাউন্ডারী করেন। চতুর্থ উইকেটের জুড়িতে ওয়াসেকার এবং মনসুর আলী



জ্যাক বার্কেনস

**কিশ্ব ক্রীড়া**



১৯৪৬ সাল সংগ্রহ করেছিলেন। মনসুর জাফরী আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ২০০ মিনিট খেলে তার ৫৪ রানে ৭টা বাউন্ডারী এবং ৬টা ক্রসার-বাউন্ডারী করেছিলেন। কিশ্বের গতিতেই না ভারতবর্ষ রান করেছিল— ১০ ঘণ্টার তাদের ৩০০ রান পূর্ণ হয়।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার তার ১ম ইনিংসের ১৫ রানের মধ্যে ১১ রান তুলে তার টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। ফারুকের এই ২০০০ রান পূর্ণ হয়েছে তার ৩৭তম টেস্ট খেলার ৬৯তম ইনিংসে। তাকে নিয়ে ১০জন ভারতীয় খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৫৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তারা মাত্র ৪০ মিনিট খেলে শেষ ৩৫ট উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ২৫ রান শোগ করেছিল। কিস্ব ওমর মারাখাক বোলিংয়ে মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে ভারতের শেষ দিনে উইকেট

সিদ্ধেছিলেন। আবিদ আলি ৪১ রান উদ্ধতকরণে। তিনি আক্রমণাত্মক খেলার ইংল্যান্ডের বোলিংয়ের দিক তেজী করে নিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনের বাকি ২৭১ মিনিটের খেলার ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের ৩৫৭ উইকেটে খুইয়ে ১১৪ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক লুইস (৮৬ রান) এবং ফ্রেচার (২৮ রান)। লুইস এবং ফ্রেচারের অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে এইদিন ৮০ রান উঠেছিল। আবিদ আলি এবং লুইসের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দশকদের এইদিন যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩১০ (৭ উইকেটে)। এইদিন তারা আরও ৪৫ উইকেট খুইয়ে পূর্ব-দিনের ১১৮ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে ১১২ রান শোগ করেছিল। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস ১২৫ রান করে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলার তার এই রথম সেপ্তুরী। তাছাড়া ইংল্যান্ড-ভারতের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজেও এটা প্রথম সেপ্তুরী। এখানে উল্লেখ্য, কানপুরে ইংল্যান্ড-ভারতের টেস্ট খেলায় এই নিয়ে ৮টা সেপ্তুরী হল—ইংল্যান্ডের ৬টা এবং ভারতের দুটো। ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট সেপ্তুরী করেছেন ব্যারিংটন (১৭২ রান), ভেঙ্কটর (নটআউট ১২৬ রান), পুলাস (১১৯ রান), বেরী নাইট (১২৭ রান) এবং পিটার পারফিট (১২১ রান)। অপরদিকে ভারতের পক্ষে সেপ্তুরী করেছেন পলি উমরীগড় (নটআউট ১৪৭ রান) এবং বাপু নাদকাগশী (নটআউট ১২২ রান)।

লুইস তার ১২৫ রানে ১৬টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। অপরদিকে তার ৪র্থ উইকেটের জুটি কিথ ফ্রেচার তার ৫৮ রানে করেছিলেন ৮টা বাউন্ডারী। টনি লুইস এবং কিথ ফ্রেচার তাদের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে যেকোন দলের অতি মনোহান ১৪৪ রান

তুলেছিলেন তেমন দশকদের বরফ আনন্দ দিয়েছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৩৩৬ (৭ উইকেটে)। ভারতের ১ম ইনিংসের ৩৫৭ রানের থেকে ২১ রান বেশী।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৩১০ (৭ উইকেটে)—ভারতের ১ম ইনিংসের থেকে ৩০ রান বেশী। খেলায় অপরাজিত থাকেন বাকেনশ (৫৯ রান) এবং আরনল্ড (৪৫ রান)। বাকেনশ এবং আরনল্ডের অসমাপ্ত ৮ম উইকেটের জুটিতে এইদিন ৮৯ রান উঠেছিল। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা মনের সূত্রে ভারতীয় বোলারদের নিম্নমভাবে পিটিয়ে খেলেছিলেন।

পঞ্চম অর্ধাং খেলার শেষ দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৩১৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের ৩৫৭ রানের থেকে ৪০ রানে এগিয়ে যায়। এই দিন ইংল্যান্ড আরও দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৩১০ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে ৭ রান শোগ করে আগুনে আঘাত থাকায় গিফোর্ড ব্যাট করতে নামেন।

ভারতের ২য় ইনিংসের ৩৯ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে গেলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে যায়। কিন্তু সালকার (২৬ রান), আবিদ আলি (৩৬ রান) এবং বিশ্বনাথ (নট আউট ৭৫ রান) দুজতার সঙ্গ খেলে ভারতকে বিপদমুক্ত করেন। সোলকার ও বিশ্বনাথ ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৬৪ রান এবং আবিদ আলি ও বিশ্বনাথ ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৮ রান তুলেছিলেন। বিশ্বনাথ ৭৫ রান করে শেষ পর্বন্ত অপরাজিত থেকে যান। তিনি ২৪২ মিনিট খেলে তার ৭৫ রানে ১০টা বাউন্ডারী করেন।


ভারতের ২য় ইনিংসের ১৮৬ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় ৪র্থ টেস্ট খেলা শেষ হয়। দুটি বিরতির সময় ভারতের রান এই রকম ছিল : ল্যান্ডের সময় ৩৬ রান (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১২৬ রান (৫ উইকেটে)।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

ভারতবর্ষ : ৩৫৭ রান (গোভাসকার ৩১, ওয়াদেকার ১৪, মনসুর আলি ৫৪ এবং আবিদ আলি ৪১ রান। ৩৫৭ ৩৯ রানে ৪ এবং আন্ডারউড ১০ রানে ৩ উইকেটে)

ও ১৮৬ রান (৬ উইকেটে)। বিশ্বনাথ নট আউট ৭৫, আবিদ আলি ৩৬ এবং সোলকার ২৬ রান। আন্ডারউড ৪৬ রানে ২ এবং বাকেনশ ৬৬ রানে ২ উইকেটে।

ইংল্যান্ড : ৩১৭ রান (লুইস ১২৫, ফ্রেচার ৫৮ বাকেনশ ৫৪ এবং আরনল্ড ৪৫ রান। চন্দ্রশেখর ৮৬ রানে ৪, বেশী ১৩৪ রানে ৩ উইকেটে)



## এস্ট্রাফ্রুটিন

কার্যকর কিড (জিঃ)

কার্যকর, শোব, হৃদয়বৃত্ত মা, পোড়া বা পোড়ার মা, প্রচুতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সাধিয়া যায়।

**বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে বোজনহীন**

সিটম ৩০ বোঃ বসিকাতা-১৪







